গ্রন্থাবলী সিরিজ

রামপদ-গ্রন্থাবলী

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

মহালয়া, ১৩৬১

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

রামপদ সাহিত্য-পরিচিতি

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়ের রচনার পরিচয় সাহিত্য-শ্রেষ্ঠদের লেখনী হইতেই পরিস্ফুট।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের পাটনা অধিবেশনে সাহিত্য-সভার সভাপতিরূপে প্রসিদ্ধ বঙ্গসাহিত্য সমালোচক ৺মোহিতলাল মজুমদার তৎকালীন প্রতিশ্রুতিবান লেখক-পরিচিতি প্রসঙ্গে বলেন,—

"শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় ধ্বংসোন্মুখ রাঢ়ের বিগতশ্রী পল্লীর চিত্ররচনায় যে দক্ষতা দেখাইয়াছেন—তাহাতে বাংলা-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট আসন দাবী করিতে পারেন।" তিনি অন্যত্র বলেন: "মধ্যবিত্ত বাঙালী-জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার কাহিনীই রামপদ বাবুর গল্পের প্রধান উপজীব্য। সেই জীবনে নিরুপদ্রব ভাবের প্রবল উচ্ছ্বাস আছে, কিন্তু বাহিরের জগতের সংগ্রামের তীব্রতা নাই; আছে একটা অলস মন্থর গতিবেগ মাত্র—ক্ষুদ্র-বৃহৎ ভাব-বুদ্বুদের উদয় ও বিলয়। জীবনের এই পটভূমিকায় লেখক যে সৃষ্টিকর্ম্ম করিয়াছেন—তাহাতে তাঁহার সুনিপুণ কল্পনা-নৈপুণ্যের পরিচয় আছে এবং আরও আছে প্রগাঢ় বস্তুরস-রসিকতার অভ্রান্ত সাক্ষ্য। দূর হইতে নহে, একেবারে মুখোমুখী দাঁড়াইয়া যে মানুষকে তিনি চাক্ষুষ করিয়াছেন, তাহারাই তাঁহার গল্পের বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে; সুতরাং এই সৃষ্টি যেমন প্রত্যক্ষ—তেমনই অতিশয় বাস্তব।"

'শাশ্বত পিপাসা' সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ রসশিল্পী সাহিত্য-প্রবীণ শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,—

"বইখানি আসার পর, পক্ষাধিক তার পাত্তাই পাইনি, মেয়েদের দখলে গিয়ে পড়েছিল। কেউ ছাড়তে চায় না। পড়তে গিয়ে তার কারণ বুঝলুম, সে যে তাদেরই জীবনী। নিজেদের নূতন করে দেখবার 'আয়না' তারা পেয়েছিল। আমাদের সংসারটা অনেকটা সেকালের মতই আছে। তাই তারা বধূজীবনের প্রত্যেক stageটি খুঁটিয়ে উপভোগ করেছে। একটা যুগকে, এখন ইতিহাস হিসেবে, জীবন্ত করে দিয়েছে। অথচ আমার মত সেকালের লোক কোথাও একটু অতিরঞ্জন পায়নি। তাতেই তোমার বাহাদুরি লক্ষ্য করলুম। আজকাল গতযুগের কথা খাঁটি রেখে লেখা যে কত কঠিন, সেটা অনুমান করতে পারি। তুমি নিশ্চয়ই সেকালের সম্ভ্রান্ত বনেদি বংশের ছেলে, নচেৎ এমন নিভুর্ল ছবি আঁকতে পারতে না। এটির মূল্য অনেক। এর মূল্য ও মর্য্যাদা এর মধ্যে সত্য হয়ে থাকবে। তোমার চেষ্টা ও শ্রম সফল ও সার্থক হয়েছে। সাহিত্যও সমৃদ্ধ হয়েছে। কল্পনা-প্রসূত উপন্যাস ও গল্প আমরা যথেষ্ট পাই। তারাই আমাদের সাহিত্যকে পুষ্ট করে চলেছে, শিক্ষিত ও শিক্ষিতাদের ক্ষুধা মেটায়—আনন্দও দেয়। তোমার 'শাশ্বত পিপাসা' সত্যের গৌরব বহন করবে। পাঠান্তে আমি বড় আনন্দ পেয়েছি। তুমি নূতন লোক নও, জনপ্রিয় সাহিত্যিক। শ্রমসাধ্য হলেও যতটা পার দেশের কথা দিয়ে যেও।"

"শাশ্বত পিপাসা", "মায়াজাল" সম্বন্ধে পরশুরাম (শ্রীরাজশেখর বসু) বলেন,—"এই গল্প যখন প্রবাসীতে ক্রমশ বার হচ্ছিল—তখনই পড়েছিলাম। বাঙালী জীবনের স্বাভাবিক বর্ণনা এখন ফ্যাশন-সম্মত নয়, তার স্থানে ইঙ্গ-বঙ্গ-বিপ্লবী কমরেড-ঘটিত কৃত্রিম সমস্যাময় সমাজচিত্র রচিত হচ্ছে, তার

পাত্রপাত্রীরা সকলেই অমিত রায় বা সন্দীপের নকলে কথা বলবার চেষ্টা করে। এই শ্রেণীর উপকথা বা অপকথা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় আপনার লেখায়। ঝরঝরে অকৃত্রিম ভাষা, অকুটিল আলাপ, আর স্নিগ্ধ গ্রাম্য পরিবেশ—সবশুদ্ধ মিলে আপনার গল্পটিকে উপাদেয় করেছে। আপনার কলম থেকে এই রকম রচনা অজস্র বার হোক, এই কামনা করি।"

'দেশ' সম্পাদক বঙ্কিম সেন শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেন—"তাঁহার লেখার বিশেষত্ব এই যে, তিনি লেখার মধ্য দিয়া বাংলা দেশের নরনারীর অন্তরের বেদনার যোগসূত্রে মানবমনের মূলীভূত সার্ব্বভৌম সত্তার সহিত পাঠকের চিত্তকে তাহার নিজের অজ্ঞাতসারেই যুক্ত করিয়া দেন। এইখানেই আমরা তাঁহার রসসৃষ্টির অসাধারণত্বের পরিচয় পাই।"

খ্যাতিমান কথা-সাহিত্যিক শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ধারণা,—

"রামপদ বাবু তাঁহার গল্পের উপাদানের জন্য সুদূরে অভিযান করেন না। নিত্য-প্রবহমান দৈনন্দিন জীবনের মধ্যেই যেখানে একটু বিস্ময়, একটু কৌতুক, আনন্দ-বেদনার সন্ধান পান, তাহাতেই সামান্য রং ফলাইয়া আমাদের পরিবেশন করেন। দেখা জিনিষকে ভালো করিয়া দেখিবার, চিনিবার এবং উপলব্ধি করিবার যে সহজ আনন্দ আছে, রামপদ বাবুর লেখায় সেই আনন্দ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।"

কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় রামপদ বাবুকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"তোমার লেখা পড়িয়া জানিয়াছি, বঙ্গ-সাহিত্যের কষ্টিপাথরে তুমি সুবর্ণরেখাপাত করিয়াছ। তোমার বাণী-সাধনা জয়যুক্ত হোক।"

শাশ্বত পিপাসা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

শাশ্বত পিপাসা

প্রথম অধ্যায়

১

বাড়ীটা বনের মধ্যেই বলিতে হইবে। সদর রাস্তা হইতে একটা পঞ্চাশ-ষাট হাত লম্বা গলি—বাড়ীর দুয়ারে গিয়া শেষ হইয়াছে! সেকালের মস্তবড় শাল কাঠের দুয়ার—যাহার মধ্য দিয়া ভিতরের ঠাকুর-দালান হইতে অনায়াসে প্রতিমা বাহির করিয়া লইয়া আসা যায়। কিন্তু যিনি ঠাকুর-দালানের পরিকল্পনা করিয়া দুয়ার তৈয়ারী করিয়াছিলেন—আর্থিক অসাচ্ছল্যের দরুণ পূজা-মণ্ডপটির ভিত পর্য্যন্ত গাঁথিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর সে-কল্পনাকে সার্থক করিবার সুযোগ আর কাহারও ঘটিয়া উঠে নাই। বরং সিং-দরজার চারি পাশের সু-উচ্চ প্রাচীর মাথা ভাঙ্গিয়া ক্রমশঃ ভূমিলগ্ন হইবার ভ্রূকুটি দেখাইতেছে। তবু সে প্রাচীর একেবারে ভাঙ্গিয়া মাটির সঙ্গে মিশিয়া যায় নাই। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দুই দিকে চাহিলে—উত্তর দিকের এই সৌভাগ্যকে হিংসাই করিতে হয়। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে এককালে যে প্রাচীর ছিল—সে কথা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। কায়েতদের প'ড়ো জমিটার জঙ্গলের সঙ্গে এবাড়ীর উঠান আশ্চর্য্যজনক ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। বড় জামগাছ ও গোটা তিনেক সজিনা গাছ না থাকিলে সীমানা-নির্দ্দেশে গোলযোগ বাধিবার যথেষ্ট সম্ভাবনাই ছিল। বোসেরা বহুকাল গ্রাম ছাড়া। গাছের মালিকানা-স্বত্ব লইয়া বিবাদ করিবার লোকাভাব বশতই—ওদিককার নোনাআতা, ধলা-আঁকড়া, কালকাসুন্দা ও পিটুলি গাছের ঘন-জঙ্গল মধ্যে শিবাকুল বাসা বাঁধিয়াছে। গোয়ালে ও বন-উচ্ছে লতা ওই সব গুল্মজাতীয় গাছের মাথায় ঘন হইয়া জঙ্গলের নিবিড়ত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে। লোকে বলে শীতকালে বাঘ আসিয়া ওখানে বাসা বাঁধিয়া থাকে। কিন্তু সে কল্পনা-বিলাসী লোকের কথামাত্র। এ-বাড়ীর লোকেরা জানেন, বাঘ কোনকালেই লোকালয়ের মধ্যে ওই জঙ্গলে আসিয়া অবস্থান করে নাই। সন্ধ্যা হইতে সারারাত্রি পর্য্যন্ত প্রহর ঘোষণা করিয়া শিবাকুল শুধু যা একটু কোলাহল জমাইয়া তুলে। প্রাচীরহীন বাড়ীতে তাহাদের উৎপাতের চিহ্নও কিছু কিছু রাখিয়া যায়। কিন্তু শৃগালকে গালি দিলে—তাহারা অনেক প্রকার অপকর্ম্মের চিহ্ন উঠানে রাখিয়া যায়, কাজেই বাড়ীর গৃহিণী আপন মনেই গজগজ করিয়া উঠানে গোবর জল ছড়াইয়া সকালের পাট-ঝাঁট সারেন। বরং বাড়ীর অন্য কেহ শৃগালের দগ্ধ মুখ লইয়া কিছু কটু কথা বলিতে গেলে—নিষেধ করেন।

পশ্চিমে প্রাচীর তৈয়ারী করিবার প্রয়োজন নাই। দু'খানি কোঠাঘর সামনের একটু ফালি রোয়াক সমেত ওদিককার সীমানা রক্ষা করিতেছে। দক্ষিণ-দুয়ারী ঘরের রাজা হইলেও, অনেকখানি জায়গা থাকা সত্ত্বেও, তাহার প্রজা হিসাবে কেন যে ঘরগুলিকে পূর্ব্বমুখী করা হইয়াছিল—তাহার কৈফিয়ৎ এক শত বৎসর পরে কে-ই বা দিবে? পাতলা ইঁটের ঘর—চুণবালির পলস্তরা নাই। তবু কাদার গাঁথনি হইলেও ইঁটগুলি সুসজ্জিত বলিতে হইবে। ঘরের দুয়ার ছোট, জানালা ছোট, ছাদ অনেকখানি নীচু। শালকাঠের কড়ি বয়োজীর্ণ হইয়া স্থানে স্থানে ফোঁপরা হইয়া গিয়াছে, বরগার অবস্থাও ভীতিপ্রদ। উপরের ছাউনি পাতলা ইঁটেরই। সেকালে টালির চলন হয়ত ছিল না। কড়ি বরগায় আলকাতরা মাখানো, ফোঁপরা জায়গাগুলিতে আলকাতরামাখানো ন্যাকড়া গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছে। মানুষের আশা অর্থাভাবে একদিকে যেমন পঙ্গু হইয়া পড়ে, অন্য দিকে উইয়ের পুরাতন-প্রীতিতে মন তেমনই শঙ্কায় ভরিয়া উঠে।

দু'টি ঘরের মাঝখানে চিলেকোঠা-সমন্বিত একটি অপ্রশস্ত সিঁড়ি আছে। দুই দিকের ঘর হইতে ছাদে উঠিবার জন্য ঐ সিঁড়ির মুখে একটি করিয়া দুয়ার আছে। তবে সে দুয়ার দুইটির উপকারিতা বিশেষ নাই। নড়বড়ে খিলে কোন রকমে আটকাইয়া দু'টি ঘরের ব্যবধান সৃষ্টি করা ছাড়া সে দুয়ারের সার্থকতা নাই। সেখান দিয়া

হাওয়া চলে না, আলো আসে না, চোর ঠেকানোও দুষ্কর। চিলেকোঠার মুখে যে দুয়ারটি আছে, সেটি মজবুত অর্থাৎ চোর আটকানো চলে। সিঁড়ি এমন অন্ধকার যে, দিনে প্রদীপ জ্বালিয়া চলিলে ভাল হয়। চিলেকোঠার মাথায় একটা টবে তে-কাঁটা সিজগাছ বসানো আছে। বজ্রপতন হইতে গৃহকে রক্ষা করিবার ওটি নাকি অমোঘ অস্ত্র।

সামনেই যা দু'টি জানালা ও একটি করিয়া দুয়ার আছে এবং সেগুলিতে উইয়ের আক্রমণ নির্মম ভাবেই চলিতেছে, শীতকালে চট টাঙাইয়া না দিলে ঘরের হিম আটকানো যায় না; আর তিন দিকে দুয়ার জানালার বালাই নাই। কর্তাদের ধন-প্রবাদের কথা এ-অঞ্চলে সুবিদিত ছিল, কাজেই চোরের ভয়ে তিন দিকে জানালা না রাখিয়া গৃহটিকে দুর্গবিশেষে পরিণত করিয়াছিলেন। তা সত্ত্বেও বার দুই চুরি হইয়া গিয়াছে ও বার কয়েক চুরির প্রয়াস হইয়াছে।

ঘরের মধ্যে আসবাব-পত্র অনেক। গোটা দুই বড় কাঠের আলনা, মাইপোষ (বাক্স সংযুক্ত তক্তাপোষ), জলচৌকি, কাঁথা ইত্যাদি রাখিবার জন্য দড়ি দিয়া ঝোলানো তক্তা, কয়েকখানি সেকালের আঁকা পটুয়ার ছবি—কালী, দুর্গা, অন্নপূর্ণা, গণেশ ইত্যাদি। একখানি খাঁড়া ও এক খানি টাঙ্গি দেওয়ালে টাঙ্গানো আছে। জোড়া কুলুঙ্গি গোটাতিনেক, তাহাতে অসংখ্য বোতল, শিশি, সিঁদুর-চুপড়ি, মাটির ও কাঠের পুতুল, সিঁদুর-কৌটা, ঝাঁপি, কড়ি, পুঁতির মালা ইত্যাদি রহিয়াছে। কুলুঙ্গির কোণে ও ঘরের কোণে মাকড়সারা জাল বুনিয়াছে। এ-বেলাকার সম্মার্জ্জনী-প্রহারে যে কারুকার্য্য ভাঙিয়া যায়, ও-বেলায় নবতর উদ্যমে সেগুলি গড়িয়া উঠে। গৃহিণীরা কাজেই উদ্যমহীন হইয়া ওই দিকগুলিতে সম্মার্জ্জনী চালনা বন্ধ করিয়াছেন। জীর্ণ কড়ির উপরে কে খড়ি দিয়া লিখিয়া রাখিয়াছে,—১৫ই মাঘ কুয়াশা। অর্থাৎ আষাঢ় মাসের ওই তারিখটিতে বৃষ্টি হইবেই। ফলাফলের কথা অবশ্য লেখক লিপিবদ্ধ করেন নাই।

উঠানের আমতলার পাশে আর একখানি পশ্চিমমুখী ক্ষুদ্রকায় ঘর আছে। সেখানি পূর্ব্বে রান্নাঘর ছিল—এখন বাসগৃহ হইয়াছে।

ঘড় ছাড়িয়া উঠানে পড়িলেই—সেখানকার প্রশস্ততায় মন উৎফুল্ল হয়, ভয়েও শিহরিয়া উঠে। উঠানে একটি আম, একটি কাঁঠাল ও একটি বাতাবি লেবুগাছ আছে। গ্রীষ্মকালে সুশীতল ছায়ায় দু-দণ্ড দাঁড়াইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়, শীত-কালে অনেকখানি বেলা হইলেও গায়ের দোলাই বা কাপড় নামাইবার ইচ্ছা হয় না, বর্ষাকালে রাত্রি বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে গা শিরশির করিয়া উঠে। রোদ পোহানই হউক, আর বড়ি শুকাইতে দেওয়াই হউক—অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া সাবধানে ছাদে উঠিতেই হয়। কাপড় মেলিতে দেওয়ার জন্য গাছের ডালে দড়ি বাঁধা আছে, জানালার গরাদে আছে, শিকল লাগাইবার সুরশো আছে; দেওয়ালে কয়েকটা হাঁসকল ও ডোমনি পোঁতা আছে। সেকালে কব্জা ইত্যাদি ছিল না, কাজেই পুরাতন হাঁসকল ডোমনি ইত্যাদি এধার ওধার অনেক পড়িয়া আছে।

ন'বছরের মেয়ে যোগমায়া এই বাড়ীর উঠানে পা দিয়া সভয়ে যে শাশুড়ীর আঁচল চাপিয়া ধরিবে, তার আর আশ্চর্য্য কি!

শাশুড়ী সস্নেহে হাসিয়া তাহাকে কোলের কাছে আরও একটু টানিয়া লইয়া বলিলেন,—ভয় কি মা। এ যে তোমারই বাড়ীঘর—চিরজীবন এইখানেই কাটাতে হবে।

চিরজীবন মানে বুঝিবার বয়স যোগমায়ার হয় নাই। ও একটা কথার কথা—বলিতে হয়। কিন্তু চার-পাঁচ দিন মানেই যদি চিরজীবন হয় তো সে বড় ভয়ানক। বাড়ী হইলে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া যোগমায়া আপত্তি জানাইত। কনকাঞ্জলির পূর্ব্বে মা পাখী পড়াইবার মত শ্বশুরবাড়ী সম্বন্ধে যোগমায়াকে অনেকগুলি সদুপদেশ দিয়াছিলেন। সবগুলিই যোগমায়ার মনে অবশ্য ছিল না। কিন্তু পতি যে পরম গুরু ও শ্বশুরবাড়ীতে মুখটি বুজিয়া থাকিলেই লক্ষ্মী মেয়ে বলিয়া সকলে সুখ্যাতি করিবে—এই দু'টি উপদেশ সে ভোলে নাই।—শাশুড়ীর আঁচলের তলায় যোগমায়ার ক্ষুদ্র দেহখানি বারকয়েক কাঁপিয়া উঠিল মাত্র, কোন ধ্বনি শোনা গেল না।

উঠানের মাঝখানে একখানি শিলের চারিদিকে কলার তেউড় পুঁতিয়া যে শুভস্থানটি রচনা করা হইয়াছে—বরবধূ আসিয়া তাহার উপর দাঁড়াইল। বছর ষোল বয়স বরের, গল্পে-শোনা রাজপুত্রের মত রং, টিকলো নাক, উপর ওষ্ঠে ফ্যাকাসে কালোর রেখা সবেমাত্র দেখা দিয়াছে। আর কৌতুকচঞ্চল চোখ দু'টি যোগমায়ার ভালই লাগিয়াছে। না

হইলে বার-বার ওদিকে চাহিতে গিয়া একটা ভয়-মিশ্রিত লজ্জা কেন আসিতেছে। অমন করিয়া তাকাইলে লোকে বেহায়াও তো বলিতে পারে।

দুধে আলতায় গুলিয়া একখানা কাঁসার থালা পায়ের কাছে রাখিয়া একজন বর্ষীয়সী বলিলেন, এই থালাখানায় পা দিয়ে দাঁড়াও তো মা। ভয় কি, দাঁড়াও।

অন্য সময় হইলে ক্রীড়ার আনন্দে যোগমায়া চঞ্চল হইয়া উঠিত, এখানে প্রতিপদে মার সতর্কবাণী শাসন-কার্য্য করিতেছে। পা কাঁপিতেছে, আনন্দ-চাঞ্চল্যে নহে, ভয়ে। না জানি চারি পাশের কৌতূহলী জনতা কি বলিবে!

চারি পাশ হইতে গুঞ্জন ধ্বনি উঠিল, আহা, থালায় পা দিয়ে থালার শোভা যেন উথলে উঠল। কেমন রাঙা টুক্‌টুকে পা দু'খানি! সার্থক বউ ঘরে এনেছ ভাই, যেন দুগ্‌গো প্রিতিমে।

এখানেও বরণ, একযোগে হুলুধ্বনি, চেলির গাঁটছড়া বাঁধিয়া ধীরপদে বরের অনুসরণ। সমবেত মহিলাবৃন্দ শত কণ্ঠে প্রশংসাধ্বনি তুলিয়াছেন, যেমন বর—তেমনি বধূ। যেন চাঁদ ও রোহিণী একত্রে মিলিয়াছে। প্রশংসার লজ্জায় বালিকার বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিতেছে, পায়ে পায়ে ও পায়ে চেলিতে জড়াইয়া চলনটিকে আরও সলজ্জ ও মন্থর করিয়াছে এবং এই চলনভঙ্গি লইয়াও প্রশংসার গুঞ্জনধ্বনি উঠিয়াছে।

পূর্ব্বমুখী বড় ঘরটাতেই পুরাতন জাজিম বিছাইয়া বরবধূর শয্যা বিস্তৃত হইয়াছে। পিছনে ও দুই পাশে ঠেস দিয়া বসিবার জন্য মোটা ধবধবে তাকিয়া সাজানো আছে, বিছানার উপরে ধবধবে চাদর পাতা। বধূর দুধে-আলতা মাখা আধশুকনা পায়ের অস্পষ্ট ছোপ সেই সাদা চাদরের উপর লাগিয়া গেল। বরবধূ পাশাপাশি বসিল। ঘরের মধ্যে সে কি ভিড়! বরবধূর কড়ি খেলা দেখিবার জন্য জনমণ্ডলীর চোখে মুখে আগ্রহ পরিস্ফুট।

হাঁ মা, কড়ি নাও—যে ক'টা ইচ্ছে নাও। নিয়ে লুকিয়ে ফেলবে শাড়ীর তলায়, হাঁটুর নীচেয়, বালিশের পাশে; যেখানে হোক, লুকোও।

বধূর আড়ষ্ট হাত আর উঠিতে চাহে না। এ খেলা মন্দ নহে, কিন্তু এতগুলি কৌতূহলভরা দৃষ্টির সম্মুখে? কে একজন তাহার আড়ষ্ট হাত ধরিয়া কড়ি লুকাইবার কৌশল শিখাইয়া দিলেন।

বরকে সম্বোধন করিয়া কেহ বলিলেন, খেল তো দেখি কড়ি। এইবার গোন দেখি—ঠিক আছে কি না? দু'টো কম? হুঁ, খোঁজ তো ভাই, কোথায় গেল?

বর বেচারা বস্ত্রস্তূপমণ্ডিতা বধূর পানে ও বালিশ-গুলির পানে কৌতুকভরা দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল। কোন্‌খানে লুকাইয়া রাখা সম্ভব? কোন্‌খানে? কিছু অনুসন্ধানের পর—বধূর বাঁ হাঁটুর তলদেশ হইতে কড়ি বাহির হইল।

সমবেত জনতা হাসিয়া উঠিল।

শক্ত মেয়ে গো, শক্ত মেয়ে। সংসার গুছিয়ে করিতে পারিবে। দেখ নি, শাশুড়ী যখন হাতে ভ্যাদা মাছটা দিলেন, কেমন শক্ত মুঠোয় চেপে ধরেছিল? এ বউ ঠাণ্ডা হবে—আর হিসেবিও হবে দিদি।

তাই আশীর্ব্বাদ কর ভাই। তোমাদের পাঁচ জনের আশীর্ব্বাদে সংসার আমার সুখের হোক। শাশুড়ীর মুখে-চোখে অপরিমিত উল্লাস-চিহ্ন।

খাইতে বসিয়া মনে পড়িয়া গেল, বেশী খাইতে মা নিষেধ করিয়াছেন। লক্ষণ বাঁচাইয়া চলাটাই নূতন জায়গার রীতি। কিন্তু বালিকা যোগমায়ার তীব্র ক্ষুধাই পাইয়াছিল। থাবায় থাবায় ক্ষিপ্র করে যাহা নিঃশেষ করিবার কথা, তাহা অতি সঙ্কুচিত ভাবে আর এক জনের হাত হইতে মুখে লইবার সময় ক্ষুধার অনেকখানিই যেন কমিয়া আসিতেছে। নিরুপায় যোগমায়া লোলুপ দৃষ্টিতে অন্নের পানে ও হতবুদ্ধির মত চারি পাশের জনতার পানে লুকাইয়া লুকাইয়া চাহিতে লাগিল। বধূর ভোজনও কি একটা দেখিবার জিনিষ! ইহাতেও নিন্দা-সুখ্যাতির কথা উঠিতে পারে বুঝি?

পেট ভরিল কিনা যোগমায়া ঠিক বুঝিতে পারিল না, কিন্তু খাইবার স্পৃহাও তাহার আর নাই। শাশুড়ীর হাতের গ্রাসে ঘাড় নাড়িয়া সে আপত্তি জানাইল। অর্থাৎ আর খাইতে পারিবে না।

সকলে বলিল, লক্ষ্মী বউ। অর্থাৎ কম খাইয়াছে।

বাহিরের লোক ততক্ষণে প্রায় সব চলিয়া গিয়াছে। নিজেদের সংসারের কাজের ফাঁকে দুই-এক জন যাওয়া-আসা করিতেছিল মাত্র। কিন্তু তাঁহাদের অবস্থিতি অতি সামান্যক্ষণই ঘটিতেছে। যোগমায়া ইতিমধ্যে দু-চার বছরের বড় ননদের সঙ্গে একটু ভাব করিয়া ফেলিয়াছে। ননদটির বিবাহ হইয়াছে, বার দুই শ্বশুরঘর করিয়া সেখানকার সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছে। সেই অভিজ্ঞতার

কাহিনী বলিবার ফাঁকে তাহার সঙ্গে একটু হৃদ্যতা হইয়াছে যোগমায়ার। শ্বশুরবাড়ী আসিয়া এই সঙ্কোচ বালিকা যোগমায়ারই নূতন নহে, চিরকাল সব বধূর বেলায় এমনই ঘটিয়া থাকে। কমলারও ঘটিয়াছিল। কমলার শ্বশুররা নাকি বড়লোক। চারিদিকে চকমিলানো বাড়ী, বাড়ীতে একজন চাকর ও একজন চাকরাণী আছে, অন্দর-সংলগ্ন পুকুর আছে। পুকুরের পাড়ে মস্ত বাগান। সে বাগানে আম, কাঁঠাল, নারিকেল প্রভৃতি অসংখ্য গাছ আছে। একটা ঝাকড়া মাথা লিচু গাছ আছে। সেই গাছটার ঘন ঝোপে বসন্তকালে কেমন কোকিল ডাকে, 'বউ কথা কও' পাখীর ফ্যাকাসে-কালো দেহটি তাহার চিক্কণ পত্রের মাঝখান হইতে দেখা যায়। ওপাশের সজিনা গাছটায় কাঠঠোক্‌রা—ঠক্‌-ঠক্‌ করিয়া শুকনা কাঠে ঘা মারিতে থাকে। এমন সুন্দর পাখী—যেন টোপর পরা বরটি।···কমলা অনর্গল বকিয়াই চলিত হয়ত, এমন সময় একজন বর্ষীয়সী আধঘোমটা টানিয়া দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কমলা বলিল, পিসিমা, প্রণাম কর।

যোগমায়া সঙ্কুচিত ভাবে তাঁহার পায়ে হাত দিতেই তিনি সস্নেহে তাহাকে দু'টি হাতে জড়াইয়া ধরিলেন।

থাক্‌, থাক্‌, জন্মএয়োস্ত্রী হও, হাতের নোয়া অক্ষয় হোক। দেখি মা, মুখখানি দেখি? লজ্জা কি, চোখ চাও?

যোগমায়া চোখ খুলিল না। এই নাকি রীতি। যে-লোক দেখিতে আসে, তাহার সামনে গুণ্ঠন মোচন করিতে হইবে, কিন্তু তাহার পানে চাহিতে পারিবে না, এ-কথা শ্বশুরবাড়ী আসিবার কালে মা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। এতক্ষণ চোখ বুজিয়া বুজিয়া যোগমায়ার চোখ ব্যথা করিতেছিল, আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া বিবাহ জিনিষটার উপর তাহার শ্রদ্ধা ক্রমশই কমিয়া আসিতেছিল। অতি জোরে বন্ধ করার দরুণ চোখের উপরের পাতা কিছু কুঞ্চিত হইয়াছিল, কিছু বা কাঁপিতেছিল। বিস্তৃত চক্ষুকেও মনে হইতেছিল, ঈষৎ ক্ষুদ্র।

কমলা বলিল, চোখ খোল না ভাই বউ। এখানে তো বাইরের লোক কেউ নেই। উনি আমার পিসিমা।

যোগমায়া চোখ খুলিল। চোখ খুলিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। কি প্রশান্ত স্থির রূপ তাঁহার। যেমন দেহের গড়ন—তেমনই ফরসা থান কাপড়খানি মানাইয়াছে। গৌর রঙের জ্যোতিতে—এতটা বয়স হইলেও—চোখমুখ যেন টল টল করিতেছে। আর কি আকর্ণবিস্তৃত সে চোখ। ঘন ভ্রূর নীচের পরিপূর্ণ মহিমায় স্নিগ্ধ প্রদীপের মত জ্বলিতেছে। যেন জগদ্ধাত্রী মা। যোগমায়া অবাক হইয়া চাহিয়াই রহিল।

তিনি অবগুণ্ঠন ঈষৎ নামাইয়া অত্যন্ত মৃদু ও মমতামাখা কণ্ঠে বলিলেন, দেখি হাতখানি? বাঃ এ যে লক্ষ্মী-ঠাকরুণের মত হাত! বলিয়া বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে সোনার ছোট্ট একটি জিনিষ বাহির করিয়া তাহার করপ্রকোষ্ঠে বাঁধিয়া দিতে লাগিলেন।

কৌতূহলী কমলা বলিল, দেখি না, পিসিমা, কি দিলে? বাঃ, এ যে মুড়কি-মাদুলী। চমৎকার গড়েছে। নবীন স্যাকরা গড়েছে বুঝি? আমার চিক কিন্তু অমন হয় নি।—বধূর গলদেশের কাপড় খানিকটা সরাইয়া চিক দেখিবার সুযোগ করিয়া দিল।

পিসিমা বলিলেন, ভাল হয় নি কি লো, এ যে চমৎকার মানিয়েছে!

কমলা বলিল, তোমাদের বউ যে সুন্দর, পিসিমা।

তা বটে, মা আমার লক্ষ্মীঠাকরুণ। বলিয়া চিবুক স্পর্শ করিয়া তিনি যোগমায়া ও কমলাকে পর পর চুম্বন করিলেন। কাজেই দুই জনেই আর একবার অবনত হইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইল। এ শিক্ষাও মায়েদের।

প্রণামান্তে কমলা বলিল, বউ-বরণের সময় তুমি বেরোও নি কেন, পিসিমা? ওদিকের ঘরের দুয়োর বন্ধ করে রেখেছিলে।

পিসিমা মৃদুস্বরে বলিলেন, ঘরের বউ, আমরা তো অষ্টপ্রহরই দেখবো। বলি, বাইরের ওঁয়া দেখে যান ততক্ষণ।

কমলা হাসিয়া বলিল, তা নয়, লজ্জা। আমরা তো দেখছি, মেয়েছেলের সামনেও তোমার মাথার ঘোমটা নামে না।

না—রে। পিসিমা সলজ্জে হাসিলেন। আমরা যখন বউ এসেছিলাম, তখন এক কাল ছিল। যেমন চোর-ডাকাত—তেমনি খারাপ লোকও ছিল। বছরে এক দিনও গঙ্গাস্নান করতে যেতাম না। কখনও মেলায়—কি ঠাকুর দেখতে বাড়ীর বার হতে দিতেন না। ওই ছোট্ট ঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে বিজয়ার দিন ঠাকুরুণের মুখ দেখতাম। তাই

কি ভাল ক'রে দেখা—আবছা-আবছা। বাড়ীতে বেরোতাম—এই এমনি করে কাপড় পরতাম কেউ যেন পায়ের পাতাটি দেখতে না পায়।

কমলা বলিল, তোমাদের কালে তো বড় কষ্ট ছিল তা হলে!

কষ্ট? তিনি আবার হাসিলেন। কই, কষ্ট বলে তো মনে হ'ত না।

কমলা বলিল, মা তো অতটা আব্রু রেখে চলেন না। সকলের সঙ্গে কথা কন।

তিনি বলিলেন, ওঁরা তো অনেক পরে এ-বাড়ীতে আসেন। ওঁদের সময় লোকের দৌরাত্ম্যি অনেক কমে এসেছিল। কই, দেখি—বউকে কি গহনা দিয়ে মুখ দেখলেন!

কমলা যোগমায়ার ঘোমটা অল্প একটু তুলিয়া বলিল, এই সিঁথি আর নারকেল-ফুল।

হাঁ—হাঁ, মা এই সিঁথি আর নারকেল-ফুল বউকে দিয়েছিলেন। সুন্দর গহনা। কতকালের গহনা, কিন্তু কেমন ঝক্‌ঝক্‌ করছে।

কমলা বলিল, আর বউয়ের বাবা দিয়েছেন এই পাঁয়জোড়, মৌরিফুল, জশম, সাতনরী।

তা অনেক গহনা দিয়েছেন বেয়াই।

তাঁর একটি মাত্র মেয়ে, আর বড় মেয়ে বলে যা দেবার কথা ছিল, তার বেশীই দিয়েছেন। সবাই গহনার সুখ্যাতি করছিলেন।

পিসিমা আনন্দ প্রকাশ করিয়া আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন—এমন সময় কয়েকজন প্রতিবেশিনী বউ দেখিতে আসিলেন। পিসিমা ঘোমটা দীর্ঘ করিয়া রোয়াকের অপর প্রান্তে চলিয়া গেলেন।

নয় বৎসরের মেয়ে—ক্লান্তি আসা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। পরদিন কুশণ্ডিকা অর্থাৎ প্রকৃত বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানগুলি শেষ করিতে দুপুর শেষ হইয়া গেল। হোমের ধোঁয়ায় চোখ দু'টি লাল হইয়াছে, সপ্তপদী গমন ইত্যাদির ক্লান্তিতে পা টলিতেছে। সর্ব্বক্ষণ আড়ষ্ট ভাবে থাকাতেই যা ক্লান্তি। ফুলশয্যার রাত্রির অনুষ্ঠানগুলিই কি কম। এক ঘর মেয়ের সামনে ভাবী-সংসার পাতিবার কত না ইঙ্গিত—অনুষ্ঠান। নয় বৎসরের বালিকার হতবুদ্ধি—আচরণের মধ্যে ভবিষ্যতের মিলন, বিরহ, সুখ, দুঃখ, বুদ্ধি ও সংসার চালাইবার দক্ষতা ইত্যাদির আবিষ্কারও কম ক্লান্তিকর নহে। অবশেষে দুধের পাত্রে সোনামুনি ভাসাইয়া দিয়া ভাবী মিলন কেমন হইবে তাহারই পরীক্ষা আরম্ভ হইল। পাত্রের দুধ হাতের তাড়নায় চঞ্চল করিয়া পাতি ময়ূর ও টোপরের টুকরা অর্থাৎ শোলার টুকরা ভাসাইয়া মেয়েরা দেখিতে লাগিলেন, কতক্ষণে দুইটি টুকরা পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যায়। দু'টি টুকরা সংলগ্ন হইতে যতই বিলম্ব ঘটিবে—উহাদের ভাবী মনের মিল সম্বন্ধে ততই উদ্বিগ্ন হইবার কথা। কিন্তু আশ্চর্য্য বধূর ভাগ্য। আন্দোলিত দুধের মধ্যে পড়িয়াই টুকরা দু'টি দ্রুত সংলগ্ন হইয়া গেল এবং চক্রাকারে থালার মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। মেয়েরা হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

ক্ষীর-মুড়কি খাওয়ানোর ব্যাপারে আর এক প্রস্থ কৌতুকরঙ্গ শেষ করিয়া ও দুই জনকে ফুলের বিছানায় বসাইয়া মেয়েরা উঠিয়া গেল।

যাইবার সময় কে একজন আধা বয়সের বধূ ফিস্‌ ফিস্‌ অথচ সকলের শ্রুতিগম্য স্বরে বলিলেন, এইবার খিল দিয়ে ফেল ভাই। আর কেউ বিরক্ত করবে না।

দুয়ার ভেজাইয়া তাহারা চলিয়া গেল।

মাইপোষের উপর ধবধবে বিছানা। গুটিকতক ফুল বিছানার এধার ওধার ছড়াইয়া রহিয়াছে। বর ও বধূর গলায় ফুলের মালা। লাল চেলি পরিয়া ও সাদা মালা গলায় দিয়া নয় বছরের মেয়েটিকে একটি বড় পুতুল বলিয়া মনে হইতেছে। পুতুলের মতই সে নিশ্চল, পুতুলের মতই সে নির্জ্জীব। কতকটা ঘুমভারেও বটে, কতকটা সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় ও অন্তঃপুরীয় বিবিধ অনুষ্ঠানের ঘটাতেও বটে। ফুলের বিছানায় বসিয়াই যোগমায়ার নাকে একটি সুমিষ্ট গন্ধ প্রবেশ করিল। গন্ধ নাক দিয়া মাথায় এবং সেখান হইতে সারা দেহে এমন স্নিগ্ধ আবেশ ধরাইয়া দিল যে, পর পর গোটাকতক হাই তুলিয়া সে বাঁ পাশের ছোট বালিশটায় মাথা রাখিল।

ষোল বছরের বর অত শীঘ্র শুইতে পারিল না। দুয়ারটা যে তাহাকেই বন্ধ করিতে হইবে—সে কথা সে জানে, আর আলো নিবাইতে ভুল হইলেও চলিবে না। ঘরের বাহিরে রোয়াকে অনেকগুলি সন্তর্পিত পদশব্দ ও চাপা গুঞ্জনধ্বনি শোনা যাইতেছে। অন্তঃপুরিকাদের কৌতূহলের অন্ত নাই। খাট হইতে নামিয়া সে পা টিপিয়া টিপিয়া দুয়ারের কাছে গেল ও তেমনই সন্তর্পণে খিল লাগাইয়া দিল। বাহিরে চাপা কণ্ঠের হাসি যেন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। কিশোর তাড়াতাড়ি প্রদীপের কাছে মুখ

আনিয়া সজোরে ফুঁ পাড়িল। রেড়ির তেলের অনুজ্জ্বল দীপ নিবিয়া গেল। অন্ধকারের মধ্যে বাহিরের শাড়ীর খস্‌খসানি, চাপাহাসি, কথা এবং দুয়ারের ছিদ্রপথে চোখ রাখিবার জন্য হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলির শব্দ মিলিয়া ভিতরের প্রাণীটিকে ভয়ত্রস্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু সে ভয় ক্ষণিকের। প্রদীপ নিবিয়াছে, ঘরে অন্ধকার নামিয়াছে বটে,—পাশে একটি ক্ষুদ্র প্রাণীও তো রহিয়াছে। বেশ প্রাণীটি। ক্ষুদ্র, সুন্দর অথচ নিরীহ! এমন নিরীহ যে, ক্লান্তিকর অনুষ্ঠানের মুখে এতটুকু আপত্তিও সে জানায় নাই! বেশ মুখখানি, আর চলনটি—সলজ্জ হাসির মাঝে···কিশোরের মনে নেশা ধরিয়া গেল! নূতন পরিচয়ের মুখে আজ কি ঘুমাইতে আছে!

পাশে শুইয়া বালিকার গায়ে একটা ঠেলা দিয়া সে ডাকিল, শুনছো? ওগো—

আঃ! বলিয়া বালিকা ও-পাশে একটু সরিয়া গেল।

কিশোরের বুকের স্পন্দন দ্রুত বাড়িল। নামটি তার মনে আছে, কিন্তু আলাপ জমাইবার মুখে ওই জানা নামটি জিজ্ঞাসা করাই তো সব চেয়ে সহজ পন্থা। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার চাপা কণ্ঠে বলিল, তোমার নামটি কি আমায় বলবে না? বলবে না?

ঘুমের ঘোরে বালিকা এমন একটা শব্দ করিল যাহা কান্নারই রূপান্তর। সে শব্দ জোরে উঠিলেই বাহিরের লোকগুলি বধূর ক্রন্দনের কারণ জানিতে দুয়ারে সজোরে করাঘাতও তো করিতে পারে!

কিশোর পুনরায় চুপ করিল। কিন্তু বুকের মাঝে পরিচয় জানার উন্মাদনা তাহাকে বেশীক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে দিল না। সে পুনরায় সস্নেহে ডাকিল, শুনছো? ওগো—

পুষ্পসুরভি শুধু বায়ুস্তরে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, আর উঠিল বাহিরের চাপা কথোপকথন। মাইপোষটা পাশ ফিরিবার কালে 'ক্যাঁচ' 'কোঁচ' করিয়া উঠিয়াছে একবার।

ভোরবেলায় বধূর ঘুম ভাঙ্গিল। নূতন আবেষ্টনে সে হতচকিত হইয়া গিয়াছিল। ঘুমভরা কণ্ঠেই ডাকিল,—মা?

কিশোর জাগিয়া উঠিল, কে? ওঃ—তা তুমি—

বধূ ঘোমটা টানিয়া জড়সড় হইয়া ওপাশে সরিয়া গেল।

কিশোর তাহার গাত্রস্পর্শ করিয়া ডাকিল, তোমার নামটি কি আমায় তো বললে না। বলবে না?

বধূ দম দেওয়া কলের মত একনিশ্বাসে বলিয়া গেল, শ্রীমতী যোগমায়া দেবী।

বাঃ—বেশ নাম। আমার নাম কি জান? শ্রীরামচন্দ্র দেবশর্ম্মা।

বস্ত্রমণ্ডিতা যোগমায়া একটু নড়িয়া সে নাম জানার স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিল।

রামচন্দ্র বলিল, তোমার পিতাঠাকুরের নাম?

যোগমায়া বলিল, শ্রীযুক্ত রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই—এই—তুমি আমার নাম ধরলে?

কই—কই—তোমার—আপনার নাম করলাম?

ওই তো রাম বললে না? বর হাসিল।

বধূ মুখ ফিরাইয়া সলজ্জকণ্ঠে সংশোধন করিয়া বলিল, শ্রীযুক্ত ফামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়।

এ-শিক্ষাও যোগমায়া-জননীর।

২

এক বৎসর পরে কোন এক শুভ লগ্নে যোগমায়া পুনরায় শ্বশুরবাড়ী আসিল। এক বৎসর বড় কম সময় নহে। মাতার উপদেশে ও গৃহকর্ম্ম শিখিবার তাড়নায় বালিকা গৃহিণীত্বের প্রথম ধাপে যেন পদার্পণ করিয়াছে। স্বাভাবিক চাঞ্চল্যও তাহার কিছু কমিয়াছে। হাতে নোয়া মাথায় সিঁদুর আর ঘোমটা—অনভ্যস্ত বালিকাকে বধূজীবনের প্রথম দীক্ষা দিয়াছে। দেহের পানে চাহিলে বোধ হয়, সৃষ্টিকর্ত্তা গড়ার কাজেও মনোযোগ দিয়াছেন।

এবার শ্বশুরবাড়ী আসিয়া যোগমায়ার আর তেমন ভয়-ভয় করিল না। গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে ছায়াশীতল উঠানটি মনোরমই যেন। তা ছাড়া আসল ভয়ের যা কারণ—তা ঘুচিয়াছে। ও-পাশে কায়েতদের প'ড়ো বনভিটার সীমান্তে প্রাচীর উঠিয়াছে। খণ্ডিত বাড়ীটাকে খানিকটা সংযত ও শ্রীমণ্ডিত বলিয়া মনে হইতেছে। বেশ পরিষ্কার নিকানো উঠান। পূর্ব্বদিকের কোণে দেওয়াল ঘেঁষিয়া একটি তুলসীমঞ্চ তৈয়ারী হইয়াছে; মঞ্চের উপরিভাগে শাখা-সমৃদ্ধ এক তুলসীবৃক্ষ। মঞ্চের আশে-পাশে কয়েকটি বেলা, জুঁই, হলুদ রঙের ঝুঁটি ও লাল রঙের জবা ফুলের গাছ। প্রাচীরের কোণের দিকের স্থলপদ্মের গাছটিও বেশ সতেজ। বৈশাখের প্রথম বলিয়া দুই একটি ফুলও যেন তাহাতে

ফুটিয়াছে। আর প্রচুর ফুল ফুটিবে শরৎকালে। উঠানের বাতাবীলেবু গাছটা ঝাঁকড়া হইয়াছে ও অসংখ্য ছোট ছোট ফল সবুজ পাতার মধ্য হইতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। কাঁঠালগুলি এত নীচে ফলিয়াছে যে, হাত দিয়া ছুঁইতে পারা যায়। এবার আম হয় নাই বলিয়া শাশুড়ী বার কয়েক দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

প্রতিবেশিনীরা আসিলেন।

লগনে ঘর করতে কি দিলে গা, রামের মা? দু'হাঁড়ি রসকরা পাঠিয়েছে? তা বেশ। এই যে ধনে হলুদ থেকে সব রকম মশলাই বেয়াই দিয়েছেন। বেশ মাছটি। ও টিনের বাক্সটা বুঝি কাপড় রাখবার? এক গামলা তেল—তা পাঁচ সেরের কম হবে না। বউ তোমার আরও সুন্দর হয়েছে, দিদি।

আশীর্ব্বাদ কর—বেঁচেবর্ত্তে থেকে মনের সুখে ঘরকন্না করুক। তিনি হাসিলেন।

কমলা আসিয়া বলিল, মাছটা আমি কুটব মা?

মা বলিলেন, তুই পারবি নে। বড় বড় দাগা করে কুটতে হবে। পাড়ার সকলের বাড়ী তেল আর মিষ্টি দিতে হবে। তুই বরঞ্চ বিলোবার ব্যবস্থা করিস। আর শোন, বেয়াই-বাড়ী থেকে যাঁরা এসেছেন—তাঁরা না খেয়ে এখান থেকে যেতে পারবেন না—বলে দে।

কমলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তুমি বরঞ্চ মাছ বিলোবার ব্যবস্থা, খাওয়ানোর ব্যবস্থা কর, আমি বৌদির সঙ্গে একটু গল্প করি।

কথা শেষে সে যোগমায়ার হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিল।

তারপর কেমন ছিলি ভাই, বউ? ফিক্ করে হাসলে হবে না, জবাব চাই।

যোগমায়া হাসিয়া বলিল, আপনি কেমন ছিলেন?

ইস্—আপনি! ভারী মান্য করে কথা কইতে শিখেছিস যে? মা শিখিয়ে দিয়েছেন বুঝি?

যোগমায়া নিঃসঙ্কোচে ঘাড় নাড়িল।

কমলা হাসিয়া বলিল, তা ওঁরা এ রকম শিখিয়ে দেন। কিন্তু আমাকে তুই আপনি বলে ডাকলে তোর কথার উত্তরই দেব না।

কি বলে ডাকবো আপনাকে? দ্বিধাভরে যোগমায়া প্রশ্ন করিল।

বলবি কমলি। কমলি দিদি। না হয় কমল ঠাকুরঝি। আর তাও যদি না পারিস—বলবি তুমি। বলিয়া কমলা হতচকিত বধূর গলা জড়াইয়া ধরিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অন্তরঙ্গতা জমিল।

কমলা বলিল, দাদা তোকে চিঠি লিখতো তো? লিখতো না? ও মা, আমার কি হবে! বলিস কি?

লজ্জাজড়িত কণ্ঠে যোগমায়া বলিল, একখানা চিঠি লিখেছিলেন।

কমলার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। ঘাড় কাত করিয়া বলিল, মাত্তর একখানা। এক বছরে মাত্তর এক—খানা! খানিক পরে বলিল, আমার তো আসে সপ্তাহে একখানা। বলেন, রোজ একখানাও লিখতে পারি। কিন্তু আমি বারণ করে দিয়েছি।

কেন বারণ করলে? যোগমায়া মূঢ়ের মত প্রশ্ন করিল।

লজ্জা করে না বুঝি? মা কি বলবেন, পড়শীরা কি ভাববে?

কমলার যে লজ্জা করিতে পারে—তাহা যোগমায়ার বুদ্ধির অগোচর। তাই সে মূঢ়ের মতই পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিল, লজ্জা করে কেন?

কমলা তাহার গাল টিপিয়া দিয়া বলিল, দিনকতক যাক, বুঝবি কেন। একটু থামিয়া বলিল, তা তুই ক'খানা চিঠি লিখেছিলি?

কেন, একখানা।

তুইও একখানা? বাঃ রে! নিজে লিখেছিলি, না আর কেউ লিখে দিয়েছিল?

যোগমায়া অসঙ্কোচে বলিল, মা লিখে দিয়েছিলেন।

সত্যি? তা তুই লিখলি নে কেন?

আমি নিজে অত গুছিয়ে লিখতে পারি বুঝি?

কি লিখেছিলি? বলবি নে একটুও?

মনে নেই।

তাহলে দাদার চিঠিখানাই না হয় দেখা।

সে তো নেই।

হারিয়ে ফেলেছিস্? দূর বোকা, প্রথম চিঠি হারাতে নেই। কোথায় ফেলেছিলি?

যোগমায়া বলিল, মা-ই তো আমার হাত থেকে নিয়ে পড়লেন। তার পর অপর্ণা, কুমুদিনী, হরি-পিসিমা, কান্তমাসী সবাই পড়লেন—আর খুব হাসলেন।

তাহলে খুব হাসির কথা লিখেছিল, দাদা? বাঃ রে, আবার বলা হয়—

কমলি, একটা পান দে তো। বলিয়া কমলার দাদা শ্রীমান্ রামচন্দ্র সশরীরে দেখা দিলেন।

কমলা দুষ্টামি করিয়া বলিল, দে না লো একটা পান সেজে। পান সাজতে পারিস ত?

কে উত্তর দিবে। ঘোমটা টানিয়া যোগমায়া ততক্ষণে পাষাণ-প্রতিমায় পরিণত হইয়াছে। অগত্যা কমলাই পান দিল।

রামচন্দ্র চলিয়া গেলে কমলা হাসিতে হাসিতে বলিল, পান চাইবার ছুতো ক'রে তোকে দেখতে এসেছিল, ভাই।

ঘোমটা খুলিতে দেখা গেল যোগমায়াও হাসিতেছে। এ কৌতুক মন্দই বা কি। বাড়ীশুদ্ধ লোকের সঙ্গে দিনের বেলায় কথা কহিতে দোষ নাই, শুধু যে লোকটাকে নেহাৎ মন্দ লাগে না, ভাব করিবার জন্য কত ছল ছুতাতেই যে এধার ওধার ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—তাহার সঙ্গে কথা বলাই নিষেধ। লজ্জা যোগমায়ারই কি ছিল, মা এবং প্রতিবেশিনীরা যে রকম নিন্দার ভয় দেখাইয়া তাহার লজ্জা আনিয়া দিয়াছেন।

শাশুড়ী আসিয়া বলিলেন, বসে বসে গল্পই ত করছিস, কমলি। বউকে কাপড় ছাড়িয়ে, নাইয়ে ধুইয়ে ঠাকুরদেবতা প্রণাম করিয়ে আন। তারপর জল খেতে দে। গল্প করলেই কি পেট ভরবে?

কমলা ব্যস্ত হইয়া বলিল, চল বৌদি চট্‌পট্।

গৃহদেবতা নারায়ণশিলা ও তুলসীমঞ্চে প্রণাম করিয়া তাহারা ও-বাড়ীর শিবমন্দিরে আসিল। সে-কালের ভাঙ্গা মন্দির। ছাদটা যে-কোন সময়ে হুমড়ি খাইয়া পড়িতে পারে। ছাদের কার্ণিশে গোটাকতক ডুমুর ও অশ্বত্থ গাছ গজাইয়াছে, মন্দিরের মধ্যে খানিকটা অন্ধকার। সেই অন্ধকারে চিঁ চিঁ শব্দ ও একটা দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। শিবঠাকুর কিন্তু ঘৃত-জলসিক্ত হইয়া দিব্য চক্ চক্ করিতেছেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া ইহারা প্রণাম করিল।

কমলা বলিল, জেঠামশাইদের শিব, অনেক কালের বুড়ো শিব। শিবরাত্তিরে যা ধুম হয়, সারারাত জেগে পূজো। গাঁয়ের কত লোক আসে।

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিল, জেঠামশাইদের বাড়ী কই?

উই যে—মন্দিরের গায়েই। ওঁদের বাড়ী থেকে দরজা আছে, আমাদের বাড়ী থেকেও; মন্দিরটা মাঝখানে কিনা।

দুপুরবেলা কমলা পান সুপারির ডাবর, বাটা ও জাঁতি যোগমায়ার কোলের কাছে রাখিয়া বলিল, নে—সাজ দেখি পান। এমন পান সাজবি—যা খেয়ে দাদার মুণ্ডু ঘুরে যাবে।

যোগমায়া ক্ষিপ্রকরে পান সাজিতে বসিল।

কমলা বলিল, দে দেখি আমায় একটা! মুখ চুণে পোড়ে কি খয়েরে তেতো হয়—আমার ওপর দিয়েই হয়ে যাক।—বাঃ, বেশ তো তোর হাত, চুণ খয়ের সমান হয়েছে। আমি ভাই ভাল পান সাজতে পারি নে। কেবলই ভয় হয়, বুঝি চুণ বেশী হলো! তোর ঠাকুরজামাই বলেন, পান না দিয়ে এক ডেলা কুইনিন দিলেও তো পার। শুনলে ভাই কথা!

যোগমায়া চোখ বড় বড় করিয়া কহিল, কুলিয়ান! যা জ্বর হ'লে খায়?

হাঁ লো। কিন্তু কুলিয়ান নয়—কুইনিন। তোর ঠাকুরজামাই লেখাপড়া-জানা লোক কিনা, তাই কুলিয়ান বললে রাগ করেন।

ঠাকুরজামাই তোমায় বকেন?

হুঁ—বেজায়। গম্ভীর ভাবে কমলা বলিতে লাগিল, তাঁর বকুনির চোটে এক দিন এমন রাগ করলাম যে, বেচারা রাত ভোর আমায় সেধে কূল পায় না। কথা শেষে কমলা খিল খিল করিয়া হাসিয়া যোগমায়াকে জড়াইয়া ধরিল। এবং হাসিতে হাসিতে বলিল, না রে—নেকু, তিনি আমায় মোটেই বকেন না। ক—ত আদর করেন—ভালবাসেন। কত জিনিষ এনে দেন।

কি জিনিষ দেন?

ফুলেল তেল, ফিতে, চুলের কাঁটা, পুতুল।

তোমার ক'টা বড় পুতুল আছে, ঠাকুরঝি?

তিন-চারটে হবে। একটু থামিয়া রহস্যের ভঙ্গিতে বলিল, একটা কিন্তু খুব বড়।

খু—ব! চক্ষু বিস্তৃত করিয়া যোগমায়া বলিল, কত বড় ঠাকুরঝি?

এই তোর মত, আমার মত। না না, আমার চেয়েও বড়। বলিয়া হাসিতে লাগিল।

শাশুড়ী ডাকিলেন, কমলি, বৌমাকে নিয়ে খাবি আয়। বেলা অনেকখানি হ'ল মা।

যাই মা। চল, খেয়ে আসি। আবার ও-বেলা গল্প করব। একটু গা গড়িয়ে বিকেলে তোর গা ধুইয়ে, চুল বেঁধে ভাল কাপড় পরিয়ে, টিপ দিয়ে সাজাতে হবে। সবাই দেখতে আসবেন কি না।

পিসিমা আপনার ঘরে বসিয়া চরকা

কাটিতেছিলেন, আহারান্তে কমলা যোগমায়াকে লইয়া সেইখানে গিয়া বসিল।

কি হচ্ছে, পিসিমা? পৈতে তৈরী হচ্ছে?

পিসিমা অভ্যাসবশতঃ ঘোমটাটা টানিয়া সংযত হইয়া বসিলেন। মৃদুস্বরে বলিলেন, হাঁ মা। এক কুড়ি পৈতে বারন্দবাড়ীর ঠাকুরঝি নেবেন বললেন। অক্ষয়তৃতীয়ার ব্রত আছে তাঁর—কালই চাই।

তা তিন চারটে করে পয়সায় পৈতে বেচে তোমার কি হয় পিসিমা! খালি হাত ব্যথা।

না রে, হাত ব্যথা নয়। পাঁচ গণ্ডা কড়ি একটা পৈতের দাম। কমই বা কি! পিসিমা হাসিলেন।

তোমার সঙ্গে যে গল্প করতে এলাম। তা তুমি ঘ্যানর ঘ্যানর তো ছাড়বে না।

কাজ করতে করতেই তো গল্প করবি, মা।

পিসিমার ঘরখানি ছোট। ইঁটের দেওয়াল, কিন্তু ছাউনি খড়ের। বৈশাখের রৌদ্রতাপে ঘরখানি বেশ ঠাণ্ডা বলিয়াই বোধ হয়। এক কোণে মাদুরটা গুটান রহিয়াছে। একটা কাঠের সিন্দুক সিন্দুর ও চন্দনের ফোঁটায় বিচিত্রিত। বাঁশের আলনায় একধারে খান-দুই থান কাপড়, একখানি পাটের কাপড় ও নামাবলী এবং অন্য ধারে শীতকালের জন্য কাঁথা প্রভৃতি রহিয়াছে। ছোট একখানি জলচৌকিতে পিতল-কাঁসার কয়েকখানি বাসন রহিয়াছে। দেওয়ালে একখানি অন্নপূর্ণা ও একখানি কালীর ছবি। গৃহসজ্জা যৎসামান্য, কিন্তু ঘরখানি ঝরঝরে। বিধবা পিসিমার বাহুল্য-বজ্জিত দেহের মতই শুচিশুভ্রতায় কমনীয়।

কমলা বলিল, নতুন বউকে ঘর করতে কি দিলে একবার দেখলে না?

পিসিমা বলিলেন, ওমা, সে কি কথা! তেল, ঘি, নুন থেকে যত রকম মশলা সবই তো খুঁটিয়ে দিয়েছেন দেখলাম। বেয়াই দিয়েছেন থুয়েছেন ভাল।

তোমাদের কালে এই সব দিত, পিসিমা?

দিত বৈ কি। তবে একালে কিছু বেড়েছে। ঐ টিনের পেটরা তখন দিত না, দিত কাঠের সিন্দুক কি বাক্স। মাথা ঘষার অনেক মশলা দিত—গন্ধ তেল তো আর বেরয় নি।

কমলা অনেকক্ষণ সেকালের গল্প করিয়া উঠিতে উঠিতে বলিল, যাই, মার হুকুম তামিল করি গে। বউকে গা ধুইয়ে কাপড় গহনা পরিয়ে দিই গে। লোকে আবার দেখতে আসবে।

পিসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, তা হরিশ যে এবার এলেন না?

চঞ্চল কমলা সহসা ব্রীড়াবনতমুখী কিশোরীতে পরিণত হইয়া হাতের নখ খুঁটিতে লাগিল।

পিসিমাই বলিলেন, ছুটি পায় নি বুঝি?

কমলা কোনমতে ঘাড় নাড়িয়া বধূকে লইয়া পলাইয়া আসিল।

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিল, হরিশবাবু কে, ঠাকুর-ঝি?

কমলা রহস্য করিয়া কহিল, রামচন্দ্র তোমার কে ভাই—সীতা?

ওঃ, ঠাকুরজামাইয়ের নাম! তা তুমি পিসিমার সামনে অতটা লজ্জা করলে কেন?

গুরুজনদের কাছে লজ্জা হবে না তো মুখে খই ফোটাব বুঝি? নে চল্।

রাত্রির তখন মধ্যযাম। ফুলশয্যার রাত্রিতে যেমন অসীম ক্লান্তি আসিয়া চক্ষুকে নিদ্রাভারাতুর করিয়া তুলিয়াছিল, খাইতে বসিয়া আজও যোগমায়ার দু'টি চোখ তেমনি বুজিয়া আসিতেছিল। মধ্যরাত্রির প্রহর ঘোষণা করিয়া শিবাদল কখন নিস্তব্ধ হইয়াছে। পঞ্চমীর চাঁদ রান্নাঘরের ও-পাশে জাম গাছটার আড়ালে মুখ লুকাইয়াছে। গভীর রাত্রির একটা গাম্ভীর্য্য কানের মধ্যে সাঁ সাঁ করিতেছে। নূতন বধূর আগমন উপলক্ষ্যে এ-বাড়ীতে কিছু কুটুম্ব-সমাগম হইয়াছে এবং সেই জন্য মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত আহারাদি চলিতেছে। অন্য বাড়ীতে নিশুতি রাত্রি। রামচন্দ্রের খাওয়া অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে। সে বেচারা বিছানায় শুইয়া জাগিয়া আছে কি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কে জানে? কমলা যোগমায়ার হাত ধরিয়া এ-ঘরের দুয়ার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবার কালে ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, দোরে খিল দে। খবরদার ঘুমোস নে, খুব বকিয়ে মারবি দাদাকে।

যন্ত্রচালিতের মত যোগমায়া ঘরের ভিতর ঢুকিল। দুয়ারটা সন্তর্পণে ভেজাইয়া খিল আঁটিয়া দিল। ঘরের এক প্রান্তে রেড়ীর তেলের প্রদীপটা নিবু নিবু হইয়া আসিতেছে। এত রাত্রিতে ওটিকে উস্কাইয়া দেওয়া উচিত কি না—হয়ত একবার ভাবিল। তারপর ধীরপদে মাইপোষের নিকট আগাইয়া আসিয়া নিদ্রিত লোকটির পানে একবার চাহিল। লোকটি সুন্দর, কিন্তু শুইবার ধরণটি উহার সুবিধার নহে। এমন আড়ভাবে শুইয়াছে

যে, বিছানার একাংশে শুইবার সুবিধাটুকুও নাই। ঘুমে যোগমায়ার চোখ জড়াইয়া আসিতেছে, তবু ঘুমের নেশাকে জয় করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অল্প-পরিচিত সুন্দর লোকটির পানে চাহিয়া রহিল। ঘুমের ঘোরে যদি সে পাশ ফেরে তো একটুখানি স্থান হয়ত বিছানায় মিলিতে পারে। কি গভীর নিদ্রা!

খানিকটা দাঁড়াইয়া যোগমায়া ফিরিয়া চলিল। ঐ কোণে একটা মাদুর রহিয়াছে না? বালিশের প্রয়োজন নাই। যা ঘুম পাইয়াছে যোগমায়ার।

মেঝেয় মাদুর পাতিবার কালে শব্দ হইয়াছিল বৈকি? বিস্মিত যোগমায়াকে অধিকতর বিস্মিত করিয়া রামচন্দ্র জাগিয়া উঠিল। শুধুই জাগিয়া উঠিল না, একেবারে বিছানায় সোজা হইয়া বসিয়া প্রশ্ন করিল, ওখানে শোবে নাকি?

যোগমায়া লজ্জায় সঙ্কুচিতপ্রায় হইয়া দেওয়ালের গায়ে মিশিয়া গেল। বুকের মধ্যে তাহার ঢিপ ঢিপ্ করিতে লাগিল। মনে হইল, এক ঘটী জল খাইলে মুখের শুষ্কতা বুঝি ঘুচিতে পারে।

রামচন্দ্র মাইপোষ হইতে নামিয়া আসিল। ধীরে ধীরে যোগমায়ার কাছে আসিয়া হাসিমুখে বলিল, ভয় কি, এস শোবে এস।

বিছানায় উঠিবার কালে হাতের ঝাপটা মারিয়া আয়ুক্ষীণ দীপ-শিখাটিকে সে নিবাইরা দিল।

খোলা জানালা দিয়া বাহিরের খানিকটা দেখা যাইতেছিল। বাহিরে অন্ধকার গাঢ়; উঠানের গাছপালার ঝোপে ত'র গাঢত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেবল গাছের ফাঁকে ফাঁকে দূর আকাশের নক্ষত্র-গুলিকে জোনাকী পোকার মত বোধ হইতেছে। গভীর রাত্রি—সাঁ সাঁ করিতেছে। কোথাও একটি পাতা নড়িতেছে না। কায়েতদের প'ড়ো ভিটায় জামগাছের ডালে বসিয়া একটা রাত্রিচর পাখী—পেঁচাই হইবে হয়ত—বিশ্রীস্বরে রাত্রির স্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। এমন কর্কশ বিশ্রী ডাক পাখীটার—যোগমায়া সভয়ে রামচন্দ্রের পিঠের দিকে ঘেঁষিয়া শুইল।

আদর রামচন্দ্র তাহাকে যথেষ্ট করিল। কতক যোগমায়া বুঝিল, কতক বা বুঝিল না। আদর আর কাহার না ভাল লাগে, কাহারই বা অন্তরঙ্গ হইবার ইচ্ছা না জাগে? যোগমায়া মনে মনে প্রসন্ন হইয়া আপন মনেই বার বার উচ্চারণ করিল, লোকটি বেশ।

আদরের পালা শেষ করিয়া লোকটি যোগমায়ার একখানি হাত আপনার হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, এখানে কেমন লাগছে তোমার?

ভাল। অস্ফুটস্বরে যোগমায়া জবাব দিল।

খুব ভাল নয় বোধ হয়?

যোগমায়া উত্তর না দিয়া নীরব রহিল। ভাল-লাগার কম বেশী জিনিষটা কি—তাহার বোধগম্য হইল না।

রামচন্দ্র পুনরায় প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, ঠিক করে বল দেখি—তোমাদের গাঁ ভাল, না আমাদের গাঁ ভাল?

এবার যোগমায়া নিঃসঙ্কোচে জবাব দিল, আমাদের গাঁ।

তোমাদের গাঁ? তাহলে তোমার এখানে থাকতে ভাল লাগছে না?

যোগমায়া পুনরায় কোন জবাব দিল না।

রামচন্দ্র তাহার হাতে দোলা দিয়া বলিল, বললে না? বললে না?

যোগমায়া বলিল, মাকে দেখতে ইচ্ছে করে যে।

আর আমাকে? কৌতুকভরে রামচন্দ্র প্রশ্ন করিল!

যোগমায়া পুনরায় নিশ্চল হইয়া রহিল।

রামচন্দ্র সান্ত্বনার স্বরে বলিল, আর ক'টা দিন যাক, আমি নিজে গিয়ে তোমায় রেখে আসব।

যোগমায়া খুশীভরা কণ্ঠে বলিল, আপনি রেখে আসবেন?

হুঁ—নিশ্চয়। ভাবছ মা না বললে আমি যেতে পারি না? জান, আমি বললে মা কিছুতেই বারণ করবেন না। আপনার পদমর্য্যাদার অনুরূপ গাম্ভীর্য্যে রামচন্দ্রের গলার স্বরটি শেষের দিকে প্রভুত্বব্যঞ্জক শুনাইল।

পুলকিত কণ্ঠে যোগমায়া বলিল, আপনি যখন আমাদের দেশে যাবেন, আপনাকে বৈঁচি বনে নিয়ে গিয়ে পাকা বৈঁচি খাওয়াবো।

খাওয়াবে? বাঃ, ভারী লক্ষ্মী তো তুমি। আর এক প্রস্থ আদর করিয়া রামচন্দ্র প্রশ্ন করিল, আমার মাকে কেমন লাগলো?

ভাল।

খুব?

হুঁ। বাড়ী যাইবার আনন্দে যোগমায়ার ক্ষুদ্র অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সব কিছু তখন তাহার মনে বা চোখে সুন্দর বলিয়াই বোধ হইতেছে। নতুবা আজ বৈকালে শাশুড়ী যখন

নির্ব্বিবাদী পিসিমাকে কয়েকটি কটুকথা বলেন, তখন যোগমায়ার মনে শাশুড়ী-সম্বন্ধে একটি প্রতিকূল ভাবধারা জন্মলাভ করিয়াছিল। কত তুচ্ছ কারণে মানুষ রাগিয়া উঠে! জলের ঘটীটি কাপড় কাচার পর পিসিমা না মাজিয়াই নাকি দাওয়ার উপর রাখিয়াছিলেন, এবং সেটি উপুড় করিয়া রাখেন নাই। শুদ্ধাচারের দিক্ হইতে ইহাকে যথেষ্ট ত্রুটি বলা যায়। বাসি কাপড় কাচার জল ঘটীর মধ্যে কয়েক বিন্দু থাকিলেও যে কাচা কাপড় পরিয়া সে ঘটী ছোঁয়া চলে না। পিসিমা চোখের জল ফেলিয়া সেই ঘটী মাজিয়া পুনরায় গা ধুইয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু যোগমায়ার ক্ষুদ্র মনে তাঁহার জন্য যথেষ্ট সহানুভূতি জমা হইয়াছে। অন্য সময় হইলে শাশুড়ী-সম্বন্ধে সে নিরুৎসাহিত কণ্ঠেই হয়তো বলিত, ভাল। অবশ্য মন্দ বলিতে তাহার শিক্ষায় বাধিত।

রামচন্দ্র অনেকগুলি প্রশ্ন করিল, পিসিমা?

উনিও ভাল। ভারি ভাল! এই উচ্ছ্বাসের মূলে অপরাধসঞ্জাত প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি অনেকখানিই ছিল।

কমলাটা ভারি দুষ্টু, নয়?

না, উনিও তো ভাল।

তাহ'লে মেনি বেড়ালটাও ভাল বল!

যোগমায়া হাসিল।

কেবল একজন এ বাড়ীতে আছে—যে ভারি দুষ্টু।

সভয়ে যোগমায়া প্রশ্ন করিল, কে, কে?

বল দেখি - কে?

যোগমায়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিল। ভাবিয়া কোন কূলকিনারা পাইল না। শেষে ভয়মিশ্রিত কণ্ঠে বলিল, আমি তো ঠিক করতে পারলাম না।

আর একটু ভেবে বল।

না, আপনি বলুন।

কেন, আমি। দুষ্টু নয়?

যান। বলিয়া যোগমায়া বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইল।

রামচন্দ্র আদর করিয়া বলিল, দুষ্টু নয়? এত রাত জাগিয়ে তোমায় কষ্ট দিচ্ছি।

যোগমায়া কোন কথা বলিল না।

রামচন্দ্র বলিল, বল না, দুষ্টু নয়?

না। ছোট্ট একটা 'না' বলিয়া যোগমায়া মৃদু হাসিয়া এই দিকেই মুখ ফিরাইল।

আনন্দে রামচন্দ্র বলিল, তুমি আমাকে ভালবাস?

যোগমায়া কথা কহে না দেখিয়া রামচন্দ্র জিদ ধরিল, না বললে তোমায় ঘুমুতে দেব না সারারাত। বল আগে?

অগত্যা আঁচলে মুখ ঢাকিয়া যোগমায়া ভীরু-কণ্ঠে বলিল, হুঁ।

হুঁ—কি? ভালবাস কিনা বলতে হবে। না বললে কাতুকুতু দেব।

যোগমায়া সশব্দে হাসিতে হাসিতে বলিল, উঃ, পায়ে পড়ি আপনার! আঃ, মা শুনতে পাবেন।

বল আগে?

চাপা গলায় ফিস্ ফিস্ করিয়া যোগমায়া বলিল—বাসি—বাসি। হলো তো?

ঘুম পাচ্ছে না তোমার?

না। যোগমায়া যেন অনেকটা সহজ হইয়া আসিয়াছে।

না, ঘুমোও—আমিও ঘুমুবো। ঐ দেখ পোয়াতে তারা উঠেছে, রাত শেষ হয়ে এলো।

আশ্চর্য্য বালিকার মন। পাশ ফিরিয়া চক্ষু মুদিতেই কয়েক মিনিটের মধ্যে যোগমায়া ঘুমাইয়া পড়িল।

৩

সকালে উঠিয়া শাশুড়ী ডাকিলেন, বউমা, ও বউমা। এত বেলা অবধি তো ঘুম ভাল নয়, মা। ওঠ।

ধড়মড় করিয়া যোগমায়া উঠিয়া বসিল। দু-হাতে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া বাহিরের পানে চাহিল। রৌদ্র অনেক খানিই চড়িয়াছে। গাছের সবুজ পাতায় সকালের রৌদ্র চিক্ চিক্ করিতেছে; রৌদ্রের একটা ফালি জানালার কাঠের গরাদগুলি স্পর্শ করিতেছে। শাশুড়ী যদি দরজার ওপারে থাকেন—কোন্ মুখে যোগমায়া দুয়ার খুলিয়া বাহির হইবে? যাহা হউক, নিদ্রিত রামচন্দ্রের পানে চাহিয়া সে তড়াক্ করিয়া মাইপোষ হইতে নামিয়া পড়িল ও কাপড়খানা কোন রকমে গায়ে জড়াইয়া সন্তর্পণে দুয়ার খুলিল। ভাঙ্গা একটা হাঁড়িতে গোবর গুলিয়া শাশুড়ী উঠানে ছড়া দিতেছেন। এ দিকটা পিছন করিয়া আছেন বলিয়া যোগমায়ার বাহিরে আসা তিনি দেখিতে পান নাই। যোগমায়া এ ধারে একটু সরিয়া আসিয়া পৈঁঠার কাছে দাঁড়াইল।

শাশুড়ী তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, এই যে উঠেছ? খুব সকাল সকাল উঠবে, মা। বউ হচ্ছে বাড়ীর লক্ষ্মী। সকালে উঠে দুয়োরে জল, উঠোনে গোবরজল ছড়া না দিলে মা-লক্ষ্মী রাগ করেন। বাসি পাটঝাঁট সারা হচ্ছে গেরস্থর চক্ষণের কাজ।

যোগমায়া নীরবে তাঁহার উপদেশ শুনিতে লাগিল।

শাশুড়ী বলিলেন, যাও, মুখ-হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে ফেল। গঙ্গাজল মাথায় দিয়ে মটকার শাড়ী পরে—সাজি নিয়ে চারটি ফুল তোল। গুছিয়ে ফুল তুলতে পারবে তো?

ঘাড় হেলাইয়া যোগমায়া সম্মতি জানাইল। সে একটু আগাইয়া যাইতেছিল, শাশুড়ী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, সেখানে বুঝি তিন পোর বেলায় উঠতে?

ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় হেলাইয়া যোগমায়া সে কথার জবাব দিল।

তবে? এতবেলা অবধি ঘুম—হঠাৎ তিনি কি যেন স্মরণে আনিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, যাও, মুখ ধোও গে।

ঘোমটার আড়ালে চক্ষু থাকিলেও শাশুড়ীর ঈষৎ হাসি যোগমায়া দেখিয়াছিল, এবং সে-হাসিতে যে লজ্জার কালি ছিল—তাহা যোগমায়ার মুখখানাকেই শুধু ভরাইয়া দিল। একটু চঞ্চল হাতেই সে রোয়াকের ধারে বসানো ঘটীটা তুলিয়া লইল। এমন দুর্দ্দৈব, হাত ফস্কাইয়া জলপূর্ণ ঘটীটা রোয়াকের নীচেয় পড়িয়া গেল। শব্দ হইতেই শাশুড়ী হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিলেন।

ভয়ে যোগমায়ার বুকের গোড়া ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি সে ঘটী তুলিতে গেল।

শাশুড়ী বলিলেন, থাক, থাক, ওখানে নোংরা। এই সকাল বেলায় নেমো না। আমি নাইবার সময় ঘটীটা তুলে—পুকুরে একটা ডুব দিয়ে আসব'খন।

যোগমায়া কাঁদিয়া ফেলিল।

শাশুড়ী প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, ছি মা, কাঁদে না। ঘটী পড়েছে—তা কি হয়েছে? অমন সবারই হাত থেকে পড়ে। এই তো কাল—আমার হাত থেকে এমন জায়গায় জলখাবার ফেরোটা পড়লো যে, ধুয়ে মেজে নেওয়াও আর চলবে না। ও অমন হয়।

এ কথায় কান্না না কমিয়া আরও বাড়িল। ঘরের দেওয়াল ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যোগমায়া কাঁদিতে লাগিল।

সান্ত্বনা দিবার সময় কম, কাজেই শাশুড়ী গোবরজলের ছড়া দিতে দিতে উঠানের অন্য প্রান্তে চলিয়া গেলেন।

কমলা বাহির হইয়া ক্রন্দনরতা যোগমায়াকে দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল, কাঁদছিস কেন, বউ? দাদা মেরেছে বুঝি?

এ রহস্যে সে হাসিল না—কাঁদিতেই লাগিল।

কি হ'ল—লো?

ঘটী পড়ে গেছে রোয়াকের নীচেয়। ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে যোগমায়া উত্তর দিল।

এই কথা! আমি বলি কি না কি! মা বকেছেন বুঝি?

সভয়ে ঘাড় নাড়িয়া যোগমায়া বলিল, না, না।

মা দেখেছেন?

হুঁ।

তবে আর কি, তোমার তো সাত খুন মাপ হয়ে গেছে! নতুন বউ, কিছু তো বলতে পারবেন না। আমাদের হ'লে দেখতে মজা!

যোগমায়া কমলার হাত চাপিয়া ধরিয়া চাপা গলায় কহিল, মা আসছেন। চল, কুয়োতলায় গিয়ে মুখহাত ধুয়ে আসি।

দিনে শাশুড়ীর স্নেহসম্ভাষণ, কমলার রহস্যালাপ, রাত্রিতে স্বামীর সোহাগ—তবু যোগমায়ার অন্তর ভরিতে চায় না। এই সোহাগ, রহস্য বা স্নেহপ্রকাশের মধ্যে বালিকার প্রাণটি ঠিক যেন যোগসূত্র খুঁজিয়া পাইতেছে না। বদ্ধ খাঁচায় থাকিয়া সোনার শিকল পায়ে দিয়া রূপার বাটিতে অনায়াসলব্ধ রাজভোগ মুখে তুলিয়া বনবিহগী কবে বা পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে? যোগমায়ার সংসারে সে বিস্তীর্ণ আকাশের অভাব; যে-আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়, ঝড়ের দোলা লাগে, বজ্রপতনের মুহূর্ত্তে মৃত্যুভয়ে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। স্বচ্ছন্দবিচরণের সেই ক্ষেত্রটিকে যোগমায়া সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিল। মায়ের তিরস্কার, সঙ্গিনীদের উপহাস বা তাহাদের লইয়া কলহ-ক্রন্দন—কোথায় গেল সে সব! ধূলাতে আঁচল লুটাইয়া—পিঠের কাপড়ে খোঁচ লাগাইয়া—হাতের চুড়ি ভাঙ্গিয়া সেই যে ছুটাছুটি—সেই ক্ষতি ও শ্রমের মধ্যে বালিকার মন দিনরাত ডুবিয়া আছে।

প্রত্যহ রাত্রিতে রামচন্দ্রকে সে বলে, কবে আমায় পাঠিয়ে দেবেন, বলুন না?

রামচন্দ্র দুঃখিত হইয়া বলে, আমাদের তোমার ভাল লাগে না বুঝি? তাই রোজ রোজ এক কথা বল।

ভাল রামচন্দ্রকে লাগে, কিন্তু সে-কথা প্রত্যহ উচ্চারণ করিয়া কি লাভ? এই জায়গা—যেখানে স্নেহ-সতর্কতার সীমা নাই অথচ ইচ্ছাসুখে ভ্রমণেরও অধিকার নাই; যেখানে ভাল খাবারটি খাওয়াইবার জন্য সকলের প্রাণপণ চেষ্টা, তবু সেখানে অলক্ষ্য-প্রসারিত বিধিনিষেধের বেড়াগুলি দিন দিন ঘন ও কঠিন হইয়া উঠিতেছে। ইহার বাহিরে—সেই অবহেলা-অনাদরের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত জীবনযাপনের জন্য যোগমায়ার আগ্রহ দিন দিন তাই প্রবলতর হইতেছে। এই যদি তাহার চিরদিনের বাসভূমি হয়—(গুরুজনদের সমবেত কামনাকে সে অগ্রাহ্য করিতে পারে না) তবে জীবনধারণই যে অসহ্য হইয়া উঠিবে।

মনে মনে অসহিষ্ণু হইয়া যোগমায়া বলে, আপনিও তো রোজ রোজ এক কথা বলেন। কই, পাঠিয়ে দিলেন না তো!

রামচন্দ্র আহত কণ্ঠে বলে, এখান থেকে গেলে তুমি খুব খুশী হও!

ঘাড় নাড়িয়া যোগমায়া জবাব দেয়, খুব।

রামচন্দ্র রাগ করিয়া বলে, কালই মাকে বলে—এর ব্যবস্থা করব।

খুশীতে যোগমায়া উজ্জ্বল হইয়া উঠে। সেখানকার কত গল্প সে অনর্গল শুনাইয়া যায়। রামচন্দ্র নীরবে খানিক শোনে—অভিমানের বাষ্পে দু'টি চোখ তাহার আচ্ছন্ন হইয়া যায়, এবং সেই বিরক্তির মাঝে কখন সে ঘুমাইয়া পড়ে। যোগমায়াও খানিক বকিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

প্রভাতে কমলা রহস্য করিয়া বলে, কচি খুকী, বাপের বাড়ী যাবার জন্যে নাড়ী টন্ টন্ করছে!

যোগমায়া নীরবে হাসিতে থাকে।

কমলা জ্বলিয়া উঠিয়া বলে, দাদাকে ছেড়ে থাকতে পারবি তো? পারবি? ধন্যি কাঠপ্রাণ যা হোক।

যোগমায়া হাসিতেই থাকে। সে তো আর কমলা নহে। পনর বছরের কিশোরী কিছু দশ বছরের বালিকার মনোবেদনা বুঝিতে পারিবে না। স্বামী-সোহাগের রশ্মিতে কমলার নূতন জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাইয়াছে। সেই রশ্মিতেই জগতের সমস্ত নারীর অন্তরকে দর্পণের মতই সে প্রতিফলিত দেখিতে চাহে। কমলা যখন বালিকা ছিল—তখনকার অনুভূতি সে হারাইয়াছে; যোগমায়ার কঠিনত্ব তাহার কাছে পরমাশ্চর্য্য বোধ হইবে বইকি!

শাশুড়ী বলিলেন, দেব বইকি বৌমাকে পাঠিয়ে। রথের দিন ভাল দিন আছে। সেই দিন—

যোগমায়া রাত্রিতে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, রথের আর ক'দিন আছে?

রামচন্দ্র বলিল, রথ দেখতে যাবে নাকি?

না, সেদিন মা আমায় পাঠিয়ে দেবেন বলেছেন।

ওঃ বলিয়া রামচন্দ্র পাশ ফিরিল।

যোগমায়া তাহার গাত্রস্পর্শ করিয়া বলিল, বললেন না তো?

আঃ, ঘুম পাচ্ছে। রামচন্দ্রের স্বর বিরক্তিজনক।

যোগমায়া সে বিরক্তি লক্ষ্য করিল না। নিজের মন আনন্দের কানায় কানায় ভরা থাকিলে পরের বিরক্তি লক্ষ্য করা দুরূহ। আপন আনন্দেই সে বলিল, আমার সঙ্গে আপনাকেও যেতে হবে কিন্তু।

তাই নাকি? মা বলেছেন বুঝি? স্বরে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ।

যোগমায়া সহজ কণ্ঠে বলিল, তা কেন, আমি একলা যেতে পারি বুঝি?

খুব পারবে। মাত্তর দুটি মাইল পথ তো। ঐ দালালপাড়ার মাঝখান দিয়ে একেবারে হরিপুরের বিলের ধারে পড়বে। তারপর তো তোমাদের মুলুক।

দূর, একলা বুঝি যেতে আছে?

নেই নাকি! কিন্তু কেন?

সবাই নিন্দে করবে যে।

ছেলেমানুষকে কেউ নিন্দে করে না। তুমি নর্দ্দমায় ঘটী ফেললে, কেউ কিছু বললেন কি?

সে তো হাত ফসকে পড়ে গেল, মশাই।

এ-ও না হয় ভুলে চলে যাবে।

যান। যোগমায়া এতক্ষণে রহস্য বুঝিতে পারিয়াছে। একটু থামিয়া বলিল, আপনি ভারি দুষ্টু।

সে কথা এতদিনে বুঝলে! রামচন্দ্র হাসিতে লাগিল।

যাহা হউক, রামচন্দ্রের অভিমানমিশ্রিত ক্রোধের পরাজয় ঘটিল। যোগমায়াকে পিত্রালয়ে

পৌঁছাইয়া দিবার প্রতিশ্রুতি আদর-সোহাগের অজস্র বর্ষণের মাঝেই কখন এক সময়ে সে দিয়া ফেলিল।

যাইবার সময় পিসিমা চিবুক ধরিয়া চুমা খাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, আবার শীগ্‌গির এস মা, এই ঘর তোমার জন্ম-জন্মান্তরের। সোয়ামীর ঘর ছাড়া—

শাশুড়ী এবং পাড়া-পড়শীরা ওই রকম অনেক কথা বলিল। কমলা তো চোখের জল মুছিতে ঢাকাই শাড়ীর আঁচলটাই চোখে চাপিয়া ধরিল। যোগমায়ার মনটাও খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। এই ঘর দু-খানির মধ্যে, রোয়াকটিতে, আমগাছতলার ছায়ায়, উঠানের ধুলাতে, তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যাদীপ দেখাইবার কালে—প্রাচীরের এ-পিঠে যে খণ্ডিত গৃহসীমা—তাহার ঘাসে, ধুলায়, গুল্মে সূক্ষ্ম একটি মমতার আস্তরণ ধীরে ধীরে কে বিছাইয়া চলিয়াছে। পিছন ফিরিলে মনের সুতায় টান ধরে—অথচ পিছন না ফিরিয়াই বা যোগমায়া করে কি? পাল্কীতে চাপিয়া বসিবার সঙ্গে সঙ্গে বিদায়োন্মুখ সমবেত লোকগুলির পানে চাহিয়া সত্যই তাহার চোখের কোণে ধারা নামিল। বিধাতাপুরুষ কিছু স্বহস্তে নারীর অন্তর-পাতায় বেদনার লেখাগুলি লিখিয়া দেন না, সে সৃষ্টিক্রিয়া নারীর কোমল মনেই অত্যন্ত সন্তর্পণে আর অলক্ষ্যে আবদ্ধ হইয়া যায়।

রামচন্দ্র সঙ্গে চলিল। গ্রাম ছাড়াইয়া মাঠে পড়িতেই ক্ষণিক বেদনার রেখা মন হইতে মুছিয়া গেল, চিত্ত প্রসন্ন হইয়া উঠিল। আস-শেওড়া গাছের কটু গন্ধ, কালকাসুন্দার ঘন ঝোপ, উপরে নীল আকাশ আর সম্মুখে প্রসারিত সবুজ বনসমুদ্র—যোগমায়াকে পুলক-বিহ্বল করিয়া তুলিল।

সে রামচন্দ্রকে বলিল, তুমি গান গাইতে জান?

রামচন্দ্র যোগমায়ার 'তুমি' সম্বোধনে উৎফুল্ল হইয়া বলিল, অ্যাঁ, 'তুমি' বললে আমায়! পাপ হবে যে!

ইস্‌, হবে বইকি। কমল-ঠাকুরঝিও তো তুমি বলেন।

সে বলে ব'লে তুমিও বলবে? জান, আমি তোমার গুরুজন?

যোগমায়া হাসিতে হাসিতে বলিল, তাই বলেই তো বলছি। মাকে কি আপনি বলি নাকি?

অকাট্য যুক্তি। রামচন্দ্র হাসিতে হাসিতে জবাব দিল, বাপেরবাড়ীর গাছপালার আর মাটির গুণ আছে। বোবারও বোল ফোটায়।

আমি বোবা নাকি?

বোবাই তো। সেখানে তো সাত চড়ে রা বেরুত না।

যোগমায়ার দৃষ্টি ততক্ষণে অন্য দিকে ফিরিয়াছে। সে বলিল, ওই পিটুলি গাছে—ফ্যাকাসে-কালো রঙের কি পাখী ওটা বল দেখি?

ওটা তো কোকিল পাখী!

দূর—ওটা বেনেবউ পাখী। 'বউ কথা কও' বলে ডাকে।

কেন ডাকে? ওর বউ বুঝি কথা কয় না? রামচন্দ্র প্রশ্ন করিল।

কি করে কবে। ও যে তাকে এক চড়ে মেরে ফেলেছিল। তাই তো দিনরাত ডাকে 'বউ কথা কও'—ব'লে।

কেন মেরে ফেললে ওর বউকে?

গল্প জান না? শোন তবে। এক যে ছিল...

গল্প ফুরাইবার আগে যোগমায়া বাপেরবাড়ী পৌঁছিয়া গেল। রামচন্দ্র লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়িল, যোগমায়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

৪

যোগমায়ার মা লবঙ্গলতা আসিয়া পাল্কী হইতে মেয়ে-জামাই নামাইয়া লইলেন। ছোট গ্রাম হরিপুর, বাড়ীর দু-পাশে প্রতিবেশীর ভিড় নাই। যোগমায়াদের বাড়ীর পাশে মাত্র দু-তিন ঘর বসতি করেন। তাঁহারাই বর দেখিতে আসিলেন।

গাঙ্গুলী-বাড়ীর বড়বউয়ের পিছনে বুড়ি দিদিমা লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করিতে করিতে আসিলেন। মাঝের বাড়ীর ছোটগিন্নী আসিলেন আর হরিশ ভট্টাচার্য্যের বিধবা পুত্রবধূ আধ-ঘোমটা টানিয়া ও রোরুদ্যমান ছেলেটার হাত ধরিয়া বর দেখিতে আসিলেন। এ-পাড়া ও-পাড়া হইতে জন কুড়ি-বাইশ অর্দ্ধ-দিগম্বর ছেলেমেয়ে আসিয়া পাল্কীর চারিপাশে কলরব জুড়িয়া দিল।

গাঙ্গুলী-বুড়ি লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করিতে করিতে আগাইয়া আসিলেন। দন্তহীন মুখে হাসিয়া কহিলেন, কই ভাই নাত-জামাই, কেমন আছ দেখি? বেশ বেশ, মুখখানি হাসি-হাসি, প্রাণখানি খুশী-খুশী, কনের সঙ্গে ভাব জমেছে তো ভাই?

রামচন্দ্র উত্তর না দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

দিদিমা বলিলেন, এ কি মান-ভঞ্জনের পালা হচ্ছে ভাই? তুমি যে এতদিন চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিলে—তা তোমার ছিরাধিকের রাগ হতে পারে, এটা বুঝতে পেরেছ—নয়? বেশ চালাক নটবর তো তুমি।

মাঝের বাড়ীর ছোটগিন্নী বলিলেন, ছিরাধিকের চরণ ছাড়া কৃষ্ণের কি গতি আছে? তাইত ও তোমায় ভুলতে পারে নি। যা হোক, পালা তোমাদের জমবে ভাল।

দিদিমা বলিলেন, জমবে না! বৃন্দাবনে যদি না জমবে তো মথুরায় কুঁজিকে নিয়ে জমবে বুঝি? এখানে যে ষোল-শো গুপিনী।

ছোটগিন্নী বলিলেন, কিন্তু আমরা তো দেখছি কুঁজিরই জয়জয়কার। আমাদের কানু কুঁজির ছিচরণ ছাড়া চিনলে কই!

দিদিমা বলিলেন, বটে ছুঁড়ি! মন ভোলাতে হ'লে শুধু রূপের দ্যামাক করলে চলে না, যত্নআত্তি না করলে কি ওরা ভোলে! শুধু কান্না, শুধু মান—ওতে কি পালা জমে?

লবঙ্গলতা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, একবার বাড়ীতে পায়ের ধুলো দেবেন, দিদিমা।

দিদিমা বলিলেন, ধুলো আর রইলো কই লবঙ্গ, এমনও হ্যাংলা জামাই করেছিস যে, সবটুকু চেটেপুটে মেরে দিলে লো!

সকলে হাসিতে হাসিতে বাড়ীর মধ্যে চলিলেন।

যোগমায়ার ব্রীড়া তখন রামচন্দ্রকে আশ্রয় করিয়াছে। সে বেচারা প্রাচীনাদের রসিকতা-বাণে বিদ্ধ হইয়া কান-মুখ রাঙা করিয়া চোরটির মত ইঁহাদের মধ্যবর্ত্তী হইয়া চলিল। যোগমায়ার সর্ব্বাঙ্গে চাঞ্চল্য ফুটিয়াছে। মাথার ঘোমটা সম্পূর্ণ খসিয়া না পড়িলেও, খাটো হইয়াছে এবং চোখে-মুখে কৌতুক-হাস্য দেখা যাইতেছে। আড়ষ্ট রামচন্দ্রের পানে চাহিয়াই হয়ত বা তাহার এই কৌতুক অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছে!

যেখানে পাল্কী নামানো হয়—সেখান হইতে বাড়ী মিনিট দুইয়ের পথ। ওই শিশু বকুল-গাছতলাটা হইতে দু-ধারে আস্‌শেওড়া সমন্বিত বনটা সবই যোগমায়াদের। বাড়ী পৌঁছিবার পথটি কিছু প্রশস্ত; প্রত্যহ সম্মার্জ্জনী-সঙ্কালনে ও গোবরজল-ছড়ায় পরিষ্কৃত সে পথ।

যোগমায়ার পিতা বাড়ী ছিলেন না। বৈদ্য-পাড়ায় প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় তিনি দাবা খেলিতে যান; মেয়ে-জামাই আসিবার কথা জানিয়াও প্রাত্যহিক নেশা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। রাম-চন্দ্রের পক্ষে সে ভালই হইয়াছে। মেয়েমহলের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ও রসিকতাগুলি পরিপাক করা কঠিন হইলেও রামচন্দ্র তাহাতে কিছু অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু রাশভারী, শ্মশ্রুগুম্ফ-শোভিত শ্বশুরের পানে চাহিয়া কথা বলিবার সাহস তার নাই। যে কটা কটা চোখের তারা তাঁর, আর গলার স্বরটিও সেই পরিমাণে গম্ভীর। হইলই বা স্নেহ-পুলকিত মৃদু সে স্বর—স্নেহ-প্রকাশের শত চেষ্টা সত্ত্বেও স্বরের গাম্ভীর্য্য যে ঢাকা পড়ে না!

অবশেষে সদর দরজা দিয়া ইঁহারা বাড়ীর মধ্যে আসিলেন। উঠান প্রশস্ত। বাড়ী ঢুকিবার মুখেই একটা বেলগাছ দেখা যায়, সদর দরজার ভিতরেই মোটা কাছির মত একটা লতাগাছ প্রাচীর বাহিয়া বেলগাছে গিয়া ঝাঁকড়া হইয়াছে। মধুমালতীর লতা। সাদা সাদা ফুলগুলি তার চমৎকার। সদর দরজার ভিতরে খানিকটা জায়গা ছোট প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া ভিতরের উঠানের আব্রু রক্ষা করা হইয়াছে। ডান দিক দিয়া ঘুরিয়া সেই প্রাচীর পার হইলেই প্রশস্ত উঠান নজরে পড়ে। উঠানের এক ধারে একটা স্বাস্থ্যহীন কাঁঠালগাছ দেখা যায়। তাহার ঠিক নীচেয় ছোট্ট পাতকুয়াটি। ও-পাশে ঝাঁকড়া লেবুগাছ পূর্ব্বদিকের প্রাচীরের গায়ে অনেকখানি জমি দখল করিয়া প্রায় শুইয়া পড়িয়াছে, উঠানের মাঝখানে একটি বকফুলের গাছ আছে, একটি করিয়া গন্ধরাজ ও জাঁতিফুলের গাছও আছে। ঠাকুরঘরের ও-পাশে জুঁই, টগর, মল্লিকা, জবা ও কুন্দফুলের ঝাড় রহিয়াছে। ঝাড়ের কোথাও বেড়া দেওয়া নাই, তথাপি ছাগল বা গরুর মুখপৃষ্টতার চিহ্ন সেগুলির কোথাও দেখা যায় না। দাওয়ার কোল ঘেঁষিয়া একটা ছোট পেয়ারা গাছ শাখা-প্রশাখা মেলিতেছে। প্রকাণ্ড আটচালা—সুশ্রী এবং শোভন। যেমন চওড়া তাহার দুই দিকের দাওয়া, তেমনই বড় বড় দু'খানি ঘর। দাওয়ায় তক্তাপোষ পাতা আছে। দশ-বার জন অতিথি আসিলে পঁচিশ-ত্রিশ হাত লম্বা দাওয়ায় পূর্ব্ব বা দক্ষিণ ধারে অনায়াসে স্থান সঙ্কুলান হইয়া যায়। উঠান হইতে দাওয়ার উচ্চতাও হাত আড়াই হইবে।

বরকে লইয়া পুরমহিলারা ঘরের মধ্যেই বসিলেন। ঘরের মধ্যে বেশ অন্ধকার। রেড়ির তেলের প্রদীপটি না জ্বালা থাকিলে বরের মুখই

দেখা যাইত না। জোড়া কুলুঙ্গির নীচে যেখানে বরের বিছানা পাতা হইয়াছে—বসুধারার ছাপ। কুলুঙ্গির মাথায় কালী, দুর্গা, শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ-মূর্ত্তি, কালীঘাটের কালীমূর্ত্তি ইত্যাদি ছোট ছোট পট রহিয়াছে। ও-পাশের বড় কড়ির আলনাটায় শীতকালের কাঁথা বালিশ ইত্যাদি একখানি ফরসা কাপড় দিয়া বাঁধা রহিয়াছে,—অজ্ঞাতবাসকালে শমীবৃক্ষে পাণ্ডবদের অস্ত্রশস্ত্র টাঙ্গাইয়া রাখিবার মত। জলচৌকির উপর কাঁসার ও পিতলের বাসনগুলি প্রদীপের আলোয় ঝক্ ঝক্ করিতেছে। কাঠের সিন্দুকে সিন্দুর চন্দনের দাগ। তবে সিন্দুকগুলি রামচন্দ্রের বাড়ীর চেয়ে অনেক বড় ও অনেক কারুকার্য্যমণ্ডিত।

যোগমায়া অনেকক্ষণ উঠিয়া গিয়াছে, রামচন্দ্র ইঁহাদের রসিকতা দ্বারা বিদ্ধ হইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে এবং মনে মনে ক্রুদ্ধও হইতেছে। ক্রুদ্ধ হইবার কথাই তো। চুণ না দিয়া পান সাজা, পানের ডিবা খুলিতেই গোটাকতক আরশুলার বহির্গমন, কর্ণমর্দ্দন ইত্যাদি স্থূল রসিকতার দ্বারা পুরমহিলাদের কৌতুকরস সৃজন—কাহার না রাগ হয়। সতেরো-আঠারো বৎসরের বরকে লইয়া এই সব রসিকতা অবাধ গতিতেই চলিয়াছে।

অবশেষে লবঙ্গলতা তাহাকে সেই বিপদসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিলেন। তিনি বলিলেন, বাছাকে একটু জিরোতে দে ভাই। কোন্ দূর থেকে এসেছে—হাক্লান্ত হয়ে আছে। বিকেলে আসিস!

দিদিমা বলিলেন, তাই আসব। ভাল ক'রে মাছের মুড়ো—দুধ ঘি খাইয়ে বাছাকে তোর চাঙ্গা করে রাখবি—বুঝলি?

হাসিতে হাসিতে তাঁহারা চলিয়া গেলেন।

একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া রামচন্দ্র বিছানার উপর কাত হইয়া শুইল। লবঙ্গলতা দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বৈকাল আসিবার পূর্ব্বে কিন্তু দুই-একজন শালী-সম্পর্কীয়া আসিয়া জুটিল। মণিমালা-নাম্নী এক বিংশবর্ষীয়া তরুণী লবঙ্গলতাকে বলিল, তুমি সর দেখি খুড়িমা। জামায়ের পিঁড়ি পাতা—ভাত খাওয়ানো আমরাই করব।

লবঙ্গলতা রান্নাঘর হইতে বলিলেন, ওকি মণি, ঘরের মধ্যে আসন পাতলি কেন? যে অন্ধকার ঘর, দাওয়ায় জায়গা কর।

মণিমালা ঘর হইতে উত্তর দিল, আহা, খুড়িমার কথার ছিরি দেখ! জামাইমানুষকে নাকি বাইরে খেতে দিতে আছে? পাঁচ জনের দৃষ্টি পড়ুক আর কি! ঘর তোমার অন্ধকার হয়—পিদীম রয়েছে কি করতে?

পিঁড়ি পাতিয়া ঝক্‌ঝকে কাঁসার গ্লাসে জল ভরিয়া মণিমালা এ ঘরে আসিয়া ডাকিল, এস ভাই রামচন্দ্র—খাবে এস। আহা, অনেকখানি বেলা হ'য়ে মুখখানি শুকিয়ে গেছে।

রামচন্দ্র সপ্রতিভ ভাবে বলিল, মুখ শুকুবে কেন, বাড়ীতে তো আমি এই সময়ে খাই।

এত বেলায়! জন-মজুর খেটে আস বুঝি কোথাও? কৌতুকহাস্যে মণিমালা ফাটিয়া পড়িল।

লবঙ্গলতা রান্নাঘর হইতে হাঁকিলেন, তোদের জায়গা করা হ'লো রে মণি?

হাঁ—খুড়িমা। তোমার জামাইকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছি। এস ভাই।

এ ঘর আরও অন্ধকার। যে প্রদীপটি মণিমালা জ্বালিয়া দিয়াছে, তাহাতে অন্ধকার খানিকটা পাতলা হইয়াছে মাত্র—সুস্পষ্ট কোন জিনিষ দেখা যায় না। মাছের কাঁটা বাছিয়া গলাধঃকরণ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

রামচন্দ্র সন্তর্পণে পিঁড়িতে পা দিতেই হুড় হুড় করিয়া পিঁড়ি গড়াইয়া গেল। তাড়াতাড়ি দেওয়াল ধরিয়া সে সামলাইয়া লইল। আছাড় খাইয়া পড়িলে মাথা না ফাটুক—আঘাতটা গুরুতরই হইত। মণিমালা ও আর দুই জন তরুণী 'আহা' ধ্বনি করিয়া হি-হি করিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

লবঙ্গলতা ওঘর হইতে হাঁকিলেন,—শব্দ হ'লো কিসের, মণি?

তোমার অকম্মা জামাই পড়ে যাচ্ছিলেন, খুড়িমা। এমন যুগ্যতা নেই যে পিঁড়িতে ভাল করে বসেন। তখন পূর্ণোদ্যমে হাসি চলিতেছে।

লবঙ্গলতা তিরস্কারের স্বরে বলিলেন,—পিঁড়ির তলায় সুপুরি দিয়েছিস বুঝি? পড়ে গিয়ে হাতপা ভাঙ্গলে তখন কি তোরা দায়ী হবি?

না গো খুড়িমা, বসতে গিয়ে যে পড়ে যায়—তেমন অকম্মা জামাইয়ের দায়িক আমরা কেন হব?

ওকে বসা—আমি ভাত নিয়ে যাচ্ছি। লবঙ্গলতা বলিলেন।

ইস্, তুমি নিয়ে আসবে বৈকি! আমরা বল্লে জামাইয়ের কাছে বসে খাওয়াব বলে আশা করে

আছি। বলিতে বলিতে বিদ্যুদ্বেগে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আর দুই জন মেয়ে রামচন্দ্রকে অনুরোধ করিয়া আসনে বসাইল।

ভাতের থালা লইয়া মণিমালা দেখা দিল। সুশীলা গ্লাস হইতে জল লইয়া হাতের তালু দিয়া মেঝে মুছিয়া দিল। মণিমালা থালা নামাইয়া বলিল, দুর্গা তুই একটু বাতাস কর না, ভাই।

আচমন করিয়া রামচন্দ্র যেমন ভাতের থালা টানিয়া লইয়াছে—অমনই দুর্গা সজোরে পাখা চালনা করিতে লাগিল। রামচন্দ্রকে বিস্মিত করিয়া পাখার হাওয়া লাগিয়া থালায় সজ্জিত শুভ্র অন্নরাজি চক্ষের নিমেষে এধার ওধার উড়িয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

মণিমালা হাসিতে হাসিতে বলিল, কি ভাই বর, ফুস মন্তরে সব ভাত খেয়ে ফেললে? ও খুড়িমা, আর এক থালা ভাত নিয়ে এস, তোমার জামাই সব খেয়ে ফেলেছে গো।

থালা মণিমালাই উঠাইয়া লইল। আধ-ঘোমটা টানিয়া একটি বউ নূতন থালায় ভাত বাড়িয়া রামচন্দ্রের সম্মুখে রাখিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, খাও ভাই, এ দোরম ফুলের ভাত নয়, হাওয়ায় উড়বে না। বলিয়া সে কথার সত্যতা প্রমাণ করিতে দুর্গার হাত হইতে পাখা লইয়া অন্নথালির উপর বার কতক সজোরে বাতাস করিল।

এবারের বিপদ কিন্তু অন্য রকমের। মধ্যমাঙ্গুলি ভাতের মধ্যে সন্তর্পণে প্রবিষ্ট করাইয়াই রামচন্দ্র বুঝিল, চূড়াবিশিষ্ট অন্নরাজির মধ্যস্থলে একটি বাটি বসানো রহিয়াছে। ধীরে ধীরে সে ভাত ভাঙ্গিয়া খাইতে লাগিল—যেন বাটি প্রকাশিত হইয়া না পড়ে।

শাক দিয়া অন্ন মুখে তুলিবার পর মণিমালা প্রশ্ন করিল, হাঁ ভাই, শাক তেলশাক কেমন হয়েছে?

ভাল। বলিয়া রামচন্দ্র সবটুকু শাক মুখের মধ্যে পুরিয়া দিল। কাঁচা শাক যতই বিস্বাদ হউক, মুখ বিকৃতি করা চলিবে না। উহাদের রহস্যের পথটি সে বন্ধ করিবেই।

মণিমালা হাসিয়া বলিল, ওগো খুড়িমা, শাক তেলশাক তোমার ভালই হয়েছে। আর একটু দেব?

আসুন। অসঙ্কোচে রামচন্দ্র বলিল।

না ভাই, আর মেলা শাকটাক খায় না, মাছ খাও।

সত্য বলিতে কি, আধপেটা খাইয়াই রামচন্দ্রকে পুনঃ পুনঃ ঘাড় নাড়িতে হইল, উদ্গারও তুলিতে হইল।

মণিমালা জিদ ধরিল, না ভাই, ভাত তুমি মোটে ছুঁলে না। মাথা খাও আমার—মাঝখান থেকে চারটি ভেঙে নাও।

হাতজোড়ের ভঙ্গিতে রামচন্দ্র বলিল, মাফ করুন।

এমন সময় দুধের বাটি হাতে করিয়া লবঙ্গলতা ঘরে ঢুকিয়া ধমকের স্বরে বলিলেন, যা তো ছুঁড়িরা।—বাছাকে খেতে দিবি না নাকি! বোস বাবা, এই দুধটুকু চারটি ভাত মেখে খেতেই হবে। বলিয়া নিজেই মুঠা দুই ভাত তুলিয়া দুধের বাটিতে দিলেন। ভাতের মধ্যের বাটি বাহির হইয়া পড়িল।

মণিমালা হাসিতে হাসিতে বলিল, ওমা, কি হবে গো, খুড়িমার জামাই ভাতের মধ্যে বাটি লুকিয়ে রেখেছিল! এমন চোর জামাই তো দেখি নি বাবা!

ধমক খাইয়া তাহারা হাসিতে হাসিতে পলাইল।

লবঙ্গলতা অনুরোধ করিয়া না খাওয়াইলে বেচারাকে সে-বেলা এক প্রকার উপবাসেই কাটাইতে হইত!

রাত্রিতে যোগমায়া বলিল, দোরম ফুলের ভাত বুঝতে পার নি?

যে অন্ধকার ঘর তোমাদের।

অন্ধকার বলেই তো ওই ঘরে ওরা তোমায় খেতে দিয়েছিল। ভারি দুষ্টু ওরা।

তোমার ঠানদিদিটিও কম নন।

নতুন বরকে নিয়ে সবাই ও রকম করে।

কেন, বর কি চোর নাকি?

যোগমায়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, চোর নয় তো কি! তোমায় দেখে আমার এমন মায়া হচ্ছিল!

প্রদীপের আলোয় যোগমায়াকে অপরূপ দেখাইল। রামচন্দ্র তাহার একখানি হাত টানিয়া লইয়া বিহ্বল কণ্ঠে বলিল, শুধু মায়া?

বাঃ রে, কষ্ট হয় না বুঝি? খিদের সময় এক জনকে না খেতে দেওয়া!

শুধু কষ্ট?

আর শোন। কণ্ঠস্বর নামাইয়া যোগমায়া বলিল, কাল তোমাকে ওরা নেমন্তন্ন করে লুচি

খেতে দেবে। ন্যাক্‌ড়ার লুচি। তুমি খেয়ো না, বলবে, না ফুললে সে লুচি আমরা খাই নে। কেমন?

আনন্দিত হইয়া রামচন্দ্র বলিল, তা তো বলবোই। আর কি পরামর্শ করেছে ওরা বল তো?

আমার মাথা ছুঁয়ে তিন সত্যি কর আগে—কাউখ্যে বলবে না? ওরা জানতে পারলে যা ক্ষেপাবে!

বেশ বল। রামচন্দ্র যোগমায়ার কথাবৎ শপথ করিল।

পিটুলি গোলা দেবে—দুধ বলে—খবরদার খেয়ো না। বলো পেটের অসুখ করেছে।

বটে! ভারি তো বুদ্ধি ওদের। খালি ঠকাবার মতলব।

আর যার বাড়ী নেমন্তন্ন করবে—আগে ভাল করে দেখে শুনে তবে খাবে। অন্ধকার ঘরে বসবে না, পিঁড়িটা সরিয়ে বসবে, পানের ডিবে খবরদার খুলো না।

যোগমায়ার বুদ্ধি আছে। তা ছাড়া বাপের-বাড়ীতে আসিয়া সে অনেকটা সহজ হইয়াছে। রাত্রির মধ্যযাম পর্য্যন্ত রামচন্দ্রের সঙ্গে গল্প করিয়া তবে সে ঘুমাইল। এ-বাড়ীর এইটুকু মজা যে, কাক কোকিল ডাকিতে-না-ডাকিতে দেহভরা আলস্য ও ঘুম-ভরা চোখ লইয়া শয্যা ত্যাগ করিতে হইবে না। এখানে বধূজীবনের কোনরূপ কর্ত্তব্য-ত্রুটির ভয় নাই, নিঃসঙ্কোচ কন্যাজীবনের ভূমিকায় অভিনয়-দক্ষতার বালাই নাই। বেশ স্বচ্ছন্দ জীবন।

৫

রামচন্দ্র কিন্তু অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেছে। সারাদিন হাসি-ঠাট্টায় উত্যক্ত হইয়া গভীর রাত্রিতে যখন তাহার মুক্তি মেলে—তখন যোগমায়াকে একান্তে পাইয়াও সে প্রাণ খুলিয়া আলাপ জমাইতে পারে না। ভোরবেলায় এ-বাড়ীর দুয়ারে কৌতুকলোভীর দল হানা দিয়া ঘুম ভাঙাইয়া দেয়।

যোগমায়া উঠিয়া অন্য ঘরে যায়, কিংবা দাওয়ার পশ্চিম কোণের তক্তাপোষের উপর শুইয়া রাত্রির অনিদ্রার ক্ষতিপূরণ করিয়া লয়। নূতন জামাইয়ের সে সুবিধা নাই। ঘুমভারে চোখ ঢুলিলে হাসিও প্রখর হইয়া উঠে। তার উপর খাওয়া, শোয়া, বসা, দাঁড়ানো ইত্যাদি সমস্ত কাজেই সদা সশঙ্ক ভাব। এমন আড়ষ্টভাবে কি মানুষ আনন্দ উপভোগ করিতে পারে!

এক দিন শ্বশুর শ্রীযুক্ত রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথাও কোন কাজের চেষ্টা করছো নাকি?

হেঁটমুখে রামচন্দ্র উত্তর দিল, আজ্ঞে পোষ্ট আপিসে একখানা দরখাস্ত করেছি।

পোষ্ট আফিসে! ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রামজীবন বলিলেন, সুবিধে হবে ওখানে? শুনেছি বড় মাইনে কম। উপরি নেই।

তা ছাড়া কোথায় চেষ্টা করব?

কেন, কোন জমিদারি-সেরেস্তায় ঢুকতে পারলে ভাল হয়। গোটা আট-দশ টাকা মাইনে দেবে বটে, দোল-দুর্গোৎসবও ওতে চালানো যায়।

দেখি তো চেষ্টা করে।

হাঁ তাই দেখ। আর তুমি যদি বল—আমি না হয় চৌধুরী মশায়কে একবার অনুরোধ ক'রে দেখি।

এখন থাক, পরে আপনাকে জানাবো।

বেশ, তাই জানিয়ো। বলিয়া তিনি উঠিলেন। কয়েক পা চলিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, শুনিয়াছিলাম—তুমি নাকি আজই যেতে চাও?

হ্যাঁ।

না-না, কাল যে বিষ্ণু জেলেকে বলেছি একটা পাকা রুইমাছ দিয়ে যেতে। একটু পোলাও-টোলাও—আজ তোমার যাওয়া হবে না। পরশু ভাল দিন আছে, বলিতে বলিতে তিনি জামাতার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

যোগমায়া রাত্রিতে বলিল, বাড়ী যাওয়ার জন্যে তোমার এত তাড়া কেন?

তোমাদের বাড়ী ভাল নয় বলে। গম্ভীর ভাবে রামচন্দ্র উত্তর দিল।

ওঃ, নিজের বাড়ীখানি সবাইয়ের ভাল লাগে গো। আমি কাঁদতাম—আর তুমি কত না ক্ষেপাতে!

রামচন্দ্র বলিল, কিন্তু সেই বাড়ীতে যে তোমার ঘর। সেইখানেই তোমায় সারা জীবন কাটাতে হবে।

যোগমায়া বলিল, ইস্, তা বৈকি। আমি কক্‌খনো সেখানে থাকতে পারব না। একবার এখানে—একবার সেখানে—

আচ্ছা—দেখা যাবে।

আচ্ছা—দেখো।

ক্ষুব্ধ মনে রামচন্দ্র পাশ ফিরিল। যোগমায়া ঘুমাইয়া পড়িলেও সে অনেকক্ষণ জাগিয়া জাগিয়া ভাবিতে লাগিল, আচ্ছা, আপনার বাড়ী মানুষের এত ভাল লাগে কেন? সেখানে বাধা-নিষেধ নাই—তাই কি এত ভাল লাগে? তবে যোগমায়া সে বাড়ীখানি কেন পছন্দ করে না? যোগমায়া তো তাহার একরূপ আপনই হইয়া গিয়াছে। যোগমায়াকে ভালবাসিয়া সেই বাড়ীখানি রামচন্দ্রের আরও রমণীয় বোধ হইতেছে। হয়তো যোগমায়া তাহাকে ভালবাসে না, তাই রামচন্দ্রের যাহা ভাল লাগে—যোগমায়ার তাহাতে আনন্দ জন্মায় না।

রামচন্দ্র চলিয়া গেলে যোগমায়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অনুভব করিল। মাথার স্বল্প ঘোমটা খসিয়া গেল, হুড়াহুড়ি ছুটাছুটির মাত্রা বাড়িয়া গেল। অনেকবার ডাকিয়াও মা তাহার সাড়াশব্দ পান না।

ও মায়া—মায়া রে, একবার উনুন-ধারে এসে বোস না!

বাঃ রে, আমরা যে জল-ডিঙ্গোডিঙ্গী খেলছি, কুমীরে ধরুক আর কি!

বলি, রান্না-বান্নাগুলো একটু শেখ, নইলে শ্বশুরবাড়ী শতেকখোয়ার হবে যে!

হাঁ, কাঠের ধোঁয়ায় চোখ কানা করে বসি আর কি। কানামাছি খেলবার সময় চোখে খালি ধোঁয়া দেখব।

তোর কপালে দুঃখু আছে—এই আমি বলে দিলাম।

সারাদিন খেলায় কাটাইয়া রাত্রিতে যোগমায়া যখন শুইতে আসে, তখন তাহার বালিকাচিত্ত খানিকক্ষণের জন্য কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে। নির্ব্বাপিতদীপ কক্ষে—পাশে আর একটি নূতন প্রাণী, কত আবোল-তাবোল সে বকে, কত আদর করে যোগমায়াকে, তাহার সঙ্গে কত না কথা-কাটাকাটি চলে! ঘুমাইতে না দিবার কত না ছলছুতা সে আবিষ্কার করে। মাথার খোঁপা খুলিয়া, চুল টানিয়া, পিঠে সুড়সুড়ি দিয়া, হাতের মুঠায় হাতখানি ভরিয়া—কত না তাহার রাত জাগাইবার প্রয়াস। যোগমায়া বিরক্ত হয়, হাসে। খেলার আনন্দে এই উপদ্রবগুলির নেশা অল্পে অল্পে তাহাকেও কেমন পাইয়া বসিতেছে। একলা শুইয়া সেই কথাই আজকাল খানিকক্ষণ মনে পড়ে। তাহাকে মনে পড়িবার সঙ্গে সেই ভগ্ন বাড়ীটার স্মৃতি উজ্জ্বল হইতে থাকে। প্রায়ান্ধকার উঠানের সেই আম, কাঁঠাল ও লেবু গাছগুলি, পূর্ব্বদিকে তুলসীমঞ্চ, সন্ধ্যাকালে সেই মঞ্চতলে প্রদীপ জ্বালিয়া দেওয়া, ধুনার ধোঁয়া ও শাঁকের ডাকে সন্ধ্যা-আবাহন, সকালের উঠান ঝাঁট—গোবরজল ছড়ানো, দুপুরে আমিষ নিরামিষ দু'টি হেঁসেলের রান্না—সবই শাশুড়ী নিজের হাতে করেন। ভাঙ্গা ঘর-দুয়ারের উপর তাঁহার কি অসীম মমতা! কমলার সখিত্ব—সেও ত ভাল লাগে। এখানে বসিয়া সেখানকার অনেক কিছুই তো ভাল লাগে, তবু সেখানকার বাতাস ভারী। প্রতিপদে বিধিনিষেধ! কে নিন্দা করিল, কে বক্র কটাক্ষে চাহিয়া তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিল, কে রূপের ত্রুটি ধরিয়া সমালোচনা করিল! ভর্ৎসনা নাই, অথচ সঙ্কোচের ছায়া প্রতি পদক্ষেপে গাঢ়তর হইয়া উঠে। পিসিমার মনখানি ভারি ভাল, শাশুড়ীও স্নেহশীলা, কমলার তো কথাই নাই। তবু এই বাড়ীতে বসিয়া সেই বাড়ীখানি যেমন মনোরম বলিয়া মনে হইতেছে, সেই বাড়ীতে বাস করিয়া ঠিক তেমনটি তো হয় না। এখানে যোগমায়ার মুক্তির ক্ষেত্র সুবিস্তীর্ণ, সেখানে রঙীন জাল বোনা হইলেও—সেই ক্ষেত্র খণ্ডিত—কায়েতদের বনসীমায় প্রাচীর তুলিয়া বাড়ীখানাকে যেমন সীমার মধ্যে বন্দী করা হইয়াছে।

রামচন্দ্রের কথা ও বাড়ীর কথা ভাবিয়াই আজকাল যোগমায়ার নিদ্রাকর্ষণ হইয়া থাকে। দিনে দিনে স্মৃতি তরল হইয়া আসে। মাঠের বৈঁচি বন, কদমতলার ডোবায় শুষ্‌নি শাক তোলা, আমবাগানে আম কুড়ানো, কুলগাছের ডাল নাড়া দিয়া কুল পাড়া, পাকা জাম পাড়িয়া দিবার জন্য দুঃসাহসিক ছেলের খোসামুদি, রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া আচার চুরি, সঙ্গিনীর সঙ্গে জল-ডিঙ্গোডিঙ্গী, কানামাছি, গঙ্গাযমুনা খেলা—এ বাড়ীর যত কিছু মনমাতানো জিনিষ যোগমায়াকে অভিভূত করিয়া তুলে। ও-বাড়ীর স্মৃতি তরল হইতে থাকে, এ-বাড়ীর প্রদীপখানি উজ্জ্বল হইয়া জ্বলে।

আগে এমন ছিল না, আজকাল যোগমায়ার নিদ্রা খুব তরল হইয়াছে। 'খুট' করিয়া একটু শব্দ হইলেই ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। চোখ না চাহিয়াই সে কল্পনা করে—দু'টি পাশই যেন খালি রহিয়াছে। মধ্য রাত্রিতে খুনসুটি করিবার জন্য মন তাহার ব্যাকুল হয় না বটে, খুনসুটি করিলেও তো মন্দ লাগে না! অনেক সময় স্বপ্নে সে শ্বশুরবাড়ীর অবস্থান ও ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। সেই

ঘটনার সঙ্গে—লজ্জা, সঙ্কোচ, আনন্দ ও শিহরণ সবই সে অনুভব করিতে পারে।

আজ, হয় তো মধ্য রাত্রিই হইবে, প্রদীপটা অনেকক্ষণ নিবিয়া গিয়াছে—ঘুমও ভাঙিয়াছে, শুধু নিজের অবস্থানটি সঠিক অনুভব করিবার ক্ষমতা তাহার নাই।

মনে হইল, পিতাই কথা কহিতেছেন, তা হোক, তিনটে মাস সময় বড় কম নয়, সে আমি ঠিক করে নেব।

এবার মায়ের কণ্ঠস্বর, তিন মাসের মধ্যে যদি মেয়ে নিতে আসে?

শ্রাবণ মাসটা অসুখবিসুক বলে কাটিয়ে দেওয়া যায়, সামনে ভাদ্র মাস। তা ছাড়া আশ্বিন মাসের শেষে এবার পূজো।

মায়ের কণ্ঠস্বর, কি জানি, আমার মনে কেবলই কু গাইছে।

মায়ের মন কিনা! পিতার গম্ভীর হাসিতে যোগমায়া চোখ চাহিল। ঘর অন্ধকারে ভরা তক্তাপোষের নীচেয় খুটুর খুটুর শব্দ হইতেছে—ইঁদুর হয়তো।

মা বলিলেন, আমাদের যা সাধ্যি তেমনি লগনে দেওয়া-থোওয়া করলেই হ'ত।

বাবা বলিলেন, ওই আমাদের বড় মেয়ে—ওর বিয়েতে সাধ-আহ্লাদ করবো না তো কি মাইপোষে কুলুপ লাগিয়ে বসে থাকবো! মানুষের খরচ আছে, তাই ধার হয়। সে ধার চিরকাল থাকে না। বলিতে বলিতে তিনি আর একবার অনুচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলেন, ধার শোধ যায়, কিন্তু সাধ-আহ্লাদ যদি না পোরাও তো জীবনভোর আপসোষ তোমার থেকে যাবে।

মা মৃদুস্বরে বলিলেন, সবই বুঝি, তবু ভয় তো কমে না। ওই তো আমাদের শেষ সন্তান নয়।

কিন্তু সাধ আমাদের এই প্রথম। তুমি ভেবো না, ঘুমোও।

হাঁ গা, জামাইটি কেমন মনে হয়?

ভাল। এখন থেকেই কাজের চেষ্টা করবে বললে। আজ অবধি এই রামজীবন বাঁড়ুয্যে কখনও খারাপ জিনিষ ঘরে আনে নি, জান?

হুঁ, ঘুমোও।

ঘুমে যোগমায়ার চক্ষু পুনরায় মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে। পিতামাতার চিন্তার সূত্রটি যে তাহাকে লইয়া, তাহা সে যেন অল্প অল্প বুঝিতে পারিতেছে, কিন্তু এত ঘুমের মধ্যে সে চিন্তাকে মাটি স্পর্শ করানো কঠিন। চিন্তা ঘুমের স্রোতে ভাসিয়া গেল, যোগমায়ার জগৎ পুনরায় অন্ধকারে ডুবিয়া গেল।

৬

তৃতীয় বার শ্বশুরবাড়ী আসিয়া যোগমায়া কল্পলোক হইতে মাটিতে পা দিল। একটি বৎসরের পরমায়ুক্ষয়ে পিসিমা ও শাশুড়ী ঈষৎ ন্যুব্জ হইয়াছেন। পিসিমা মাথায় পূর্ব্বের মতই ঘোমটা টানিয়া ঘরের মধ্যে ধীর গতিতে চলাফেরা করেন, শাশুড়ী পূর্ব্ববৎ সংসারের শৃঙ্খলাবিধানে নিবিষ্টচিত্ত। বয়স বাড়িয়াছে বলিয়াই তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা মুখরা হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অপরাহ্ণে যোগমায়ার হাতে গঙ্গাজলের ঘটি দিয়া বলিলেন, দুয়োরে জলের ছিটে দিয়ে পিদীমটা জ্বেলে ফেল। সন্ধ্যে দেখিয়ে শাঁক বাজাবে, তার পর ধুনোর ধোঁয়া এঘর ওঘর দেবে। তোমার কাজ বুঝিয়ে দিয়ে তবে আমার ছুটি।

অনভ্যস্ত করে যোগমায়া দুয়ারের ঝনকাঠে জলের ধারা দিল, চকমকি ঠুকিয়া প্রদীপ জ্বালিল। এ-ঘর ও-ঘর উঠান ও তুলসীমঞ্চে আলো দেখাইয়া শাঁকে ফুঁ পাড়িল। মনে হইল, এইটিই সব চেয়ে কঠিনতম কাজ। গাল ফুলাইয়া চোখ দিয়া জল বাহির করিয়া প্রাণপণে ফুঁ দেওয়া সত্ত্বেও শাঁক বিন্দুমাত্র শব্দ করিল না। যোগমায়া দারুণ লজ্জায় মরিয়া হইয়া পুনরায় সজোরে ফুঁ পাড়িল। শাঁখের আওয়াজ বাহির হইল না, একটা চাপা ফুৎকার-ধ্বনি ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। হরিনামের মালা হাতে শাশুড়ী শঙ্খধ্বনির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। চাপা ফুৎকারধ্বনিতে মালা কপালে ঠেকাইয়া তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, আ আমার কপাল, অমনি করে ফুঁ পাড়ে বুঝি? আস্তে আস্তে সবটা ফুঁ শাঁখের মধ্যে না দিলে বুঝি শাঁক বাজে? বেয়ান কি তোমাকে শাঁকটাও বাজাতে শেখান নি বৌমা?

শাঁখ হাতে লইয়া তিনি বাজাইবার কৌশল শিখাইয়া দিলেন। যোগমায়া মরমে মরিয়া গেল।

ধূনা দেওয়া প্রভৃতিতে আর গোল বাধিল না। রাত্রিতে রুটি বেলিবার কালে যোগমায়া আর একবার ফাঁপড়ে পড়িল। শাখ বাজাইবার মত বৃথা প্রয়াসে সে নিজেকে অপ্রস্তুত না করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, আমি তো রুটি বেলতে পারি না, মা।

শাশুড়ী বিস্ময়ে খানিকক্ষণ তাহার পানে চাহিয়া কহিলেন, রুটি বেলতে জান না?

যোগমায়া তাড়াতাড়ি বলিল, আমরা ত রাত্তিরে রুটি খাই নে, ভাত খাই।

শাশুড়ী হাসিয়া বলিলেন, তবে রুটি বেলাটা আমার কাছেই শেখ। এই এমনি করে নেচি ময়দার গুঁড়ির ওপর চেপটে চাকিতে রাখবে। তার পর বেলন দিয়ে—এমনি করে বেলতে থাকবে।

পরদিন দুপুর বেলায় যোগমায়া চুপি চুপি পিসিমাকে বলিল, আমায় তরকারী রান্না শিখিয়ে দেবেন পিসিমা?

পিসিমা বলিলেন, কি তরকারী, মা?

সব। আমি তো কিছু জানি নে, পিসিমা। রাশভারী শাশুড়ীর কাছে যোগমায়া এমন অসঙ্কোচে কথা বলিতে পারে না। পিসিমাকে সে সত্যই ভালবাসে।

পিসিমা বলিলেন, ধর চচ্চড়ি রাঁধতে কি কি মশলা দিতে হয়। সরষে বাটা, লঙ্কা বাটা—

যোগমায়ার ভাগ্য ভাল—শাশুড়ী এক দিনও তাহাকে হেঁসেল-ধারে ঘেঁষিতে দিলেন না। যোগমায়াও বিশেষ আগ্রহ দেখাইল না।

রোজই সে মনে মনে প্রার্থনা করে, হে হরি, শাশুড়ীর শরীর যেন ভাল থাকে। তিনি যেন রন্ধনের ভার যোগমায়ার স্কন্ধে না চাপান। এবার বাপেরবাড়ী গিয়া তাহার সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হইবে রন্ধনবিদ্যা আয়ত্ত করা। সত্যই তো, এ বিদ্যা না জানা থাকিলে স্ত্রীলোকের লজ্জার সীমা-পরিসীমা থাকে না।

শ্বশুরবাড়ীতে যোগমায়ার মন এবার বসিতেছে ন। রামচন্দ্র নাই। কোন্ পোষ্ট আপিসে তাহার চাকরি হইয়াছে। আজ এখানে কাল সেখানে বেদের মত টোল ফেলিয়া তাহার দিন কাটিতেছে। এমন আপিস, ছুটি নাই। যোগমায়া যে এ-বাড়ীতে আসিয়াছে—সে খবরটাও কি সে পায় নাই? এমন চাকরি না করিলেই বা কি ক্ষতি হইত? শ্বশুরবাড়ী যে এমন খারাপ লাগিতে পারে, এ-কথা যোগমায়া পূর্ব্বে একবারও বুঝিতে পারে নাই। বুঝিতে পারিলে সে ইহার ত্রিসীমানায় পা দিত না।

সকালবেলায় শাশুড়ী বলিলেন, ফুলের সাজিটা নিয়ে ও-বাড়ী থেকে চারটি ফুল তুলে আন, বৌমা। জবা, জুঁই, টগর,—যা পাও। দুব্বো তুলবে। চারটি আলোচাল ভিজিয়ে অর্ঘ্যি থালার একপাশে রাখবে। আহা, আগে এড়া কাপড়খানা ছেড়ে—মাথায় গঙ্গাজল দিয়ে মটকার শাড়ীখানা পর। আমি ভোগ রাঁধব—গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসি। যদি পার, তোমার পিস্‌শাশুড়ীকে নিয়ে নৈবিদ্যিগুলোও করে নিও। হ্যাঁ ভাল কথা, সাদা চন্দন, রক্ত চন্দন ঘষে রাখবে।

ফুল তুলিয়া যোগমায়া বলিল, আমায় নৈবিদ্যি করা শিখিয়ে দিন না, পিসিমা?

শাশুড়ী বাড়ী নাই। পিসিমার নির্দ্দেশমত আলোচাল ভিজাইয়া পিতলের থালায় চূড়াকৃতি করিয়া যোগমায়া নৈবেদ্য সাজাইতে লাগিল। কলার টুকরা, বাতাবী লেবুর টুকরা, শসার টুকরা, ছোলা, মটর ভিজা ইত্যাদি কয়েকটি ফলমূল থালায় ভাগ করিয়া রাখা হইল।

পিসিমা বলিলেন, একটা থালায় লক্ষ্মীর, একটা থালায় নারায়ণের, একটা থালায় কুবেরের, প্যাচার—নৈবিদ্যি কর। পঞ্চ দেবতার নবগ্রহের কুচো নৈবিদ্যি ঐ ছোট রিকিবিখানায় কর। চন্দন ঘষে কলাপাতায় রাখ, সিঁদুর গুলে রাখ, আর দুব্বো একটু আলাদা ক'রে রাখ। বাঃ, বেশ হয়েছে। পানি-শঙ্খে জল ভরে বাঁ পাশে রাখ, উঁহু ঘণ্টা রাখতে হবে না, লক্ষ্মীপূজোয় ঘণ্টা বাজায় না। পঞ্চপিদীমে তুলোর সলতেগুলো ঘিয়ে ভিজিয়ে দাও। হ্যাঁ, পিলসুজটা মাজা আছে তো? রাখ ঐ কোণের দিকে। একটা কলায় গোটা দুই ধূপ গেঁথে রাখ—পূজোর সময় জ্বেলে দেবে। বাঃ, বেশ পঞ্চমুখী জবাফুল পেয়েছ তো। মা লক্ষ্মীর কি মহিমে, পোষ মাসে, চোত মাসে, ভাদ্দর মাসে যখনই পূজো হয়—জবাফুল যেন আপনি ফোটে।

একটা বড় বাটিতে পিটুলি গুলিয়া ফরসা একখানি ন্যাকড়া তাহাতে ডুবাইয়া পিসিমা আলিপনা দিতে বসিলেন।

যোগমায়া মুগ্ধ নয়নে তাঁহার আলিপনা দেওয়া দেখিতে লাগিল। পিসিমা বৃদ্ধা হইয়াছেন, তবু তাঁহার দ্রুত সঞ্চরমান করাঙ্গুলির বিচিত্র স্পর্শে কেমন লতাপাতা, পদ্মফুল, মরাই প্রভৃতি জন্মলাভ করিতেছে। খোয়া-ওঠা রুক্ষ মেঝে—তবু আলিপনার সৌন্দর্য্যে সে মেঝেকে অপরূপ বলিয়া বোধ হইতেছে।

যোগমায়া মাঝে মাঝে প্রশ্ন করিতেছে, ঐ মরাইয়ের গায়ে মই আঁকলেন—তার পাশে এক জোড়া পা আঁকলেন কেন?

পিসিমা বলিলেন, মা লক্ষ্মীর ছিচরণ, মা। ওঁর

দৌলতেই মানুষের যত কিছু বাড়বৃদ্ধি! জান মা তো এ-বাড়ীর কথা। এমন এক সময় ছিল—যখন মা লক্ষ্মী উথলে পড়তেন এ-বাড়ীতে।

আপনারা দেখেছেন? আগ্রহে যোগমায়া প্রশ্ন করিল।

দেখেছি বৈকি, মা। আমার বাবার আমলেই দোল-দুর্গোচ্ছব দেখেছি, আবার তাঁর আমলে হাতীতে-খাওয়া কদ্‌বেলের মত অবস্থাও দেখলাম। একজন্মে অনেক দেখা হয়েছে, মা। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি আলপনা দিতে লাগিলেন। ঘর ছাড়িয়া পিসিমা উঠানে নামিলেন। গোময়লিপ্ত পরিষ্কার উঠান,—সাদা আলিপনা উঠানটিকে শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিতেছে। যোগমায়া নীরবে পিসিমার অনুসরণ করিতে লাগিল।

খানিক থামিয়া পিসিমা বলিলেন, বাবা ছিলেন এ অঞ্চলের নামী লোক। গেরামের আধখানা ছিল তাঁর—সব নাখরাজ জমি। এক পয়সা খাজনা দিতে হ'ত না। তাঁর টাকা ছিল অনেক, লোককে ধারও দিতেন। দেখচ না, বাড়ীখানা আমাদের বনের মধ্যে। তখন ডাকাতের ভয় ছিল কি না, তাই শত মধ্যিখানে বাড়ী করেছিলেন। পুবদিকে কায়েতদের বাড়ী, উত্তুরে কামারেরা ক-ভাই ছিল, দক্ষিণে দুলে-বাগ্দীরা—তিন-চার ঘর খাজনা-করা পেরজা ছিল, আর পশ্চিমে তোমার জেঠ্‌শ্বশুররা থাকতেন। আপন জেঠা নন, পাড়া সম্পর্কে। কিন্তু আপন জ'ও এমন হয় না। আর ঐ উত্তুর-পশ্চিম কোণে থাকত বেনেরা। আজ সবাই মরে হেজে গেছে, কেউ বাস উঠিয়ে দেশান্তরী হয়েছে—তাই বনের মাঝখানে বাড়ীখানা মনে হয়।

একটু থামিয়া বলিলেন, তিনিই তো চালাঘর ঘুচিয়ে কোঠাঘর তুললেন—দু'খানা। চোরের ভয়ে বেশী দুয়োর-জানালা রাখেন নি। সেকালের কোঠাঘর—কতলোক যে দেখতে আসত। শুধু কি তাই, নীলকুঠীর আয় ছিল, গোটা দুই আমবাগান—একটা পুকুর ছিল।

উঠানের আলিপনা প্রায় শেষ করিয়া পিসিমা উত্তরমুখী হইলেন। এই দিকে বাড়ী ঢুকিবার বড় দরজা। দরজার ঝন্‌কাঠে নক্স' কাটিতে কাটিতে বলিলেন, বাইরে দোল-দুর্গোচ্ছব চালাতেন—ভেতরে ফোঁপরা হয়ে আসছিল। যে-সব গরিব লোক টাকা ধার নিত—সুদ দেওয়া চুলোয় যাক, আসলই শুধতে পারত না! তাঁর ছিল দয়ার শরীর। বলতেন, ওদের পীড়ন করব না, সময় ভাল হইলে দেবে বৈ কি। আবার এমনি কপাল, পালবাবুদের সঙ্গে মোকদ্দমা করে টাকা হুড়হুড় করে জলের মত বেরিয়ে গেল। বাগান দু-খানাও রক্ষে হল না। নাখরাজ জমি—দলিল-পত্র দেখাতে পারলেন না, ওরা দলিল জাল করে ওদের আমবাগানের সঙ্গে আমাদের আমবাগান দু'টোও এক করে নিল। দেনার দায়ে পুকুর বিকুলো, শুধু নীলকুঠী রইল। বেচবার উপায় ছিল না বলে।

কেন?

ও যে সাহেবদের মৌরসীপাট্টা দেওয়া। খাজনা ছাড়া ওর উপস্বত্ব পাবার জো ছিল না। সায়েবরা ভারি গোঁয়ার—নামমাত্র খাজনা দিত—সে জমি কিনতে চাইল না।

দুয়ারের বাহিরে গোময়লিপ্ত জমির উপর বড় মরাই আঁকিতে আঁকিতে তিনি বলিলেন, তারপর শোন মা। বাবা শোক সামলাতে পারলেন না। বিছানায় পড়লেন। সেই শোওয়াই তাঁর শেষ শোওয়া। মরবার আগে বললেন, সদু, তোদের আমি পথে বসিয়ে চললাম মা।

অতীত কথা স্মরণে পিসিমার চক্ষুও অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইল। আঁচলে চোখ মুছিয়া ধরা গলায় তিনি বলিতে লাগিলেন, বাবার মিত্যুর পর আমাদের অগ্নিপরীক্ষে আরম্ভ হ'ল, মা। পানু—তোমার শ্বশুর—তখন পাঁচ বছরের, আমার বয়স দশ। মা একলা বিধবা মানুষ—কি করেন। বাপেরবাড়ী থেকে দিদিমা এসে মেয়ে আগলাতে লাগলেন। আমার শ্বশুর ছিলেন দেবতুল্যি লোক, উনি বুক দিয়ে না পড়লে বাড়ীঘর কিছুই রক্ষে হ'ত না।

তার পর?

আর তো কিছুই রইলো না, নীলকুঠীর চব্বিশ-পঁচিশ টাকা খাজনা বছরে পাওয়া যেত। তাই কি সাহেব সহজে দিত। যে বজ্জাত ওরা। চাবুক মারব বলে ভয় দেখাত, কুকুর লেলিয়ে দিত। বলত, ভাগো, নেই মিলেগা।

তবে টাকা আসত কি করে?

আমার শ্বশুর আদায় করতে পারতেন না। বাবাও তার আগে আনতে পারেন নি এক বছর। চার-পাঁচ বছরের খাজনা বাকি ছিল। আমার শ্বশুর খুব চালাক ছিলেন। তোমার শ্বশুরের বয়স তখন ছ' বছর। একদিন মতলব করলেন কি,

ওকে দিয়েই খাজনা আদায় করবেন। যে মতলব সেই কাজ। নীলকুঠীর বাইরে একটা গাছ তলায় তিনি দাঁড়িয়ে থাকতেন, আর তোমার শ্বশুর—ওই ছ' বছরের ছেলে কুঠীতে ঢুকতো। সায়েবরা ভয় দেখাত, কুকুর লেলিয়ে দিত—সে ভয় না পেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতো—এক ধারে। শেখানো ছিল কি না—টাকা না নিয়ে নড়বি নে। সায়েবরা খুশী হয়ে হা—হা করে হাসতো। বলতো, কি চাই বাবু। তোমার শ্বশুর বলতো, খাজনা। সায়েব বলতো, খাজনা কি হবে, একটা মাছ নিয়ে যাও। ছেলেমানুষ তো! মাছ দিয়ে ভুলিয়ে ওরা তোমার শ্বশুরকে ফেরৎ পাঠাত। মাছ দেখে আমার শ্বশুর বলতেন, আর একবার যাও ধন, বলগে—ঘরে টাকা নেই, শুধু মাছ খাব কি দিয়ে। তোমার শ্বশুর আবার যেতেন। কথা শুনে সায়েবরা খুশী হয়ে এক সঙ্গে দশ-বিশ টাকা দিয়ে দিত। ছোট ছোট ছেলেকে ওরা ভারি ভালবাসে কিনা।

পিসিমার গল্প হয়ত আরও খানিকক্ষণ চলিত। কিন্তু গঙ্গাস্নান সারিয়া শাশুড়ী আসিয়া পড়িবেন—এই আশঙ্কায় দুই জনেই তাড়াতাড়ি অন্যান্য কাজগুলি সারিতে লাগিলেন।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে পিসিমা সংক্ষেপে বলিতে লাগিলেন, সে একদিন গেছে মা। চারি দিকের পাঁচীল ভেঙে ইঁট বিক্রী করে মা আমার নাবালক মানুষ করেছিলেন। তোমার বিয়ের পর সেই পাঁচীল আবার উঠলো। তাও ধারকর্জ্জে—

পিসিমা হঠাৎ থামিয়া গেলেন। নূতন বধূ ও বালিকা বধূর কাছে অনেকখানি তিনি বলিয়া ফেলিয়াছেন। তাহাকে দুঃখের মধ্যে আর টানিয়া আনা কেন? ছেলেমানুষ, কিছুই হয়ত বুঝিবে না, মাঝে হইতে মন খারাপ করিয়া বসিবে।

শাশুড়ী গঙ্গাস্নান সারিয়া আসিয়া পিসিমাকে বলিলেন, ঠাকুরঝি, গোবিন্দর মা, হরিপদর পিসি, আর দ্বারিকের বৌকে বলা হয়েছে তো? অড়র ডালের খিচুড়ী—পাঁচ রকম ভাজাভুজি—আর একটু পায়েস নামিয়ে তাড়াতাড়ি ভোগের ব্যবস্থা করি। পুরুতঠাকুর কি আর দু'বার করে নারায়ণ নিয়ে আসবেন? আজ তো অনেক বাড়ীতেই পুজো আছে।

সকাল হইতেই বেশ লাগিতেছে যোগমায়ার। কাজের তাড়ায়, একটা নূতন কিছু দেখিবার আগ্রহে—ভাদ্র মাসের চড়া রৌদ্রকেও পিঠ পাতিয়া খুশী মনে গ্রহণ করিতে ভালই লাগিতেছে।

নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গোবিন্দর মা ও হরিপদর পিসি পূর্ব্বেই আসিয়াছেন। তাঁহারা বিধবা মানুষ। শুদ্ধাচারে পূজার দ্রব্যসামগ্রী এটা-ওটা আগাইয়া দিয়া সাহায্য করিতেছেন। পুরোহিতের জন্য এক ঘটি জল ও গামছা রোয়াকের যেখানে ছায়া পড়িয়াছে সেইখানটায় রাখা হইল। নারিকেল-ছোবড়ায় আগুন দিয়া ধুনচির মধ্যে ভরিয়া দেওয়া হইল, পিলসুজের উপর প্রদীপও জ্বলিল। চন্দন, ফুল, ধূপ, নৈবেদ্য ইত্যাদি মিলিয়া বেশ একটি স্নিগ্ধ ও পবিত্র গন্ধ পূজাগৃহ হইতে বাহির হইতেছে। মা লক্ষ্মী এমন শুচিশুভ্রতার মধ্যে কেনই বা নিজের আসনখানি বিছাইয়া পূজার দিনটিকে সার্থক করিবেন না?

পূজা তখন বসিয়া গিয়াছে। প্রতিমা না থাকিলেও লক্ষ্মীদেবী বেশ সৌষ্ঠবযুক্ত। আলিপনা-দেওয়া জলচৌকির উপর একটি কাঠায় ধান উপচাইয়া পড়িতেছে। চৌকির সমস্তটাই সেই উপচিত ধান্যে ভরিয়া গিয়াছে। বিচিত্র বর্ণের বড় বড় সামুদ্রিক কড়ি ও কাঠের নানা আকৃতির সিঁন্দুর-মাখানো কৌটা চৌকির উপর সাজানো রহিয়াছে। একখানি ছোট লাল চেলি কাঠার উপর ঢাকিয়া দিয়া মা লক্ষ্মীকে অবগুণ্ঠনবতী করা হইয়াছে। চেলির উপর অর্থাৎ সিঁথিতে একটি পঞ্চমুখী জবা শোভা পাইতেছে। একটি সিঁন্দুর-মাখানো মোহর—(টাকাও হইতে পারে, কারণ সিঁন্দুর-চর্চ্চিত হইয়া সেটির গাত্রবর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে) পঞ্চমুখী জবার পাশে সযত্নে সাজানো আছে। ধূপধুনার ধোঁয়ায় ঘর ভরিয়া গিয়াছে এবং সদ্য-রন্ধিত খিচুড়ির সুগন্ধেও সে ঘর আমোদিত হইয়াছে। বিধবারা নাকে কাপড় চাপিয়া রুদ্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে কঠোর ভাবেই শাসন করিতেছেন। ঠাকুরের ভোগের আগে ঘ্রাণ লওয়া নাকি প্রথাবহির্ভূত। পিসিমা পাশে বসিয়া ধুনুচির মুখে একখানি আধভাঙা পাখা দিয়া বাম হাতে বাতাস করিতেছেন ও মাঝে মাঝে ডান হাতের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও বৃদ্ধ অঙ্গুলির সাহায্যে অল্প পরিমাণ ধুনা উঠাইয়া ধুনচিতে নিক্ষেপ করিতেছেন। শাশুড়ী ও-পাশে বসিয়া সঙ্কল্পের পূর্ব্বে নাম, গোত্র ইত্যাদি বলিতেছেন; কখনও বা পুরোহিতকে কোন্ দেবতার কোন্ নৈবেদ্য বা খিচুড়ি ভোগ, দেখাইয়া দিতেছেন।

এমন সময় 'কি গো রামের মা', বলিতে বলিতে

বিনোদিনী ওরফে দ্বারিক গাঙ্গুলীর বৌ আসিয়া দেখা দিলেন। তিনি একা নহেন, সঙ্গে অবগুণ্ঠনবতী এক বধূও আসিয়াছে।

শাশুড়ী যোগমায়াকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, আসন পেতে ওদের ও-ঘরে বসাও না, বৌমা। ওটি অনুকূলের বউ বুঝি? আহা থাক, থাক, এমনিতেই আশীর্ব্বাদ করছি। জন্ম এয়োস্ত্রী হ'য়ে থাক, পাকাচুলে সিঁদুর পর—

যোগমায়ার নির্দ্দেশমত উঁহারা এ ঘরে আসিলেন। গৃহিণীর দেহ মেদবাহুল্যে ভারাক্রান্ত; তার উপর মোটা গহনায় ও চওড়া পাড় শাড়ীতে তাঁহার গৌরবর্ণ খুলিয়াছে ভাল। বয়সকালে তিনি সুন্দরী ছিলেন এবং স্বাস্থ্যবতীও ছিলেন। তবে সৌন্দর্য্যের নমুনা যদি গৌরবর্ণ ও মেদময়তাকে যদি স্বাস্থ্য বলা যায়, তবে এখনও—এই চল্লিশের অপর প্রান্তে পৌঁছিয়াও তিনি সে খ্যাতি হারান নাই বলিতে হইবে। নাক চোখ জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মত, তেমনি মিশ্‌মিশে কালো চুলে প্রকাণ্ড খোঁপা বাঁধা। বউটিকে তাঁহার পাশে মানায় নাই; তেমন বর্ণ থাকিলেও—স্বাস্থ্য নাই, উপরন্ত রোগা বলিয়া যে কয়খানি গহনা হাতে বা গায়ে আছে—তাহা গৌরবের না হইয়া দেহের ভারই বাড়াইয়াছে। ঘোমটা-ঢাকা মুখখানিও কেমন যেন মলিন।

বিনোদিনী বলিলেন, তোমরা দু'টিতে বসে গল্প কর, মা। আমি পুজোটা দেখে আসি। লজ্জা কি, একবয়সী তোমরা—ভাবসাব কর।

তিনি চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে যোগমায়া ধীরে ধীরে বউটির অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল, তোমার নামটি কি ভাই?

রাধারাণী। তোমার নাম?

যোগমায়া। খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকিয়া যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার বাপের বাড়ী?

গয়েশপুর। গয়েশপুরের ত্রৈলোক্য-বাঁড়ুজ্জে আমার বাবা। নাম শোন নি তাঁর?

না তো।

তিনি যে ভাল যাত্রার দল খুলেছেন। এ তল্লাটে বাঁড়ুজ্জে মশাইয়ের দলের নাম জানে না—হেন লোক নেই। তাইত বাঁড়ুজ্জে না ব'লে সবাই বলে অধিকারী।

বাঃ। তুমি এবার নিয়ে কবার শ্বশুরবাড়ী এসেছ?

তা বার তিনেক হবে।

আমিও। তোমার বর কি করে ভাই?

কি আবার করবে, টো টো করে বেড়ায়। বলে, তোমার বাবার দলে আমি পালা লিখে দেব। সুন্দর গান বাঁধতে পারে ভাই।

সত্যি? কবির গান বাঁধতে পারে তোমার বর?

হুঁ! আমাকে নিয়ে সেদিন কেমন ছড়া তৈরী করলে!

বলবে ভাই ছড়াটা?

আমার ভাই সবটা মনে নেই। যদি খানিকটা শোন তো বলতে পারি।

বেশ ত বল না।

রাধারাণী আবৃত্তি করিল:

কদমতলায় দাঁড়িয়ে কেন রাধা?
বাঁশীর ডাকে মন যে তোমার বাঁধা।
সাঁজের বেলায় জল আনিতে চল,
থির যমুনার অতল কালো জল,
তোমায় ডাকে—আমায় ডাকে প্রিয়ে
ঘর ছেড়ে তাই বাইরে এলে ধেয়ে।

আর আমার মনে নেই।

তুমি ভাই গান জান?

দূর, গান গাইতে আছে শ্বশুরবাড়ী! সবাই নিন্দে করবে না!

তোমার বর বাসরঘরে গান গেয়েছিল?

কি জানি, মনে নেই। আমি তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোর বেলায় ঘুম ভেঙে দেখি, রাঙা-ঠান্‌দি ভাঙা গলায় গান ধরেছেন।

আর একটু কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়া যোগমায়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, আর একটা কথা বলব ভাই কানে কানে।

রাধারাণী হাসিয়া বলিল, কি কথা? বরের কথা বুঝি?

যোগমায়ার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিল, হাঁ।

রাধারাণী বলিল, তোমাকেও কিন্তু বলতে হবে ভাই। ফাঁকি দিয়ে যে আমার কথাটি শুনে নেবে—

ফিস্ ফিস্ করিয়া দুই নববধূতে কথা আরম্ভ হইল। ঘরের দেওয়ালের কান থাকিলেও সে কথা শোনা দুষ্কর। কিন্তু গুরুজনে ভরা বাড়ী, ইঁহারা নবাগত প্রাণী এবং আলোচনাটিও এমন একটি ব্যক্তি সম্বন্ধে যাহাকে রাত্রির নিরালা মুহূর্ত্তে নিতান্ত আপনার জন বলিয়া ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়।

তাঁহার সঙ্গে অন্তরঙ্গতার কথা, সুতরাং সে অন্তরের কথাকে দরদী অন্তর ভিন্ন মেলিয়া ধরিবার উপায়ই বা কই?

পূজা শেষ হইলেও দুই বধূর অজস্র-উৎসারিত কথার শেষ যেন আর হয় না। রাধারাণীর অভিজ্ঞতা বিচিত্র, যোগমায়ার চেয়ে সে বছর দুইয়ের বড় হইবে। তাহার কথাই যোগমায়াকে শুনিতে হইল সর্ব্বক্ষণ। এবং তাহার কথা শুনিয়া মনে হইল, উহাদের ভালবাসাই সার্থক। অনাস্বাদিতপূর্ব্ব যে ভালবাসার বিন্দুবাষ্পও যোগমায়া জানে না, রাধারাণীর অন্তর তাহারই ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। যে-উজ্জ্বল আলোকে রাধারাণীর নবীন জীবনের গতি আরম্ভ হইয়াছে—তাহারই বৃহৎ ও গাঢ় ছায়ার তলে যোগমায়া এখনও সুপ্তিমগ্ন।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। জানালা দিয়া উঠানের আম কাঁঠাল গাছ সেই আলোয় অদ্ভুত দেখাইতেছে। কাঁঠালের মসৃণ পাতায় জ্যোৎস্না যেন পিছলাইয়া পড়িতেছে। গুমোটভরা ভাদ্রমাস, হাওয়া কোথাও নাই। উঠানের সাদা আলিপনা জ্যোৎস্নার শুভ্রতায় মিশিয়া নিশ্চিহ্ন হয় নাই। শাখাজালনিবদ্ধ আমকাঁঠালের নিবিড় ছায়ার ফাঁকে উপরের যে খণ্ড খণ্ড আলো উঠানটিতে নূতন আলিপনা আঁকিয়াছে—তাহারই কোণে ওবেলাকার আলিপনা নবরূপে সমৃদ্ধ হইয়াছে। যোগমায়া অন্য দিন ঘুমাইয়া পড়ে, আজ সে জাগিয়া জাগিয়া আকাশের গায়ে চাঁদের দৌড়াদৌড়ি দেখিতেছে, গাছের পত্রান্তরালে পলাতক অন্ধকারের গাঢ়তা লক্ষ্য করিতেছে এবং নবপরিচিতা বউটির কথাও ভাবিতেছে। অন্তরের দৈন্য বাহিরের বেশভূষায় সব সময়েই কি প্রকটিত হয়? কথা কহিবার সময় বউটির মুখের মালিন্য কোথায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। স্বামীর কথা বলিতে বলিতে সে মুখ প্রভাতের পদ্মফুলের মতই প্রফুল্ল দেখাইতেছিল। তাহার স্বামী তাহাকে লইয়া পালা গান লেখে—তাহাকে কত প্রকারে আদর করে—সর্ব্বক্ষণ (মানে সারারাত্রি) সঙ্গ দিয়া কৌতুক-হাসিতে সময় কাটাইয়া দেয়।

যোগমায়া সন্তর্পণে বিছানা হইতে উঠিল। আঁচলের গ্রন্থি হইতে চাবি লইয়া বাপেরবাড়ীর দেওয়া কাঠের বাক্সটি খুলিল। অন্ধকারে খানিকটা এধার-ওধার হাতড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে একখানা কাগজে তাহার হাত ঠেকিল। একখানি চিঠি। সুবাসে ভরা। বিলাতী এসেন্সের উগ্র গন্ধে মাথাটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। বেশ তীব্র অথচ মিষ্ট গন্ধ। চিঠির কাগজ নাকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া সেই গন্ধের তীব্রতাকে যোগমায়া মস্তিষ্ক দিয়া সারা দেহে সঞ্চারিত করিয়া দিল। ধীরে ধীরে আবার সে বাক্স বন্ধ করিল। রাত্রিতে আলো জ্বালা নিষেধ। নিষেধ না থাকিলেও শাশুড়ী জাগিয়া উঠিতে পারেন। কাল মধ্যাহ্নে কিংবা সকালের কোন এক নিরালা-মুহূর্ত্তে চিঠিখানা আর একবার সে পড়িবে।

বৎসরখানেক হইল যোগমায়া প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ শেষ করিয়াছে।

কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ শেষ করিলেই কিছু চিঠির উত্তর দেওয়া চলে না। এই সব উচ্ছ্বাসভরা কথার অর্থ যোগমায়ার হৃদয়ঙ্গম হয় না। বেশ সোজা কথায় লিখিলেই তো হয়—তুমি কেমন আছ? প্রাণ সত্যই কিছু তাহার ফাটিয়া বাহির হইবার উপক্রম হয় নাই। প্রাণের অস্থিরতা তখনই বৃদ্ধি পায়—বাপেরবাড়ী হইতে অনেক দিন যদি কোন সংবাদ না আসে। অগ্রহায়ণে যোগমায়া বাপেরবাড়ী যাইবে। নলেন গুড়ের সন্দেশ ও নিখুঁতি সঙ্গে না দিয়া বউ পাঠাইলে নাকি শাশুড়ীর নিন্দা রটিবে। বেশ তো, কালই যদি অগ্রহায়ণ আসে তো মন্দ কি!

স্বামীর চিঠি আজ চার দিন প'ড়িয়া আছে। পড়া হইয়াছে, ভাল মানে বুঝা যায় নাই। শাশুড়ী বা পিস্‌শাশুড়ীর কাছে ত চিঠির পাঠ বুঝাইয়া লওয়া চলে না। শীঘ্র করিয়া অগ্রহায়ণ না আসিলে যোগমায়ার চলে কি করিয়া? সে ব্যক্তিটি হয়ত ভাবিবে, এমন বউ তাহার যে চিঠির উত্তর দিবার বিদ্যাটুকুও সঞ্চয় করে নাই। হাঁ, ছিল বটে বিবাহের সময়, বর্ণপরিচয়ের বোধ তাহার ছিল না। কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যে যুক্তাক্ষরের জাল ভেদ করিয়া যোগমায়া যে বাংলা ভাষার মনোরম উদ্যান-সীমানায় আসিয়া পড়িয়াছে—সে সংবাদ তো রামচন্দ্র জানে না!

রাধারাণীর সঙ্গে ভাব হইবার পরক্ষণেই তাহার মনে হইতেছে, বুঝি বিধাতা এতদিনে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। সে দুই বৎসরের বড়, সে অনেক জানে। কবিতা দিয়া চিঠিও হয়ত লিখিয়া দিতে পারে। না-হয় একখানা গানও তো দিতে পারিবে। কিন্তু কেমন করিয়া রাধারাণীর সঙ্গে আবার তাহার দেখা হইবে? উপলক্ষ একটা

কিছু চাই। লক্ষ্মী পূজা কালই তো হইবে না। কিংবা শাশুড়ীর অনুমতি না পাইলে রাধারাণীও এখানে আসিতে পারিবে না। বাপেরবাড়ী হইলে এই রাত্রিতেই এক দৌড়ে সে রাধারাণীর দুয়ারে ধাক্কা মারিয়া ডাকিত, ও রাধুদিদি, দুয়োর খোল না গো? ও দিদি—

বউমা, বউমা, অমন গোঁ গোঁ করছ কেন? শাশুড়ী তাহার গায়ে ঠেলা দিয়া ডাকিলেন। যোগমায়া ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিল। সবটাই স্বপ্ন? না তো! নাকে সেই ভুরভুরে মিষ্ট গন্ধটা এখনও যেন লাগিয়া আছে, আর হাতের মুঠায় সেই চিঠিখানা। কি লজ্জার কথা! তাড়াতাড়ি বুকের কাপড়ের মধ্যে চিঠিখানাকে চালান করিয়া দিয়া যোগমায়া নিদ্রাকাতর কণ্ঠে কহিল, উঃ, না তো।

পাশ ফিরে শোও। খারাপ স্বপন দেখলে গোবিন্দ—গোবিন্দ বলবে। বলিতে বলিতে শাশুড়ী ঘুমাইয়া পড়িলেন।

যোগমায়া ঠিক করিল, রাধারাণীর সঙ্গে দেখা করিবার কথা একবার পিসিমাকে বলিলে কেমন হয়। কালই সে সে-কথা পিসিমাকে বলিবে।

পিসিমার চেষ্টায় দু'টি বউয়ের মিলন ঘটিল। বেলা তিনটা; খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। আহারের পর শাশুড়ী একটু গড়াইয়া লন। মেঝেয় আঁচল পাতিয়া তিনি আলস্য উপভোগ করিতেছেন। পাশের ঘরে দুই বউ মিলিয়া মৃদুস্বরে আলাপ করিতেছে। দক্ষিণ দিকের ছোট ঘরখানিতে পিসিমা ঘ্যানর ঘ্যানর শব্দে চরকা কাটিতেছেন। দুপুরের রৌদ্র যখন তীব্র হইয়া উঠে, আকাশে চিলের ডাক ও জলটুনটুনি পাখীর টুন্ টুন্ শব্দ সেই নিস্তব্ধ দুপুরের বুকে ভারি মিষ্ট শোনায়, আর মিষ্ট লাগে চরকার ঘ্যানর ঘ্যানর আওয়াজ। যেন কয়েকটা কালো ভোমরা অশ্রান্তভাবে পাখার গুঞ্জন তুলিয়া ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের চোখে নিদ্রার কালো কাজলরেখা টানিয়া দেয়।

রাধারাণী বলিল, কই তোমার চিঠি দেখি?

আঁচলের প্রান্ত হইতে সন্তর্পণে চিঠিখানি খুলিয়া যোগমায়া রাধারাণীর হাতে দিল।

রাধারাণী চিঠিখানি নাকের কাছে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, বেশ মিষ্টি গন্ধ। তোমার বর বুঝি এসেন্ ভালবাসে?

যোগমায়া ঘাড় নাড়িল।

চিঠি খুলিয়া রাধারাণী পড়িতে লাগিল। এক এক লাইন পড়ে—আর মুখচোখ তাহার উজ্জ্বল হইয়া উঠে, কামারের হাপরে ভস্ত্রার চাপে যেমন আগুনের হাসি দেখা যায়। এক সময়ে সে হাসিতে হাসিতে যোগমায়ার গায়ে লুটাইয়া পড়িল। কহিল, মা গো মা, তোমার বরটি ভারি বেহায়া।

কেন? কেন? চিঠির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া যোগমায়া প্রশ্ন করিল।

এই দেখ না, এইখানটায় কি লিখেছে। তা ভালবাসে বটে, তোমাকে খুব ভালবাসে।

যোগমায়া কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, তা অত কথা কি লিখেছে?

ওই ভালবাসারই কথা। আমিও সব মানে ভাল বুঝতে পারছি নে, উনি পড়লে ঠিক বলে দেবেন।

দূর! যোগমায়া চিঠিখানি তাহার হাত হইতে ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইল।

রাধারাণী হাসিয়া বলিল, আমি যেন তাকে এখনই দেখাচ্ছি আর কি! ইস্, ভয় দেখ না মেযের!

না, ভয় করে না বুঝি? তোমার চিঠি দেখাতে পার ওদের?

আমার তো চিঠি নেই। কাছেই বাপের বাড়ী, উনিও বিদেশে যান নি কখনও, চিঠি কোথায় পাব ভাই? একখানিও চিঠি না থাকার দুঃখে রাধারাণী মুখখানা ম্লান করিয়া রহিল।

যোগমায়া বলিল, তাহ'লে উত্তুর লেখাব কাকে দিয়ে, ভাই?

কেন, চিঠি পাই নি বলে—তোমার উত্তুরটাও লিখে দিতে পারব না? দেখি কাগজ কলম?

যোগমায়া কাগজ, কলম ও বালির পুঁটুলি আগাইয়া দিল। রাধারাণী পত্র-রচনায় মনোনিবেশ করিল। অনেকখানি সময় লাগিল পত্র রচনায়। রোয়াকের রোদ সরিয়া গেল, ও-বাড়ীর সজিনা গাছের অন্তরালে সূর্য্যদেব ঢলিয়া পড়িয়াছেন। এখনই শাশুড়ী জাগিয়া উঠিবেন। হে হরি, আর খানিকক্ষণ যেন উঁহার নিদ্রা না ভাঙ্গে! মাঝে মাঝে সে রাধারাণীকে তাড়া দিতে লাগিল, হ'ল ভাই, বড্ড দেরি করছ, মা এখুনি উঠে পড়বেন!

এই হ'ল। বলিয়া রাধারাণী পড়িল, ইতি সেবিকা তোমার শ্রীচরণের দাসী—সবটা পড়ব?

পড়।

যোগমায়ার ভালই লাগিল পত্র। রাধারাণীর লিখিবার ক্ষমতা আছে। চিঠির মধ্যে ভালবাসার

কথা আছে অনেক বার, ছড়া আছে দু'টি, একটি গানের দেড়খানি লাইনও সে লিখিয়া দিয়াছে এবং আর যাহা আছে তাহা সত্যই দুর্বোধ্য। চাঁদ, বসন্তকাল, মলয় পবন, প্রাণ হু-হু করিয়া জ্বলা, এমনি আরও অনেক কথা। যেমন উনি চিঠি লিখিয়াছিলেন, তেমনই জবাব দিতেছে যোগমায়া।

রাধারাণী খামের মধ্যে চিঠি পুরিতে পুরিতে বলিল, ইংরিজী ঠিকানা যে আমি লিখতে জানি নে ভাই। ওঁকে দিয়ে লিখিয়ে দেব, কেমন?

কিন্তু তোমার বর যদি চিঠি পড়েন?

দূর, তোমার চিঠি সে পড়বে কেন।

না ভাই, আমার মাথা ছুঁয়ে তিন সত্যি কর—এ চিঠি তাঁকে পড়তে দেবে না।

না না না। হল তো? রাধারাণী উঠিল।

আবার কবে আসবে ভাই?

আর দু-এক দিন পরে। কই ভাই, তোমার পিসিমাকে বল, আমায় পৌঁছে দিয়ে আসুন।

পত্রের উত্তর শীঘ্রই আসিল। পিওন চিঠি বিলি করিবার কালে হাঁক দিল, আপনাদের চিঠি রৈল গো মাঠাকরুন।

যোগমায়ার শাশুড়ী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া চিঠিখানি চৌকাঠের উপর হইতে তুলিয়া লইলেন। চিঠির আকৃতি দেখিয়া তিনি হাঁকিলেন, ও বউমা, রাম বোধ হয় চিঠি দিয়েছে। দেখত মা।

লজ্জায় যোগমায়া বাহির হইতে পারিল না। স্বামীর চিঠি কি শাশুড়ীর হাত হইতে লওয়া যায়?

যে ঘরে বসিয়া যোগমায়া কুটনা কুটিতেছিল, তাহার দ্বারপ্রান্তে চিঠিখানি রাখিয়া শাশুড়ী বলিলেন, কেমন আছে একবার জানিও বৌমা। ডালটা না সাঁতলালে এখনই ধরে পুড়ে যাবে।

পুষ্পসার সুরভিত চিঠি। সেই পরিচিত গন্ধ, তেমনই তীব্র অথচ মধুর। খামখানাও ভারি-ভারি বোধ হইতেছে।

আলুর খোসা ছাড়ানো শেষ হইলে যোগমায়া চিঠিখানা আদ্যোপান্ত পড়িল। অদ্ভুত চিঠি। কতকগুলি কবিতা, গান ও দুর্বোধ্য কথার সমষ্টি। অতবড় পত্র—যোগমায়া বিন্দু-বিসর্গও বুঝিতে পারিল না। লেখকের কুশল-সংবাদ কিছু নাই! যেমন পত্র দিয়াছিল যোগমায়া, তেমনই কঠিন তার প্রত্যুত্তর। রাধারাণীর লিপিকুশলতার সুযোগ লইয়া রামচন্দ্র রীতিমত দুর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। সে যে শারীরিক কেমন আছে, সে সংবাদটিও দিতে ভুলিয়াছে। মনের অবস্থা তাহার শোচনীয়—হয় ত শরীরটা খারাপ বলিয়া।

শাশুড়ী রান্নাঘর হইতে হাঁকিলেন, রাম কেমন আছে, বৌমা?

চিঠি হাতে যোগমায়া রান্নাঘরের দুয়ারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, ভাল।

হুঁ, আর কিছু লেখে নি?

না।

তা লিখবে কেন, সেই যে কথায় বলে, 'পরের ছুলো খায়, আর বনের পানে চায়।' এও হয়েছে ঠিক তাই। মাকে এক ছত্তর লিখে পেরনাম জানাতে তার হাত ব্যথা করে বুঝি?

কঠিন অভিযোগ। যোগমায়া অপরাধিনীর মত সরিয়া আসিল। শাশুড়ী সজোরে খুন্তি নাড়িতে নাড়িতে আরও কি সব মন্তব্য করিলেন—তাহা সে শুনিতে পাইল না।

খানিক পরে শাশুড়ী ডাকিলেন, আলু কোটা হ'ল? একটা বাটিতে কোটা আলু আনিয়া যোগমায়া উনানের কাছে নামাইয়া দিল।

শাশুড়ী বলিলেন, আঃ আমার পোড়া কপাল! আলুগুলো না ধুয়েই হেঁসেলে ঠেকালে? বলে, 'আমি যাই বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে।'

যোগমায়া কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিল।

শাশুড়ী বলিলেন, এক কাজ কর, ওই ঘটিতে জল আছে—আলগোছে বাটিতে একটু ঢেলে দাও। বেগুন কোটনি তো—বেগুন? থাক, কাল হবে।

আজ স্নান করিতে গিয়া যোগমায়ার জলের বালতি ভাল করিয়া ধোওয়া হইল না। মাথায় গঙ্গাজলের ছিটা পরিমাণে কম হওয়াতে শাশুড়ী শুচিশীলতা সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা যোগমায়াকে শুনাইলেন। খাইতে বসিয়া জলের ঘটি আলগোছে মুখে তুলিতে গিয়া ঠোঁটে ঠেকিয়া গেল। শাশুড়ীর কড়া মন্তব্যে, কি দুর্বোধ্য চিঠির আক্রমণে, যোগমায়ার আজ সব গোলমাল হইয়া পড়িতেছে, কে জানে! চিঠিটা যদি সব সে বুঝিতে পারিত তো এত হাঙ্গামা বাধিত না। চিঠিটা পাইয়াই তার রাধারাণীর কথা মনে পড়িতেছে, এবং কি করিয়া তাহার সঙ্গে দুপুরের নিরালা মুহূর্তে আর একবার সাক্ষাৎ করা চলে, সেই কল্পনাতেই সে মাতিয়া উঠিয়াছে। পিসিমাকে বার-বার অনুরোধ করিলে তিনি যদি বেহায়া মনে করেন বধূকে? হায়রে, বধূজীবন! বাপের

বাড়ী থাকিলে এ দুর্ভোগ তাহাকে ভুগিতে হইত না।

৭

পঞ্চমীর দিন প্রাতঃকালে শাশুড়ী বলিলেন, আজ বেশ রোদ উঠেছে, ওলের আচারের খোরাটা রোদে দাও দেখি, বৌমা।

আচার রোদে দিয়া যোগমায়া জলের ঘটী লইয়া যেমন হাত ধুইতেছে, অমনই হাত ফস্কাইয়া ঘটী রোয়াকের উপর পড়িয়া গেল। সন্ত্রস্ত যোগমায়া তাড়াতাড়ি ঘটী তুলিয়া লইতে-না-লইতে শাশুড়ী রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া কহিলেন, হাত থেকে ঘটী পড়লো বুঝি?

যোগমায়া কাষ্ঠ-মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। শাশুড়ী হাসিমুখে বলিলেন, কাল চ'কা পাখী ডেকে গেল—আজ ঘটী পড়লো তোমার হাত থেকে—নিশ্চয়ই রাম আসবে। এমন ছেলে সব আজকাল-কার—একখানা চিঠি দিয়েও বলে না, কবে আসবে।

নিজের আনন্দেই শাশুড়ী বলিয়া চলিলেন, তোমার পিস্‌শাশুড়ীকে বল আধকাঠা সোনা-মুগের ডাল ভেজে আজই যেন ভেঙ্গে রাখেন। এক গুটি (কাঁচি-এক পোয়া) ঘি দেখতে হবে গয়লা বাড়ী। পূজো আসছে কিনা, সব জিনিসই মাগ্যি।

যোগমায়ার অন্তরেও বুঝি শাশুড়ীর মনের প্রসন্নতার ছোঁয়াচ লাগিল। এক নিমিষে এই বাড়ীখানার চেহারা বদলাইয়া গেল। শরতের আকাশ সত্যই গাঢ় নীল। বর্ষায় যে আকাশ জলভারে অবনত হইয়া থাকে, শরতের ছোঁয়া লাগিয়া সে কতখানি উঁচু হইয়াছে! স্থলপদ্মের গাছ ভরিয়া গোলাপী ফুল ফুটিয়াছে, কত নূতন রঙের পাখী আসিয়া আম ও কাঁঠাল গাছে কলরব তুলিতেছে। ও পাশের শিউলি গাছটায় অজস্র ফুল, ভারি মিষ্ট গন্ধ বাহির হয় রাত্রিতে। সকালে শিউলিতলা আলো করিয়া সেই ফুল বিছাইয়া থাকে। আঁচল ভরিয়া শিউলি ফুল সংগ্রহ করিয়া তাহার লাল রঙের বোঁটাগুলি কাটিয়া যোগমায়া রোয়াকে শুকাইয়া লয় প্রত্যহ। প্রায় একপেতে শুকনা বোঁটা জমিয়াছে। চারখানা শাড়ী সেই রঙে ছোপানো চলিবে। যে লাল পাড় শাড়ীখানা কাল ছোপানো হইয়াছে, সেখানা পরিলেও তো মন্দ দেখায় না। রামচন্দ্র আসিয়াই যদি দেখে শিউলি রঙের শাড়ী পরিয়া অপরিচিতা একটি মেয়ে এধার-ওধার ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—কি বলিবে সে? চিনিতে পারিবে তো যোগমায়াকে? কিন্তু রাত্রিতে যোগমায়া রামচন্দ্রের সঙ্গে কথা কহিবে না। অমন ভাবে চিঠি লেখা কি তার উচিত হইয়াছে! রাধারাণী যা হাসিয়াছে চিঠি পড়িয়া! দুর্ব্বোধ্য চিঠির সবটা বুঝিতে না পারিয়া রাধারাণী বাধ্য হইয়া তাহার বরের সাহায্য লইয়াছে। কি লজ্জার কথা! তা ছাড়া নিজের মাকে মাসে মাত্র একখানা চিঠি দেওয়া কেন! যেমন যোগমায়ার চিঠি আসে—ঐ সঙ্গে মাকেও কি দু-ছত্রে প্রণামটুকু জানানো চলে না? শাশুড়ী যখন-তখন চিঠির কথা লইয়া যোগমায়াকে কত কথা বলেন! শ্বশুর-বাড়ী না হইলে সে এতদিন অন্যত্র কোথাও চলিয়া যাইত।

পক্ষীদূতেরা অনেক সময় সঠিক সংবাদ দেয়। সেই দিনই দুপুরবেলায় রামচন্দ্রের পত্র আসিল। চারি দিনের ছুটি লইয়া আগামীকল্য সে বাড়ী আসিতেছে।

সত্য সত্য আজ বৈকালে সূর্য্য পাটে বসিবার সময় পশ্চিমের ভাঙ্গা মেঘগুলির মাথায় যা চমৎকার রক্তের ছোপ ধরিয়াছে! এক ঝাঁক সাদা পাখী 'ক্যাঁক' 'ক্যাঁক' শব্দ করিতে করিতে সেই মেঘের গা দিয়া কোথায় উড়িয়া গেল। হয়ত ওদের ঘরে।

পিসিমার সঙ্গে আজ যোগমায়া অনেকক্ষণ গল্প করিল। সেকালের গল্প শুনিতে যোগমায়া ভালবাসে। অতীতকালের লোকেরা চিরদিনই সুখী, চিরদিনই তাঁহাদের রামরাজত্বে বাস। বর্ত্তমান কাল—বড় প্রখর কাল। অনেক আচার-প্রথা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। সোনার কালের (পিসিমার ভাষায়) শতজীবী লোকেরা কি সাধে ধর্ম্ম-অন্ত প্রাণ ছিলেন! যা মুনিঋষি-প্রচলিত বিধান, তাকে মানিয়া চলাতেই জগতের মঙ্গল। কলির শেষে পাপ যখন চারি পোয়ায় পূর্ণ হইবে, তখন কল্কি অবতার সারা পৃথিবীর পাপী লোকগুলিকে তীক্ষ্ণধার তরবারির দ্বারা কাটিয়া কাটিয়া বিদ্যুদ্বেগে তাঁহার শ্বেত-অশ্বটিকে উল্কার গতিতে ছুটাইয়া পাপময় সৃষ্টিকে ধ্বংস করিবেন। তারপর আরম্ভ হইবে সত্য যুগ। সত্য যুগে মানুষের কোন দুঃখ-কষ্ট থাকিবে না। সে অঋণী হইবে, প্রবাসজীবন যাপন করিবে না, সর্ব্বক্ষণের জন্য সরস প্রসন্নতা তার বজায় থাকিবে। এবং···

গল্প শুনিতে শুনিতে যোগমায়া ঘুমাইয়া

পড়িয়াছিল, পিসিমা ডাকিয়া তুলিয়া দিলেন। ভরসন্ধ্যা বেলায় বধূর ঘুম দেখিলে শাশুড়ী এখনই অলক্ষণের আশঙ্কায় আঁতকাইয়া উঠিবেন।

প্রবাস হইতে বাড়ী আসিল রামচন্দ্র। তখন দিনের বেলা। অন্তরালে অবস্থিতি ছাড়া যোগমায়ার উপায় নাই। তোরঙ্গ নামাইবার শব্দ, কাপড়-জামা বাহির করিবার খস্‌খসানি, আর মাতাপুত্রের কথোপকথন পাশের ঘর হইতে যতটা শোনা যায়—যোগমায়া শুনিল। আশ্চর্য্য দেশ! রামচন্দ্রকে নিজেই হাত পুড়াইয়া রাঁধিতে হয়! তরকারী? পুরুষমানুষ কখনও ও-সব রাঁধিতে পারে? তিন দিন ভাতে ভাত খাইয়া—তাও কি ফেনগালা ঝরঝরে ভাত—রামচন্দ্রের শরীর আধখানা হইয়া গিয়াছিল। ভাগ্যে চক্রবর্ত্তী-গৃহিণী ছেলেটির আনাড়িপনা দেখিয়া নিজে হইতে সাধিয়া তাঁহাদেরই বাড়ীতে উহার দুই বেলা দু'টি খাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। বিনিময়ে মাত্র পাঁচটি টাকা তাঁহাকে দিতে হয়। কিন্তু ঐ সামান্য অর্থের বিনিময়ে যে যত্ন তিনি করেন, তাহা নাকি জীবনে ভুলিবার নহে। পোষ্ট-আপিসের কাজ,—সকাল, দুপুর, বিকাল, অষ্টপ্রহরই লাগিয়া আছে। একটা পিওন আছে, সে বাবুর ফাইফরমাশ খাটে। শীতকালে পাটালী গুড়, খেজুর রস, গ্রীষ্মকালে ফুটিটি, তরমুজটি, ভাল জাম, ফলসা বা আমটি আনিয়া রামচন্দ্রকে উপহার দেয়। আষাঢ়ে পেটো অর্থাৎ বড় ইলিস মাছ—নদী হইতে যেদিন সে পায়—একটি লইয়া আসিতে ভোলে না। মাছ পাইয়া চক্রবর্ত্তী-গৃহিণীর নাকি আনন্দ ধরে না। তাড়াতাড়ি ভোঁতা বঁটিখানা পাতিয়া মাছটি তিনি কুটিয়া ফেলেন। আগে আঁশগুলি ছাড়াইয়া জল দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া তবে ইলিস মাছ কুটিয়া পরিষ্কার পাত্রে রাখিতে হয়। কাঁচা ঝাল-দেওয়া পেটি তিনি বেশী করিয়াই রামচন্দ্রের পাতে দেন। যে মাছ আনে, তাহাকে নাকি বেশী করিয়া দেওয়াই নিয়ম।

চক্রবর্ত্তী-গৃহিণীর সুখ্যাতিতে শাশুড়ী মুখর হইয়া উঠিলেন, আহা সতীকন্তে, রেতের প্রাতঃবাক্যে বেঁচে থাক। হাতের নোয়া অক্ষয় হোক। হাঁ রে, এত খাস-দাস জল-হাওয়াও বললি ভাল, তবু তোকে রোগা-রোগা দেখাচ্ছে কেন বল ত?

রোগা! কৈ? রামচন্দ্র সশব্দে হাসিয়া উঠিল। আমাদের পোষ্ট-আপিসের কাছেই রেল-ষ্টেশন। সেখানে ওজন হবার যন্ত্র আছে। যখন যাই ওখানে, প্রথম ওজন হ'লাম—এক মণ দশ সের। কাল আবার ওজন হ'লাম—এক মণ সাড়ে তের সের। সাড়ে তিন সের বেড়েছি মা।

হাঁ, ছাই যন্তর! ওজনে বাড়লে বুঝি মানুষের মুখ সরু হয়! মানুষ বুঝি লম্বা তালগাছের মত হয়?

তিন মণ ওজনে বাড়লেও তোমার চোখে আমি তেমনি রোগাই থাকব। রামচন্দ্র টানিয়া টানিয়া যে দীর্ঘ হাসিটি হাসে, তাহা সত্যই ধ্বনি-মাধুর্য্যে অপরূপ। সে যে রামচন্দ্রের হাসি—অনেকগুলি লোকের হাসির মধ্যে মিশিয়া থাকিলেও যোগমায়া অনায়াসে তা বলিয়া দিতে পারে।

নাঃ, জ্বালাতন! অনেক দিন বাদে বাড়ী আসিলে পাড়ার লোকে যেন তামাসা দেখিতে ভিড় জমায় বাড়ীতে। বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীতে বাড়ী ভর্ত্তি। বেচারা কোন তেপান্তরের মাঠ ভাঙ্গিয়া, সারারাত্রি না ঘুমাইয়া আসিয়াছে; না মিলিতেছে তাহার বিশ্রাম, না বা জলখাবার খাইবার একটু ফুরসৎ! বাড়ী যেন কেহ আর আসে না!

দুপুর বেলায় শাশুড়ী আজ ঘুমাইলেন না ছেলের সঙ্গে কত গল্প করিতে লাগিলেন। ছেলেও গল্পে মাতিয়া গেল। গল্প আর কিছুই নহে, বাড়ীতে নূতন ঘর তুলিবার কথা। কোন্‌খানে ঘর উঠিবে, একতালা না দোতলা হইবে, পাতকুয়াটা বুজিয়া আসিতেছে—নূতন একটা কাটাইতে হইবে, আপাততঃ গোয়াল না ছাওয়াইলে শীতকালে গরু রাখা দায় হইয়া উঠিবে। বাঘ না হউক, হাঁড়োলেও তো ছোট ছোট বাছুর অনেক মারিয়া ফেলে।

রাত্রির আহারে বেশ খানিকটা বিলম্ব হইল। বিলম্ব তো হইবার কথা। ছেলে বাড়ী আসিয়াছে, যেখানে যে সময়ের বা অসময়ের আনাজপাতি পাওয়া যায়, শাশুড়ী তাহা সযত্নে সংগ্রহ করিয়াছেন। তার উপর, খাওয়ার সঙ্গে গল্প। সে গল্পেরও যেন শেষ নাই। রাত্রি বারোটায় যোগমায়া যখন শুইতে আসিল, তখন সারাদিনকার প্রতীক্ষা-ব্যাকুল মুহূর্ত্তগুলি নিদ্রার ছায়াময় আলস্যে মন্থর হইয়া উঠিতেছে। বার বছরের মেয়ে যদি গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সেই প্রতীক্ষাকে সমান তীক্ষ্ণ করিয়া রাখিতে না পারে—তাহারই বা অপরাধ কি!

রামচন্দ্র জাগিয়াই ছিল। এমন কি, সে শয্যায় শয়ন পর্য্যন্ত করে নাই। যোগমায়া দুয়ার বন্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইল।

দু'টি ব্যগ্র বাহু বিস্তার করিয়া গদ্‌গদ্ কণ্ঠে একটি অস্ফুট ধ্বনি তুলিবামাত্র যোগমায়া খপ করিয়া তাহার পায়ের গোড়ায় অবনত হইয়া পায়ের ধূলা তুলিয়া মাথায় দিল। তার পর রামচন্দ্রের বাহু-বিস্তারের মধ্যে বাঁধা পড়িয়া সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে কহিল, ভাল ছিলে?

কথাটা অভিনয়ের মত শোনাইল না, আন্তরিকতায় গাঢ়বদ্ধ সে স্বর। রামচন্দ্র চুম্বনের দ্বারা সে কথার প্রত্যুত্তর দিয়া যোগমায়াকে প্রতিপ্রশ্ন করিল।

তন্দ্রাদেবী এ ঘরের সীমানা পরিত্যাগ করিলেন। যোগমায়া বলিল, ফের যদি দুষ্টুমি ক'রে অমন চিঠি লেখ তো জবাবই দেব না।

তুমি কেন লিখেছিলে অত কথা? যত দোষ বুঝি আমারই বেলায়!

বাঃ রে, তোমার চিঠির জবাব না দিলে তুমি হয়ত ভাববে—যোগমায়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

রামচন্দ্র বলিল, কি ভাবব? থামলে কেন, বল?

ভাববে আমি কিছুই জানি নে।

বটে! আচ্ছা একটা সত্যি কথা বলবে? চিঠিখানা তুমি নিজে লিখেছিলে না, আর কেউ—

বল দেখি কে? কৌতুকে যোগমায়ার চক্ষু নাচিয়া উঠিল।

তুমিই। রামচন্দ্র সমাপ্তির ছেদ টানিয়া এক মুহূর্তে যোগমায়ার সমস্ত কৌতূহলকে নির্ব্বাণ করিয়া দিল।

যোগমায়া কহিল, আমি? ঠিক বলছো তো?

কেন, সন্দেহ আছে নাকি?

ইস্। বলবো বই কি। নিজে পারলেন না বলতে!

এখানে তোমার আবার কে সঙ্গীসাথী জুটলো তা তো জানিনে। মা কি পিসিমা তো লিখতে পড়তে জানেন না।

মাকে দিয়ে বুঝি তোমার চিঠি লেখানো যায়? কি বুদ্ধি!

তাই ত, তবে এ সখীটি কে? রামচন্দ্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চিন্তার অভিনয় করিল।

মৃদু হাসিয়া যোগমায়া বলিল, বল দেখি। বলতে পারলে তোমায় একটা জিনিষ দেব কিন্তু।

কি জিনিষ আগে বল?

তা বলব বৈকি! ফাঁকি দিয়ে জিনিষের নামটি জেনে নাও—ভারি চালাক!

তা হ'লে জিনিষ তোমারই রইলো, মায়া! নাম আমি বলতে পারলাম না।

বলি? রয়ে আকার রা—আর ধয়ে আকার ধা—কি হয়?

রাধা।

তারপরটা বল না।

রাধাকে আমি তো জানি না।

দুয়ো, হেরে গেলে! রাধাদি হচ্ছেন গাঙ্গুলী-বাড়ীর বউ।

বটে! তার সঙ্গে এরই মধ্যে ভাব করে নিয়েছ?

সেদিন লক্ষ্মীপুজোর দিন নেমন্তন্ন খেতে এসেছিলেন, ভাব হয়ে গেল।

তাই বলি এমন কবিত্বভরা চিঠি কে লিখলে?

হুঁ—হুঁ—কেমন জব্দ! যোগমায়া হাসিয়া উঠিল!

খুব জব্দ করেছ যা হোক। আচ্ছা, এইবার না বলতে পারার জন্যে তোমায় একটা উপহার দেব আমি। পছন্দ হ'ল কিনা বলতে হবে।

রামচন্দ্র উঠিয়া কুলুঙ্গির ভিতর হইতে একটা কাগজের বাণ্ডিল টানিয়া আনিল। ছোট লম্বা মত বাণ্ডিল। কাগজ খুলিবার সময় যোগমায়ার লুব্ধ দৃষ্টি সেই অনাবৃত বস্তুটির উপর পড়িল। সবুজ রঙের একখানা শাড়ী, পাড়গুলিতে ফুল কাটা। চক্‌চকে শাড়ীখানা ফুলপাড়ে মানাইয়াছে ভাল।

রামচন্দ্র বলিল, এর নাম পার্শী শাড়ী—নতুন উঠেছে। কেমন, পছন্দ হয়?

এ জিনিষ যে রামচন্দ্র তাহারই জন্য আনিয়াছে, সে কথা ভাবিতে গিয়া পুলক-বিহ্বলা যোগমায়ার আর উত্তর দেওয়া হইল না। পুলকের আতিশয্যে সে ঘাড় নাড়িতে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেল। শুধু তাহার উজ্জ্বল চোখ দেখিয়া রামচন্দ্র আশ্বস্ত হইল।

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতার মধ্যে কাটিবার পর রামচন্দ্র বলিল, এইবার পর দেখি—কেমন মানায়?

দূর! লজ্জায় যোগমায়া মুখ নামাইল।

কেন দোষ কি?

কিছুতেই যোগমায়াকে নূতন শাড়ী পরানো গেল না। উপরন্তু সে জানাইল, মাকে না জানাইয়া চুপি চুপি তাহাকে উপহার দিলে কোনদিন সে শাড়ী সে পরিতে পারিবে না। সে শাড়ী পরা তাহার উচিত নহে।

রামচন্দ্র বলিল, বাঃ, এখন এ শাড়ী কি মাকে

দেখানো চলে? তোমার আটপৌরে কাপড়, মার কাপড়, পিসিমার কাপড়—সব তো দুপুর বেলায় ওঁর হাতে দিয়েছি!

যোগমায়া বলিল, তবে এ শাড়ী আমি পরবো না, ফিরিয়ে দিয়ো।

দোকান থেকে একবার কিনলে আবার নাকি ফেরৎ নেয়!

তাহলে কি হবে? দুশ্চিন্তায় যোগমায়ার কচি মুখখানিতে ছায়া নামিল।

রামচন্দ্র খানিকক্ষণ চিন্তাচ্ছন্নের মত বিমূঢ় হইয়া রহিল। অকস্মাৎ এক সময়ে মৃদুহাসির ছটায় তাহার মুখখানি ভরিয়া উঠিল।

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিল, হাসছ যে?

রামচন্দ্র বলিল, মানে—এখন তোলা থাক এখানা। আমি যাবার দিন সঙ্গে করে নিয়ে যাব। তার পর সুবিধা বুঝে একদিন তোমায় দেওয়া যাবে।

কি করে দেবে?

সে আমি বুঝবো। বলিয়া রামচন্দ্র হাসির মাত্রা বাড়াইয়া দিল।

যোগমায়া ঈষৎ বিরক্ত হইয়া বলিল, কি যে হাসছো!

আছে—আছে—মজার কথা আছে। রামচন্দ্র হাসিতেই লাগিল।

যোগমায়া বলিল, সর, আমি শুই।

সারারাত্র যাত্রাগান শুনিয়া ভোরবেলায় শ্রোত্রীর যেমন অবস্থা হয়, নিদ্রা-শৈথিল্যে যোগমায়া তেমনই অবশ হইয়া পড়িল। পথক্লান্ত রামচন্দ্রও কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল।

দেখিতে দেখিতে সুখস্বপ্নের মত তিনটি দিন কাটিয়া গেল। অষ্টমী পূজার দিন—ঠাকুর দেখিতে শাশুড়ীর সঙ্গে সে বুড়া-বারোয়ারি তলায় গিয়াছিল। শাশুড়ী বুকের রক্ত দেওয়া ও ধুনা পোড়ানো মানত করিয়াছিলেন বলিয়া পিসিমার সঙ্গে যোগমায়াও মানত শোধ দেওয়া দেখিতে গেল। ঠাকুরের সম্মুখে—যেখানে আক, কুমড়া, কলা প্রভৃতি বলিদান দেওয়ার জন্য মাটির অস্থায়ী ছোট আল তৈয়ারী করা হইয়াছে, তাহারই সামনে যোগমায়ার শাশুড়ী পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া পদ্মাসন করিয়া বসিলেন। মাথায় ও দুই হাতে মাটির সরা লইয়া নারিকেল ছোবড়ায় আগুন জ্বালিয়া সরার উপর রাখা হইল। ঠাকুরের নির্মাল্যফুল মন্ত্র পড়িয়া পুরোহিত তাহার উপর রাখিলেন এবং পিসিমা উৎসর্গীকৃত ধুনা মুঠা মুঠা করিয়া সেই আগুনে ফেলিয়া দিতে লাগিলেন। চারিদিকে বহু নরনারী ভিড় করিয়া সেই ধুনা-পোড়ানো দেখিতে লাগিল। যোগমায়ার ভারি লজ্জা করিতেছিল! এতগুলি লোকের সামনে বসিয়া—হাতে ও মাথায় সরা লইয়া ধুনা পোড়ানো—সে হইলে কিছুতেই পারিত না!

তার পর বুক চিরিয়া রক্ত দেওয়ার পালা। নূতন ছুরিতে বুকের খানিকটা চিরিয়া যে রক্ত বাহির হইল, তাহারই খানিকটা নূতন পাত্রে রাখিয়া দেবীর সামনে ধরিয়া দেওয়া হইল। ঢুলি বাজনা বাজাইতেছিল, চারিদিকের লোকজন প্রশংসাধ্বনি তুলিয়াছিল। যোগমায়া কিন্তু সারাক্ষণই চোখ বুজিয়া ছিল।

নবমীর দিন কাদা-খেঁড় যোগমায়া দেখিতে যায় নাই, শুধু রামচন্দ্র কাপড় জামায় কাদা মাখিয়া বাড়ী আসিলে তাহার হাসি পাইয়াছিল। স্ফূর্তিতে মানুষের এমন অদ্ভুত চেহারাও হইতে পারে!

দশমীর দিন বিল্বপত্রে নাম লিখিবার কালে রামচন্দ্র যোগমায়াকে একান্তে পাইয়া কহিল, তুমিও নাম লেখ না কেন?

দূর, মা এখুনি এসে পড়বেন।

কোথায় মা? গঙ্গা থেকে নেয়ে আসতে তাঁর এখন আধঘণ্টা। লক্ষ্মীটি, লেখ। এই যে আল্‌তা—

যে ছোট ছোট বেলপাতা—আর যোগমায়ার অক্ষরের ছাঁদগুলি বড় বড়। শ্রী শ্রী লিখিতেই একটা পাতা ফুরাইয়া গেল। সরু বেলপাতার বোঁটা তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া রামচন্দ্র যোগমায়ার হাত ধরিয়া বলিল, এমনি করে ছোট ছোট করে ধরে ধরে লেখ।

বলিতে গেলে—সে লেখা রামচন্দ্রেরই। যোগমায়ার আড়ষ্ট হাতে শুধু বেলপাতার বোঁটাটি ছিল—যা করিবার রামচন্দ্রই করিয়াছে।

বৈকালে রামচন্দ্র বিদায় হইল। বিদায়কালে পিসিমা আশীর্বাদ করিয়া আঁচলে চোখ মুছিলেন, শাশুড়ীও দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইলেন। যোগমায়ার মনটিতে যেন ভারি একখানা পাথর চাপিয়া বসিয়াছে। চোখে জল আসা এমন কিছু বিচিত্র নহে।

যোগমায়ার যা-কিছু মনোবেদনা অন্তরালেই নিষ্পন্ন হইল। মনের মাঝে তরঙ্গ উঠিল, কেহ দেখিল না। নির্জন ঘরে দাঁড়াইয়া চোখে আঁচল

চাপিয়া সে বিদায়-ব্যথা অনুভব করিল—কেহ বুঝিলেন না এবং সেই নির্জ্জন ঘরে কাঁদিলেও তাহাকে সান্ত্বনা দিবার কেহ রহিলেন না।

৮

শ্বশুরবাড়ী যোগমায়ার ভাল লাগিতেছে না। মনের মধ্যে সামান্য ব্যথা আছে, কাহারও কাছে মন খুলিয়া ধরিবার উপায় নাই। যখন-তখন গাঙ্গুলী-বাড়ী যাওয়া চলে না। সেদিন তো শাশুড়ী স্পষ্টই বলিলেন, হুট বলতে কারো বাড়ী যাওয়া আমি পছন্দ করি নে। তোরা এলি, আমরাও গেলাম—সে এক কথা।

অথচ শাশুড়ী সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গ্রামখানি আট-দশবার ঘুরিয়া আসেন। সংসারে মানুষ-জন নাই। অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছেন —শক্ত না হইলে বাহিরের সংসারে তাঁহার বাঁচিয়া থাকাই যে কঠিন হইত! বাজার হাট, দোকানের কেনা-কাটা, কাহারও কাছে টাকা ধার করা, ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ আনা, পড়ো জমিতে কেহ কাঠ ভাঙ্গিতে আসিলে তাহার সঙ্গে ঝগড়া করা ইত্যাদি সবই তিনি একাকী করিয়া থাকেন। পিসিমা গ্রামের মেয়ে হইয়াও কুলবধূর মত চরকা সূতা লইয়া ঘরের কোণে দিন কাটাইতে ভালবাসেন। এই গ্রামের মেয়ে হইলেও শ্বশুর-ঘর তাঁহাকে করিতে হয় নাই। পিসেমশাই ঘরজামাই ছিলেন বলিযা পিসিমা অত্যধিক লজ্জাশীলা হইয়াছেন।

পাড়ায় বাহির হইলেও বা নিস্তার ছিল। যতবার বাহির হইতে ফিরেন ততবারই শাশুড়ীকে গা ধুইয়া স্নান করিতে হয়। পল্লীর পথঘাট ভাল নহে, বাসি কাপড়ে কত জাতির লোক যে তাঁহারই গা ঘেঁষিয়া পথে চলে—তাহারও হিসাব তিনি প্রত্যেকবার শুদ্ধীকৃত হইবার সময় দেন। অবশ্য তাহারা যে ইচ্ছা করিয়া তাঁহার কাপড় অপবিত্র করিয়া দেয় এমন নহে, মানুষের স্বভাবই চইল—সাবধান হইয়া পথ চলিতে পারে না। বিশেষ করিয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলা!

বাড়ী আসিয়া বলেন, এক ঘড়া জল মাথায় ঢেলে দাও তো কাপড়খানা কেচে নিই। কলুদের ছেলেটা এমন জোরে ছুটে গেল—গায়ে কাপড়খানা ঠেকে গেল যেন! ওই টেমি ঘটির গঙ্গাজলের কি কম্ম! তাঁবার বড় ফেরোটা এনে সবটুকু জল মাথায় ঢেলে দাও। ছিরিক ক'রে একটুখানি জল ছিটোলে কি দেহ শুদ্ধ হয়!

তা ছাড়া আজকাল সংসারের ছোটখাটো কাজ —যেমন গরুর বিচালী কাটা, গোবর নেদি দেওয়া, ঘর রোয়াক ঝাঁট দেওয়া, রান্নাঘর নিকানো, সবই যোগমায়া করে। যন্ত্রের মত সে কাজ করে, কাজ করিতে করিতে অন্যমনস্ক হইয়া যায়। কখনও দূর প্রবাসে স্বামীর কথা মনে পড়ে, কখনও হরিপুরের বৈঁচি বনের ধারে, কদমতলার ডোবার শুষনিকলমির বনে, কখনও বা আমবাগানের মধ্যে তাহার মন ঘুরিয়া বেড়ায়। শীতকালে বড় বড় বৈঁচি পাকিবে, মোড়লদের ক্ষেতে রাঙা-আলু ও শাঁকালু তোলা হইবে, মটর গাছগুলিতে এত দিনে বেগুনি ফুল ধরিয়াছে নিশ্চয়।···শাশুড়ী বকেন। কাজে মনোযোগ না থাকিলে সংসারে লক্ষ্মীশ্রী থাকে না। বকুনিতে যোগমায়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে—আবার এলোমেলো চিন্তার ধারায় কাজে বিশৃঙ্খলা ঘটে।

আর একটি কাজ কার্ত্তিক মাস পড়িযা অবধি যোগমায়াকে করিতে হইতেছে। গোময় লেপিয়া তুলসীতলা পরিষ্কার করিয়া প্রত্যেকটি সন্ধ্যাবেলায় তাহাকেই একটি করিয়া মাটির প্রদীপ তার তলায় জ্বালিয়া দিতে হয়। প্রদীপের সল্তে পাকানো দুপুর বেলাতেই সে সারিয়া রাখে। এত কাল, তবু যোগমায়ার মন এখানে বসিতে চায় না। এ বাড়ীর সঙ্গে কেমন নাড়ীর যোগ যেন তাহার নাই। পরের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে আসার মত—সর্ব্বদাই লজ্জা ও কুণ্ঠায় যোগমায়া নিজেকে ঘরের এক কোণে গোপন করিয়া রাখিতে চায়।

শাশুড়ী যত বলেন, তোমার ঘর, তোমার দুয়োর, বুঝে নাও এই বেলা। যোগমায়া মাথা নাড়িয়া শাশুড়ীকে জানায় সে সব বুঝিয়াছে, কিন্তু মনে মনে ভাবে, যেখানে জোরে হাসিবার অধিকার নাই—সে বাড়ীকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করার মত অধর্ম্মের ভোগ আর কি আছে! যোগমায়া কি যখন-তখন ছাদে উঠিতে পারে? যখন তখন লাফাইয়া এঘর-ওঘর করিতে পারে? না, পাড়ায় অবাধ বিচরণের স্বাধীনতাই তাহার আছে? তবে শাশুড়ীর কথার প্রতিবাদ করিতে নাই, যোগমায়া নীরবে তাঁহার উপদেশ মানিয়া চলে।

এক দিন রাধারাণী বলিল, শাশুড়ীকে একটু যত্ন-আত্তি করবি ভাই, নইলে কথা শুনতে হয়।

যোগমায়া বলিল, উনি তো আমায় ভালবাসেন।

দূর নেকি, কি রকম জানিস? উনি কাজ করছেন, তুই হাত থেকে সে কাজ কেড়ে নিলি। উনি শুয়েছেন—হ'লো বা একটু পা টিপে দিলি। ওঁর মাথায় যদি পাকা চুল থাকে তো তুলে দিবি।

যোগমায়া শুষ্ক মুখে বলিল, আমার ভয় করে। অষ্টপ্রহর যে রকম ছুঁই-ছুঁই করেন। ওঁকে ছুঁলে কি আর রক্ষে আছে?

রাধারাণী হাসিয়া বলিল, তা বটে! ছুঁচিবেয়ে ধাত যাদের, তারা কারও কাজ পছন্দ করে না। আমার শাশুড়ীরও ছিল, ওঁর পাল্লায় পড়ে সে রোগ সেরেছে।

হাসিয়া যোগমায়া বলিল, কি রকম?

এই ধর না, যেমন কাচা কাপড় পরে ভাঁড়ারে ঢুকেছেন—উনি গিয়ে ছুঁয়ে দিলেন। বকৃতে বকৃতে মাথায় জল ঢেলে ফের কাচা কাপড় পরেছেন—অমনি উনি আবার ছুঁয়ে দিলেন। মানুষ আর কত বার মাথায় জল ঢালতে পারে, বল?

আমার শাশুড়ী দিনে আট-দশ বার ঢালেন।

সকলের ধাত তো সমান নয়। ওঁর সহ্য হয় না। এখন কি বলেন জানিস? বলেন, বামুন-মানুষ তিন পা বাড়ালেই শুদ্ধু!

যোগমায়া ও রাধারাণী দুই জনেই হাসিতে লাগিল। হাসি থামাইয়া রাধারাণী বলিল, তুই বরং এক কাজ করিস। দশমীর দিন—দোয়াদশীর দিন ওঁর ফলমূলগুলো কুটে কেটে দিস। ফলে তো দোষ নেই।

যোগমায়া চুপ করিয়া রহিল। একটু থামিয়া বলিল, ফল তো উনি খান না।

খান না! তবে কি খান দশমীর দিন?

ময়দার সঙ্গে ঘি মিশিয়ে, কখনও বা দোকান থেকে ছানা আনান।

আর দোয়াদশীর দিন?

প্রথমে একটা কলা ছাড়িয়ে আধখানা খান, বাকি আধখানা চালভাজার গুঁড়োর সঙ্গে মিশিয়ে খান।

তবে চালভাজা গুলো গুঁড়িয়ে রাখিস।

হাঁ! ভাজাখোলা সেই তেপাটায় টাঙানো আছে। আমাদের ছুঁতে দেন কিনা!

তাই ত, তোর তা হ'লে এ জন্মে আর শাশুড়ী-সেবা হ'ল না। তা মন দিয়ে স্বামী-সেবা করিস—তাতেই অক্ষয় পুণ্য।

তার পর সেই প্রসঙ্গই চলিতে থাকে।

কিন্তু সে আর ক'দিন! সারা কার্ত্তিক মাসে এক দিন রাধারাণী বেড়াইতে আসিয়াছিল এ বাড়ীতে, এক দিন যোগমায়া গাঙ্গুলী-বাড়ী গিয়াছিল। দু'টি স্বল্পায়ু দুপুরের নিরালা মুহূর্ত্তে মন খুলিবার অবসর যা মিলিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কি তৃপ্তি আসে? একটি পুরা দিনে যে কথার উৎস অবিশ্রান্ত ভাবে উৎসারিত হইলেও ফুরাইতে চাহে না, সামান্য কয়েক দণ্ডের আলাপে—আলাপের তৃষ্ণাই তো বাড়িয়া যায়!

একটু আশার আলোক যা দেখা যাইতেছে। বাবা এক দিন আসিয়াছিলেন—যোগমায়াকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়া কার্ত্তিক মাসে বাপেরবাড়ী হইতে আসা বা যাওয়ায় নাকি ভায়ের অকল্যাণ ঘটে! অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি শাশুড়ী দিন স্থির করিলেন। অগ্রহায়ণের প্রথমেই ভাল দিন থাকিলেও নবান্নটা না সারিয়া বধূকে তিনি পিত্রালয়ে পাঠাইতে সম্মত নন।

বাবা বলিলেন, সেই ভাল, আমরা নবান্নের দিন করব অঘ্রাণের শেষাশেষি। ওখানে গিয়েও মায়া নবান্ন করতে পারবে।

উৎসবের দিনগুলিকে যোগমায়ার ভারি ভাল লাগে। ভোরবেলায় স্নান সারিয়া মটকার শাড়ীখানা পরিয়া সর্ব্বপ্রথম সাজি ভরিয়া ফুল তোলে! শাড়ীখানা বহু পুরাতন এবং পরনে বড় হইলেও—ওর ফ্যাকাসে লাল পাড়টুকু যোগমায়ার ভারি ভাল লাগে। এই শাড়ীতে কত ব্রত, পূজা, উপবাস, ও পুণ্যাহের স্মৃতি লাগিয়া আছে। উইয়ে বা পোকায় দুই-এক জায়গায় ফুটা করিলেও, ঐ শাড়ী পরিলে নিজেকে শুচিস্নিগ্ধা মনে হয়। ফুলের সাজি হাতে করিয়া গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে—ঘাসের শিশিরে পা ভিজাইয়া এলোমেলো টগর-গাঁদার ঝোপে ফুল তুলিবার কালে মনের যত কিছু গ্লানি কোথায় যেন নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। পুষ্পপাত্রে ফুল গুছাইয়া রাখা, কলার পাতে সিঁদুর গুলিয়া ও চন্দন ঘষিয়া এবং সেই পাত্রেরই একধারে দূর্ব্বা ও আতপ চাউলের অর্ঘ্য সাজাইয়া রাখার মধ্যেও পারিপাট্য দেখা যায়। পঞ্চপ্রদীপের তুলার সলিতাগুলি ঘিয়ে ভিজাইয়া, পাণি শঙ্খটিতে জল ভরিয়া, চক্‌চকে পিলসুজের মাথায় পিতলের প্রদীপটি রাখিয়া—ধূপ ও ধুনা জ্বালাইবার আয়োজন করা পর্য্যন্ত—ঠাকুর আসিয়া এই বেদীতে বসিবেন, এই কল্পনায় মন যেন কানায় কানায় ভরিয়া উঠে। যে-ঠাকুরকে চর্ম্মচক্ষের গোচরীভূত করা যায় না,

মনের মন্দিরে তিনি সেই মুহূর্ত্তে সব ঠাঁই ব্যাপ্ত করিয়া অনুভূতিতে পরিপূর্ণ ও প্রখর হইয়া উঠেন। আবাহন বোঝে না যোগমায়া। বিসর্জ্জনের বেদনাও তাহার মনকে পীড়া দেয় না, কিন্তু ধূপ-ধুনা ফুল-চন্দনের গন্ধে, পুরোহিতের দুরুচ্চার্য্য মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে একটা অপ্রত্যক্ষীভূত মহিমা—সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়া সে যেন অনুভব করিতে পারে। সে মহিমার গাঢ় উত্তাপে চোখ দিয়া তাহার হু-হু করিয়া জল বাহির হয়, মনের তন্ত্রীতে একটানা একটি সুর বাজিয়া মাথাটিকে মেঝেতে লুটাইয়া দেয়, এবং মনে মনে সে এই সংসারের—আত্মীয়-পরিজনের মঙ্গল কামনা করে।

নবান্নের দিন এত আয়োজন-সমারোহ অবশ্য ছিল না। নূতন আতপ চাউলের সঙ্গে নূতন খেজুরের গুড়, কলা, কাঁচা দুধ, ছোলা মটর ভিজা, মূলার টুকরা ইত্যাদি মাখিয়া শাশুড়ী নবান্ন প্রস্তুত করিলেন। পুরোহিত শালগ্রাম শিলা সম্মুখে রাখিয়া মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে তুলসীপত্র ফেলিয়া সেই নবান্ন দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া দিলেন। একটু বেলা হইলে ঠাকুরকে আর এক বার লইয়া আসিয়া তিনি পায়স-ভোগ নিবেদন করাইয়া যাইবেন।

শাশুড়ী এক টুকরা কলার পাতায় নবান্ন উঠাইয়া যোগমায়ার হাতে দিয়া বলিলেন, ঐ পাঁচীলের মাথায় রেখে এসো তো মা। কাগে না খেলে তো নবান্ন মুখে দিতে নেই। আর শোন, এই কলার পাতাটা গরুর মুখে দিয়ে এসো।

যোগমায়া কথাবৎ কার্য্য করিল।

আশ্চর্য্য, অন্য দিন কা-কা রবে অসংখ্য কাক বাড়ীখানার উপর কত রকমেই না দৌরাত্ম্য করে, আজ কি একটি কাকেরও দেখা নাই! শাশুড়ী ও যোগমায়া পুরা দশ মিনিট প্রাচীরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল, কাকের চিহ্নমাত্র দেখা গেলনা।

শাশুড়ী মন্তব্য করিলেন, মরণ! নবান্নের কাগ কিনা, ত্রিসীমানায় নেই। গরুতে খেয়েছে তো, বৌমা?

যোগমায়া ঘাড় নাড়িল।

এমন সময় কোথা হইতে দুইটা শালিক পাখী কিচির-মিচির করিতে করিতে আসিয়া প্রাচীরের মাথায় বসিল ও কাকের জন্য রক্ষিত নবান্ন ঝগড়া মারামারি করিতে করিতে গিলিতে লাগিল।

শাশুড়ী প্রসন্ন মুখে বলিলেন, ওই হয়েছে। কাক-পক্ষীতে খেলেই হ'ল। এইবার তুমি মুখে দাও, বৌমা।

এ বাড়ীর কোন আকর্ষণই যোগমায়ার ছিল না, তবু যাত্রাকালে মন খারাপ হইয়া যায়। যাত্রাকালে পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহিণীরা পর্য্যন্ত পাল্‌কীর ধার ঘেঁষিয়া দাঁড়ান। তাঁহারা অনাত্মীয়, তবু গলার স্বরটি তাঁহাদের কোমল হইয়া আসে। গদগদ স্বরে বলেন, আবার এসো মা শীগ্‌গির। তোমারই ঘর—তোমারই সব।

যোগমায়া চারিদিকে চাহিয়া ভাবে, কেন ইঁহারা বারবার একই কথা বলেন? শাশুড়ী থাকিতে এ-বাড়ীতে তাহার অধিকার বা মর্য্যাদা সে বুঝিতে পারে না। হয় এসব স্তোকবাক্য, নতুবা প্রথামাফিক বলা। বাড়ীর উপর টান না থাকুক, মনের কোথায় যেন টান ধরে। এখানে যে ক দিন ছিল, মন্দই বা কি ছিল! শাশুড়ীর প্রখর দৃষ্টিতে শাসনের যে রূঢ়তা, এইক্ষণে স্নেহের মেদুরতায় তাহা রূপান্তরিত হইতেছে। আশ্চর্য্য, তাঁহার চোখেও জল! বিদায়ের কথাটি স্নেহ-প্রতিমদের মুখ হইতে নাকি বাহির হইতে নাই।

প্রণাম করিয়া মৃদুকণ্ঠে যোগমায়া বলিল, মা, আসি?

এস, মা। তাহার মুখখানি বুকের কাছে টানিয়া শাশুড়ী স্নেহ-চুম্বনে ভরিয়া দিলেন। মায়ের আদরের মতই মিষ্ট সেই চুম্বন।

চোখে জল আসা অতঃপর বিচিত্র নহে।

৯

বাপেরবাড়ীতেও দিনগুলি আজকাল মন্থর মনে হয়। সঙ্গিনীদের সকলকে পাওয়া যায় না। গঙ্গা-যমুনা বা কুমীর-কুমীর খেলাতেও মনোমত সঙ্গিনীর অভাব। বয়সে বড় দুই এক জন যাহারা শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়াছে—তাহাদের সঙ্গেও ঠিকমত মনের মিল হয় না। যেমন অপর্ণার কথাই ধরা যাক।

মাত্র তো বছরখানেকের বড়, যোগমায়াকে পাইয়া যে সব কথা সে ফাঁদিয়া বসিল, তাহা যোগমায়ার শাশুড়ীর মুখ হইতে বাহির হইলেই মানায়।

কি লা, যুগি—কেমন আছিস? শ্বশুরবাড়ীর

ভাত খেয়ে গতর লেগেছে কৈ লো! শাশুড়ী যত্ন-আত্তি করে তো?

যোগমায়া হাসিয়া বলিল, না, মারে।

সেকি লো, বউ-কাঁটুকি নাকি? খেতে দেয় না বুঝি ভাল করে? কিন্তু সহানুভূতি দেখাইতে সে আসে নাই। পরক্ষণেই বলিল, আমার শাশুড়ী কিন্তু ভাই ভারি ভাল। একেবারে মাটির মানুষ। আমি যা করি, বলি, কথাটি কন না। এই দেখ না, ক্যাশবাক্সের চাবিটা আমার আঁচলেই বেঁধে দিয়েছেন। ঝনাৎ করিয়া চাবির গোছাটা পিঠের দিক হইতে হাতের মুঠায় ভরিয়া সে বিজয়িনীর মতই হাসিল। সংসারে পাশা খেলার জিতের বাজিটি যেন তাহারই স্বপক্ষে চলিতেছে!

যোগমায়া হাসিল। বলিল, তবে তো ভালই হ'য়েছে, অপি।

শুধু ভাল! উনি এই নারকেল-ফুল আর জশম গড়িয়ে দিলেন—শাশুড়ীর কত আনন্দ। উনি কাজ করেন জমিদারী সেরেস্তায়—উপরি পান কি না।

যোগমায়া অত বুঝিল না। অপর্ণার হাতখানি টানিয়া বলিল, বাঃ, চমৎকার মানিয়েছে, ভাই।

আসচে পূজোয় সিঁথি নেব। ও বলে চিক্ নিও। তুই কি বলিস বুগি, সিঁথি ভাল, না চিক্ ভাল?

যোগমায়া অপর্ণার মতেই মত দিল। কেন, সিঁথি। যেন যাত্রার দলের রাধিকের মত।

তোদের শ্বশুরবাড়ীর দেশে বারোয়ারী পূজো হয়? তাতে বাই নাচ, ঢপ, চণ্ডী, যাত্রা হয়?

কই, যাত্রা তো শুনিনি। বেউলার গান নাকি হয়। মোছলমানদের একটা দল আছে। আমাদের বাড়ী থেকে তাদের আকড়ার গান শোনা যায়।

শুনিসনি যাত্রা? আঃ রে! ঠোঁটের মধ্যে একটা তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক শব্দ উচ্চারণ করিয়া অপর্ণা বলিল, তোদের তাহ'লে অজ পাড়া-গাঁ বল। খুব ম্যালেরিয়া আছে তো? কোঁ—কোঁ জ্বর? আমাদের গাঁয়ে ভাই ওসব কিছু নেই। আর দুধ, ঘি, মাছ, তরিতরকারি—সব সস্তা।

অপর্ণা যোগমায়ার কথা শুনিতে চাহে ন', কেবল নিজের ঐশ্বর্য্যখ্যাতির গল্প, স্বামী-শাশুড়ী-শ্বশুর-ভাসুরদের আদর যত্নের কথা, এবং সেই পল্লীকে শহরের কোঠায় তুলিয়া গৌরববোধ ইত্যাদিতেই মশগুল হইয়া থাকিতে চাহে। বাপেরবাড়ীতে দুঃখের ভাত ব্যঞ্জন-উপকরণে জুটিত না, অপর্ণা তাই—কুড়াইয়া-পাওয়া ঐশ্বর্য্যের গৌরবে বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছে।

অপর্ণার কথা ছাড়িয়া দিলে কুমুদিনীও তো অন্য জগতের মানুষ হইয়া গিয়াছে। শাশুড়ী, অলঙ্কার, গ্রাম ইত্যাদির গল্পে সে মাতিল না বটে, স্বামীকে লইয়া একটু বাড়াবাড়ি করিল বৈকি। ভালবাসিলেই যে নির্লজ্জ হইতে হয়, একথা যোগমায়া তাহার মুখেই প্রথম শুনিল। গুরুজনদের লুকাইয়া কি করিয়া ইঙ্গিতে ও পত্রটুকরায় তাহারা ভালবাসাকে নির্ব্বিঘ্নে প্রকাশ করিয়াছে—তাহার বিচিত্র ইতিহাস অতি দীর্ঘ হইলেও—সুখস্মৃতির মত সে অনর্গল বলিয়া যাইতেছে। মাথা-ধরার অছিলা করিয়া যোগমায়া পলাইয়া বাঁচিল।

সঙ্গিনীদের হাত হইতে যদি বা পরিত্রাণ আছে, (পরিত্রাণ আছে এই জন্য যে, স্বামী-সোহাগের কথা শুনিবার জন্য প্রথমটা তাহারা পীড়াপীড়ি করিলেও—খানিকটা শুনিবার পর বক্তা হইয়া বসে। সে তো গল্প নহে, সংক্রামক রোগ। তরুণ বয়সে এই সংক্রামতা অত্যধিক। সৌভাগ্যে কেহ যে কাহাকেও অতিক্রম করিবে—এমনটা আশা বোধ হয় কেহই করে না।) পরিত্রাণ নাই বয়োজ্যেষ্ঠাদের কাছে। তাঁহারা শুধু খুঁটিয়া খুঁটিয়া সব কথা শুনিতে চাহেন। তাঁহারা এমন সব প্রশ্ন করেন—যাহাতে অতিগোপন কথাটুকুও না বলিয়া নিস্তার নাই। কানে-কানে-বলা কথার মর্য্যাদা ও শপথ না ভাঙিলে তাঁহাদের বুঝি স্বস্তি নাই। কথা শুনিয়া তাঁহারা হাসেন, খানিক চুপ করিয়া কি ভাবেন, পুনরায় প্রশ্নবাণে কিশোরীর চিত্তকে জর্জ্জরিত করিয়া নিঙড়াইয়া সবটুকু রস বাহির করিয়া লন। বয়স্থাদের এই কাঙালপনার অর্থ যোগমায়া বুঝিতে পারে না। যাহার অঙ্গনে সবেমাত্র সোনালী রৌদ্ররেখায় সোনার আলিপনা দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে, মধ্যাহ্ন-বিদগ্ধ প্রান্তরের ধূম ও তাপের জ্বালা সে কি বুঝিবে?

দু'ট দিনেই হরিপুর গ্রাম পুরাতন হইয়া গেল। মা বেশীমাত্রায় সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন মেয়ে সম্বন্ধে। এই সতর্কতা তাঁহার কেন? মেয়ে তাঁহার কোন্ জিনিষটি খাইতে ভালবাসে—সে সব তো তিনি প্রতিদিনই সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাঁধিতে থাকেন। তবে আসন পাতিয়া, থালায় ভাত সাজাইয়া, বাটিতে ডাল ও ঝোল দিবার অত ঘটা কেন? যখন সে চিরদিনের মেয়ে হইয়া এ-বাড়ীতে ছিল—তখন তো এমন পরিপাটী যত্ন

মায়ের মধ্য হইতে অঙ্কুরিত হইতে সে দেখে নাই। সেই এক সঙ্গে এলোমেলো ভাত বাড়িয়া—এখানে ওখানে তরকারী দিয়া—ভাতের মাঝখানে খানিকটা ডাল ঢালিয়া দেওয়া—তাহাতে যত্নের অভাব কোন দিন যোগমায়া বোধ করে নাই। মেয়েকে সতর্ক হইয়া সেবা করার মধ্যে আগ্রহ ও যত্ন দুই থাকিতে পারে, কাছে টানিবার উপকরণ যেন কি ভাবে কমিয়া গিয়াছে। বৎসরের আবর্ত্তনে মা যেন শাশুড়ী হইয়াছেন।

তার পর একদিন রামচন্দ্রের পত্র আসিল। সে পত্র লইয়া সঙ্গিনী মহলে কি কাড়াকাড়ি—হুড়াহুড়ি।

অপর্ণা বলিল, আমাদের উনি ওর চেয়ে ঢের ভাল লেখেন।

কুমুদিনী বলিল, আমাদের উনিও।

সুভাষিণীও ছাড়িবার পাত্রী নহে। বলিল, নিয়ে আয় তোদের চিঠি, মিলিয়ে দেখব।

কুমুদিনী যে চিঠিখানি আনিল—সেটি সম্প্রতি আসিয়াছে। ছেলেমানুষ বর, স্কুলে বেশীদূর পড়ে নাই। অজস্র বানান ভুল করিয়াছে। তবে হাতের লেখাটি তাহার বড় বড় ও স্পষ্ট। কাজেই সুভাষিণী বলিল, মন্দ কি, বেশ চিঠি। অপর্ণাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, কৈ, দেখা তোর চিঠি?

অপর্ণা বলিল, বড় চিঠিখানা হারিয়ে ফেলেছি—এটা তত ভাল নয়।

এমন জড়ানো হাতের লেখা যে, সম্বোধন ছাড়া বাকিটার পাঠোদ্ধারে রীতিমত পরিশ্রম হয়। সুভাষিণী বলিল, কুমির বরের চেয়েও তোর বরের লেখা খারাপ। যাই বল, ঘুগির বরই সব্বার চেয়ে ভাল লিখেছে।

অপর্ণা বলিল, ছাই লেখা! মোটিস একটা তো গান চিঠিতে!

তোর তো একটাও নেই, খালি বক্তিমে!

সে চিঠিখানা হারিয়ে গেছে, তাতে চারটে গান ছিল। জান তো ভারি!

মুখ ভার করিয়া অপর্ণা চলিয়া যায় দেখিয়া কুমুদিনী বলিল, আর ক'দিন আছ ভাই এখানে?

ঠোঁট উল্টাইয়া অপর্ণা বলিল, ক'দিন! বলে, আমি না গেলে ওদের চলে! এসেছি তো মোটে দশ দিন, এর মধ্যে মাসশাশুড়ী এলেন একবার, উনি এলেন একবার। বলেন, চল, না গেলে যে সংসার যায়।

সুভাষিণী বলিল, যাই বল ভাই, বাপেরবাড়ী দু'দিনই ভাল লাগে।

যোগমায়া বলিল, তা কেন, সে বরঞ্চ শ্বশুর-বাড়ীর কথা বলতে পার।

তিন জনেই সশব্দে হাসিয়া উঠিল। দীর্ঘ-বিলম্বিত হাসি—থামিতে আর চাহে না। এক একবার হাসি স্তিমিত হইয়া আসে, পরক্ষণেই দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসে পরস্পর পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়িয়া হাসির উৎসমুখে ভাসিয়া চলে।

বিরক্ত হইয়া যোগমায়া বলিল, মরণ! এত হেসে মরছ কেন?

অপর্ণা বলিল, তোর কথা শুনে। নেকু!

কুমুদিনী বলিল, মেয়েমানুষের স্বামীর ঘর ছাড়া আর তীর্থ আছে নাকি? বিয়ে হলেই তো বাবা-মা পর হ'য়ে যায়।

যায় বৈকি! মুখ ঘুরাইয়া যোগমায়া বলিল, সে যারা নিমমায়া—তারা বলে ও-কথা।

অপর্ণা বলিল, শোন তাহলে। সেবার শশুরবাড়ী যাবার সময় মাকে বললাম, মা, আমার দিদিমা যে খোরাখানা দিয়ে গেছেন—ওখানা দাও, গ্রীষ্মিকালে ওতে করে পান্তা ভাত খাব। মা কি বললেন, জানিস? বললেন, আগুসারা মেয়ে, বিয়ের সময় মুঠো মুঠো টাকা নিয়েও সাধ মেটে নি। বলে:

ঘরের হুলো খায়,
আর বনের পানে চায়।

তোরাও হচ্ছিস তাই। শুনলি ভাই?

কুমুদিনী বলিল, ওই বিয়ের সময়েই যা দেওয়া-থোওয়া। অন্য সময়ে চাইলে ক্যাঁট ক্যাঁট করে কত কথা না শুনিয়ে দেয়।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, বিবাহের পর পিতৃগৃহে কন্যার কোন অধিকার থাকে না। যদি অধিকার খাটাইতে যাওয়া যায় তো মনঃকষ্ট ছাড়া বিশেষ কিছু লাভ হয় না।

এ-কথায় যোগমায়া সায় দিল না। সে-কথা সে স্বীকার করে না। মা কখনও পর হইতে পারেন? তাহার মা তো নহেই। যে মেয়ে মায়ের বাক্স হইতে টানিয়া নিজের বাক্স ভরাইতে সর্ব্বদা সচেষ্ট, সে স্বার্থপর নহে তো কি! নিজের দোষগুলি—নিজে কেহ দেখিতে পায় না।

সারা দুপুরটা যোগমায়া রামচন্দ্রের চিঠিখানা পড়িল। চিঠি পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে রামচন্দ্র সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল—শ্বশুরবাড়ীর খাটো প্রাচীর-ঘেরা আমকাঁঠাল গাছ বুকে-করা সেই

ছায়াচ্ছন্ন নাতিপ্রশস্ত উঠানটি, সেই ভাঙ্গা ঘরখানির মধ্যে একখানি বড় তক্তাপোষ এবং সমস্তটা ঘিরিয়া রাত্রি—অন্ধকার রাত্রি নামিতেছে সেই বিরলবসতি ভিটাখানির চারিদিকে। একটি রাত্রির স্মৃতিতে অনেকগুলি রাত্রি ভরপুর হইয়া আছে। সেই রাত্রিই যখন তখন মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়া যোগমায়ার চোখে ঘনাইয়া আসে। রাজপুত্র তেপান্তরের মাঠ পার হইয়া পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চাপিয়া কোন্ প্রবাসে উধাও হইয়া গিয়াছে, রাজকন্যা নিদ্রা-মধুর পুরীর মাঝে কেশদাম এলাইয়া—সোনারূপার কাঠি শিয়রে লইয়া ঘুমাইতেছে। শুধুই সে ঘুমাইতেছে না, স্বপ্নও দেখিতেছে সেই সঙ্গে।

কলমি-ডোবায় পা ডুবাইয়া বাসন মাজিতে মাজিতে যোগমায়া ভাবে, এখানকার সব কিছুই দিনে দিনে বদলাইয়া যাইতেছে কেন? কিসের ত্বরায় সঙ্গিনীরা চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে? কোন্ প্রয়োজনে মনের আকাশে রঙের খেলা চলিতেছে? সাতরঙা রঙ—কোথা হইতে আসিয়া কোথায় মিলাইয়া যায়! যাহাদের লইয়া রঙের খেলা জমে—এই নিত্যপরিবর্ত্তনশীল খেলাঘরে—সেই খেলিবার সঙ্গী-সাথীগুলির দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। কাল যাহাকে লইয়া প্রাণ খুলিয়া হাসিয়াছে, আজ তাহাকে লইয়া সে হাসি জমে না। আজ অপর্ণা-কুমুদিনী সুভাষিণীরা ফিকে হইয়া আসিতেছে।

ফাল্গুনের শেষে একদিন রাধারাণীর পত্র আসিল। সে লিখিয়াছে:

ভাই, বোশেখে যদি আস তো তোমার সঙ্গে দেখা হয়। আমি আর বড় জোর বোশেখ মাসের খানিকটা এখানে আছি। এবার বাপেরবাড়ী যাব। যাবার ইচ্ছে নেই, তবু যেতে হবে। কেন না, প্রথা। ভাবছি, কি করে ওঁকে ছেড়ে থাকব! তুই তো খুব কঠিন। গিরিকন্যা কি না, তাই এখানকার জন্যে তোর প্রাণ কাঁদে না। আচ্ছা কেমন করে তুই প্রাণ ধরে থাকতে পারিস? একটুও কষ্ট হয় না? একটু—ও না? ভালবাসা নিবি। তবে বাপেরবাড়ী যাবার জন্যে একটু একটু আনন্দ না হচ্ছে তা নয়। কেন জানিস? একটা নতুন জিনিষ পাব বলে। কি জিনিষ জানিস? না, চিঠিতে সে-কথা বলব না। তুই আয়—শুনতেই পাবি। কেমন আছিস?

আশ্চর্য্য চিঠি! মনের গোপন তারে করুণ সুরে আঘাত করিতেছে বার বার একবার ঘুরিয়া আসিলে কি ভাল হয় না? একবার মাত্র, দিন দুইয়ের জন্য।

খাইতে বসিয়া যোগমায়া বলিল, মা, রাধুদিদির চিঠি পেলাম আজ।

কি লিখেছে?

সব বুঝতে পারিনে। অনেক করে আমায় যেতে লিখেছে।

এই তো অঘ্রাণে এলি—পুজো না এলে পাঠাচ্ছি কি না।

কিন্তু রাধুদিদি যা করে লিখেছে!

তুই যাবি নাকি, মায়া? মা সবিস্ময়ে কন্যার মুখের পানে চাহিলেন।

মায়ের দৃষ্টি যোগমায়া সহ্য করিতে পারিল না, মুখ নামাইয়া বলিল, না গেলে রাধুদিদি দুঃখু করবে।

মা একদৃষ্টে মেয়ের পানে খানিক চাহিয়া রহিলেন। পরে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, তাই যাস।

তুমি হাসলে কেন, মা? নিজের অপ্রতিভ ভাব কাটাইতে যোগমায়া প্রশ্ন করিল।

এমনি।

না, এমনি নয়।

দেখ মেয়ের কথা! এমনি নয় তো কি?

যোগমায়া ঘাড় গোঁজ করিয়া বসিয়া রহিল, অন্নের গ্রাস মুখে তুলিল না।

মা বলিলেন, ও ক'টি মুখে দিয়ে নে। দেখ একবার কাণ্ড! কি যে বলে, বিয়ে হ'লে আর ঘর চলে না, তোরও হয়েছে তাই।

মুখ গোঁজ করিয়া যোগমায়া ভাত ক'টি খাইল এবং মুখ গোঁজ করিয়াই সকাল সকাল শুইতে গেল।

আলো নিভিলে—ও ঘর হইতে যোগমায়া শুনিল মা বলিতেছেন, বোশেখের প্রথমেই দিন দেখো—মেয়ে তোমার থাকতে চায় না এখানে।

বাবা বলিলেন, পাগল!

না গো, আজ স্পষ্ট বললে আমাকে—তার রাধুদিদিকে দেখতে যাবে।

রাধুদিদিকে? তাই বল!

তুমি দিন দিন যেন খোকা হ'চ্ছ? রাধুদিদি মানেই—বুঝছ না?

তিনি তথাপি অবুঝের মত বলিলেন, তা রামচন্দ্র তো ছুটি নিচ্ছে না।

নিচ্ছে না, নিতেও তো পারে। কি লিখেছে মেয়েকে আমি দেখেছি নাকি?

কাল দেখো একবার।

মেয়ের চিঠি? বল কি গো, বোকা বলে আমি কি এমনই বেহুঁস?

পিতা বলিলেন, গঞ্জের কিস্তিতে আজ মাৎ হয়ে গেলাম! নইলে গুপ্ত কিনা আমায় ঠাট্টা করে বলে বলে—

তা মেয়ে পাঠাচ্ছ কি না?

নিশ্চয় পাঠাব। বেয়ানের চিঠি আসুক। উঃ, নৌকোখানা যদি সেই সময়ে চেপে দিতাম!

এ-ঘরে অন্ধকারে শুইয়া যোগমায়ার কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা করিতে লাগিল। মা আবার বাবার সামনে এই কথা বলিলেন। কাল সকালে বাবা যখন ডাকিবেন, বুড়ি, মুখ ধোবার জল নিয়ে আয় তো? তখন প্রতিদিনকার মত হাসিমুখে যোগমায়া জলের ঘটি ও গামছা আগাইয়া দিতে পারিবে কি? মা ভারি বোকা।

১০

শ্বশুরবাড়ী আসিলেই কিন্তু রাধারাণীর সঙ্গে দেখা করা যায় না। সেই দিন দ্বিপ্রহরে যোগমায়া পিসিমার ঘরে গিয়া বসিল।

পিসিমা বলিলেন, কম্বলের আসনখানা টেনে নিয়ে বোস, মা। কাপড়ে ধুলো লাগবে।

লাগুক। যোগমায়া বসিয়া পড়িল মেঝেয়। কহিল, পিসিমা, একটা কথা আপনাকে বলব?

চরকার গতি শ্লথ করিয়া পিসিমা হাসিমুখে বলিলেন, কি কথা মা?

বলিবার পূর্ব্বে যতটা সহজ মনে হইয়াছিল, বলিতে গিয়া তত শীঘ্র সে কথা যোগমায়া বলিতে পারিল না। একটু থামিয়া ডান হাতের নখ দিয়া মাটিতে আঁচড় কাটিতে কাটিতে অবনত মুখে বলিল, রাধুদিদির সঙ্গে সই পাতাবার ইচ্ছে করে।

পিসিমা হাসিয়া বলিলেন—এই কথা! তা আজই আমি সদু-পিসিকে ডাকিয়ে বলব'খন।

মা কিছু মনে করেন যদি? কুণ্ঠিত স্বরে যোগমায়া বলিল।

বউ আবার কি মনে করবে! ছেলেবেলায় অমন সবাই, সই, মকর, গঙ্গাজল পাতায়। খরচ আছে বটে। একটু ভাবিয়া বলিলেন, এবার কিন্তু এক খরচে হয়ে যাবে।

ভীরুকণ্ঠে যোগমায়া বলিল, আপনি যদি আমার নাম করেন—

পাগল! পিসিমা হাসিলেন। আমিই বলব তোমার শাশুড়ীকে।

এত শীঘ্র কথাটা পাকা হইয়া যাইবে যোগমায়া আশা করে নাই।

বৈকালে শাশুড়ী বলিলেন, চুয়ো আনতে হবে, খাজা, গজা কিছু ময়রার দোকান থেকে কিনে আনতে হবে। কাল ভাল দিন আছে—পাঁচখানা ভাজা দিয়ে—একখানা লালপেড়ে শাড়ীও চাই—নতুনহাটে না গেলে কি পাওয়া যাবে?

পিসিমা বলিলেন, এত তাড়াতাড়ি না-করে দু'দিন পরে করলে—

শাশুড়ী বলিলেন, পরশু যে বাপেরবাড়ী যাবে বউ। আমরা কালই করব, ওরা করবে পরশু।

নূতন করিয়া যোগমায়া আজ রাধারাণীকে অভ্যর্থনা করিল। শাশুড়ী তাড়াতাড়ি একখানা গালিচার আসন হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, এইখানা পেতে বস, মা। বউমা, চন্দন ঘষে রেখেছ তো মা? দুর্ব্বো, ফুল, চুয়ো, সব ঠিক আছে? একটা পিদীম জেলে ওই কোণে রাখ। আর তুমিও একখানা ভাল কাপড়—শুদ্ধু শাড়ী পরে এস,—বিয়ের চেলিখানাই না হয় পর।

রাধারাণী মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। কোণের প্রদীপের মিটিমিটি আলোয় রাধারাণীকে সত্যই রাধারাণী বলিয়া মনে হইতেছে। এই ছয় মাসে সে কিছু মোটা হইয়াছে, রঙ তাহার ফরসা হইয়াছে এবং মুখেচোখে এমন এক অপরূপ শ্রী নামিয়াছে—যাহা দেখিলে জগদ্ধাত্রী প্রতিমার কথাই মনে পড়ে।

রাধারাণী বলিল, অমন করে 'হাঁ' করে কি দেখছিস?

যোগমায়া বলিল, তোমাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে ভাই। যেন পীরের হাটের জগদ্ধাত্রী ঠাকরুণ।

দূর, ঠাকুর-দেবতার সঙ্গে মানুষের তুলনা করতে নেই। তুমিও একদিন এমনি সুন্দর হবে ভাই।

আমি! তোমার মত আমার গায়ের রং আছে, না অমন টানা টানা বড় বড় চোখ আছে?

সে কথা আমি বলে মুখ নষ্ট করি কেন, বরঞ্চ তোর তাঁকে জিজ্ঞাসা করিস।

যোগমায়া বলিল, উনি তো কিছু বলেন না।

বলেন না, কিন্তু লেখেন। মাগো, কি সব

কবিতা! আমিই কি ছাই বুঝতে পারি সব? চাঁদ, ফুল, পদ্ম—কত কি!

লজ্জাবনতমুখে যোগমায়া বসিয়া রহিল। সত্য, লোকটার যেন চিঠি লিখিয়া আর আশা মেটে না। মুখ তুলিয়া কি বলিতে যাইবে, এমন সময়ে শাশুড়ী জনকয়েক মেয়েছেলের সঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকিলেন। রাধারাণীর শাশুড়ী, দুই ননদ ও পাঁচ-ছয় জন প্রতিবেশিনী সইপাতানো দেখিতে আসিয়াছেন।

বেশ কৌতুককর অনুষ্ঠান। অগ্নি সাক্ষী করিয়া কপালে চুয়া-চন্দনের ফোঁটা দেওয়া, পরস্পরের মুখে খাবার তুলিয়া দেওয়া ও লজ্জাবিজড়িত কণ্ঠে তিন বার 'সই' বলিয়া ডাকা—বেশ অনুষ্ঠান। দেবতা ও মানুষকে সাক্ষী রাখিয়া—যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ—এমনই আত্মীয়তা পাতাইয়া আসিতেছে। মানুষের সমাজ মানুষকে দিয়া তৈয়ারী করিয়া মানুষের যেন ভয় ঘোচে নাই, দেবতার প্রয়োজন সেই সমাজবিধির ধারাগুলিকে গুরুত্ব প্রদান করিয়াছে।

বেলা দশটার মধ্যে সই-পাতানো হইয়া গেল। প্রতিবেশিনীরা যে যাহার ঘরে চলিয়া গেলেন। শাশুড়ী কর্ম্মান্তরে মনোনিবেশ করিলেন। বসিয়া রহিল—রাধারাণী আর যোগমায়া।

যোগমায়া কিছুক্ষণ পরে বলিল, তোমাকে আপনার করে পাবার জন্যে কত যে ঠাকুর দেবতাকে ডেকেছি, ভাই। পিসিমার কাছে কথা পেড়ে অবধি বুক টিপ্ টিপ্ করে মরি আর কি! কেবল ভাবি—ওঁরা যদি রাজী না হন, যদি বকেন!

রাধারাণী বলিল, আমারও অন্য জায়গায় সই পাতানোর কথা চলছিল। শাশুড়ীর খুব ঝোঁকও ছিল। বউটি ভাল, বড়-মানুষের বউ, কিন্তু শাশুড়ী ভারি দেমাকে! আমিই তো ওঁকে বলিয়ে মার মত করালাম।

সত্যি? আনন্দে বিহ্বল হইয়া যোগমায়া রাধারাণীকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। বেষ্টনের আনন্দে খানিকটা পরিপূর্ণ থাকিয়া সে অবশেষে বলিল, আচ্ছা ভাই, তুমি এখন বাপের বাড়ী নাই বা গেলে? বেশত থাক না এখানে। এখন সই পাতানো হ'লো, আমরা যাব আসব—কেউ কিছু বলতে পারবে না।

রাধারাণী বলিল, কিন্তু আমার যে যেতেই হবে ভাই। প্রথমবার শ্বশুরবাড়ীতে থাকতে নেই।

যোগমায়া হতবুদ্ধির মত প্রশ্ন করিল, প্রথমবার কিসের? তুমি তো কতবার এসেছ—

না গো, সই, না। আজ তোমার শাশুড়ী আমার সাধ দিচ্ছেন—এ খবরটিও রাখ না?

যোগমায়া সহসা আর একবার রাধারাণীকে বেষ্টন করিয়া সানন্দে বলিল, আজ সই পাতানো না হলে তোমার সঙ্গে আড়ি দিতাম।

কেন, সই?

কেন অঘ্রাণে যখন বাপেরবাড়ী যাই—তখন তো আমায় কিছুটি বলনি?

রাধারাণী হাসিয়া বলিল, বলবার সময় ছিল কই, তোমার বরের চিঠি নিয়ে যা ব্যস্ত ছিলাম।

ধ্যেৎ—তোমার খালি ঠাট্টা!

তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া রাধারাণী বলিল, আচ্ছা সই, একটা কথা বল দিকি? ওই পিদীম জ্বলছে এখনও—এই মাত্র সই পাতিয়েছ, ধর্ম্ম সাক্ষী করে, দেখি তোর কথাটা সত্যি হয় কি না।

কি কথা, বল না?

বলিতে গিয়া রাধারাণীর একটু লজ্জা করিল বৈকি। সে বয়সে বড়। সম্বন্ধটাও লজ্জা করিবার মত নহে। তবু কথাটা বলিবার পূর্ব্বে একবার চারিদিকে চাহিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া চুপি চুপি বলিল, খোকা হবে, না, খুকী?

যোগমায়া ভাবিতে লাগিল।

রাধারাণী ঘরের কোণের দিকে চাহিয়া বলিল, এখুনি পিদীমটা নিবে যাবে। বল না, সই?

রাধারাণীর এই ব্যাকুলতায় যোগমায়ার বিস্ময় বাড়িল।

ছেলেই হউক আর মেয়েই হউক, সন্তান ত। সে জন্য রাধারাণীর এত ব্যাকুল হইয়া উঠিবার প্রয়োজন কি?

রাধারাণী তাহার গায়ে ঠেলা দিয়া বলিল, বল না, সই?

যোগমায়া হাসিয়া বলিল, যাই হোক না কেন, তোর এত ভাবনা কেন, সই?

আছে। ওর সঙ্গে বাজি ফেলেছি কি না। শীগ গির বল?

যোগমায়া হাসিমুখে বলিল, খোকা।

দপ্ দপ্ করিয়া প্রদীপটা নিবিয়া গেল।

রাধারাণী যোগমায়ার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, তোর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক ভাই। এমন দুষ্টু, বলে কি না মেয়ে হবে? মেয়ে হ'লে যেন ওর আর দু'টো হাত বেরুবে!

—

দ্বিতীয় অধ্যায়

১

বৈশাখেরই এক মধ্যাহ্নে যোগমায়ার শাশুড়ী একখানি চিঠি হাতে করিয়া বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ওঘরে চরকা-চালনারত পিসিমাকে ডাকিয়া বলিলেন, ঠাকুরঝি, শুনেছ—বট্‌ঠাকুর যে আসছেন।

পিসিমা চরকা থামাইয়া আধ ঘোমটা টানিয়া ঘরের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শাশুড়ী বলিলেন, এই দেখ চিঠি লিখেছেন। আজ বিকেলেই আসচেন। এই অবেলায় কোথায় কি পাই! ও বেলা বাজার অবধি গেলাম না, ভাল মাছ-টাছ কিছু নেই, দেখি গোয়ালাবাড়ী এক ছটাক (কাঁচি আধ সের) যদি দুধ পাই।

বড়ঠাকুর মানে আপন কেহ নহে, নিকট প্রতিবেশী হিসাবে সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। ওপাশের শিবমন্দির—যেখানে কমলার সঙ্গে প্রথমবার শ্বশুরবাড়ী আসিয়া যোগমায়া প্রণাম করিতে গিয়াছিল—তাহারই গায়ে তাঁহাদের বাড়ী। বাড়ীতে পোষ্য কম। ছেলেপুলে এক দম নাই, কেবল যোগমায়ার জেঠ্-শাশুড়ী একজন বিধবা ননদকে লইয়া ওই বাড়ীতে বাস করেন। জেঠ্-শ্বশুর মহাশয় প্রবাস-জীবন-যাপন করেন। এক বিবাহের সময় ছাড়া যোগমায়া কোন বারই তাঁহাকে দেখে নাই। আর বিবাহেয় সময় যে দেখা—তাহাতে লোকটিকে চিনিয়া রাখিবার কথা নহে। লজ্জায় সঙ্কোচে চক্ষু মুদিয়া একটি প্রণাম করিবার অতি সংক্ষিপ্ত সময়টুকুর মধ্যে পরিচয়ের অবসরই বা মিলিবে কি করিয়া? তিনি থাকেন রাঢ় অঞ্চলের কোন একটি গ্রামে। সেখানে খুড়ি না জেঠি কাহার দেবোত্তর সম্পত্তি পাইয়াছেন—প্রায় দুই শত বিঘা ধানের জমি। কিন্তু বিষয়ের একটি সর্ত্ত নাকি—দান-বিক্রয়ের অধিকার তাঁহার নাই, শুধু দেবতার সেবক হিসাবে বার মাসে তের-পার্ব্বণ সুসম্পন্ন করিয়া সেই সম্পত্তি ভোগদখল করা চলিবে।

বেশ রাশভারী লোক। তিনি বাড়ী আসিলে জেঠিমা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। খাওয়া শোওয়া সবেতেই তিনি নিয়ম'মুবর্ত্তিতা ভালবাসেন। এই নিয়ম পালনের ঠেলায় বাড়ীর মেয়েদের সন্ত্রস্ততার আর অন্ত নাই।

ইদানীং জেঠিমার বাড়ীখানি বন্ধই রহিয়াছে। জেঠা মহাশয়ের খুড়ির গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটাতে তিনি সপরিবারে রাঢ় দেশের সেই গ্রামে গিয়া উঠিয়াছেন। শাশুড়ী তো যখন-তখন বলেন, বট্‌ঠাকুর বোধ হয় এখানকার বাস উঠুলেন। যে ভাবগতিক!

পিসিমা বলেন, তাই তো, মহেশরা চলে গেলে এ বাড়ীটা একেবারে বনের মধ্যে পড়বে।

বিকালের দিকে একখানা গরুর গাড়ী বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া লাগিল। ময়লা কাপড়ে মালকোঁচামারা এক গাড়োয়ান কয়েকটি মোট মাথায় করিয়া বাড়ীর উঠানে প্রবেশ করিয়া হাঁকিল, কৈ গো মাঠাকরোণ, নাবাব কোথায়?

উই রোয়াকে থো। গঙ্গাজল ছিটিয়ে তবে ঘরে তুলতে হবে।

সবশুদ্ধ গোটা চারেক মোট। দুটি বস্তায় কি বাঁধা রহিয়াছে, একটি কাপড়ের পুঁটুলি আর একটি মাটির হাঁড়ি। সর্ব্ব পশ্চাতে জেঠ্-শ্বশুর দেখা দিলেন। হাতে মোটা একটা বাঁশের লাঠি—তাহারই উপর ভর দিয়া খুক্ খুক্ করিয়া কাসিতে কাসিতে তিনি বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। রং তাঁহার খুব ফরসা, নাকটি টিকলো, কিন্তু এত রোগা চেহারা যোগমায়া খুব কমই দেখিয়াছে। রোয়াকের উপর পৈঠা দিয়া উঠিবার কালে মনে হইল, তিনি হাঁপাইতেছেন। শাশুড়ী মাথায় ঘোমটা টানিয়া রান্নাঘরের দিকে সরিয়া গেলেন। পিসিমা মাথায় ঘোমটা দিয়া আগাইয়া আসিয়া কুশল প্রশ্ন করিলেন, কেমন আছ মহেশ? বৌ ভাল আছে?

আর ভাল! রোয়াকের উপর উঠিয়া তিনি ততক্ষণে দেওয়াল ধরিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। নিশ্বাস ত্যাগের ফাঁকে ফাঁকে বলিতে লাগিলেন,—আর ভাল হব চিলুতে শুয়ে। দেখছ না টান—শীতকালে তো বিছানা থেকে উঠতে পারি নে—এখনই এই। বলিয়া সুদীর্ঘ একটি নিশ্বাস ফেলিয়া ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

সত্য বলিতে কি, বৃদ্ধ বয়সে মুখে-চোখে যে একটি রমণীয় প্রসন্নতা ফুটিয়া উঠে, ইঁহাকে দেখিয়া সে ধারণা ভুল বলিয়াই মনে হয়। সারা জীবনে তিনি যেন সংসারে বিরক্তি আর অশান্তিই সঞ্চয় করিয়াছেন। কথা বলিবার সময় অনেকগুলি সরু-মোটা শিরা গলদেশ হইতে ললাট পর্য্যন্ত এমন বিশ্রীভাবে ফুটিয়া উঠে। সারা মুখখানির লোলচর্ম্মে সেই কুঞ্চন রেখা এমনই ভাবে ছাইয়া যায়! তা ছাড়া গলার স্বরটিই বিরক্তিব্যঞ্জক। উহার অবস্থা

সচ্ছল; প্রায় দুই শত বিঘা জমির উপস্বত্ব ভোগ করেন। বার মাসে তের-পার্ব্বণ ঠেকাইয়াও রীতিমত ধান-চাল ধার দিয়া কিছু সঞ্চয়ও করিয়াছেন, শোনা যায়। কিন্তু অদৃষ্ট! ধনের সুখে সুখী হইয়া—মানের মুকুট মাথায় পরিয়া—দেহের জন্য তিনি সদাই অসুখী হইয়া আছেন।

পিসিমা বলিলেন, নিতাইকে নাকি পুষ্যিপুত্তুর নিয়েছ?

হাঁ। না নিলে এত বড় বিষয়টা কে দেখবে, দেবতার সেবা চালাবে কে?

তা নিতাই সব দেখে শোনে তো? এখন কত বড়টি হয়েছে?

দেখে আর ছাই। সারা বছর ম্যালেরিয়াতে ভুগছেই। পেট-জোড়া পিলে—বার মাস জ্বর লেগেই আছে। বাঁচবে বলে বোধ হয় না।

ওমা—সে কি! তা চিকিচ্ছে-পত্তর কি করাচ্ছ?

চিকিৎসা? তার খুব ঘটা আছে, দিদি। বছরে এক পিপে কুইনিন ওর পেটে যায়। এত মিছরি—এত সাগু। কুইনিন খেয়ে খেয়ে ছোঁড়াটা কানের মাথা খেয়ে বসে আছে।

আহা—বাছারে! পিসিমা আঁচল দিয়া চোখ মুছিলেন।

জেঠশ্বশুর বলিলেন, কেন এলাম জান? দু-জায়গায় টানা-পোড়েন আর করব না। বয়সও বটে, শরীরেরও এই অবস্থা। যে দিন যায়, সেই দিনই ভাল। বাড়ীটা বেচেই দেব মনে করেছি।

পিসিমা বলিলেন, বেচে দেবে? জন্মভিটে কি বেচতে আছে?

জেঠশ্বশুর মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন,—সে কাদের? যাদের ছেলেপুলে নাতি-নাতনীতে সংসার গম গম করছে। আঁটকুড়োর আবার জন্মভিটে! তুমিও যেমন!

পিসিমা বলিলেন, তা হোক, তবু বাপপিতামোর নাম—

আমি গেলেই তো অন্ধকার। এক ফোঁটা জল তাঁদের মুখে ঠেকাবে কে শুনি? তুমি তো জান, দিদি, তোমাদের বউ হেন ঠাকুর-দেবতা ভূভারতে নেই যার দোর ধরেন নি। কিছু ফল হ'লো কি? যাদের হয়, মা-ষষ্ঠী ঢেলে দেন দু-হাতে।

তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন কি না বোঝা গেল না। হাঁপানির টানটা বেশী বলিয়াই মনের নানা প্রকারের ভাবকে তিনি ঐ একটি মাত্র পথ দিয়াই প্রকাশের সুযোগ দিয়া থাকেন।

একটু থামিয়া বলিলেন, এখানকার বাড়ীটা বেচেই দেব। কিছু টাকার আমার দরকার। বছরাবধি একটা মামলা চলছে। দুঁদে জমিদার, দেবোত্তর সম্পত্তি উড়িয়ে দিতে চায়। ব্যাটা উকিল মোক্তার যেন জোঁকের মত লেগেছে, দিদি। হাতে যা ছিল গেছে, তোমাদের বউয়ের গহনা—

পিসিমা বলিলেন, তা মিটিয়ে ফেল না।

ফেলব—ফেলব। বলিয়া হাসির মাত্রাটা উচ্চগ্রামে তুলিতেই তিনি হাঁপানির টানে কাতর হইয়া পড়িলেন। আপন মনে খানিকক্ষণ সৃষ্টিকর্ত্তাকে গালি বর্ষণ করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, ছোট-আদালতে জিতলাম, বড়-আদালতে গেল। আর ক'টা মাস গেলে দেখ না—বাছাধনকে আদা-জল খাইয়ে দিই কেমন। জানে না তো মহেশ চাটুয্যেকে!

পিসিমা বলিলেন, আচ্ছা, এইবার মুখ-হাত ধুয়ে একটু জল মুখে দাও তো।

আরে, তুমিও যে কুটুম্বিতে আরম্ভ করলে দেখতে পাই। এ কি আমার পরের বাড়ী? হবে'খন, হবে'খন, বৌমাকে ব্যস্ত হতে বারণ কর। কাজের কথাটা হয়ে যাক্ আগে। কাল দশটার আগেই আবার রওনা হ'তে হবে আমায়। হাঁ, বৌমাও শোন, বাড়ী আমি বেচবই। তোমরা তো জানই, গেলবারে যখন কথা ওঠে, তিলিরা হাজার টাকা দেবে বলেছিল। মনে নেই তোমার, দিদি?

পিসিমা ঘাড় নাড়িলেন।

আমি বলেছিলাম, না, বাড়ী আমি বেচব না। সবাই বলে জন্মভিটে—নিজেরও একটা মায়া ছিল বরাবর। কিন্তু—

হাঁপানির টানটা বেশী হওয়ায় তিনি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে কহিলেন, ছত্তোরি জন্মভিটে! বলে আপনি বাঁচলে বাপের নাম। তা তোমরা যদি নাও, অমনি দেওয়াই আমার উচিত ছিল, কিন্তু বুঝছো তো? টাকার দরকার। পাঁচশো টাকা পেলেই কাল রেজেষ্ট্রি করে দিতে পারি।

পিসিমা বলিলেন, দাঁড়াও, বউ কি বলছেন শুনে আসি। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, বউ বলছেন, হাতে তো এখন টাকা নেই, এখন কিছু নিয়ে আর মাসখানেক বাদে যদি—

হাঁ—হাঁ—তাই হবে—তাই হবে। এখন আমার শ'খানেক টাকা হ'লেই চলবে।

শাশুড়ী ব্যস্ত হইয়া সেই সন্ধ্যা বেলাতেই পাড়ায় কয়েকবার ছুটাছুটি করিলেন। মাইপোষটা খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একটি ছোট টিনের বাক্স বাহির করিলেন। টিনের বাক্সের মধ্য হইতে যে কি বাহির করিয়া আঁচলের তলায় লুকাইলেন, তাহা যোগমায়া দেখিতে পাইল না, কিন্তু খানিক পরে টাকা বাজাইবার শব্দে সে বুঝিল, বাড়ী কেনার একটা পাকা বন্দোবস্তই হইয়া গেল।

পিসিমা বলিলেন, কাল অমাবস্যে পড়বে বলে বউ তাড়াতাড়ি টাকা নিয়ে এলেন। লেখাপড়া তুমি কালই করে দিয়ো ভাই।

হাঁ, কালই লেখাপড়া হবে। রেজেষ্ট্রি আপিসে যেতে আসতে বড় জোর তিন ঘণ্টা। হাঁ, কালই রেজেষ্ট্রি হবে। তবে বউমাকে বলো, দিদি, আসছে মাসের শেষাশেষি টাকাটা যেন উনি দিয়ে দেন। বড্ড ধারেকর্জ্জে জড়িয়ে পড়েছি কি না।

পরদিন প্রাতঃকালে শাশুড়ীর কথামত যোগমায়া জেঠ্‌শ্বশুরের পায়ে প্রণাম করিতে আসিলে, তিনি মুখখানিতে যথাসম্ভব প্রসন্নতা ফুটাইয়া বলিলেন, রামের বউ বুঝি? আঃ বিয়ের সময় কতটুকুটি দেখেছিলাম। দেখি মা—তোমার হাতখানি একবার? লজ্জা কি, দেখি?

যোগমায়ার সঙ্কুচিত হাতের মধ্যে দুইটি টাকা গুঁজিয়া দিয়া পিসিমাকে বলিলেন,—বেশ বউ, সুশীলা, লক্ষ্মী।

তাঁহার দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দটি যোগমায়ার কানে একটু প্রখর বলিয়াই বোধ হইল।

২

রেজেষ্ট্রি আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া শাশুড়ী সেই দিন দুপুরবেলায় দা ও শাবল লইয়া ওই বাড়ীর দুয়ার খুলিয়া বন পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গেলেন। অন্ধকার ঘরে চামচিকারা বাসা বাঁধিয়াছিল। তাহাদের পক্ষসঞ্চালন-জনিত দুর্গন্ধে সে ঘরে খানিক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকাও দুঃসাধ্য; কিন্তু পরের বাড়ীকে নিজের বলিয়া পাইবামাত্র শাশুড়ী এক মুহূর্ত্তে সমস্ত বিরাগকে দমন করিয়া সেই সবের যথোচিত ব্যবস্থা করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন। তা পথে বাহির হইলেও দিনে অন্তত তিনি আট-দশ বার স্নান করেন, বাড়ীর বন-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া সন্ধ্যা বেলায় একবার মাত্র স্নান তাঁহার পক্ষে এমন কিছু বাহুল্যের নহে। যোগমায়ারও কাজ জুটিয়া গেল। ওই পড়ো বাড়ীটার সুবিস্তৃত উঠানে কুমড়া, শাক, মিষ্টি ডাঁটা ও নটেশাকের জন্য জমি তৈয়ারি করিয়া প্রত্যহ সে পাতকুয়া হইতে জল তুলিয়া সেই সব জমিতে সিঞ্চন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাঙা নটের অঙ্কুর বাহির হইল, কুমড়ার ডগা সাপের মত ফণা বিস্তার করিয়া প্রাচীরের গায়ে -ঊর্দ্ধমুখী হইল, সতেজ ডেঙ্গু ডাঁটার পত্রবিস্তারের মধ্যে যোগমায়ার প্রসন্ন মন আত্মগোপন করিল।

কুমড়ার ফুল ফুটিলে শাশুড়ী বলিলেন, বউমার হাত ভাল। কেমন গাছগুলি হয়েছে দেখেছ, ঠাকুরঝি?

পিসিমাও চোখমুখ খুশীতে উজ্জ্বল করিয়া কহিলেন, হবে না, ও মেয়ের আঁচলে লক্ষ্মীঠাকরুণ বাঁধা। দেখো এই বউ হতেই—

কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষাশেষি আবার শাশুড়ীকে চিন্তাকুল দেখা গেল। কয়দিন তিনি ভাল করিয়া আহার করিলেন না, বাড়ীতে অল্পক্ষণ থাকিয়া পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইলেন। বাড়ী পরিষ্কার করিবার নেশাটা তাঁহার এই কয়দিনের মধ্যেই আশ্চর্য্যজনকভাবে কমিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর সেদিন যোগমায়া ঘরের কোণে প্রদীপটিকে উস্কাইয়া দিয়া একখানি কম্বলের আসন পাতিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণখানি খুলিয়া বসিয়াছিল। আজ পিসিমা আসেন নাই, শাশুড়ীও নয়। উঁহারা আসিলে যোগমায়া মৃদুকণ্ঠে পাঠ আরম্ভ করিবে। প্রথম প্রথম লজ্জা করিত। গলার স্বর বুজিয়া আসিত, বর্ণাশুদ্ধি বাঁচাইয়া পাঠ করাও এক দুরূহ ব্যাপার। পাঠের গুণে এক শব্দের অর্থ -অন্য হইয়া দাঁড়াইত। সে জন্য যোগমায়াকে অবশ্য খুব বেশী লজ্জিত হইতে হইত না। কারণ পাঠ আরম্ভ হইবামাত্র শাশুড়ী ঢুলিতে থাকিতেন; পিসিমা হাতের মালা করাঙ্গুলির সাহায্যে ঘুরাইবার সঙ্গে সঙ্গে সভক্তি অন্তরে চক্ষুকে অর্দ্ধ-মুদ্রিত করিয়া কখনও আনন্দ-প্রকাশের মধ্য দিয়া, কখনও বা খেদোক্তির দ্বারা—কাহিনীকে যে সারা অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতেছেন—তাহা জানাইতেন। দেবতার কথায় ভুল ধরিবার দুর্ম্মতি তখনকার রীতি ছিল না, পাঠ বা বর্ণাশুদ্ধির খাতিরেও নহে। সাহস পাইয়া এই

কয় সপ্তাহে যোগমায়ার কণ্ঠস্বর শুধুই স্বাভাবিক হয় নাই, রামায়ণপাঠ কালে পয়ারের যে একটি সুন্দর সুর নারীকণ্ঠ হইতে উত্থিত হইয়া কাহিনীর বিষয়বস্তুকে প্রাণবন্ত করে, সেই সুললিত সুরটিও এখন যোগমায়ার আয়ত্তীভূত হইয়াছে। রামায়ণ পাঠ করিয়া সে অনায়াসে অন্যের চক্ষুকে অশ্রুভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতে পারে। কাল রাম-নির্ব্বাসনের কালে দশরথের বিলাপ-গাথা পাঠ করিবার কালে পিসিমা ও শাশুড়ী দুই জনেই হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়াছিলেন।

পাঠে যোগমায়ার মন বসিবার পূর্ব্বে তার মনে হইল, ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে পিসিমা ও শাশুড়ী কি বলাবলি করিতেছেন। দুই ঘরের সংযোগসেতু সিঁড়ির দুয়ারটা আধভাঙ্গা বলিয়া ওঘরের অনুচ্চ কণ্ঠের কথাবার্ত্তা এঘরে বসিয়াও দিব্য শোনা যায়। বই খোলা পড়িয়া রহিল, যোগমায়া উৎকর্ণ হইয়া উঁহাদের কথোপকথন শুনিতে লাগিল।

পিসিমা বলিতেছেন, তা হোক, বিয়ের কনে কিছু নয়, বয়সও হয়েছে।

শাশুড়ী বলিলেন, বেয়াই-বেয়ান যদি কিছু মনে করেন?

পিসিমা বলিলেন, তা তাঁরা মনে করতে পারেন। নতুন কুটুম তো!

শাশুড়ী বলিলেন, তবে তাঁরা কি বুঝবেন না যে, ওদের জন্যই আমাদের এই হাকুলি-বিকুলি। আমি তো গঙ্গার পাউড়িতে বসে আছি, যা থাকবে ওরাই ভোগদখল করবে।

পিসিমা বলিলেন, আর একটা মাস সময় নাও না কেন? মহেশকে একখানা চিঠি লিখে—

শাশুড়ী বলিলেন, আর এক মাস পরেই বা টাকা কোত্থেকে আসবে শুনি? রাম তো মাইনে পায় কুড়িটি টাকা। দশটি টাকা মাত্তর পাঠায়, তাতে কি—

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর পিসিমা বলিলেন, সাত তাড়াতাড়ি জমিটা না কিনলেই হ'ত। ধারেকর্জ্জে নুণ্ডুভুণ্ডু। এই ত বিয়ের পর পাঁচিল তুলতে যে দেনা হ'লো—তা অতি কষ্টে পোষ মাসে শোধ দিয়েছ। আবার—

শাশুড়ী ঈষৎ তীব্রকণ্ঠে কহিলেন, জমি কিনব না ত কি পর এসে বাস করবে আমার বাড়ীর গায়ে? আমার সোমত্ত বউ ঘরে—যে-সে এসে বসলেই হ'লো?

পিসিমা চুপ করিয়া রহিলেন।

শাশুড়ী বলিলেন, জমি নেবার জন্যে পাড়ার লোক মুকিয়ে আছে। একবার খবর পেলে হ'ত, পাঁচ ছ' কুড়ি টাকা বেশি দিয়ে তারা জমি কিনে নিত না!

তথাপি পিসিমা কথা কহিলেন না।

শাশুড়ী বলিলেন, ভারি তো বাপেরা গহনা দিয়েছে—পায়জোড়, জশম, মৌরিফুল, আর সাতনরী। কতটুকু সোনা হবে শুনি?

পিসিমা বলিলেন, তা ভরি-দশেক তো বটেই।

তবে? আর আমরা দিয়েছি কিছু না হোক পনেরো-ষোল ভরি সোনা। ছেলে চাকরি করছে, গহনা বাঁধা পড়ে, ছাড়িয়ে আনতে ক'দিন!

পিসিমা বলিলেন, বেয়াইরা কিছু মনে না করেন—তাই বলছি।

মনে করেন তো কি আর করব। মেয়ে না হয় পাঠাব না। বলিয়া সব চিন্তার নিষ্পত্তি করিয়া তিনি কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

সেদিন রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া অনেকক্ষণ অবধি যোগমায়ার ঘুম আসিল না। সব কিছু না বুঝিবার বয়স তার নাই। বাপের বাড়ীতে একবার মৌরিফুল বাঁধা পড়িয়াছিল, তিন মাসের মধ্যে বাবা সে জিনিষ খালাস করিয়া আনিয়াছিলেন। বাপের বাড়ীতে তো নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে যাওয়া ছাড়া যোগমায়া গহনা গায়ে দিত না, কাজেই নিজের বাড়ীর সিন্দুকেই থাকুক আর পরের বাড়ীর হাত-বাক্সেই থাকুক, তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। শ্বশুরবাড়ীতে আলাদা কথা। যখন-তখন লোকে বউ দেখিতে আসে। বউ এবং গহনা দুইটিই যে দেখিবার ও আলোচনার বস্তু, তাহা যোগমায়া বেশ বুঝিতে পারে। যে বাড়ীর কুৎসিত বউ, এবং যে বাড়ীর বউয়ের রূপ আছে অথচ গায়ে অলঙ্কার নাই—তাহাদের প্রতিকূল সমালোচনা একই পর্য্যায়ভুক্ত। তফাৎ রূপহীনা বধূর অপরাধ শুধু তার নিজের আর গহনার অভাব তার পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের। যদিও অর্থ ও রূপের অনিত্যতা সম্বন্ধে তাঁহাদের মুখে সারগর্ভ কথাও যখন-তখন শুনিতে পাওয়া যায়।

অন্ধকারে সারা গায়ে হাত বুলাইয়া বুলাইয়া যোগমায়া অলঙ্কারের অবস্থানটুকু ভাল করিয়া অনুভব করিল। আরসী থাকিলে—সেখানা সম্মুখে রাখিয়া নিজের অলঙ্কার-সমৃদ্ধ দেহবিম্ব সেই দর্পণে ফুটাইয়া সে হয়ত মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিত। কিন্তু রাত্রি যতই গভীর হইতে থাকে, যোগমায়ার মন ততই চঞ্চল হইয়া উঠে। অলঙ্কার চুরি করিবার

জন্য চোর বুঝি ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করিতেছে! দেহচ্যুত হইলে এ জিনিষ আর দেহাশ্রয় করিবে না! সংসারকে না বুঝিবার বয়স এখন তো যোগমায়ার নাই।

শুধু সে বুঝিতে পারে না ভবিষ্যতকে। তাহাকে অলঙ্কারবিহীনা করিয়া ভবিষ্যৎ যে কি সুফল প্রসব করিবে! অন্ধকার রাত্রিতে নির্ব্বাপিতদীপ কক্ষে উপাধান চোখের জলে ভিজাইয়া প্রিয়বিয়োগব্যথার দুঃখে যোগমায়া অনেকক্ষণ ধরিয়া নিঃশব্দে কাঁদিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িল।

অবাধ্য অশ্রু—কিছুতেই কি যোগমায়া তাহাকে রোধ করিতে পারে না! দুপুরের নির্জ্জন মুহূর্ত্তে যত বার সে আভরণহীন দেহের পানে চাহিয়াছে, তত বারই দু'টি চোখের বাধা ঠেলিয়া অশ্রু গণ্ড প্লাবিত করিয়া দিয়াছে।

পিসিমা অনেক ভাল ভাল কথা শুনাইয়াছেন। পতি-অনুগামিনী বল্কলধারিণী সীতার কথা সে পরশুই তো পড়িয়াছে। রাজরাণীর কিসের অভাব ছিল? অথচ সোনারূপার অলঙ্কার তুচ্ছ করিয়া পতিকেই তিনি শ্রেষ্ঠরত্ন বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তেমন অলঙ্কার নাকি মেয়েমানুষের ত্রিভুবনে আর নাই! কিন্তু কাহিনীর কথা কল্পনার ক্ষেত্রে মনকে অনেকখানি উপরে তুলিয়া মনোরম একটি স্বর্গ রচনা করে, বাস্তবের হাওয়ায় সে স্বপ্ন কোথায় উড়িয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। সারা দুপুরবেলাটা তার সীতার কথা মনে পড়ে নাই, তাঁহার আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত ভাবিয়া মন প্রবোধ মানে নাই। সে শুধু ভাবিয়াছে, বইয়ে যাঁহাদের কথা আছে—তাঁহারা ছিলেন দেবদেবী। দেবদেবীর দুঃখ-কষ্ট শুধু তাঁহাদের পরীক্ষার জন্য—তাঁহাদের মহিমাকে বৃদ্ধি করিবার জন্য। আর মানুষের দুঃখকষ্ট অনন্তকালের জন্য। যে জিনিষ একবার চলিয়া যায়, সে জিনিষ তত শীঘ্র ফিরিয়া আসে না। আজ যদি রামচন্দ্র এখানে থাকিত, কিংবা সে বাপের বাড়ীতে থাকিত—এই ব্যাপার কখনই ঘটিতে পারিত না। এখন কেহ বউ দেখিতে আসিলে ঘরের কোণে মুখ লুকাইয়া থাকা ছাড়া আর সহজ উপায় কি! ভাগ্যে রাধারাণী এখানে নাই।

বৈকালে সে ওবাড়ীতে শাকসব্জীর চারায় জল ঢালিতে গেল না, ঘরের কোণে বসিয়া রামায়ণখানি কোলের উপর খুলিয়া রাখিয়া মনটিকে কোন্ তেপান্তরের মাঠে ছাড়িয়া দিল।

কৈ গো রামের মা, কি হচ্ছে? বলিয়া এক বর্ষীয়সী প্রবেশ করিলেন। বর্ষীয়সীর হাতে হরিনামের ঝুলি, গায়ে নামাবলী এবং মুখে পান। তামাকপোড়া খান বলিয়া দাঁতগুলি মিশ কালো। মাথার চুলে সবেমাত্র পাক ধরিয়াছে, অথচ বলেন বয়স তিন কুড়ি পার হইয়া গিয়াছে। পাড়ার সকলেই তাঁহাকে হরি-ঠাকুরঝি বলিয়া ডাকে। অতি শৈশবকালে বিবাহ এবং বৈধব্য ঘটিয়া গিয়াছে। ভাইয়ের সংসারে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া আছেন। তাঁহার মুখের উপর কথাটি কহিবার সামর্থ্য সে সংসারে কাহারও নাই। বেলা দুইটা আন্দাজ আহার শেষ হইলেই থান কাপড়ের উপর নামাবলীখানি চাপাইয়া হাতে হরিনামের ঝুলিটি লইয়া এ-বাড়ী ও-বাড়ী তথ্য সংগ্রহ করিয়া ফিরেন। তামাকপোড়াটুকু না হইলে চলে না বলিয়া সেটুকু অঞ্চলপ্রান্তে বাঁধিয়া লন। তাঁহাকে বসিবার জন্য আসন দিলে পড়শীবধূ বা ঝিয়ারীরা পান দিতেও ভুলে না। শুধুই পরচর্চ্চার হজমিগুলি গলাধঃকরণ করিয়া তাঁহার মনের স্বাস্থ্য অটুট থাকে না। হরি-ঠাকুরঝির পরোপকার-প্রবৃত্তিরও একটা খ্যাতি আছে। যেখানে রোগ বা অভাব, সেইখানেই হরি-ঠাকুরঝির সুকোমল বৃত্তিগুলির অনুশীলন চলে। মুখরা বলিয়া তাঁহার দুর্নাম রটিলেও, চরিত্র-গৌরবে তাঁহার খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত।

শাশুড়ী আজকাল ও-বাড়ী লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। ওবাড়ীর শাল কাঠের দুয়ারজানালা-গুলিতে উই ধরিয়াছে বলিয়া একটা হাঁড়িতে কিছু আলকাতরা ও ছেঁড়া-ন্যাকড়া লইয়া তিনি ওগুলির সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়াছেন।

পিসিমা ওঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন,—এস, ভাই, এস। বউমা কম্বলের আসনখানা পেতে দাও তো—তোমার পিস্‌শাশুড়ীকে!

কুণ্ঠিত যোগমায়া বাহির হইয়া আসন পাতিয়া দিল।

আসনে বসিয়া হরি-ঠাকুরঝি বলিলেন, বউমা, তুমিও এইখানটিতে ব'স।

পিসিমা বলিলেন—পান সেজে আন, বউমা।

হরি-ঠাকুরঝি হাসিয়া বলিলেন, ওই আমার এক রোগ, ওটুকু মুখে না দিলে প্রাণ যেন আইঢাই করে। তা আজ কি রান্না হ'লো, দিদি?

তুমিও যেমন, কোন রকমে গর্ত্ত বুঁজুনো। বউমা রয়েছেন তাই দু'বেলা দু'খানা তরকারি রাঁধতে হয়। হ'লো নটে শাকের তেলশাক, পটল

ভাজা, মুগের ডাল, আর কুমড়োর ডাটা দিয়েছিল সরি গয়লানী—তারই চর্চ্চড়ি! আমড়ার টক।

কচি আমড়া আছে গাছে? আমায় চারটি দিয়ো তো দিদি, একদিন পোস্ত দিয়ে টক করে খাব।

যে সগ্‌গে গাছ! ওই লগা দিয়ে বেড়িয়ে বেড়িয়ে কোন রকমে পাড়া। তা চারটি ঘরে আছে—এনে দেই।

থাক, থাক, কাল আবাব একাদশী। পরশু নিয়ে যাব। আজ দশমীর দিন কি জলখাবার খাবে?

দেখি যদি একটু ছানা পাওয়া যায়। গ্রীষ্মিকালে হিম-হিম ছানা মন্দ লাগে না।

যা বলেছ দিদি,—আমার তো বারমাসই ছানা চলছে। এত বারণ করি, হারু কিছুতে শোনে না।

তা হারুর মত ভাই এ পাড়ায় তো একটিও দেখি নে। দিদির ওপর কি ছেদ্দা-ভক্তি।

হরি-ঠাকুরঝি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তোমাদের পাঁচ জনের আশীর্ব্বাদে এখন ওকে রেখে—ছেলেদেব রেখে চোখ বুজতে পারি তবে তো! হরিবল।

এমন সময়ে ছোট একটি রেকাবিতে পান ভরিয়া যোগমায়া তাঁহার সম্মুখে রাখিল। তিনি যোগমায়ার সর্ব্বাঙ্গে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি বুলাইয়া সবিস্ময়ে বলিলেন,—ওমা, বোয়ের হাত খালি করে রেখেছ কেন গা? পরশু দেখলাম একতার লবঙ্গফুল, মুড়কী মাদুলি, মৌরি ফুল—! গলা খালি, ওপর হাত খালি, অমন সোন্দর বউ ভাল দেখাচ্ছে না, দিদি!

পিসিমা একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন—কথাটা বলিবেন কি না। রামের মায়ের নিষেধ কোন কথা প্রকাশ করিতে। গহনা বন্ধকের মত সম্মান হানিকর কাজ নাকি এ জগতে আর নাই।

অভাব সব সংসারেই আছে, গহনাও প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতে বাঁধা পড়ে, এবং কাহার গহনা কোথায় কি প্রয়োজনে বাঁধা পড়িয়াছে, তাহাও হরি-ঠাকুরঝির মত নিত্য সংবাদসংগ্রহকারিণীর না জানিবার কথা নহে; তবু মিথ্যা কথা বলিয়া সম্মান বাঁচাইবার রীতি এই গ্রামে, শুধু এই গ্রামেই বা কেন, সব গ্রামে চিরকাল এমনই ভাবে চলিয়া আসিতেছে।

হরি-ঠাকুরঝি নূতন রহস্যের সন্ধান পাইয়া পুলকিত ও আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, ছি মা, গহনা কি বাক্সে বন্দ করে রাখতে আছে। সদা সর্ব্বদা পরে থাকবে। এই তো পরবার বয়েস। এখন—পরবে না ত কি···আমাদের বউ বলেন কি—সংসারের কাজ করতে হয়—সোনা ক্ষয়ে যাবে। শুনেছ কথা? সোনা ক্ষয়ে যায়, আবার গড়িয়ে দেবে। হারু যতক্ষণ বেঁচে আছে—তোমার গহনার ভাবনা!

তা তো বটেই।

দেখি, গলা দেখি, মা। ওমা, চিকটাও খুলে রেখেছ! যাও, পরে এস। বলিয়া গোটা দুই পান গালে পুরিয়া অঞ্চলগ্রন্থি হইতে দোক্তা খুলিতে লাগিলেন।

পিসিমা বুঝিলেন, আসল কথা লুকাইতে যাওয়া বৃথা। আজ না হয় কাল্ হরি-ঠাকুরঝি সমস্তই জানিতে পারিবেন। আর যোগমায়ার শাশুড়ীর মত অতটা চালাক-চতুরও তিনি নন। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন,—আর ভাই, রাম বেঁচে থাকুক—গহনা পরবেন বইকি বউমা। একটা দরকারে কিছু টাকার অনটন হ'লো—

ও, তাই বল! মস্ত একটা দুর্ভাবনা কাটিয়াছে, এমনই ভাবে তাঁহার মুখে-চোখে আনন্দজ্যোতি খেলিয়া গেল।

তা·ধার আর কোন্ সংসারে হয় না বল। পাঁচটা ঝঞ্ঝাট থাকলে ও রকম হয়েই থাকে। ওই দেখ না, মিত্তিরদের গিন্নী, বোয়ের হাত খালি দেখে যেমন জিজ্ঞেস করেছি, হ্যাগা, ছেলেমানুষ বউ অমন রাঁড়হাত ক'রে রেখেছ কেন? বললে, নতুন প্যাটানের চুড়ি গড়াতে দিইছি। ধর্ম্মের ঢাক এক দিন বাজেই দিদি, পাপ কখনো লুকোছাপা থাকে না। ঠিক তিনটি দিন পরে বাঁড়ুজ্জেদের রাখালের সঙ্গে দেখা। হাতে তার কাগজের মোড়ক দেখে জিজ্ঞেস করলাম, ওতে কি রাখাল? বললে, মা বুড়ো মানুষ জানে না তো, মিত্তির-গিন্নীকে এক কুড়ি টাকা ধার দিয়েছে এই ক' গাছা লবঙ্গফুল রেখে। আজ স্যাকরাবাড়ী যাচাই করতে গিয়েছিলাম। সে বললে, মরা সোনার জিনিষ, পানে ভর্ত্তি, মেরে কেটে ওর দাম কুড়িটে টাকা হতে পারে—সুদ এক পয়সাও পাবে না। বোঝ একবার কলিকালের ধর্ম্ম!

ধর্ম্মের কাহিনী চাপা থাকিবার কথা নহে, বিশেষতঃ যাহারা সে কাহিনী অন্যের মন হইতে টানিয়া বাহির করিতে সুদক্ষ—তাহাদের কাছে। পিসিমা আনুপূর্ব্বিক সমস্তই খুলিয়া বলিলেন।

হরি-ঠাকুরঝি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাইয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

কিন্তু ব্যাপারটার এইখানেই শেষ হইল না। শাশুড়ী আলকাতরা মাখা হাত লইয়া ওবাড়ী হইতে আসিয়াই পিসিমাকে প্রশ্ন করিলেন, কেউ এসেছিল বেড়াতে? যেন হরি-ঠাকুরঝির গলা শুনলাম।

হাঁ—তিনিই তো এসেছিলেন।

তা বউ এখানে বসে বসে কি করছে? গল্প শুনছে বুঝি? শাশুড়ীর স্বর বিরক্তিতে অপ্রসন্ন।

পিসিমা মৃদু স্বরে বলিলেন, ঠাকুর-ঝি বসতে বললেন, তাই।

তাই! শাশুড়ীর স্বর তীব্র হইয়া উঠিল। ওসব পাড়াবেড়ানোর ছুতো আমরা বুঝি। লোকের পেটের কথা টেনে বার করতে না পারলে রাত্তে ওদের ঘুম হয় না।

পিসিমা কথা কহিলেন না, যোগমায়াও আড়ষ্টের মত দেওয়াল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দুই জনের অন্তর ভয়ে কাঁপিতেছিল।

শাশুড়ী বলিলেন, ওসব মৌটুসকিপনা আমরা আজন্ম দেখে আসছি। পাড়ার খবর নিতে আসা নয় তো, মজা দেখতে আসা। তিন কুল খেয়ে বসে আছে কি না—তাই মজা দেখতে আসে। ভাইয়ের সংসারে তো হাঁড়ি ঢুন্ ঢুন! আবার বড়মানুষী ফলিয়ে বেডানো হয!

বলে,—

'কে নেবে মোর শাকের পেতে
কে নেবে মোর কেঁড়ে,
আমার গা থর থর করে।'

বহির্মুখী আক্রমণের বেগ অন্তর্মুখী হইল। আর তোমাদেরও বলিহারি যাই! যার-তার কাছে পেটের কথা খুলতে যাওরার কি দরকার। অত আদিখ্যেতা করে পান সেজে দেওয়াই বা কেন? পান না দিয়ে মুখে বাসি আকার ছাই তুলে দিতে পার নি?

পিসিমা ধীরে ধীরে আমতলার ঘরে চলিয়া গেলেন। শাশুড়ীও রাগ করিয়া সন্ধ্যাবেলায় দোকান হইতে ছানা আনিলেন না, দশমার কোন আয়োজনই করিলেন না। ভয়ে শোকে মুহ্যমান যোগমায়ারও সারারাত্রির মধ্যে আর ক্ষুধা বোধ হইল না। এ ধরণের আঘাত তার পক্ষে এই প্রথম।

৩

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া শাশুড়ী উঠানের পাটঝাঁট সারিবার কালে আপন মনেই বহুক্ষণ গজ গজ করিতে লাগিলেন। কখনও পাড়া-প্রতিবেশীদের উদ্দেশে, কখনও বা পিসিমা ও যোগমায়াকে উপলক্ষ্য করিয়া যে-সব বাক্যবাণ বর্ষিত হইতে লাগিল—তাহাতে যোগমায়ার বিছানা ছাড়িয়া উঠিবার উৎসাহ লোপ পাইল। তাহার মনেও পড়িল না যে, আজ একাদশী—বিধবা মানুষ উপবাস করিয়া আছেন। আজ তাঁহার হাত হইতে ঝাঁটা কাড়িয়া লইয়া যোগমায়ারই উঠান ঝাঁট দেওয়ার কথা, গোবর-জলের হাঁড়িটা লইয়া তাহারই রান্নাঘর নিকানো উচিত। অল্প আয়াসের কাজগুলি তিনি সুসম্পন্ন করুন, কেন না, এমন কতকগুলি আচার-নিয়মের কাজ আছে, যাহা অন্যের দ্বারা সুসম্পন্ন হইতেই পারে না। যে সে কাজে হাত দিলে কাজের মর্য্যাদা বা পবিত্রতা রক্ষা হয় না। এই কথাগুলি শাশুড়ীর মুখে শুনিয়া যোগমায়ার মনেও বদ্ধমূল হইতেছে। বাপের বাড়ীতে অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে কোথায় স্খলন বা ত্রুটি—সেটুকু কোন্ দুলালীই বা বুঝিতে পারে! বিধিনিষেধের কঠিন বৃত্ত রচনা করিয়া মেয়ে যখন বধূজীবনে রূপান্তরিত হয়—তখনই ঔচিত্যবোধে সে গৃহিণী পদবীতে আরূঢ় হইতে থাকে। শাশুড়ীর মনে যে ক্রোধের সঞ্চার যথেষ্টই হইযাছে, তাহা দুপাৎ করিয়া রোয়াকের কোণে ঝাঁটা আছড়াইবার শব্দে, ঠন্ করিয়া বালতির মধ্যে পিতলের ঘটি ডুবাইবার সময়েও ঢুম করিয়া সেই জলপূর্ণ ঘটি শানের মেঝেয় বসাইবার কালে টের পাওয়া যাইতেছে। যোগমায়ার অলঙ্কারের শোককে ছাপাইয়া ভয়টাই এখন প্রবল হইয়া উঠিতেছে। না জানি আজ আবার কি কাণ্ডই ঘটিবে।

ও-ঘরে পিসিমাও উঠিয়াছেন। নিজের ঘরটি তিনি প্রায় নিঃশব্দেই ঝাঁট দিলেন, ঠুন্‌ঠান্ শব্দে অতি ধীরে ঘর ও রোয়াক ধোয়া-মোছা শেষ করিলেন। পিসিমা চিরদিনই, ধীর স্বভাবের মেয়ে; হাসেন নিঃশব্দে, কথা বলেন মৃদুস্বরে—সে কথাগুলি সংক্ষিপ্তও বটে, আবার কাজ করিয়া যান তেমনই নিঃশব্দে। কাহারও বিরুদ্ধে কোন-রূপ অনুযোগ তিনি করেন না কখনও। অন্ততঃ যোগমায়া তো শোনে নাই।

উঠি-কি-উঠিব-না ভাবিবার সময় যোগমায়া

শুনিল, শাশুড়ী বলিতেছেন,—বেলা তিনপোর অবধি ঘুম। আজ কালকার মেয়েদের অন্ত পাওয়াই ভার। কাজ করিস না করিস—উঠতেও কি গতরে—

বকিতে বকিতে তিনি বাহির হইয়া গেলেন। যোগমায়া তখন দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। শাশুড়ী গামছা ও মটকার কাপড়-খানি ডান-হাতের উপর ফেলিয়া বাঁ-হাতে ছোট একটি পিতলের কমণ্ডলু লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে যোগমায়ার মনে পড়িল, আজ যে একাদশী। তাহার উদ্দেশে এই মাত্র যে সমস্ত তীব্র মন্তব্য তিনি করিয়া গেলেন—তাহা তো অকারণ নহে। সকালের কাজগুলি তাহারই সারা উচিত ছিল আজ।

পিসিমা বলিলেন, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, মা? মুখহাত ধোও। যোগমায়া পিসিমার কাছে আসিলে তিনি বলিলেন, আহা, মুখখানি বাছার শুকিয়ে গেছে। সারারাত উপোস করে রইলে!

এই কথায় যোগমায়ার চক্ষুতে অশ্রু উথলিয়া উঠিল। সে আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না, সম্বরণ করিবার চেষ্টাও করিল না। ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

পিসিমা স্নেহসিক্ত স্বরে কহিলেন, চুপ কর মা, চুপ কর। পিসিমা উঠিয়া তাহার নিকটে আসিলেন। সহানুভূতি পাইলে কান্না থামিবার কথা নহে, যোগমায়াও থামিল না। পিসিমার বুকে মুখ গুঁজিয়া সে কান্নার মাত্রাটা বাড়াইয়া দিল। আজ এই মুহূর্তে পিসিমা আর শাশুড়ীপদবাচ্য নহেন—সহানুভূতির নদীধারাতে মিশিয়া তিনি মা হইয়াছেন।

হৃদয়াবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে পিসিমা বলিলেন, আহা, আমরাও এমন আবাগী যে, কাল একবার মনেও পড়লো না—কচি বউটা সারারাত উপোস করে রইল!

যোগমায়া বলিল, আপনারাও তো উপোস করে ছিলেন।

আমরা আর তুমি! বিধবা মানুষের অমন উপোস মাসে চার-পাঁচটা তো আছেই। এই আজ তো একাদশী, জল তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে গেলেও এক বিন্দু জল খাবার উপায় নেই।

কষ্ট হয় না আপনার?

কষ্ট! পিসিমা হাসিলেন, দূর পাগল মেয়ে! কষ্টের কথা কি বলতে আছে? প্রথম প্রথম হত বটে, আজকাল শরীর এমন হাল্কা হাল্কা বোধ হয়। বেশ লাগে।

যদি ধরুন, এই জ্যষ্ঠি মাসের দুপুর বেলায় জল তেষ্টা পায়?

না মা, তা পায় না। যা ধম্ম-কম্ম, তাতে ওসব ইচ্ছেই হয় না, নইলে আর দেবতার মাহিত্তির কি।

যোগমায়া মুখ ধুইতেই পিসিমা বলিলেন, শোন তো, মা, এক বার এদিকে এস। ওই কোণে কেটের কাপড় আছে—এড়া কাপড়খানা ছেড়ে ঐখানা পর। পরেছ? এইবার উই কুলজি থেকে পেতলের মাঝারি ফেরোটা পেড়ে ওর মধ্যে চারটি মুড়কি আছে—নাও দেখি।

যোগমায়া সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, না, পিসিমা—এত সকালে?

পিসিমা হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, না-ও-ই না। আজ তো আমরা খাব না, তোমার খেতে দোষ নেই। আমি বলছি, কোন অকল্যাণ হবে না। আরও দু-মুঠো নাও। বসো ওইখানে, সবগুলি খেয়ে ফেল। গামছা পরে এক ঘটি জল তুলে আনি।

মুড়কি খাইতে বসিয়া যোগমায়া ক্ষুধার তীব্রতা অনুভব করিল। সারারাত্রি যাহা শোকে ও ভয়ে অভিভূত ছিল, পিসিমার স্নেহস্পর্শে তাহা লোলুপ ভাবেই আত্মপ্রকাশ করিল। ঢক্ ঢক্ করিয়া ঘটি দুই জল খাইয়া যোগমায়া তৃপ্ত বোধ করিল। এতক্ষণে মনে হইল, সকাল বেলাটি ভারি মিষ্ট।

কিন্তু সে আর কতক্ষণের জন্য। গঙ্গাস্নান সারিয়া শাশুড়ী বাড়ীর উঠানে পা দিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতের সেই রমণীয়ত্ব চলিয়া গেল। নিজে তিনি পুণ্যসঞ্চয় করিয়া আসিলেন, ইহাদের জন্য আনিলেন,—সারাদিনকার আত্মগ্লানি।

উঠানে পা দিয়াই বলিলেন,—হরি-ঠাকুরঝির পেটে পা দিয়ে এলাম না! সারা ঘাটের লোক ছি-ছিক্কার করতে লাগলো। টাকা ধার কে না করে? কে না গহনা বাঁধা দেয়? বিষয় কিনেছি, উড়িয়ে তো দিই নি। হারামজাদী!

যোগমায়া ও-বাড়ীতে চলিয়া গেল। আবার একটা ভয়ের ছায়া ধীরে ধীরে তাহার তরুণ মনকে গ্রাস করিতে লাগিল।

প্রত্যহের জলসিঞ্চনে রাঙানটেগুলি সতেজ হইয়া উঠিয়াছে, জমি আর দেখা যায় না—লাল কম্বল কে যেন বিছাইয়া দিয়াছে সেখানে।

মিষ্ট ডাঁটার লাল গাছগুলিও ওধারে কাঁকড়া হইয়াছে। প্রাচীরের কোণে সেদিন যে ঢ্যাঁসের বীজ ফেলা হইয়াছিল, তাহাতে অঙ্কুর বাহির হইয়াছে ঠাসাঠাসি। আর একটু বড় হইলে বা দুই এক ছাট বৃষ্টি হইলে, ওগুলি তুলিয়া একটু ফাঁক ফাঁক করিয়া পুঁতিতে হইবে। সেদিনকার জল পাইয়া এখানে-ওখানে ওলের ডাঁটা জমি ভেদ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ওগুলিকে কেহ পুতিয়া দেয় না, অথচ বছর বছর জ্যৈষ্ঠের শেষাশেষি একটু বৃষ্টির জল পাইলেই আপনি আপনি মাটি ফুঁড়িয়া উঠে। ঝিঙ্গার লতাটি লতাইয়া লতাইয়া কাঁঠাল গাছ আশ্রয় করিতেছে—এখনও ফুল ফোটে নাই। কিন্তু প্রাচীরের মাথা অজস্র কুমড়া-ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। যোগমায়া কয়েকটি কুমড়ার ফুল তুলিল। বেশম দিয়া এই ফুলের বড়া শাশুড়ী প্রায়ই ভাজিয়া থাকেন। তুলিবার সঙ্গেই মনে হইল, আজ একাদশী। নাকের কাছে একবার ফুলটি সে তুলিয়া ধরিল। বেশ একটা রসনা-উদ্রেককারী গন্ধ বাহির হইতেছে! এইমাত্র ফুল ফুটিয়াছে—অথচ ছোট ছোট গোল ধরণের পোকাও কয়েকটি ফুলের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আশমানী রঙের উপর কালোর ঘন ফুট দেওয়া ঈষৎ শক্ত পাখা তাহাদের—হাত দিবার সঙ্গে সঙ্গে পক্ষ বিস্তার করিয়া পোকাগুলি উড়িয়া গেল। পুষ্প-পরাগমাখা হাতখানি যোগমায়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিতে লাগিল।

সজিনা ডালে একটা হাঁড়িচাঁচা পাখী আসিয়া বসিল। খানিক কর্কশ স্বরে কুক্ কুক্ শব্দ করিয়া আবার সে উড়িয়া চলিয়া গেল। ফুল ফেলিয়া দিয়া যোগমায়া উড়ন্ত পাখীটার পানে চাহিয়া রহিল।

কি সুন্দর জীবন উহাদের! যখন তখন যেখানে সেখানে উড়িয়া যায়। এইমাত্র এখানে আছে—পরমুহূর্তে এক ক্রোশ দূরে চলিয়া গেল। মানুষের যদি পাখা থাকিত! মানুষ যদি আকাশে অমনই ইচ্ছা-সুখে বিচরণ করিতে পারিত! এক ক্রোশ দূরের হরিপুর গ্রামখানি যোগমায়ার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। সেই কদম তলার কলমি-ডোবা, বৈঁচি-ঝোপ, বাড়ীর সামনে ঝাঁকড়া বকুল গাছ—ডান দিকের ঝোপে কল্কে ফুলের গাছে হলুদ রঙের অজস্র ফুল, সেই গাছে উঠিয়া ফুলের বোঁটা ভাঙ্গিয়া মধুলেহন, উঠানের জাঁতি গাছ—বক ফুলের গাছ ও শুইয়া-পড়া লেবু গাছ, মায়ের সদাপ্রসন্ন মুখ, বাপের অসময়ে স্নান-আহারের অনিয়ম, দাওয়া উঁচু আটচালা ঘরের আধ-অন্ধকার কোণে দেড়কোর উপর মাটির প্রদীপটি মিটি মিটি জ্বলিতেছে, জোড়া কুলুঙ্গির নীচেয় সিঁদুর, হলুদ ও ঘৃত বিচিত্রিত বসুধারার দাগ…

দুপুর বেলায় ঘরে বসিয়া যোগমায়া মাকে চিঠি লিখিল :

শতকোটি প্রণাম জানিবে। মা, তোমার জন্য আমার বড় মন কেমন করে। কবে আমাকে লইয়া যাইবে? এখানকার সংবাদ সকলে ভাল আছেন। তোমারা কেমন আছ জানাইবে। বাবাকে আমার প্রণাম জানাইবে।

এক পৃষ্ঠা কাগজের সবটুকুই শেষ হইয়া গেল। আর বেশীই বা কি লিখিবে?

ওইটুকু লিখিতেই তো দুপুর বাজিল। শাশুড়ী ও-ঘর হইতে ডাকিলেন, বউমা, খাবে এস।

চিঠির কাগজখানি আঁচলের খুঁটে বাঁধিয়া যোগমায়া ও-ঘরে চলিল।

শাশুড়ী ভাল যে না বাসেন, তাহা নহে। এই একাদশীর দিন উপবাস করিয়া বাজারে গিয়াছিলেন মাছ আনিতে। অন্য দিন না হইলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু একাদশীর দিন সধবা মানুষের মাছ না খাওয়াটা অকল্যাণজনক। মাছের ঝোল আর ভাত। যোগমায়ার মনে তখন পিতৃগৃহের বিচ্ছেদধারাটি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কি করিয়া চিঠিখানা সেখানে পাঠাইবে, সেই চিন্তায় সে তন্ময়। বাটিতে কিছু ঝোল পড়িয়া রহিল, পাতে অনেকগুলি ভাতও।

শাশুড়ী মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, ও ক'টি খেয়ে নাও, নইলে ফেলা যাবে।

যোগমায়া মৃদুস্বরে বলিল, আর পারব না, মা।

শাশুড়ী তেমনই ভাবে বলিলেন,—গেরস্থর ক্ষেতি-অপচো ভাল নয়। গরুও এখন বিয়োয় নি যে তার নাদায় দেব।

অতি কষ্টে যোগমায়া আর চারিটি ভাত মুখে দিয়া উঠিয়া পড়িল। রোয়াকে আঁচাইবার সময় সে শুনিল, শাশুড়ী আপন মনে গজ গজ করিতেছেন, —আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচি নে। বুড়ো মাগী হয়ে মরতে চলল্ম—এ সব ঢের বুঝি। গহনার শোক! এই দুর্জ্জয় একাদশী করে ওবেলা আবার রাঁধব নাকি? থাক ঐ ভাত জল দেওয়া। দুষির বয়েস তের বছর হ'ল তবু যদি একটু হুঁস থাকে!

ঘটীর জলের সঙ্গে সঙ্গে চোখের জল মিশাইয়া যোগমায়া নিজের ঘরে গিয়া বসিল। অঞ্চলগ্রন্থি হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া তাহার উল্টা পিঠে

লিখিল, মাগো, আমার বড্ড মন কেমন করিতেছে। যদি না লইয়া যাও তো আমার মাথা খাইবে।

শাশুড়ী ঘুমাইলে চুপি চুপি সে পিসিমার ঘরে উঠিয়া গেল। নিত্য অভ্যাস মত তিনি চরকা কাটিতেছিলেন। এক পাশে পাঁজ করা তুলা রহিয়াছে, তাহার পাশে ছোট একটি পিতলের ঘটীতে সামান্য একটু জল। ঘটীর জলে মাঝে মাঝে আঙুল ডুবাইয়া না লইলে সুতা কাটার সুবিধা হয় না।

যোগমায়াকে দেখিয়া পিসিমা বলিলেন, এস, মা বোস।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া যোগমায়া মৃদুস্বরে ডাকিল, পিসিমা?

কি, মা? চরকা হইতে মুখ তুলিয়া তিনি বলিলেন, কিছু বলবে?

অঞ্চলগ্রন্থি হইতে চিঠিখানা খুলিতে খুলিতে যোগমায়া সলজ্জ কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, এই চিঠিখানা যদি পাঠিয়ে দেন, মাকে।

পিসিমা চিঠিখানা হাতে লইয়া বলিলেন, এই কথা! আচ্ছা, দেব'খন, ওদের কালীকে ডেকে—একখানা খাম কিনিয়ে—

খামের পয়সা তো আমার নেই, পিসিমা?

আচ্ছা, আচ্ছা, খাম যদি কেনা হয়—পয়সার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না।

দিন দুই পরে যোগমায়ার পিতা রামজীবনবাবু একটা হাঁড়িতে কিছু মিষ্টি ও ঝুড়িতে কিছু আনাজপাতি লইয়া এ-বাড়ীতে দেখা দিলেন।

এই যে বেয়াই এসেছেন। আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম গো, বেয়াইয়ের সাক্ষাৎ পেলাম। বসুন। আধঘোমটা টানিয়া শাশুড়ী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন।

রামজীবনবাবু হাসিয়া বলিলেন, অনেকদিন আসি নি, ভাবলাম, বেয়ানের শ্রীচরণ দর্শন করে আসি।

আর বেয়াই, কোন রকমে প্রাণগতিকে বেঁচে আছি। বেয়ান ভাল আছেন? ছেলেরা ভাল আছে?

আপনার আশীর্ব্বাদে আর ভগবানের কৃপায় সবাই ভাল আছে। রাম এখন কোথায়, বেয়ান?

চিঠি আনছি। পোড়া দেশের নামও মনে থাকে না ছাই!

এর মধ্যে বুঝি আর বাড়ী আসে নি?

পোড়া কপাল কাজের! ছুটি কোথায়? সেই পুজোয় যা এসেছিল। বউমা, কোথায় গেলে গো? এ-ঘরে এসো। তোমার বাবা এসেছেন, আদর-যত্ন কর। আমাদের যত্ন-আত্তিতে কি হয়, বাপু?

মেয়ের যত্ন তো সবাই পায়, বেয়ান। আপনাদের যত্ন পাওয়াই সৌভাগ্যের কথা।

শাশুড়ী হাসিয়া বলিলেন, শোন কথা! আচ্ছা, আচ্ছা, যত্ন না হোক—একটু কষ্ট করে এ-বেলাটা এখানে খেয়ে যেতে হবে। না বললে শুনবো না। আমি গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসি। ঠাকুরঝি, বেয়াই রইলেন, হাতমুখ ধুইয়ে জলটল খাইও। বলিয়া তিনি গমনোদ্যত হইলেন।

রামজীবন বলিলেন, তাই ত বেয়ান, বড়ই মুশকিলে ফেললেন দেখছি। সারা দুপুর বেলাটা কাটাব কি ক'রে?

মেয়ে রয়েছে, গল্প করবেন বসে বসে। বলিয়া তিনি কক্ষত্যাগ করিলেন।

যোগমায়া আসিয়া পিতাকে প্রণাম করিল এবং হাসিমুখখানি তুলিয়া প্রশ্ন করিল, কেমন আছ, বাবা?

বাঃ রে, তুইও যে তোর শাশুড়ীর মত জিজ্ঞাসাবাদ করতে শিখেছিস? রাঁধতে শিখেছিস তো?

যাও। উল্লাসমিশ্রিত কৃত্রিম ক্রোধে যোগমায়া মুখ ফিরাইল।

আহা, চটিস কেন। না হয় বুড়ো বাপকে একদিন রেঁধেই খাওয়ালি।

যিনি খাওয়াবার তিনি খাওয়াবেন। সহসা মুখ ফিরাইয়া অভিমানগদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে কহিল, তোমাদের তো ভারি দরদ! আমি যাই চিঠি লিখে পাঠালাম—তাই দেখতে এসেছ।

রামজীবনবাবু হাসিয়া বলিলেন, যখন তখন দেখতে এলেই বুঝি খুব দরদ—

যাও, যাও, তোমায় আর কথা কইতে হবে না।

আহা, রাগ করিস কেন, বুড়ি—শোন না। সাধ্যসাধনায় যোগমায়া কাছে আসিলে তিনি তাহাকে পাশে বসাইয়া বলিলেন, তোর শাশুড়ী বুঝি তোকে বলেছিল চিঠি লিখতে?

হাঁ, দায় পড়েছে ওঁর! তোমাদের তো মন কেমন করে না। আবার কণ্ঠস্বর অভিমানে ভারী হইয়া উঠিল।

রামজীবন তাহার পিঠের উপর একখানি হাত রাখিয়া বলিলেন, করে, বইকি, মা, করে। করলেই

যা উপায় কি। তোমার ঘর তো তোমায় চিনতে হবে।

যোগমায়া কথা কহিল না। এ কথা সে ছেলেবেলা হইতে শুনিতেছে—বহু লোকের মুখে। এই ঘর-চিনিবার মধ্যে এমন কি সান্ত্বনা বা শান্তি আছে—তাহা তো যোগমায়া আজ পর্য্যন্ত বুঝিল না।

রামজীবন মাথা চুলকাইয়া বলিতে লাগিলেন, কিন্তু কি বলে কথাটা পাড়ি বল দেখি?

বাঃ রে, তার আমি কি জানি।

এই বোশেখে এলি—আর জ্যষ্টিতে যদি নিয়ে যাবার কথা তুলি—উনি কি মনে করবেন?

জানি না।

কন্যার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি সস্নেহে বলিলেন, দুঃখু করিস নে মা। অনেক সহ্য করতে না পারলে—

তাঁহার কথা শেষ হইতে-না হইতে যোগমায়া ত্বরিতে নিজের মুখখানি তাঁহার বুকে গুঁজিয়া দিয়া হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। রামজীবন নিঃশব্দে তাহার মাথাটি বুকের উপর আর একটু চাপিয়া ধরিয়া গাঢ় স্পর্শের ভিতরে তাহাকে নীরব-সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। খুট্ খুট্ করিয়া ও ঘরের শিকল নড়িয়া উঠিল। রামজীবন সচকিত হইয়া বলিলেন, তোমার পিস্‌শাশুড়ী বোধ হয় ডাকছেন।

তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া যোগমায়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অনেকখানি অশ্রু বাহির করিয়া তাহার দেহমন লঘু হইয়া গিয়াছে।

নূতন হইয়া যোগমায়া ফিরিয়া আসিল। হাতমুখ ধুয়ে নাও, বাবা, পিসিমা বলছেন।

আর একটু গল্প করি না।

না, আগে হাতমুখ ধুয়ে সন্ধ্যে-আহ্নিক করে—

ওরে, ভোর বেলায় সন্ধ্যে-আহ্নিক সেরে তবে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি। আচ্ছা, আচ্ছা, হাতমুখ ধুয়ে নিচ্ছি। কুটুমবাড়ী এসেছি, জল খেতে হবে বইকি!

যোগমায়া হাসিয়া বলিল, কুটুমবাড়ীই তো।

জলখাবার খাওয়া হইলে রামজীবন বলিলেন, হাঁ রে বুড়ি, তোদের এখানে ভাল দাবা খেলিয়ে আছে?

যোগমায়া হাসিয়া বলিল, হাঁ—সন্ধান বলে দিই, আর সারাদিন সেইখানে গিয়ে থাক!

পরে, তোদের তাড়ায় এখানে সেটি হবার জো কি!

জান না, এ যে কুটুমবাড়ী!

তুই ভারি দুষ্টু হয়েছিস, বুড়ি। দুই জনেই হাসিতে লাগিলেন।

হাসি থামিলে বলিলেন, আচ্ছা চল, কি কি গাছ আজ্জেছিস দেখিগে।

যোগমায়া পিতাকে ও-বাড়ীতে লইয়া গেল। রামজীবন মুগ্ধদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে বলিলেন, বাঃ, অনেকখানি জায়গা তো এ বাড়ীতে। একখানা দোতলা কোঠা ঘরও রয়েছে। কাদের বাড়ী রে, বুড়ি?

বল দিকি কাদের? কৌতুকে যোগমায়ার চক্ষু নাচিয়া উঠিল।

বলব? বলব? একটু চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন,—দূর ছাই—ওঁর নামটা যে মনে পড়ছে না। তোর বিয়েব সময় যিনি বরকর্ত্তা হয়ে গিয়েছিলেন।

যোগমায়া হাসিয়া বলিল,—তিনি তো আমার জেঠশ্বশুর হন। তাঁদেরই বাড়ী। আমরা যে কিনে নিয়েছি।

কিনে নিয়েছিস তোরা? বাঃ, খাসা বাড়ী, অনেকখানি জায়গা। তিনি সপ্রশংস দৃষ্টিতে যোগমায়ার পানে চাহিলেন। যেন এই বাড়ী, ক্রয় করিবার সবটুকু গৌরবের সে-ই একমাত্র অধিকারিণী।

যোগমায়ার সারা-অন্তর পিতার প্রসন্ন দৃষ্টি-পাতের কিরণে পুলকিত হইয়া উঠিল। উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে কহিল, এই দেখ না, শাশুড়ী বন পরিষ্কার করে জমি কুদ্‌লে দিয়েছেন; আমি রাঙানটে, ট্যাঁরস, মিষ্টি ডাঁটা আজ্জেছি।

খাসা নটে শাক হয়েছে তো, বুড়ি। আজ তেল-শাক করিস দিকি।

করব। ঘাড় নাড়িয়া যোগমায়া এই বাড়ীর জমি তৈয়ারীর অনেক তথ্য বলিয়া গেল। ভবিষ্যতে কোথায় ভাল আমের কলম বা কাঁঠালের চারা পুঁতিবে, তাহার কথাও বলিতে লাগিল।

রামজীবন বলিলেন, তোমাদের গরু নেই? আছে? মাত্তর একটা। আর একটা গাই পুষিস। পালা ক'রে দুটোয় বারো মাস দুধ দেবে। ঐ কোণটায় ছোটখাটো খড়ের চালের গোয়ালটা বাড়ীয়ে নিস।

যোগমায়া বলিল, মাকে বলব।

বলিস। ভাল গরু যদি নাই পাস, আমাদের রাঙীর নই বাছুর হলে একটা পাঠিয়ে দেব।

তাহ'লে বেশ হবে, বাবা। তাই তুমি পাঠিয়ে দিও। ছোট বাছুর মানুষ করতে আমার ভারি ভাল লাগে।

লাগবে বৈকি, মা। রামজীবন মুগ্ধ দৃষ্টিতে কন্যার পানে চাহিলেন। ত্রয়োদশী কিশোরীর মুখে যে হাসিটি ফুটিয়াছে, তেমন মিষ্ট-হাসি মাতৃজাতির মুখেই ফুটিতে পারে, এবং তাহাদের মুখে সে হাসি মানায়ও চমৎকার।

পিতাকে লইয়া সারাটি দিন যোগমায়ার বড় আনন্দেই কাটিল। নূতন নূতন জিনিষ দেখিয়া রামজীবনের যত বিস্ময় বাড়ে, যোগমায়া আনন্দ ও গৌরবে ততই ফুলিয়া উঠিতে থাকে। বিদায়-কালে ম্লান মুখে সে পিতাকে বলিল, এ বেলাটা থেকে যাও না। চারটি ভাত তো খেলে না!

রামজীবন হাসিলেন, দূর পাগলী! ভাত খাবার দিন আগে আসুক—তখন পেটভরে তোর হাতের সুক্তো ডালনা খেয়ে যাব।

আবার কবে আসবে, বাবা?

আসব—আসব—শীগ্‌গির। এ-পাড়া ও-পাড়া বৈ ত না!

কই, আস না তো!

আচ্ছা, রথের দিন আসব।

ঠিক?

ঠিক আসব। সেদিন এসে কিন্তু তোর শাক ভাজা দিয়ে লুচি খাব না, নতুন ইলিস মাছ ভাজা দিবি তাতে। বুঝলি?

আচ্ছা।

পিতা চলিয়া গেলে যোগমায়ার আনন্দও ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। চিঠি লিখিয়া পিতাকে আনাইয়া যে-কথাটি সে বলিতে চাহিয়া-ছিল, তাহা বলা হইল কৈ? তাহাকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব অশোভন হইলেও. তাহার দুঃখ-গুলি সে পিতার কাছে প্রকাশ করিতে ভুলিয়া গেল কেন? তিনি হাসিমুখে বিদায় লইবার সময় নিঃসংশয়ে জানিয়া গেলেন, কন্যা পরম সুখেই শ্বশুরঘর করিতেছে। একবারও কন্যার খালি গা বা হাতের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কৈ জিজ্ঞাসা করিলেন না তো, হাঁ রে বুড়ি, তোর গায়ের গহনাগুলো কি হ'ল? আশ্চর্য্য! দীর্ঘ-দিন বিচ্ছেদের পরে পিতাপুত্রীর মিলনে যে কথা উঠা উচিত ছিল, তাহার বাতাস মাত্র উঠিয়াই এ-বাড়ীর তুচ্ছ ঐশ্বর্য্য ও রচনার মধ্যে সেই অভিযোগগুলি কোথায় নিশ্চিহ্ন হইয়া তলাইয়া গেল!

৪

জৈষ্ঠ্যের শেষাশেষি একদিন শাশুড়ী গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া পিসিমাকে ডাকিয়া বলিলেন, শুনেছ ঠাকুরঝি, হরি-বাঁড়ুজ্জের মেয়ের পরশু বিয়ে হবে।

পিসিমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, তিনি শুনেন নাই একথা।

শাশুড়ী বলিলেন, গঙ্গার ঘাটে বাঁড়ুজ্জে-গিন্নী বলছিলেন। তাড়াতাড়ি ডুব দিয়েই তিনি উঠে পড়লেন, জপটাও সারতে পারলেন না। কাল গোয়াড়ী থেকে চাটুজ্জেরা এসেছিল মেয়ে দেখতে। দেখেই পছন্দ। একেবারে দৈবজ্ঞি ডাকিয়ে গণ পণ মিলিয়ে আশীর্ব্বাদ সেরে গেছে।

পিসিমা বলিলেন, মেয়ের বরাত ভাল। গোয়াড়ীর চাটুজ্জেরা রাজা লোক।

শাশুড়ী বলিলেন, বাঁড়ুজ্জেরাই আমাদের গ্রামে কম কি! জমিদারী নাই থাক, সবাই বড় চাকরে।

পিসিমা বলিলেন, তা ভগবান মিলিয়েও দেন তেমনি। যে যার হাঁড়ীতে চাল দিয়ে এসেছে।

শাশুড়ী বলিলেন, তা তো হ'ল। শুনেছি গাঁ শুদ্ধু নেমন্তন্ন হবে। প্রথম মেয়ে—সাধ-আহ্লাদ তো কিছু বাকী রাখবে না। আমাকে দু'টি হাতে ধরে বললে, নিরিমিষ রান্নার ভার নিতেই হবে।

পিসিমা বলিলেন, তোমার রান্নার সুখ্যাতি এ অঞ্চলে আছে কি না।

আর একটা বিপদ কি হয়েছে জান? গলার স্বর নামাইয়া শাশুড়ী বলিলেন, আমরা বিধবা মানুষ, কারু বাড়ীতে যেন খেলাম না, শোভা পেয়ে গেল, কিন্তু বউমাকে ওরা ছাড়বে কেন?

পিসিমা বলিলেন, তা কি ছাড়ে। বউমাও যাবেন না হয়—

শাশুড়ীর চাপাগলায় বিরক্তি ফুটিয়া উঠিল, তুমি যেন দিন দিন কি হচ্ছ, ঠাকুরঝি! ওই বড়মানুষের বাড়ী—কত দেশ থেকে কত কুটুমসাক্ষেৎ আসবে, পাড়ার বউ-ঝিরা সেজে-গুজে খেতে যাবে—আর খালি হাতে ট্যাং ট্যাঙিয়ে বউমা কি ক'রে সেখানে যাবে শুনি? আমাদের মুখখানা তাতে পুড়ে যাবে না?

পিসিমা কথা কহিলেন না।

শাশুড়ী বলিতে লাগিলেন, আমি ভাবছিলাম,

কি, বউমাকে না-হয় দিন কতকের জন্যে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিই, বেয়ানের অসুক বলে। কি বল?

সেই ভাল। কথা না কহিলে পাছে তিনি বিরক্ত হন, এই ভয়ে পিসিমাকে মত দিতে হইল।

শাশুড়ী আপন মনেই বলিলেন, এই সেদিন বেয়াই এলেন, তখন যদি খবরটা পেতাম! এখন উব্‌জে মেয়ে পাঠাই-বা কি করে? ওঁরাই বা কি মনে করবেন?

পিসিমা কি উত্তর দিবেন ইতস্তত: করিতে লাগিলেন। শাশুড়ীর প্রশ্নটি স্বগত, কাজেই উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া তিনিই বলিতে লাগিলেন, পরশু বিয়ে, ভেবে দেখি। চেয়ে-চিন্তে এক দিনের জন্যেও যদি ওরা গহনা ক'খানা দেয়! দেবে না?

তা দিতে পারে, এমন তো অনেকে নেয়—আবার ফিরিয়েও দেয়।

তাই বলব। একখানা লাল পেড়ে শাড়ী আর কিছু মিষ্টি পাঠিযে দিতে হবে আইবুড়ো ভাত ব'লে। হাতে আবার টাকার টানাটানি! কি করে যে সংসারধর্ম্ম করি, তা ভগবানই জানেন!

ভাঁড়ার ঘরে বসিয়া যোগমায়া যুক্ত করে ঠাকুরকে ডাকিতে লাগিল, হে হরি, গহনা যেন ওরা ফিরিয়ে.না দেয়। দোহাই ঠাকুর, তোমায় আমি পাঁচ পয়সার হরিন্নুট দেব।

প্রথমটা মনে হইল, যোগমায়ার ক্ষুদ্র প্রলোভনে হরিঠাকুর হয়ত বা বশীভূত হইয়া পড়িয়াছেন। গহনা পাওয়া গেল না। মিত্র-গৃহিণী বলিয়াছেন, এই রকম দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে তিনি বার-দুই এমন ঠকিয়াছেন যে, ঠাকুর-ঘরে দাঁড়াইয়া ভবিষ্যতের জন্য তাঁহাকে কঠিন শপথ করিতে হইয়াছে। শপথ করিয়াছেন দেবতার সম্মুখে, পাছে নিকট আত্মীয়-স্বজন অথবা অতিবিশ্বাসী কোন প্রতিবেশী তাঁহাকে উক্তরূপ অনুরোধ করিয়া শপথ ভাঙিয়া দেন! বিশ্বাস তিনি রামের মাকে যথেষ্টই করেন, এত বিশ্বাস করেন যে, নিজের মাকেও ইত্যাদি, কিন্তু দেবতার সম্মুখে শপথ—

শাশুড়ী গজ গজ করিতে করিতে বাড়ী আসিলেন, না দেবার ছুতো! এমন পিচেশ, ঠাকুরঝি। ওদের যদি নরকেও জায়গা হয়! কাল সকালেই গাড়ি ডাকিয়ে বউমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেব, নইলে মানসম্ভ্রম যাবে।

লঘুপক্ষ বিহঙ্গিনীর মত যোগমায়া উড়িয়া ও-বাড়ীতে চলিয়া গেল। মিষ্ট ডাঁটার গাছে গাল ঘষিয়া, নটে শাকের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া ও কুমড়া ফুলের রেণু নাকের ডগায় মাখিয়া আপন মনেই সে হাসিয়া উঠিল। ভারি তো পাঁচটা পয়সা, মায়ের কাছে চাহিয়া যদু ময়রার দোকান হইতে নিজেই সে পাটালি বাতাসা কিনিয়া আনিয়া 'হরিন্নুট' দিবে।

ঠাকুর কিন্তু সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করিলেন না। হয়ত বা আর কোথাও মোটা রকমের ঘুষের প্রলোভনে তিনি যোগমায়ার প্রার্থনাটি ভুলিয়া গেলেন! সন্ধ্যার মুখে একখানি গরুর গাড়ী এ বাড়ীর বহির্দ্বারে আসিয়া থামিল এবং গাড়ীর ভিতর হইতে চঞ্চলা কুরঙ্গীর মত কমলা বাহির হইয়া আসিল। শুধু যোগমায়া কেন, এ-বাড়ীর সকলেই অবাক্ হইয়া গেলেন। বলা নাই, কহা নাই, হঠাৎ এই অপ্রত্যাশিত আগমন!

শাশুড়ীর মনে আনন্দ ও আশঙ্কা দুই জাগিয়া উঠিল। উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করিলেন, হাঁ রে, হঠাৎ এলি যে?

কেন, আস্‌তে নেই? প্রতিপ্রশ্ন করিয়া কমলা হাসিল।

শাশুড়ী বলিলেন, জামাই ভাল আছে তো? বেয়ান—বেয়াই?

সবাই—সব্বাই ভাল আছেন। তোমার কোন চিন্তা নেই। চিঠি ওঁরা দিয়েছিলেন, আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম ডাক বাক্সে ফেলতে দিই নি। ভাবলাম, হঠাৎ গিয়ে তোমাদের তাক্ লাগিয়ে দেব।

তোর চিরটা কাল এক ভাবেই গেল কমলি। মাগো, হঠাৎ বুকের গোড়ায় এমন ছাঁৎ করে উঠেছে!

বউ কোথায়? বউ আছে তো এখানে?

আছে রে—আছে। কাল যে সে বাপের বাড়ী যাবে।

ইস্ যেতে দিলে তো! আমি বলে সওয়া পাঁচ আনার 'হরিন্নুট' মানত করে আসছি, হে হরি, বউকে গিয়ে যেন দেখতে পাই—বউকে গিয়ে যেন দেখতে পাই! কৈ লো বউ, কোথায় তুই? এক লম্ফে রোয়াকে উঠিয়া কমলা ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

শাশুড়ী বলিলেন, ওরে কমলি, এ ছেলেটি কে? তোর দেওর বুঝি?

ঘরের মধ্য হইতে উত্তর আসিল, হাঁ, আমার খুড়তুত দেওর। ভাগ্যিস ওর ইস্কুলের ছুটি ছিল—তাই ত আসতে পারলাম! ও তো আর আমার

কুটুম নয়, তোমার কুটুম, তুমিই ওকে যত্ন-আত্তি কর না?

কথা শোন মেয়ের! বস বাবা, বস।

কিশোর বালকটিকে রোয়াকে মাদুর পাতিয়া তিনি বসাইলেন ও বলিলেন, এইখানে দিব্যি হাওয়া দিচ্ছে, একটু জিরোও। গাড়োয়ান জিনিষগুলো এই রোয়াকেই রাখ, গঙ্গাজল ছিটিয়ে ঘরে তুলতে হবে।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কমলা বলিল, কৈলো বউ, নাকি বাপের বাড়ী পালাচ্ছিস কাল?

যোগমায়া ঘাড় নাড়িয়া মৃদু হাসিল।

হঠাৎ কেন লো? বুড়ি হলি, তবু মা-বাবার জন্যে হেদো'নো কেন লো? ওসব হবে টবে না। আমি বলে সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে ছুটতে ছুটতে আসছি!

এখন থাকবে তো, ঠাকুরঝি?

বাঃ, তোর মুখে ঠাকুরঝি ডাক ভারি মিষ্টি লাগলো, বউ। মুগ্ধ চোখে কমলা যোগমায়ার পানে চাহিল। যোগমায়া লজ্জায় মুখ নামাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, ঠাকুরঝি হও বলেই তো—

হাঁ গো হাঁ—তোর আর অত ব্যাখ্যানাতে দরকার নেই। ঠাকুরঝি বলেই তো ডাকবি। তুই কিন্তু অনেক বদলে গেছিস?

কি রকম? দেখতে খুব খারাপ হয়েছি বুঝি?

খারাপ! খানিকক্ষণ বিস্ময়ে নির্ব্বাক থাকিয়া কমলা জিজ্ঞাসা করিল, হাঁরে বউ, দাদা কতদিন হলো বাড়ী আসে নি?

আমি তো তাঁকে এবার এসে দেখি নি।

বলিস কি? বোশেখের প্রথমে এসেছিস—আষাঢ় পড়লো। দাদা কি মানুষ?

সে তোমরাই জান ভাই। ফিক্ করিয়া যোগমায়া হাসিল।

'ইস্, কুটুস কামড় বেশ যে দিলি! পিঁপুল পাকছে কি না।' এবার বাড়ী এলে আচ্ছা করে শাসন করে দিস, বুঝলি? এ রকম বেয়াড়াপনা—বলিতে বলিতে যোগমায়ার অলঙ্কারবিহীন দেহের পানে চাহিয়া সে প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল, ওকি দশা তোর! রাধার মত বিরহিণী সেজে বসে আছিস? না একখানা গহনা গায়ে, চুলে খড়ি উড়ছে, পরনে একখানা চিম্‌সে দুর্গন্ধওলা কালো কাপড়!

গহনা অন্তর্দ্ধানের ইতিহাস শুনিয়া কমলা চঞ্চলা হরিণীর মত বাহিরে চলিয়া গেল ও রোয়াকে দাঁড়াইয়া কহিল,—ঠাকুরপো, আমার গহনার হাতবাক্সটা কোথায় রাখলে?

সে বেচারা বাড়ীর নির্দ্দেশমত ছোট হাতবাক্সটি চাদর ঢাকা দিয়া সর্ব্বক্ষণ সন্তর্পণে আগলাইতেছিল। কমলার কথায় বাক্সটি বাহির করিয়া মাদুরের এক প্রান্তে রাখিয়া দিল। বাক্স ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়া কমলা ঘরের মধ্যে আসিয়া ঢুকিল। তারপর বাক্স খুলিয়া সে এক কাণ্ড করিয়া বসিল। তাহার মধ্য হইতে চিক, রতনচুর, পাঁয়জোর, মৌরি ও নারিকেল ফুল, জশম ইত্যাদি বাহির করিয়া একে একে যোগমায়াকে পরাইতে লাগিল। যোগমায়া প্রথমটা বেশ আপত্তিই তুলিয়াছিল। কমলা তাহার গালে ছোট্ট একটি চড় মারিয়া সব আপত্তি খণ্ডন করিয়া বলিল, থাম্, সেদিনের এক ফোঁটা মেয়ে, কথার ওপর কথা কোস কোন্ সাহসে! যা বল্‌বো, চুপটি করে শুনবি। জানিস, এ শ্বশুর-বাড়ী। কালসাপিনী ননদিনী—

গহনা পরানো শেষ হইলে খপ্ করিয়া তাহার পায়ে হাত দিয়া বলিল, তুই সম্পর্কে বড়, গালে চড় মেরেছি, পাপ হ'ল তো—তাই। কিছু মনে করিস নে ভাই বউ। এগুলো আমি যতদিন এখানে থাকব, তোর গায়ে থাকবে। খবরদার, খুলেছিস কি—এমন ঝগড়া করব! বাক্সের মধ্যে পচিয়ে রেখে লাভ কি ভাই, তবু এমন গায়ে উঠলে সার্থক হবে! যোগমায়ার গাল টিপিয়া দিয়া কমলা তাহাকে আদর করিল।

যোগমায়ার মনে এতটুকু ক্লেশ আর রহিল না। সমব্যথী না হোক—সমবয়সী মেয়ের কাছে মন খুলিতে না পারিলে বধূ-জীবনের নিঃসঙ্গতা সত্যই অসহ্য লাগে। শুধু গাছপালা লইয়া, বাড়ীঘর দেখিয়া ও সকালের পাটঝাঁট ও সন্ধ্যার প্রদীপ-দেখানোর ব্যস্ততায় মনের কতটুকু ভরিতে পারে! নিজের মন যেখানে মেশে না, বাহিরের কতকগুলি উপলক্ষ লইয়া মন ভরাইতে যাওয়ার মত দুর্ভাগ্য আর কি আছে! প্রথম সুরটি যাঁহারা বাঁধিয়া দিবেন, তাঁহাদের সুরকে রাগিণীবহুল করিতে এই সব পরিবেশের প্রয়োজন। এই বাড়ীঘর, গাছপালা, কর্ম্ম, আলস্য ও গৃহিণীপনা। কিন্তু সুরস্রষ্টার অনুপস্থিতিতে সারা পরিবেশটিই নিষ্প্রাণ বলিয়া বোধ হয়।

রাত্রিতে দুই জনে এক বিছানায় শুইল এবং গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত গল্প করিয়া পরম আরামেই ঘুমাইয়া পড়িল।

৫

গ্রাম দেখা যোগমায়ার ভাগ্যে বড় একটা ঘটিয়া উঠে না। সেই বৈশাখ মাসের প্রথমে সই পাতানো লইয়া একবার যা রাধারাণীদের বাড়ী গিয়াছিল। কিন্তু সে কতটুকু পথই বা। বারেন্দ্রপাড়ায় যাইতে হইলে যেটুকু পাকা রাস্তা পায়ে হাঁটিয়া যাইতে হয়—যোগমায়াকে ততটুকুও হাঁটিতে হয় নাই। বেনে-গলির মধ্য দিয়া হাত পঞ্চাশেক গিয়াই নিবু ভট্টাচার্য্যের বাড়ী পড়ে। তাহাদের খিড়কীর দুয়ারের শিকল নাড়িয়া দুয়ার খোলাইয়া দুই মিনিটের মধ্যেই বারেন্দ্রপাড়ায় পৌঁছান যায়। রাধারাণীদের বাড়ীটা আবার বারেন্দ্রপাড়ার প্রথমেই। কাজেই সংক্ষিপ্ত পথে কুলবধূর সম্ভ্রম যেমন বাঁচিয়া যায়, দু'ধারে দুই চারিটা সজিনা, জাম ও কাঁঠাল গাছ ছাড়া মানুষজন প্রায়ই চোখে পড়ে না। তবু বাড়ীর বাহিরে এই পাড়াগাঁর একটি স্বতন্ত্র রূপ আছে। সঙ্কীর্ণ পথের উপর যে আকাশ—বর্ণে ও বিস্তারে সে বাড়ীর মধ্যকার উঠান-সীমানায় খণ্ডিত আকাশের চেয়ে নূতনতর; পথের ধারে যে সতেজ ও ধুলি-বিবর্ণ গাছ—সেগুলির শাখাপ্রশাখা মেলিবার ধরণ বাড়ীর চেয়ে স্বতন্ত্র; পথের ধাঁরে ছাগল, গরু ও কুকুরগুলিও যেন জীবজগতের এক রহস্যময় অধ্যায়।

আজ ঘোরা পথেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে ইহারা হরি বাঁড়ুয্যের বাড়ী চলিল। এ-বেলা ও-বেলা দুই বেলাই নিমন্ত্রণ। এক দিনেই গায়েহলুদ ও বিবাহ। তা ছাড়া 'এয়ো বরণ' ইত্যাদির জন্য কমলা ও যোগমায়ার আবশ্যক আছে। শাশুড়ী রন্ধনের ভার লইয়া কোন্ সকালে রওনা হইয়া গিয়াছেন। বাড়ী আগলাইবার জন্য পিসিমা বাড়ীতে রহিলেন। কমলা এ গাঁয়ের মেয়ে হইলেও, পাশের বাড়ীর কুমুদিনীর বিধবা মাকে শাশুড়ী বার বার করিয়া বলিয়া দিয়াছেন—মেয়ে ও বউকে সঙ্গে করিয়া সে যেন নিমন্ত্রণ খাওয়াইয়া আনে। গাঁ শুদ্ধ লোকের নিমন্ত্রণ, কুমুদিনীর মাও বাদ পড়েন নাই। তিনি ব্রাহ্মণের বিধবা নহেন বলিয়া ব্রাহ্মণকন্যার হাতে ব্রাহ্মণ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে তাঁহার কোন বাধা নাই।

আগে চলিয়াছেন কুমুদিনীর মা, তার পিছনে যোগমায়া—সব শেষে কমলা। ঘোষালদের আট বছরের মেয়েটা ইহাদের সঙ্গ লইয়াছে, কাজেই কমলাকে সকলের পিছনে পড়িতে হয় নাই। অবগুণ্ঠনটা যোগমায়ারই বেশী এবং কৌতূহলও তাহার প্রবল। পথের দু'পাশে বাড়ীঘর, গাছপালা, মাঠপুকুর কিছুই তাহার দৃষ্টি এড়াইতেছে না। কেবল মানুষজন দেখিলেই বাম হস্তোত্তোলিত ঘোমটাটি স্বস্থানে আসিয়া পড়িতেছে। যোগমায়া স্পষ্ট অনুভব করিতেছে, দোকানে বসিয়া দোকানী কেনাবেচার সঙ্গে সঙ্গে পথের দিকে দৃষ্টি ফেলিয়া রাখিয়াছে, ময়রা তাড়ু নাড়িতে নাড়িতে পথের দিকেই চাহিয়া আছে। জিনিসপত্র হাতে বা মাথায় লইয়া যাহারা পথ অতিবাহন করিতেছে—তাহারাও অন্য পথচারী বা চারিণীদের গতিবিধি সম্বন্ধে সতর্ক। সে দৃষ্টিতে তাহাদের লালসার চেয়ে কৌতূহলই বেশী। তথাপি যোগমায়ার সঙ্কোচ আসিল। কমলা গাঁয়ের মেয়ে, কে কোথায় হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, সে দিকে বড় ভ্রূক্ষেপই করিতেছে না, গল্পে মাতিয়া পথ চলিয়াছে আপন মনে। পিছনের ছোট মেয়েটা সময় সময় মল বাজাইয়া আপন মনে ছড়া কাটিয়া চলিয়াছে।

গ্রাম নয়—শহর। যোগমায়াদের গ্রামের চেয়ে কত বড় আর কেমন পাকা রাস্তা। দু'ধারে ঘন বসতি। বন নাই, নির্জ্জনতা নাই। এখানে উঁচু গলায় কথা বলিলে অনেকগুলি লোকই সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকিবে, এখানে আসশেওড়া গাছের কটু গন্ধ নাকে ভরিয়া বন ঠেলিয়া 'কু—ঘস্ ঘস্' রবে রেলগাড়ী খেলা চলে না, রাস্তার ধূলায় লাফাইয়া জল ডিঙ্গাডিঙ্গি খেলাও না। প্রথম দৃষ্টিপাতে তবু সেই নিস্তব্ধ জনমানবহীন গ্রামের চেয়ে এই শহর-মার্কা গ্রাম কিশোরী যোগমায়ার ভালই লাগিল। বহুদিন পরে বাড়ী হইতে বাহির হইতে পারিয়াছে, বহুদিন পরে গা ভরিয়া গহনা পরিয়াছে, ঠাকুরঝির দামী একখানা চকচকে শাড়ী গায়ে উঠিয়াছে এবং নিমন্ত্রণ খাওয়ার আনন্দ—এই সব মিলিয়াই বুঝি এই শহরতুল্য গ্রামখানি যোগমায়ার মনে অপরূপ সৌন্দর্য্যে ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিল।

ঐ না বিবাহবাড়ী দেখা যায়? অনেক লোকজনের কোলাহল, নহবতের আলাপধ্বনি, কুকুর ঠেঙানো ও পাতা, গ্লাস ফেলার শব্দ। মাছের পিত্ত চোক্‌রা প্রভৃতি পচিয়া একটি তীব্র আঁসটে গন্ধ বাহির হইতেছে। সদর দরজায় লোকজনের ভিড়, ওদিক দিয়া পুরুষ মানুষেরা ব্যস্ত ভাবে যাতায়াত করিতেছে। এই দরজার উপরেই রোশনচৌকি বাজিয়া এই বাড়ীর শুভ কার্য্যের

নির্দ্দেশটি স্পষ্ট করিয়া তুলিতেছে। সদর দরজা দিয়াই হউক বা খিড়কি দিয়াই হউক, বাঁড়ুয্যে বাড়ীর অন্দরে ঢুকিতে হইলে বড় উঠানটি পার না হইয়া উপায় নাই। সে উঠান আজ দেখিবার মত হইয়াছে। অতবড় উঠান—কোথাও ঘাসের চিহ্ন নাই, গাছের চিহ্ন নাই। এ-ধার হইতে ও-ধার পর্য্যন্ত পাল খাটানো। পালের নীচে কাগজের বিচিত্র বর্ণের ফুল লতার শৃঙ্খল, ঝাড় বাতিদানের প্রাচুর্য্য। সুন্দর দেবদারু ও কামিনীপত্রমণ্ডিত বাঁশের খুঁটির গায়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নাগালের বাহিরে কত না পৌরাণিক চিত্র টাঙানো রহিয়াছে। প্রত্যেক চিত্রের মাথায় দুইটি করিয়া তিন-চার-রঙা কাগজের নিশান আড়াআড়ি ভাবে সজ্জিত রহিয়াছে। যেন যাত্রার আসর সাজানো হইতেছে। ধূলার উপর প্রকাণ্ড সতরঞ্চিখানা গুটানো রহিয়াছে। চাদর-গুলি একটু উঁচুতে বাঁশের পাড়ের উপর পাট করিয়া কাহারা রাখিয়া দিয়াছে। একপাল ছেলেমেয়ে সেই গুটানো সতরঞ্চির উপরে পড়িয়া চীৎকার ও হুড়াহুড়ি করিতেছে। আসর-সজ্জাকরেরা কখনও তাড়া দিয়া তাহাদের খেলা বন্ধ করিতেছেন, কখনও বা মৃদু হাসিয়া কার্য্যান্তরে মনোনিবেশ করিতেছেন। কর্ম্মকর্ত্তাদের সকলের হাতেই থেলো হুঁকা ও হাতপাখা, কাঁধে গামছা, কাপড় মালকোঁচা আঁটিয়া পরা। কখনও বাম-হস্তস্থিত থেলো হুঁকায় তামাক টানিতেছেন, কখনও বা ডান হাতের তালবৃন্ত নাড়িয়া হাওয়া খাইতেছেন, কখনও বা এধার-ওধার ছুটিয়া কাজের বন্দোবস্ত করিতেছেন। সমস্ত উঠানটিই একটা হৈ হৈ, হট্টগোলের মধ্যে গম্ গম্ করিতেছে।

দরজার বাহির হইতে কুকুরের একটানা ঘেউ ঘেউ ও খ্যাক্ খ্যাক্ ঝগড়ার শব্দ কানে আসিতেছে। বাড়ীর মধ্য হইতে চাপা হাস্যধ্বনি ও মল পায়জোরের আওয়াজ। রোশন-চৌকি একটানে বাজিয়া চলিয়াছে।

অন্দরের উঠানে পা দিতেই নানা জাতীয় ব্যঞ্জনের সুঘ্রাণে রসনার ঘুম ভাঙিয়া যায়। এ পাড়া ও-পাড়ার যুবক বৃদ্ধ মিলিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে কোমরে গামছা বাঁধিয়া ও পৈতার গোছা গলায় ঝুলাইয়া বাইন হইতে বড় বড় ভাতের হাঁড়ি নামাইতেছে। ও-পাশে প্রকাণ্ড একটা মাটির চৌবাচ্চার উপর তিন-চারিটা ঝুড়ি বসানো আছে। বাইনে এক সঙ্গে দশ-বারটা তোলো হাঁড়িতে ভাত ফুটিতেছে। টুলের উপর বসিয়া কেহ বড় বড় চেলা কাঠ বাইনের মধ্যে ঠাসিয়া দিতেছে, কেহ কাঠের খুন্তিতে ভাত টিপিয়া পরীক্ষা করিতেছে সিদ্ধ হইয়াছে কিনা। ভাত সিদ্ধ হইলে দুই জনে সন্তর্পণে হাঁড়ি নামাইয়া সেই চৌবাচ্চার উপর রক্ষিত ঝুড়িতে উপুড় করিয়া ঢালিতেছে! ফেন ঝরিয়া গেলে দুই দিক হইতে দুইজন বাঁশের হাতল দেওয়া ঝুড়ির দুই প্রান্ত ধরিয়া প্রকাণ্ড একটা লম্বা ঘরে আনিয়া সেই অন্ন স্তূপীকৃত করিতেছে। অন্ন রাখিবার ব্যবস্থাও বেশ। মেঝের উপর দরমা বিছানো, তার উপর সাদা ধবধবে চাদর! সেই বকপক্ষতুল্য চাদরের উপর মল্লিকাফুলের মত অন্নের রাশি স্তূপীকৃত হইতেছে। সে ঘরে যেন শরীরী হইয়া মা অন্নপূর্ণা দেখা দিয়াছেন।

উঠানে যেসব লোক কর্ম্মব্যস্ত রহিয়াছেন, তাঁহাদের অনেককেই যোগমায়া চেনে না। কমলা যোগমায়াব কাছে সরিয়া আসিয়া চুপি চুপি বলিল, ওই যে আমতলায় টুলের ওপর বসে রয়েছে—কে বল দেখি?

যোগমায়া সেদিকে চাহিয়া দেখিল; অবগুণ্ঠন সরাইয়া একটু ভাল করিয়াই চাহিল, কিন্তু চিনিতে পারিল না। লোকটির বয়স খুব কম। কালো হইলেও গঠনে ও মুখশ্রীতে সুন্দর বলাই চলে। চোখ দু'টি বড় বড়, কালো মুখে গোঁপের রেখাটি বেশ পরিস্ফুট, চুল কোঁকড়ানো। লোকটি লম্বা নহে, রোগাও নহে, সবশুদ্ধ মিলিয়া কান্তিমান পুরুষ। এত কোলাহলেও লোকটি কেমন যেন অন্যমনস্ক।

যোগমায়া মাথা নাড়িল।

কমলা হাসিয়া বলিল, তোর সয়া রে।

যোগমায়া আর একবার চাহিল। লোকটি অন্যমনস্ক না থাকিলে যোগমায়ার লজ্জার সীমা-পরিসীমা থাকিত না। রাধারাণীর বর্ণনাগুলি মূর্ত্তি ধরিয়া চোখের সামনে নামিল। ও যদি আমগাছের তলায় ভাতের বাইনের সম্মুখে না বসিয়া যমুনার কূলে কদমতলায় অমনই ভাবে গালে হাত রাখিয়া চিন্তাসমুদ্রে ডুবিয়া থাকিত এবং ওর হাতে যদি বাঁশী থাকিত! এক জায়গায় রাধারাণীর বর্ণনা বড় ফিকে বোধ হইতেছে। ওই শান্তভাবে চুপচাপ বসিয়া থাকা—ও যেন লোকটিকে মানাইতেছে না। চারি পার্শ্বের ওই কর্ম্মকর্ত্তাদের মত ও যদি মুখে চীৎকার ও

পদক্ষেপে দ্রুততা আনিয়া নিজের মূল্য সম্বন্ধে আর পাঁচ জনকে সচকিত করিয়া তুলিত তো সে বড় মন্দ দেখাইত না। রাধারাণীর বর্ণনার সঙ্গে না মিলুক—ওর ওই অন্যমনস্কতার মধ্যে যোগমায়া সইয়ের অনেকবার-বর্ণিত সেই পুরাতন কথাটিকে যেন বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিল। প্রিয়ার বিরহে প্রিয়ের অবস্থা তো এমনই হইয়া থাকে! বিদ্যুতের মত রামচন্দ্র আসিয়া উঁকি দিল, এই কর্ম্মকোলাহলময় বাড়ীতে তার মধুর ও মৃদু হাসির ধ্বনিটি যোগমায়ার কানে বাজিয়া উঠিল।

আহা—হা—এঁটো পাতার ওপর পা দিয়ে ফেললে গা? দাঁড়াও—মা—দাঁড়াও, এক ঘটি জল এনে দেই।

কমলা হাসিয়া রহস্য করিল, সয়াকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলি যে, বউ!

যোগমায়ার গা দিয়া তখন গল্ গল্ করিয়া ঘাম ঝরিতেছে। একবাড়ী লোকের সামনে এ সে কি করিয়া বসিল!

পা ধুইয়া যোগমায়া আরও বেশী কুণ্ঠিত হইয়া চলিতে লাগিল।

স্থূলকায়া বাঁড়ুয্যে-গিন্নী সাদর অভ্যর্থনা করিলেন, এই যে, এতক্ষণে আমার কমলমণির দেখা মিলল। ও-ঘরে মেয়েরা বসে আছেন, খেতে বসতে পারছেন না। আহা, থাক, থাক, বউমাকে যেন রোগা রোগা ঠেকছে! চিবুক ধরিয়া চুমা খাইয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন। প্রকাণ্ড মুখে তাঁহার দুই ভরি ওজনের ফাঁদি নথটা সেই হাসির তালে তালে দুলিতে লাগিল।

মুখ নামাইয়া যোগমায়া তাঁহার গরদ শাড়ী-মণ্ডিত বিশাল দেহের পানে চাহিল। যেমন প্রকাণ্ড চকৃমিলানো বাড়ী, তেমনই বিবাহের সমারোহময় অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে গৃহিণীও দেহ ও অলঙ্কারের মহিমা লইয়া লোকের সম্ভ্রম ও বিস্ময় কুড়াইতেছেন। সের দুই-আড়াই সোনা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে চাপানো আছে, তবু ভার না হইয়া সেই সোনাই ভূষণের মত দেখাইতেছে।

মেয়েটি অর্থাৎ কনে গৃহিণীর মতই গৌরী, কিন্তু দেহমর্য্যাদায় সমভাগিনী নহে। সারা দিনের উপবাসে মুখখানিতে তার ক্লান্তির ছায়া পড়িয়াছে, একটু শুকাইয়াছে। কিন্তু শুকনা মুখে পাণ্ডুতার বদলে একটি জ্যোতি বাহির হইতেছে। বইয়ে-পড়া তপস্যার জ্যোতির মত সেই ঔজ্জ্বল্য। লালপাড় শাড়ী হলুদ রঙে রঞ্জিত, কপালে হলুদ, হাতে কাজললতা, চুলগুলি এলো। তপস্যার দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়া মেয়েটি যেন অভীষ্টলাভের পথে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে।

বেশী দিনের কথা নহে, তবু এই মেয়েটির মধ্যে যোগমায়া যেন নিজেকে এক বার ভাল করিয়া দেখিল।

মা, খিদে পেয়েছে।

আগে বিয়ে হোক, তার পর খাস।

হাঁ, পারি নাকি সারা দিন উপোস করে থাকতে!

এই একটি দিন তো, মা। একটু না সইলে কি হয়।

এ মেয়ে গৌরীকাল উত্তীর্ণ হইয়া কুমারীকালে পড়িয়াছে, সুতরাং, ক্ষুধার জন্য সে হয়ত বায়না ধরে নাই। এই নারীজীবন-প্রতিষ্ঠামুখে পুণ্য ব্রত-উপবাসের অনিবার্য্য অনুষ্ঠানটিকে হয়ত বা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। মুখখানি তাহার শুকাইয়া ঈষৎ মলিন হইয়াছে মাত্র। মলিন হইয়াছে এবং মহিমান্বিতও হইয়াছে।

একান্তে পাইলে মেয়েটির সঙ্গে যোগমায়া একটু আলাপ করিত হয়ত। কিন্তু আহারের ডাকে সকলেই হুড়মুড় করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। কচি ছেলেমেয়েগুলি ককাইয়া উঠিল, বড় ছেলেমেয়েগুলি লাফালাফি ঠেলাঠেলি জুড়িয়া দিল। মেয়েরাও নীরব রহিলেন না, কিলটা চড়টা কাহারও পৃষ্ঠে বা গালে বসাইয়া দিয়া অনুচ্চকণ্ঠে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। সেই চীৎকারে মনে হইল এই ঘরের ছাদটাই বা মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়ে!

রন্ধনের সুখ্যাতি রটিল। খাইতে বসিয়া যোগমায়ার মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। এই প্রশংসার অনেকখানিই যেন যোগমায়ার প্রাপ্য।

কে রেঁধেছেন গা? রামের মা? চমৎকার। এমন সুক্তো, এমন মোচার ঘণ্ট, এমন ছোলার ডাল এ তল্লাটে কেউ রাঁধুক দিকি!...আর ওই বুঝি ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া এককোণে রামের বউ খাইতে বসিয়াছে? বেশ বউ। যেমন শাশুড়ী করিৎকর্ম্মা, তেমনি সুন্দর বউ ও বউও এক দিন—

ওকি বউমা, কিছু যে খাচ্ছ না? সব পাতে পড়ে রইল যে! ভাল লাগছে না বুঝি? রোজ যে অমন্ত খায়—

কিন্তু তা নয়, এই সুরন্ধিত ব্যঞ্জনের চেয়ে

সুউচ্চারিত উচ্ছ্বসিত প্রশংসাধ্বনি সে আকণ্ঠ গলাধঃকরণ করিতেছে। ব্যঞ্জন মাত্র রসনাকে তৃপ্তি দিতে পারে—প্রশংসা যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের—

পাশে বসিয়া একটি বউ মাটির গ্লাসে কিছু কিছু তরকারি জমা করিতেছিল। যোগমায়া এদিকে চাহিতেই একটু অপ্রতিভের হাসি হাসিয়া বলিল, কি করি মা, ওঁয়ার বড় অসুখ, দু'মাস জ্বরে শয্যেগত—অরুচি! তাই একটু ভাল তরকারি,—পাশের ছেলেটিকে ধমক দিয়া বলিল, হাউড়ের মত খাচ্ছে দেখ তরকারি গুচ্ছেক। আসুক বঁদে আসুক—গিলোখ'ন।

যোগমায়ার দিকে ফিরিয়া কহিল, আমায় চিনতে পারছ না বোধ হয়! যেদিন গাঙ্গুলী-বাড়ী সই পাতাতে যাও, সেদিন—ওদের জ্ঞেয়াত হই কিনা! দশ রাত্তিরের জ্ঞেয়াত। ওদের অবস্থা ভাল, আর—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বউটি চুপ করিল।

বউটির মুখে লোভের ছায়া দেখিয়া যোগমায়া প্রথম হইতেই অনুমান করিয়া লইয়াছিল যে, ইহাদের অবস্থা সচ্ছল নহে। রাধারাণীদের জ্ঞাতি শুনিয়া সে তাহাকে রাধারাণী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার জন্য মনে মনে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

তাহার মুখে-চোখে আগ্রহের আধিক্য দেখিয়া বউটিই বলিল, কিছু বলবে, মা? বল।

তথাপি অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া যোগমায়া মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—সই কেমন আছে?

তোমার সই? তা ভালই আছে। কিন্তু—একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বউটি আপন মনে বলিতে লাগিল, কপালে না থাকলে—দেবতার সাধ্যি কি দেয়—এই দেখ না মা, চার-পাঁচটায় আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করে মারছে দিনরাত। মরেও না তো একটা—আপদ যায়!

যোগমায়া শিহরিয়া উঠিয়া মনে মনে বলিল, ষাট! ষাট!

বউটি বলিল, অথচ দেখ, যারা আরাধনা ক'রে আসে—তাদের কপালে সুখ হয় না। একটি ছেলের একটি বউ—পেরথম নাতি, কত না সাধ-অহ্লাদ মানুষের মনে। পোড়া বিধাতা সেইখানেই বাদ সেধে বসে আছেন। মরণও হয় না যমের।

যোগমায়ার কণ্ঠতালু শুকাইয়া উঠিল, উদ্বিগ্ন স্বরে সে প্রশ্ন করিল, সইয়ের ছেলে—

ছেলেই হয়েছিল, মা। সোনার চাঁদ ছেলে—ঘর আলো-করা রাজপুত্তুর। কিন্তু 'নত্তা'র দিন সেই যে কাঁদতে সুরু করলে—দু'দিন গেল না। বাবা পাঁচুঠাকুরই জানেন, কেন এমন ধারা করলেন!···

বঁদে ও দই আসাতে বউটি ওদিকে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ছেলের গ্লাসের জলটা ঢক্ ঢক্ করিয়া পান করিয়া সেই গ্লাসে বঁদে সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

যোগমায়ার চক্ষে তখন দিনের আলো নিবিয়া গিয়াছে! ঘোমটাটা বাঁ হাতের উল্টা পিঠ দিয়া আর একটু টানিয়া দিয়া সে নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল।

৬

প্রথম আঘাত বুকে বেশী লাগিবারই কথা। স্বল্পভাষিণী বলিয়া যোগমায়ার ব্যথা বিশেষ কেহ টের পাইলেন না। টের পাইবার অবসরই বা কোথায়! বিবাহ-বাড়ীর নিমন্ত্রণ-পর্ব্ব শেষ হইতে-না-হইতে জয়মঙ্গলবারের পূজা আসিয়া পড়িল। সোমবারের বৈকালে প্রত্যেকের জন্য সতেরটি করিয়া কাঁঠালপাতা, বেলপাতা ও দূর্ব্বা তুলিয়া আঁটি বাঁধিতে হইবে। ঘরের মেঝেয় সাদা আলিপনার লতাপাতা কাটিয়া একটি করিয়া কড়ির ছোট ঝাঁপি (ঝাঁপির মধ্যে আলতা, সিঁদুর, নোয়া, শাঁখা, ছোট আরসী, চিরুণী প্রভৃতি সধবা নারীর নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ থাকে।) বসাইয়া তার কোলে দূর্ব্বা, কাঁঠালপাতার আটি, কলা, তালশাঁস, আম, সন্দেশ প্রভৃতি সাজাইয়া রাখিতে হইবে! বাড়ীতে যতগুলি স্ত্রীলোক আছেন—প্রত্যেকের জন্য এই আয়োজন। চার জনের জন্য বড় কম কাঁঠাল পাতা বা দূর্ব্বা বিল্বপত্র গুছাইতে হইবে না। আগের দিন না তুলিয়া রাখিলে সদ্য সদ্য আয়োজন করা কঠিন। তার উপর এটি হইতেছে শেষ মঙ্গলবার, পূজা ও ব্রত পালনের একটু বিশেষ রকম উদ্যোগ আছে বইকি।

আশ্চর্য্য মানুষের মন! পাতা ও দূর্ব্বা তুলিবার কালে কমলার মুখে দেবী মঙ্গলচণ্ডীর উপাখ্যান শুনিতে শুনিতে যোগমায়ার চিত্ত সেই পৌরাণিক যুগের প্রতিবেশে মগ্ন হইয়া গেল। সেই চিরমহিমান্বিত দুর্গম কৈলাসপর্ব্বত; ভাঙ ধুতুরা সেবনে অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে বিশ্বের সংহারকর্ত্তা, বিল্ববৃক্ষমূলে বাঘছাল পরিয়া ও বিভূতি লেপন করিয়া বসিয়া আছেন, পার্শ্বে অর্দ্ধপ্রোথিত ত্রিশূলের উপর গৈরিকরঞ্জিত ভিক্ষার ঝুলি! অদূরে বসিয়া নন্দীভৃঙ্গী ভাঙ পেষণ করিতেছে, আর দেবী দুর্গা সেই

যোগীরাজের একান্ত সন্নিকটে বসিয়া এই পুণ্য ব্রতকথার ইতিহাস বলিয়া যাইতেছেন। যাঁর ঔষধান্তের মধ্যে মঙ্গলময় মৃত্যুর ইঙ্গিত, তাঁরই সম্মুখে নশ্বর জীবের সুস্থ দেহে ও স্বচ্ছন্দ মনে বাঁচিয়া থাকিবার কাহিনী দেবী বলিয়া যাইতেছেন। জীবন আর মৃত্যু পাশাপাশি চলিয়াছে বলিয়া—দুই জনকে আশ্রয় করিয়া পালনকর্ত্তার সৃষ্টিকে কেমন পরিপূর্ণ মনে হইতেছে।

মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা যোগমায়া কত বার শুনিয়াছে, কিন্তু সে শুনায় প্রাণের যোগ ছিল না। রাধারাণীর জন্য বেদনা-বোধ ও তার মঙ্গল কামনাই আজ যোগমায়াকে এমন মনোযোগী শ্রোত্রীতে পরিণত করিয়াছে! আহা, সই না জানি কত কষ্ট পাইয়াছে? এখনও তার চোখের জল হয়ত শুকায় নাই। সরবে না হউক, রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া নিত্য সে চোখের জলে বালিশ ভিজাইয়া কাঁদে। এ-সময়ে একবার যদি সে রাধারাণীর কাছে যাইতে পারিত! দেবতারা অন্তর্য্যামী। আর কিছু না পারুক—যোগমায়া তাঁহাদের কাছে প্রার্থনা করিতে পারিবে।

হে মা মঙ্গলচণ্ডী, আমার সইকে কষ্ট ভুলাইয়া দাও। আবার যখন দেখা হইবে, তখন সইয়ের মুখে হাসিটি যেন সে দেখিতে পায়।

কমলা বলিল, বউ, আজ বড্ড অন্যমনস্ক তুই। ক-গণ্ডা কাঁঠালপাতা, বেলপাতা আর দুব্বো দিয়ে আটি বাঁধলি?

কেন, সতেরটি করেই দিয়েছি তো।

উঁহু, গোণ দেখি।

গণিয়া একগণ্ডা করিয়া কম হইল। কমলা হাসিয়া বলিল, বাপের বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছে বুঝি?

যোগমায়া ঘাড় নাড়িল।

তবে বুঝি দাদার জন্যে?

এ রহস্যেও যোগমায়ার মুখ সরমরাগরঞ্জিত হইয়া উঠিল না, মাথা নাড়িয়া ও ভ্রূকুটি করিয়া কহিল না, যাও। শুধু তাহার চোখ হইতে কয়েক ফোঁটা জল টপটপ করিয়া গড়াইয়া পড়িল।

কমলা বিস্মিত হইয়া কহিল, তুই কাঁদছিস? হ'ল কি বউ?

ফোঁটা ধারায় রূপান্তরিত হইল। যোগমায়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। হতবিস্ময়ে কমলা বলিল, ওমা কেঁদে ভাসালি যে! আমি তো তোকে এমন কিছু বলি নি—!

না, ঠাকুরঝি। অনেক কষ্টে কান্নার বেগ থামাইয়া সে বলিল, পরশু নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে শুনলাম, সইয়ের ছেলে হয়ে মরে গিয়েছে।

বটে, কার মুখে খবর পেলি?

ওদের জ্ঞাতি হয়—সেই যে বউটি আমার পাশে বসেছিল—তারই মুখে শুনলাম।

আহা! খানিক চুপ করিয়া কমলা প্রবোধ দিয়া বলিল, জগতের ধারাই এই ভাই। সে ছেলে শত্রু, নইলে এমন কষ্ট দেবে কেন! তুই কাঁদিস নে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে তোর সই যে সেরে উঠেছে—সেই ভাল।

কেন ঠাকুরঝি—ও কথা বললে কেন?

ছেলে হওয়া মানেই জন্মমৃত্যুর কথা। দুটো দু-ঠাঁই হওয়া যে কত মানত করে হয—তা জানিস? সাধ দেয় কেন? পাঁচ ভাজা করে, পায়েস করে, ভাল কাপড় পরিয়ে—পাঁচটা ভাল তরকারি বেঁধে খেতে দেয় কেন! ছেলে হ'তে গিয়ে অনেক পোয়াতীই মারা যায় কিনা। তাই জন্মের খাওয়া—

যোগমায়া শিহরিয়া উঠিয়া কমলার আঁচল চাপিয়া ধরিয়া অস্ফুট কণ্ঠে বলিল, মা মঙ্গলচণ্ডী করুন—সই আমার শীগ্‌গির ফিরে আসুক।

কমলাকে বলিয়া ভার অনেকটা লঘু হইল। হাল্কা মনে যোগমায়া গুণিয়া গুণিয়া বেলপাতা, কাঁঠালপাতা ও দূর্ব্বার আঁটি বাঁধিতে লাগিল।

পূজা ও কথা শেষ হইলেও যোগমায়ার প্রণাম করা আর শেষ হয় না। মা মঙ্গলচণ্ডীর কাছে আকুল মনেই সে প্রার্থনা করিতে লাগিল।

শাশুড়ী বলিল, দেখ কমলি, ঐ বড় খোরাটায় এক কাঠা চাল ভিজিয়ে দে। দইটা বসেছে কিনা দেখ্‌ দিকি।

না মা, জল টল্‌ টল্‌ করছে এখনও।

আমার তো মনে ছিল না—ভোরবেলায় দুধে দম্বল দিয়েছি। বোধ হয় দম্বল কম হয়েছে। না-হয় একটু তেঁতুল দিয়ে রাখ—খানিক পরে জমে যাবে'খন।

আজ আর রান্নার পাট নাই।

কমলা বলিল, তাস খেলবি, বউ?

যোগমায়া বলিল, আমি তো গ্রাবু খেলতে জানি নে।

না-হয় পেটাপিটি। দু-জনে দেখা-বিন্তি খেলাও হয। খেলবি? এবং যোগমায়ার সম্মতির অপেক্ষা না রাখিয়া কুলুঙ্গি হইতে একজোড়া ধূলামাখা তাস

বাহির করিয়া আঁচল দিয়া ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, এমন করেও রেখেছিস? সব আছে তো?

গণিয়া একখানা কম হইল। কিন্তু কোনখানা কম হইল ধরা কঠিন।

কমলা বলিল, আবার গোণ। আমি চিড়িতন হরতন সব আলাদা করে রাখছি, তেরখানা করে তাস প্রত্যেক ভাগে। যেটায় কম হবে, গুণে আমায় বলবি।

গণিয়া হরতনের সাহেব পাওয়া গেল না। কমলা রহস্য কবিয়া বলিল, তা-ও বেছে বেছে লাল সাহেবটিই মিলছে না! একেই বলে কপাল! বলিয়া হাসিয়া যোগমায়াকে একটা ঠেলা দিল।

যোগমায়াও হাসিল। কহিল, তা'হলে খেলা হবে না তো?

ইস্, হবে না বৈকি। এই হরতনের ত্বরিটা যেন সায়েব হ'ল। কেমন।

কিন্তু যোগমাযাকে লইয়া খেলা জমিল না। কমলা রাগ করিয়া উঠিয়া গেল। হয়তো পাড়ায় বেড়াইতে গেল—কিংবা আর কোন খেলুড়ের সন্ধানে।

খানিক পরেই ও-ঘর হইতে পিসিমা ডাক দিলেন, বউমা কি ঘুমিয়েছ?

দুয়ারটা ভেজাইয়া দিয়া যোগমায়া পিসিমার কাছে গিয়া বসিল।

পিসিমা আঁচলের খুঁট হইতে একখানা ভাঁজ-করা চিঠি বাহির করিয়া কহিলেন, তোমার চিঠি—এই মাত্র নন্দী গয়লানী দিয়ে গেল। ওর ছেলে পানপাড়ায় বকনা বাছুর কিনতে গিয়েছিল কিনা, পথে বেয়াইবাড়ী পড়ে, তাঁরাই দিয়াছেন।

আগ্রহভরে যোগমায়া চিঠিখানি পড়িতে লাগিল এবং খানিকটা পড়িয়াই মুখখানি তার শুকাইয়া গেল। পিসিমা চরকায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তুলা ফুরাইয়া যাওয়াতে ও-পাশের পাঁজ ঠিক করিবার জন্য যেমন তিনি মুখ তুলিয়াছেন, অমনই যোগমায়ার নিশ্চল শুক্‌না মুখখানি তাঁহার চোখে পড়িল। ব্যগ্রস্বরে প্রশ্ন করিলেন, খবর সব ভাল তো, মা? ওকি অমন ক'রে চেয়ে রইলে যে?

পিসিমা? ক্রন্দনের আবেগে যোগমায়ার পাতলা ঠোঁট দু'খানি কাঁপিয়া উঠিল।

চরকা এক পাশে রাখিয়া পিসিমা এধারে সরিয়া আসিয়া কহিলেন, কি, মা? কারও কি অসুখ করেছে?

বাবার খুব অসুখ। বলিয়া যোগমায়া কাঁদিয়া ফেলিল। সান্ত্বনা দিয়াও পিসিমা সে কান্না রোধ করিতে পারিলেন না।

কমলা পাড়া হইতে আসিয়া কত বুঝাইল, তাহাতেও যোগমায়ার মন বুঝিল না। অবশেষে শাশুড়ী বলিলেন,—যাই, পাল্কী নিয়ে আসি গে একখানা! এই অবেলায় বাপের বাড়ী যাওয়া,. কি জানি বাপু, আমাদের কালে এমন অনাছিষ্টি তো দেখি নি!

কমলা বলিল, পরশু পিসিমাকে নিয়ে আমি দেখতে যাব বউ। ভয় কি, মা বাগ্‌দেবী বড় জাগ্রত দেবতা, পঞ্চমুণ্ডির আসন আছে ওখানে। মানত কর—জোড়া পাঁঠা দিয়ে পুজো দিবি মার, মা সব মঙ্গল করবেন।

মন বিচঞ্চল থাকিলে ঠাকুরদেবতাকে একমন হইয়া ডাকাও যেন চলে না। স্থির বিশ্বাসের মূলে—সংশয় আসিয়া অনবরত আঘাত করিতে থাকে। বিপদের দিনের মন—যেন চৈত্রবায়ু-তাড়িত পেঁজা তুলার রাশি।

বকুলতলায় যোগমায়ার পাল্কী নামিল, জনপ্রাণী কেহ সেখানে ছিল না! পাড়ারই একজন ভিন্ন-জাতীয় অনুগত বর্ষীয়ান যোগমায়ার রক্ষী হইয়া সঙ্গে আসিয়াছিল। যোগমায়া পাল্কী হইতে নামিলে সে বলিল, যাও মা, বাড়ীর মধ্যে যাও। ভয় কি? আমি গাছতলায় দাঁড়াচ্ছি। একটা খবর পাঠিয়ে দিও—বেয়াই কেমন আছেন।

একটু পরে বছর দশেকের একটি ছেলে বকুল-তলায় আসিয়া বলিল,—আপনি একবার বাড়ীর ভেতর আসবেন? মা ডাকছেন।

তুমি কি রামজীবনবাবুর ছেলে? ছেলেটি মাথা নাড়িলে লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আছেন তোমার বাবা?

ভাল। ঘুমুচ্ছেন তিনি। বাঃ রে, আপনি বাড়ীর মধ্যে না গেলে মা রাগ করবেন যে।

তোমার মাকে বলো—বেয়াই ভাল হ'লে আর একদিন এসে জলখাবার চেয়ে খেয়ে যাব, বুঝলে বাবা? আজ তো আর বেলা নেই, এক কোশ পথ ভাঙ্‌তে রাত্রি হয়ে যাবে।

ছেলেটির চিবুক ধরিয়া আদরের ভঙ্গিতে তিনি বার কয়েক নাড়িয়া দিয়া বেহারাদের বলিলেন,পাল্কী ওঠা হরিয়া। অন্ধকার রাত—বনের পথ—

যোগমায়াকে দেখিয়া লবঙ্গলতা একরূপ ছুটিয়াই

দাওয়া হইতে নামিয়া আসিলেন। যোগমায়াও মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ছোট মেয়েটির মতই ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মা নিজের চোখের জল মুছিবেন, না মেয়েকে সান্ত্বনা দিবেন, ঠিক করিতে না পারিয়া উঠানের মাঝখানেই হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। এমন সময় কলুপাড়ার রাঙাখুড়ি খিড়কির দুয়ার দিয়া এ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই আলিঙ্গনাবদ্ধ মা ও মেয়েকে তদবস্থায় দেখিয়া বলিলেন, কে, যুগি না? কাঁদছিস কেন? অসুখ কি কারও হয় না। ধন্যি অসহ্যি তোর লবঙ্গ। বুড়ো মাগী—কোথায় মেয়েকে বোঝাবি—না হাউ হাউ করে কেঁদে মরছিস! ছি!

লবঙ্গ যোগমায়াকে ছাড়িয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, মন যে বোঝে না, খুড়ি।

কপালখানা মনের। বোঝে না বলে কাঁদলেই রোগ সেরে যাবে? তোর কান্না শুনলে রুগী চুপ.ভাঙ্গা হবে না? ওর—অমঙ্গল হবে না? আয় যুগি, উঠে আয়। হাত মুখ ধো, একটু জিরো। যোগমায়ার হাত ধরিয়া তিনি দাওয়ায় উঠিলেন।

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবা কোন্ ঘরে?

লবঙ্গ বলিলেন, বড় ঘরে। একটু ঘুম আসছে বোধ হয়।

রাঙাখুড়ি বলিলেন, ভালই তো, ঘুমুক। হৈ চৈ করে—ঘুম ভাঙ্গাস নে। রুগী মানুষ—ঘুমুলেই সেরে যাবে।

যোগমায়ার ছোট ভাইটি এমন সময় বাড়ীর মধ্যে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে উঠান হইতে হাঁকিল, মা, পাল্কী নিয়ে ওরা চলে গেল যে।

রাঙাখুড়ি বলিলেন, চুপ, চেঁচাস নে। চলে গেল তো মা কি করবে?

বাঃ রে, মা যে বললে, জল খাবার খেয়ে—

আচ্ছা—আচ্ছা, তুই থাম তো বাবা।

ছেলেটি চলিয়া যাইতেছিল, রাঙাখুড়ি ডাকিলেন, ও হরি, শোন। কবিরাজ মশায়ের বাড়ী গিয়েছিলি আজ? কি বললেন তিনি?

কি আর বলবেন! বেলপাতার রস মধু দিয়ে সকালের ওষুধ, আর সন্ধ্যে বেলায় তুলসী পাতার রস। বললেন, ভয় নেই, ভাল হ'য়ে যাবে।

ভাল হ'য়ে যাবে—আমি জানি। তবে যে কাল বলছিলেন—জ্বরটা বাঁকা, কিছুদিন সময় নেবে।

তা আমি কি জানি! বলিয়া সে গমনোদ্যত হইল।

লবঙ্গ বলিলেন, ছেলের কেবল চব্বিশ ঘণ্টাই যাই যাই। বাড়ীতে রুগী, একটু কাছে বসলেও তো উবগার হয়।

উঠান হইতে মুখ ভেংচাইয়া ছেলে বলিল, হাঁ হয়! হাওয়া করে করে আমার বলে হাত ব্যথা হ'য়ে যায়! ঐ তো দিদি এলো, করুক না হাওয়া। সে আর সেখানে দাঁড়াইল না।

রাঙাখুড়ি বলিলেন, ছেলেমানুষ, ওরা তো ছট্ফট্ করবেই। রুগীর কাছে বসে থাকতে কি ওরা পারে!

লবঙ্গ বলিলেন, তুমি জান না, রাঙাখুড়ি—হরিটা ছেলেবেলা থেকেই অমনি আপ্তসারা। কেউ মলেও চোখ মেলে দেখে না।

রাত তখন ন'টাই হইবে। এ বাড়ীর আহারাদি শেষ হইয়া গিয়াছে। মেঝের উপর ঢালা বিছানা পাতা; হরি একটা ছোট পাশ-বালিশ জড়াইয়া তাহার এক কোণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, মাঝখানে রামজীবন চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছেন। ঘুমাইতেছেন কি না বুঝা যায় না। মাঝে মাঝে তাঁহার মুখ হইতে অস্ফুট একটা গোঙানির শব্দ বাহির হইতেছে। লবঙ্গলতাও শুইয়াছেন এবং শুইবামাত্রই তাঁহার ঘুম আসিয়াছে। একা মানুষ, দিনে সংসারের ও রাত্রিতে রোগীর সেবা করিয়া দুটি দিনেই তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। যোগমায়ার হাতে আজ রোগীর ভার দিয়া তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছেন। ওঘরে রাঙাখুড়ি আসিয়া শুইয়াছেন। দুই দিনই তিনি লবঙ্গকে আগলাইবার জন্য এ বাড়ীতে শয়ন করিতেছেন। নিশুতি রাত্রিতে একটা গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িলেও মানুষ সেই শব্দে চমকাইয়া উঠে, ঘরের কানাচ দিয়া কত কুকুর শিয়াল যে থ্যাক্ থ্যাক্ শব্দে সারারাত্রি ছুটাছুটি করে! যদিও ওঘর হইতে—রাত্রির প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রাঙাখুড়ির নাসিকাধ্বনি শোনা যায়, তথাপি নিদ্রিত মানুষকে সঙ্গী করিয়াও জাগ্রত মানুষের বুকে সাহস জাগে। রাঙাখুড়ি বিধবা মানুষ। রাত্রিতে আচমনী জিনিষ অর্থাৎ তেলে বা ঘিয়ে ভাজা কোন জিনিষ খান না। কোনদিন কাঁচা ময়দায় ঘি মাখিয়া, কোনদিন একটু দুধ, কোনদিন বা একটা কলা ও দু'খানা

বাতাসা জল খাইয়া তিনি রাত্রির আহার সমাধা করেন। যোগমায়াদের বাড়ীতে শুইতেছেন বলিয়া—রাত্রির জলযোগের ব্যবস্থা লবঙ্গলতাকেই করিতে হয়।

রামজীবনের শিয়রে জাগিয়া বসিয়াছিল—যোগমায়া। হাতের পাখাটা তার বহুক্ষণ চালনার ক্লান্তিতে কিছু শিথিল হইয়াছে। রাত্রির নিস্তব্ধতার মাঝে নিজের বুকের শব্দটিও সে যেন কান পাতিয়া শুনিতেছে! মার নিশ্বাস পড়িতেছে জোরে জোরে, বাবার মুখ হইতে মাঝে মাঝে একটা চাপা নিশ্বাস গোঙানির মতই বাহির হইতেছে, হরি নিঃশব্দে ঘুমাইতেছে। বাবার সারা গা হইতে একটা গন্ধ বাহির হইতেছে। ঠিক দুর্গন্ধ নহে—'অসুখ' 'অসুখ' গন্ধ। এই গন্ধটা নাকে অসহ্য না হইলেও, মনে ঈষৎ ভাবনা ও ভয়ের সঞ্চার করে বৈ কি! মৃদুস্বরে যোগমায়া দুই এক বার ডাকিল, বাবা, ও বাবা। তিনি উত্তর দিলেন না। সেই মৃদুস্বর দেয়ালে ঠেকিয়া যোগমায়ার বুকেই ফিরিয়া আসিল। বুকের স্পন্দন দ্রুততর হইল। হাতের পাখাটাও সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চল হইল। ঘরের কোণে রেড়ির তেলের অনুজ্জ্বল প্রদীপটির আয়ুও যেন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে!

সিন্দুকের ওপাশে খুট করিয়া ইঁদুর চলার শব্দ হইল। বিড়ালটা চটের উপর শুইয়া ঘড়র ঘড়র শব্দে ঘুমাইতেছে। যোগমায়া দ্রুততর বক্ষ স্পন্দনের সঙ্গে প্রায় রুদ্ধশ্বাস হইয়া ডাকিল, এই কালি—কালি—ইস্—স।

বিড়াল চোখ মেলিয়া চাহিল। চাহিয়াই ডাকিল, মিউ। যোগমায়ার শুষ্ক কণ্ঠ সরস হইয়া উঠিল, হাতের পাখা ধীরে ধীরে আবর্ত্তিত হইতে লাগিল, প্রদীপের শিখাটা মনে হইল—আর একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। যা ভয় ভয় করিতেছিল!

চোখ মেলিয়া রামজীবন চাহিলেন, একটু জল—দাও না?

যোগমায়া জীবনের জগতে নামিল। জল খাবে বাবা, জল?

রামজীবন উত্তর না দিয়া হাঁ করিলেন। পার্শ্বের কুলুঙ্গিতে রেকাব ঢাকা দেওয়া জলের গ্লাস ছিল, যোগমায়া তাড়াতাড়ি গ্লাস লইয়া পিতার মুখে ঢালিয়া দিতে লাগিল।

জল খানিকটা পান করিবার পর রোগী মাথা নাড়িলেন। হাত নড়িয়া খানিকটা জল তাঁহার মুখের উপর গড়াইয়া পড়িল। রামজীবন চমকাইয়া প্রশ্ন করিলেন, কে? এতক্ষণে তিনি বুঝি সম্পূর্ণ চৈতন্য লাভ করিলেন।

আঁচল দিয়া তাঁহার মুখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে যোগমায়া উত্তর দিল, আমি, বাবা।

হরি?

না বাবা, আমি তোমার মায়া।

মায়া! আরক্ত চক্ষু মেলিয়া তিনি যোগমায়ার পানে চাহিলেন। দৃষ্টিতে রোগযন্ত্রণার মধ্যেও অর্দ্ধ-পরিচয়ের রশ্মি যেন ফুটিয়া উঠিল। খানিকটা বিস্ময় ও খানিকটা আনন্দের আলোও সেই পরিশুষ্ক আরক্ত চক্ষুর তারায় প্রতিবিম্ব ফেলিয়া খানিকক্ষণের জন্য স্থির হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ তাহার পানে চাহিয়া থাকিবার পর তিনি অস্ফুটে উচ্চারণ করিলেন, মায়া? আঃ!

দৃষ্টি আবার ঘোলাটে হইয়া আসিতেছে দেখিয়া যোগমায়া তাঁহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল, আমায় চিনতে পারলেন না, বাবা?

ঘোলাটে দৃষ্টি পুনরায় স্বচ্ছ হইয়া উঠিল। তিনি মাথা নাড়িয়া—মুখে হাসি টানিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন, চিনিতে পারিয়াছেন।

যোগমায়া বলিল, কথা কইতে কষ্ট হচ্ছে? বুকে হাত বুলিয়ে দেব?

হুঁ। বলিয়া তিনি ডান-হাতখানি শূন্যে তুলিয়া যোগমায়ার একখানি হাত টানিয়া লইয়া নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিলেন।

যোগমায়া বলিল, কিছু খাবে, বাবা?

আবার তিনি মাথা নাড়িলেন; অস্ফুট স্বরে দুই-একবার কি বলিলেন ও যোগমায়ার হাত ছাড়িয়া দিয়া কাঁথার মধ্যে হাতখানি ঢুকাইয়া পৈতার গোছাটা টানিয়া বাহির করিয়া করাঙ্গুলি আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিড় বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। যোগমায়া বুঝিল না—জ্ঞানের রাজত্বে পা দিয়াই সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মণের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ত্তব্যের তাড়নায় তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। ভয়ে সে নিদ্রিত মাতাকে টানিয়া উঠাইল। মা, ওমা, বাবা কেমন করছে দেখ না?

লবঙ্গলতার নিদ্রা আজ গাঢ়। গুরু চিন্তার অংশ ভাগ করিয়া দিয়া মানুষ এমনই নিশ্চিন্ত হয়। উঃ, বলিয়া পাশ ফিরিয়া তিনি শুইলেন।

যোগমায়ার আর্ত্তকণ্ঠস্বরে রামজীবনের মোহাচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া গেল, পৈতায় জড়ানো হাতখানি দিয়া যোগমায়ার বাহুমূল ধরিয়া কহিলেন, কখন এলে, মা?

আজ সন্ধ্যেবেলায়। তুমি অমন করছিলে কেন, বাবা ?

না—রে, অমন করি নি। হাসিয়াই তিনি বলিতে লাগিলেন, ওকে ডাকিস্ নে বুড়ি। অনেক দিন ও ঘুমোয় নি—ভারি কষ্ট গেছে। আজ কি বার রে ? মঙ্গলবার ?

মঙ্গলবার।

জ্যৈষ্ঠ না আষাঢ় মাস ?

কাল জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি।

কাল! একটু থামিয়া বলিলেন, তাই ত বুড়ি, এবার অম্বুবাচীর পরেই যে রথ। তোর শ্বশুরবাড়ীতে যাওয়া হ'ল না!

আমি তো এখানে এসেছি, বাবা। তুমি ভাল হয়ে ওঠ, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে—

যাবি ? আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবি ? না বুড়ি, রথের দিন পাঁপড় ভাজা, কাঁঠাল, আনারস আর ইলিশ মাছ দিয়ে তত্ত্ব পাঠাব ভেবেছিলাম! তা তখন কি সেরে উঠব ?

উঠবে—উঠবে।

একটু মাথায় হাত বুলিয়ে দে। না ন', বসে থাকিস নে, শুয়ে পড়; অনেক পথ এসেছিস—শুয়ে পড়।

অগত্যা যোগমায়াকে শুইতে হইল।

রামজীবন জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর শাশুড়ী যে বড় পাঠালে তোকে ?

বাঃ, তোমার অসুখ, পাঠাবেন না!

তা হলে কার জিত হ'ল, বুড়ি? সেবার তুই আসতে চাইলি—আমি আনলাম না। এবার আমি আনলাম না—অথচ তুই এলি! কার জিত হ'ল বল দেখি ?

তোমার।

ইস! বোড়ের চালে তুই কিস্তিমাত করলি—না ? দেখ বুড়ি, ওরা যদি বেশী চালাকি করে, ওদের অশ্বচক্র করিয়ে দেব, বুঝলি ? টানিয়া টানিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

যোগমায়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। রামজীবনের চোখের দৃষ্টি আবিল হইয়া উঠিতেছে আবার; কথায় অসংলগ্নতা আসিতেছে। ধীরে ধীরে চোখ বুজিয়া বিড়বিড় করিতে করিতে তিনি আবার বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ভয় হইলেও শ্রান্ত জননীকে যোগমায়া আর ডাকিল না। পাখার বেগটা ঈষৎ বাড়াইয়া দিয়া অকম্পিত দীপশিখা ও কুণ্ডলীকৃত কালি বিড়ালটার পানে চাহিয়া রহিল। তার পর কখন এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

৫

মধ্য রাত্রিতে সেই যা একটু জ্ঞানের লক্ষণ দেখা গিয়াছিল—আর রামজীবন চোখ মেলিয়া বড় একটা চাহেন নাই। যদি বা চাহিয়াছেন, রক্তবর্ণ চক্ষুতে তাঁহার পরিচয়-বোধের কোন চিহ্নই ফুটিয়া উঠে নাই। পূর্ণ বিকার দেখা দিয়াছে। সেই প্রলাপের মধ্যে ত্রিসন্ধ্যার মন্ত্রপাঠ চলিতেছে, দাবা খেলার চাল ও কিস্তির উচ্চধ্বনিও শোনা যাইতেছে, অত্যাসন্ন রথের দিনে যোগমায়ার শ্বশুরালয়ে যাওয়ার উদ্যোগ ও সাংসারিক অনটনের কথাটাও এক একবার উচ্চারিত হইতেছে। লবঙ্গলতা চোখের জল মুছিয়া গৃহকর্ম্ম করিতেছেন। যোগমায়া কখনও জল, কখনও বা আনারসের রস দিয়া বাপের শুষ্ক ওষ্ঠ ভিজাইয়া দিতেছে, হাতের পাখার তো বিরাম নাই। ভরসার মধ্যে পাড়ার পাঁচ জনে হাসিমুখেই সাহস দিতেছেন। কবিরাজ-জ্যেঠাও দুই একটি রসিকতা-মাখা কথা দ্বারা যোগমায়াকে প্রফুল্লিত করিয়া যাইতেছেন। কি সব দামী দামী ঔষধ তিনি দিবেন—যাহার মূল্য তাঁহাকে আজকালের মধ্যে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত।

লবঙ্গ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, সবই তো জান রাঙাখুড়ি, হাতে সোনারূপোর গুঁড়ো নেই—কি দিয়ে চিকিচ্ছে চালাই ?

রাঙাখুড়ি বলিলেন, যুগীর হাতের নারকেল-ফুল জোড়াটা না হয় বাঁধা দে।

ওর শ্বশুরবাড়ীর জিনিষ; সেবার বাঁধা দিয়ে দু'মাস ঘুমুতে পারি নি, খুড়ি।

বলি—ধারকর্জ্জ কি মানুষের চিরকাল থাকে? সেবার বাঁধা দিয়েছিলে—আবার ধার শুধে জিনিষ খালাস করে মেয়ের হাত ভর্ত্তি করে দিয়েছ। আগে মানুষ, না আগে গহনা ?

সবই জানি খুড়ি—কিন্তু আমার অদৃষ্ট বড় মন্দ!

দেখ বউমা, সত্যি কথা বলি—জীবন যদি বেঁচে ওঠে তুমি যে রাজরাণী—সেই রাজরাণী। একটু থামিয়া বলিলেন,—মেয়ে কিছু বলে নাকি ?

লবঙ্গলতা বলিলেন, দুধের বাছা—ওরা ভালমন্দ কি বোঝে। কিন্তু আমার ভাবনা—

খুড়ি স্বর নামাইয়া বলিলেন, কবিরাজ হাজার বন্ধু লোক হোক, টাকাটা পেলে যেমন প্রাণ ঢেলে চিকিচ্ছে করবে—যেমন ভাল ভাল ওষুধ দেবে—

লবঙ্গলতা বলিলেন, যাই হোক, খুড়ি—মায়াকে একবার জিগ্‌গেস করি।

তোর মাথা খারাপ হয়েছে, ওকে আবার জিগ্‌গেস করবার কি আছে! দাও আমাকে, পেটকোঁচড়ে করে লুকিয়ে মল্লিকবোয়ের কাছ থেকে গোটা পঁচিশেক টাকা নিয়ে আসি গে।

পিত্রালয়ে এক গা গহনা পরিয়া থাকিবার আবশ্যকতা নাই বলিয়াই—হাতের দু'গাছি-মুড়কি-মাদুলি ছাড়া—আর সবই যোগমায়া মায়ের হাতে দিয়াছিল সিন্দুকে তুলিয়া রাখিবার জন্য। গহনাগুলি তার নিজের হইলেও-বা দুই-এক দিন পরিয়া থাকিতে বাধা ছিল না। কিন্তু কমলার জিনিষ পাছে ময়লা লাগিয়া বা কোন কিছুর সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগিয়া ভাঙ্গিয়া বা তোবড়াইয়া যায়—এই ভয় সর্ব্বক্ষণই তার মনে জাগিয়া ছিল। কমলা মুখ ভার করিবে বলিয়া শ্বশুরবাড়ীতে গহনা খুলিবার সুবিধা হয় নাই, বাপের বাড়ী আসিয়াই তাই সেগুলি খুলিয়া সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছে। গহনা সম্বন্ধে মা-ও কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন নাই—সেও কিছু খুলিয়া বলে নাই। পিতা অসুস্থ না হইলে হয়ত এই সম্বন্ধে স্ত্রী-জাতিসুলভ কৌতূহলকে ঠেকাইয়া রাখা দুষ্করই হইত!

দিন সাতেক পরে পিসিমাকে লইয়া কমলা যখন যোগমায়ার পিতাকে দেখিতে আসিল, তখন রামজীবন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে আসিয়াছেন! লবঙ্গলতা ও যোগমায়াকে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া কমলা আর বিশেষ কিছুই জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিল না। এমন কি, যোগমায়ার নিরাভরণ দেহের পানে চাহিয়াও সে সম্বন্ধে যে কোনরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে—এ ধারণাও কমলার রহিল না। শুধু হাতের মিছরির ঠোঙাটা যোগমায়ার জননীর হাতে দিয়া তাঁহার পায়ে প্রণাম করিয়া কহিল, আপনি ভাবছেন কেন আঁবুই-মা, ভগবান ভালই করবেন।

অনেক অনুরোধ করিয়াও পিসিমাকে জল খাওয়ানো গেল না। বলিলেন, গাড়ীতে এসেছি—ছোঁয়া-নেপা—তুমি ব্যস্ত হয়ো না, বেয়ান! বেয়াই ভাল হয়ে উঠুন—এক দিন এসে নেমন্তন খেয়ে যাব।

লবঙ্গলতা চোখের জল ফেলিয়া বলিলেন, সেই আশীর্ব্বাদ করুন—বেয়ান। উনি ছাড়া আমাদের যে কি অজল-অস্থল অবস্থা—দেখছেন তো। আপনাদের বুড়ো সিদ্ধেশ্বরী শুনেছি খুব জাগ্রত, ওঁর নাম করে যদি সওয়া পাঁচ আনার পুজো দেন—

দেব বৈকি, বেয়ান, দেব।

দাঁড়ান একটু। বলিয়া দ্রুতপদে তিনি ঘরের মধ্যে গিয়া ছোট কাঠের বাক্সটি খুলিয়া পয়সা বাহির করিলেন।

বাহিরে আসিয়া বলিলেন, যে দিন মায়া এখানে আসে, ওর মুখে শুনে—মার নাম করে ওঁর কপালে ছুঁইয়ে রেখেছিলাম।

পিসিমা বলিলেন, পুজো দিয়ে পেসাদ চন্নামেত্তর পাঠিয়ে দেব। আর মা বাগদেবীর পুজো মানত করবো, বেয়ান। সিদ্ধপীঠ।

হাঁ, জোড়া পাঁঠা দিয়ে মাকে পুজো দেব। বুড়ো-বারোয়ারি তলায় ধুনো জ্বালিয়ে বুকের রক্ত দেব।

সপ্তাহ পরে আরও কিছু টাকার প্রয়োজন হওয়ায় লবঙ্গলতা আর একবার সিন্দুক খুলিলেন। রাঙাখুড়ির নিষেধ সত্ত্বেও সেদিন রাত্রিতে তিনি যোগমায়াকে চুপি চুপি বলিলেন—তোকে না জিগ্‌গেস করে একটা কাজ করে ফেললাম, মায়া। হাতে একটা পয়সা ছিল না, তোর দু'খানা গহনা বাঁধা দিয়ে—

যোগমায়ার মুখ শুকাইয়া গেল। লবঙ্গলতা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, উনি ভাল হ'য়ে উঠলে মাসখানেকের মধ্যে—সেবার যেমন ছাড়িয়ে এনেছিলেন—

যোগমায়ার আর্ত্তকণ্ঠ হইতে শুধু বাহির হইল, —মা।

কি রে, মায়া, অমন করছিস কেন?

যোগমায়া ঢোঁক গিলিয়া আপনাকে সামলাইয়া লইল। সামলাইতে খানিকটা সময় গেল বৈকি।

লবঙ্গলতার ভয় হইল, লজ্জাও বোধ করিলেন। যেন মেয়েকে বঞ্চনা করিয়া তাহার অলঙ্কারগুলি আত্মসাৎ করিয়াছেন—এমনই কুণ্ঠিত ভাবে মুখ নামাইয়া আমৃতা-আমৃতা করিয়া বলিলেন, ওঁর অসুখে—চারিদিকে যেন কূল পেলাম না, মা। কি যে করি—

যোগমায়া বলিল, গহনা তো আমার নয় মা, ও যে ঠাকুরঝির।

লবঙ্গলতা মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন, তোর গহনা নয়? তা তুই আমায় বললিনে কেন আগে! কোন্‌গুলো তোর আর কোন্‌গুলো তোর নয়—আমি কি করে জানব, বল?

এমন ভাবে তিনি কথা বলিলেন যেন মেয়ের

সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই এই কাজ করিয়াছেন; সে ঠিকমত না বলিয়া দেওয়াতেই যত অনর্থ ঘটিয়াছে।

যোগমায়া ধীরস্বরে বলিল, ওর মধ্যে একখানি গহনাও তো আমার নয়, মা; সব ঠাকুরঝির।

অতি বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলিয়া লবঙ্গলতা বলিলেন,—তোর গহনাগুলো তবে কি হ'ল? একখানা দু'খানা তো নয়—এক গা গহনা!

যোগমায়া বলিল, জেঠশ্বশুরের দরুণ বাড়ীটা যে ও-মাসে কেনা হ'ল। চার-পাঁচ-শ টাকা লাগলো। হাতে তো টাকা ছিল না—তাই—

লবঙ্গলতার বাক্যস্ফূর্ত্তি রহিল না অনেকক্ষণ। ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তিনি যোগমায়ার মুখের পানে চাহিয়া বুঝিতে চাহিলেন, সে রহস্য করিতেছে কি না? কিন্তু যোগমায়া—শান্ত যোগমায়া তো কোন কালেই রহস্য করে না। দুরন্তপনা সে করে, মায়ের কথাও অনেক সময় শোনে না, কিন্তু মিথ্যা বলিয়া মাকে অকূল পাথারে ফেলিয়াছে—এমন একটি দিনের কথাও তো মনে পড়ে না লবঙ্গলতার। কিন্তু হাতেই যদি টাকা ছিল না—তো বাড়ী কিনিবার কি দরকার ছিল?

অনেকক্ষণ পরে একটি নিশ্বাস মোচন করিয়া লবঙ্গলতা বলিলেন, জানি নে অদৃষ্টে কি আছে। তোকে একি জালে জড়ালাম মায়া?

যোগমায়া বলিল, তুমি ভাবছ কেন মা, বাবা ভাল হয়ে উঠলে—সেবারকার মত গহনা ছাড়িয়ে এনো। ঠাকুরঝি তো এখনই শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে না। বাবা ভাল না হ'লে আমিও সেখানে যাব না।

তোর শাশুড়ী যদি নিতে আসেন?

আসেন—যাব না। বাবা না সারলে আমি কক্খনো যাব না।

লবঙ্গলতা কহিলেন, হে হরি, ধম্মে ধম্মে উনি ভাল হয়ে আমার মুখ রক্ষে করুন, নৈলে—

নহিলে কি যে হইবে, তাহার আভাস তিনি যোগমায়াকে আর দিলেন না। যোগমায়াও এ বিষয়ে খুব বেশী চিন্তা করিল না। বাবা যেখানে জীবন-মরণের সম্মুখীন, অন্য চিন্তা সেখানে আধিপত্য বিস্তার করিবে কি করিয়া!

দুপুর বেলায় সাগুর বাটি লইয়া যোগমায়া ডাকিল,—বাবা, সাবু এনেছি।

আরক্ত চক্ষু মেলিয়া রামজীবন চাহিলেন। এবং পণে মাথা নাড়িতে নাড়িতে আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বলিলেন, ওযাক্—থু। খাল্‌নি সাবু নাকি খাওয়া যায়। না লেবু—না, যা, যা, নিয়ে যা। আমি খাব না, খাব না—খাব না—আ—আ—

তাঁহার একটানা অস্বীকৃতিতে যোগমায়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। মা সংসারের কোন বিষয়ে খেয়াল করেন না বড একটা। রোগীর পথ্য নির্ব্বাচনে তাঁহার কোন মতামত নাই। সাধারণ সুস্থ লোকে যেমন ভাত ডাল খায়, রোগীও তেমনি দুধ নতুবা সাগু খাইবে। সেই দুধে মিছরি বা সাগুতে লেবু দিয়া মুখরোচক করিবার কল্পনাও তাঁহার মাথায় আসে না। বর্ষাকালে লেবুর অভাব নাই। কিন্তু এমন দুরদৃষ্ট, উঠানের ঝাঁকড়া গাছটিতে লেবু এবার ধরে নাই। গ্রীষ্মের উত্তাপে গাছটি প্রায় শুকাইয়া মরিতে বসিয়াছিল, মরে নাই শুধু পিতার অক্লান্ত জল ঢালিবার ফলে। গাছ মরে নাই, এবং মুমুর্ষু গাছে একটিও ফুল ধরে নাই।

লেবু আছে ঘরের ওপিঠে হারু-কাকাদের গাছে। কাকার জীবিত কালেই ইঁহারা পৃথগন্ন। এবং জ্ঞাতিসম্পর্কীয়েরা পৃথগন্ন হইলে যা হয়—দুই বাড়ীর মধ্যে বিরোধের প্রাচীরটিও বেশ কায়েমি হইয়া উঠিয়াছে। সে প্রাচীরের গাঁথনি পাকা, শীঘ্র ভাঙ্গিবার কোন লক্ষণই দেখা যায় না। এমন কি কাকার মৃত্যুর পর কাকিমা বীরাঙ্গনার মত মৃত স্বামীর ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞাকে বর্ণে বর্ণে পালন করিয়া চলিয়াছেন। যোগমায়ার বিবাহে যে ভাঙ্‌চি পড়িয়াছিল, বাড়ীর লোকে বলে, সে ওই হারাধনের স্ত্রীর কীর্ত্তি। অবশ্য সে কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিবার সৎসাহস কাহারও হয় নাই। বিবাহ যখন ভাঙ্‌চিতেও রোধ করা যায় নাই, তখন সেই সব পল্লী-পাঁচালী পাঁচ কান করিয়া বেড়ানো রামজীবন পছন্দ করিতেন না বলিয়াই কথাটার ইতিহাস বিবাহের আনন্দ-পর্ব্বের মধ্যেই চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। কাকিমা অর্থাৎ হরিমতী কিন্তু ভোজ খাইতে এ বাড়ীতে পদার্পণ করেন নাই। সগর্ব্বে তিনি প্রচার করিয়াছিলেন,—আমি যাব পাত পাততে বট্‌ঠাকুরের বাড়ীতে? ওঁয়ার সঙ্গে যে ব্যাভার ও করেছে, মুচি-মুদ্দোফরাসেও তেমন করে না। ওদের বাড়ীর ঢাকের বাদ্যি আমার কানে গেলে প্রাশ্চিত্তির করতে হবে না!

বিবাহের কয়েকদিন আগে তিনি তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী বাবলা গ্রামে তাঁহার মেঝমেয়ের বাড়ী গিয়াছিলেন, এবং পনের দিন পরে সেখান হইতে

ফিরিয়াছিলেন। ঘরের পিছনে যে পড়ো জমিটায় লেবুগাছ আছে, সেটা ঠিক হারুকাকাদেরও নহে। তবে এ পক্ষ হইতে প্রতিবাদ না হওয়াতে, অপর পক্ষ দিব্য ভোগ দখল করিয়া চলিয়াছেন। গাছটির ইতিহাস এইরূপ ঃ

রামজীবনের পিতারা ছিলেন তিন ভাই। একান্নবর্ত্তী পরিবার। এধারের কলমি ডোবা হইতে কুড়ি বিঘাব্যাপী আম বাগানটা সবই ছিল তাঁহাদের। মাঝখানে ওই বাঁশঝাড়, ওই বড় তেঁতুল গাছটা, জাম গাছটা, দু'টি বেল গাছ ও সারি সারি কলিকা ও কুরচি ফুলের গাছ—যাহা জঙ্গলে রূপান্তরিত হইয়াছে—সবটাই পরিপাটি করিয়া সাজানো-গোছানো ছিল। সদ্ভাবে কাটাইয়া তিন কর্ত্তাই পরলোকগত হন। উত্তরাধিকার-সূত্রে ছোটকর্ত্তার ছেলে রামজীবন ও বড় কর্ত্তার ছেলে হারাধনে এই বিষয় বর্ত্তিয়াছে। মেজকর্ত্তা অপুত্রক ছিলেন বলিয়া যোগমায়াদের ঘরের পিছনে ওই খণ্ড জমিটুকু—অর্থাৎ যে ঘরখানিতে তিনি বাস করিতেন, মাত্র সেইটুকু আজও পড়িয়া আছে। জমিজমা সবই টুকরা টুকরা করিয়া চুল চিরিয়া ভাগ হইয়া গিয়াছে। অবিভক্ত রহিয়াছে ওই জমিটুকু। অপুত্রকের ভিটা দখল করিতে দুই পক্ষেরই আন্তরিক অনিচ্ছা ছিল। জমির আর ছিলই বা কি! ঘরের মাটির দেওয়াল মাটিতে মিশিয়াছে, চালের খড় কোন্ কালে খসিয়া পড়িয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, দরজা জানালাগুলি সহসা যে কোন্ পথে অন্তর্হিত হইয়াছে তাহার ইতিহাস জানিলেও কেহ প্রকাশ করিয়া কলহ সৃষ্টি করিতে চাহে নাই। আর দাওয়ার খুঁটি ও চালের কাঠামোর বাঁশ-বাখারি দুই বাড়ীর চুলার খাদ্যরূপেই আহৃত হইয়াছে, সুতরাং দুই বাড়ীর অভিযোগ ইহাতে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিবার কথা নহে। গোল বাধাইয়াছে ঐ লেবুগাছটা। পড়ো ভিটের উর্ব্বর মাটিতে সেটির স্বাস্থ্য শুধু অভাবনীয়রূপে বাড়িয়া চলিয়াছে। নীচের ডাল-পাতাগুলি ছাগল গরু মুখ বাড়াইয়া যতটা পারিয়াছে মুড়াইয়া খাইয়াছে, তবু গাছটির অদ্ভুত জীবনীশক্তি। উর্দ্ধমুখে বহু শাখা-প্রশাখা মেলিয়া ফাঁকা জায়গায় অবাধ আলো-হাওয়ায় সেটি যেন উর্দ্ধগ দেবতার অভয় আশীর্ব্বাদ সমস্ত দেহপ্রাণ দিয়া গ্রহণ করিতেছে। যেমন থরে থরে ফুলের সমারোহ সারা ঋতুতে তার সর্ব্বশাখায় উৎসব আনিয়া দেয়, তেমনই থলো থলো ফলের প্রাচুর্য্যে সে নয়নমন-লোভন। হারুকাকার বিধবা জোর গলায় বলেন, লজ্জাও করে না বেহায়া মিন্‌সের! আমার কি রোজগার করবার কেউ আছে, না অরুণের গতর নিয়ে কেউ বাইরের পয়সা ঘরে তুলছে? ওই নেবু ক'টি ভরসা করে বিধবা মানুষ সম্বচ্ছর চালাই। দু-আনা করে শ ঃ পরণের ঠেঁটি একখানা জোটে কি তাই! আবার বলে ভাগ? বেহায়া কোথাকার!

রামজীবন স্ত্রীকন্যাকে নিষেধ করিয়াছেন—পিছনে ওই পড়ো ভিটার লেবুগাছে তাঁহারা যেন হাত না দেন।

অনেক দিন হইয়া গিয়াছে, সে নিষেধের স্মৃতি ফিকা হইয়া আসিবারই কথা। পিতার সহিষ্ণুতার গুণে নূতন করিয়া খুড়িমার সঙ্গে বিরোধ বাধে নাই। বিষ খুড়িমাই হৃদয়ে পুরিয়া রাখিয়াছেন; সকালে—সন্ধ্যায়—দুপুরবেলায় বা মধ্যরাত্রিতে—কর্ম্মের অবসরে সেই বিষ উদ্গার করিয়া থাকেন। নিত্যকার বলিয়া সে জিনিষ এ-বাড়ীর লোকদের গা-সহা হইয়া গিয়াছে। পাড়ার লোকে এদিকে কর্ণপাত করে না।

লেবুর সন্ধানে যোগমায়া ঘরের পিছন দিকে আসিল। গাছটায় লেবু কমই আছে। খুড়িমা দিন দুই আগে প্রায় এক হাজার লেবু বেচিয়া উচ্চৈঃস্বরে দাম হিসাব করিতেছিলেন। লেবু-বিক্রেতার অসাধুতা ও নিজের ভালমানুষিত্বের কথা সেই হিসাব রাখার ফাঁকে ফাঁকে—হয়ত লোক-জনকে, হয়ত বা পিছনের বাঁশঝাড় বা আমবাগানকে শুনাইতেছিলেন। ইহাদের না শুনাইলে কাহাকেই বা শুনাইবেন! মেয়েরা সব শ্বশুরালয়ে, ছেলে নাই।

যোগমায়ার লেবু চাই, বেশী নহে—একটি মাত্র। ঘোষালদের বাড়ীতেও লেবু আছে, কিন্তু সে অনেকটা দূর। যাওয়া-আসায় দণ্ডখানেক সময় যাইতে পারে। মা বাড়ী নাই, একা রুগ্ন পিতাকে ফেলিয়া কিছু লেবু সংগ্রহে যাওয়া চলে না। তা ছাড়া, খুড়িমা বোধ হয় বাড়ী নাই। দুপুরে বাড়ীটা এমন নিস্তব্ধ হইয়া থাকে না। গাছপালার সঙ্গে কথা না কহিলেও, কুকুর বিড়ালটার সঙ্গেও এই সময় তিনি নিত্য বকাবকি করেন। যোগমায়াদের বাড়ীর বিড়ালটা প্রত্যহ নাকি ও-বাড়ীর হাঁড়ি খাইয়া আসে। আশ্চর্য্য বিড়াল! মাছ মাংসে বীতস্পৃহ, অথচ বিধবার আতপ চাউলের অন্ন কি তার এতই মিষ্ট লাগে? জ্ঞাতি-শত্রু আর বলিয়াছে কেন?

আর থাকিলেনই বা খুড়িমা। দু'টা নয়, দশটা নয়—একটিমাত্র লেবু লইবে যোগমায়া। যদিই তিনি কিছু বলেন, ও বেলা ঘোষালদের বাড়ী হইতে লেবু আনিয়া একটার বদলে দুইটা লেবু সে খুড়িমাকে দিয়া আসিবে।

উঁচু গাছ, আঁকশি দিয়া ঠেঙাইতেই গোটা চারেকই লেবু পড়িল, এবং এদিককার দুয়ার খুলিয়া সাধা গলায় খুড়িমা হাঁকিলেন,—কে রে, লেবু পাড়ে কে?

যোগমায়া মৃদুস্বরে বলিল, আমি, খুড়িমা।

খুড়িমা লেবুতলায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। যোগমায়াকে দেখিয়া মুখ সিঁটকাইয়া বলিলেন, তুমি না হ'লে এত বড় বুকের পাটা আর কার যে হরি বামনীর গাছ ঠেঙায়? ও মা গো, একটা নয়—দুটো নয়—একেবারে এক গাদা লেবু পেড়ে ভাঁই করেছ? বলি তোর রকমখানা কি, খুগি?

যোগমায়া বলিল, বাবার অসুখ বলে—একটা লেবু—

এই কি তোর একটা লেবু? চোখের মাথা খেয়ে দেখ দিকি—বলি এ কি তোর একটা—? একেবারে বেড়িয়ে বেড়িয়ে গাছটার দফা রফা করেছ! পাড়ার লোকে বলে—আমি মন্দ। এসে দেখুক তারা—

যোগমায়া বলিল, চেঁচাচ্ছ কেন, খুড়িমা, ও বেলা না হয় দু'টো লেবু দিয়ে যাব'খন।

আগুনে ঘৃতাহুতি পড়িল। খুড়িমা লেবুতলার এধার হইতে ওধারে একরূপ নাচিয়াই প্রখর কণ্ঠে বলিলেন, ভারি যে তোর নেবু হ'য়েছে লো? ভারি যে নেবুর ডবডবানি দেখাচ্ছিস চুন্নি কোথাকার! নিজের গাছ ভর্ত্তি থাকতে পরের গাছে এসেছ নেবু চুরি করতে। ওলো বেহায়ি, এত যদি বড়মানুষী তো রাঁড় হাত করে রয়েছিস কেন? নিজের গহনাগুলো বাঁধা দিয়ে বাপের চিকিচ্ছে চালাচ্ছিস! লজ্জাও নেই—হায়াও নেই!

লবঙ্গলতা বাড়ী আসিয়া ওধারে জায়ের রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি দেখিয়া তাড়াতাড়ি লেবুতলায় গিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া কহিলেন, এদিকে আয়, মা। ছিঃ—!

ঝর ঝর করিয়া যোগমায়ার চোখের জল ঝরিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সে মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া বলিল, আমি কিছু বলি নি, মা। খুড়িমা শুধু—শুধু—

শুধু—শুধু? মেয়ে কুলোয় শুয়ে তুলোয় করে দুধ খান? শুধু—শুধু!

মেয়েকে একরূপ টানিয়াই লবঙ্গলতা বাড়ীর মধ্যে আসিলেন।

পিছনে তাড়া করিয়া ভিটার সীমান্ত পর্য্যন্ত আসিয়া কণ্ঠের জোরে এ-বাড়ী প্রকম্পিত করিয়া খুড়িমা বলিতে লাগিলেন,—দাঁড়াও, ভাঙছি তোমার তেজ। বড় অংখার তোর। শ্বশুরবাড়ীর গহনা বাঁধা দিয়ে বাপ-সোহাগী চিকিচ্ছে চালাচ্ছে। দাঁড়া, তোর ফাঁড়ে পা দিয়ে আজই বলে আসছি তাদের। পরের গাছের নেবু চুরির মজাটা বুঝবি তখন!

সত্যই তিনি গজ গজ করিতে করিতে খানিক পরে বাহির হইয়া গেলেন।

৮

সুচিকিৎসা ও সেবার গুণে তিন সপ্তাহের মধ্যেই রামজীবন সুস্থ হইয়া উঠিলেন। সেদিন অন্নপথ্য করিবার কথা। সকালবেলায় দাওয়ায় বসিয়া মুনে সামান্য তেল মিশাইয়া তিনি দাঁত মাজিতেছিলেন—যোগমায়া ঘটী করিয়া অল্প অল্প জল তাঁহার হাতে ঢালিয়া দিতেছিল। রামজীবন মুখ ধোয়া শেষ করিয়া মেয়ের পানে চাহিলেন। যোগমায়া ঘটী নামাইয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল, বিছানা আমি ঝেড়েঝুড়ে রেখেছি, এস।

রামজীবন হাসিলেন। সে হাসি দেখিয়া যোগমায়ার চোখে জল আসিবার উপক্রম হইল। বড় রোগা হইয়া গিয়াছেন তিনি।

অমন পুরন্ত গাল—কোথায় মিলাইয়া চোয়ালের হাড় ঠেলিয়া উঠিয়াছে, ভাসন্ত পিঙ্গল তারাসমন্বিত টানা চোখ দু'টি গিয়াছে তাহারই মধ্যে ডুবিয়া। অমন যে টকটকে রঙ—পুড়িয়া তামাটে হইয়াছে, আর আঙুল হইতে সারা হাত দু'খানিতে অসংখ্য শিরা বাহির হইয়াছে, রোমশ, শীর্ণ ও শিরা-প্রকটিত হাতের পানে চাওয়াই যায় না। পা দু'খানি কাঠির মত সরু হইয়াছে—চলিতে গেলে কাঁপিতে থাকে। তখনও গায়ের চাদরখানি খোলেন নাই।

রামজীবন হাসিয়া বলিলেন, ঘরের মধ্যে নয়। এই দাওয়ায় তক্তাপোষের ওপর মাদুর পেতে দে।

যোগমায়া বলিল, মাদুর যে গায়ে ফুটবে, বাবা। একখানা কাঁথা পেতে দিই না হয়।

তাই দে। গায়ে তো আর মাংস নেই, খালি হাড়, নয় রে?

যোগমায়া রাগ করিয়া বলিল, জানি নে। তাড়াতাড়ি সে বাহিরের তক্তাপোষটা ঝাড়িয়া পিতার জন্য শয্যা রচনা করিয়া দিল। রামজীবন নিজেই উঠিতেছিলেন, হাঁ—হাঁ করিয়া আসিয়া যোগমায়া তাঁহাকে ধরিল ও ধীরে ধীরে বিছানার উপর বসাইয়া দিয়া কহিল, সব তাতেই তোমার তাড়াতাড়ি! দেখছ রোগা শরীর—

রামজীবন হাসিয়া বলিলেন, তোর শাসনের জ্বালায় যে অস্থির হ'লাম, বুড়ি! রোগা ছেলের ওপর খুব শাসনটা চালিয়ে নিচ্ছিস—যাহোক।

যোগমায়া দাওয়ার প্রান্তটা জল দিয়া ধুইতে ধুইতে বলিল, না, নেবে না! তোমার তো খালি কুপথ্যি করবার ইচ্ছে। কবিরাজ-জ্যেঠা যেটি না দিতে বলবেন—সেটি পাচ্ছ না তুমি।

কর্ শাসন। রামজীবন হাসিলেন, কিন্তু তোমার কবিরাজ-জ্যেঠার পাঁচন, বড়ি বা সাবু আজ থেকে আর খাচ্ছি নে—তা তোরা যতই রাগ করিস!

যোগমায়া বলিল, খেয়ো না। ভুগতে তো তোমাকে হবে না, ভুগবো আমরাই।

রামজীবন বলিলেন, তুই বড্ড রেগেছিস বুড়ি। অনেক দিনের কথা, প্রায় ভুলেই গেছি, অসুখ হ'লে মা আমায় এমনি ধমকাতেন। শাসন করতে পেলে—বড় মা-ই হোন আর ক্ষুদে মা-ই হোন—কেউ ছাড়েন না। ওটা তোদের জন্মগত সংস্কার, নয় রে বুড়ি?

যাও—জানি না।

আহা, একটু কাছেই বোস না, বুড়ি। অনেক দিন বাইরেটা দেখি নি—ভারি ভাল লাগছে। একটু গল্প কর্ না রে!

যোগমায়া বসিয়া বলিল, ঠাকুমা তোমায় খুব বকতেন, বাবা? তুমি খুব দুষ্টু ছিলে বুঝি?

রামজীবন বলিলেন, দুষ্টুমি কাকে বলে তখন তো বুঝতাম না—এখন বুঝি। তিনি যদি বলতেন, চালের বাতা ধরে ঝুলিস নে—গেরস্থর অকল্যাণ হয়, আমি সময় পেলেই ওই কাজটা করতাম। কেমন সে অকল্যাণ দেখবার জন্য। তিনি বলতেন, পাঁচিলে উঠিস নে—পড়ে যাবি, গাছে চড়িস নে, হাত-পা ভাঙবি, ছুটিস নে, আছাড় খাবি। আমি ভাবতাম, গেলামই বা পড়ে, ভাঙলোই বা হাত-পা, কি খেলামই বা আছাড়। ছুটবো, ধুলো মাখবো, গা-হাত ছড়ে যাবে—তবে না আনন্দ! ছেলে-বেলায় এই সবেতেই আনন্দ—নয় রে বুড়ি?

যোগমায়া ধীরে ধীরে যেন সদ্যপরিত্যক্ত বাল্যকালে ফিরিয়া আসিতেছে। তার হাতপায়ের মধ্যে রক্তস্রোত উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে—চোখের তারায় ফুটিতেছে চাঞ্চল্য। বিস্রস্ত আঁচলখানি এক সময় স্খলিত হইয়া পিঠের দিক্ হইতে তক্তপোষের উপর পড়িল। খুশীভরা কণ্ঠে সে বলিল, তাই বুঝি মা বকলে তুমি তাকে বারণ করতে, বাবা?

রামজীবন মৃদু হাসিলেন।

একটু থামিয়া যোগমায়া বলিল, কিন্তু শাসন না করলে ছেলেমেয়েরা তো খারাপ হয়ে যায়।

রামজীবন বলিলেন, যায় নাকি? কই, আমি তো জানি না।

যোগমায়া লজ্জায় অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, যায় বইকি। তুমি শাসন কর না বলেই তো হরিটা অমন দিনকের দিন বেয়াড়া হয়ে উঠেছে।

কে বললে রে? তোর মা বুঝি?

মা কেন বলবে, আমি দেখি নে বুঝি? ছেলে যেন ধিঙ্গি! সেই যা কবিরাজ-জ্যেঠার কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে আসে। সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এক পয়সার বাতাসা কিনে দিয়ে উব্‌গার করে না।

রামজীবন হাসিলেন, তাই নাকি?

যোগমায়া বলিতে লাগিল, তোমার এত বড় অসুখটা গেল—বসেছে একদিন তোমার কাছে? পাখা ধরেছে কি অমনি হাত ব্যথা হয়।

রামজীবন উত্তর না দিয়া হাসির মাত্রা বৃদ্ধি করিলেন।

যোগমায়া রাগ করিয়া বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, কি যে হাস, ভাল লাগে না। মা বলেন, তোমার আস্কারা পেয়েই—

রামজীবন বলিলেন, তুইও তো আমার আস্কারা পেয়েছিস বুড়ি। ওর চেয়ে অনেক বেশীই পেয়েছিস। তুই কি করে আমার বুড়ো মায়ের মত সেবাযত্ন করলি, বল তো?

ভারি তো তোমার সেবা করলাম। লজ্জায় যোগমায়া মুখ ফিরাইয়া রহিল।

রামজীবন বলিলেন, সেবাযত্ন করবার বয়স যখন আসে, কাউকে শিখিয়ে দিতে হয় না। ওটা আপনিই হয়। হরিকে যদি জোর করে সেবা

শেখাতে যান—ও দায়-সারা গোছ সে কাজ করবে—আর মনে মনে তোদের ওপর উঠবে চটে। তার ফল ভাল হয় না। আজ হয়ত আমার কথা বুঝবি নে, ছেলে হলে বুঝবি, মা।

এমন সময়ে বাহিরের দরজা হইতে কে ডাকিল, বাড়ী আছেন—মা-ঠাকরোণ? বাড়ী আছেন? একবার ইধারে আসুন না?

যোগমায়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল এবং ঘোমটা টানিয়া ফিরিয়া আসিল। পিতার কাছে আসিয়া চুপি চুপি বলিল, গড় থেকে লোক এসেছে, বাবা।

তাই ত, ডাক না ওকে বাড়ীর ভেতরে।

যোগমায়া নিদ্রামগ্ন হরিকে ঠেলিয়া তুলিয়া বলিল, দেখ দেখি—বাইরে কে ডাকছে।

আমি পারব না—তুই যা। সে পাশ ফিরিয়া শুইবার উপক্রম করিল।

দাওয়া হইতে রামজীবন বলিলেন, মায়ার শ্বশুরবাড়ী থেকে লোক এসেছে, তাকে এখানে ডেকে নিয়ে আয় তো, হরি।

পিতা বড় একটা আদেশ করেন না, কিন্তু তিনি আদেশ করিলে লঙ্ঘন করিবার শক্তি হরি কেন এ বাড়ীর কাহারও নাই। গা মোড়ামুড়ি ভাঙ্গিয়া—হাই তুলিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে হরি বাহিরে আসিল।

রামজীবন বলিলেন, যাও, বাইরের দরজায় সে আছে—ডেকে আন। বুড়ি, আসনখানা না হয় পেতে দে—এইখানে।

লোকটি আসিয়া আসনে বসিল না। চিঠিখানি রামজীবনের কোলের কাছে ফেলিয়া দিয়া যুক্তকরে দাঁড়াইয়া রহিল। ঘোমটা টানিয়া যোগমায়া তখন দ্বারের অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে, হরি জলের ঘটীটা টানিয়া লইয়া মুখহাত ধুইতে বসিয়াছে।

রামজীবন বলিলেন, বোস, তোমার নামটি কি?

এজ্ঞে আমার নাম শ্রীকুঞ্জবিহারী ঘোষ। জেতে আমরা গোপ। গিন্নিমা বড় স্তেঁহ করেন—ভালবাসেন। কোন কাজ আর কাউকে দিয়ে বিশ্বেস করেন না। হুট্ বলতে ডাক কুঞ্জকে।

রামজীবন বলিলেন, ভাল, ভাল। যে ভাল লোক—সবাই তাকে ভালবাসে। তুমি বস, এবেলা তোমার যাওয়া হবে না, কুঞ্জ। চারটি প্রসাদ না পেয়ে—

এজ্ঞে—আপনাদের পাতের পেসাদ পাওয়া তো আমাদের ভাগ্যি। কিন্তু এবেলাই আমায় যেতে হবে, বাবু। বৈকেলে আট মণ ক্ষীর দিতে হবে—মিত্তির বাড়ী, তেনার বড়মেয়ের বিয়ে কিনা। আর একদিন বরঞ্চ এসে—

আসবে বই কি—আসবে বই কি। তা বেয়ানের চিঠির জবাব লিখতে তো পারবো না, কুঞ্জ। ভারি কাহিল করে দিয়েছে জ্বরটায়, হাত কাঁপে।

এজ্ঞে জবাব না লিখুন ক্ষেতি নেই—মোদ্দা জিনিষ গুনো আমার হাতে দিতে বলেছেন। আর কারুখ্যে দিয়ে তেনাদের তো বিশ্বেস হয় না।

জিনিষ! আচ্ছা দেখি পড়ে চিঠিখানা।

চিঠি পড়িয়া রামজীবন চিন্তাকুল হইলেন। গালে হাত দিয়া খানিকক্ষণ কি ভাবিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তোমার বেয়ানকে একবার ডেকে জিগ্‌গেস করি। আমি তো কিছু জানিনে।

এজ্ঞে তাই করুন; ওসব গহনা-পত্তরের কথা তেনারাই ভাল জানেন—ভাল বোজেন। জিগ্‌গেস করুন তেনাদের। নারকোলফুল, মৌরীফুল, গলার চিক, পাঁইজোড় আর অনন্ত—এই পাঁচ প্রিস্তুত বলে দিয়েছেন—গিন্নিমা। আর পত্তরে সব নেকাই আছে। আমি একটু ঘোষ-পাড়া থেকে ঘুরে আসি। কুটুম্ব আছে, বার্ত্তা নিয়ে আসি। আপনি ঠিক করে রাখুন সব! প্রণাম করিয়া কুঞ্জ ঘোষ চলিয়া গেল।

বাহিরের পাট-ঝাঁট সারিয়া লবঙ্গলতা বাড়ীর উঠানে আসিয়া দেখা দিলেন, যোগমায়াও দুয়ারের বাহিরে আসিল।

যোগমায়া শুধাইল, গহনার কথা ও কি বলছিল বাবা?

রামজীবন বলিলেন, তোমার ননদ হঠাৎ শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছেন। তাঁর গহনা নাকি তোমার কাছে আছে—তাই বেয়ান চেয়ে পাঠিয়েছেন!

যোগমায়ার মুখ শুকাইয়া গেল। সে মাকে ডাকিয়া বলিল, এদিকে একবার এস না, মা।

ঝাঁটা উঠানের পেয়ারা গাছটায় ঠেস দিয়া রাখিয়া লবঙ্গলতা দাওয়ায় উঠিবার সর্ব্বোচ্চ পৈঠায় দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলছিল রে?

রামজীবন বলিলেন, মায়ার ননদের গহনা তোমাদের কাছে আছে?

লবঙ্গলতার মুখ শুকাইয়া গেল। একবার মেয়ের পানে চাহিয়া একটা ঢোক গিলিয়া তিনি বলিলেন, আছে। কেন?

বেয়ান লোক পাঠিয়েছেন—সেই গহনা নিয়ে যেতে। মেয়ে তাঁর শ্বশুরবাড়ী যাবে—তাই।

লবঙ্গলতা নির্ব্বাক প্রস্তরমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া যোগমায়ার পানে চাহিয়া রহিলেন।

রামজীবন বলিলেন, যাও, শীগ্‌গির হাত পা ধুয়ে কাপড়খানা ছেড়ে গহনাগুলো বার করে রাখ গে। এখুনি লোক আসবে।

তথাপি লবঙ্গলতা কোন কথা কহিলেন না, ঠায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। রামজীবন বুঝিলেন, কোথায় যেন কি ত্রুটি ঘটিয়াছে। তাঁহারাই ভুল করুন কিংবা ইহারাই ভুল বুঝুক—কি একটা অঘটন ঘটিয়াছে। লবঙ্গলতার পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি বলিলেন, ব্যাপার কি বল ত?

যোগমায়া অকস্মাৎ ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। লবঙ্গলতা বলিলেন, কিন্তু ওর হাতে গহনা দিয়ে বিশ্বাস কি?

রামজীবন বলিলেন, লোকটি খুব বিশ্বাসী। বেয়ান নিজে চিঠি দিয়েছেন ওরই হাতে গহনা দিতে।

তা হোক, ওর হাতে আমি অতগুলো সোনা বিশ্বাস করে দিতে পারব না—সে বেয়ান যাই লিখুন।

রামজীবন বলিলেন, বেশ ভেবেচিন্তে কথা বলো। তাঁর বিশ্বাসী লোক, না দিলে কুটুমের সঙ্গে মনকষাকষি হতে পারে। সেটা কি ভাল?

লবঙ্গলতার বুকে যেটুকু সাহস জাগিয়াছিল—এই কথায় সেটুকু উবিয়া গেল। শুষ্ক কণ্ঠে কহিলেন, তা ছাড়া সব গহনা তো এখন দিতে পারব না।

কেন? কেন দিতে পারবে না?

লবঙ্গলতার দু চোখ ভাঙ্গিয়া অশ্রুধারা নামিল। আঁচলে চোখ মুছিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, তুমি তো রইলে পড়ে, হাতে একটি পয়সা নেই—একলা মেয়েমানুষ ক'দিক সামলাব বল? মায়ার গহনা ক'খানা ছিল বলেই না তোমাকে সারিয়ে তুলতে পারলাম।

রামজীবন পাংশু মুখে কহিলেন, সব গহনাই কি বাঁধা দিয়েছ?

না, সব নয়।

কি কি গহনা বাঁধা দিয়েছ? বল, বল?

তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া লবঙ্গলতা কেমন যেন দিশাহারা হইয়া গেলেন। শুষ্ক স্বরে কহিলেন, শুধু নারকেল ফুল, গলার চিক আর অনন্ত।

রামজীবন আর কোন কথা না বলিয়া বালিশটার উপর কাত হইয়া শুইয়া পড়িলেন। শুধু বলিলেন, একটু জল দাও।

লবঙ্গলতা মেয়েকে ডাকিয়া বলিলেন, মায়া এক ফেরো জল নিয়ে আয় তো। স্বামীর পানে ফিরিয়া কহিলেন, তুমি সেরে ওঠ—ও গহনা খালাস করে আনতে কতক্ষণ! একটা কিছু বলে ওকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

যোগমায়া জল লইয়া পিতার শিয়রে আসিয়া ডাকিল, জল এনেছি, বাবা।

এনেছিস, দে। বলিয়া কম্পিত করে জলের ঘটীটা যোগমায়ার হাত হইতে লইয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া প্রায় সবটা জল পান করিয়া ফেলিলেন। খানিকটা জল কস গড়াইয়া বালিশের প্রান্ত ভিজাইয়া দিল। রামজীবন শিহরিয়া উঠিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, বড় শীত, বুড়ি, বড় শীত। শীগ্‌গির কাঁথাখানা গায়ে চাপিয়ে দে। উহু—হু—বড় শীত।

তাড়াতাড়ি কাঁথা আনিয়া, যোগমায়া বাপের গায়ে চাপাইয়া দিল। পিতার এই সহসা পরিবর্ত্তনে সে-ও কেমন বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল। কাঁথা চাপাইয়া দিয়াই তাড়াতাড়ি সে আপনার ডান হাতখানি তাঁহার কপালের উপর রাখিয়া আর্ত্তকণ্ঠে প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল, এ কি বাবা, তোমার কপালটা যে পুড়ে যাচ্ছে!

রামজীবন কোন উত্তর দিলেন না। আপনার কম্পমান ডান হাতখানি দিয়া যোগমায়ার ললাটন্যস্ত হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বুকের গোড়ায় টানিয়া আনিলেন ও প্রস্তুত ছোট ছেলেটির মতই ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

৯

দিন পাঁচেক পরে আর একখানি পত্র ও পাল্কী লইয়া কুঞ্জ ঘোষ দেখা দিল। দ্বিতীয় বার জ্বরের আক্রমণে রামজীবন তখন সংজ্ঞাহীন; যোগমায়াকে লইয়া লবঙ্গলতা অকূল পাথারে ভাসিতেছেন। ভরসামাত্র রাঙাখুড়ি। তা দুই দিন হইতে তাঁহারও বাম পায়ে এমন বেদনা হইয়াছে যে, অতি কষ্টে উঠা হাঁটা করিতেছেন। লোকে বলিতেছে, বাতের ব্যথা। তিনি বলেন, কলমি ডোবায় বাসন মাজিতে গিয়া এঁটেল মাটিতে পা পিছলাইয়া হঠাৎ পড়িয়া যাওয়াতে এই ব্যথা হইয়াছে। বয়সটা বেশী, কাজেই যে ব্যথাই

হউক—তাঁহাকে কাতর ও কাবু করিয়া ফেলিয়াছে। এমন কাবু করিয়াছে যে, ত্রয়োদশীর দিন হইতে এ বাড়ীতে শয়ন করা তাঁহার বন্ধ হইয়াছে। সবাই বলিতেছে, সামনে পূর্ণিমা—আর দু'টি দিন কাটিয়া গেলেই ব্যথা তাঁহার কমিয়া যাইবে। কিন্তু বাতব্যাধিই যদি তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে—আর দু'টি দিন গেলেই বা সে কাল ব্যাধির হাত হইতে পরিত্রাণ কোথায়? চিরদিন বাতে ভুগিয়া আশু কবিরাজের মা কি সাধে বলিতেন :

পুন্নিমে যেতে না যেতে অমাবস্যে এলো,
বেতো রুগীদের আর কোন্ দিন বা ভালো!

পূর্ণিমা কাটাইতে পারিলে রাঙাখুড়ি যেমন নিশ্চিন্ত হন, লবঙ্গলতারও তেমনি ভাবনা ঘোচে। সব রোগেরই বৃদ্ধি একাদশী হইতে পূর্ণিমা বা অমাবস্যার মুখে। পূর্ণ বিকারের মধ্যে রামজীবন অঘোরে পড়িয়া আছেন। কবিরাজের মুখে চিন্তার ছায়া ফুটিয়াছে, পাড়ার সকলেই বলাবলি করিতেছে, তাই ত, পথ্যি করবার দিন আবার জ্বরটা এলো! ভাল করে ঠাকুর-দেবতাকে মানত কর্ লবঙ্গ—তাঁরা কি এমনি যে মুখ তুলে চাইবেন না?

মানত লবঙ্গলতা দিনরাত করিতেছেন। চোখের জলে বুক ভাসাইয়া ভাঙ্গা শিবমন্দিরে গিয়া, রাঁধিবার কালে কাঠের ধোঁয়ায় চোখ রাঙা করিয়া এবং জপ করিবার কালে অনেকক্ষণ মেঝেতে ও তুলসী-তলায় মাথা লুটাইয়া মানত ও প্রার্থনা তাঁর চলিতেছেই। কিন্তু আশ্চর্য্য মানুষের মন, বিপদের শিলাখণ্ড বুকে চাপিলে প্রার্থনার সহজ ভাষাও ঠিক মত বাহির হইতে চায় না। সমস্ত মঙ্গলকে ঠেলিয়া অশুভ ইঙ্গিতটি স্পষ্টতর হইতে থাকে। যদি উনি না সারিয়া উঠেন? যদি···মাথা খুঁড়িয়া লবঙ্গলতা ভাবেন, কেন আমার মনে দিনরাত কু-ভাবনাগুলি জট বাঁধিয়া আছে? ভগবান্ যে মঙ্গলময় এ বিশ্বাস ভালদিনে যেমন ছিল, বিপদের দিনে তেমনই মুছিয়া যাইতেছে কেন?

দুপুরে খাওয়ার আগে জপ সারিবার কালে—মেঝেয় মাথা ঠুকিয়া লবঙ্গলতা আকুল মনে এই সব ভাবিতেছেন, ওদিকে রান্নাঘরে ভাতের থালা কোলে করিয়া যোগমায়া ডাকিতেছে, মা তোমার হ'ল? ভাত যে শুকিয়ে কড়কড়ে হয়ে গেল। এমন সময়ে পাল্কী নামাইয়া কুঞ্জ ঘোষ বাহির-দরজায় হাঁকিল, ঠাকুরমশায় গো—একবার দরজাটা খোলেন। আমি কুঞ্জ ঘোষ—তোমার বেয়ানের কাছ থেকে আসছি। ভাতের থালার সম্মুখে বসিয়া যোগমায়া একবার কাঁপিয়া উঠিল, লবঙ্গলতা তাড়াতাড়ি প্রণাম সারিয়া বাহিরে আসিলেন।

লজ্জার সময় এ নহে। রামজীবন জ্বরঘোরে অচৈতন্য; রাঙাখুড়ি বাম হাঁটুতে হরীতকী বাটা ও চোনার প্রলেপ লাগাইয়া রৌদ্রে পড়িয়া আছেন, আজ একবারও এ বাড়ী আসেন নাই; হরি বাড়ী নাই যে তাহাকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া লবঙ্গলতা বৈবাহিক বাড়ীর কুটুম্ব-স্বজনের সাক্ষাতে নিজের মান বাঁচাইয়া আলাপ-আলোচনা করিবেন!

কি আর করেন, কাপড়খানায় সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া আবক্ষ ঘোমটা টানিয়া দুয়ার খুলিয়া কুঞ্জ ঘোষের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন।

কুঞ্জ ঘোষ মাটির পানে চাহিয়া সেই দূর হইতেই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। চিঠিখানি তাঁহার পদপ্রান্তে রাখিয়া হেঁট মুখেই বলিতে লাগিল, বাঁড়ুজ্যে মশায়—কেমন আছেন?

মৃদুস্বরে লবঙ্গলতা জবাব দিলেন, জ্বরে বেহুঁস।

তাই ত। মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কুঞ্জ ঘোষ বলিল, ইদিকে মা-ঠাকরোণ—আপনাদের বেয়ান গো—তেনার হুকুম বউমাকে নিয়ে যেতে হবে। যে পায়ে আছেন—সেই পায়ে যেতে বলেছেন। কাল কমলাদিদি শ্বশুরবাড়ী যাবে কি না—তাই।

এই অসুখের মধ্যে—আমি একা মেয়েমানুষ—কি করে পাঠাই মেয়েকে?

তাই ত দেখছি, মা-ঠাকরোণ, তোমাদের তো অজ্জল-অস্থল অবস্থা। ইদিকে তেনার প্রিতিজ্ঞে, হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না। পরে গলা খাটো করিয়া কহিল, মা-ঠাকরোণ আপনাদের যে শত্তুর আছে—এ কথাও শোনলাম। তেনারাই তো বলে এয়েলেন, একদিন সন্দ্যেবেলা যে আপনারা নাকি বউমার গহনা বাঁধা দিয়ে বাবুর অসুকে ধার-কর্জ্জ করেছ! এই বেলা বউমাকে না নিয়ে এলে সব গহনাগুলো যাবে।

লবঙ্গলতা সবিস্ময়ে বলিলেন, আমরা তো কারো সঙ্গে ঝগড়া করি নে—

কুঞ্জ ঘোষ হে হে করিয়া হাসিয়া বলিল, ঝগড়া আপনারা করবা কেন, মা-ঠাকরোণ, শত্তুরের দশাই ওই। কথায় বলে না, 'ভাল করতে পারি নে মন্দ করতে পারি, কি দিবি তা বল?' ওই যে কালো, মাথায় শোণের নুড়ির মত পাকা চুল, ধুম্‌সী মাগী ধুমোবতীর মত চেহারা—উনিই তো গিয়েলো সেই সন্দ্যেবেলায়!

তুমি বোস একটু। আমি আসছি। দাওয়ায় আসিয়া লবঙ্গলতা চিঠিখানা মেয়ের হাতে দিয়া বলিলেন,—কি লিখেছে, পড় ত, মা।

যোগমায়া বলিল, তুমিই পড না, মা।

না মা, মাথার ঠিক নেই—চোখে কেমন ধাধ-ধাধ ঠেকছে—তুই পড়।

যোগমায়া পড়িল :

যথা'বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন,

বেয়াই, আপনি কুঞ্জ ঘোষকে ফেরত দিয়াছেন, গহনা দেন নাই। আমি যাহাকে বিশ্বাস করিয়া পাঠাইলাম—আপনি তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। দোষ আমারই অদৃষ্টের। একটা লোকের রাহাখরচ দিয়া পাঠানো যে কত ঝঞ্ঝাটের কাজ—পুরুষমানুষ আপনি বুঝিতে পারিবেন না। লোকের খোসামোদ ও অর্থদণ্ড দুই ভোগ করিতে হয়। যাহা হউক, আপনাকে জানাইতেছি যে, আমার কন্যা শ্রীমতী কমলা আগামী কল্য শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিবে। সে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে যাহাতে গহনাগুলি লইয়া যাইতে পারে—সে ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য বিধায় আপনাকে জানাইতেছি। আপনার কন্যাকে পিত্রালয়ে রাখিয়া আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, মেয়েকে নিজের কাছে রাখিবার সাহস আমার নাই। কুটুম্বকে বিনা কারণে অসম্মান দেখাইতে আমার বাধে। তাহা ছাড়া কুটুম্বকে ভয় করিয়াও চলিতে হয়। পাল্কী পাঠাইলাম। বধূমাতাকে এই সঙ্গে পাঠাইয়া দিবেন। সামনে ভাদ্র মাস, মল মাস বলিয়া আশ্বিনেও ভাল দিন নাই। মেয়েকে অবশ্য করিয়া পাঠাইবেন। আশা করি, ও-বাটীর সকলে কুশলে আছেন।

পুঃ—আর একটি কথা। পাল্কী যদি ফেরত আসে, তবে বুঝিব বধূমাতারও এ গৃহে আসিবার ইচ্ছা নাই। এবং ইহার পর তাঁহাকে এ গৃহে আনিতে যাওয়ার মুখও আমার থাকিবে না। যাহা ভাল হয় করিবেন।

বজ্রাহতের মত লবঙ্গলতা বলিলেন, মায়া।

যোগমায়া চিঠিখানা একপাশে রাখিয়া মায়ের পানে চাহিল।

শীগ্‌গির কাপড় পরে নে, মা ; পাল্কী ফেরাতে পারব না।

যোগমায়া শুষ্ক কণ্ঠে কহিল, চারটি খেতেও বললে না, মা ? মুখের ভাত নিয়ে বসে আছি।

লবঙ্গলতা চোখের জলে ভাসিয়া ধরা গলায় বলিলেন, শ্বশুরবাড়ীর ভাতই মেয়েমানুষের আসল ভাত। আমি হয়ত চোখের জল ফেলব, তোর কিন্তু ভালই হবে, মায়া।

ভাল! ম্লান হাসিয়া যোগমায়া মুখ ফিরাইল। চোখের জল গোপন করিতে কি না, কে জানে ?

এক মুঠো মুখে দিয়ে কাপড়টা ছেড়ে ফেল, মা। তাড়াতাড়ি চুলটা বেঁধে দেই। আমি ততক্ষণ ওদের একটু পাটালি গুড় দিয়ে জল খাইয়ে আসি।

খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া লবঙ্গলতা দেখিলেন, ভাতের থালা কোলে করিয়া যোগমায়া একভাবেই বসিয়া আছে। কাপড় সে ছাড়ে নাই।

ওরা যে তাড়া দিচ্ছে, মায়া। না খাস—নাই খাবি, কাপড়খানা ছেড়ে ফেল।

ম্লান হাসিয়া যোগমায়া বলিল, আমি তো যাব না, মা।

যাবি নে ? পড়লি তো বেয়ান কি লিখেছেন ? না যাওয়ার মানে বুঝিস ?

যোগমায়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, মানে সে বুঝিয়াছে।

লবঙ্গলতা পুনঃ পুনঃ মাথা নাড়িয়া ঈষৎ স্বর চড়াইয়া বলিলেন, না মায়া, মানে তুই বুঝিসনি। আজ যদি পাল্কী ফিরে যায়, তোর সেখানে গিয়ে দাঁড়াবার মুখ আর থাকবে না।

এত বড় কথা শুনিয়াও যোগমায়ার দেহে স্পন্দন জাগিল না। যেমন বসিয়াছিল—তেমনই সে বসিয়া রহিল।

বাহির হইতে কুঞ্জ ঘোষ হাঁকিল, আপনাদের হ'ল গো, মাঠাকরোণ ?

লবঙ্গলতা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। পাগলিনীর মত যোগমায়ার একখানা হাত টানিয়া ধরিয়া বার বার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, ওরে হতভাগী—নিজের সর্ব্বনাশ ডেকে আনিস নে। ওঠ—ওঠ বলছি। না উঠিস তো মাথা-মুড় খুঁড়ে আমি রক্তগঙ্গা হব এইখানে।

যোগমায়া গাত্রোত্থান করিল। ধীরে ধীরে পৈঠা দিয়া উঠানে নামিল। উঠানে নামিয়া কাপড় ছাড়িবার জন্য শয়নঘরের অভিমুখে না গিয়া সদর দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল। সেখান হইতে তাহার সুস্পষ্ট অথচ চাপা দৃঢ়কণ্ঠ শোনা গেল,—আপনি ফিরে যান। বাবার অসুখ না সারলে আমি তো যেতে পারব না।

লবঙ্গলতার চোখের সম্মুখে দ্বিপ্রহরের উজ্জ্বল

আকাশ সেই মুহূর্ত্তে গাঢ় অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল। অস্ফুট একটু আর্ত্তনাদ করিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত তাঁহার রহিল না।

তৃতীয় অধ্যায়

১

তার পর বর্ষা গিয়াছে—হেমন্ত অদৃশ্য হইয়াছে—শীতও এইমাত্র চলিয়া গেল। সুদীর্ঘ ছ'টি মাস পায়ে পায়ে আগাইয়া গিয়াছে। ছ'টি মাস মানুষের আয়ু হইতে খসিয়া পড়িতে কতটুকুই বা লাগে! কিন্তু হরিপুরের এ বাড়ীতে এই ছ'টি মাস দীর্ঘসূত্রিতায় যাই যাই করিয়াও যাইতে চাহে নাই। সাধারণ মানুষ বলিয়াছে, পুজো এলো আর চলে গেল—দিনগুলো যেন উড়ে যাচ্ছে! যোগমায়া ভাবিয়াছে, সেই কথাই কি সত্য? দিনের পাখা কোথায়? পায়ে তাহার ভারী পাথর বাঁধা। ভাদ্রের শেষে শিউলি ফুল ফুটিয়াছে, আশ্বিনে বাগানে আগুন জ্বালাইয়া ফুটিয়াছে স্থলপদ্ম। পুকুর কুমুদ-কহ্লারে হাসিয়াছে, আকাশ মাথার উপরে অনেকখানি উঁচু হইয়াছে আর হইয়াছে গাঢ় নীল। সেই নীলের কোল ঘেঁষিয়া মাঝে মাঝে বকের সারি উড়িয়া যায়।

'বক মামা বক মামা ফুল দিয়ে যা,
তাল গাছে কড়ি আছে গুণে নিয়ে যা।'

ছ'টি হাতে দশটি আঙুলের নখের মাথায় সাদা সাদা দাগ দেখিয়া কৌতূহলী বালকবালিকারা কে কয়টি ফুল পাইয়াছে—সগর্ব্বে পরস্পরকে দেখায়। যোগমায়া আঙুল উল্টাইয়া ছেলেবেলার মত নখ দেখে নাই। তার পর, বৈরাগীরা গাহিয়াছে আগমনীর গান, ঘোষাল-বাড়ীতে বাজিয়াছে আগমনীর নহবৎ। এত বিলম্বিত মায়ের আগমন? ঋতু পরিবর্ত্তনে মনের সরোবরও ওই পদ্ম-কহ্লারের মত বর্ণবিকাশে ভরিয়া উঠিতে চাহে। ত্রয়োদশ শেষ হইয়াছে যোগমায়ার। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের যোগ কোথায় সে ঠিক বুঝিতে না পারিলেও—ওই নীল আকাশ, শিউলি ফুলের গন্ধ, স্থলপদ্মের বাগান-ভুলানো হাসি—সব কিছুতেই মনটিকে মিশাইয়া দিতে ইচ্ছা হয়। আকাশ যেমন ভরিয়া আছে, বাগান ও পুকুর যেমন সর্ব্বাঙ্গে সার্থক হইয়াছে, শিউলি গাছে যেমন লক্ষ লক্ষ কুঁড়ির সমারোহ—অমনই একটি সার্থক হইবার আশা—ক্ষীণ আশা—যোগমায়ার মনকে নাচাইতেছে সর্ব্বক্ষণ। এ সময়ে যদি রামচন্দ্র আসিত!

রামচন্দ্র আসিল না, ষষ্ঠী চলিয়া যায়-যায়—শ্বশুরবাড়ী হইতে পূজার তত্ত্ব আসিল না, আসিল না কোন সমাচার। যদিও শরৎ শেষ হইয়া কার্ত্তিকের প্রথমে পূজা আসিল—পূজা একবারেই না আসিলে বা কি ক্ষতি হইত?

কৈ গো যোগমায়ার মা, বেয়ান এবার মেয়েকে কি কাপড় দিলেন দেখি? দেয় নি কিছু, ও মা, সে কি?

লজ্জা তো বটেই। এ লজ্জা যেন লবঙ্গলতারই।

মুখ নামাইয়া তিনি উত্তর দেন, এবার বেয়ান একখানা বাড়ী কিনেছেন কিনা, মেয়ে পাঠাবার সময়ই বলেছিলেন—তত্ত্ব-টত্ত্ব করতে পারবেন না।

ও মা, যে রাঁধে সে কি আর চুল বাঁধে না? দেনা-কর্জ্জ কোন্ সংসারে নেই, বছরকার দিন একখান দশি তা বলে কি কেউ দেয় না? তোমার বেয়ানের সবই নতুন ধারা বাপু! বুড়ি খুব কেপ্পন বুঝি?

হাসি টানিয়া লবঙ্গলতা জবাব দেন, তা বেয়ানের একটু হাতভারি আছে, ঠাকুরঝি।

একটু নয়—বিশেষ। তা পুজোর সময় যোগিকে যে বড় নিয়ে গেলেন না?

এই তো সেদিন এলো, উনি এখনও ভাল করে সারেন নি। কথায় কথায় মায়া। পান সাজবে মায়া, জল গড়িয়ে দেবে মায়া, বিছানা পাতবে মায়া, রামায়ণ পড়বে মায়া—মায়া অন্ত প্রাণ।

আহা বাপের প্রাণ! অসুখ হ'লে মমতা যেন বাড়ে। তা ভাই—সত্যি বলতে কি, মেয়েমানুষের স্বামীর ঘর হ'লো গিয়ে আপন। দু'দিক যাতে বজায় থাকে, তাই করাই ভাল।

কেন, দু'দিক বজায় থাকবে না, ঠাকুর-ঝি?

থাকলেই ভাল। পাড়ার কেউ কষ্ট পায়—শুনলেই প্রাণটা কর কর ক'রে ওঠে। আহা—অতিবড় শত্তুরেরও যেন শ্বশুরবাড়ীর হেনস্থা না হয়।

তিনি চলিয়া গেলে যোগমায়া দাওয়ায় আসিয়া বলিল, মা, কেন তুমি ওঁদের সামনে রোজ রোজ মিথ্যে কথা বল।

লবঙ্গলতা অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন, কি মিথ্যে কথা বললাম?

এই তো ত্রৈলোক্য-পিসির সামনে বললে—বাড়ী কিনেছে ব'লে এবার পুজোয় তত্ত্ব করতে পারে নি।

লবঙ্গলতার আজকাল কথায় কথায় ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। যে সর্ব্বনাশ মেয়ে ঘটাইয়াছে তাহা যেন তাঁহারই অদৃষ্টগুণে ঘটিয়াছে। তিনি যদি সুগৃহিণী হইতেন তো সাধ্য ছিল কি মেয়ের শ্বশুরবাড়ীর পাল্কী ফিরাইয়া দিবার। পাল্কী শুধু ফিরিয়া যায় নাই, সে বাড়ীর দুয়ার যোগমায়ার পক্ষে হয়ত বা চিরদিনের জন্যই রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। মেয়ের নির্ব্বুদ্ধিতায় তাঁহার অল্পেতেই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। তাহাকে বকিয়া কাঁদিয়া অল্প সময়ের মধ্যে সংসারে এমন অশান্তি ঘনাইয়া তুলেন! অথবা মন্দভাগ্যের পথ দিয়া এমনই অকারণে—সামান্য ছলছুতায় অশান্তির কালো মেঘখানি দেখা দেয়।

ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে লবঙ্গলতা বলিলেন, কেনে নি বাড়ী, মিছে কথা বললাম? তুই তো সবতাতেই আজকাল আমাকে মিছে কথা বলতে শুনিস! শত্তুর ধরেছিলাম পেটে—নইলে পেটের মেয়ে হ'য়ে তুই—মায়ের চোখে হু-হু করিয়া জল আসিলেই যোগমায়া ছুটিয়া পালায় সেখান হইতে। ভাবে, সংসারে মানুষ নিজের সুখটাই বেশী বোঝে বলিয়া কথায় কথায় পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইতে তার বাধে না হয়ত।

পলাইয়াই বা নিস্তার কোথায়? সব সময়ে যোগমায়াই কি সত্য কথা বলিতে পারে? সেদিন বৈকালে অপর্ণা বাড়ীতে আসিয়া যোগমায়াকে লইয়া পড়িল।

তবু ভাল তোকে পেলাম; যারই খবর নিই—শুনি শ্বশুরবাড়ী। মাগো মা, কি শ্বশুরবাড়ীই যে চিনেছে সব!

আর তুমি? যোগমায়া রহস্য করিবার চেষ্টা করিল।

আমার কথা আলাদা। শাশুড়ী কি আর চোখ মেলে দেখেন কিছু সংসারে? যেটি আমি না করব, সেটি হবে না। এই দেখুন, যত রাজ্যের চাবির গোছা আমার আঁচলে বেঁধে দিয়েছেন। পাছে বাপের বাড়ী এসে আট-দশ দিন থাকি—তাই এই বাঁধন! এই সৌভাগ্যের কথা শতবার শুনাইয়াও অপর্ণার তৃপ্তি নাই। যোগমায়ার পর্য্যন্ত সেগুলি মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। অপর্ণা না থাকিলে গরুগুলি আধপেটা খাইয়া রোগা হইয়া যায়, শ্বশুরের কণ্ঠার হাড় ঠেলিয়া উঠে, শাশুড়ীর জপে ভুল হয়, আর স্বামীর আকারটি মাত্র পড়িয়া থাকে—প্রাণটি চলিয়া আসে অপর্ণার সঙ্গে—যেমন চাবির গোছা আঁচলের খুঁটে বাঁধা রহিয়াছে। স্বামী ও শাশুড়ী-প্রীতির উচ্ছ্বাসে অপর্ণা সঙ্গিনীদের যতই ভাসাইবার চেষ্টা করুক না কেন, যোগমায়ার মনে হইত, বঞ্চিত বলিয়াই হঠাৎ ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তির উল্লাসে অতিরঞ্জনে সে প্রগল্‌ভা হইয়া উঠে। আজ মনে হয়, হউক অতিরঞ্জন—সত্যকার বস্তু না পাইলে কেহ কি আনন্দে ফুলিয়া উঠিতে পারে? একটু সত্য বস্তু থাকিলে মিথ্যা অতিরঞ্জন-দোষে দুষ্ট হইয়াও অশোভন আচরণ বা শ্রুতিকটু ভাষণের অগৌরব অস্বীকার করিতে পারে। চুপ করিয়া রহিল যোগমায়া। সখীর সৌভাগ্যে মনে মনে একটু ঈর্ষা বোধ করিল বইকি।

অপর্ণা হাসিল, তা তুই কবে এলি? জ্যৈষ্ঠ মাসে? বলিস কি লো, এ যে দীর্ঘ বিচ্ছেদ!

ভারি তো বিচ্ছেদ!

ভারি নয়? আচ্ছা নিয়ে আয় তোর চিঠি—কেমন হা-হুতাশ তাতে নেই দেখি? ভারি চাপা মেয়ে তুই—যুগি—চিরটা কাল এমনি চাপা। ভালবাসার কথা বললেই যেন পরকে অমনি ভাগ দিয়ে ফেললি? ভয় দেখ মেয়ের!

আচ্ছা অপি, ভালবাসা হ'লে এতদিন কেউ কি চুপচাপ বসে থাকতে পারে?

অপর্ণা বলিল, পারেই তো। শ্রীরাধা এক-শ বছর বিরহ সয়েছিলেন, আর এ তো হল আষাঢ় এক, শ্রাবণ দুই—

হ'সিয়া যোগমায়া বলিল, আঙুল গুণে কাজ নেই, আমি বল'ছ চার মাস। কিন্তু এমনও তো হ'তে পারে—তারা আবার বিয়ে করবে কোথায়!

তাই নাকি! লিখেছে বুঝি ঐ কথা চিঠিতে? ধন্যি তোর বর, যোগমায়া! তা ওরা পারে, সব পারে। বৃন্দাবনে রাধাকে ত্যাগ ক'রে অনায়াসে মথুরায় গিয়ে কুঁজিকে বিয়ে করলে।

কথার মোড় অন্য দিকে ঘুরিতেছে দেখিয়া যোগমায়া স্বস্তি বোধ করিল।

একটু থামিয়া অপর্ণা বলিল, পুজোর দিন এমন ডোকলার মত দশা কেন তোর? গহনাগুলো অঙ্গে ওঠা, কাপড়খানা পর।

যার যা আছে সে তাই প'রে থাকে।

হুঁ, তোর এই কাল চিটি কাপড় ছাড়া যেন আর কিছু নেই! নে, রঙ্গ রাখ্। আজ ষষ্ঠীর দিন, নতুন কাপড় প'রতে হয়।

যাদের নতুন কাপড় নেই—তারা কি পরে?

কি আবার প'রবে, পুরোনো। কিন্তু রাঁড়ি-বালতি যার যা জোটে—

অপি, ক'দিন থাকবি এখানে।

যেরেকেটে কোজাগর পূর্ন্নিমে অবধি। এই বলে কত ব'লে ক'য়ে—

তোর শাশুড়ী তোকে বকে না?

বকবে? শাশুড়ী? যেন এত বড় অবান্তর প্রশ্ন এ জগতে অপর্ণাকে এই প্রথম করা হইল। হাসিয়া বলিল, যে ভালমানুষ তিনি—

অপর্ণার শাশুড়ী-মহিমা বর্ণনায় বাধা পড়িল। লবঙ্গলতা আসিয়া পড়িলেন। এক হাতে তাঁর গিরিমাটি গোলা বাটি, অন্য হাতে কলাপাতায় সিঁদুর গোলা। দুয়ারের চৌকাঠে গিরিমাটি ও সিঁদুরের ফোঁটা দিয়া তিনি ষষ্ঠীর শুভ অনুষ্ঠান পালন করিতেছেন। অপর্ণা তাঁহাকে প্রণাম করিতেই তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, থাক, থাক, জন্মএয়োস্ত্রী হও। এই শাড়ী বুঝি এবার পূজোয় হ'ল? বেশ শাড়ী।

অপর্ণা বলিল, যুগিকে শাড়ী পরিয়ে দেন নি কেন, খুড়িমা?

পরবে'খন। তিনি তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলিলেন। যোগমায়া মায়ের কথার প্রতিবাদ করিল না।

অপর্ণা বলিল, আবার আসব এখুনি—দেখি কে কে আছেন বাপের বাড়ীতে।

অপর্ণার সম্মুখে সত্য কথা প্রকাশ করিতে যোগমায়ার বাধিল বইকি। পাকে-প্রকারে যে কথা সে জানাইতে চাহে, স্বামী-সোহাগিনী তরুণী সে কথা বিশ্বাস করিবে কেন? যতই সে শ্বশুরবাড়ীর অবহেলা, অনাদর, ও বৈরাগ্যের ছবিটি রূঢ়ভাবে ফুটাইতে চাহে, ততই অপর্ণারা হাসিয়া সে কথা উড়াইয়া দেয়। ইতিপূর্ব্বে তাহারা কি যোগমায়ার চিঠি দেখে নাই, না, যোগমায়ার শ্বশুরবাড়ীর কাহিনী শোনে নাই? এ কথা সত্য —উচ্ছ্বাসে গলিয়া যোগমায়া সাধিয়া সে গল্প কোন দিন করে নাই ইহাদের কাছে। কিন্তু সেখানকার কথা উঠিলেই তার উজ্জ্বল চোখের পানে চাহিয়া সমব্যথী তরুণীরা কি মনের কথা বুঝিতেও ভুল করিবে? মুখরার যাহা কথায় ফোটে, যোগমায়ার মত লাজুক প্রকৃতির মেয়েদের নম্র চালচলনের মধ্যে সেটুকু ভিন্ন ভাবেই হয়ত প্রকাশ পায়।

আবার আসিল অপর্ণা। সারা সন্ধ্যাবেলায় বসিয়া নিজের সৌভাগ্যের ইতিহাস খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া যোগমায়াকে বলিল এবং যোগমায়ার কাহিনীও কিছু কিছু শুনিল। না শুনাইয়া তো যোগমায়া পারিল না। অনেকগুলি পাল-পার্ব্বণ-ভরা দিনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, কয়েকটি অন্ধকার ও চাঁদিনী রাত্রির ভয় আনন্দের কথা, রামচন্দ্রকে লইয়া ছেলেমানুষি শপথ ও কপট অভিমান—সবই তো কিছু কিছু অপর্ণাকে জানাইল। যে-কাহিনীর উপর নির্ম্মমভাবে যবনিকা পড়িয়াছে, সেই কাহিনীকেই উদ্ধার করিয়া নিজের সম্ভ্রম যোগমায়া অক্ষুন্ন রাখিল। ষষ্ঠীর সন্ধ্যাবেলায় ফর্সা কাপড়ও সে পরিয়াছে, কমলার অবন্ধকী গহনা ক'খানাও গায়ে তুলিয়াছে। অথচ মিথ্যা কথা বলার জন্য আজ সকালেই সে মায়ের সঙ্গে উগ্রভাবে কথা বলিয়াছে! মিথ্যা কথা বলা বেশী অসম্মানকর, না মিথ্যা অভিনয় করাটা?

অপর্ণা চলিয়া গেলে দাওয়ার ওধারের কোণে বসিয়া যোগমায়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিল, অন্তত একখানি পত্রও যেন রামচন্দ্রের নিকট হইতে আসে। কোন পত্র তো আসে নাই, কাজেই শ্বশুরবাড়ী হইতে শেষ যে পত্রখানি আসিয়াছে সেইখানিই সে আর একবার বাক্স হইতে বাহির করিল। প্রদীপের আলোয় সে কমলার পত্রখানি খুলিয়া বসিল। এ পত্রখানি সে একবার পড়ে নাই, বার বার পড়িয়াছে।

পাল্কী ফিরিয়া যাইবার দিন দুই পরে সেই পত্র আসিয়াছিল। লেখা আছে:

পূজনীয়া বৌ, তোমার এ কাজটা ভাল হইল না ভাই। কেন তুমি মার কথা অমান্য করিলে? মার কথা রাখিয়া যদি এখানে আসিতে তো সব গোলই মিটিয়া যাইত। তোমার বাবার অসুখ—আমরা জানি। তবু কেন যে পাল্কী গিয়াছিল ওখানে শুনিবে? তোমাদেরই কোন জ্ঞাতি একদিন বৈকালে আমাদের বাড়ী আসিয়া মার সামনে বলিলেন যে, তোমার গায়ের গহনা বাঁধা দিয়া নাকি সংসার-খরচ চালাইতেছ। কথাটা আমি বিশ্বাস করিলাম না। মার মনে সন্দেহ হইল। তাই চিঠি দিয়া কুঞ্জ-কাকাকে গহনা আনিতে পাঠাইলেন। তোমরা বিশ্বাস করিয়া তাহার কাছে গহনা দিলে না। সে যাহা হউক, মার মনে ধারণা হইল, গহনা শুধু বন্ধক দেওয়া নয়—হয় তো বা বেচিয়াই দিয়াছ। এই কথা লইয়া মার সঙ্গে আমার ঝগড়া হইয়া গেল। আমি

বলিলাম, গহনা কি উঁরা বেচতে পারেন? মা বলিলেন, নিশ্চয়ই বেচেছে। সত্য মিথ্যা পরীক্ষার জন্য তোমাকে আনিতে আমিই পাল্কী পাঠাইলাম। সত্যি ভাই, যদি একবার আসিতে, আমার সঙ্গে দেখা হইত, মার মনের সন্দেহ ঘুচিত আর তোমাকে পরের দিন বাপেরবাড়ী পাঠাইবার ব্যবস্থাও আমি করিয়া যাইতাম। কেন আসিলে না ভাই? তবে কি মায়ের কথা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইব?—তা যদি হয়—বড় অন্যায় কাজ করিয়াছ। তোমাকে ভালবাসিয়া আমার গহনা তোমার গায়ে পরাইয়া আমার আনন্দ হইয়াছিল। গহনা লইয়া আমার শ্বশুরবাড়ীতে কোন কথা না-ও উঠিতে পারে। কিন্তু তোমাদের দিক হইতে কত বড় অন্যায় কাজ হইয়া গেল—ভাব তো একবার। তোমার মায়ের গহনা তো বেচিতে বা বাঁধা দিতে পারিতে। ভারি অন্যায় করিয়াছ ভাই। আমি যদি বা, ক্ষমা করিতে পারি—উঁরা ক্ষমা করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। কে-ই বা ক্ষমা করিতে পারে? তোমার জন্য আমার দুঃখ নয়—রাগও হয়। একবার শ্বশুরবাড়ী আসিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইত? ছি ভাই, বুদ্ধি তোমার মোটেই নাই। নিজের পায়ে কুড়ুল মারিলে, সারা জীবন অনুতাপে কাটাইতে হইবে। আমার এমন রাগ হইতেছে যে, তোমাকে ভালবাসা বা প্রণাম জানাইতেও ইচ্ছা হইতেছে না।—

ইতি—
কমলা।

যোগমায়া তো অন্তর্যামিনী নহে, ভিতরে ভিতরে এমন একটা কাণ্ড ঘটিয়াছে—কি করিয়া বুঝিবে সে। হারু-কাকার বিধবা লেবু পাড়ার উত্তম শোধ লইয়াছেন। এত জানিলে সে নিশ্চয়ই একবার শ্বশুরবাড়ী যাইত—তাঁহাদের পায়ে ধরিয়াও অন্তত এ বিরোধের মীমাংসা করিত। বাপের অত বড় অসুখে পাল্কী আসিতে দেখিয়াই না তাহার পিতৃস্নেহমুগ্ধ অন্তর ধোঁয়ায় ভরিয়া উঠিল। ক্রোধ এবং অভিমানে ভরা সেই ধোঁয়া। মানুষ কি মানুষের কাছে সহজ সবল স্নেহ-মমতার প্রত্যাশাও করিতে পারে না?

বিজয়ার দিন সব চেয়ে ফাঁকা লাগিয়াছে যোগমায়ার। বিসর্জ্জনের বাদ্য যেন দেবীপ্রতিমার নহে—তাহারই অন্তরের মুক্ত দীর্ঘনিশ্বাসের ধারা। মা-বাপের পায়ে প্রণাম সারিয়া, আরও কোথায় প্রণাম রাখিবার আকুল আকাঙ্ক্ষা কেন জাগিতেছে? গেল বছরের কথা এখনও যে হৃদয়ের কানায় কানায় ভরা।

প্রণাম করিবার আগে সেই রহস্যপ্রিয় কিশোরের বাহুবন্ধনে বন্দিনী হইয়া যোগমায়া চোখ বুজিয়াছিল। সারা দেহে তার শিহরণ জাগিয়াছিল সেই কিশোরের দেহসুরভিতে।

শরতের নীল আকাশে রোজই অসংখ্য তারা উঠিতেছে, কলাভিমুখী চন্দ্র দিন দিন পরিপুষ্টি লাভ করিয়া উজ্জ্বল হইতেছেন। গত বৎসরের শরতের আকাশ—এ বৎসরের প্রতি সন্ধ্যায় চোখে দেখা আকাশের কাছে তবু নিষ্প্রভ হইয়া গেল। এ আকাশে বর্ণ আছে—বিভ্রম নাই, সমারোহ আছে—জীবন নাই, স্নিগ্ধ বলিয়াই বুঝি মনকে পাথর করিয়া দেয়।

দশমীর রাত্রিতে যোগমায়া ঘুমাইতে পারিল না। সেই উষ্ণ নিশ্বাসের পরিমণ্ডলে সারারাত্রি সে সাঁতার কাটিয়া বেড়াইল, সেই আদরচুম্বনের ঢেউয়ের তালে তালে কখনও শিহরিত—কখনও বা তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া রহিল।

আর কালীপূজার দিন? জগদ্ধাত্রী পূজার দিন? মানুষের সুসময়ে উৎসব আসে বন্ধুর মত। আতসবাজী, বাজনা, ভোগ-প্রসাদ বিতরণ, আরতি ও পূজার মধ্য দিয়া মানুষকে প্রিয়পরিজনের অন্তররাজ্যে পৌছাইয়া দিয়া উৎসব পরিসমাপ্ত হয়। দুঃখের দিনে এই উৎসবই কণ্টক ক্ষতের জ্বালায় তাহার সুখ-স্মৃতিকে জাগাইয়া তোলে—তাহাকে অস্থির করিয়া দেয়। সুখ যেন শিথিলবৃন্ত কামিনী ফুল। হাত দিয়া ছুঁইলে বৃন্তচ্যুত হইতে এক দণ্ডও বিলম্ব ঘটে না।

অগ্রহায়ণের সংক্ষিপ্ত দিনগুলি রাত্রিকে করে দীর্ঘতর। দীর্ঘতর রাত্রির সবটুকুই তো নিদ্রায় কাটে না, কাটে চিন্তায়। যে ঘটনার প্রবাহ সুখস্রোতের মত একদা সারা দেহে প্লাবন আনিয়া দিয়াছিল, তাহারই বিপরীতমুখী স্রোত-ধারাটিকে ফিরাইয়া সেই প্রবাহে ভাসিয়া থাকিতে ইচ্ছা জাগে! রবিবারে ইতুপূজার পর্ব্ব, নবান্নের শুভ আয়োজন কাহার জন্য? যাহার সংসারের দুয়ার বন্ধ হইয়া গিয়াছে চিরদিনের জন্য—সে কেন পালন করিবে এই পার্ব্বণগুলি? কিন্তু বড় তৃপ্তি হয় পার্ব্বণ পালন কালে। প্রথমটায় সবই তো দুঃখের কাহিনী। নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যই হউক, অহমিকার জন্যই হউক, আর ভ্রমপ্রমাদবশতই হউক—দেবতাকে অগ্রাহ্য করিয়া যে দুঃখটা ওই কাহিনীর

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীরা ভোগ করিয়া গিয়াছেন,—দেবমহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভক্তিমান্ হওয়া মাত্রই তাঁহাদের সে বিপদ কাটিয়াছে। সুখের সূর্য্যকিরণে পিঠ পাতিয়া আবার তাঁহারা আরাম উপভোগ করিয়াছেন। প্রার্থনা ও প্রণামের মধ্যে যোগমায়া তাই পূজাগুলির মধ্যে সান্ত্বনা পাইয়া থাকে। বিপদ আসে, বিপদ কাটিয়া যায়। কিছুই চিরস্থায়ী নহে। দেব-মহিমায় কি না সম্ভব? যোগমায়ার নির্ব্বুদ্ধিতায় যে গ্রহ রুষ্ট হইয়া এই অঘটন ঘটাইয়াছে সে-ও একদিন ইতুপূজার সঙ্গে, কুলুই-চণ্ডীর ব্রত পালনে হয়ত বা তুষ্ট হইতে পারে। কিন্তু সে কবে?

অল্লায়ু অগ্রহায়ণ ও পৌষ যেন যাইয়াও যাইতে চাহে না। তবু তাহারা চলিয়া গেল। মাঘ আসিল। সরস্বতী পূজার উৎসব—তার পরের দিন শীতল ষষ্ঠীর কলাই সিদ্ধ ও পান্তা ভাত। অনুষ্ঠানের বাকি কিছুই এ বাড়ীতেও রহিল না। সেই পঞ্চমীর রাত্রিতে একখানি হলুদ-ছোপানো নূতন গামছা শিল ঢাকিয়া রাখা হইল, তার কোলে ফলমূল ইত্যাদি। সেই গামছা সিঁদুরের ফোঁটায় বিচিত্রিত হইল। সন্ধ্যা রাত্রিতে এক তোলো ভাত রাঁধা হইল। প্রত্যেক পুত্রবতী নারীর জন্য ছয়টি করিয়া সাদা সিম, ছয়টি করিয়া বেগুন সাদা কলাইয়ের সঙ্গে সিদ্ধ করা হইল।···কাল ষষ্ঠীর পূজা ও ভোগ দেওয়া শেষ হইলে, যাহাদের কলাই সিদ্ধ নাই তাহারা একটি পাথরের খোরা হাতে করিয়া প্রসাদ লইতে আসিবে! এক তোলো সিদ্ধ ভাতের অল্পই অবশিষ্ট থাকিবে, কলাই সিদ্ধও থাকিবে অল্প। অল্প থাকিবে বলিয়াই বুঝি মনে হইবে, আর একটু কলাই বা আর একটি বেগুন পাইলে আরও চারিটি পান্তা ভাত তেলনুন মাখিয়া খাইতে পারা যায়। ভারি চমৎকার অনুষ্ঠান।

ফাল্গুন আসিল। বাগাঁচড়া গ্রামে বাগ্‌দেবীর মেলা বসিবে। পায়ে হাঁটিয়া ও গরুর গাড়ী করিয়া দলে দলে যাত্রী আসিবে এই সিদ্ধপীঠে মানত শোধ করিতে। অস্থায়ী চিনি-সন্দেশের দোকান বসিবে, কত খাবারওয়ালাও এই সুযোগে কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিবে। ফাল্গুন ও চৈত্র মাস ধরিয়া চলে এই মানত শোধের পালা। শুক্ল পক্ষেই যাত্রী আসে দলে দলে, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের আর বিরাম নাই। দেবী জাগ্রতা; জোড়া পাঁঠা দিয়া না হউক, অন্তত পাঁচ পয়সার চিনি সন্দেশও দেবীর নামে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া চাই। গামছায় চিঁড়া মুড়কি বাঁধিয়া, দেবীর পূজা দিয়া—সেই চিঁড়ার ফলার করিয়া ব্রতপালন শেষ করিবে ইহারা। যোগমায়াও মানত শোধ করিতে চলিল।

ওগো বাবাঠাকুর, আমার পূজোটা আগে সেরে দিন না। বাড়ীতে কুলুপ লাগিয়ে এসেছি—যেতে সেই সন্ধ্যে হ'য়ে যাবে।

কিন্তু বিধবাকে ঠেলিয়া গরদ শাড়ীপরা এক-গা গহনা গায়ে একজন স্থূলকায়া প্রৌঢ়া আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, আমার জোড়া পাঁঠার মানত, বাবাঠাকুর। একটু শীগ্‌গির করে উদ্যুগ ক'রে দেবেন। বাড়ী গিয়ে রাঁধব—তবে ছেলেপুলে-গুলো খাবে।

পুরোহিত হাসিয়া বলিলেন, তুমি তো দেখছি বাটনা বেটেই বেখে এসেছ, মা। এ পাঁঠা কি দেবীকে উৎসর্গ করা চলে?

বিধবাটি বলিলেন, তাই বটে!

সকলেরই ত্বরা। দেবী-দর্শনে আসিয়াছে বটে, পিছনের সংসার প্রবল ভাবেই টানিতেছে উহাদের।

যোগমায়াদের পূজা শেষ হইতে দুপুর উৎরাইয়া গেল। মজা নদীর ঢালু জমিটার উপর একটি গাছতলায় বসিয়া যোগমায়াদের গ্রামের জন দশেক প্রাচীনা ও তরুণী মিলিয়া চিঁড়ার ফলার খাইতেছে অর্থাৎ 'পালুনি' করিতেছে। এমন সময় হরিনামের মালা হাতে একজন বিধবা সেখানে উঁকি দিয়া গেলেন। 'পালুনি' শেষ হইলে ইহারা যখন হাত ধুইতেছে—তিনি তখন আবার ফিরিয়া তাহাদের প্রত্যেককে খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া দেখিতে লাগিলেন।

দলের মধ্য হইতে এক জন বর্ষীয়সী বলিলেন, কাকে খুঁজছ গা?

লবঙ্গলতার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মালাজপরতা বিধবা বলিলেন, তুমিই কি আমাদের হরিপুরের বেয়ান? যেন চিনি চিনি করছি—অথচ চিনতে পারছি নে। নজরের আর তেমন জুৎ নেই তো, মা। বলিয়া তাহাদের সন্নিকটে আসিয়া বসিলেন।

যোগমায়া ইঁহাকে চিনিতে পারিয়া মায়ের কানে কানে বলিল, ইনি হরি-ঠাকুরঝি—ভারি কুঁদুলে লোক।

লবঙ্গলতা হাসিয়া বলিলেন, তা বেয়ান ভাল?

আর ভাল! তোমাদের আশীর্ব্বাদে প্রাণ-

গতিকে বেঁচে আছি আর কি। বৌমা কই, বৌমা? ওমা, আমায় তুমি চিনতে পারছ না? লজ্জা দেখ! আহা, এমন সোনার প্রিতিমের এই দশা!

লবঙ্গলতা সে কথা চাপা দিবার জন্য বলিলেন, বেয়ান ভাল আছেন?

ভাল থাকবে না কেন—ভালই আছে। এই তো বাগ্‌দেবী তলায় গরুর গাড়ী করে এসেছে। এত করে বললাম, হরিপুরের মধ্যে দিয়েই তো যাচ্ছিস ভাই, গাড়োয়ানকে বল কলুপাড়া দিয়ে গাড়ীটা ঘুরিয়ে নিয়ে যাক। তা কে শোনে কার কথা! রাগ করো না বেয়ান, আপন গাঁয়ের নোক, বলতে নেই—তোমার বেয়ান ভারি দেমাকে।

দলের মধ্যে একজন বর্ষীয়সী বলিলেন, জীবনের তখন অসুখ—এখন যায় তখন যায়, সেই সময় পাল্কী পাঠালেন বউ নিতে। যার মানুষের চামড়া গায়ে আছে—সে কি পারে?

বাধা দিয়া লবঙ্গলতা বলিলেন, তাঁর দোষ কি রাঙাখুড়ি—আমারই অদৃষ্টের দোষ!

হরি-ঠাকুরঝি বলিলেন, ঠিকই তো—হক কথাই তো। অদেষ্ট তো বটেই। তবে তোমার বেয়ানটিও কম মিট্‌মিটে ডান নন। বলি কচি বউ—দুধের বালক, তার অপরাধটা কি? বিনি দোষে তাকে ত্যাগ করলে ভগমান্ তোকে রেয়াত দেবেন? তেমন অবিচের ওনার কাছে নেই।

কেহ কোন কথা কহিল না।

হরি-ঠাকুরঝি কপালে মালা ঠেকাইয়া কহিলেন, তার পর শোন, এখানে পুজো দিতে এসে আমায় আঙুল দিয়ে এই আমতলাটা দেখিয়ে দিয়ে বললে, হরিপুরের বেয়ানের জন্যে হাঁপাচ্ছিলে—ওই দেখ আমবাগানে বসে ওরা পালুনি করছে। বললাম, চল না, বেয়ানদের খবরটা নিয়ে আসি। বললে কিনা, দায় পড়েছে। যাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়ে গেছে—তাদের ছোঁয়া মাড়াব আমি! শোন একবার অংখারের কথা! ছিঃ!

খানিক মুখ বিকৃতি করিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিলেন, তবে শোন আসল কথা—বাগাঁচড়ার রায়েদের একটি ফুটফুটে মেয়ে আছে। এক দিন হাঁড়ি বেচতে গিয়ে কুমোর মিনসে বুঝি গপ্প করেছিল, তাই, বাগ্‌দেবীর পুজো দেবার ছুতো করে মেয়ে দেখতে এসেছেন। শুনছি ছেলের আবার বিয়ে দেবেন।

রাঙা-খুড়ি বলিলেন, এমন সোনার প্রিতিমে মেয়ে বিনি দোষে ত্যাগ করবে?

হরি বল মন। ওরা যে পিচেশ—পিশাচ! ওরা কি কচি মেয়ের দুঃখু বোঝে! ক'টা শাশুড়ীই বা পরের মেয়েকে আপন ক'রে নেয় ভাই! তাই ত বলছি, ভায়ের সংসারে আছি, যা করি কথাটি কইবার কেউ নেই—তবু কোন দিন পীড়ন করেছি বউকে! কেউ বলুক দিকি একবার! সমাগত মহিলাবৃন্দের পানে চাহিয়া তিনি দ্রুতকরে মালা ঘুরাইতে লাগিলেন।

হরিপুরের দলটি এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। কাহারও মুখ হইতে কোন কথা উচ্চারিত হইল না।

হরি-ঠাকুরঝি উঠিলেন। যাই ভাই, বেলাও পড়ে আসছে, এই বেলা না বেরুলে পৌঁছুতে রাত হয়ে যাবে। আমরা তো তোমার বেয়ানের মত গাড়ী ক'রে আসি নি, যা করেন এই পা-গাড়ী। হরি বল।

যোগমায়া মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। লবঙ্গলতাও মেয়েকে কোন রূপ সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলেন না। দোষীর বিচার যেন শেষ হইয়া গেল এই মুহূর্ত্তে, নির্ম্মম বিচারক রায় দিয়া বিচারাসন পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ঢালু জমির নীচেয় হাঁটুভোর জল এখনও জমিয়া আছে, সারা বছর ওটুকু জমিয়াই থাকে। জল আর কতটুকু! পদ্মদামে ও শেওলায় সেটুকু প্রায় ভরিয়া গিয়াছে। জলের অপর পার উঁচু হইয়া উঠিয়াছে; বহুদূর বিস্তৃত গঙ্গার চরভূমি—ফাল্গুনের ফসলহীন মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। বর্ষার বন্যার জলে এই মাঠ ডুবিয়া যায়, তখনকার পরিপূর্ণ শোভার আর অবধি থাকে না। এখন বাগ্‌দেবীর বিলের উপর দিয়া ক্ষুদ্র সেতুটি পার হইয়া যে পথ ও-পারের বহুদূর বিস্তৃত রুক্ষ মাঠের বুক ভেদ করিয়া টিয়াবালি গায়েশপুর অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে—তখন তাহার উপর দিয়াই নৌকা চলে। দু'টি মাস পরে জল শুকাইলে নরম কাদা শক্ত হইয়া যায় ও বহু পদচিহ্নিত পথটি কায়া লাভ করিয়া পথিককে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবার ইঙ্গিত জানায়। পথ মুছিয়া যায়—পথ গড়িয়া উঠে, মানুষের অদৃষ্ট একবার ভাঙ্গিলে আর কেন জোড়া লাগে না? সেই পথের পানে চাহিয়া যোগমায়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। ও-পথের বুকে রামচন্দ্রের পদচিহ্ন পড়িয়াছে কি? ওই প্রান্তরে রামচন্দ্র কি

কোন্ দিন আসিয়াছিল? রৌদ্ররেখায় দূর দিগন্তে অস্পষ্ট ধোঁয়ার জাল বোনা চলিতেছে। সেই জাল যোগমায়া'রও অন্তরে।

রাঙা খুড়ি সনিশ্বাসে বলিলেন, ওঠ লবঙ্গ। কেমন করে যে বেয়ান আবার ছেলের বিয়ে দেন, আমি একবার দেখব। কেন কি অপরাধ?

লবঙ্গলতা অপরাধিনীর মত ভীরুকণ্ঠে কহিলেন, ওঁরা ছেলের মা, সব পারেন।

রাঙা-খুড়ি বলিলেন, না, পারেন না। ওপরে ধর্ম্ম নেই, গাঁয়ে মানুষজন নেই? অতি ভালমানুষ হ'য়েই না তোর এই দুর্দ্দশা, লবঙ্গ!

আমবাগান পার হইয়া তাঁহারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। পথে আর কেহ কোন কথা কহিলেন না।

রামজীবন সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন। শিষ্য-বাড়ী বেড়াইয়া ইতিমধ্যে তিনি যে টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে নারিকেল-ফুল ছাড়ানো হইয়াছে; জশম ও গলার চিক উদ্ধার করিতে কম পক্ষে আরও ছ'টি মাস লাগিবে। শিষ্য সেবকদের অবস্থা তেমন সচ্ছল নয়। সকলেই চাষবাস করিয়া খায়। তাছাড়া গুরুগিরিকে ব্যবসায় হিসাবে রামজীবন কোন দিন দেখিতে পারেন নাই। পরকালের ভয় দেখাইয়া প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া বা পূজা-পার্ব্বণে ফর্দ্দের কাগজ বাড়াইয়া লাভের অঙ্কটিকে তিনি কোন দিনই উর্দ্ধে তুলিতে পারেন নাই।

সংবাদ শুনিয়া রামজীবনও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। দাবার চাল মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার মস্তিষ্ক পরিত্যাগ করিল। লবঙ্গলতাকে ডাকিয়া কহিলেন, কবে বিয়ের দিন ঠিক হ'য়েছে?

লবঙ্গলতা বলিলেন, দিন ঠিক হয় নি, মেয়ে দেখা চলছে।

কোথায়?

বাগাঁচড়ায় রায়েদের বাড়ী নাকি মেয়ে দেখতে গেলেন, বেয়ান। সত্যি মিথ্যে জানি নে, খোঁজ নাও না একবার।

—হাঁ—তাই নিই, আর মায়াকেও তুমি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠিক করে রেখ, যদি কোন উপায় না দেখতে পাই—ওকে রেখে আসব ওখানে। তিনিও তো মেয়ের মা, ওর শুকনো'মুখের পানে চেয়ে কখনোই ও-কাজ করতে পারবেন না।

গ্রামে কথাটা রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। দলে দলে প্রতিবেশিনীরা সহানুভূতি দেখাইতে রামজীবনের বাড়ীতে ভিড় করিতে লাগিলেন। যোগমায়া ঘরের পিছনে আমবাগানের মধ্যে গিয়া বসিয়া রহিল। কয় দিন হইতে সে ভাল করিয়া খায় নাই, কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়াছে। শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ ফুরাইলে মেয়েমানুষের যে বাঁচিয়া থাকাই বিড়ম্বনা—সে জ্ঞান সে লাভ করিয়াছে।

খুড়িমা প্রত্যহ প্রাতে গোবর জল ছড়া দিবার সময় ও সন্ধ্যায় প্রদীপ দেখাইবার কালে এ দিকের দুয়ার খুলিয়া লেবু গাছটিকেই উদ্দেশ করিয়া বলেন, কেমন, সতী কন্যের বাক্যি ফললো কি না? বলে, অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে ভেঙ্গে যাবে। যার খায় তারই বুকে বসে দাড়ি ওপড়ায়—ওদের স্বভাবই ওই। হে হরি, তুমিই দেখো, আমার মনে কষ্ট দিয়েছে যে সে যেন সোয়ামীর অন্ন না খেতে পায়—না খেতে পায়—না খেতে পায়।

মট্ মট্ করিয়া আঙুল মটকাইবার শব্দ স্পষ্টই শোনা যায়। লবঙ্গলতা শিহরিয়া উঠেন। নীরবে আপন মনে শুধু বলেন, ঠাকুর, তুমি তো অন্তর্যামী—তুমিই এর বিচার ক'রো।

রাত্রিতে লবঙ্গলতা বলিলেন, শোন্ মায়া, লজ্জা করিস নে। উনি বলছিলেন কি—আসছে হপ্তায় সব খোঁজ-খবর নিয়ে তোকে রেখে আসবেন শ্বশুর-বাড়ীতে। কেমন, রেখে আসুন?

যোগমায়া কোন্ দিকে ঘাড় নাড়িল জানে না, ম খুশী হইলেন। কহিলেন, শাশুড়ী দেবতুল্যি, যাই বলুন—যত বাক্য-যন্ত্রণাই দিন, তোমায় মা সইতে হবে।

যোগমায়ার সারা অন্তর সেই সহনশীলতার অনুকূলে সায় দিল। দু'টা মুখের কথা শুনিলে যদি চিরজীবনের সর্ব্বনাশকে ঠেকানো যায়—কেন সহ্য করিবে না যোগমায়া? একালের তেজী মেয়ে হইলে কি হইত বলা যায় না, কতই বা বয়স যোগমায়ার! সংসারের উত্তাপে ও রঙে তার সারা দেহ-মন অপরূপ হইয়া উঠিতেছে, মধুর একটি আস্বাদে চিত্তশতদল বিকচোন্মুখ। এখন তেজ বা অভিমানের কথা উঠিতেই পারে না। রামচন্দ্রকে যোগমায়া হারাইতে পারে? রামচন্দ্রের অনেক-গুলি পুষ্পসার-সুরভিত পত্র তার বাক্সে বন্ধ আছে, অনেক স্মৃতি তার বুকে জমা আছে, অনেক আশা তার তরুণ দু'টি চোখে সন্ধ্যার প্রদীপশিখার মত সবে জ্বলিয়া উঠিয়াছে!

পৌরাণিক যুগে অভিমান করিয়াছিলেন সতী।

বিনা নিমন্ত্রণে পিত্রালয়ে গিয়া যে অন্যায় করিয়াছিলেন—প্রায়শ্চিত্তও ঘটিয়াছিল জীবন বিসর্জ্জন দিয়া। সতী উমা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন, তপস্যা দ্বারা জন্মান্তরে সেই শিবকেই পতিরূপে লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। কিন্তু দেবতার কথা স্বতন্ত্র। যে যাহার পতি-পত্নী তাহারা হয়ত জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া পরস্পরের অনুসরণ করিয়া থাকে। কিন্তু জন্ম-জন্মান্তর কথা কানে শুনিয়াও এই বয়সে অনুভব করিবার শক্তি যোগমায়ার জন্মে নাই। এই জীবনের পর যে জীবন—অনন্ত, মৃত্যুহীন, জরাহীন, আনন্দময়—এ জীবনের সুখ-সমৃদ্ধির দিনে সেই সুখ-সমৃদ্ধ উত্তর জীবনকে ধ্যান করিতে ভালই লাগে হয়ত। কিন্তু এ জীবনে যার নৈরাশ্যের সন্ধ্যা পিছনে বিরাট মসীময়ী রাত্রিকে লইয়া অবতীর্ণ হইতেছে অতি দ্রুত, পরজীবনের স্বর্ণবর্ণ দিনের কথা ভাবিবে সে কোন্ ফাঁক দিয়া? আঘাতের পর হয়ত বেদনার তীব্রতা অনেকখানি হ্রাস পায়, তখন হয়ত এ দিকের আলো নিবিলে ওদিকের আলো জ্বলিবার আশায় প্রাণের তন্ত্রীগুলি সুরময় হইয়া উঠে। কিন্তু এ দিকের আলো যার নিবু-নিবু, ওদিকের আলো-জ্বলায় তেমন বিশ্বাস নাই—তাহাকে এই দিকেরই নিবন্ত প্রদীপে যেমন করিয়া হউক তৈল নিষেক না করিলে যে নয়।

বাপের ঘর আজ বড় নহে! স্বামীর ঘরের অগৌরবে এ বাড়ীর সমস্তই বিবর্ণ হইয়া উঠিতেছে। মায়ের কোল নহে—আমবাগানের নির্জ্জন কোণে লোকসম্পর্কবর্জ্জিত হইয়া তবে সে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিয়াছে।

যেমন করিয়া হউক, স্বামীর ঘরে তাহাকে ফিরিতেই হইবে। সেই তীর্থে—নারীর চিরজীবনের গৃহে। হে ভগবান্, বাবার সুমতি দাও, মায়ের মনকে কোমল কর।

২

সমস্ত ঘটনাই স্বপ্নের মত বোধ হয়। ভয়ে, লজ্জায়, আত্ম-অনুশোচনায় নরম কাদার তালটির মত যোগমায়া ঘরের মধ্যে বসিয়া রহিল। শাশুড়ী ক্রোধ করিয়া অনেক কথা শুনাইলেন। অবিশ্রান্ত অনর্গল সে প্রবাহে দগ্ধ হইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে রামজীবন ফিরিয়া গেলেন।

শাশুড়ী যেন একবার রাগ করিয়া ঝাঁজালো স্বরে বলিয়াছিলেন, মেয়েকে ছোট্টটি থেকে মানুষ করেছেন—আর চারটি ভাত দিতে পারবেন না, বেয়াই।

রামজীবন উত্তর দিয়াছিলেন, ভাত দিতে পারি বেয়ান, কিন্তু সে ভাত ওর গৌরবের নয়। আপনার পায়ের তলায় ওকে ফেলে দিলাম, পায়ে রাখুন বা ঠেলুন, যা আপনার ইচ্ছা। কনকাঞ্জলির সময় মা যে আমার সব দেনা শোধ করে এসেছে বেয়ান, আর মাকে ঋণী করবো না।

পিতা চলিয়া গেলে শাশুড়ী বলিলেন, মেয়েমানুষের দপ্প ভাল নয়। বলে, 'বেঁচে থাক্ আমার চুড়ো বাঁশী—হাজার হাজার মিলবে দাসী।' এই ফাল্গুনেই রামের বিয়ে দিয়ে বউ ঘরে তুলব না, দেখি তোর তেজ থাকে কোথায়!

বহুক্ষণ বকিয়া তিনি শ্রান্ত বা শান্ত হইলেন। পিতলের ঘড়াটা কাঁকে করিয়া পিসিমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, বউ রইলেন, অভিমানী রাজকন্যে—দেখো ঠাকুরঝি! এসেছেন আমার মাথা রক্ষে করেছেন—আবার পিণ্ডি গেলার উদ্যোগ করতে হবে তো।

পিসিমা আসিয়া যোগমায়ার মাথায় হাত বুলাইতেই সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না, পিসিমা।

পিসিমার চোখের দৃষ্টিও জলধারায় ঝাপ্সা হইয়া উঠিল। শীর্ণ হাত দিয়া যোগমায়ার মাথাটি বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া ভাঙা গলায় বলিলেন, তুমি আমার মা-লক্ষ্মী। আমার দুর্গা বেঁচে থাকলে ঠিক এমনটিই হতো—মা।

পিসিমা সম্পর্কে শাশুড়ী, কিন্তু হৃদয়ের সম্পর্কে মা। হয়ত তাঁহার বহুদিনের হারানো মেয়ে দুর্গাকে তিনি যোগমায়ার মধ্যে দেখিয়াছেন—তাই রুদ্ধ উৎসমুখ হইতে শোকের পাথরখানি সরিয়া স্নেহের ধারা উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে।

মনে একটুও সোয়াস্তি ছিল না, মা। কেবল ভাবতাম, বউমার আমার বুদ্ধিশুদ্ধি ভাল—তবে কেন করলে এমন কাজ। দিনরাত ডাকতাম, হে হরি—ওর সুমতি দাও। হরিঠাকুর আমার কথা শুনেছেন, মা। আঁচলে চোখ মুছিয়া তিনি উঠিলেন এবং বলিলেন, হাতমুখ ধোও, পায়ে জল দেও। আহা, বাছার মুখখানি শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেছে। একটা নারকোল নাড়ু এনে দিচ্ছি—একটু জল খেয়ে ঠাণ্ডা হও।

হাতমুখ ধুইয়া যোগমায়ার শ্রান্তি দূর হইল।

উদ্বেগ অনেকখানি কমিয়া যাওয়াতে সে সুস্থবোধ করিল। পিসিমার স্নেহের মধ্য দিয়া আবার যেন সে পূর্ব্ব অধিকার ফিরিয়া পাইয়াছে। শ্বশুরবাড়ীতে আবার সে সম্রাজ্ঞী হইয়া বসিবে। আঃ, এই সঙ্কীর্ণ ভাঙ্গা রোয়াক, উইদষ্ট জীর্ণপ্রায় কড়ি বরগায় ছাদের পাতলা ইটগুলিকে আর ঠেকাইয়া রাখা যাইতেছে না—অবাধ্য ছেলের মত কতকগুলি ইট বরগার ফাঁকে নীচের দিকে ঝুঁকিয়াছে, ঘরের দেওয়ালে চুণ-বালির পলস্তারা নাই, কীটদষ্ট ছবিগুলি তেমনই মাকড়সার ঝুলে ভরিয়া আছে—তবু সুন্দর এ গৃহ। এখানে চোখ বুঁজিলে এখনি বুঝি ঘুম আসিবে, এখানে চোখ মেলিলে সাতরাজার ধন মাণিক না মিলুক—মর্য্যাদাভরা আকাশের টুকরা চোখের সামনে হাসিয়া উঠিবে। এখানে চলিবার কালে সঙ্কোচব্রীড়ার সঙ্গে সম্ভ্রম-মর্য্যাদা নূপুরের তালে তালে বাজিবে, এখানে কথা কহিবার সময় বুক ভরিয়া স্বস্তির বাণীই বাহির হইবে। এখানে লজ্জা করিয়া অল্প খাইয়াও তৃপ্তি, এখানে দুপুরে কোন পরিচিতার সঙ্গে গল্প করিতে না-করিতে দুপুর ফুরাইয়া যায়। নাই বা আসিল রামচন্দ্র? যোগমায়ার মনের প্রান্ত হইতে যে রজ্জু প্রসারিত হইয়া এই সংসারের মায়াজালের ফাঁস বুনিতে বুনিতে সেই অজানা দেশটিতে চলিয়া গিয়াছে—সেই মায়াজালের আর একটি প্রান্ত রামচন্দ্রের মন হইতে উঠিয়া কি এই সংসারের কেন্দ্রাভিমুখে যোগমায়ার হৃদয়োত্থিত মায়াজালের বুনুনির সঙ্গে এক হইয়া যায় নাই? রামচন্দ্রের পরিশ্রম আর যোগমায়ার সংগ্রহ, রামচন্দ্রের আয়োজন ও যোগমায়ার রচনা—এই লইয়াই তো সংসারের নৈবেদ্য সাজানো হইতেছে! জীবনদেবতা মনের মন্দিরে আসিয়া পূজা লইবেন যে শুভ মুহূর্ত্তে—সেই শুভক্ষণের প্রতিটি পল গণিয়া—এই উপচার থরে থরে জমিয়া উঠিতেছে। এমন মধুর রচনা! আবেগে যোগমায়ার নিমীলিত নয়নের কোল দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

অ-বউমা—বউমা, ঘুমুলে নাকি? পিসিমার ডাকে ঘুম ভাঙ্গিয়া যোগমায়া উঠিয়া বসিল। অনেকক্ষণ হইল সে ঘুমাইয়াছে। না জানি শাশুড়ী কত রাগ করিবেন।

ফাল্গুনের রোদ চড়া হইয়াছে—শীতের মত সুখস্পর্শ আর নাই।

এসো, দুই মায়ে ঝিয়ে খেয়ে নিই গে। তোমার শাশুড়ী আজ খাবেন না, মঙ্গলবার কিনা, সিদ্ধেশ্বরী তলায় 'পালুনি' করবেন।

চমৎকার সজনে ফুলের চচ্চড়ি হয়েছে পিসিমা।

আর একটু দেব, মা? দিই। গাছের ফুল—পড়ে উঠোন আলো করেছে; ভাবলাম, কুড়িয়ে বাটি-চচ্চড়ি করি। কতকাল যে রাঁধিনি মা, নুণ তেলের আন্দাজ পাই নে।

আরও চারিটি ভাত যোগমায়া লইল—আরও একটুখানি তরকারি। শ্বশুরবাড়ীর সঙ্কোচ কাটাইয়া সে যেন পিত্রালয়ের হৃদ্যতার মধ্যে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

আহারান্তে পিসিমা চরকা লইয়া বসিলেন, যোগমায়া পাশে গিয়া বসিল।

জান মা, বউ তো ঝোঁক ধরলেন, এই ফাল্গুনেই ছেলের বিয়ে দেবেন। কত জায়গা থেকে যে সম্বন্ধ এলো! গণ মেলে তো পণ মেলে না, পণ মেলে তো মেয়ে হতকুচ্ছিত। শেষে বাগাঁচড়ায় রায়েদের বাড়ী প্রতিমা বলে মেয়েটিকে তোমার শাশুড়ী পছন্দ করলেন। মিথ্যে বলব না, মেয়ে সুন্দরী, কুষ্টি মিললো—দেনা-পাওনাও মিললো।

তাহলে সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল?

না মা, তোমার শাশুড়ী আশীর্ব্বাদের দিন স্থির ক'রে রামকে পত্তর লিখলেন।

যোগমায়ার প্রাণ কণ্ঠাগ্রে আসিয়া ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। কি বলিল—রামচন্দ্র?

পিসিমা বলিতে লাগিলেন, রাম কি আমার সেই ছেলে! লিখলে, মা, অন্যায় অনুরোধ আমায় করো না। বিনি দোষে স্ত্রী ত্যাগ ক'রে কেউ কখনও সুখী হয় নি—অমন যে রাজা রামচন্দ্র তিনিও নয়। ওদের দিক থেকে সম্মতি পেলে বিয়ে আমি করব—তা নইলে নয়। আমার সোনা ছেলে!

যোগমায়া মাথা নীচু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। দুঃখে নহে—অসহ্য আনন্দে।

পিসিমা বলিলেন, কি উত্তর দেবেন বউ ভাবছিলেন, এমন সময় তোমরা এলে। খুব সময়ে এসে পড়েছ মা।

শাশুড়ী শয়ন করিলে যোগমায়া ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার পা টিপিতে লাগিল। শাশুড়ী পা গুটাইতে গেলে সে জোর করিয়া সেই পা চাপিয়া ধরিল। চোখের জলে পা তাঁহার ভিজিয়া গেল। একটা চীৎকার কণ্ঠ ঠেলিয়া বাহির হইতেছিল, কণ্ঠের মধ্যে সেই চীৎকারকে পুরিয়া দিয়া তিনি

বলিলেন, রাত হয়েছে, যাও শোও গে। এখন আবার পা টেপাটিপি কেন?

অস্ফুট স্বরে যোগমায়া বলিল, আমার উপর রাগ করবেন না, মা।

শাশুড়ী পা গুটাইয়া বলিলেন, না, রাগ করি নি। সর, আমরা গরিব মানুষ—সাত দিকে সাতটা দাসী বাঁদী তো নেই—পা টেপাইও নি কখনো।

অভিমানে তখনও তাঁহার কণ্ঠস্বর উত্তপ্ত। যোগমায়া সেই অভিমানকে ভাঙ্গিবার জন্য আর জিদ্ করিতে সাহস করিল না। সত্য বলিতে কি, এই বাষ্পরুদ্ধ অভিমানাহত কণ্ঠস্বর তাহার ভালই লাগিতেছিল।

সে রাত্রি জাগিয়াই যোগমায়ার কাটিয়া গেল।

নূতন প্রভাত—এ বাড়ীতে নূতন জীবন আনিয়া দিল।

ভোর রাত্রিতে উঠিয়া শাশুড়ী পোঁটলা বাঁধিতেছিলেন। ছোট ছোট ন্যাকড়ায় কোনটায় সেরটাক মুগের ডাল, কোনটায় এক কাঠা (আড়াই সের) মুড়ির চাল, কোনটায় বা পাতি লেবু, কুল শুকনা ইত্যাদি। সকাল হইলে ও-বাড়ীর ছাইগাদা হইতে একটা বড় মানকচু তুলিলেন, লাউয়ের ডাঁটাও গাছকতক বাঁধিয়া পিসিমাকে বলিলেন, কুঞ্জ ঘোষ এলেই আমি জিরেট যাব। কমলির গহনা ক'খানা বেয়াই কাল দিয়ে গেছেন, যার ধন তারে বুঝিয়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্দি হই। যে দিনকাল—চোর ছ্যাঁচড়ের অভাব তো নেই।

পিসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, কবে ফিরবে?

কাল একাদশী, পরশু দোয়াদশীর দিন কি আর আস্‌তে দেবে? তরশুই ফিরব মনে করছি। আর দেখ, বাজারপত্তর সব করে রেখেই গেলাম। আলু ঘরে রইলো, দু'সের বেগুন, মটর শুটি, সিম, ও-বাড়ীতে পালং শাক আছে তুলো, হ'ল বা এক দিন সজনে ফুলের চচ্চড়ি করলে—।

সে আমরা চালিয়ে নেব'খন, তুমি দুগ্‌গা বলে বেরিয়ে পড়।

হাঁ—যাই। কালনা থেকে ইষ্টিমার ছাড়বে—দশটার কম কি আর শান্তিপুরে আসবে?

পিসিমা বলিলেন, শান্তিপুরের ইষ্টিমারের ঘাট কি এখানে? সেই বয়ড়া যেতে হবে তো।

না, আজকাল নাকি ঘোড়ালের ঘাটে লাগছে। কুঞ্জর আর হয় না, নড়তে-চড়তেই ওর বছর কেটে যায়।

এমন সময়ে কুঞ্জ ঘোষ আসিয়া ডাকিল, কৈ গো—মা-ঠাকরোণ, হ'লো?

কখন হা-পিত্যেশ করে বসে আছি। দেখ দেখি কুঞ্জ, মানকচুটা নেব, না রেখে যাব?

না, মা-ঠাকরোণ, তেনাদের নাম করে তুলেছ, রেখে যাবে কি দুঃখে! খাসা মানকচু, পুবে বুঝি?

হাঁ, ওই ময়রারা চাঁদপুর থেকে এনেছিল সেবার। পারবি তো নিয়ে যেতে?

খুব খুব। দেখতে আমি ডিগ্‌ডিগে বটে, আপনাদের আশীর্বেদে তিরিশ সের জিনিষ নিয়ে দু'বার ইষ্টিমারের ঘাট যেতে আসতে পারি। এস মা-ঠাকরোণ, দুগ্‌গা—দুগ্‌গা—

দুগ্‌গা—দুগ্‌গা—সিদ্ধিদাতা গণেশ। ঠাকুরঝি, সংসার রইলো, দেখো ক্ষেতি-অপচো না হয়। তেল বুঝে-সুজে খরচ করো, চাল এক কুনকে বরং কম কম নিয়ো—ভাত না ফেলা যায়। আর—

পিসিমা পিছনে পিছনে গেলেন। সদর দরজায় বাহির হইয়াও শাশুড়ী সংসার সম্বন্ধে তাঁহাকে বার বার সতর্ক করিয়া দিলেন।

পিসিমা ফিরিয়া আসিলে যোগমায়া বলিল, পিসিমা, আজ আমি রাঁধব।

তুমি! পারবে তো?

কেন পারব না, বাবার অসুখ হ'লে আমি তো কত দিন রেঁধেছি ওখানে। শাকের ঘণ্ট, সুক্তো, ডালনা, চচ্চড়ি, ঝোল—সব রাঁধতে পারি।

বাঃ রে—আমার রাঁধুনির মেয়ে! মা পাকা রাঁধিয়ে কি না। তা চল, কুটনো কুটে দিই গে। কি রাঁধবে আজ?

সজনে ফুলের চচ্চড়ি—আপনি দেখিয়ে দেবেন কিন্তু।

আচ্ছা। দু'রকম ভাত রাঁধা—অত কি পেরে উঠবে, মা?

তা কেন, আমিও না হয় আলোচালের ভাত খাব আজ।

না মা, আলোচালের ভাত রাঁধা শক্ত। এক দিন না দেখিয়ে দিলে তুমি পারবে না।

সহসা কি মনে পড়িয়া যাওয়াতে যোগমায়া কুণ্ঠিত স্বরে কহিল, না না, আপনিই রাঁধুন।

পিসিমা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, কেন, তরকারি না হয় তুমি রেঁধো।

না আপনিই রাঁধুন।

কেন বল দেখি, মা? রাগ হ'লো?

হাসিয়া যোগমায়া বলিল, বাঃ রে, রাগ হবে

কেন? আমি রাঁধলে আপনি তো খেতে পারবেন না।

কে বললে তোমায়?

আমি বুঝি জানি নে। মা বলেন, মন্তর না নিলে হাতের জল শুদ্ধ হয় না। হাতের জল শুদ্ধ না হ'লে—আপনি কি ক'রে আমার হাতে খাবেন?

এই কথা! পিসিমা হাসিয়া বলিলেন, তা ঠিকই বলেছ, বউমা। পাড়া-পড়শীর হাতের জল শুদ্ধ না হ'লে—আচার-বিচেরওয়ালা না হ'লে—যার তার হাত খেতে নেই। কিন্তু আজ যদি আমার অসুখ হয়, ঘরে যদি মেয়ে থাকে, সে যদি ইষ্টমন্তর না নেয় তো তার হাতেও না খেয়ে শুকিয়ে মরব নাকি?

মেয়ের হাতে খেতে তো দোষ নেই।

বউয়ের হাতেও না। মেয়ে আর বউ কি আলাদা? তোমার শাশুড়ী বেশী বাচ-বিচার করেন—উনি না খেতে পারেন, আমি অতটা পালতে পারি নে, মা।

অত্যন্ত খুশী হইয়া ঘাড় নাড়িয়া যোগমায়া বলিল, তা হ'লে চলুন—আপনি কুটনোটা কুটে দিন—আমি দু-ঘড়া জল তুলে নেয়ে নিই।

স্বল্পভাষিণী পিসিমা আজ সারাক্ষণই গল্প করিতেছেন। কোথায় একখানা মেঘ প্রতিদিন এ-বাড়ীর মাথায় চাপিয়া থাকে, মেঘের অন্ধকারে এ-বাড়ীর লোকগুলিও ভাল করিয়া নিশ্বাস লইতে পারে না। আজ মেঘ সরিয়া গিয়া এখানকার বায়ুস্তর ফাল্গুনী-হাওয়ার মতই গা-জুড়ানো ও পাতলা হইয়া উঠিতেছে। সে দাক্ষিণ্যে মানুষ যে মন মেলিবে—সে আর এমন বিচিত্র কি!

দুপুরে পিসিমা নিত্য প্রথামত চরকা কাটিতে বসিলেন। যোগমায়া ঘর-দুয়ার গুছাইতে লাগিল। সত্যই—মাকড়সারা সংখ্যায় বাড়িয়া নিজেদের কারুকার্য্যে মানুষের কারুকার্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে, কুলুঙ্গির মাথায়, বাক্সে, সিন্দুকে, আলনার কাঁথা কম্বলে, কাপড়ে ধুলাই কি কম জমিয়াছে? ঘরের মেঝেয় খোয়া উঠিতেছে, আড়া হইতে উইয়ের ও সুরকির ধুলাই যে কত এদিক-ওদিকে ভাঙিয়া পড়িয়াছে!

বাঁশের আগালিতে মুড়া ঝাঁটা বাঁধিয়া যোগমায়া প্রথমে ঝুল পরিষ্কার করিল; তার পর কাপড়, কাঁথা, বালিশ, বিছানা ঝাড়িয়া সিন্দুকের উপর ও আলনায় পরিপাটি করিয়া গুছাইয়া রাখিল। তার পর কুলুঙ্গির সংস্কারসাধনে যত্নবতী হইল।

যত রাজ্যের শিশি, বোতল, সিঁদুর-চুপড়ি, আলতা, কাঠের পুতুল, ভাঙা লোহা, জাঁতি, ঔষধ মাড়িবার খল, হামানদিস্তা, ছেঁড়া কাগজ ও রঙীন ন্যাকড়া কুলুঙ্গি হইতে বাহির হইল। ঝাড়িয়া মুছিয়া গুছাইয়া রাখিতে দুপুর প্রায় শেষ হইয়া গেল। কাগজের গোছার মধ্যে একখানা আস্ত খাম পাওয়া গেল। যোগমায়ার মন নাচিয়া উঠিল। রামচন্দ্রের চিঠি নাকি? নাকের কাছে সে চিঠিখানা ধরিল। না, কোন গন্ধ নাই। খামখানা তেমন রঙীনও নহে, সাদাই। কিন্তু এক রামচন্দ্র ছাড়া আর কেহ খামে করিয়া তাহাকে চিঠি দিয়াছে, সে কথা তো কই মনে পড়ে না।

এই তো চিঠির উপর তাহারই নাম লেখা: শ্রীমতী যোগমায়া দেবী। ঠিকানাটা ইংরেজীতে লেখা। সম্ভবত এই বাড়ীর ঠিকানা।

সমস্ত গুছাইয়া সে চিঠিখানি খুলিল, এবং খুলিয়াই আনন্দে প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল। সই? রাধারাণী তাহাকে চিঠি লিখিয়াছে? বুক তাহার দুরু দুরু করিয়া উঠিল। বার তিনেক সম্বোধনটা পড়ে—আর মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসে। সই যেন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সম্বোধন-পাঠ শেষ করিয়া যতই সে অগ্রসর হইল—ততই মুখের হাসি মিলাইয়া আসিতে লাগিল।

রাধারাণী লিখিয়াছে:

ভাই সই, অনেক দিন তোমাদের কোন খবর পাই নি, কেমন আছিস? উনি কয়বারই এখানে এলেন—জিজ্ঞাসা করিলেও কিছু বলিতে পারেন না। পারিবেনই বা কোথা হইতে। যে আপনভোলা মানুষ! তা ছাড়া তোকে খবরও দিই নি ইচ্ছা করিয়া। কোন্ মুখে—আর কি খবরই বা দিব? যে আসিয়াছিল—হতভাগীর কোল পূর্ণ করিতে—সে অভিমানভরে চলিয়া গিয়াছে। রাক্ষসী আমি তাহাকে রাখিতে পারি নাই। তোর কথাই সত্যি হইয়াছিল। কিন্তু সই, সে যদি আসিল তো চলিয়া গেল কেন? রাজপুত্রের মত ছেলে হাসিলে আমার বুকের মাঝে মুক্তো ঝরিত, কাঁদিলে সেখানটা তোলপাড় করিয়া উঠিত। যেমন টক্‌টকে রং, তেমনই টানা টানা চোখ, তেমনই নাদুস-নুদুস। হয়ত আমি আবাগীর চোখ লাগিয়াছিল। তাই সে স্বর্গের ধন স্বর্গে চলিয়া গেল। 'নত্তা'র আগের দিন হইতে সেই যে কান্না সুরু করিল—সে কান্না আর থামে নাই। কত মাদুলি, তুক্‌তাক্, জলপড়া, মন্তর, কিছুতেই কিছু

হইল না, সই। ছেলে মাই টানিল না। দুধ জমিয়া মাই টন্ টন্ করিয়া ওঠে, দুধ গালিয়া ফেলিয়া দিই, কিন্তু সোনার খোকা আমার রাক্ষসী মার বুকের এক ফোঁটা দুধ খাইল না। কেন খায় নাই, সই? উঃ, আর যে পারি না ভাই। অনেক আশার প্রথম ফল—কাব চোখের দৃষ্টি লাগিয়া যে নষ্ট হইয়া গেল! বুক আমার সদাই হু-হু করে। মা বলেন, লোকের নজর লাগিয়া এমন হইয়াছে। কত লোক তো আঁতুড়ে খোকাকে দেখিয়া গিয়াছে, সবাই তো ছেলেব মা, সবাই তো জানা-শোনা। তবে তারা কেন চোখ দিতে আসিবে? ডাইনে খাইলে নাকি ছেলে বাঁচে না। কেমন করিয়া বলিব, এত আত্মীয় প্রতিবেশীর মধ্যে কার মনে কি ছিল? যার মনে যাই থাক ভাই, আমার বুক যে দিনবাত হু-হু করিয়া জ্বলিয়া যায়। ন'টি দিন তো ছিল—কিন্তু ন' বছরের মায়া আমাব বক্ষ হইতে সে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। এমন শত্রু!. এঁরা সবাই বলেন, শত্রু। নহিলে এমন দাগা সে দিবে কেন? কিন্তু মন আমার বলে, না, না, শত্রু সে নয়। আমি ধরিয়া রাখিতে পারি নাই—আমারই তো দোষ। যেখানে বেশী যত্ন—বেশী আদর পায়, ওরা স্বর্গের জিনিষ, তাদের কাছেই তো যাইবে। সই রে, এ ব্যথা বোঝাবার নয়। এঁরা বলেন, আমার শরীর নাকি ভাঙিয়া গিযাছে। কই ভাই, খোকা যেখানে গিযাছে—আমাকে কেন সেখানে লইয়া যায না। এত দিন গেল—এক দিনও তো স্বপ্নে তাহাকে দেখিলাম না। এখন যদি মরণ আসে, বাঁচিয়া যাই। কিন্তু মরিতে সাহস হয় না—তোর সয়ার জন্য। অমন আমুদে মানুষ—কি হইয়া গিয়াছেন। সে দেহ নাই—সে হাসি নাই। বলেন, খোকার জন্য আমি দুঃখ করি না, তুমি যে শরীর মাটি করিতে বসিয়াছ? তুমি না সারিয়া উঠিলে—আমার মুখে হাসি ফুটিবে না। শুনিলে তো কথা! ছেলে পেটে পুরিয়া আমি যদি সারিয়া না উঠি তো কে সারিয়া উঠিবে! ভাল আমি হইবই। উনি বলেন, তুমি মরিলে—আমার গৃহও শ্মশান হইবে। আমি সন্ন্যাসী হইব। তা পারে ভাই। বিয়ের পর কখনও ছাড়াছাড়ি হই নি। তুই তো জানিস, আমাদের ভালবাসার কথা। দু'টি দেহে—একটিই প্রাণ। ওর মুখে হাসি না দেখিলে—আমি ভাবিয়া মরি। কিন্তু খোকার জন্য প্রাণ এমন হু-হু করে যে, ওর মুখও কোথায় ভাসিয়া যায়। কেন এমন হয়, সই? তবে কি ওর চেয়ে আমার খোকাই বড় হইল? কে জানে। অনেক কথা লিখিলাম, আর তোর মন খারাপ কবিযা দিব না। তোকে বড দেখিতে ইচ্ছা করে এক বার। কবে যে ওখানে যাইব! ভগবানই জানেন। ভালবাসা নিস্। পত্র লিখিতে অসুবিধা না হইলে পত্র দিস। ইতি

অভাগিনী সই

পত্রখানি যোগমায়া বার তিনেক পড়িল, তার পর পড়িতে পারিল না। মনে হইল, চোখের জলে ঝাপ্‌সা হইয়া সব লেখা একাকার হইয়া গিয়াছে।

ও-ঘর হইতে পিসিমা ডাকিয়া বলিলেন, সলতে পাকানো আছে তো, বউমা? পিদীমটা জ্বেলে, শাঁক বাজিয়ে দুয়োরে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দাও।

তাড়াতাড়ি যোগমায়া উঠিয়া পড়িল। সন্ধ্যাই হইযাছে হয়ত, চোখের জলে ঝাপ্‌সা হয় নাই লেখাগুলি।

সন্ধ্যা দেখাইয়া সে পিসিমার কাছে গিয়া বসিল।

আচ্ছা পিসিমা, আঁতুড়ে ছেলেপিলে হয়ে মরে যায় কেন?

অনাচার, লোকের দৃষ্টি, পেঁচোয় পাওয়া—এই সব।

কিসে অনাচার হয়?

কিসে যে কি হয় তা কেমন ক'রে বলব, মা। হয়ত এডা কাপড়ে মাই দিলে, বাইরে এসে ভর সন্ধ্যেবেলায় মাথার চুল এলো করলে, ছেলেকে এক কোণে ফেলে রাখলে—এই সব আর কি।

পেঁচোয় পাওয়া কি?

ওপর দৃষ্টি পড়লে পেঁচোয় পায়।

ভূত বুঝি?

পিসিমা শিহরিয়া ত্রাস্তস্বরে বলিলেন, ও কথা বলতে নেই মা। ওঁরা দেবতা, সব পারেন। আর ভর সন্ধ্যেবেলায় ওসব কথা বলতে নেই। তুমি বরঞ্চ রামায়ণখানা এনে পড়, একটু শুনি।

আপনি তো আজ ও ঘরে শোবেন?

তা শোব বৈকি। ও ঘরে সিন্দুক আছে—আগলাতে হবে।

রাত্তিরে আপনি কি খাবেন?

কি আবার! একটু বাতাসা মুখে দিয়ে এক ঢোঁক জল।

না পিসিমা, আজ দশমীর দিন—একটু ছানা আনালেও তো পারেন।

তুমিও যেমন মা, বারোমেসে দশমীব আবার ছানা সন্দেশ! গুড়ই ভাল।

না, ছানা আনান।

দূর পাগল মেয়ে, বিকেলে ছানা বেচতে আসে, এখন কোথায় পাব?

তবে দু'খানা তেলের লুচি ভেজে দিই।

পাগল মেয়ে—আচমনী আমি খাই রাত্তিরে। কলা থাকে তো একটা দিস বরঞ্চ।

ঠিক হয়েছে, শাঁকালু আছে, রাঙালুও আছে —গুড় দিয়ে খেতে বেশ লাগবে। আর দুধও আছে জ্বাল দেওয়া।

তোমার দুধটুকু বুড়ো মাগী আমি খাব? পিসিমা হাসিলেন।

খাবেনই তো। নইলে আর কিসের মেয়ে আমি!

পিসিমা আনন্দে গলিয়া গিয়া বলিলেন—আমার সোনা বউ। এমন বউকে ফেলে যারা মেয়ে খোঁজে, তারা:

কিসের গরব করে?
তারা আগুনে পুড়ে না কেন মরে।

একটুখানি নয়—সব ছড়াটা বলুন।

পিসিমা বলিতে লাগিলেন:

ধন—ধন—ধন
বাড়ীতে ফুলের বন।
এ ধন যার ঘরে নেই তার বৃথাই জীবন।
তারা কিসের গরব করে।
তারা আগুনে পুড়ে না কেন মরে।

সইয়ের কথাই মনে হইল। ধরা গলায় যোগমায়া বলিল—এ ঘরে কুলুপ লাগিয়ে ও ঘরে যাই চলুন।

৩

সকাল বেলায় একটা চাকা পাখী ডাকিয়া গেল। দুয়ারে জল দিতে গিয়া পিসিমার হাত হইতে ঘটীটাও পড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, তোমার শাশুড়ী আজই ফিরে আসবেন, বউমা।

আজ! যোগমায়া সঙ্কুচিত হইয়া গেল। আজ সকালের আকাশটিকে ভারি ভ'ল লাগিতেছিল তার। ভারি মিষ্ট বাতাস দক্ষিণ হইতে বহিতেছিল। অকস্মাৎ হাওয়া বদলাইয়া গেল।

আজ কি ক'রে আসবেন?

না হলে চাকা পাখী ডাকলো কেন, ঘটীই বা পড়লো কেন হাত থেকে? যে অস্থির মানুষ, সংসার ফেলে কোথাও কি দু'দণ্ড থাকতে পারেন? সেবার শ্রীক্ষেত্তর যেতে যেতে পথ থেকে ফিরে এলেন। বলেন, বাড়ী থেকে গিয়ে—বাড়ীর কথাই খালি মনে পড়ে, ঠাকুরঝি; শেষকালে কি লাউমাচা—পুঁইমাচা দেখব?

আপনি গেছেন শ্রীক্ষেত্রে?

কই আর হ'লো, মা। তিনি না টানলে কার সাধ্যি যায়। ডুবি ধরে না টানলে যাবার যো কি! আহা,

কপালে মাণিক জ্বলে
মণিকোঠা আলো করে,
আমার মায়া-ডুরি দাও হে কেটে,
ওগো জগবন্ধু—দীনবন্ধু—

গৃহের কাজ সারা হইলে বলিলেন, আজ একাদশী, আমার তো খাওয়া নেই, দেখি একবার কাউকে বলে, যদি মাছটা এনে দেয়।

মাছ কি হবে পিসিমা, এমনি ভাতে-ভাত দিয়ে—

একাদশীর দিন সধবা মানুষের যে মাছ খেতে হয়।

বেলায় বাজার বসে। দশটার সময় পিসিমা একগলা ঘোমটা টানিয়া চৌকাঠের বাহিরে পা দিবেন, এমন সময় একখানা গরুর গাড়ী আসিয়া বাড়ীর দুয়ারে থামিল। পিসিমার আর বাহির হওয়া হইল না। তিনি ভিতরে চলিয়া যাইতেছিলেন, পিছনে কে ডাকিল,—আমি বাড়ী এলাম, আর আমায় দেখে পালাচ্ছ, পিসিমা।

পিসিমা মুখ ফিরাইতে না-ফিরাইতে রামচন্দ্র আসিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইল।

ওমা, রামু আমার কোত্থেকে এলি? না পত্তর—না কিছু?

হঠাৎ কুষ্টেয় বদলি হ'লাম যে, পিসিমা। সাত দিনের ছুটি পেয়েছি।

কুষ্টে? সে তো অনেক দূর।

হাঁ, তা এখান থেকে এক দিনের পথ। দাঁড়াও, গাড়ী থেকে জিনিসপত্রগুলো নামাই। মা কোথায়?

বউ গেছেন জিরেটে। কালই গেছেন।

জিরেটে গেছেন মা! তাই ত, কবে আসবেন?

কাল না হয় পরশু। আজ চাকা পাখী ডেকে গেল দেখে ভাবছিলাম বউই হয় ত এসে পড়বেন। তা তুই এলি। শরীরগতিক ভাল ত? রোগা-রোগা দেখাচ্ছে কেন?

নিজে হাতে রেঁধে খেতে হয়। আজ এখানে, কাল সেখানে দশ দিন পনেরো দিন ক'রে ঘুরছিই। এবার ইনস্পেক্টর বাবুকে ব'লে কয়ে—একটা ভাল জায়গায় বদলি হলাম। উনি আমায় ভালও বাসেন।

আহা, ভগবান্ তাঁর ভাল করুন। রেঁধে খেলে কি ব্যাটাছেলের শরীর থাকে? মাছ-টাছ সব রাঁধতে পারিস তো?

ইতিমধ্যে গাড়োয়ান মোটগুলি বাড়ীর রোয়াকে রাখিযাছে। তাহার ভাড়া মিটাইয়া দিয়া রামচন্দ্র কথা কহিতে কহিতে বাড়ীর মধ্যে আসিল।

হাঁ, মাছ! বলে কোন রকমে ভাতে-ভোতে।

ও মাগো, তাই এমন চেহারা হ'য়েছে! ওই যে জল রয়েছে—হাত পা ধুয়ে ঘরে বসে একটু জিরো। দেখি নারকোল-নাড়ু-টাড়ু কিছু আছে কি না শিকেয় তোলা।

রামচন্দ্র ঘরের মধ্যে আসিয়া তক্তাপোষের উপর বসিল। দু'টি ঘরেব সংযোগস্থল অন্ধকার সিঁড়িটার মধ্যে আত্মগোপন করিযা যোগমায়া রামচন্দ্রকে দেখিতে লাগিল। অনেকদিন পরে দেখা। পরিচিত লোককেও কত না অপরিচিত মনে হইতেছে। রামচন্দ্র ঢেঙা হইয়াছে, সেইজন্যই কি রোগা-রোগা দেখাইতেছে? রঙের সে ঔজ্জ্বল্য নাই, মুখের গোঁফটি ঘন হইয়া যাত্রাদলের সাজা সেনাপতির মত অনেকটা দেখিতে হইয়াছে। জরির পোষাক পরিলে ও শিরপেঁচ মাথায় দিলে—কে বলিবে রামচন্দ্র সেনাপতি নয়? তবে রামচন্দ্রের মুখে তেমনই হাসি লাগিয়া আছে। ও ঘরের মধ্যেও ত পুরা আলো নাই, তাই সেই হাসির বেগ মন্দীভূত ও ছটা স্তিমিত বোধ হইতেছে। কণ্ঠস্বরটি আরও ভরাট হইয়া অপরিচয়ের অবগুণ্ঠন একটু বেশী করিয়াই টানিয়া দিয়াছে। বিদেশ হইতে দেড় বৎসর পরে রামচন্দ্র আসিয়াছে নূতন মানুষ হইয়া।

নারিকেল নাড়ু জলযোগ করাইয়া পিসিমা বলিলেন, আজ তোকে বাজারে যেতে হবে। একটু মাছ টাছ—

রামচন্দ্র বলিল, আবার মাছ কি হবে; তুমি যা রাঁধবে, তাই অমৃত লাগবে। কতদিন যে তোমাদের হাতের রান্না খাইনি! নিষ্প্রাণ কণ্ঠস্বর রামচন্দ্রের!

ওমা, তা কি হয়? আজ একাদশী, বউমা সধবা মানুষ—

বউমা! বিস্ময়ে রামচন্দ্রের বিস্তৃত চক্ষু বিস্তৃততর হইয়াছে।

পোড়া মনের দশা দেখ, বলতে ভুলেছি! বউমা যে আজ তিন দিন হ'ল এসেছেন।

কথা কহিয়া রামচন্দ্র আনন্দ প্রকাশ করিল না, একটু চঞ্চল হইয়া নড়িয়া বসিল শুধু। চোখ দু'টি তার খুশীর ছটায় চক্‌চক্ করিতে লাগিল।

তবে ত মাছ আনতেই হবে পিসিমা। কিন্তু হঠাৎ তোমার বউমা যে এলেন।

বাড়ীর বউ বাড়ী আসবে না ত যাবে কোথায় শুনি? বউয়ের যেমন কাণ্ড! সামান্য জিনিস নিয়ে কুটুমের সঙ্গে মন কষাকষি চলছিল। দোষ দু'পক্ষেরই। ঝগড়া-বিবাদ কি চিরদিন থাকে।

বলিয়া সংক্ষেপে তিনি বৈবাহিকের সঙ্গে মনোমালিন্যের ইতিহাসটুকু বিবৃত করিলেন। রামচন্দ্র নীরবে শুনিয়া গেল, কোন মতামত প্রকাশ করিল না।

সিঁড়ির ওপারে দুরু-দুরু বক্ষে রুদ্ধ নিশ্বাসে যোগমায়াও সব শুনিতেছিল। রামচন্দ্র কোন কথা কহিল না দেখিয়া সে কিছু আশ্বস্ত হইল। যাক্, উনি তাহা হইলে ব্যাপারটিকে তেমন গুরুতর ভাবেন নাই।

যাই পিসিমা, অনেক দিন পরে এলাম, কে কেমন আছেন একবার দেখাশোনা ক'রে আসি।

রামচন্দ্র বাহির হইয়া গেলে পিসিমা ডাকিলেন, বউমা।

যোগমায়া সিঁড়ি হইতে পাশের ঘরে নামিয়া গেল ও রোয়াক দিয়া ঘুরিয়া ওঘরে আসিল।

কি পিসিমা?

পিসিমার মুখ খুশীতে ভরা। কহিলেন, রাম যে কুষ্টেয় বদলি হ'য়েছে, সাত দিন ছুটি পেয়েছে।

ঘোমটা টানিয়া যোগমায়া নীরব রহিল।

পিসিমা বলিলেন, তুমিই আজ রাঁধ না হয়। মুগের ডাল, নিম বেগুন ভাজা, সজনে ফুলের চচ্চড়ি, মাছের ঝোল আর টক্।

যোগমায়া বলিল, না, আপনি রাঁধুন।

কেন, ভাল হবে না রান্না তাই ভয় করছ?

তিনি হাসিলেন। একটু থামিয়া বলিলেন, তা হোক, আমি বরঞ্চ দেখিয়ে দেব'খন!

না পিসিমা—আপনিই রাঁধুন।

আজ না হয় আমি রেঁধে খাওয়ালাম—চিরদিন যে তোমাকে খাওয়াতে হবে, মা।

মাছ না হয় আমি রাঁধব—আপনি দেখিয়ে দেবেন।

সেই ভাল।

আহারাদি শেষ হইতে বেলা দুইটা বাজিয়া গেল। গ্রামে যত আত্মীয়বন্ধু বা পরিচিত প্রতিবেশী আছেন, সকলের সঙ্গে তবু রামচন্দ্র দেখা করিতে পারে নাই। বেলা একটায় বাজারে গিয়াও চুনা মাছ ছাড়া আর কিছু মিলে নাই।

বিছানায় গা ঢালিয়া রামচন্দ্র পান চিবাইতে চিবাইতে হয়ত যোগমায়ার কথাই ভাবিতেছিল। আজ সে পাড়ায় প্রাণ খুলিয়া মিশিয়াছে। যে মেঘ মাথার উপর ঘন হইয়া জমিয়াছিল, তাহা দক্ষিণা বায়ুর দাক্ষিণ্যে কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। রামচন্দ্র নিজেকে বড়ই পরিতৃপ্ত ও সুখী মনে করিতেছে। চোখ বুজিয়া সে সুদূর অতীতে চলিয়া গেল।

তিনটার পর খুট্ করিয়া সিঁড়ির দুয়ার খোলার শব্দ হইল। রোয়াক দিয়া যোগমায়া দিনের বেলায় ওঘরে আসিতে পারে নাই। আমতলার ঘর হইতে পিসিমা যদি দেখিয়া ফেলেন? নড়বড়ে দুয়ার সিঁড়ির। এক দিকের ডোমনি উপড়াইয়া গিয়াছে, হাঁসকলটা ঝুলিয়া পড়াতে ওদিকের কপাটটা কাত হইয়াছে। বন্ধ করিবার ও খুলিবার সময় খটাং করিয়া শব্দ হয়। সেই শব্দে রামচন্দ্রের তন্দ্রা টুটিয়া গেল। যোগমায়া ঘরের মধ্যে আসিয়া ওদিকের দুয়ারটা বন্ধ করিয়া দিল। রামচন্দ্র ততক্ষণে উঠিয়া বসিয়াছে।

রামচন্দ্র প্রশ্ন করিল, কেমন আছ?

যোগমায়া কোন কথা না বলিয়া রামচন্দ্রের পায়ের গোড়ায় অবনত হইল। হাত দিয়া তাহার পদ স্পর্শ করিয়া হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

রামচন্দ্র তাহাকে তুলিয়া ধরিয়া কহিল, কাঁদ কেন?

অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া যোগমায়া শান্ত হইল। শান্ত হইলেও মাঝে মাঝে সেই উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের বেগ দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে বুক ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। কেন যে কাঁদে—সে কথা যোগমায়া কাহাকেও তো বুঝাইতে পারে না। নারীর কত বড় সর্ব্বনাশ যে হইতে বসিয়াছিল।

বেলা বেশী ছিল না, কাজেই প্রথম মিলন-পর্ব্ব রোদন ও নীরব সান্ত্বনার মধ্য দিয়াই শেষ হইল। যোগমায়াই তাড়াতাড়ি উঠিবার মুখে বলিল, এখনি সন্ধ্যে হবে—ঘর ঝাঁট দিয়ে নিই।

রাত্রিতে রামচন্দ্র বলিল, তোমার বড্ড ভয় হয়েছিল, না মায়া? যদি আর একটা বিয়ে ক'রে বসতাম?

ডান হাত দিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া শঙ্কিত চাপা-স্বরে যোগমায়া বলিল, আবার!

রামচন্দ্র বলিল, আচ্ছা, ও কথা না হয় বলব না। কিন্তু আর একটা সুখবর আছে।

কি?

শুনেছ বোধ হয় আমি কুষ্টেয় পোষ্টমাষ্টার হ'য়ে বদলি হ'য়েছি? পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনে হ'য়েছে।

সত্যি?

পোষ্টমাষ্টার হ'লে একটা বাসাও ওই সঙ্গে পাওয়া যায়। তাই ভাবছি, কতদিন আর একলা হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাব?

তুমি আবার রাঁধতে পার নাকি?

রাঁধলাম তো এই চার বছর ধরে। কখনও হয়ত কোন পোষ্টমাষ্টারের বাড়ী খাওয়ার সুবিধা হ'য়েছে। কাল হয়ত তোমাকে মাছের ঝোল রেঁধে খাওয়াব।

লজ্জা করবে না তোমার রাঁধতে? পিসিমা কি বলবেন?

পিসিমা যাই বলুন—আমার রান্নার তারিফ তোমায় করতেই হবে।

আচ্ছা বল দেখি—ঝোলের আলু কি ক'রে কোটে? কৌতুকভরে যোগমায়া প্রশ্ন করিল।

কেন, ছুরি দিয়ে কুচি কুচি ক'রে—

ও হরি, তবেই তুমি রেঁধেছ মাছের ঝোল! ঝোলের আলু বুঝি কুচি কুচি করে? চারফালা করে কুটতে হয় আলু। আচ্ছা, কি কি মশলা দিতে হয় বল দেখি?

কাল খেলেই বুঝতে পারবে—কেমন হ'য়েছে ঝোল। আচ্ছা, ঝোল না হয় রাঁধব না, যদি তুমি গিয়ে বাসায় আমায় রেঁধে দাও।

আমি যাব বাসায়?

কেন, সবাই তো যায়। আমাদের মহাদেববাবু তের বছরের বউ নিয়ে গেলেন বাসায়। কেমন রাঁধছে—বাড়ছে।

শাশুড়ী বাড়ীতে রইলেন—বউ যাবে বিদেশে! লোকে নিন্দে করে না?

কিন্তু লোকের নিন্দে শুনতে গেলে নিজের সুবিধেয় জলাঞ্জলি দিতে হয়। এই ধর, তুমি যদি যাও আমার সঙ্গে—

হাঁ—গেলাম ত! তা হ'লে মা,—সহসা যোগমায়া চুপ করিয়া গেল। তাহার কৌতুকোজ্জ্বল মুখে ছায়া নামিল। রামচন্দ্র যোগমায়ার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিল। লক্ষ্য করিয়া তাহার হাত ধরিয়া আর একটু কাছে আকর্ষণ করিয়া কহিল, মা বুঝি তোমার ওপর এখনও রাগ ক'রে আছেন?

যোগমায়া থমথমে মুখে চুপ করিয়া রহিল। সেকথা স্বামীর কাছে বলা যায় নাকি?

রামচন্দ্র কহিল, আমার মাকে আমি যেমন জানি আর কেউ তেমন জানে না। উনি রাগ করেন বটে, ভেতরে ভেতরে ভালও বাসেন। তাই ত আমি এখনও ভাবতে পারি না, কি ক'রে বিয়ের কথা লিখেছিলেন আমায়।

যোগমায়া কোন কথা কহিল না। মায়ের নিকট সন্তানেরা চিরকালই দোষত্রুটিশূন্য। 'কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখনো নয়।' ভক্ত রামপ্রসাদের এই গান তো মিথ্যা নহে। কিন্তু পরের মেয়ে যোগমায়া—তাহার সম্বন্ধেও যে শাশুড়ী অতটা স্নেহশীলা হইবেন—

রামচন্দ্র তাহার হাতে দোলা দিতে দিতে বলিল, ভয় কি মায়া, আমার হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাওয়ার কথা শুনলে—উনি কখনই অমত করবেন না।

ন', তুমি ব'লো না।

কেন গো, তোমার লজ্জা কি?

মা হয়ত মনে করবেন—আমিই তোমায় বলেছি এ কথা।

বললেই বা তুমি, এমন তো সবাই বলে থাকে। রামচন্দ্র হাসিতে লাগিল।

যাও! কৃত্রিম ক্রোধে যোগমায়া মুখ ফিরাইল।

আচ্ছা, আচ্ছা, যাতে কেউ কিছু মনে না করেন—তেমন ভাবেই বলব। ভয় নেই তোমার।

আশ্বস্ত হইয়া যোগমায়া বলিল, কৈ, এবার আমার জন্য তো কিছু আননি।

তুমি যে এখানে আছ জানব কি ক'রে। তা ছাড়া—

থাক, রাত হ'য়েছে—ঘুমোও।

না মায়া, আজ ঘুমুবো না, তোমায়ও ঘুমুতে দেব না।

তোমায় কি, দুপুরবেলায় ঘুম মারবে।

তুমিও—

হাঁ, বেশ বলেছ যা হোক। আমি ঘুমুলে কেউ রক্ষে রাখবেন নাকি। যা ঠাট্টা করবেন।

কিন্তু এত বিবেচনা সত্ত্বেও যোগমায়া গল্প করিতে লাগিল। কত দিনের জমা-করা যত রাজ্যের গল্প। সই-পাতানো হইতে আরম্ভ করিয়া পিত্রালয়ে বাস পর্য্যন্ত প্রাত্যহিক খুঁটিনাটির কত না বিবরণ। এতও মনে আছে যোগমায়ার! তবু সব গল্প করা হইল কৈ, মুসলমান পাড়ায় মুরগী ডাকিয়া উঠিল। যোগমায়া চঞ্চল হইয়া কহিল, ওই যাঃ, কুঁকড়ো ডেকে উঠলো, রাত পুইয়ে এলো বুঝি?

রামচন্দ্র কহিল, দুপুরে ঘুমুবে তো?

তুমি নাক ডাকিয়ো।

তোমার নাক বুঝি ডাকে না?

যাও। যোগমায়া উঠিয়া গেল।

ত্রয়োদশীর দিন বেলা দু'টার সময় শাশুড়ী আসিলেন। সঙ্গে অনেকগুলি পুঁটুলি। ওপারে জামাইয়ের বিস্তর নারিকেল গাছ আছে। আধ-পাকা ও ঝুনা নারিকেলে দু'টি পুঁটুলি বোঝাই হইয়াছে। এক রাশ নারিকেল-কাঠি চাঁচিয়া তাড়া বাঁধিয়া আনিয়াছেন—ঝাঁটা হইবে। আর যাহা আসিয়াছে, আনাজপাতি। জামাই একখানা কাপড় দিয়াছেন আর কলিকাতা হইতে বাঁধা কপি আনা হইয়াছিল, তাহাও একটি দিয়াছেন।

রামচন্দ্র তখন বাড়ীতে ছিল না। পিসিমার মুখে তাহার পদোন্নতির খবর শুনিয়া বলিলেন, মা-সিদ্ধেশ্বরীর সওয়া পাঁচ আনার পুজো দিয়ে আসব কাল, আর মা-বাগ্‌দেবীর পাঁচ সিকে পুজো মানত করা যাক—আসচে বার দেব। রামকে বলতে হবে—পেরথম মাইনে পেলে যেন আমায় পাঁচটা টাকা পাঠিয়ে দেয়। ভাল ক'রে সত্যনারাণের সিন্নিও তো দিতে হবে।

ওতে কি, বউ? মেলাই পুঁটুলি এনেছ যে।

আর বল কেন, ভাই! আমিও নেব না—মেয়ে জামাইও ছাড়বে না। আর ওই কুঞ্জটাই কি কম! বলে, দিন মাঠাকরোণ, আমি নিয়ে যাব। তেমনি নাকাল আসতে! নারকোল ছুলে আনলে কি অত ভারি হয়। হাঁ, ওগুলোয় জল ঢেলে ধুয়ে নাও। তারপর একটু গঙ্গাজল ছিটিয়ে দাও। হয়েছে। পাড়ার সবাইকে একটা ক'রে কপির পাতা আর নারকোল একটা ক'রে বিলুতে

হবে। কুঞ্জকে দুটো নারকোল দিও। আচ্ছা, হাত পা ধুয়ে আমিই গুছিয়ে দিচ্ছি।

নিজে হাতে না দিলে শাশুড়ীর তৃপ্তি হয় না—সে কথা পিসিমা জানেন। কাজেই জিনিস শুদ্ধীকৃত করা ছাড়া ভাগ-বাঁটোয়ারার দিকে তিনি ঘেঁষিলেন না। শাশুড়ী আঁচলের গ্রন্থি খুলিতে খুলিতে বলিলেন, ভাল কথা, কমলি কি লিখেছে বউমাকে।—এই নাও গো চিঠি। বলেছে উত্তর পেলে আসবে একবার। কৈ গো—বউমা কোথায়?

যোগমায়া আসিয়া শাশুড়ীর পায়ের ধূলা লইল। মেয়ে-বাড়ী হইতে আসিয়া এই তিনি তাহাকে 'বউমা' বলিয়া প্রথম ডাকিলেন। সে ডাকে স্নেহ না ফুটুক—মাধুর্য্য আছে বইকি। রামচন্দ্রের উপর মনে মনে যোগমায়া আরও বেশী কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিল। তাঁহারই জন্য আজ সব দিক হইতেই সমস্ত মেঘ যেন কাটিয়া যাইতেছে।

৪

নূতন দেশে আসিবার পথটিও চমৎকার। ছোট বড় দু'রকমের রেল-গাড়ী চড়িয়া তিন জায়গায় গাড়ী বদল করিয়া, অধিক রাত্রিতেই হইবে, যোগমায়া কুষ্টিয়া পৌঁছিল। রাত্রি বারোটা কি একটাই হইবে—তখন। চারিদিকে অন্ধকার—নিশুতি রাত সাঁ-সাঁ করিতেছে কানের কাছে। কোথাও জনপ্রাণী নাই? ষ্টেশনে ঘুমন্ত কানে যা দুই একবার কুলির ডাক শোনা গিয়াছিল! তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিতে গিয়া যোগমায়ার বাঁ-পায়ের খানিকটা ট্রেণের দুয়ারে লাগিয়া ছড়িয়া গেল, শাশুড়ী হুমড়ি খাইয়া প্ল্যাটফরমের কাঁকরের উপর পড়িয়া গেলেন। ওদিকে মোটঘাট নামাইবার তাড়াই কি কম। ঘুম-চোখ বলিয়া এবং ছোট ষ্টেশনে গাড়ী বেশীক্ষণ থামে না বলিয়াও রামচন্দ্র কুলিকে একটা ধমক দিয়া নিজেই মালপত্র টানাটানি করিতে লাগিল। কে জানে, সব মাল নামিল কিনা, ট্রেণ তো ধোঁয়া ছাড়িয়া শব্দ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

ক'টা মোট ছিল, মা?

কি জানি বাপু, বারোটা কি তেরোটা, ঠিক মনে হচ্ছে না।

চোদ্দটা নয় তো?

না।

তা হলে ঠিকই আছে।

অদূরে একজন লোক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ইহাদের অবতরণ দেখিতেছিল, সে অগ্রসর হইয়া নমস্কার করিয়া কহিল, আপনিই নতুন পোষ্টমাষ্টার বাবু?

তুমি কে?

আজ্ঞে—আমি লক্ষ্মণ। ডাক-হরকরা। রমেশবাবু পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, রাত্রির-কাল—নতুন জায়গা।

রমেশবাবু কে?

আজ্ঞে কেরাণীবাবু। আপনি একখানা চিঠি লিখেছিলেন পোষ্টমাষ্টারের নামে, তা তেনার জর। কেরাণীবাবু বললেন, লক্ষ্মণ তুই যা—নতুন মানুষ বিপদে পড়বেন।

বাঁচালে লক্ষ্মণ, তুমি না এলে ভারি মুশকিল হ'ত। গাড়ী এনেছ তো? আপিস এখান থেকে কতদূর?

এজ্ঞে এক পোয়া রাস্তা। ছোট ইষ্টিশানে নেবে ভালই করেছেন, হেঁটে যেতেই পারবেন। গাড়ী তো পাইনি বাবু। এই কুলি, বাবুর মোট নিয়ে যেতে পারবি?

কেন পারব না, চার আনা পয়সা চাই।

হাঁ, চার আনা? এই মাঠটা পেরুলেই পোষ্ট আপিস, দু'আনা পাবি।

অনেক দর কষাকষি করিয়া তিন আনাতে রফা হইল।

রামচন্দ্র বলিল, এত মোট—ও একা নিতে পারবে কেন?

আজ্ঞে, আমিও কিছু নেব। হাল্কি হাল্কি বুঁচকিগুলো আপনারা হাতে করে নেন। যেতে তো হবে।

মোট লইয়া লক্ষ্মণ আগাইয়া চলিল। তার পিছনে রামচন্দ্র, যোগমায়া ও শাশুড়ী চলিলেন; সর্ব্বশেষে চলিল কুলিটা। রেলের তার দিয়া ঘেরা জমিটা পার হইয়াই মাঠ। কোন দিকে বাড়ী নাই, মানুষ নাই; থাকিলেও অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। তারের ওপারে অনেকগুলি বড় ঝাউগাছের মাথায় ফাল্গুনের হাওয়া শোঁ-শোঁ করিয়া ঝড় তুলিয়াছে। অদূরে কয়েকটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল।

রামচন্দ্র বলিল, কোয়ার্টারে তো মাষ্টারবাবু আছেন বললে, আমরা গিয়ে উঠবো কোথায়?

আজ্ঞে তিনি আছেন রমেশবাবুর বাসায়। কাল আপনাকে চার্জ্জ বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাবেন।

ও! তা এখানে বুঝি খুব ম্যালেরিয়া আছে?

ফাল্গুন মাসে কি ম্যালেরিয়া হয় বাবু? যে রকম গায়ে হা'তে ব্যথা, সন্দ হচ্ছে মা'র অনুগ্রহ হবে।

মনে মনে আতঙ্কিত হইয়া রামচন্দ্র বলিল, বল কি! খুব হচ্ছে বুঝি?

আজ্ঞে না। প্রেত্যেক বার যেমন হয়—তেমনি। যে সময়ের যা। এই যে বাবু পোষ্ট আপিসের পেছনে এসে পড়লাম। এই যে তার দিয়ে ঘেরা—এই সব জমিই পোষ্ট আপিসের। এই কাঁঠাল গাছ, দুটো আম গাছ, ওই বেল গাছ—সব গবরমেন্টের জমি। হাঁ, কোঠাঘরেই আপিস বসে। সামনেরটা আপিস—পেছনটা কোয়াটার। রান্নাঘর দো-চালা।

জিনিষপত্র নামাইয়া কুলিটা চলিয়া গেল। লক্ষ্মণ রান্না ঘর হইতে একটা কেরোসিনের কুপি জ্বালাইয়া এ ঘরে আনিয়া বলিল, আজ কোন রকমে একটু ফলমূল আর দুধ সেবা ক'রে শুয়ে পড়ুন—কাল সকালে সব ব্যবস্থা ক'রে দেব। ঐ কুয়ো, বালতিতে জল তুলে রেখেছি। আমরা কৈবত্ত, নমস্কার বাবু। যাইতে যাইতে ফিরিয়া কহিল, উই শিকেয় মাটির ভাঁড়ে কাঁচা দুধ আছে, রান্নাঘরে পাকাটি আছে—জ্বাল দিয়ে নেবেন।

লক্ষ্মণ বাহির হইয়া গেলে শাশুড়ী কহিলেন, ঐ একরত্তি বালতির জলে কি কাপড়চোপড় কাচা হয়? না নেয়ে ধুয়ে—ট্রেণে শত্তিক জা'ত ছুঁয়ে আসা—ঘুম হবে কেন? কুয়োর দড়া আছে তো? বলিয়া তিনি জল তুলিবার জন্য ওদিকে আগাইয়া গেলেন।

যোগমায়া ঘোমটা টানিয়া বিশৃঙ্খল মোটঘাটের এক ধারে বসিয়া রহিল। শাশুড়ী সঙ্গে আসিয়াছেন বাসা গুছাইয়া দিবার জন্য। দিন কয়েক থাকিয়া তিনি চলিয়া যাইবেন। তিনি না আসিলেও বা গোছগাছের কাজে যোগমায়া কিছু সাহায্য করিতে পারিত। কিন্তু কোন্ জিনিষটি কি ভাবে রাখিতে হইবে, সে নির্দ্দেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত যোগমায়াকে এমনই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে।

ছোট্ট বাড়ীটি। চারিদিক উঁচু প্রাচীর দিয়া ঘেরা। এধারে দু'খানি নাতিপ্রশস্ত কোঠাঘর, ওধারে খড়ের দু'খানা চালা। মাঝখানে ফালি এতটুকু উঠান। উঠানের এক পাশে—পশ্চিমের প্রাচীর ঘেঁষিয়া পাতকুয়া—তার ওধারে পায়খানা। পূবদিকে সদর দরজা; সেই দরজার মাথায় কি সব লতা গাছ। দরজার পাশে কয়েকটা বেগুন-গাছ অন্ধকারেও সতেজ বলিয়া বোধ হইতেছে। আর কোঠাঘরের ঠিক নীচেয় পাঁচ সাত হাত লম্বা অপ্রশস্ত শাকের ক্ষেত। প্রচুর ধূম-উদ্গীরণকারী কেরোসিনের কুপির আলোয় এতটা অবশ্য দেখিবার কথা নহে, কিন্তু অন্ধকারে বহুক্ষণ থাকিয়া চোখের দৃষ্টিও স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে; গাঢ় অন্ধকার ফিকে বোধ হইতেছে।

রামচন্দ্র বালতির মধ্য হইতে তেল ভরা হিঙ্কসের লণ্ঠনটা বাহির করিয়া জ্বালিল। সে আলোকে ঘর আলোকিত হইল। লোহার কড়ি-দেওয়া ছোট ঘর। মাত্র দুইটা লোহার কড়ি। পূবের দিকে একটি মাত্র হাফ্ জানালা আছে, উত্তরে পোষ্ট আপিসের দেওয়াল। ওদিকে একটি মাত্র দুয়ার রহিয়াছে, সেটি খুলিলে আপিসের মধ্যে যাওয়া যায়। পশ্চিমেও একটি দুয়ার পাশের ঘরে যাইবার জন্য। খালি দক্ষিণে একটা বড় জানালা ও দুয়ার আছে। পাশের ঘরটি আয়তনে ঈষৎ বড়। সেটির পশ্চিম দিকে খড়খড়ি দেওয়া দু'টি জানালা। উত্তর দিকটায় দেওয়াল। আর পূর্ব্ব-দক্ষিণ এই ঘরেরই মত। আলো উঁচু করিয়া রামচন্দ্র ঘর দেখিতে লাগিল। যোগমায়াও ঘোমটাটা ঈষৎ খাটো করিয়া চারিদিকে চাহিল। সাদা দেওয়াল, এখানে ওখানে চুণবালি খসার দাগ। আসবাবপত্র যাহা ছিল, পোষ্টমাষ্টার উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন,—এমন কি, দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পেরেকগুলি পর্য্যন্ত। পেরেক তোলার জন্যই হয়ত মেঝেয় অত ধূলাবালি জমিয়া জঞ্জালের সৃষ্টি হইয়াছে।

কাপড় কাচিয়া শাশুড়ী ফিরিলেন। ঘর দেখিয়া বলিলেন, তাই ত, একবার ঝাঁট দিয়ে দিলে হ'ত। কাল সব ধুয়েমুছে নিলেই হবে।

রামচন্দ্র বলিল, এত রাত্রে ঝাঁটা কোথায় পাবে, মা?

সব এনেছি বাবা। নতুন বাস পাতানো—কিছু ভুলে গেলে কি চলে।

সমস্ত গোছ-গাছ করিতে আরও ঘণ্টাখানেক গেল।

কয়েক টুকরা শাঁকালু, কলা ও কিছু দুধ খাইয়া রামচন্দ্র ও যোগমায়া শয়ন করিল; শাশুড়ী জলস্পর্শ করিলেন না। গঙ্গাস্নান না করিয়া ট্রেণের মানুষ কি শুদ্ধ হইতে পারে?

নূতন দেশের প্রথম সকাল। প্রাচীরের ওপিঠে কাঁঠালগাছটার মাথায় রোদ পড়িয়া পাতাগুলি চিক্‌চিক্ করিতেছে। আমের কচি-কচি পাতাগুলি বাতাসে পত্‌ পত্‌ করিয়া দুলিতেছে। কাঁঠাল-গাছের মাথা ছাড়াইয়া অনেক দূরের একটা নবপত্রশোভিত দেবদারু গাছ দেখা যায়, গাছের মাথায় একটা চিল বসিয়া ডানা ঝাড়িতেছে। পশ্চিমের প্রাচীরের গায়ে একটা উঁচু তালগাছ—তার বাগ্‌ড়াগুলি হইতে অসংখ্য বাবুই পাখীর বাসা সকালের হাওয়ায় এধার-ওধার দুলিতেছে। তার পাশে ঝাঁকড়া ডুমুর গাছে এক ঝাঁক্ ছাতারে পাখী কলবর জুড়িয়া দিয়াছে। ঘরের নীচের পালং শাকের ক্ষেতটা মুড়াইয়া লওয়া সত্ত্বেও কচি কচি শীষ্‌ সমেত শাক বাহির হইয়াছে। বেগুনগাছে অনেকগুলি বেগুনী ফুল ধরিয়াছে—বেগুন একটাও নাই। দুয়ারের মাথায় সিমগাছে সাদা ও কালো সিম থলো থলো ঝুলিতেছে। ছোট্ট একটা চারা আমগাছ পায়খানার পাশে ধীরে ধীরে মাথা তুলিতেছে।

লক্ষ্মণ আসিতেই শাশুড়ী বলিলেন, বাবা আমায় একবার গঙ্গাস্নান করিয়ে আনতে হবে।

লক্ষ্মণ হাসিয়া বলিল, এখানে গঙ্গা কোথায় ঠাকরুণ! গোরাই নদী আছেন।

নদী তো, তাহলেই হবে। কতদূর বাবা?

এই তো কাছে। রশিটাক পথ হবে। কাপড় গামছা নিয়ে আপনি বরঞ্চ আমার সঙ্গে আসুন—

ঘরদুয়োরগুলো ততক্ষণে ধুয়ে ফেলি বাবা?

হাটবাজার কি করতে হবে আমায় বলবেন।

আজ আর কিছু চাই নে, বাবা। আলু, বেগুন, সিম, বড়ি, সব এনেছি—তুমি একটু দুধ এনে দিও। আর বোকনোয় রাঁধবো। আমি চলে গেলে একটা ছোট তোলো হাঁড়ি আর খান দুই সরা কিনে দিও। পয়সা দিচ্ছি, আজই না হয়—আজ কি বার বাবা?

আজ্ঞে, আজ সোমবার।

সোমে শুক্কুরে তো হাঁড়ি কিনতে নেই—কাড়তেও নেই। কালই তুমি কিনে এনো—এই পয়সা চারটে রাখ। শুক্‌নো কাঠ আছে তো বাবা?

হাঁ, একগাড়ী কাঠ কিনে সেদিন পোষ্টমাষ্টার মশায় চেলিয়ে রেখেছেন—দাম দিয়ে সেগুলো কিনে নিলেই হবে।

সেই ভাল। যিনি ছিলেন—তাঁরা কি জাত লক্ষ্মণ?

আজ্ঞে—ওনারা কায়েস্থ। ভারি ভালমানুষ আর ভদ্দর লোক ছিলেন।

চল, তোমার সঙ্গে গিয়ে একটা ডুব দিয়ে আসি—অমনি পথটাও চেনা হয়ে যাক। বউমা, তুমিও তেল মেখে নেয়ে-টেয়ে নাও। কাঠের উনুন—এসেই ধরাবো 'খন।

চার্জ্জ বুঝিয়া লইতে রামচন্দ্রের একটু বেশী দেরিই হইল। বেলা দুইটার পর সে আসিলে শাশুড়ী বলিলেন, হাঁরে রাম, এই তিন পোর বেলায় খেয়েই তোর শরীরের এমন দশা বুঝি? এ কি কাজ রে বাপু, তিনপোর বেলা পর্য্যন্ত পিত্তি পাড়িয়ে—

কাল থেকে দশটায় খেয়ে বেরুব মা। আজ চার্জ্জ বুঝে নিতে একটু দেরি হ'ল কি না। ভাত বাড়, আমি চট্ করে মাথায় জলটা ঢেলে নিই।

কড়কড়ো ভাত ফেলে আবার ভাত চাপিয়েছে বউমা। ভাল ক'রে তেল মেখে নে।

আবার তিনটেয় আপিস যে।

পোড়া কপাল আপিসের, মানুষের নাবার খাবার সময় থাকে না! কি জানি বাপু—কেমন আপিস তোদের। আপন মনেই তিনি গজ গজ্‌ করিতে লাগিলেন।

বৈকালে রমেশবাবুদের বাড়ীর মেয়েরা বেড়াইতে আসিলেন। বিদায়ী পোষ্টমাষ্টারের বাড়ীর মেয়েরাও আসিলেন। বেশ মিশুক ও ভদ্র মেয়েগুলি। শাশুড়ী কম্বল পাতিয়া তাঁহাদের বসাইয়া আপ্যায়িত করিলেন।

এস মা, বোস। এটি তোমার মেয়ে বুঝি? এখনও বিয়ে হয় নি? তা বেটের বিয়ের যুগ্যি হ'য়ে উঠেছে।

পোষ্টমাষ্টারের গৃহিণী কহিলেন, আর মা, এই মাইনে—সংসার তো বেটের এক ফোঁটা নয়। দু'বেলা আঠারোখানি পাতা পড়ে। বাড়ীতে মা আছেন, বিধবা বোন আছেন, সেখানেও একটা সংসার। ভাগ্যি চার বিঘে ধানের জমি আছে—তাই।

শাশুড়ী বলিলেন, তা তো বটেই, তোমারই ত বেটের ছেলে-মেয়ে সাতটি। কোলেরটি কি? ছেলে বুঝি?

হাঁ মা, ছয় মেয়ের কোলে ওইটুকু সোনার

গুঁড়ো। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন—যেন বেঁচেবর্ত্তে থাকে।

কেরাণী রমেশবাবুর বউটি অল্পবয়সী—সবে মাত্র কোলে একটি ছেলে। সে যোগমায়ার কাছে বসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া আলাপ করিতেছিল।

তোমরা কতদিন এখানে আছ, ভাই?

কত দিন আর! এই ত শীতকালে এলাম—কুমোরখালি থেকে বদলি হ'য়ে। কোনখানে কি স্থিতু হয়ে বসতে পায়? পায়ে যেন কাক বাঁধা! তেমনি শরীরও ভাই, নানান জায়গার জলহাওয়া—

বউটি কথা কয় বেশী। তা হোক, কথাগুলি তার ভারি মিষ্ট। কতই বা বয়স, বড় জোর কুড়ি। একটি ছেলে কোলে পাইয়া সে যেন কতকালের বুড়ি গৃহিণী হইয়া গিয়াছে।

তোমার শাশুড়ী নেই, ভাই? যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিল।

না ভাই। শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্ক বলতে কেউ নেই। একটু থামিয়া বলিল, নেই এক হিসেবে ভাল। যা শুনি সব!

কি শোন ভাই?

এই বৌ-কাঁটকি-পনা। কুমোরখালিতে আমাদের কোয়াটারের পাশে এক ঘর তেলি ছিল। সে বাড়ীর গিন্নি এমন দজ্জাল ছিল যে, বাক্যি-যন্ত্রণা সইতে না পেরে কচি বউটা একদিন গলায় দড়ি দিয়ে মরল। সে কি কাণ্ড ভাই! থানা পুলিশ হৈ-হাক্কার। টাকার ঘণ্ট ক'রে তবে ওরা সে যাত্রা রক্ষে পায়।

কেন যন্ত্রণা দেয় বউকে?

স্বভাব। একলষেঁড়ে লোকগুলোর স্বভাবই ওই। তোমার শাশুড়ী দেখছি খুব ভাল লোক। নতুন বাসা গুছিয়ে দিতে সঙ্গে এসেছেন। আর গোছানীও খুব।

হাঁ, অপরিষ্কারপনা মা দেখতে পারেন না।

তাঁহারা চলিয়া গেলে শাশুড়ী বলিলেন, আসন ক'খানা উঠিয়ে ওই জানলায় রাখ। কম্বলের আসন কাচতে হবে না—একটু গঙ্গাজল ছিটিয়ে নিলেই শুদ্ধু হবে।

গঙ্গাজল কোথায় পাবেন?

কেন, লক্ষ্মণ যে বললে, একটা তাঁবার ফেরো ক'রে পাঠিয়ে দেবে। দেয় নি?

ওই ত একটা ছোট ফেরো দিয়ে গেছে।

এইটুকুন? আগে কি জানি অগঙ্গার দেশ, তাহলে এক ঘড়া জলও আনতাম সঙ্গে ক'রে। কে জানে মা, গঙ্গা নেই—এমন দেশও আছে!

৫

তবু শাশুড়ী থাকিতে নিজেকে এতটা নিঃসঙ্গ বোধ হইত না। সঙ্গী হিসাবে তিনি খুব বাঞ্ছনীয় না হইলেও—সকাল হইতে সারা দিনমান ও সন্ধ্যা হইতে শুইবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত কাজ করিয়া ও বকিয়া এই ক্ষুদ্র বাসস্থানটিকে মুখরিত করিয়া রাখিতেন। ছোট ছোট কত যে অসংখ্য উপদেশ দিয়াছেন যোগমায়াকে—সবগুলি সে কিছু মনে রাখিতে পারে নাই। উপদেশ দিবার ছলে কত বকিয়াছেন, তবু, যাইবার সময় যখন বধূর চিবুকে দক্ষিণ হাতের আঙুল দিয়া চুম্বন করত সজল চোখে বলিলেন, 'বউমা' রাম রইলো—তুমিও ছেলেমানুষ, বুঝেসুজে সংসার চালিও। খেতে বেলা ক'র না, রাত্তিরে সকাল-সকাল শুয়ো। ভগবান না করুন—অসুখবিসুখ কিছু হ'লে খবরটা দিও। যাচ্ছি বটে বাড়ীতে, প্রাণ আমার তোমাদের কাছেই পড়ে রইলো।'

কত দিনের কত অপ্রীতিকর কথা, কত কটু কথা, কলহ, অভিমান—সব নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল, যোগমায়ার চোখেও জল টল টল করিয়া উঠিল।

এখন বড়ই নিঃসঙ্গ বোধ হয়। নূতন দেশ, তা ছাড়া বাসাও গ্রামের একটেরে। সামনের পথ দিয়া লোকজন যাতায়াত করে, প্রতিবেশী হিসাবে এক রমেশবাবুর বউ ছাড়া আর কেহ নাই। আর মাঠের এক পাশে—যেখানে পোষ্ট আপিসের জমিটা শেষ হইয়াছে—ওইখানে ছোট একখানি কুঁড়ে ঘরে এক বৃদ্ধা তাহার দশ বছরের নাতিটিকে লইয়া বাস করে।

নাতির নামটি যোগমায়া এখনও শোনে নাই, কিন্তু বৃদ্ধাকে কেষ্টর মা বলিয়া সকলে ডাকে। ঘুঁটে বেচিয়া, ধান ভানিয়া সে সংসার চালায়। ঘুঁটে বেচিতে আসিয়া যোগমায়ার সঙ্গে সামান্য মাত্র আলাপ করিয়া গিয়াছে। বউমানুষ যোগমায়া—এখানেও শ্বশুরবাড়ীর ধরণে ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' 'হুঁ' দিয়া আলাপ সারিয়াছে।

রমেশবাবুর বউয়ের নাম কালীতারা। এক ই সে স্বামীর আপিসের ভাত-জল করে, দেড় বছরের কচি ছেলে লইয়া সারা দুপুর ও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটাইয়া দেয়। বউটি ছেলেকে যত্ন করিতে জানে।

রোজ গরম জলে গা মুছাইয়া—চোখে কাজলের রেখা টানিয়া—কপালের উপর মাথার কাঁটা দিয়া ছোট্ট একটি খয়েরের টিপ পরাইয়া দেয়। ছেলের গলায় সরু একগাছি রূপার হাঁসুলি গড়াইয়া দিয়াছে। আর মাথার কোঁকড়া চুল কপালের দিকে যেখানে বড় হইয়াছে—সেইখানে একটি ছোট সোনার পুঁটে বাঁধিয়া দিয়াছে। নাদুস-নুদুস কালো ছেলেটি—নাড়ুহাতে বসাইয়া দিলে অবিকল হাঁটু-গাড়া গোপালের মতই বোধ হয়।

দুপুর বেলায় ছেলের দুধ খাওয়ানো ও প্রসাধন শেষ হইয়া গেলে—যে দিন ছেলে ঘুমায় না ও কালীতারার হাতে কাজ থাকে না—সেই দিন সে এ-বাড়ীতে ঘণ্টাখানেকের জন্য বেড়াইতে আসে! ও-বাড়ী হইতে এ-বাড়ী দু'মিনিটের পথও নয়। দুপুরে পথে লোকজন চলে কম, কালীতারা এধার-ওধার উঁকি মারিয়া—ঘোমটা টানিয়া ও-বাড়ীর শিকল তুলিয়া—এক ছুটে এ-বাড়ীতে আসিয়া ডাকে, কি ভাই, কি করছ?

আসুন দিদি। বসুন। কম্বলের আসনখানা যোগমায়া পাতিয়া দেয়।

কালীতারা বসিয়া বলে, ছেলে যাই কাঁদুনে নয়, তাই একা হাতে অনেক কাজ করতে পারি। পরশু এক কাঠা ডাল ভিজিয়েছিল'ম, কাল সারাটা দিন বসে বসে বড়ি দিলাম। খোকা চুপটি ক'রে বসে বসে দেখলো। তুমি বড়ি দেওনি?

মা অনেক বড়ি দিয়ে গেছেন; ভাজা বড়ি, কুমড়ো বড়ি, মটর ডালের বড়ি।

মটর ডালের বড়ি কিসে দাও তোমরা?

কেন, লাউয়ের ঝালে মটর ডালের বড়ি বেশ হয়।

ঠিক বলেছ ভাই। গিন্নীবান্নী বাড়ীতে না থাকলে অত মনেও হয় না সব। আচ্ছা ভাই, তোমার গহনা সব খুলে রেখেছ কেন?

যোগমায়া বিপদে পড়িয়া গেল। বানাইয়া কথা বলা তার অভ্যাস নয়। একটু ভাবিয়া—মুখ নীচু করিয়া বলিল, গহনা সব বাড়ীতে আছে।

ও, বিদেশ বিভুঁই বলে শাশুড়ী সঙ্গে দেন নি। তা যা বল ভাই, এই ত সাধ-আহ্লাদের বয়েস—এখন—যদি চোরের ভয়ে সব—পুতু-পুতু ক'রে বাক্সোয় তুলে রাখ ত পরবে কি বুড়ো বয়েসে? কি, কি, গহনা তোমার আছে ভাই?

যোগমায়া গহনার নাম করিল, শুনিতে শুনিতে কালীতারার চোখমুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

তোমার বাপেরা বুঝি খুব বড় লোক?

যোগমায়া হাসিয়া বলিল, না ভাই, গেরস্ত মানুষ—শিষ্যি-সেবক আছে, চাকরি-বাকরি করতে হয় না।

তাই বল! চাকরি—ঐ শুনতেই বেশ—মাস গেলে বাঁধা মাইনে, কিন্তু ভাই সে টাকা হাতে মাখতে কুলোয় না। আমার ইচ্ছে ছিল, খোকার গলায় সোনার হাঁসুলি দেই এক গাছা, পেরে উঠলাম কই! দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। আজ আসি ভাই, উনি আপিস থেকে আসবেন, জলখাবার দিতে হবে।

উঠানের এক পাশে এক বোঝা ঘুঁটে পড়িয়া আছে দেখিয়া বলিল, ঘসি দিল কে ভাই? কেষ্টর মা বুঝি?

হাঁ।

কি দর নিলে? এক ঝুড়ি এক পয়সা ত? ফাউ দিয়েছে? দেয়নি? ও-ই মাগির দোষ। না বললে ধর্ম্ম ভেবে কোন কাজ করে না। এবার এলে বলবে, ফাউ দেও। তা আট-দশখানা ঘসি দেবে'খন। আর সাবধান—যখন ঘসি দিতে আসবে—দাঁড়িয়ে থাকবে সামনে। মাগির আবার হাতটান আছে।

যোগমায়া বলিল, তাই নাকি?

হাঁ—ভাই। প্রথম প্রথম আমি ত জানতাম না। শীতকাল, ঘসি দিয়ে বসে রইল উঠোনে। বললে, বেশ রোদ তোমাদের উঠোনে মা-ঠাকরুণ, বুড়ো মানুষ—ফুলে পড়েছি—একটু রোদ পুইয়ে নিই।

ভাবলাম, আহা—পোয়াক রোদ। ওমা, চলে গেলে দেখি—কুয়োতলায় ফুটো ঘটিটা নেই। নিস্তার পিসি বেড়াতে এসে বললেন, ওই কেষ্টার মা'র কাজ—বুড়ির হাতটান আছে।

কোন দিন দুপুর বেলায় রন্ধনের গল্প হয়, কোন দিন বা স্বামীর গুণাগুণ। এবং তার সঙ্গে মান অভিমানের কথা। প্রতিদিনকার গল্পের বিষয়বস্তু অভিন্ন, তবু পুনরাবৃত্তিতে দু'টি তরুণীর ক্লান্তিবোধ করে না। কালীতারার অভিজ্ঞতায়—যোগমায়াও বাহিরের দরদস্তুর—কেনাবেচা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে থাকে। অনেক জিনিসের দরও তার জানা হইয়া গিয়াছে।

যে দিন কালীতারা আসে না—সে দিনও সময়

কাটাইবার পন্থা সে আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। বসিয়া বসিয়া কোন দিন সুপারি কুচায়, কোন দিন মুগ ভাঙিয়া ডাল তৈয়ারী করে, কোন দিন বা উঠানের পালং শাকের ক্ষেতে একটি একটি করিয়া ঘাস তুলিতে থাকে। যে বেগুন গাছটা দুয়ারের ধারে হেলিয়াছে—ছোট একখানি বাখারি পুঁতিয়া সেটিকে সোজা করিয়া বাঁধিয়া দেয়। প্রদীপের জন্য সলিতা পাকায়। কিছু না থাকিলে বসিয়া বসিয়া কতকগুলি ছেঁড়া কাপড় লইয়া কাঁথা সেলাই করে। কালীতারার কাছে সম্প্রতি সে কাঁথা সেলাই শিখিতেছে।

সন্ধ্যা বেলায় দুয়ারের চৌকাঠে জলধারা দিয়া—শাঁক বাজাইয়া ও তুলসীতলায় প্রদীপ দেখাইয়া গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করে। প্রণাম করে আর বলে, হে ভগবান—সব্বাইকে ভাল রেখো। হে হরি, সবাইয়ের মঙ্গল করো। প্রার্থনার সময় তাহার চিত্ত এমন একাগ্র হইয়া যায় যে, এক এক দিন আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিয়া তবে সে প্রদীপ তুলিয়া লইতে পারে। ঘরে বসিয়া সেদিন খানিকক্ষণ সে ভারি তৃপ্তিবোধ করে।

সন্ধ্যার পর ও-বাড়ী হইতে কালীকাতার সুমিষ্ট অথচ ঈষৎ উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা যায়। ছেলেকে সে তখন ঘুম পাড়াইতেছে :

আয়রে চাঁদা, বাছুর বাঁধা, দুয়োরে বাঁধা হাতী,
চোখ ঢুলু ঢুলু কপ নি পরা দেখরে সোমের বাতি।

কখনো বলে :

ধান ভানলে কুড়ো দেব,
মাছ কুটলে মুড়ো দেব,
গাই বিয়োলে বাছুর দেব,
আয়রে চাঁদ আয়—
চাঁদের কপালে মোর—
টি—দিয়ে যা।

টি শব্দটির দীর্ঘ উচ্চারণে যোগমায়ার অন্তর পর্য্যন্ত দুলিয়া উঠে। কি চমৎকার সুরে কালীতারা ওটির দীর্ঘ উচ্চারণ করে।

রোদ পড়িয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তালগাছের বাবুই পাখীগুলি বাসায় ফিরিয়া আসে, ডুমুর গাছের ঝোপে ঝোপে ছাতারেগুলি কিচিরমিচির করিয়া উঠে, তালচোঁচ পাখীরা এক অদ্ভুত শব্দ করিতে থাকে। কিন্তু সে যতক্ষণ সন্ধ্যা না হয়। সকালে যাহারা ছেলেমেয়ে-স্বামীস্ত্রী-আত্মীয়স্বজন-বন্ধুপ্রতিবেশী মিলিয়া আহার অন্বেষণে দিগ্ দিগন্তরে চলিয়া যায়—সন্ধ্যা ঘনাইবার পূর্ব্বে তাহারা দ্রুত-বেগে ফিরিয়া আসে নিজেদের বাসায়। এবং সারাদিনকার অদর্শনের পর আত্মীয় বন্ধু প্রিয়-পরিচিত কে আসিল—কে বা আসিল না—তাহারই খবর হয়ত কিচির-মিচির দুর্ব্বোধ্য ভাষায় লইয়া থাকে। উহাদের এই আসাযাওয়ার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা যোগমায়ার মনে করুণ রাগিনীতে ঝঙ্কার তোলে। পাখীরা কেমন সুখী। রোজ সন্ধ্যায় সকলে সকলকে দেখিতে পায়—মা, বাবা, ভাই, স্বামী, শাশুড়ী—সবাইকে। সকলে এক সঙ্গে মিলিয়া আনন্দ করে, আর মানুষ? কোথায় যোগমায়া পড়িয়া আছে, কোথায় তার শ্বশুরগৃহ—কোথায় বা পিত্রালয়, কতযোজন দূরে—মানুষের মনের উদ্বেগ—আকাঙ্ক্ষা—আশা—আনন্দগুলি ছড়াইয়া আছে। দূর প্রবাসে স্বামীর অবিচ্ছিন্ন সঙ্গ পাইয়াও—যোগমায়ার মন কাঁদে বই কি। স্বামীকে লইয়া পরিপূর্ণ আনন্দ ভোগ করা যায়—কিন্তু সেই আনন্দকে পরিপূর্ণতর করিবার একমাত্র আশ্রয়স্থল সংসার। সেখানকার দুঃখ-সুখ, সংঘাত-বেদনা, উৎসব-আনন্দ—হাসি-কান্নার মিলিত ফলেই সংসার-বৃক্ষ ফলবান্ ও সুন্দর। দূর প্রবাসে—বিচ্ছিন্নভাবে—স্বামীসঙ্গ লাভ করিয়া অন্তত যোগমায়া তাই ভাবে।

সন্ধ্যার পর রামচন্দ্রের অখণ্ড অবসর। খানিক গল্প করিয়া যোগমায়া রাঁধিতে যায়; রামচন্দ্রও যায় সঙ্গে সঙ্গে। একখানি পিঁড়ি পাতিয়া রান্নাঘরে বসিয়াই সে যোগমায়ার সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দেয়। একদিন মাছের ঝোল রাঁধিয়া সে যোগমায়াকে খাওয়াইয়াছে।

সেদিনের কথা মনে পড়িলে এখনও যোগমায়ার হাসি পায়। ঝালের খানিকটা সরিষা বাটনা দিয়া যে চমৎকার ঝোল সেদিন রাঁধিয়াছিল রামচন্দ্র। নুন দিতেই ভুলিয়া গিয়াছিল। বাটির ঝোলে এক খামচা নুন দিয়া তবে সে ঝোল যোগমায়া মুখে তুলিতে পারে।

অত অল্পদিনেই যোগমায়া কিন্তু অনেক রকম রান্না শিখিয়া ফেলিয়াছে। এ বিদ্যাটা যেন যোগমায়ার জন্মগত। নুন ঝাল বা মশলা এখন সব তরকারিতেই সমান হয়। মাংস রাঁধিবার দিন অল্প গরম ঝোল বাটিতে তুলিয়া জুড়াইয়া সে রামচন্দ্রকে বলে, একবার হাত পাত তো?

রামচন্দ্র বলে, ভাল চাখনদার পেয়েছে আমার জান, চাখনদারের মাইনে দিতে হয়।

যোগমায়া বলে, সে যারা ভাল চাখিয়ে। তোমার এখনও মুখ—নুন ঝাল বোঝবার ক্ষমতা নেই। সেদিন নুন না-দেওয়া মাছের ঝোল সোনাহেন মুখ করে খেয়ে গেলে, কিছুই বললে না।

বাঃ রে, সে যে আমার রান্না! তোমারই সাক্ষাতে তোমার রান্নার নিন্দে করব আমি! বেশ!

নাও, দেখ দেখি নুন ঝাল ঠিক হ'লো কিনা?

ঝোল খাইয়া রামচন্দ্র বলে, ঠিক বুঝতে পারলাম না। একখানা মাংস দেও বরঞ্চ।

মাংস খাইয়াও রামচন্দ্র উচ্চবাচ্য করে না। যোগমায়া অধীর হইয়া বলে, কি গো, কেমন লাগলো?

ফার্ষ্ট ক্লাস। ঘটক মশায় রোজ এসে বউয়ের মাংস রান্নার সুখ্যাতি করেন, আমার ইচ্ছে হ'চ্ছে এক বাটি পাঠিয়ে দিই ওঁদের বাড়ীতে।

যাও, তোমার সবতাতেই ঠাট্টা।

নাগো, ঠাট্টা নয়। আচ্ছা, তুমি না হয় চেখে দেখ।

আচ্ছা, আচ্ছা, দেখব'খন। তা কালীদিদিকে দেব এক বাটি পাঠিয়ে।

নিশ্চয়—গুরুদক্ষিণা আগে দেবে, না হলে কার্য্যসিদ্ধি ঘটে না।

কালীদিদি বুঝি আমার গুরু?

মাংস রান্নার গুরু নয়?

ও, তাই বল। হাসিয়া যোগমায়া বলে, শুনেছি দিদি নাকি ভাল মাংস রাঁধেন। বামুন হ'লে একদিন খেয়ে দেখ্‌তাম।

নাইবা হ'লেন বামুন—বাসায় ওসব দোষ নেই।

চোখ বড় বড় করিয়া যোগমায়া বলে, বল কি গো। মা শুনলে রক্ষে রাখবেন!

মা শুনবেন কি করে? তিনি কি আর এখানে এসে পাহারা দিচ্ছেন।

মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া যোগমায়া বলে, যাই বল, আচার-বিচার করা ভাল। তা ওঁরা যদি মাংস পাঠিয়ে দেন—তুমি খেতে পার?

স্বচ্ছন্দে। রামচন্দ্র হাসিতে লাগিল। যোগমায়া ভাত হইয়াছে কিনা দেখিবার জন্য উনানের কাছে পিঁড়ি টানিয়া সরিয়া গেল।

রামচন্দ্র বলিল, আমাকে ছুঁলেও জাত যাবে নাকি—এমন ভাবে সরে গেলে!

আপিসের কাপড়ে তুমি বসেছ—হেঁসেল ছোঁয়াছুঁয়ি কি ভাল?

না, যা দেখছি তোমার মাথাটি বেশ করে খেয়ে গেছেন। এখন থেকে শুচিবাইগির ঢুকলে···এই ছুঁয়ে দিলাম কিন্তু।

না, না, করিতে করিতে রামচন্দ্র সত্যই ছুঁইয়া দেয়। সে স্পর্শ যোগমায়ার মন্দ লাগে না, কৌতুক-আনন্দে মনটা বেশ সরস থাকে। কিন্তু মনের তলায় অল্প খুঁত-খুঁতানির ধোঁয়াও উঠিতে থাকে। হেঁসেল না ছুঁইয়া কি কৌতুক করা যায় না!

ক্রমে নূতনত্বের মোহ কাটিয়া যায়। রামচন্দ্র যখন তখন আর হেঁসেলে আসিয়া বসে না। যোগমায়াও তাহাকে ডাকে না। আপিসের অনেক খাতা'পত্র ফাইল লইয়া—লণ্ঠন জ্বালিয়া বড় ঘরটায় রামচন্দ্র কাজ করিতে থাকে। যোগমায়া আপন মনে রাঁধিতে থাকে। রান্না হইলে এ-ঘরে আসিয়া ডাকে, এখন খাবে?

হাঁ, রাত ক'টা বেজেছে?

যোগমায়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকে। রামচন্দ্র বলে, পকেট-ঘড়িটা দেখ না একবার।

যোগমায়া মৃদু স্বরে শুষ্ক মুখে বলে, আমি তো ঘড়ি দেখতে জানি না।

জান না! খানিক যোগমায়ার পানে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রামচন্দ্র বলে, আন তো ঘড়িটা —আমার ওয়েষ্ট কোটের পকেট থেকে। আজ তোমায় ঘড়ি-দেখা না শিখিয়ে ভাত খাব না।

যোগমায়া ঘড়ি লইয়া আসিলে রামচন্দ্র বলে, বোস। এই যে দেখ—ঘড়িতে বারটা ঘর আছে এক, দুই—

কিন্তু রোম্যান ফিগার যোগমায়া বুঝিতে পারে না। পাঁচ মিনিট অন্তর এক একটি দাগ, এবং বারটি দাগে মিলিয়ে মোট ষাটটি মিনিটে একটি করিয়া ঘণ্টা হয়। এ বড় আশ্চর্য্য ও দুরূহ তথ্য! ছোট কাঁটা কত কম চলে—আর বড় কাঁটাটি চলে দ্রুত। বড়টা সব ঘরগুলি প্রদক্ষিণ করিয়া উপরের ঐ বারোটার ঘরে আসিলেই—তবে নাকি ঘণ্টা হয়। তথ্য দুরূহ নহে তো কি? ছোট কাঁটা যেখানে থাকিবে—সেইখানেই ক'টা বাজিল বুঝিতে হইবে।

কিন্তু রোম্যান ফিগারগুলিই তো গোলক-ধাঁধা। চার পর্য্যন্ত দাগ গুণিয়া না হয় বোঝা গেল। পাঁচে আসিয়াই মাথা গুলাইয়া যায়। থিয়োরী-অব-রিলেটিভিটির যুগে এই তথ্য হাস্যকর হইতে পারে—কিন্তু ঘড়ির সময়-দেখার যুগও এমনি সঙ্কট-জনক ভাবে একদিন উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

রান্না ঘরে ঢুকুঢাক শব্দ হইতেই যোগমায়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল, ওই যাঃ, বেড়ালে বুঝি মাছ খেয়ে গেল।

অগত্যা হতাশ রামচন্দ্রও খাতাপত্র গুছাইয়া যোগমায়ার অনুসরণ করিল।

৬

এক দিন রামচন্দ্র বড় গোল বাধাইল। বৈকালে লক্ষ্মণ আসিয়া দোরগোড়ায় একটা গামছা বাঁধা পুঁটুলি ও ছোট একটা মাটির ভাঁড় নামাইয়া দিয়া বলিল, মাংস পাঠিয়ে দিলেন বাবু, রাত্তিরে চারজন বাবু খাবেন।

শুনিয়া যোগমায়ার হাত-পা আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। দুপুর হইলেও বা কথা ছিল! কালী-দিদিকে ডাকিয়া মাংস রান্নার একটা ব্যবস্থা করা যাইত। একজন নয়, দুইজন নয়—একেবারে চারজনকে নিমন্ত্রণ। জানি না, রামচন্দ্র কি মনে করিয়াছে? যোগমায়াকে পাঁচজনের সামনে অপ্রস্তুত করাই বোধ করি তার ইচ্ছা। ভাঁড়ের দই ঢাকিয়া রাখিয়া গামছা খুলিল যোগমায়া। বড় আধখানা মানকচুর পাতায় এক পাতা মাংস—সের তিন-চার হইবে হয়ত। গামছার আর এক-প্রান্তে একরাশি পিঁয়াজ ও আদা। এই এত মাংস রাঁধিতে বাটনাও ত চাই এক এক তাল। ধনে, হলুদ, জিরেমরিচ, আদা, পেঁয়াজ, গরম মশলা, লঙ্কা। এত মাংস যোগমায়া কোনদিন রাঁধে নাই। নুনের আন্দাজ ঠিক হইলেই না রক্ষা! না, রামচন্দ্রের কোন হিসাবজ্ঞান নাই, এমন বিপদে ফেলিবার কি দরকার?

কোমরে আঁচল জড়াইয়া যোগমায়া বাটনা বাটীতে লাগিয়া গেল। সে কাজ শেষ হইতেই সন্ধ্যা আসিল সঙ্গে সঙ্গে অপিস বন্ধ করিয়া রামচন্দ্র ভিতরে আসিয়া বলিল, তোমার একটু কষ্ট হবে, মায়া। কিন্তু ওরা রোজ যে ক'রে বলে, একদিন বোয়ের হাতে মাংস খাওয়াও—মাংস খাওয়াও—। আজ বললাম, আচ্ছা নেমতন্ন রইল।

যোগমায়া আঁচলের আড়ালে প্রদীপ ঢাকিয়া তুলসীতলায় যাইতে যাইতে বলিল, ওঁরা কি ক'রে জানলেন যে, আমি ভাল মাংস রাঁধতে পারি? তুমিই বলেছ নিশ্চয়।

হাসিতে হাসিতে রামচন্দ্র বলিল, তা সেদিনকার মাংস যা চমৎকার হয়েছিল! গল্প করেছিলাম কি না।

যোগমায়া বলিল, তোমাদের পোষ্টাপিসে মাংস রান্না আর বোয়ের গল্প হয় খালি, নয়?

রামচন্দ্র বলিল, তা হয় বৈকি। যারা মাংস খায় আর যাদের বউ আছে, তারা সেই সব গল্প করতেই ভালবাসে।

যাও। এখন আমি কি করি বল ত! তোমার মাংস রাঁধি, না লুচি বেলি—না লুচি ভাজি।

লুচি বেলে দেব'খন।

থাক্, তুমি যা রাঁধুনি—তা মাছের ঝোলে—

না গো, না, জগন্নাথ-মূর্তি দেখে বিশ্বকর্মাকে মন্দ কারিগর ঠাউরো না। লুচি বেলে আজ সে কলঙ্ক ভঞ্জন করব।

বেশ।

কিন্তু রামচন্দ্রের সাহায্য যোগমায়াকে লইতেই হইল। না লইলে উপায়ই বা কি। ময়দা টানিয়া লেচি কাটিয়া দিল রামচন্দ্র। লুচি বেলার একটা কৌশল আছে, বেলনের চাপে লুচি চাকির উপর আপনি গোল হইয়া উঠিবে। রামচন্দ্র একখানা লুচি বেলিতে গিয়া চাকিতে এমন চ্যাপ্টাইয়া গেল যে, নখ দিয়া চাঁচিয়া তবে চাকি পরিষ্কার করিতে হইল। আর একখানা আট কোণ মেলিয়া না পরোটা, না লুচি হইয়া যোগমায়ার হাস্যকৌতুক বৃদ্ধি করিল শুধু। এবং হাসিতে হাসিতেই যোগমায়া তাহার হাত হইতে বেলন কাড়িয়া লইয়া বলিল, তুমি বরং ওঘরে আসন-টাসন পেতে রাখ গে।

এমন সময় লক্ষ্মণ আসিয়া ডাকিল, মাষ্টারমশায়, হারমোনিয়ম নিয়ে এলাম, বাঁয়া তবলা আনতে গেল ভুবন। কোথায় রাখি বলুন?

যোগমায়া বলিল, বাড়ীর মধ্যে গান বসিও না যেন।

রামচন্দ্র বলিল, পোষ্টাপিসের মধ্যে শতরঞ্জি পেতে দে। দুটো তাকিয়া বালিশ—আর এক ডাবর পানও রেখে আয় ওখানে। আর দেখ—তামাক টিকে সব ঠিক আছে কিনা?

বাড়ীর ভিতরে আসন ও গ্লাস পাতিয়া ব্যবস্থা করিল রামচন্দ্র, বাহিরে শতরঞ্জি বিছাইয়া আসর বসাইল লক্ষ্মণ। হৈ হৈ করিতে করিতে নিমন্ত্রিতেরা আসিয়া পড়িলেন। রামচন্দ্র ছুটিয়া ওধারে গেল। খানিক পরে হারমোনিয়মের সুর ও তবলার চাঁটির

আওয়াজ পাইয়া যোগমায়া কান খাড়া করিয়া রাখিল ওদিকে। এখনই গান আরম্ভ হইবে।

তখন মাংস ফুটিতেছে, লুচি পরে ভাজিলেই হইবে। আর সমস্ত ভাজা, ডাল, চাটুনি, তরকারি নামিয়া গিয়াছে। রান্নাঘরের জানালা দুয়ার বন্ধ করিয়া যোগমায়া অতি সন্তর্পণে পোষ্টাপিসের সংযোগস্থল সেই দুয়ারগোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। একজন বাজর্খাই গলায় এমন গান ধরিয়াছে! দুয়ারের ফাঁক হইতে যোগমায়া দেখিল, মাথা নাড়িয়া, সারা দেহ দোলাইয়া—এ-ধার হইতে ও-ধারে হেলিয়া রামচন্দ্র তবলায় চাঁটি মারিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মুখ হইতে বাহির হইতেছে, বাঃ, বেশ—সাবাস্!

কি সে অঙ্গভঙ্গি! অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া যোগমায়া গান শুনিতে লাগিল। কোঁকড়া চুল—ফরসাগোছের একটি ছোকরা একধারে বসিয়াছিল, এইবার বাজর্খেয়ে গলার লোকটি হারমোনিয়ম তাহার দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, এইবার শ্যামাপদর একখানা হোক।

শ্যামাপদ ছোকরাটি লাজুক। মাথা নীচু করিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, বিপিনদার হোক—বলাইদার হোক—তারপর আমি। আমার গান শুনলে কি আর ভাল লাগবে আপনাদের?

গোলগাল বেঁটে একটি লোক—তাকিয়ার উপর ভর দিয়া প্রায় শুইয়াছিল। এইবার সে সোজা হইয়া বসিয়া হাস্যতরল কণ্ঠে বলিল, বিলক্ষণ! চাঁদের কাছে জোনাকি! বলে হিল্লী দিল্লী লাহোর মেরে এসে—শ্যামাপদ এখন বিপিনদা, বলাইদাকে দিচ্ছ ঠেকিয়ে? হারমোনিয়ম প্যাঁ পোঁ করলেই যদি গাইয়ে হওয়া যেত—হা—হা—

যোগমায়ার মনে হইতেছিল, দুইটি তাকিয়া ওদিকটায় উপরি উপরি কে রাখিয়া দিয়াছে বুঝি! কিন্তু তাকিয়া হঠাৎ হাসির ধমকে বেশী রকমেই নড়িয়া উঠাতে সে অবাক্ হইয়া গেল।

শ্যামাপদই গান ধরিল। মিথ্যা বলে নাই তাকিয়া। কি মিষ্ট—সরু গলা। পুরুষের যে এমন সুন্দর গলা হয়—যোগমায়ার ধারণা ছিল না। গান থামিলেও সে তন্ময় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সঙ্গত ফেলিয়া রামচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, বিপিনবাবু, আপনি একটু ঠেকা দিন ততক্ষণ—আমি দেখে আসি ওদিকের কতদূর।

সাঁ করিয়া সরিয়া গেল যোগমায়া। তাড়াতাড়ি খুন্তি দিয়া একখানা মাংস তুলিয়া দেখিল, হাড় হইতে মাংস ছাড়িয়া আসিতেছে। দুই কোয়া রশুন ঘিয়ে ভাজিয়া মাংসটা সাঁতলাইয়া লইতে পারিলেই—

কি গো, কত দূর? রামচন্দ্র আসিয়া দুয়ারে দাঁড়াইল।

এই মাংস সাঁতলেই—লুচি ভাজি।

বেশ বেশ, আর কিছু—

হাঁ গা, গাইছেন উনি কে? বেশ গলাটি।

ওর নাম শ্যামাপদ ঘোষাল। কলকাতার সখের থিয়েটারে গান গায়—ভারি চমৎকার গায়। ওই যে মিত্তির—মোটা মত—বেঁটে মত—ওই ধারে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসেছিল, ওরা এখানকার বড়লোক কি না, নাম বিপিন—ওরই বাড়ীতে এসে উঠেছে। এখানকার সখের থিয়েটারে পার্ট করবে ব'লে। বিপিনবাবুই ত বললে শুধু যাওয়া আর নেমন্তন্ন খাওয়া—কেমন যেন দেখায় মাষ্টার, একটু গান বাজনার আয়োজন কর। তাই ওকেও বললাম।

আর দু'জন কে আছেন?

একজন বলাইবাবু, মানে—ওই পোষ্টাপিসের সামনের বাঁড়ুজ্জে বাড়ীর। বড় কন্ট্রাক্টার ও। বেশ রোজগার করে। আর একজন রমেশবাবু—আমার কেরাণী গো।

তুমি কিন্তু ওঁদের সঙ্গে খেতে বসো না যেন, পরিবেশন করবে।

তা জানি। তোমায় ও কঠিন কাজটা করতে হবে না।

আহারের ডাক পড়িতে সকলে গল্প করিতে করিতে বাড়ীর মধ্যে আসিলেন। পাতে লুচি ও পটোল ভাজা দেওয়া হইয়াছে। মুগের ডালও দেওয়া হইল। তার পর আলুর দম ও মাংস। উঁহাদের খাওয়া যতই অগ্রসর হইতে লাগিল—যোগমায়ার বুকের গোড়ায় ততই ঢিপ-ঢিপ করিতে লাগিল। রামচন্দ্র বার তিনেক চাখিয়া মাংসের সুখ্যাতি করিয়াছে, যোগমায়াও গোপনে একবার চাখিয়া বিশেষ খুঁত ধরিতে পারে নাই। কিন্তু সকলের রুচি ত সমান নহে। কেহ বেশী মিষ্ট খায়, কেহ চড়া ঝাল ভালবাসে। আর মাংসই যদি খারাপ হয় ত সারা কুষ্টিয়া শহরে তাহার আর লজ্জা রাখিবার ঠাঁই থাকিবে না। এমনও অকর্ম্মা বউ পোষ্টমাষ্টারের!

স্বামী ওঘরে রহিয়াছেন, উঁহারাও হাসি গল্প থামাইয়া আহার করিয়া চলিয়াছেন। কাণ

পাতিয়া যোগমায়া মাংসের হাড় চিবাইবার কুড়মুড় শব্দ পর্য্যন্ত শুনিতে পাইল, একটুও প্রশংসা-ধ্বনি কিন্তু শোনা গেল না। নিজের অক্ষমতার জন্য যোগমায়ার কষ্ট বোধ হইতে লাগিল।

এমন সময় রামচন্দ্র খালি জামবাটি হাতে বাহির হইয়া আসিল। যোগমায়া ততক্ষণে দাওয়া হইতে নামিয়া রান্নাঘরের মধ্যে গিয়া বসিয়াছে।

বাটি নামাইয়া রামচন্দ্র বলিল, আর একটু মাংস দেও ত।

যোগমায়া অস্ফুট স্বরে বলিল, ভাল হয়নি বুঝি?

হাঁ, তাই ত ওঁরা আর একটু চাইলেন। মাংস লইয়া সে অগ্রসর হইতেছিল—যোগমায়া খপ্ করিয়া তাহার জামার পিছন দিকটা চাপিয়া ধরিয়া করুণ কণ্ঠে কহিল, সত্যি বল না?

রামচন্দ্র হাসিয়া বলিল, খারাপ হ'লে কেউ আবার চেয়ে নেয়? নাঃ, তুমি ভারি বোকা। খুব ভাল হয়েছে। একটু সরিয়া আসিয়া গলা নামাইয়া বলিল, এত ভাল হয়েছে যে ওদের বউরা সব হেরে গেল আজ।

অবশ্য রান্না উৎরাইবার একমাত্র হেতু যোগমায়ার রন্ধন-নৈপুণ্য নহে—হরিঠাকুর না যোগমায়ার কাতর প্রার্থনা শুনিয়া রান্নাটিকে ভাল ভাবে উৎরাইয়া দিয়াছেন।

প্রশংসার ধ্বনি যোগমায়ার বুকে বড় বিপ্লবই তুলিল। পা যেন তার আর মাটিতে ঠেকে না, মন কোথায় উড়িয়া বেড়াইতেছে।

উঁহারা যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, যাত্রা-গানের আসর হ'লে বউদিকে একখানা সোনার মেডেল দিয়ে যেতাম, মাষ্টার। চমৎকার রাঁধেন উনি।

রামচন্দ্র আসিয়া বলিল, শুনলে? আর অ-চাকিয়ে বলে করবে আমায় ঠাট্টা?

যোগমায়া বলিল, আর আমি বুঝি চাকি নি মাংস?

ও হরি, আমার আগে পেসাদ করে বসে আছ! দাঁড়াও, মাকে চিঠি লিখছি।

লেখ না, রাঁধতে রাঁধতে সবাই অমন চেখে থাকে। না চাখলে কেউ রান্না শিখতে পারে নাকি?

বটে! রান্না শেখার প্রধান গুণ হচ্ছে চুরিবিদ্যা! তা কি ক'রে জানব বল।

এস, খাবে এস।

আমি কিন্তু ভাজাভুজি কিছু খাব না, শুধু মাংস।

মাংস তো বেশী নেই। কালীদিদির জন্যে এক বাটি রেখেছিলাম—তাও শেষ হয়ে গেল।

বল কি! চার সের মাংস চার জনে উড়িয়ে দিলে! উঃ, খাইয়ে বটে।

যোগমায়া বলিল, যারা গিন্নী তাদের ভাগ্যে এমনই হয়। নাও, বস।

রামচন্দ্র বলিল, তুমিও বস, রাত অনেক হয়েছে।

তা হোক্। তোমার পাতে খেয়ে একেবারে হেঁসেল তুলে তবে ওঘরে যাব।

তবে মাংস আরও খানিকটা উঠিয়ে রাখ। নিজে রেঁধে নিজে একটুও চাখবে না বুঝি?

চাখি নি বুঝি? আঃ, আবার তুলছো কেন? ওই বাটিতেই থাক, আমি খাব'খন।

যোগমায়া যখন হেঁসেলপাট তুলিয়া এঘরে আসিল, তখন পোষ্টাপিসের ঘড়িটায় টং টং করিয়া দুইটা বাজিল।

দিন দুই পরে রামচন্দ্রের নিমন্ত্রণ হইল বিপিনবাবুর বাড়ী। সন্ধ্যার পরেই রামচন্দ্র বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় বলিল, ফিরতে রাত হবে একটু, গান বাজনা আছে। পোষ্টাপিসের বাইরের বারান্দায় ভুবন রোজ শুয়ে থাকে—আজও থাকবে। যদি ভয় করে—

যোগমায়া কহিল, তুমি যাও।

তবে না হয় ঘরে খিল লাগিয়ে শোও, আমি ডাকলে দুয়োর খুলে দিও। তিনবার না ডাকলে যেন খুলো না দুয়ার।

তিনবার ডাকবে কেন?

মানে আছে, এসে বলবো।

ঘরে আলোই জলুক—আর খিল আঁটাই থাক—ভয়-ভয় করে না বুঝি? ষ্টেশনের আদালত-প্রাঙ্গণের ঝাউগাছগুলির শোঁ-শোঁ শব্দ ওখান হইতে স্পষ্ট শোনা যায়। মাঠের ওপারে বার দুই শেয়াল ডাকিয়া উঠিল, ডুমুর গাছে পাখীর ডানা ঝাপ্টানির শব্দও কয়েকবার শোনা গেল। আর শোনা যায়—লক্ষ্মী-পেঁচার কর্কশ আওয়াজ। আজ মাসখানেক হইতে একটা পেঁচা আসিয়া পোষ্ট আপিসের কার্ণিসের উপর বসিয়া সারারাত ডাকিতে থাকে। ঘুমের ঘোরে সে ডাক শুনিলে—কচি ছেলের চাপা কান্নার মত শুনায়। লক্ষ্মী-পেঁচা নাকি ভাল, তাই ওটিকে কেহ তাড়ায় না।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, চারিদিকে জ্যোৎস্না। গ্রীষ্মকালের জ্যোৎস্নার একটা ভুবন-ভুলানো রূপ

আছে। উঠানে দাঁড়াইয়া কিংবা খোলা জানালা দিয়া সে রূপ দেখিলে যে-কেহ মোহিত হইয়া যায়। চাঁদের কাছ বরাবর দু'টি পাখী একই সময়ে ঘুরিতে থাকে। না কি—চখাচখি। চাঁদের সুধা পান করিয়াই উহারা জীবন ধারণ করে। যোগমায়া জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল। গরম হইলেও হাতপাখা রহিয়াছে তো। ডুমুর গাছের তলাটায় যা অন্ধকার। বিরলপত্রের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নারেখা গাছতলায় পড়িয়াছে—পিসিমা যেন লক্ষ্মীপূজার আল্পনা দিয়াছেন উঠানে। কিন্তু শুধু আল্পনা দেওয়ার কথা নয়, হঠাৎ ওদিকে চাহিলে মনে হয়—সাদা থান কাপড় পরিয়া কে যেন ডুমুর তলায় দাঁড়াইয়া আছে। এবং এই জানালার পানেই সে তাকাইয়া আছে।

ঘরের আলোটায় দম দিয়া যোগমায়া কাঁথা সেলাই করিতে বসিল। এবং সেলাই করিতে করিতেই খাটের পায়ায় ঠেস দিয়া এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

খটাখট কড়া নাড়ার শব্দে যোগমায়ার ঘুম ভাঙিল।

রামচন্দ্র বলিয়া গিয়াছে—তিনবার না ডাকিলে যেন দুয়ার না খোলে। কিন্তু এ ঘর হইতে বাহির হইতে যোগমায়ার যতখানি সময় গেল, তাহারই মধ্যে রামচন্দ্র অন্তত বার আষ্টেক ডাকাডাকি করিল। খুব জোরে নহে, খুব আস্তেও নহে।

ওগো শুনছ? ওগো দুয়োর খোল। মায়া—মায়া—

যোগমায়া দুয়ার খুলিলে রামচন্দ্র বলিল, ডেকে ডেকে গলা ভাঙবার জো—আচ্ছা ঘুম যা হোক।

অপ্রতিভের হাসি হাসিল যোগমায়া।

একটু রাত হয়ে গেল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্যামাপদ গেয়েই চলেছে—ক্লান্তি নেই। খানিক পার্টও বললে। কলকাতায় নতুন থিয়েটার খুলেছে, লীলাবতী না কি পালা—শ্যামাপদ চমৎকার পার্টও বলে।

হাত-পা ধুইয়া বলিল, তুমি খাওনি? আরে একি, সব দুয়োর-জানলা বন্ধ যে! ভয় করছিল বুঝি!

যোগমায়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, অজানা জায়গা, যদি চোর আসে?

জানলার গরাদে গ'লে চোর আসবে! টাকাকড়ি নয়, তা হ'লে সে যদি তোমাকেই চুরি করত, মায়া? ভাগ্যিস জানালা বন্ধ ছিল!

ঘুমচোখে রামচন্দ্রের পরিহাস যোগমায়া ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। খাটের মশারিটা ফেলিতে ফেলিতে বলিল, রাত হয়েছে, শোও।

তুমি খেয়ে নিয়েছ তো? নাও নি? সে কি!

না, আমার ভাল খিদে নেই। ওবেলার জল-দেওয়া ভাত আছে, মাছ ভাজা আছে—

তাড়াতাড়ি জামার পকেটে হাত দিয়া রামচন্দ্র বলিল, দাঁড়াও, দাঁড়াও—তোমার জন্যে একটা ভাল জিনিষ এনেছি। ইস্, পকেটে চেপ্টে রস লেগে গেছে। কাল জামাটায় একটু সাবান দিয়ে দিয়ো তো।

ওটা কি?

নারকুলে সন্দেশ নয়—ছানার ভাল সন্দেশ। কলকাতার এক কারিগর এসেছে, মিত্তিরদের জন্যে তৈরি করলে আজ।

তা পকেটে কি ব'লে আনলে? লজ্জা করল না তোমার?

লজ্জা করলো বলেই তো পকেটে পুরে আনলাম। মিত্তির ও ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে এক জোড়া সন্দেশ আমার হাতে দিয়ে বললে, নতুন জিনিষ বউদিদির জন্যে নিয়ে যাও। পাছে আর কেউ দেখে বলেই তো পকেটে পুরলাম।

ছঁদা বেঁধেছ বল।

তা বামুন মানুষ—ছাঁদা বাঁধায় আমাদের লজ্জা নেই।

দুটো আমি খাব না, কাল একটা তুমি জলখাবার খেয়ো বিকেলে।

এক পেট সন্দেশ খেয়েছি, ওটুকু যদি তুমি না খাও তো সত্যি বলছি তোমার সঙ্গে আড়ি দেব, কথাই কইব না।

স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া যোগমায়ার চোখ দু'টিতে আবেশ ঘনাইয়া উঠিল। এত ভালবাসে রামচন্দ্র তাহাকে!

৭

রামচন্দ্রের সান্ধ্যভ্রমণ প্রাত্যহিক হইয়া দাঁড়াইল। মিত্র-পরিবার কুষ্টিয়ার মধ্যে ধনে ও মানে বিখ্যাত। বিপিনবাবু সেই বংশের বড় সরিক; যেমন আমুদে লোক, তেমনই দরাজ হাত। পাঁচ জনকে লইয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতে ও খাওয়াইতে তিনি পটু। রাত্রির খাওয়াটা রামচন্দ্র প্রায়ই ওখান হইতে সারিয়া আসে। যোগমায়ার

রুটি তরকারি প্রায়ই নষ্ট হয়। ঘুঁটে বেচিতে আসিয়া একদিন কেষ্টর মা বাসি তরকারি খাইয়া পরদিন বলিয়াছিল, আহ' তোমাদের আন্না অমত্ত মা-ঠাক্রোণ। কত তেল—ঘি—মশলা দিয়ে আঁধ। আর আমাদের? জল-আছড়ানো আন্না খেয়ে অরুচি ধরে গেছে। কাল তোমার হাতে অমত্ত খেলাম, আহা কত দিনের অরুচি মুখ যেন জুড়িয়ে গেল। আহা!

কথার সঙ্গে কেষ্টর মা অনবরত জিহ্বা ও তালুর সংযোগে চুক্চুক্ শব্দ করিয়া নিজের দুর্ভাগ্য কি তরকারি পাওয়ার আনন্দ কোন্টা প্রকাশ করে—ঠিক বুঝা যায় না।

যোগমায়া খুশী হইয়া বলে, আজও একটু বাসি ডাল, ডালনা আছে, নেবে?

নেব না, সে কি বউমা। তোমাদের হাতের আন্ন খাওয়া ত আমাদের ভাগ্যির কথা। আহা, আন্না ত নয়—

বাসি তরকারির লোভে কেষ্টর মা প্রত্যহই একবার নিজের দুঃখের কথা জানাইতে আসে। আত্মীয়তা দেখাইয়া বলে, পোড়া-ঝোড়া থাকলে—এই কড়া—কি বোক্নো—কি তাওয়া আমায় ব'লো, মেজে দিয়ে যাব, বউমা। বলে কত জন্মের পুণ্যিতে তবে বামুভোনের সেবা করবার ভাগ্যি হয়। ব'লো বউমা, নজ্জা ক'রো না। কেষ্টর মা থাকতে তোমার ভাবনা কি। বলো।

রাত্রিতে ভুবন ওধারের বারান্দা হইতে মাঝে মাঝে হাঁক দেয়। কখনও শিয়াল তাড়াইবার অছিলায়, কখনও পাখী তাড়াইবার অছিলায়; কখনও বা পথ দিয়া কেহ গেলে চীৎকার করিয়া ওঠে, কেডা যায় গো? কেডা?

যোগমায়া এখন অল্প জানালা খুলিতে পারে। ঘরের মধ্যে আলো জ্বালিলে—ততটা আর ভয় করে না। তা ছাড়া, প্রাত্যহিক অভ্যাসে সবই সহিয়া যায়। পেঁচাটা আজকাল চীৎকার করে না, শৃগালের প্রহর-ঘোষণা কান-সহা হইয়া গিয়াছে। শুধু কান-সহা নয়, সন্ধ্যা হইতে দুইবার শৃগাল ডাকিবার পর রামচন্দ্র ফিরিয়া আসে বলিয়া সময় নিরূপণের আগ্রহে সে ডাক যোগমায়াকে খানিক ভরসাও দেয়। ডাক শেষ হইবার কিছু পরে রামচন্দ্র ঠুক্ ঠুক্ করিয়া দুয়ারে আওয়াজ দেয় ও ডাকে, ঘুমুলে নাকি?

রামচন্দ্র প্রায়ই ওখানে রাত্রির আহার সারিয়া আসে বলিয়া যোগমায়া দুপুরের রান্না সারিয়া সেই উনানেই খানকতক রুটি সেঁকিয়া রাখে। আলাদা বাটিতে রাখা তরকারিগুলি আর একবার গরম করিয়া শিকায় তুলিয়া রাখে, এবং রামচন্দ্র আসিবামাত্রই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আহার সারিয়া লয়। শুইয়া শুইয়া রামচন্দ্র গান-বাজনা, থিয়েটারের পালা ও কে কেমন পার্ট করিল, এই সব গল্প করে। সে সব গল্প শুনিতে ভালই লাগে যোগমায়ার। অথচ রাত বেশী হইলে—স্বামীকে ঘুমাইবার জন্য তাড়া দিয়া সে আলোটা নিবাইয়া দেয়।

দশহরার আগের দিন কালীতারা বেড়াইতে আসিয়া বলিল, কাল নাইতে যাবে ভাই? এ দেশে ত গঙ্গা নেই, তবু নদীতে ছান করলে নাকি আদ্দেক পুণ্যি।

তিন-চার মাস এখানে আসিয়াছে—কেমন যে কুষ্টিয়া শহর, যোগমায়া দেখে নাই। পোষ্ট আপিসের প্রাচীরবেষ্টিত কোয়ার্টার-সীমায় সেই যে বন্দিনী হইয়াছে, আর বাহির হইতে পারে নাই। বাহির হইবার কথাই তার মনে হয় নাই। বাপেরবাড়ীর এক জীবন; শ্বশুরবাড়ীর জীবন তাহা হইতে স্বতন্ত্রতর; আর বাসার জীবন আর এক রকমের! এখানে মাথার উপরে শাসন করিতে বা নির্দ্দেশ দিতে কেহ নাই, তবু গুটিপোকায় যেমন জাল রচনা করিয়া তারই মধ্যে জড়াইয়া পড়ে, তেমনই সংসারের ছোট-খাটো কাজে ডুবিয়া বা মাতিয়া বাহিরে যাইবার কথাটাও যোগমায়া ভুলিয়াছে। কুষ্টিয়া শহরে প্রথম পদার্পণের সেই নিশুতি রাতটি—জনমানবহীন মাঠ পার হইয়া সেই বাসায় আসা, অগোছালো বাসায় কোন রকমে আধ-জাগন্ত ভাবে কাটাইয়া দেওয়া—শহরের সেই রূপটিই তার মনের মধ্যে অক্ষয় হইয়া আছে। ঐ বাবুই-পাখীর বাসাগুলি নূতন, ডুমুর গাছটাও। তা ছাড়া উপরের ঐ খণ্ডিত নীল আকাশ, সেই জ্যোৎস্না, সেই শাক-সিম আনাজপাতি, মাছ বা কেষ্টর মা'র মধ্যে নিজের গ্রাম বা শ্বশুরবাড়ীর ছবিটিই সে দেখিতে পায়। একই লোক পোষাক বদল করিয়া কখন রাজা সাজিতেছে, কখনও বা অমাত্য।

স্নানের কথায় যোগমায়ার বহির্মুখী বৃত্তিগুলি চঞ্চল হইয়া উঠিল। একে একে বাপেরবাড়ীর কলমি ডোবা, বৈঁচি ঝোপ, আমবাগান—ময়রাবাড়ী যাইবার ধুলাভরা পথ, সব জাগিয়া উঠিতে লাগিল। ঘাড় নাড়িয়া সে সম্মতি দিল।

দশহরায় উনুন জ্বালিতে নাই। বাড়ীতে নাই বলিয়া বাসাতেও যোগমায়া সে পাট করিবে না। এক বেলার জন্য ইলিশ মাছ ভাজা ও পান্তা ভাত, আর এক বেলা দুধ চিঁড়ার ফলার। দুধ গরম করিবার জন্য উঠানে খান দুই ইঁট পাতিয়া লইলেই চলিবে।

ঘোমটার ফাঁকে পথ দেখিয়া যোগমায়া ও কালীতারা স্নান করিতে চলিল। লক্ষ্মণ পিওনের বৃদ্ধা দিদি ইঁহাদের পথ-প্রদর্শিকা হইল। অবশ্য কালীতারা বারকয়েক নদীতে স্নান করিয়া পথঘাট ভাল করিয়া চিনিয়া আসিয়াছে। তবু বউমানুষ ত! স্বদেশ বা বিদেশ সব জায়গাতেই একজন অভিভাবক নহিলে চলে না।

ঢালু নদীতীর; এখানে ওখানে বালির পাহাড়। খুব চওড়া নহে, কিন্তু লম্বায় যেদিকটা পদ্মার পানে চলিয়া গিয়াছে—সেদিকের যেন শেষ নাই। সূর্য্যের কিরণে জল চিক্‌চিক্ করিতেছে, চিক্‌চিক্ করিতেছে বালুরাশি। আর নদীতীরে বালু-রাশির উপর রূপার পাহাড়। রূপার পাহাড় নয়—ইলিশমাছ। এত মাছও নদীতে আছে?

যোগমায়া বলিল, এত মাছ কে খায় ভাই?

কালীতারা বলিল, কত তো লোক আছে। শুনেছি রেলে ক'রে কলকাতায় নাকি চালান যায়।

একটি স্থূলাঙ্গী বর্ষীয়সী বিধবা মালা জপ করিতে করিতে শুধাইলেন, তোমরা কাদের বাড়ীর বউ গা? চিনতে ত পারছি নে।

গামছা-পরিহিত একজন শ্যামাঙ্গী বিধবা উত্তর দিলেন, ইনি ত কেরাণীবাবুর বউ, আর উটি নতুন পোষ্ট-মাষ্টারের?

বর্ষীয়সী বলিলেন, বামুন ত তোমরা?

কালীতারা বলিল, ইনি বামুন, আমরা কায়েত।

তাই বল। ওদিকে একটু সরে দাঁড়াও ত মা। নেয়ে-ধুয়ে বামুনের ছোঁয়াটা আর মাড়াব না। তোমার কোলে বুঝি ঐ ছেলে? আর হয় নি? তোমার? হয় নি? ওমা!

কালীতারা সে দিক হইতে সরিয়া আসিতেই একজন অল্পবয়সী বিধবার সঙ্গে চোখোচোখি হইয়া গেল। নামেই সে বিধবা। কালিতারা না বলিয়া দিলে, যোগমায়া বুঝিতেই পারিত না। পরনে তার এক ইঞ্চি চওড়া কালো-পাড় ধুতি, গলায় হারের মতই চিক্‌চিক্ করিতেছে কি একগাছা, হাতে মুড়কি-মাদুলি না লবঙ্গফুল কি যেন রহিয়াছে! পান খাইয়া ঠোঁট দু'খানি টুক্‌টুকে করিয়াছে মেয়েটি। আর ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতেছে।

কালীতারাকে দেখিয়া সে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, এই যে শ্যামা-ঠাক্‌রুণ, এতক্ষণে উদয় হ'লে?

কালীতারার কুঞ্চিত ভ্রূ দেখিয়া যোগমায়া বুঝিল—সম্বোধনে সে প্রীতিলাভ করে নাই।

কোন উত্তর না দিয়া কালীতারা মুখ মচ্‌কাইয়া একটু হাসিল মাত্র।

বলি, এটি কে? পোষ্ট-মাষ্টারের বউ? সেই যে ছোক্‌রা মত পোষ্ট-মাষ্টার রোজ আমাদের বাড়ী গিয়ে বাঁয়া-তবলা পেটেন? উঃ সে যা ঘাড় নাড়া আর হাত নাড়ার ভঙ্গি। খিল্ খিল্ করিয়া সে হাসিতে লাগিল।

ও-পাশের মালাজপ-রতা বিধবাটির মন্তব্য শোনা গেল: মরণ, বিধবা মানুষের অত হাসি কেন বাপু! অত রং-ঢংই বা কেন!

মেয়েটি মুখরা। ঘাড় ফিরাইয়া টপ্ করিয়া জবাব দিল, লক্ষ্মীপেঁচা দেখেছ ভাই, শ্যামা-ঠাক্‌রুণ? উই দেখ। বলিয়া আঙুল দিয়া ইসারা করিয়া কৌতুকভরে সে চোখ উল্টাইয়া দিল।

কালীতারা ও যোগমায়া এবং যাঁহারা সে কথাটা শুনিল ও মেয়েটির ভঙ্গি দেখিল—তাহারাই হাসিয়া উঠিল। স্থূলকায়া বর্ষীয়সী বুঝিলেন, তিনিই উহাদের হাসি-তামাসার লক্ষ্য স্থল। সবেগে মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে তিনি এই দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন, কি বললি, চামচিকে কোথাকার, আমি লক্ষ্মীপেঁচা?

চারিদিকে হাসির হুল্লোড়ে বিধবা যেন ক্ষেপিয়া গেলেন। হাত নাড়িয়া ও গলা চড়াইয়া বলিলেন, মিত্তির বাড়ীর মেয়ে ব'লে তোকে ভয় ক'রে চলতে হবে নাকি? তোর খোসামোদ করব নাকি? ওলো ঢক্কাওয়ালি, যার কপাল পুড়েছে—তার অত ভাবন কেন? তার আবার বেশ-বিন্যেস কেন? কার মন ভোলাবার জন্যে—

নদীর তীরে অবিলম্বে দুইটি দল গড়িয়া উঠিল, এবং যে-সব পারিবারিক রহস্য উদ্ঘাটিত হইতে লাগিল—তাহার সিকি অংশ সত্য হইলে দুই পক্ষেরই এ-গাঁয়ে মুখ দেখানো দুষ্কর। কিন্তু নদীর তীরে ও দৃশ্য নূতন নহে। কাহারও কাপড় গায়ে ঠেকিয়া গেলে, স্নানকালে গামছার জল গায়ে লাগিলে বা কাহারও কোন মন্তব্য শুনিলে দুই পক্ষের মধ্যে এমনই কলহ বাধিয়া যায়। দুই

পক্ষই দুই পক্ষের কলঙ্কের রাশি উদ্‌ঘাটিত করিয়া লোকচক্ষে পরস্পরকে খাটো করিয়া বিজয়ের তৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকে।

এত যে ঝগড়া হইয়া গেল--পূর্ণিমা গায়ে মাখিল না। পূর্ব্ববৎ হাসিতে হাসিতে বলিল, তোমার সঙ্গে একদিন আলাপ করে আসব ভাই। তোমার বরটিকে দেখেছি—দাদার বৈঠকখানায় ব'সে বাজন. বাজান। বেশ সুন্দর বর। বলিয়া ফিক্ করিয়া হাসিল।

কালীতারা ফিরিবার সময় যোগমায়াব কানে কানে বলিল, ঐ যে বুড়িটা ওকে গাল দিলে—সব মিথ্যে নয় ভাই। মেয়েটা'র স্বভাবচরিত্তির নাকি ভাল নয়।

পূর্ণিমা কিন্তু সেই দিন সন্ধ্যার একটু আগেই বাসায় আসিয়া হাজির। নদীর ঘাটের মূর্ত্তি হইতে এ মূর্ত্তি সম্পূর্ণ আলাদা। কোঁচাইয়া কাপড় পরিয়াছে—গায়ে একটা পাতলা জামা দিয়াছে—ধোপদস্ত কাল'পাড় কাপড়ের আঁচলে রিং-সমেত একগে.ছা চাবি বাঁধিয়াছে। মুখেও কি যেন মাখিয়াছে—সাদা সাদা গুঁড়া। মোট কথা সুন্দরী সাজিবার একটা স্বেচ্ছাকৃত উদ্যোগ মেয়েটির মধ্যে পরিস্ফুট। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, নাকটা ঈষৎ খাঁদা, দেহটি ক্ষয়া গোছের, ঠোঁট দু'খানি অতিরিক্ত পান খাইয়া ক লো হয় নাই, দ'াতগুলিও সাদা চকচকে আছে। এবং সেই লাল টুকটুকে পাতলা ঠোঁটে সর্ব্বক্ষণই একটি মিষ্ট হাসি লাগিয়া আছে। সবশুদ্ধ মিলিয়া মেয়েটিকে সুন্দরীই বলা চলে।

হাসিতে হাসিতে সে বলিল, নতুন লোক এলো গো, .বাদ।

যোগমায়া বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িল। এখনই স্বামী আপিস হইতে আসিবেন, সন্ধ্যা দেখাইতে হইবে। কম্বলের আসনখানি পাতিয়া দিয়া বলিল, বসুন!

বসব বলেই ত এলাম। দাদা আসেন নি এখনও আপিস থেকে? জ্বালা আপিস যা হোক! বউদি একলাটি মুখ বুজে পড়ে রইলেন বাসায়, দাদা করছেন আপিস। সখ ক'রে এ কষ্ট সইবার দরকার কি!

যোগমায়া বলিল, সখ ক'রে কেন? চাকরি—

হাঁ গো, চাকরি সবাই করে। কত মাষ্টারই ত দেখলাম। খুটু খুটু ক'রে বাড়ীর মধ্যে আসছেই—আসছেই। পানটি নেবার ছুতো ক'রে, জলটি খাবার ছুতো ক'রে—।

যোগমায়া অবাক হইয়া তাহার কথা শুনিতেছিল।

অথচ দাদাও তো তোমায় খুব ভালবাসেন। রাত দশটা বাজতে না-বাজতে বাজনার তাল কেটে যায়। উস্‌খুস্ করতে থাকেন খালি।

আপনি বুঝি অত রাত জেগে রোজই গান শোনেন?

কি করি বল, নেই কাজ ত খই ভাজ। যখন কলকাতায় ছিলাম—কি আমোদেই যে দিন কাটতো! গিরিশ ঘোষের নাম শুনেছ? তাঁরা কেমন থিয়েটার খুলেছেন,—কত নতুন নতুন পালা হয় সেখানে। কলকাতা বেশ জায়গা ভাই।

কুষ্টেও তো শহর।

কলকাতার কাছে! চাঁদের কাছে যেন টিমটিমে তারাটি। সেখানে ট্রাম গাড়ী চলে—ঘোড়ায় টানে, রাস্তায় আলো জ্বলে।

তন্ময় হইয়া যোগমায়া সেই বড় শহরের গল্প শুনিতেছিল। শুনিতে শুনিতে সন্ধ্যা আসিয়া গেল তবু তার হুঁস নাই। অন্য বাড়ীতে শঙ্খধ্বনি হইতেই চমকিত হইয়া যোগমায়া বলিল, আপনি বসুন একটু—আমি সন্ধ্যেটা দেখিয়ে নিই।

যোগমায়া সন্ধ্যা জ্বালিতে গেল, ওদিকে আপিসের দুয়ার ঠেলিয়া রামচন্দ্র প্রবেশ করিতে করিতে বলিল, মায়া, ব'সে কেন?

পূর্ণিমা উঠিয়া হাসিয়া বলিল, মায়া নয়, দাদা—আমি। বলিয়া অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিল।

রামচন্দ্র কি বলিবে—কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল। ঘরে আব.ছা অন্ধকার। মানুষ স্পষ্ট দেখা যায় না। অথচ দাদা বলিয়া ডাকিতেছে এই অপরিচিতা তরুণী—কে এ তরুণী?

পূর্ণিমা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিল, বিপিনবাবু আমার বড়দা। আপনি আমায় চেনেন না—আমি আপনাকে চিনি। আমাদের বৈঠকখানায় ব'সে রোজ আপনি বাঁয়া-তবলা বাজান।

ওঃ, আপনি—

বাঃ রে, আপনাদের দেশে ছোট বোনকে বুঝি আপনি বলে ডাকে! আমাদের এখানে কেউ ছোটকে মান্য ক'রে কথা বলে না!

কিন্তু—

আচ্ছা, হাত-মুখ ধুয়ে ফিরোন। খানিকক্ষণ ব'সে না হয় গল্প করে যাব আপনার সঙ্গে। বউদি সন্ধ্যে দেখতে গেছেন—আলো নিয়ে এলেন বলে।

ছোট বোন! রামচন্দ্র পা ধুইবার কালে আপন মনেই বলিল, বয়সে কমলার চেয়ে কিছু বড়ই হইবে কিন্তু কমলার সঙ্গে মিল ওর কোথাও নাই। কমলার রহস্যপ্রিয়তা ও বাক্‌পটুতা আছে। কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিচিতকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করিবার প্রগল্‌ভতা নাই। বাক্‌বাহুল্যে সে এমন কৌতুকময়ীও নহে।

যোগমায়া আলো জ্বালিয়া ওঘরে গিয়া বসিল। রামচন্দ্রও মাদুরের এক প্রান্তে আড়ষ্ট হইয়া বসিল।

পূর্ণিমা বলিল, বাঃ রে, যাকে উপলক্ষ্য ক'রে আলাপ জমলো—তিনিই সরে গেলেন। এখনও সেকালে বুড়ীদের মত তোমার লজ্জা কেন, বউদি? এঘরে আসবে না?

যোগমায়া এ ঘরে আসিল না। যোগমায়া আসিল না, কাজেই একা রামচন্দ্রের সঙ্গে কতই বা গল্প করিবে পূর্ণিমা। একাই সে বকিয়া গেল, একাই মতামত প্রকাশ করিল—রামচন্দ্র শুধু নিরপেক্ষ শ্রোতার মত হুঁ—হাঁ দিয়া বসিয়া রহিল।

উঠিবার সময় পূর্ণিমা বলিল, দেয়ালের সঙ্গে কথা কয়ে সুখ নেই। এবার যেদিন আসবো—তোমার ঘোমটা আর দাদার মুখের কুলুপ দুই ঘুচিয়ে তবে আমার কাজ! যেমন দাদা—তেমনি বউদি, দুই সমান। উচ্চ হাসির রোল তুলিয়া পূর্ণিমা অন্ধকার পথে বাহির হইয়া গেল। এমন মূঢ় রামচন্দ্র যে অন্ধকার পথে তরুণীকে খানিকটা আগাইয়া দিবার কথাও বলিতে পারিল না।

যোগমায়া এঘরে আসিলে রামচন্দ্র বলিল, উনি কখন এসেছিলেন?

সন্ধ্যের একটু আগে। বেশ লোক।

তোমার ত সব জিনিসই বেশ। মেয়েছেলে অত ফাজিল হওয়া ভাল নয়।

যোগমায়া কথা কহিল না। পূর্ণিমার চালচলনের অসামঞ্জস্য তাহার মনেও অল্প অল্প বিঁধিতেছিল। তবু প্রাণের আনন্দে ভরপুর মেয়েটিকে সে প্রাণ খুলিয়া নিন্দাও করিতে পারিল না। গোরাই নদীর ঘাটে আজ সকালের ঘটনাটি বাদ দিলে—রহস্যপ্রিয় পূর্ণিমাকে ভালই লাগে। ও যেন খানিকটা কমলা-ঠাকুরঝি, খানিকটা রাধারাণী আর খানিকটা অতি চঞ্চল দমকা চৈত্রবায়ু দিয়া গড়া।

যে আচরণ একের পীড়া জন্মায়—অন্যের তা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে।

জামা ছাড়িয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়া রামচন্দ্র বলিল, আজ আর যাব না ভাবছি।

কেন, শরীরটা খারাপ বোধ হচ্ছে? যোগমায়ার শঙ্কিত কর রামচন্দ্রের ললাট স্পর্শ করিল।

রামচন্দ্র সেই হাতখানি টানিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া হাসিল, হাঁ। ওর সঙ্গে আজ আলাপ হ'ল, গেলেই আবার বকবে ত।

বকলেই বা। ছোট বোন যদি দৌরাত্ম্যই করে—

না মায়া, ওকে ছোট বোন ব'লে ঠিকমত ভাবতে পারছি না। ওকে দেখলে—কেমন যেন আমার ভয় হয়।

ভয়! যোগমায়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। ও কি ভূত-পেত্নী নাকি? আসুক কাল—

ভূত-পেত্নীকেও আমার ভয় হয় না, মায়া। কিন্তু ওরা কলকাতায় গেছে অনেকবার—শহুরে বাতাস ওদের গায়ে লেগে আছে, আমাদের ঘরে ওরা যেন ঠিকমত মানায় না।

তোমার বন্ধু ত খিরিষ্টান নন?

বিপিন! না, হিন্দুই বটে, তবে মতামতগুলো ওদের কেমন কেমন। আমাদের ঘরে হ'লে কি এই অন্ধকারে ও বেড়াতে আসতে পারত? আমাদের ঘরের মেয়েরা কি জামা গায়ে দেয়, না জুতো মোজা পরে?

কই ঠাকুরঝি ত জুতো পরে আসেন নি।

আসেন নি, কিন্তু ওদের বাড়ীতে ওরা জুতো পায়ে দেয়; বিপিনবাবুর বউ শুনেছি পাস-করা মেয়ে।

পাস করা? সে কেমন গো?

তোমার আমার মতই দেখতে। দুটোহাত—দুটো পা।

যাও, তোমার সব তাতেই ইয়ে। কিন্তু রাগ করিয়া যোগমায়া চলিয়া যাইতে পারিল না, রামচন্দ্র বাহুর শৃঙ্খলে ততক্ষণে তাহাকে শৃঙ্খলিত করিয়া ফেলিয়াছে।

সত্যি আজ বেরুবে না?

না।

তবে আমায় ছেড়ে দাও, এ বেলা দু একখানা তরকারি রাঁধি।

না, আজ খাওয়ার ইচ্ছে কি গান-বাজনার ইচ্ছে

হচ্ছে না, মায়া। খালি তোমার সঙ্গে গল্প করতে ভাল লাগছে।

দীর্ঘ জীবনকালের মধ্যে একান্ত করিয়া পাওয়া এই একটি সন্ধ্যা যোগমায়ার বুকের মণিহারে মুক্তার মত গাঁথা হইয়া রহিল।

৮

কয়েক দিন পরে কালীতারা বেড়াইতে আসিয়া বলিল, আজকাল তোমাদের বাড়ীতে খুব মজলিস বসে ভাই, আমাদের বাড়ী থেকে হাসির হর্‌রা শুনতে পাই কিনা!

যোগমায়া বলিল, পূর্ণিমা-ঠাকুর-ঝি বেড়াতে আসেন রোজ। ভারি মিশুক লোক।

ঠোঁট উল্টাইয়া কালীতারা বলিল, ও-রকম গায়েপড়াপানা তা ব'লে ভাল নয়। হ'লই বা বাপের বাড়ী, অন্ধকারে হুট্‌হুট্‌ করে আসা—সোমত্ত বয়েস—ভাল নয় ভাই।

ইঙ্গিত যোগমায়ার কাছে তথাপি স্পষ্টতর হইল না। সে কহিল, ওঁরা শহরে রাত দশটা-এগারটা অবধি বেড়াতেন কিনা। আমাদেব বলেন, খাঁচার পাখী। বলিয়া হাসিতে লাগিল।

কালীতারা মুখ মচ্‌কাইয়া বলিল, মরণ! আমাদের খাঁচার পাখীই ভাল। খিরিষ্টানী আচার-বিচার কিনা, কাজেই বলবে বই কি ওরা ওকথা।

কালীতারার কালো মুখের পানে চাহিয়া যোগমায়া কোন কথা বলিল না। কালো রঙ হইলেও কালীতারার মুখশ্রী ত মন্দ নয়, কিন্তু ওর গম্ভীর মুখে কয়েকটি রেখা ফুটিলে চোখ দু'টি যেমন ছোট হইয়া যায়, মুখখানাও কুশ্রী হইয়া উঠে তেমনি।

কালীতারা বলিল, বরটিকে সাবধান ভাই। ওরা কামরূপ-কামিখ্যের ডাইনি—মন্তর-তন্তরে সব করতে পারে।

এবার কালীতারার অন্তর্নিহিত শ্লেষ ও সন্দেহ যোগমায়া বুঝিতে পারিল; বুঝিয়া তার দুঃখও হইল। কালীদিদির মনে ওসব কুভাব আসেই বা কেন?

কোলের ছেলেটিকে স্তন্যপান করাইতে করাইতে অতঃপর কালীতারা অন্য প্রসঙ্গ পাড়িল, যোগমায়াও সহজভাবে নিশ্বাস ফেলিয়া সংসারের খুঁটিনাটির আলোচনায় মন-প্রাণ ঢালিয়া দিল।

আর একদিন দুপুরবেলায় যোগমায়া কালীতারাদের বাড়ী বেড়াইতে গেল। ঠিক করিল, পূর্ণিমা আসিবার একটু আগেই সে ও-বাড়ী হইতে ফিরিবে। ইদানীং কালীতারা ত এ বাড়ীতে ঘন ঘন আসা কমাইয়া দিয়াছে। বলে, কাজ সারতে হয়। কিন্তু বর্ষাকালে বড়ি দেওয়ার লেঠা নাই, একরাশ কাপড় কাচিয়া শুকাইতে দেওয়ার হাঙ্গামাও নাই। টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িলে—দাওয়ায় কুড়ের মত পা ছড়াইয়া বসিয়া ছড়া কাটা ছাড়া আর কিই-বা কাজ কালীতারার!

ছেলে কাঁদে না, তবু কালীতারা আকাশে জল ঝরিবার সঙ্গে সঙ্গে সুর করিয়া আবৃত্তি করে:

বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদী এল বান,
শিব ঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যে দান।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন আর কন্যে খান,
আর কন্যে না খেতে পেয়ে বাপের বাড়ী যান।

বৃষ্টি না পড়িলেও খর মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে সে দাওয়ায় বসিয়া অনর্গল ছড়া বলিয়া যায়:

ও পারেতে জস্তি গাছটি জস্তি বড় ফলে।
গুয়ো জস্তির মাথা খেয়ে প্রাণ কেমন করে॥
প্রাণ করে আই ঢাই গলা করে কাঠ।
কতক্ষণে যাবরে ভাই তিরপুণির মাঠ॥
তিরপুণির মাঠেতে ভাই রাঙা রাঙা বালি।
চাঁদ মুখে রোদ লেগেছে তুলে ধর ডালি॥
পান কিনব চুণ কিনব ননদ ভাজে খাব।
আমাকে যদি না দাও ত দাদাকে বলে দেব॥
দাদা দাদা ডাক পাড়ি—দাদা নেইকো বাড়ী।
সুবল সুবল ডাক পাড়ি—সুবল আছে বাড়ী॥
আজ সুবলের অধিবাস কাল সুবলের বিয়ে।
সুবলকে নিয়ে যাবে দিগ্‌নগর দিয়ে॥
দিগ্‌নগরের মেয়েগুলি নাইতে লেগেছে।
চিকন চিকন চুলগুলি তার ঝাড়তে লেগেছে।
হাতে তার দেব শাঁখা নেপ লেগেছে।
গলায় তাদের তক্তি মালা রক্ত ছুটেছে॥
পরনে তার ডুরে শাড়ী উড়ে পড়েছে।
দুই দিকে দুই কাত্‌লা মাছ ভেসে উঠেছে॥
একটি নিলেন গুরু ঠাকুর—একটি নিলেন টিয়ে।
টিয়ের মার বিয়ে॥
লাল গামছা দিয়ে।
অশ্বথ পাতা ধনে॥
গৌরী বেটী কনে।
নখা ব্যাটা বর।
ঢ্যাম কুড়াকুড় বাদ্যি বাজে চড়ক ডাঙায় ঘর॥

সুদীর্ঘ ছড়া—বার বার আবৃত্তি করিয়া

কালীতারা অলস মধ্যাহ্ন কাটাইয়া দেয়—তবু যোগমায়ার কাছে আসিবার সময় তার হয় না!

কালীতারা অভ্যর্থনা করিল, এস, এস ভাই, বস। কি ভাগ্যি আমার—পূবের সূর্য্যিঠাকুর আজ পশ্চিমে উঠেছেন।

তুমি ত আর যাও না দিদি।

এই দেখ না ভাই, আজকাল এমন অভ্যেস হয়েছে বাবুর ছড়া না শুনলে আর ঘুম হয় না।

তোমার মুখে ছড়া ভারি মিষ্টি শোনায়, দিদি।

হাঁ, ছড়া নাকি আবার মিষ্টি! পুন্নিমে সুন্দুরীর মত গান গাইতে তো পারি নে আমরা—যা করেন ওই ছড়া। দুধের সোয়াদ ঘোলে মেটাই, ভাই।

তা অন্তরঙ্গতা বাড়িবার সঙ্গে পূর্ণিমা মৃদুকণ্ঠে গানও গায় আজকাল। সে অস্ফুট গলার স্বর তো এতদূর পৌঁছিবার কথা নহে।

যোগমায়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, তুমি শুনতে পাও এতদূর থেকে?

আমি কেন ভাই, সারা কুষ্টেয় ঢি-ঢাক্কার পড়ে গেছে। পোষ্টমাষ্টার ব'লে কেউ বলে না কিছু।

কালীতারার বক্র ইঙ্গিতে মনে মনে অসন্তুষ্ট হইল যোগমায়া। পুরুষ ও নারীর একত্র সম্মিলন মাত্রই যে দোষের—একথা মেয়েরাই যখন তখন বলে। দুর্ব্বল বলিয়াই কি মেয়েদের উপর মেয়েরা এই সন্দেহ পোষণ করে?

কালীতারা বলিল, উনি সেদিন পোষ্টাপিসের পাশ দিয়ে আসছিলেন, পুন্নিমে সুন্দুরী তখন গাইছেন। নিধুবাবুর সেই—'ভাল বাসি' বলে গানখানা।...তা সত্যিই যদি এত 'প্রেম' 'প্রেম'—তো বিয়ে করুন না কেন? কলকেতায় শুনি তো অনেকেই করছে।

বড় আশা করিয়া যোগমায়া আসিয়াছিল সংসার সম্বন্ধে দুই-একটি উপদেশ লইতে। কালীতারার কথার ধারা শুনিয়া সে উঠি-উঠি করিয়া অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। এইমাত্র আসিয়াছে—এখনই উঠিবে কি করিয়া? অন্তত সন্ধ্যাটা না আসিলে—

বেলা পড়িয়া আসিতেই যোগমায়া উঠিল, যাই দিদি, সন্ধ্যে হ'ল।

আবার এসো ভাই।

আসব।

যোগমায়া দুয়ার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে—অমনই কালীতারা হাসিতে হাসিতে বলিল, তোমায় ভালবাসি বলেই বলছি ভাই,—সাবধান, কর্ত্তাটিকে চোখে চোখে রেখো। যে নজর পড়েছে—!

যোগমায়া উত্তর না দিয়া চলিতে লাগিল। বাড়ীর দুয়ারে আসিতেই পূর্ণিমার মৃদুকণ্ঠের গান ও রামচন্দ্রের তবলার মৃদু আওয়াজ শুনিয়া যোগমায়া একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। পিছনে কালীতারার কণ্ঠস্বর যেন তাহাকে তাড়া করিয়া আসিল: সাবধান, কর্ত্তাটিকে চোখে চোখে রেখো। যে নজর পড়েছে!

কই, যোগমায়ার উপস্থিতিতে প্রতিদিন যে মজলিস বসে, সে মজলিসে পূর্ণিমা গান গায় বটে, রামচন্দ্র তো তবলা বাজায় না। একপাশে আড়ষ্টের মত বসিয়া থাকে রামচন্দ্র। প্রথম দিন পূর্ণিমাকে দেখিয়া পর্য্যন্ত যে অহেতুকী ভয় তাহার মনে জাগিয়াছে—এত দিনের অন্তরঙ্গতায়ও সে ভয় তাহার কাটিল না! তবে কি ভয় যোগমায়াকে, পূর্ণিমাকে তার ভালই লাগে?

দুয়ারে দাঁড়াইয়া প্রায় তিন চার মিনিট যোগমায়া এই সব চিন্তা করিল। না, কালীতারা তার মনের সন্দেহ যোগমায়ার মনে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছে। নইলে যে রামচন্দ্রকে যোগমায়া দিনের উজ্জ্বল আলোর মতই চিনিয়াছে—তাহার সম্বন্ধে এরূপ চিন্তা সে করে কেন? পাছে পূর্ণিমার সঙ্গে গল্প করিতে হয় বলিয়া প্রথম পরিচয়ের দিনটিতেই সে গান-বাজনার আখড়ায় যায় নাই; আর সে রাত্রির আদর প্লাবনে যোগমায়া পর্য্যন্ত হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল।

ঘোরানো খিলের দুয়ার—বাহির হইতে সে সন্তর্পণেই খুলিল। কিন্তু বাড়ীর ভিতরে পা দিতেই তার মনে হইল পূর্ণিমার খিল্ খিল্ হাস্যধ্বনির সঙ্গে রামচন্দ্রও যোগ দিয়াছে। পূর্ণিমা বলিতেছে, এবার আপনার গাইবার পালা। যদি না গান—

রামচন্দ্র হাসিয়া বলিতেছে, আগে হারমোনিয়ম বাজাতে শিখি, কলকাতায় ঘুরে আসি—

হড়াৎ করিয়া যোগমায়া দুয়ারের খিল বন্ধ করিল। ঘরের মধ্যে হাসি-আলাপও অমনি নিস্তব্ধ হইয়া গেল। পূর্ণিমা দ্রুত ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিল, অন্তত যোগমায়ার তাই মনে হইল। তারপর গলা ছাড়িয়া বলিল, বউদি বুঝি? খাস্তি পাড়া বেড়াতে শিখেছ যাহোক! এদিকে দাদার মন উড়ু উড়ু। কত ক'রে গান গেয়ে—

যোগমায়া ঝনাৎ করিয়া রান্নাঘরের শিকলটা খুলিল। ধপাস্ করিয়া দেড়কোটা দাওয়ায় বসাইল, এবং অন্ধকারেই কুপিটা হাতড়াইতে গিয়া সেটি ঠুন্ করিয়া হাঁড়ির উপর পড়িয়া গেল।

ওঘর হইতে পূর্ণিমা হাসিয়া বলিল, বউদি কি হাঁড়ি খাচ্ছ অন্ধকারে?

দিয়াশলাই জালিয়া তুম্ তুম্ শব্দে যোগমায়া এঘর ওঘর করিয়া সন্ধ্যা দেখাইল। তুলসীতলায় আঁচল লুটাইয়া প্রণাম করিতেই খানিকটা চোখের জল উপচাইয়া পড়িয়া সেখানকার মাটি ভিজাইয়া দিল। সেই মাটি মাথায় ঠেকাইয়া যোগমায়ার বুকটা অনেকখানি হাল্কা হাল্কা বোধ হইতে লাগিল।

এ ঘরে আসিয়া যোগমায়া দেখিল পূর্ণিমা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। যোগমায়াকে দেখিয়া সে বলিল, বউদি তো বসতেই বললে না আজ!

যোগমায়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, যিনি বসাবার তিনি তো বসিয়েছেন ভাই, আমরা না বললে কি আসে যায়?

পূর্ণিমা হাসিয়া বলিল, না ভাই, কথায় বলে, ভাইয়ের ঘর—ভাজের হাত। তোমরা আঙুল না নাড়লে—ভাইদের সাধ্যি কি যে ডেকে বসান! বলিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যোগমায়া রামচন্দ্রের পানে চাহিল। প্রতিদিনকার মত ভয় সে মুখে লাগিয়া আছে, কিন্তু আজিকার ভয়ের চিহ্ন আরও একটু নিবিড়। অপরাধ করিয়া ধরা পড়িবার মত মুখভাব রামচন্দ্রের।

যোগমায়া বলিল, নাও ওঠ। মাদুরটা ঝেড়ে-ঝুড়ে গুটিয়ে রাখি। আজ খাবে তো রাত্তিরে?

রামচন্দ্র বলিল, না খাবার কারণটা কি?

যোগমায়া বলিল, গল্প খেলে পেট ভরে না জানি, বন্ধুরাও তো খাওয়াতে পারেন!

তা পারেন। তবে সেটার কোন বাঁধাধরা বন্দোবস্ত নেই—খেয়ালখুসির ওপরই নির্ভর করে অনেকটা।

বাঁধাধরা বন্দোবস্তই একটা করে নাও না, মিছিমিছি রোজ রোজ কতকগুলো তরকারি নষ্ট হয় কেন!

তুমি তো বল কেষ্টর মাকে তরকারিগুলো দাও, নষ্ট হয় না।

যোগমায়া হাসিবার ভঙ্গি করিয়া বলিল, তুমি না খেলেই তো নষ্ট—তাই বলছি। এখুনি বেরুচ্ছ তো?

না, আজ আর যাব না ভাবছি।

কেন, শরীর খারাপ বুঝি?

কিন্তু আগাইয়া আসিয়া যোগমায়া তাহার কপালে হাত রাখিল না, বা স্বরে কোনরূপ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া এতটুকু ব্যস্তও হইল না।

রামচন্দ্র বিস্মিত হইয়া যোগমায়ার পানে চাহিল। কহিল, তোমার শরীর কি আজ ভাল নেই, মায়া?

যোগমায়া বলিল, কে বললে? ভালই তো আছি। ভাল না থাকলে কেউ বেড়াতে যায়!

তা বটে। তবু আজ এমন অনেক কথা বলছ,—যা তোমাকে মানায় না মায়া। তুমি তো কোন দিন এমন ক'রে কথা বল না।

তবে কি করে বলি কথা? উচ্চ হাসিয়া যোগমায়া এক পাক ঘুরিয়া হারিকেনটার দম কমাইয়া মাটির উপর রাখিয়া দিল।

রামচন্দ্র বলিল, হাসই আর যাই কর—তোমার মন আজ ভাল নেই। কেন নেই, মায়া?

হাত ধরিতে গেলে সে পিছাইয়া গেল! কহিল, তোমার সঙ্গে গল্প করে রাত্তিরের খাওয়া মাটি করি সেদিনকার মত! তা হ'চ্ছে না!

না হ'লই বা খাওয়া। এস, গল্প করি।

না গো না। ঘর হইতে ছিট্‌কাইয়া বাহির হইয়া গেল যোগমায়া।

রাত্রিতে খাটের চারিপাশে মশারি গুঁজিতেছে—রামচন্দ্র খপ্ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, আজ আমার ওপর রাগ করেছ, মায়া?

যোগমায়া প্রায় চীৎকার করিয়া কহিল, উঃ, হাতে লাগে যে!

লাগুক, কেন রাগ হ'ল তোমার বল তো?

রাগ হবে না কেন? তুমি আমার সামনে বসে কোন দিন বাজাও না কেন?

এই! তা তুমি তো কোন দিন আমায় বাজাতে বল নি। বলেছ?

না, আমি যে গাইতে পারি নে।

শিখবে গান?

গান শেখবার ইচ্ছে হ'লেই যেন শেখা যায়! কে শেখাবে?

যদি বলি পূর্ণিমা।

পূর্ণিমা তো মাষ্টার নয়, ওর কাছেই বা আমি শিখব কেন?

যদি আমি শেখাই?

জান নাকি তুমি? কই, এক দিনও তো গাইতে শুনি নি

শুনবে? গাইব?

খুব হয়েছে। রাত জাগলে শরীর অসুখ করবে না বুঝি? ঘুমোও।

না, ঘুমুব না।

তবে বক। পিছন ফিরিয়া যোগমায়া নিঃশব্দে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

পূর্ণিমার হাজিরার কামাই নাই। ঘড়ির কাঁটার মত নিত্য-নিয়মিত তার আসা-যাওয়া। কি পূর্ণিমা—কি অমাবস্যা—একাই সে আসে, একাই চলিয়া যায়। বলে, পুরুষকে ভয় ক'রে ক'রেই তো আমাদের এই দশা। নিজের পায়ে নিজে চলব—তা আবার অন্যের সাহায্য নেব কেন? ওরা যদি চলতে পারে—আমরাও পারব।

তবলা আজকাল রামচন্দ্র প্রকাশ্যেই বাজায়; একটা হারমোনিয়ম আনাইবার কথাও চলিতেছে। যোগমায়ার চিত্ততলে সেই দিনের সন্দেহবীজ একেবারে শুষ্ক হইয়া যায় নাই। বুঝি অনুকূল হাওয়ায় সে পল্লব মেলিতেছে।

মজলিসে সর্ব্বক্ষণ সে বসিয়া থাকে না, ছুতা করিয়া উঠিয়া যায়। কখনও রান্নাঘরে গিয়া হাঁড়ি ঠুক্ ঠুক্ করিয়া জানাইয়া দেয়—সে কাজ করিতেছে, কান পাতিয়া রাখে এ ঘরের পানে। রামচন্দ্র ক'বার হাসিল ও কি কথা বলিল—ও ঘরে না থাকিয়াও যোগমায়া সব মুখস্থ বলিয়া দিতে পারে। কখনও পা টিপিয়া আর একটু আগাইয়া আসিয়া পালং শাকের ক্ষেতের কাছটায় সামান্যক্ষণ দাঁড়ায়। ঘরে যতক্ষণ হাসি-কথা, গান-বাজনা চলে, যোগমায়া ততক্ষণ নিরুদ্বিগ্ন থাকে, কিন্তু ও-ঘর নিস্তব্ধ হইলেই যোগমায়ার বুকে কে যেন সজোরে হাতুড়ি পিটিতে থাকে। সন্দেহ প্রবল হইয়া গলা পর্য্যন্ত শুকাইয়া দেয়। পা টিপিয়া টিপিয়া যোগমায়া পাশের ঘরে ঢুকিয়া অন্ধকার-মাখা দুয়ারের ও-পিঠে চোখ পাতিয়া রাখে। প্রথমে সামান্যক্ষণ চোখ পাতিয়াই তার মন দারুণ অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিত, এখন পূর্ণ সাত-আট মিনিটও সে মশক-দংশন নীরবে সহ্য করিয়া ও-ঘরের পানে চাহিয়া থাকে। ও-ঘরেই যে তাহার জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলা চলিতেছে। নিজের দুর্ব্বলতা যোগমায়া বুঝিতে পারে; এ যে কত বড় অন্যায়—কত বড় পাপ—তাহাও সে মনে মনে স্বীকার করে, কিন্তু কালীতারার দেওয়া বিষের চারা মনের ক্ষেত্র হইতে উপড়াইয়া ফেলিবার সাহস যোগমায়ার নাই। সে চারা দিনে দিনে পরিপুষ্ট হইতেছে—অনেকগুলি শিকড় নামাইয়াছে যোগমায়ার হৃদয়ে—অনেকখানি গভীর ক্ষত সৃষ্টি করিয়া যোগমাকে দিনে রাত্রিতে যন্ত্রণা ভোগ করাইতেছে। চিরন্তনী দুর্ব্বল বৃত্তির খেলনা হইয়াছে যোগমায়া। রামচন্দ্রকে সে অবিশ্বাস করে না—অন্তত মনে মনে সে বারবার সেই কথা বলে। কিন্তু দিনে দিনে রামচন্দ্রের নিকট হইতে সে দূরেও সরিয়া যাইতেছে বুঝিতে পারে। রামচন্দ্রের যে রহস্য আগে যোগমায়া বুঝিতে পারিত না, এখন সেই রহস্যেরই কদর্থ করিয়া সে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়। ভাবে, আমার রূপ নাই, গুণ নাই, গান জানি না, হাসিতেও জানি না ভাল করিয়া—রামচন্দ্র আকৃষ্ট হইবে কেন? ভালবাসা হাবভাবে যে মানুষকে কাছে টানে না—সে কথা বুঝিবার বয়স হয় নাই যোগমায়ার। আকাশে উঠেন চাঁদ—নদীতে নামে জোয়ার, ভিতরের আকর্ষণেই একের হাসিতে অন্যের বুককে আবেগে স্ফীত করিয়া তুলে। আজকাল তুলসী তলায় সন্ধ্যা দেখাইবার কালে প্রণামটা বিলম্বিত করে যোগমায়া। ইচ্ছা করিয়াই প্রণাম বিলম্বিত করে। চোখের জল সঙ্গে সঙ্গে অনেকখানি বাহির হইয়া যায়। যেদিন জল বাহির হয় না—সেদিন বুকখানা ব্যথায় টন্‌টন্ করিতে থাকে। যোগমায়ার সম্মুখেই তার গৃহদাহ আরম্ভ হইয়াছে—হাত-পা বাঁধা যোগমায়ার। ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া দেখা ছাড়া গত্যন্তর কি?

প্রথম প্রথম রামচন্দ্র বিস্মিত হইত, এখন সে বিস্ময় তার কাটিয়া গিয়াছে। বয়সের অনুপাতে যোগমায়ার অনেক পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই পরিবর্ত্তন হয়ত সেই জাতীয়। সংসার সংসার করিয়া ঘুমের ঘোরে চমকাইয়া উঠে। শীতের প্রত্যূষে রামচন্দ্রের বাহুবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া সে আঁচল গায়ে দিয়া বাহিরে আসে; গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় পাখা হাতে করিয়া খানিকটা গল্প যে রামচন্দ্রের সঙ্গে করিবে—সে অবসর তার নাই। সংসারে এতও কাজ জমিতেছে দিন দিন!

সেদিনও মজলিস হইতে যোগমায়া উঠিয়া গিয়াছে। গান থামিয়া গিয়াছে, গল্পও এইমাত্র শেষ হইয়া গেল। তবু পূর্ণিমার উঠিবার ত্বরা নাই। রান্নাঘর আদুড় রাখিয়া যোগমায়া আসিয়া এ ঘরের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া কপাটের ফাঁকে চোখ রাখিল।

পূর্ণিমার মুখে আজ হাসি নাই, কথায় তেমন উচ্ছ্বাসও নাই। সে মৃদু কণ্ঠে বলিতেছে, কালই কলকাতায় যাচ্ছি। একটু থামিয়া বলিল, আচ্ছা দাদা, বিধবা-বিবাহ ভাল না মন্দ?

রামচন্দ্র বলিল ওসব বিচার পণ্ডিত লোকেরা করছেন, আমরা কি-ই বা বুঝি!

পূর্ণিমা বলিল, আমাদের কথা আমরা যেমন বুঝবো, তেমন কেউ বুঝতে পারবে না। পণ্ডিতরা শাস্ত্র নিয়ে চুলচেরা বিচার করুন গে।

রামচন্দ্র বলিল, হিন্দু হয়ে শাস্ত্র যখন মানছি—তখন তার ব্যবস্থাটা অস্বীকার করবার শক্তি কোথায় আমাদের।

স্বীকার-অস্বীকারের কথা বলছি না, আমি শুধু জিজ্ঞাসা করছি—ভাল না মন্দ?

রামচন্দ্র কোন কথা কহিল না।

পূর্ণিমা হাসিয়া বলিল, শাস্ত্র আমাদের বিচার-বুদ্ধিকে এমন আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ ও-কথা জোর গলাতেও আমরা বলতে পারি না। অথচ শাস্ত্র তৈরি করেছি আমরাই। আমরা যা তৈরি করেছি—আমরা তা বদলাতে পারব না—এ কেমন কথা?

রামচন্দ্র বলিল, ভাল বুঝেই তো আমরা একদিন কতকগুলো বিধান মেনে নিয়েছি, পূর্ণিমা। আজ হঠাৎ সেগুলো ভাঙার কোন মানে হয়?

পূর্ণিমা বলিল, সেদিন যা দরকারী ছিল, আজও তাই দরকারী আছে? এক দিন ছিল—যখন সামাজিক কোন বন্ধনই কেউ মানতেন না। বীর্য্যশুল্কে স্ত্রীলোকের ভাগ্য নিরূপিত হ'ত; আজ তিন রকম বিবাহ উঠে গিয়ে শুধু লৌকিক বিবাহটাই চলিত রয়েছে। এক কালের বিধান চিরকাল থাকতে পারে না। কথা শেষে মনে হইল, রামচন্দ্রের প্রতি একাগ্র দৃষ্টিতে তার চোখ দু'টি জল্ জল্ করিতেছে।

রামচন্দ্র বলিল, এ কি তোমার মত পূর্ণিমা?

যদি বলি আমার নয়—তাতেই বা কি? যা সত্য—তা যার মতই হোক—সব সময়েই সত্য।

তোমরা ব্রাহ্ম বুঝি?

ব্রাহ্ম কি হিন্দু নয়? যাঁরা এগিয়ে গেলেন মতামতে—তাঁদের ঠেলবার জন্ত আপনারা ত অস্পৃশ্য ক'রে দিয়েছেন। তাঁরা জাত দেন নি, মাত্র মত বদলেছেন—তাই আপনারা তাঁদের দূরে সরিয়েছেন। আজ আমি যদি আবার বিয়ে করি—আপনি কি করবেন, দাদা? এমনি ক'রে বাসায় আসতে দেবেন আমায়? আপনার সামনে গান গাইলে এমনি ক'রে সঙ্গত করবেন আমার সঙ্গে?

রামচন্দ্র শুষ্ক স্বরে বলিল, কিন্তু বিবাহের চেয়ে ব্রহ্মচর্য্য হচ্ছে মানুষের সব চেয়ে কল্যাণকর পথ।

কোন্ মানুষের পথ? যিনি আকণ্ঠ ভোগ করে বীতস্পৃহ হ'য়েছেন ভোগে, না দৈববিড়ম্বনায় যাঁর অদৃষ্টে ভোগ্যবস্তু জোটে নি? যে-যুগে ব্রহ্মচর্য্য অবশ্য-পালনীয় ছিল—আমরা কি সেই ঋষি যুগে বাস করছি এখনও?

রামচন্দ্র উত্তর দিল না। পূর্ণিমা হাসিয়া বলিল, আজ এসব কথা বলছি কেন জানেন? দাদা বৌদি আমায় কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছেন এই বৈধব্য থেকে আমায় মুক্তি দেবেন ব'লে। যদি মুক্তিই পাই, আর তো আপনাদের এখানে এসে বসতে পারব না—তাই এত কথা জিজ্ঞাসা করছি আজ। বলুন না, বিয়ে করলে আমায় ঘৃণা করবেন তো?

রামচন্দ্র বলিল, ঘৃণা করব কি না, জানি না, কিন্তু তোমার বিয়ে খুব ভালভাবেও নিতে পারব না, পূর্ণিমা। আমি যে-সমাজের লোক, সে-সমাজের কেউ এ জিনিষ ভালভাবে নিতে পারেন না।

কেউ নয়—অনেকেই। যাই হোক, আপনাকে প্রণাম করে যাই। যদি আসিবার মত অবস্থা না হয়, তবু মনে রাখব আপনাকে। শুধু দাদা বলে নয়—। পূর্ণিমা সহসা চুপ করিল।

তবে কি বলে মনে রাখবে?

মনে রাখব—কারণ—, পূর্ণিমা পুনরায় চুপ করিল।

চুপ করলে যে?

যত বেহায়া হই দাদা, সামনে সে কথা বলতে পারব না। যদি দরকার বুঝি, একদিন চিঠি লিখে জানাব আপনাকে। একটু থামিয়া বলিল, ব্রহ্মচর্য্য পালন করার মত মনের বল সবার থাকে না দাদা। আমি এতদিন নিজেকে যতখানি সবল মনে করতাম, এখন তা করি না। বলিয়া হাসিল।

উঠছ?

হাঁ। বউদি কোথায় গো? বয়সে ছোট না হ'লে তোমারও পায়ের ধুলো নিতাম একটু। বউদি?

অন্ধকার ঘর হইতে দ্রুত অপসৃত হইয়া যোগমায়া তুলসীতলায় আসিয়া চাপা গলায় বলিল, ডাকছেন?

—হাঁ। হাসিতে হাসিতে দুয়ার খুলিয়া সে

বাহির হইয়া তুলসীতলার সন্নিকটে আসিয়া বলিল, একটু মাটি আগার মাথায় ঠেকাবে ভাই?

আপনারা তো মানেন না।

মানি না, কিন্তু অস্বীকাব কবতে পারি কি! ওর একটু মাটির জন্যই তো কলকাতায় চললাম। তোমাদের সংসারটি এত ভাল লাগে কেন, জান? ওই সন্ধ্যে দেখানো আছে বলে, শাঁক বাজাও বলে, তুলসীতলার মাটি মাথায় নাও বলে। আমরা নিতে পারি নে—তবে নেবার ইচ্ছে করে। হাসিতে হাসিতেই পূর্ণিমা বাহির হইয়া গেল।

যোগমায়া হতবিস্ময়ে তুলসীতলায় দাঁড়াইয়া খোলা দুয়ারটার পানে চাহিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। আজ ওর গলার স্বরটি হাসির মধ্যেও কি অস্বাভাবিক থমথমে। এত দিনেও পূর্ণিমাকে সে বুঝিতে পারিল না?

৯

পূর্ণিমা অন্তর্হিত হইতেই অমাবস্যা আসিল। অর্থাৎ কালীতারা দেখা দিল। আসিয়া বলিল, যাবার আগের দিন সন্ধ্যের পর তোমাদের পুন্নিমে সুন্দরী হঠাৎ আমাদেব বাসায় গিয়ে উপস্থিত। বললেন, বউদি,' চললাম। তোমায় আমাবস্যে সুন্দুরী বলে ক্ষেপিয়েছি কত দিন, কিছু মনে ক'রো না ভাই। লোককে রাগানো আমার একটা স্বাভাব। তুমি ক'লো আর আমি সোন্দর বলে যে তোমায় আমাবস্যা বলে ডাকতাম, তা নয়। তোমায় দিদির মত মনে ক'রেই বলতাম ও-কথা। আমি যেন ওর ইয়ার! খয়ের খাবাব যুগ্যি!

যোগমায়া বলিল, আমায়ও বললেন তুলসী-তলার মাটি মাথায় নিতে ইচ্ছে করে।

কালীতারা বলিল,—ওই রকম! নিজেদের সংসারে ওদের কিসের অভাব, ভাই। তবু আমাদেব মত গরিবদের বাড়ী পড়ে থাকতেই ওর ভাল লাগত। একটা ছেলে যদি আরেকটা ছেলের সামনে দাঁড়িয়ে খাবার খায় ত—যে ছেলেটা খাবার পায় নি—তার যেমন চোখের ভাব—আমাদের পুন্নিমে সুন্দরীরও সেই রকম চোখ আমি কত বার দেখেছি। এমন হ্যাংলা!

যোগমায়া মনে মনে বলিল, ঠিক। আমিও সেদিন দুয়োরের ফাঁক দিয়ে ওঁর দিকে ঠিক ওই রকম চোখেই ওকে চাইতে দেখেছি। হ্যাংলাই ত'। প্রকাশ্যে বলিল, শুনছি নাকি ওঁর আবার বিয়ে হবে?

বিয়ে? মেয়েমানুষের ক'বার বিয়ে হয়? মরণ!

দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল।

খানিক পরে কালীতারা বলিল, আপদ যে বিদেয় হ'ল—তোমার ভাগ্যি ভাল, ভাই। ওঁতে আমাতে কত দিন বলাবলি রয়েছি—একটা কেলেঙ্কারি না হয়।

যোগমায়া কথা কহিল না। কালীতারার এই কথাগুলি তাঁর ভাল লাগে না। মন যাহাতে ভাল থাকে—তেমন কথা যেন কালীতারা বলিতেই পারে না আজকাল।

কহিল, মরুক গে ভাই, যে দোষ করবে—সে তার ফল ভোগ করবে। বিয়ে করে যদি ভাল থাকে—

পোড়া কপাল! ভাল থাকবার মেয়েই কি না ও! দেখো, ও যদি না—

যোগমায়া তাড়াতাড়ি ওঘরে উঠিয়া গেল। ফিবিয়া আসিল সুচ-সুতা হাতে করিয়া। বলিল, কাঁথার ওপর একটা হাতী তুলছি, দিদি। ভাবছি নীল সুতো দেব। উনি বললেন, সবুজ দেও। মানাবে সবুজ?

দূব, হাতীর গায়ে বরঞ্চ মেটে রং মানাতে পারে, সবুজ মানায় কখনও? ফিকে নীল রং মানাবে ভাল। শুধু হাতী নয়, পায়ের তলায় পদ্মর পাতা আর ফুল দিয়ো।

যোগমায়া বলিল, ঠিক বলেছ দিদি, যেন পদ্মবন ভাঙছে।

কালীতারা বলিল—হাতী নয়, হস্তিনী। পদ্মবন ভাঙতে আর পারলে কই, যে পাকা মাহুত!

আবার সেই কদর্য্য ইঙ্গিত! কাঁথা রাখিতে গিয়া যোগমায়া ওঘরে একটু বিলম্বই করিল।

কালীতারা বলিল, উঠি, ভাতুরে বেলা আদুরে যায়। একটা কথা বলি ভাই, একটা টাকা ধার দিতে পার? পরশু মাইনে পেলেই দিয়ে যাব?

আমার কাছে ত টাকাকড়ি থাকে না।

থাকে না! তবে যে চাবি ঝুলছে আঁচলে? কথাটা যেন বিশ্বাসযোগ্য নহে।

যোগমায়া বলিল, ওগুলো বাহারে চাবি। উজুই চণ্ডীর জাত দেখতে গিয়ে শাশুড়ী কিনে এনেছিলেন।

ও হরি বল! চাবিই যদি হাত করতে না

পারলে ত কিসের গিন্নিপনা করচ শুনি? না ভাই, একটা টাকা না হয়—আট আনাই দাও। সত্যি বলছি, খোকার বার্লি নেই—

যোগমায়ার নিজের একটি আধুলি ও একটি সিকি পুঁজি ছিল—কালীতারার আগ্রহাতিশয্যে আধুলিটি সে বাহির করিয়া দিল।

কালীতারা সেটি আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, পরশু কি তরশু দুকুরে এসে দিয়ে যাব। দুয়োরটা দাও, আমি চললাম।

সন্ধ্যার পর কালীতারা ছেলেকে ছড়া কাটিয়া ঘুম পাড়াইতেছে শোনা গেল:

ঘুম পাড়ানী মাসি পিসি ঘুম দিয়ে যেয়ো,
বাটা ভরে কাটা গুয়ো গাল পুরে খেয়ো।

* * *

ওরে—খোকার আমার বিয়ে দেব
হট্টমালার দেশে।
তারা গাই বলদে চষে, তারা হীরেয় দাঁত ঘষে,
রুই মাছ পটলের শাক ভারে ভারে আসে॥

রামচন্দ্র সেদিন রাত্রি দশটায় মিত্র-বাড়ীর আখ্ড়া হইতে ফিরিয়া গম্ভীর মুখে বলিল, ওদের কলিকাতায় যাওয়া হ'ল না। গিন্নিমা অমত করলেন। বললেন, ব্রাহ্মই হও—আর খ্রীষ্টানই হও, ভাদ্দর মাসে বাড়ী থেকে বেরুতে দেব না, বাছা!

যোগমায়া বলিল—তা পূর্ণিমা-ঠাকুরঝি একদিন ত একবারও এলেন না।

রামচন্দ্র বলিল, আমি চেষ্টা করছি যাতে এখান থেকে শীগ্‌গির বদলি হ'তে পারি।

কেন, এ জায়গা ত মন্দ নয়?

ম্লান হাসিয়া রামচন্দ্র বলিল, না, মন্দ নয়—তবে আমার ভালও লাগছে না।

কেন, বেশ ত গান-বাজনা নিয়ে আছ, আমারই বরঞ্চ ভাল না লাগবার কথা!

তোমার আর ভাবনা কি, মায়া। সংসার আছে, তুলসী গাছ আছে, কত ছোটখাটো কাজ আছে।

কি করি, তোমাদের মত আপিস করবার বরাত ত দেন নি ভগবান। যোগমায়া হাসিল।

করবে আপিস? কর ত দেখ—রমেশবাবু ছুটি চাইছেন এক মাস, তোমায় একটিনি দিই।

যাও, খালি ঠাট্টা! কেন ভাল লাগছে না—বললে না ত?

এমনই, সব কথার কি মানে থাকে?

হয়ত থাকে না। থাকিলেও সে কথা লইয়া পীড়াপীড়ি করিতে পারে না যোগমায়া।

কিন্তু তাহার পরদিনই সন্ধ্যার পর রামচন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া হাসিমুখে বলিল, আজই ওরা কলকাতায় যাচ্ছে।

ভাদ্দর মাস ব'লে কেউ আপত্তি করলেন না?

আপত্তি মানবে কে, পূর্ণিমার যা জিদ! সে ধনুকভাঙা পণ ক'রে বসেছে—কলকাতায় যাওয়া না হ'লে জলস্পর্শ করবে না।

মেয়েমানুষের অত জেদ ভাল নয়। একটা লক্ষণের কাজ আছে ত।

রামচন্দ্র প্রত্যুত্তর করিল না। আজ সে বহুদিন পরে রান্নাঘরে পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া যোগমায়ার সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিল, রান্না লইয়া রহস্যও করিল কত। আজ রাত্রিতেও রামচন্দ্রের বাহুবন্ধনে বন্দিনী হইয়া যোগমায়া নিজেকে পরম সুখী মনে করিল। পরম স্নেহভরে রামচন্দ্রের মাথার চুলে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে কহিল, ঘুমোও।

সহসা রামচন্দ্র আবেগকম্পিত স্বরে বলিল, সবাই যদি আমায় ত্যাগ করে—তুমি করবে না ত মায়া?

যোগমায়া অঙ্গুলি সঞ্চালন থামাইয়া বলিল, স্ত্রী বুঝি আবার স্বামীকে ত্যাগ করে? কি যে বল!

রামচন্দ্র যোগমায়ার স্কন্ধদেশে মুখ গুঁজিয়া কহিল, কি জানি, আমার খালি ভয় হয়—কেউ বুঝি আমায় ছেড়ে গেল। যাকে আঁকড়ে ধরতে চাই—সে চলে যায় দূরে।

যোগমায়া হাসিয়া বলিল, আমি ত কাছেই আছি।

রামচন্দ্র বাহুবন্ধন নিবিড় করিয়া গদ্গদ্ স্বরে বলিল, তাই থাক।

শীত শেষ হইয়া ফাল্গুন আসিল। প্রবাসে একটি বৎসর কাটিল যোগমায়ার। এবার ফাল্গুন অফুরন্ত আলস্য আনিয়াছে যোগমায়ার জন্য। এমন মিষ্ট হাওয়া, খালি আঁচল পাতিয়া মেঝেয় শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। সুরকীর মাজা মেঝে, বেশ লাগে শুইতে।

কালীতারা ত এক দিন রহস্য করিয়া বলিল, আজ কি বার ভাই? বুধ? তা হ'লে বলি—কিছু মনে করো না। এখানে এসে তোমার রূপ যেন খুলেছে, ভাই। বেশ একটু মোটাও হ'য়েছ।

যোগমায়া হাসিয়া বলিল, তাই নাকি?

কালীতারা বলিল, তা ছাড়া রঙও তোমার ফরসা হ'য়েছে। যে সস্তা ইলিশ মাছ—খেলে নাকি সালসার কাজ করে।

তুমিও ত অনেকদিন ধরে মাছ খাচ্ছ, তবে মোটা হ'চ্ছ না কেন, দিদি?

পোড়া কপাল! অম্বলে অম্বলে শরীর পাত হ'য়ে গেল। যেমন ওনার, তেমনি আমার। ইলিশ মাছ কি বাড়ী ঢুকতে পায়, সিঙ্গি, চুনো-চানা খেয়ে কাটাচ্ছি।

গতর লাগলে কি হবে, দিদি। যা শরীর টিস্ টিস্ করে আজকাল। রোগটোগ হ'ল নাকি, কে জানে।

শরীর টিস্ টিস্ করে? সত্যি?

হাঁ দিদি, গা বমি বমি—

হাসিতে হাসিতে কালীতারার দম আটকাইবার জো।

যোগমায়া মুখ শুকাইয়া বলিল, হাসছ কেন, দিদি?

হাসছি কি আর সাধে—সন্দেশ খাওয়াবার পালা আসছে কিনা, তাই। বলিয়া তাহার কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস্ ফিস্ করিতেই—লজ্জায় যোগমায়ার মুখ সিন্দূর বর্ণ ধারণ করিল। কালীতারা চলিয়া গেলেও সে তেমনই ভাবে বসিয়া রহিল। মনে পড়িল, রাধারাণীর কথা। আজ কতকাল হইল সই তাহার চিঠি দেয় নাই। যোগমায়ারই বা তাহাকে মনে পড়িয়াছে কই? নূতন জায়গা'য় নূতন সংসার লইয়া এমন মাতিয়া উঠিয়াছে যোগমায়া—পুরানো সঙ্গী-সাথীদের মনেই পড়ে না আর! কে জানে, সই এতদিনে শ্বশুর-বাড়ী ফিরিয়াছে কি না। যে পত্নীগতপ্রাণ সয়া—সইকে এত দীর্ঘ দিন বাপের বাড়ীতে নিশ্চয়ই ফেলিয়া রাখে নাই। আবার সইয়ের শরীর সারিয়া উঠিয়াছে, আবার হয়ত—

কণ্টকিত দেহে যোগমায়া সইয়ের সঙ্গে নিজের অবস্থার তুলনা করিল। কে আসিতেছে আজ যোগমায়ার বুক পূর্ণ করিতে? যদি কালীদির অনুমানই সত্য হয়, স্বামীকে তার এ-কথা বলা উচিত। একলাটি বাসায় থাকিতে সে সাহস করে না। কিন্তু এ-কথা সে বলিবে কি করিয়া? লজ্জায় কোনরকমে চোখ কান বুজিয়া? না, যোগমায়া তা পারিবে না। উনি হয়ত না জানি কত ঠাট্টাই করিবেন।

বলি কি বলিব না—এই চিন্তাই মনে অনবরত তোলা-পাড়া করিতে লাগিল। আনন্দ ও লজ্জার মধ্যে রীতিমত ঝগড়া বাধিয়া গেল, এবং শেষ পর্য্যন্ত লজ্জাকে পরাজয় মানিতে হইল।

সেই দিন রাত্রিতে যোগমায়া তন্দ্রামগ্ন রামচন্দ্রকে ঠেলিয়া বলিল, শুনছ?

আঁ! তন্দ্রার ঘোরে রামচন্দ্র উত্তর দিল।

আজকাল আমার শরীর বড় খারাপ যাচ্ছে।

শরীর খারাপ? মুহূর্ত্তে রামচন্দ্রের তন্দ্রা টুটিয়া গেল। চোখ কচলাইতে কচলাইতে সে বলিল, এ কথা বল নি কেন আমায়? অ্যাঁ। কালই ডাক্তার—

ডাক্তার ডাকতে হবে না, সে সব কিছু নয়।

তবে?

এইবার রাজ্যের লজ্জা যোগমায়ার ঘাড়ে চাপিল। তবু সে বালিসে মুখ গুঁজিয়া বলিয়া ফেলিল, কালীদি বললে—সবাইর ও রকম হয়। তা ছাড়া প্রথম বার—

আনন্দে রামচন্দ্র গায়ের চাদর ফেলিয়া দিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল; উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, সত্যি? সত্যি? তা হলে তোমায় ত মোটা রকম একটা বকশিশ দিতে হয়। এবং পর মুহূর্ত্তে নিবিড় চুম্বনের দ্বারা যোগমায়াকে পুরস্কৃত করিতেও সে ভুলিল না।

কেষ্টর মা ঘুঁটে দিতে আসিলে যোগমায়া বলিল, আমাদের বাড়ীতে দু-একখানা কাজ ক'রে দিতে পারবে কেষ্টর মা?

কেন পারব না বৌমা, আপনারা যদি অনুগ্রহ করে দেন, বসেই ত আছি।

যোগমায়া বলিল, উনি বলেছেন—আট আনা ক'রে মাইনে দেবেন। দু-বেলা উঠোনটা ধুয়ে—বাসন ক'খানা মেজে—রান্নাঘরটা নিকিয়ে দেবে, পারবে ত?

একগাল হাসিয়া কেষ্টর মা বলিল, খুব পারব বৌঠাকরোণ। যদি বলেন—জলও তুলে দিতে পারি।

না, লক্ষ্মণ জল তুলে দেয় রোজ। তা ছাড়া তুমি বুড়ো মানুষ—

আর বৌমা, বুড়ো মানুষ বলে কি পোড়া পেট বোঝে? গরিব-দুঃখীর শরীল-অশরীল দেখতে গেলে চলে না। যদি বল, আর দু-আনা দিও—বাটনাটাও বেটে দেব।

আচ্ছা, ওঁকে জিজ্ঞেস ক'রে বলব। উনি ত দুপুর বেলায় খেতে আসবেন।

তা হ'লে আজ থেকেই নাগি? বৈকেলে আসব'খুন।

এখানে আসিবার মাসখানেক পর হইতে বেলা একটার সময় রামচন্দ্র আহার করে। ঘণ্টাখানেক বিশ্রামান্তে পুনরায় আপিস যায়। আপিস আর বাড়ী যখন পিঠাপিঠি—তখন দশটায় নাকে মুখে ভাত গুঁজিয়া ওখানে গিয়া বসিবার কি প্রয়োজন?

একখানা পোষ্টকার্ডের চিঠি যোগমায়ার হাতে দিয়া রামচন্দ্র বলিল, মা লিখেছেন, পড়।

রামচন্দ্র স্নান করিতে গেলে যোগমায়া পড়িল:

শুভাশীর্ব্বাদঞ্চাগে,

পরে তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলাম। বধূমাতাকে এখন কাজকর্ম্ম বিশেষ কিছু করিতে দিবে না, একজন কাজ করিবার লোক রাখিবে। জল-আচরণীয় যেন হয়। আর সাত মাস পড়িলেই —বৈশাখের মাঝামাঝি আমি বধূমাতাকে আনিতে ওখানে যাইব। ছুটি পাইলে তুমিও রাখিয়া যাইতে পার। অধিক কি লিখিব, ভগবানের আশীর্ব্বাদে এ বাটীর প্রাণগতিক সব মঙ্গল। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে ও বধূমাতাকে জানাইবে। সদাসর্ব্বদা সাবধানে থাকিবে ও পত্রপাঠ উত্তর দিবে।

ইতি—

মাথা মুছিতে মুছিতে রামচন্দ্র বলিল, সবখানি যে পড়ে ফেললে? তুমি বোশেখ মাসে বাড়ী চল, আমিও ছুটির দরখাস্ত ক'রে দিই। কেমন?

বেশ ত। যোগমায়া ভাত বাড়িতে গেল।

আহার ও বিশ্রাম সারিয়া রামচন্দ্র আপিস চলিয়া গেলে যোগমায়া আর একবার পত্রখানি পড়িল। পড়িয়া যত্ন করিয়া কুলুঙ্গিতে রাখিয়া দিল। তারপর স্থচ স্থতা ও কাঁথা লইয়া বসিয়া সেই দিনের সদ্যসমাপ্ত হাতীটার পায়ের নীচের পদ্মপাতা ও পদ্মফুলের নক্সার উপর স্থচ চালাইতে লাগিল।

সেলাই করিবার কালে আজকাল যোগমায়া প্রায়ই নাকিস্থরে গুন্ গুন্ করিয়া গান গায়। গান নয়—ছড়া। কালীতারার অনুকরণ করিয়া সে কখনো লঘুছন্দে—কখনও বা টানিয়া টানিয়া আবৃত্তি করে:

ধন, ধন, ধন—বাড়ীতে ফুলের বন,
এ ধন যার ঘরে নেই তার বৃথাই জীবন।
তারা কিসের গরব করে,
কেন আগুনে পুড়ে না মরে।

কখনো বলে:—

ধান ভানলে কুঁড়ো দেব—মাছ কুটলে মুড়ো দেব,
গাই বিয়োলে বাছুর দেব—চাঁদের কপালে চাঁদ টী
দিয়ে যা।

টী শব্দটি দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া আপন মনেই সে হাসিতে থাকে।

অবশেষে বৈশাখ আসিল। বিদায়ের দিনও নিকটবর্ত্তী হইল। রামচন্দ্রের ছুটি মঞ্জুর হইয়াছে। মঞ্জুরী ইংরেজী লেখাটা যোগমায়ার সামনে ফেলিয়া ধরিয়া বলিল, এই দেখ, হুকুম হ'য়েছে ছুটির। কালই ভাল দিন আছে, যাত্রা করব। আজ মাকে চিঠি লিখে দিলাম।

যোগমায়া বলিল, কালই? বলিয়া পশ্চিম দিকের বাবুই-বাসা-অলঙ্কৃত তালগাছটার পানে একবার চাহিল। তার মুখের আনন্দটা ঠিকমত পরিস্ফুট হইল না।

ছোট্ট উঠানে যেখানে পালং শাকের ক্ষেত ছিল—যোগমায়া রাঙা নটে বুনিয়াছে। ঘন ঠাস বুনানিতে সেখানটা লাল চেলি পাতিয়া দেওয়ার মত শোভা পাইতেছে। ওপাশের প্রাচীরের মাথা ছাড়াইয়া দু'টি পেঁপেগাছ উঠিয়াছে। ফুলে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া গিয়াছে। চালের উপর কুমড়ার লতা সতেজ হইয়াছে ও হলুদ বর্ণের ফুল ফুটিতেছে। কুয়াতলায় গেল বর্ষায় পোঁতা পাতি লেবুগাছটা জল পাইয়া অনেকগুলি নূতন শাখা বিস্তার করিয়া ঝাঁকড়া হইতেছে। রান্নাঘরের মাথা-বরাবর যে আমগাছটা উঠিয়াছে—আপিসের বড়বাবুরা আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন—ওটি নাকি কাটিয়া ফেলা দরকার। তা যোগমায়া না থাকিলে উঁহারা যাহা খুসি করুন, নিজের হাতে গাছ পুঁতিয়া নাকি কাটিয়া ফেলা যায়? কাল চলিয়া যাইবে, আবার কত মাস পরে ফিরিয়া আসিয়া ওই রাঙা নটের শোভা, পেঁপে ও কুমড়ার ফুল, চালার ওপাশের আমগাছটা বা ঝাঁকড়া লেবুগাছ সবগুলিই ঠিক এমনভাবে দেখিবে কিনা, কে জানে!

বাড়ী যাওয়ার আনন্দ ও বাসা ত্যাগের বেদনার মাঝে যোগমায়া দোল খাইতে লাগিল।

রাত্রিতে রামচন্দ্রকে বলিল, লক্ষ্মণকে ব'লো, গাছপালা যেন কিছু নষ্ট না হয়। আমি এসে—

রামচন্দ্র বলিল, আবার যে আমরা এখানে আসব—কে বললে তোমাকে? আর আমরা আসব না।

কেন? শুষ্ক মুখে যোগমায়া প্রশ্ন করিল। গাছগুলো তা হ'লে কি হবে?

যারা আসবে, তারা ওর ফল ভোগ করবে। বদলির বাসা এমনিই মায়া, একজন গাছ পোঁতে—আর একজন ফল খায়।

না না, তুমি এইখানেই বদলি হবার চেষ্টা করো।

বদলির চেষ্টা করতে পারি, হাত আমার নেই। ওপরওয়ালার মর্জ্জি।

কালীতারা চুল বাঁধিয়া ও সিঁথিতে সিঁদুর দিয়া যাত্রার আয়োজন সুসম্পূর্ণ করিয়া দিল। কেষ্টর মা পায়ে আলতা পরাইয়া দিল; তার পর হাঁড়ি, সরা ও ফুটা বালতি, ঘটি চাহিয়া লইয়া নিজের বাড়ীতে রাখিয়া আসিল ও আঁচলের খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, আহা, তোমার জন্যে পেরাণডা আমার ডুকরে ডুকরে উঠছে—বৌমা। কি মনিষ্যিই ছিলে। আবার এসো মা, রাঙা খোকা কোলে করে আবার এসো।

কালীতারা ম্লান হাসিয়া বলিল, যে যায় সে আর আসে না, ভাই। কত বদলিই দেখলাম। তোমার জন্যে, যেমন মন কেমন করছে—এমন কখনো করে নি ভাই। সেও আঁচলে চোখ মুছিতে লাগিল।

যোগমায়া তাহার খোকাটিকে কোলে করিয়া অনেকগুলি চুমা তাহার গালে দিয়া বলিল, চিঠি দেবে ত, দিদি?

কালীতারা বলিল, সবাই বলে চিঠি দিও, সবাই ভুলে যায়। প্রথম প্রথম দুই একখানা দেয়ও—কেউ কেউ, তার পর তুমিও যেমন! একটু চুপি চুপি বলিল, কুষ্টে থেকে বদলি হ'য়েছ ভালই হ'য়েছে, না হ'লে কর্ত্তাটিকে হারাতে, ভাই।

আজ কালীতারার কথায় যোগমায়া রাগ করিল না, হাসিমুখেই বলিল, সে ভাই গুরুজনের আশীর্ব্বাদ আর ওঁর দয়া। বলিয়া উপর পানে চাহিল।

সকলের কাছে বিদায় লইয়া ও তুলসী তলায় প্রণাম সারিয়া গরুর গাড়ী আসিলে জিনিসপত্রের স্তূপের মধ্যে উঠিয়া বসিল যোগমায়া। রামচন্দ্রের স্থান গাড়ীর মধ্যে হইবে না। কতটুকুই বা পথ, সে হাঁটিয়াই যাইবে। পিছনের ঝাঁকড়া ডুমুর গাছ, পোষ্ট আপিসের অঙ্গনে আম কাঁঠাল বেল গাছ, হলদে রঙের পোষ্ট আপিস ও কোয়ার্টার, ছেলে কোলে ম্লানমুখী কালীতারা, লক্ষ্মণ ও ভুবন পিওনের অবগুণ্ঠনবতী বউ, মেয়ে ও দিগম্বর ছেলেগুলা——ক্রমে ক্রমে সব মিলাইয়া গেল। কেষ্টর মা চোখে আঁচল দিয়া বড় রাস্তার খানিক দূর পর্য্যন্ত আসিল ও বলিতে লাগিল, আবার এসো মা, রাঙা খোকা কোলে ক'রে—

বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা গেল শুধু তালগাছটা। বাবুই পাখীর বাসায় ভর্ত্তি তাল গাছটা। বৈকালের হাওয়ায় পাখীর বাসাগুলি এধার-ওধার দুলিতেছে, ঝড় উঠিলে কত বাসা যে ভাঙ্গিয়া যায়। ছইয়ের গলুই দিয়া যেটুকু আকাশ দেখা যায়—তাহার বর্ণ না নীল, না ধূসর। কিংবা অশ্রুতে ঝাপসা-দৃষ্টি যোগমায়ার চোখে সে আকাশের বর্ণ নাই। পাতার সঙ্গে ধুলা উড়িতেছে, বুঝি ঝড়ই উঠিয়াছে!

চতুর্থ অধ্যায়

১

বধূজীবনের গৌরব বহিয়া যোগমায়া আজ শ্বশুরবাড়ীতে আসিতেছে। জীবন-গতির তালে তালে মানুষের পশ্চাতের পটভূমি প্রতি মুহূর্ত্তে মুছিয়া যায়, ট্রেনের তালে তালে তেমনই কুষ্টিয়ার বাসার বৎসরাধিক সঞ্চিত স্মৃতি—বাড়ী পৌঁছানোর তাড়ায় মলিন হইয়া আসিতেছিল।

শ্বশুরবাড়ীর গ্রাম কতকাল পরে সে দেখিল। আম বাগানের মধ্যে সেই ছোট টিনের চালা দিয়া তৈয়ারী ষ্টেশন-ঘরটি, ষ্টেশনের সম্মুখে সঙ্কীর্ণ পাকা রাস্তায় সেই নীচু ছাদওয়ালা রুগ্ন ও খর্ব্বকায় অশ্ব-চালিত গাড়ীগুলি এলোমেলোভাবে দাঁড়াইয়া আছে; ট্রেন আসিবামাত্র গাড়োয়ানেরা লোহার রেলিঙের ওপারে দাঁড়াইয়া তেমনি কলরব তুলিল, গাড়ী লাগবে বাবু, গাড়ী? টিকেট দিয়া গেটের বাহিরে আসিতে-না-আসিতে কেহ বা রামচন্দ্রের হাত হইতে পুঁটুলি কাড়িয়া লইয়া বলিল, এদিকে বাবু, এদিকে আসুন।

পাকা রাস্তার নীচের ডোবাগুলিতে ও নয়ন-জুলিতে জল থই থই করিতেছে—রাস্তায় ধুলাও নাই। কাল বিকালে যে ঝড় উঠিয়াছিল—

এখানেও সে পৌঁছিয়াছিল তাহা হইলে! আজ যোগমায়াদের সাদর অভ্যর্থনা জানাইতে রুদ্র বৈশাখী-প্রকৃতি সুস্নিগ্ধ হইয়াছে; আকাশে কিরণ আছে—তাপ নাই, পথে ধূলা নাই।

দুয়ারগোড়ায় শাশুড়ী ও পিসিমা দাঁড়াইয়া ছিলেন। শাশুড়ী আগাইয়া আসিলেন পথ পর্য্যন্ত। রামচন্দ্র তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইল—যোগমায়াও শাশুড়ীকে প্রণাম করিল। তিনি চিবুক চুম্বন করিয়া তুইজনকেই প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। বলিলেন, এত দেরি হ'ল যে?

রামচন্দ্র বলিল, এক ঘণ্টা গাড়ী লেট।

পিসিমার পায়ে প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন, ভাল ত মা?

পিসিমা বড় রোগা হইয়া গিয়াছেন। চুল অনেকগুলি পাকিয়াছে, দাঁত একটিও নাই, চামড়া সব লোল হইয়া অমন যে গৌর বর্ণ—তামাটে করিয়া দিয়াছে।

আপনি বড্ড রোগা হয়ে গেছেন, পিসিমা।

আর মা, বেঁচে উঠলাম, এই ঢের! যে শীত এবার। ফুলে-ফেঁপে পড়েছিলাম। মুখে কিছু ভাল লাগত না, অরুচি। তোমার খোকা দেখব বলেই বুঝি মা-গঙ্গা এবার নিলেন না।

খবর পাইয়া প্রতিবেশিনীরা দেখিতে আসিল। গাড়ী বোঝাই করিয়া জিনিষ আনিয়াছে রামচন্দ্র। আনাজপাতি হইতে বাসনকোসন পর্য্যন্ত—কত কি মাটির, কাঠের, পিতল কাঁসার জিনিষ! কুশল-প্রশ্ন আদান-প্রদানের পর তাহারা চলিয়া গেল। বধূ যোগমায়াকে তাহারা যেমন আগ্রহের সহিত দেখিয়াছিল—ভাবী জননী যোগমায়াকেও তাহারা তেমনই আগ্রহের সহিত নিরীক্ষণ করিল। মেয়েদের যত রূপই থাকুক—খালি কাঁকে নাকি সবই বৃথা!

এখানকার উজ্জ্বল আকাশের আবরণে কুষ্টিয়ার ঝটিকাক্ষুব্ধ আকাশ চাপা পড়িয়া গেল। আহারাদি করিয়া সুস্থ হইতে সন্ধ্যা কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা দেখাইবার তাড়া আজ যোগমায়ার নাই; শ্রান্ত বধূকে ব্যস্ত হইতে নিষেধ করিয়া সে-সব লক্ষণের কাজ শাশুড়ীই সারিলেন। যোগমায়া বড় ঘরটিতেই বসিয়া রহিল। সেই বিবাহ-দিনের বসুধারা-বিচিত্রিত দেওয়াল—সপ্ত ধারার মাথায় সিঁদুর ও হলুদের ফোঁটা; ঘিয়ের ঈষৎ কালো সাতটি ধারা দেওয়ালের গা বাহিয়া খানিকটা গড়াইয়া নীচে নামিয়াছে। জোড়া কুলুঙ্গির নীচেই সেই দাগ। এই বসুধারা শুধু রামচন্দ্রের বিবাহ-দিনেই ওই দেওয়ালে বিচিত্রিত হইয়া উঠে নাই। এই বংশের কত ছেলের অন্নপ্রাশনে, উপনয়নে ও বিবাহে—পুরাতন চিত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। অনুসন্ধান করিলে কয়েক পুরুষের ইতিহাস উহার মধ্যে মিলিতে পারে।

পূর্ব্বরাত্রি জাগরণজনিত ক্লান্তি দুইজনেরই ছিল—তবু দশটার আগে ঘুমাইবার অবসর মিলিল না। নিজের বাস্তুভিটায় আসিয়া যোগমায়া যেন রামচন্দ্রকে সব সংশয়, সব দ্বন্দ্বের অতীত করিয়া পাইয়াছে, তাই গাঢ় নিদ্রায় দণ্ডেকের মধ্যে দীর্ঘ রাত্রি শেষ হইয়া গেল।

সকালে শাশুড়ী বলিলেন,—ঠাকুরঝি, আজ তরকারি কুটো না, আমাদের দু'জনের খাওয়া বই ত না, ভাতে ভাত ক'রে নিলেই হবে। ওদের গাঙ্গুলি-বাড়ী নেমন্তন্ন হ'য়েছে।

পিসিমা বলিলেন, গাঙ্গুলি-বাড়ী কিসের নেমন্তন্ন?

ছেলের বউ-ভাত। দ্বিতীয় পক্ষ বলে বেশী জাঁক-জমক করে নি। আমাদের সঙ্গে একটা কুটুম্বিতে আছে বলে বলেছে।

যোগমায়া তখন কুয়াতলায় কাপড় কাচিতেছিল, এ সব কথা শুনিতে পাইল না। কাপড় ছাড়িয়া সে পিসিমার ঘরে আসিয়া বলিল, আজ আকায় আগুন দেন নি কেন, পিসিমা?

পিসিমা বলিলেন, তোমাদের নেমন্তন্ন আছে মা। খানিক ভাবিয়া বলিলেন, সে ত সেই বিকেলবেলা। দু'টি ঝালের ঝোল ভাত খেয়ে গেলে মন্দ হ'ত না।

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় নেমন্তন্ন?

গাঙ্গুলি-বাড়ী। বউভাতের নেমন্তন্ন।

বউভাতের? কার বিয়ে পিসিমা?

আর মা, শুনলে তুমি দুঃখু প'বে—অনুকূলের বিয়ে।

অনুকূলবাবু? সইয়ের বর?

হ্যাঁ মা, তোমরা ত দেশে ছিলে না, জানবে কোত্থেকে। বউটা ছেলে ম'তে সেই যে শয্যে নিলে—আর শ্বশুরভিটেয় পা দিতে হ'ল না। আজ ছ-মাস হ'ল—

যোগমায়ার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে দেওয়াল ধরিয়া অতি কষ্টে সে আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইল।

পিসিমা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, ও কি মা, অমন করছ কেন?

আমার মাঝে মাঝে এমন হয়, পিসিমা। একটু জল দিন, খেলেই সামলে নেব। জল পান করিয়া বলিল,—সই মরে গেল!

আর মা, কিছুই চিরস্থায়ী নয়। তবে অসময়ে গেলেই দুঃখু। তা হাতের নোয়া সিঁথির সিঁদুর নিয়ে ভাগ্যিমানী গেছে—

যোগমায়া কাষ্ঠমূর্ত্তির মত সৌভাগ্যবতীর বৈকুণ্ঠযাত্রার ইতিহাস শুনিতে লাগিল। না পড়িল তার চোখ হইতে এক ফোঁটা জল, না ফেলিল সে দীর্ঘনিশ্বাস। যেন এ ঘটনা মোটেই নূতন নহে, যোগমায়ার জীবনে কতবারই যে ঘটিয়া গিয়াছে।

খানিক পরে সে বলিল, কিন্তু আমি ত ওদের বাড়ী খেতে যেতে পারব না পিসিমা।

কেন পারবে না, মা? তোমার সই হ'ত, শোক লাগবারই কথা। সংসারের এই নিয়ম। না গেলে তোমার শাশুড়ী দুঃখু করবেন।

দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া যোগমায়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেল। কাছেই বাড়ী; লোকজন সব ব্যস্ত হইয়া এধার ওধার করিতেছে। এই-মাত্র ব্রাহ্মণ ভোজন হইয়া গেল। লুচি নহে, ভাত। কাজেই—খুরি বা গেলাসে করিয়া সামান্য কিছু কিছু মিষ্ট লইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে স্ফীতোদর ব্রাহ্মণেরা পৈতা গলায় ও চাদর কাঁধে ফেলিয়া কচি কচি ছেলে মেয়ের হাত ধরিয়া রন্ধনের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করিতে করিতে বাহির হইয়া গেলেন।

বাড়ী ঢুকিবার মুখেই অনুকূল অর্থাৎ সয়াকে দেখা গেল। সেদিন আমতলায়-বসা বিমর্ষ বদন ও উদ্যমহীন অনুকূল নহে, কর্ম্মব্যস্ততায় আজ তার সারা দেহে চাঞ্চল্য। হাতে হলদে সুতায় বাঁধা শুকনা দূর্ব্বাগুচ্ছ, পরনে ধবধবে একখানি ধুতি। সেখানটা পুষ্পসার সুরভিতে ভারাক্রান্ত।

সইয়ের দুর্ভাবনা আজ শেষ হইয়াছে। তাহার বিরহে লোকটি আত্মহত্যা করে নাই বা সন্ন্যাস লয় নাই। সই বাঁচিয়া থাকিলে সে সুখী হইতে পারিত!

কিছুই ভাল লাগিল না। যে ঘরে সই-পাতানো হইয়াছিল, সেই ঘরেই যোগমায়াদের খাইবার জায়গা হইয়াছে। এক ঘর মেয়ে খাইতে বসিয়া কল কল করিতেছে। যোগমায়া ঘোমটাটা আর একটু টানিয়া এক কোণে গিয়া বসিল। ঘর ভরিয়া কত মেয়েই না বসিয়াছে, সই তাহার কোথাও নাই। তবু যোগমায়ার মনে হইল, ঐ হাফ্ জানালা দিয়া ঝির ঝির করিয়া যেমন হাওয়া আসিতেছে—সেই হাওয়ার সঙ্গে সইয়ের নিশ্বাসও বুঝি ভাসিয়া আসিতেছে! সে নিশ্বাস কাহারও কানের কাছে বাজিল না, যোগমায়ার কানের গোড়াতেই শোঁ-শোঁ করিয়া একটানা বহিতে লাগিল। কুষ্টিয়া ষ্টেশনে আদালত-প্রাঙ্গণের সেই সারিবদ্ধ ঝাউগাছগুলির একটানা করুণ আর্ত্তনাদের মত।

কিছুই সে মুখে তুলিতে পারিল না, বউ দেখিবার আগ্রহে ও-ঘরেও গেল না।

শাশুড়ী বলিলেন, বউ দেখেছ?

আমার মাথাটা বড্ড ঘুরছে—মা।

মাথা ঘুরছে? আচ্ছা একটুখানি দাঁড়াও, আমি বউয়ের মুখ দেখে আসছি। বলিয়া টাকাটি আঁচল হইতে খুলিতে খুলিতে ও-ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, খাসা বউ হয়েছে, যেমন রং—তেমনি গড়ন-পেটন।

বাড়ী হইতে বাহির হইবার মুখে যোগমায়া আর একবার পিছন ফিরিয়া ঘরখানির পানে চাহিল।

রাত্রিতে হঠাৎ রামচন্দ্রের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘর অন্ধকার। মনে হইল, ঘরের মেঝের উপর পড়িয়া কে যেন মৃদু স্বরে কাতরাইতেছে। হাতড়াইয়া সে বিছানার এপাশ ওপাশ দেখিল। না, যোগমায়া কোথাও নাই। বুকটা তার ছাঁৎ করিয়া উঠিল। তবে কে—

সদ্য ঘুমভাঙা স্বরে সে ডাকিল,—মায়া, মায়া? গলার মধ্যে ঘড় ঘড় করিয়া ধ্বনি উঠিল—স্বর বুঝি তেমন বাহির হইল না। তবে কি সে দুঃস্বপ্ন দেখিতেছে? দুঃস্বপ্ন দেখিয়া চীৎকার করিলে অমনই গলার স্বর বাহির হয় না। কিন্তু না, এই ত সে জাগিয়া আছে। এই ত হাত দিয়া বুঝিতেছে—ডান ধারে অনেকখানি জায়গা খালি পড়িয়া আছে, কেহ নাই। কানেও ত মৃদু যন্ত্রণাব্যঞ্জক ধ্বনি শোনা যায়। শেষ তন্দ্রাটুকু সবলে ঝাড়িয়া রামচন্দ্র বিছানার উপর বসিয়া ডাকিল,—মায়া?

সেই বিকৃত ভয়ার্ত্ত ধ্বনি দেওয়ালে আহত হইল, মৃদু আর্ত্তনাদ থামিয়া গেল।

রামচন্দ্র আবার ডাকিল, মায়া? সঙ্গে সঙ্গে বালিশের নীচেয় রাখা দীপশলাকা জ্বালিয়া ঘরের চারিদিক দেখিয়া লইল। ঐ যে মেঝের মাদু

পাতিয়া ও-পাশে মুখ ফিরাইয়া যোগমায়া নিশ্চল হইয়া পড়িয়া আছে।

শিয়রের কাছেই প্রদীপ ছিল, কাঠি জ্বলিয়া শেষ হইবার আগেই সে সলিতায় অগ্নি স্পর্শ করাইয়া দীপ জ্বালিয়া ফেলিল এবং দ্রুতপদে নীচেয় নামিয়া যোগমায়ার শিয়রে আসিয়া ডাকিল,—মায়া ?

যোগমায়া অল্প একটু নড়িয়া শব্দ করিল, উঁ।

এখানে এসে শুয়েছ কেন ? যোগমায়ার দেহে কর স্পর্শ করিয়াই রামচন্দ্র চমকিত হইয়া উঠিল, এ কি, তোমার গা যে পুড়ে যাচ্ছে ! জ্বর হয়েছে নাকি ?

যোগমায়া মাথা নাড়িয়া বলিল, না ত।

না কি ? গা যে পুড়ে যাচ্ছে ? দেখি কপাল, এদিকে ফের ত ?

রামচন্দ্রের দিকে যোগমায়া ফিরিল। শুধু কপাল তাতিয়া উঠে নাই, প্রদীপের অস্পষ্ট আলোয় যোগমায়ার মুখখানিও লাল টকটকে দেখাইতেছে ; চোখ ফুলিয়াছে, গাল ফুলিয়াছে এবং কুঞ্চিত ললাট ও ভ্রূ দেখিয়া ভিতরের যন্ত্রণাও বেশ বুঝা যাইতেছে।

আমায় বল নি কেন, মায়া ?

তোমার যে ঘুম ভেঙে যাবে। সারাদিন খেটেখুটে এসেছ—

তাই বলে অসুখ হ'লে বলবে না ? এ ভারি অন্যায়। আমাকে তুমি আপন মনে কর না তাহ'লে ?

যোগমায়া তাহার জ্বরতপ্ত দু'খানি হাত দিয়া রামচন্দ্রের ডান হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল, ওকথা বলো না, কত পাপ যে তোমার কাছে করেছি—

রামচন্দ্র বলিল, পাপ কিসের ? স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সুখদুঃখের ভাগ যদি না নিলে ত কিসের সংসার ?

যোগমায়া কাতর কণ্ঠে আবেগ ঢালিয়া বলিল, ওগো না—না, তুমি জান না—তোমায় আমি কত সন্দেহ করেছি—কত অন্যায় করেছি।

রামচন্দ্র বুঝিল, জ্বরের ঝোঁকে যোগমায়া অত্যন্ত ভাবপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছে। এমন অনেকে হয়। কেহ গান গায়, কেহ অসংলগ্ন বকে, কেহ বা দোষ না করিয়াও খালি কাঁদে আর ক্ষমা প্রার্থনা করে। যোগমায়ার তেমনই হইয়াছে হয়ত।

ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে সে বলিল, ঘুমোবার চেষ্টা কর—আমি বাতাস করছি।

এই কথায় যোগমায়া হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। রামচন্দ্র যত সান্ত্বনা দেয়—ততই তার ক্রন্দনের বেগ বাড়ে। যত বুঝাইতে চেষ্টা করে—ততই সে অবুঝের মত বলে, ওগো, আমার এ পাপ কি তুমি ক্ষমা করবে ?

রামচন্দ্র ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিল, শুধু শুধু বাজে কথা বলছ কেন, আর ক্ষমাই বা চাইছ কেন ? কিছুই ত কর নি তুমি।

শুনবে—শুনবে ? শোন তবে। যদি মরে যাই, আর বলতে না পারি, যমের বাড়ী গিয়ে যে সাজা ভোগ করব চিরকাল।

একটু চুপ কর না, মায়া ! জল খাবে ?

যোগমায়া হাঁ করিয়া কহিল, দাও। বড় তেষ্টা—বুকের মধ্যে শুকিয়ে উঠছে। ঢক্ ঢক্ করিয়া এক ঘটি জল পান করিয়া যোগমায়া বলিল, শুনবে ?

আজ নয়, কাল শুনব।

না, আজই। তোমার ক্ষমা না পেলে আমি যে স্বস্তি পাচ্ছি না। বড় জ্বালা এইখানটায়। বুকে এমন ভাবে হাত রাখিল যোগমায়া যে, চাপড় মারার মতই শব্দ হইল।

শশব্যস্তে তাহার হাত ধরিয়া রামচন্দ্র কহিল, আচ্ছা—শুনছি—শুনছি তোমার কথা। বল।

আর একটু জল দাও। আঃ—শোন। তুমি পূর্ণিমা-ঠাকুরঝির সঙ্গে কথা কইতে, সে গান গাইলে তুমি বাজাতে—আমার সন্দেহ হ'ত।

কাষ্ঠমূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল রামচন্দ্র। এ যোগমায়া বলে কি ? পরস্পরকে ভালবাসিলে—প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিলে—দু'টি হৃদয়ই কি স্বচ্ছ দর্পণের মত হইয়া উঠে পরস্পরের কাছে ? সেদিনের প্রণয়ভীরু বালিকা—কোথা হইতে বুকের মাঝে তার জাগিল নারীমনের চির ঈর্ষা—যে বিষে জর্জ্জর হইয়া সোনার সংসার জ্বলিয়া যায়, প্রেমের পুষ্পোদ্যান শুকাইয়া উঠে।

জ্বরের ঘোরে যোগমায়ার এ উচ্ছ্বাস নহে—এ যেন রামচন্দ্রেরই মৃত্যুদণ্ডাদেশ। যোগমায়া কি বলিতেছে—সে কথা রামচন্দ্রের কানে বাজিতেছে শুধু, মস্তিষ্কে আঘাত করিয়া চেতন-দ্বারে কোন অর্থ পরিষ্কার করিয়া দিতেছে না। অমন করিয়া সেই দুর্দ্দিনে যোগমায়াই বা সরিয়া গেল কেন ? তেমন দুর্দ্দিন রামচন্দ্রের জীবনে আর আসে নাই।

সব বলা হইয়া গেলে যোগমায়া কাতর স্বরে বলিল, আমায় ক্ষমা করলে ?

রামচন্দ্র বলিল, দোষ কর নি, তবু যদি ক্ষমা পেলে তুমি খুসী হও—আমি ক্ষমা করলাম।

হাত বাড়াইয়া যোগমায়া বলিল, তোমার পায়ের ধুলো?

রামচন্দ্র নিজের পদ স্পর্শ করিয়া সেই হাত যোগমায়ার মাথায় ঠেকাইল। যোগমায়া মৃদুস্বরে বলিল, আর একটু জল।

সকাল বেলায় শীত করিয়া জ্বর আসিল।

শাশুড়ী বলিলেন, ম্যালেরিয়া।

রামচন্দ্র বলিল, বোশেখ মাসে ম্যালেরিয়া হবে কেন?

শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, বউমা, কাল কি ওদের বাড়ীতে দই খেয়েছিলে বেশী?

যোগমায়া মাথা নাড়িয়া জানাইল—না।

তবে? শশী কবিরাজকে একবার খবর দেব? তাই যাই। পোয়াতী মানুষ—এমন ধারা জ্বরই বা হঠাৎ হ'ল কেন? দিষ্টি-ফিষ্টি লাগে নি ত? অমনি ভট্চার্জ্জি মশায়ের কাছেও একবার ঘুরে আসি। নৃসিংহ কবচ কি মৃত্যুঞ্জয় কবচ য'দ দেন।

জ্বরের ঘোরে যোগমায়া কয়েকবার রাধারাণীর নামও করিল।

শাশুড়ী চিন্তিত মুখে কহিলেন, পাতান সই কি না! কাল ওবাড়ীতে নেমন্তন্ন খাওয়াতে না নিয়ে গেলেই হ'ত। আমার কি সব সময়ে বুদ্ধি যোগায়! ঠাকুর-ঝিও এমনি—যে একটা পরামর্শ দিয়ে উপ্‌কার নেই। বকিতে বকিতে তিনি ভট্টাচার্য্য-বাড়ী ছুটিলেন।

সাতদিন পরে, পাঁচন বড়ি খাইয়া কি নৃসিংহ কবচ বাহুমূলে বাঁধিয়া জ্বর ছাড়িয়া গেল—কেহ বলিতে পারে না। তবে সাতদিন পরে খুব খানিকটা ঘাম হইয়া যোগমায়ার দেহ শীতল হইয়া গেল, সে ঘুমাইয়া পড়িল। দীর্ঘ আট ঘণ্টা বাদে ঘুম ভাঙিলে সে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া বলিল, সন্ধ্যে হয়েছে বুঝি? পিদীমটা জ্বেলে—

রামচন্দ্র বলিল, সন্ধ্যে নয়—এখন বিকেল বেলা। তোমার ত জ্বর ছেড়ে গেছে। কোথায় আছ বল দেখি?

কেন—কুষ্টেয়।

না, বাড়ীতে আছ। আজ সাতদিন তোমার জ্বর হয়েছিল—বেহুঁস পড়েছিলে।

ক্ষীণকণ্ঠে যোগমায়া বলিল, সাত দিন?

একটু দুধ খাবে মিছরি দিয়ে? দাও। দুধ পান করিয়া যোগমায়া বলিল, হাঁ, মনে পড়ছে। কুষ্টে থেকে আসবার দিন কি ঝড়! গাড়ীতে বেশ শীত শীত করছিল।

আর কিছু মনে পড়ে না?

মাথা নাড়িয়া যোগমায়া বলিল, হাঁ। ওদের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে গেলাম। একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আহা, সই মরে গেল!

যোগমায়ার চোখে জল টল টল করিয়া উঠিল। রামচন্দ্র সেই অশ্রু মুছাইয়া দিলে কহিল, আচ্ছা, লোক মরে যায় কেন?

মানুষ মাত্রই মরে, না মরলে সৃষ্টি থাকে না।

কেন থাকে না? মানুষ বেঁচে থাকলেই ত ভাল, মরলেই ত দুঃখু। দেখ—সই মরে নি। যদি মরল ত রোজ রোজ আমার কাছে আসত কি করে? কত কথা বলত।

রামচন্দ্র বলিল, ও সব কথা বলতে নেই।

যোগমায়া বলিল, বললেই কি মরে যাব! না গো, আমি মরব না। সই ত কত ডাকলে, আয়—আয়, আমি গেলাম না।

রামচন্দ্রের ইচ্ছা হইল—জিজ্ঞাসা করে, কেন?

যোগমায়া বলিল, তার অদৃষ্ট মন্দ—সে মরে গেল। আমি এসব ছেড়ে যাব কেন? কেন যাব বল তো? রামচন্দ্রের হাত ধরিয়া সে হাসিল।

রামচন্দ্র বলিল, ঘুমোও।

যোগমায়া পথ্য করিলে শাশুড়ী বলিলেন, বেয়াইকে খবর পাঠাই, তিনি নিয়ে যান, এখানে থাকিলেই ওর সইয়ের কথা মনে হবে। দিষ্টি-ফিষ্টিকে আমি বড় ডরাই বাপু। জোড়া মাস ত নয়, সাধ দিতে হয় তাঁরা দিন।

পিসিমা বলিলেন, সেই ভাল। সাধের কাপড়-চোপড় যা দেবার দিয়ে—বউমাকে বাপের বাড়ীই পাঠিয়ে দাও।

শাশুড়ী বলিলেন, একখানা ভাল কাপড় কিনে আনিস ত রাম। প্রথম বার—নেহাৎ একখানা সুতির লালপাড় শাড়ী ত দেওয়া যায় না।

রামচন্দ্র বলিল, আচ্ছা।

রাত্রিতে কাপড় দেখাইয়া রামচন্দ্র বলিল, পছন্দ হয়?

যোগমায়া উজ্জ্বল চোখে শাড়ীর পানে চাহিয়া বলিল, বেশ কাপড়। এ শাড়ীর নাম কি গা?

পার্শী শাড়ী, সাত-আট বছর হ'ল উঠেছে।

যোগমায়া নাড়িয়া চাড়িয়া শাড়ীখানা দেখিতে লাগিল।

রামচন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিল, একটু মনে করে দেখ দেখি—এ শাড়ী আর কখনও দেখেছ কি না?

দেখেছি বই কি, কিন্তু কোথায়—কবে—ঠিক মনে হচ্ছে না।

আমারই হাতে আর এই ঘরে দেখেছিলে। মনে পড়ে? রামচন্দ্র কৌতুকে চক্ষু নাচাইয়া প্রশ্ন করিল যোগমায়াকে।

যোগমায়া হতবুদ্ধির মত চাহিয়া বলিল, কই, না ত।

তখন তুমি মা'র ভয়ে নাও নি এ শাড়ী। আমি বলেছিলাম, আচ্ছা আর একদিন দেব তোমায়। সাধ ক'রে যখন কিনেছি—ফিরিয়ে দেব না।

যোগমায়া ভাবিতে লাগিল।

রামচন্দ্র বলিতে লাগিল, বলেছিলাম—এক দিন সুবিধা বুঝে দেব। তখন মা'র ভয়ে পরতে চাও নি, আজ মা'র হাত দিয়েই পেলে ত এখানা।

এইবার যোগমায়ার একটি রাত্রির কথা মনে পড়িয়া গেল। মুখে লজ্জা ফুটিল। মুখ নামাইয়া সে বলিল, উঃ, এতও মনে থাকে তোমার!

রামচন্দ্র বলিল, থাকবে না মনে? বাক্স খুললেই শাড়ীখানা আমার নজরে পড়ত—আর ভাবতাম, কবে এখানা দেবার সুবিধা হবে।

যাও। বলিয়া যোগমায়া হাসিমুখেই ঘাড় কাৎ করিল।

রামচন্দ্র তাহাকে বাহুবেষ্টনে বন্দী করিয়া কহিল, যাব বই কি। তবে আজ নয়—ছুটি ফুরোলে।

সংবাদ পাইয়া রামজীবনবাবু আসিলেন। আসিয়া মেয়ের খোঁজ যত না লইলেন—বৈবাহিকার সঙ্গে খোসগল্প করিলেন তত। সেদিনকার অপমান ও ব্যথা আজ তাঁহার মনের কোণেও লাগিয়া ছিল না। গৌরবিনী মেয়ে আজ তাঁহাকে মর্য্যাদা দান করিয়াছে। শ্বশুরকুলের মর্য্যাদা ও পিতৃকুলের মর্য্যাদা। এ কথা বেয়ান অনেক বার বলিলেন, শুনিতে শুনিতে তিনিও কন্যাগর্ব্বে হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার মায়া যে ছেলেবেলা হইতেই সুলক্ষণা—সে কথা তাঁহার চেয়ে আর জানে কে? যে যেবার হয়—সেইবারই ত—দক্ষিণের বড় আটচালাখানা উঠিয়াছে, তার অন্নপ্রাশনের দিনে ছ-সেরি দুধের রাঙী গাইটা ঘোষেরা তাঁহাকে দান করিল। সেই রাঙীর বাছুর আজ সাত-আট সের দুধ দেয় দু-বেলায়। মায়ার বিবাহের সময়—

যাত্রাকালে পিসিমাকে প্রণাম করিতে গেলে তিনি নিজের ঘরের মধ্যে যোগমায়াকে আনিয়া একখানা আসন পাতিয়া বসাইয়া দুয়ারটা ভেজাইয়া দিলেন। পরে পিতলের ঘটি হইতে একটি তিলের নাড়ু ও খানকতক বাতাসা বাহির করিয়া বলিলেন, একটু জল খেয়ে যা, মা। যোগু-মেঠাই কে এনে দেবে, পয়সাই বা কোথায়। পরে কণ্ঠস্বর নামাইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিলেন, একটা কথা বলি—কাউকে ব'লো না। তোমায় একখানা গহনা দেব—আমার কানবালা। অল্প সোনাই আছে, হাঁসুলি ত হবে না, যদি খোকা হয়—সোনার পুঁটে গড়িয়ে দিও ওর ভাতের সময়। আর মেয়ে হ'লে—

যোগমায়া বলিল, তা আপনিই দেবেন গড়িয়ে।

পিসিমা চাপা গলায় বলিলেন, চুপ—চুপ, কেউ শুনতে পাবে। আমার দেবার জো নেই। তোমার শাশুড়ী জানেন—আমার হাতে কিছু নেই। শুনলে কি আর রক্ষে রাখবেন, মা! তুমি ওখান থেকে গড়িয়ে এনে বলো—তোমার বাবা দিয়েছেন, আমি আশীর্ব্বাদ করব।

নিজেই তিনি ন্যাকড়ার পুঁটুলি করিয়া জিনিষটি যোগমায়ার পেট কোঁচড়ে বাঁধিয়া দিলেন।

যোগমায়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিল।

২

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি এক দিন সকাল বেলায় হরিপুরের সদর দরজার মাথায় মধুমালতীর ঝোপে বসিয়া বেনেবউ পাখী ডাকিতেছিল, একটা খোকা—ওকা হোক, একটা খোকা—ওকা হোক।

লবঙ্গলতা উঠান ঝাঁট দিতে দিতে বলিলেন, আহা, তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। আমার মায়ার যেন একটি টুকটুকে রাঙা খোকাই হয়।

দাওয়ায় বসিয়াছিল যোগমায়া। পাখীর ডাক ও মন্তব্য সবই তাহার কানে গেল। মনে মনে খুসী হইয়া সে ঘুঁটের ছাই ভাঙিয়া দাঁত মাজিতে লাগিল। যোগমায়ার অনাবৃত বাম বাহুমূলে একখানি কবচ ও গোটা দুই মাদুলি লাল সুতা দিয়া বাঁধা রহিয়াছে। মুখখানি তার আলস্যে

ভারাতুর। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কোন ভারি কাজই সে করিতে পারে না, তথাপি সারা দেহে তার আলস্য লাগিয়া আছে। যত রাজ্যের আলস্য কি যোগমায়ার দেহকেই আশ্রয় করিয়াছে! কাজ করে না বলিয়াই শুইয়া বসিয়া যোগমায়া দিনরাত অনাগত ভবিষ্যতকে রঙীন করিয়া তুলে। তার সঙ্গে অতীতও উঁকি দেয়। কুষ্টিয়ার সেই বাসা, বিদায়-দিনে সেই সকলের অশ্রুসজল মুখ। কিন্তু এ সব চিন্তার উপরেও যে স্বপ্ন যোগমায়ার বুকে আশ্রয় লইয়াছে, তাহার নারী-জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিবার আয়োজন করিতেছে—তাহারই উজ্জ্বল রেখা উপচাইয়া পড়িতেছে তার সারা মুখে-চোখে। সকলেই বলে, রাঙা খোকা হোক্ একটি—কোল আলো-করা খোকা। ছেলেরা নাকি মেয়েদের কাছে অমূল্য। তাহারা রহস্যচ্ছলে একবারও বলে না ত—একটি মেয়ে হোক। সে-ও আজকাল মনে মনে প্রার্থনা করে, হে ভগবান্, খোকাই যেন হয়। তাহাকে চাঁদ ধরিয়া দিবার জন্য, ঘুম পাড়াইবার জন্য, তাহার দুরন্তপনাকে শান্ত করিবার জন্য—অনেকগুলি ছড়া যোগমায়া মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছে। ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্নজাল বুনিবার ফাঁকে গুন্ গুন্ করিয়া গানের সুরে অত্যন্ত সন্তর্পণে যোগমায়া সেই ছড়াগুলি আবৃত্তি করিতে থাকে।

ভয়—হাঁ, ভয়ও তাহার মনে হয় বইকি। সকলেই ত ঠাকুর-দেবতার মানত করিয়াছেন সুপ্রসবের জন্য। নারীর জীবন-মরণের সন্ধিকাল এই সন্তান প্রসবের মুহূর্ত্ত। তা ছাড়া অগণিত উপদেবতারা নাকি ভাবী জননীর উপর অকল্যাণের দৃষ্টি দিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ায় চারিদিকে। ভর সন্ধ্যাবেলায় যোগমায়া দাওয়া হইতে নামিতে পায় না, দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি তার বহুদিন হইল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ফরসা কাপড় পরিবার বা গন্ধ তৈল মাখিবার উপায় নাই, সুগন্ধি মশলা দিয়া গাত্র মার্জ্জনাও নহে। যিনি আসিতেছেন—তাঁহার কড়া শাসন যোগমায়াকে মানিতেই হয়। ছাঁচতলায় একদিন আঁচলখানি লুটাইয়া ছিল—ও-ঘরের দাওয়া হইতে লবঙ্গলতা দেখিতে পাইয়া হাঁ—হাঁ করিয়া নিষেধ করিয়াছিলেন।

বাবা ত প্রায়ই এটা-ওটা আনিয়া দেন। ডাঁসা পেয়ারা, আনারস, ইলিস মাছ, ল্যাংড়া আম, পাঁপর ভাজা, চিনা বাদাম ও তিল ভাজা দিয়া মুড়ি, কলাইয়ের ডালের বড়া, ঝিঙে-পোস্ত ইত্যাদি কত জিনিষই যে যোগমায়ার খাইতে ইচ্ছা হয় কাঁচা লঙ্কা ও কাসুন্দির আচারে তাহার প্রীতি জন্মিয়াছে। মা বলেন ছেলেটাকে রাগী না ক'রে ছাড়বি না মায়া। এত ঝালও ভাল লাগে! একটু মিষ্টি খা না বাপু।

মিষ্টি—নাম শুনিলেই গা ঘিন্ ঘিন্ করিয়া উঠে—তার খাওয়া!

সখীরা দুই-এক জন এখানে আছে। সকলেই সন্তান লাভ করিয়া গৃহিণী-পদবাচ্যা হইয়াছে। যোগমায়াকে একান্তে পাইলে—জননী-জীবন ও তাহার কর্ত্তব্যপালন সম্বন্ধে উপদেশ তাহারা অজস্রই দিয়া থাকে।

প্রায় সকলের সন্তানই দুরন্তপনায় ও বুদ্ধিমত্তায় অদ্বিতীয়। কেহ জামা টানিয়া ঘরের জিনিষপত্র একাকার করিয়া দেয়, কেহ দু'টি মাত্র দাঁতে 'কুটুস্' করিয়া এমন আঙুল কামড়াইয়া ধরে, কেহ মাড়ি দিয়া নাসিকা লেহন করিতে ভালবাসে, কেহ 'মা' 'বাবা' প্রভৃতি বলিতে শিখিয়াছে, কেহ মায়ের কোল না হইলে ককাইয়া বাড়ী মাথায় করে, কেহ বা যে-কাহারও কোলে কচি হাত বাড়াইয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং অপরিমিত হাসে—এই সব কাহিনী যোগমায়া অহরহ শুনিতেছে। সন্তানের গৌরবে সকলেই আত্মহারা! যাহাদের কোলে তিন-চারিটি আসিয়াছে—তাহারা কিছু বলে না—মুখ টিপিয়া শুধু হাসে। হাঁ, তাহারাও বলে, কিন্তু সে সন্তান-সোহাগের কথা নহে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসুখের কথা, জ্বালাতনের কথা—সংসারের দারিদ্র্যের কথাও।

সোনার স্বপ্নে মোড়া আত্মবিস্মৃত দিনগুলি। কখনও আশঙ্কা প্রবল হয়, কখনও আশার বাতি সূর্য্যের মত জ্বলিয়া উঠে। খোকা আসিতেছে—পিছনে তার মায়া-কাননের পটভূমিকা। একটি সমগ্র সংসারের হাসি-হিল্লোলে সেই কাননে বসন্তশ্রী জাগিয়াছে। যোগমায়ার সংসারকে কেন্দ্র করিয়া আর একটি অস্পষ্ট সংসার—ধূসর দিগন্ত-কোলে বেলালুণ্ঠিত নীল সমুদ্র-জলরেখার মত দেখা যায়। যোগমায়া যখন শাশুড়ী হইবে—তাহার ঘর আলো করিয়া একটি ফুটফুটে বউ আসিবে। খোকাকে সে বিদেশে চাকরি করিতে পাঠাইবে না, নিজের স্নেহডোরে বাঁধিয়া রাখিবে। খোকার উপার্জ্জনে শ্বশুর-ভিটার শ্রী উজ্জ্বল হইবে। তার পর নাতি-নাতিনীদের লইয়া···

কোন্ অনাগত শতাব্দীর সাগরজলে যোগমায়া

এই সব স্বপ্ন-তরঙ্গের সৃষ্টি করিতেছে মনে মনে।

আরও বাল্যকালে ইটের খেলাঘর পাতিয়া—কাঁকরের অন্ন ও পাতার ব্যঞ্জন রাঁধিয়া—পুতুলের বিবাহ দিয়া—এই অস্পষ্টতম সংসারকে খেলার ছলেই ত যোগমায়ারা আপন মনের উত্তাপে গলাইয়া আকার দিয়াছে কতবার। খেলা আজ সত্য হইয়াছে, ভবিষ্যতের অস্পষ্ট রেখাগুলি কেনই বা আকার লাভ করিবে না।

সেই অপরাহ্নেই আকাশে মেঘ জমিয়া বৃষ্টি নামিল।

লবঙ্গলতা বলিলেন, আজ কি বার রে মায়া?

যোগমায়া বলিল, মঙ্গলবার।

লবঙ্গলতা বলিলেন, তা হ'লে তিন দিনের খেয়া। কথায় বলে:

শনির সাত, মঙ্গলের তিন,
আর সব দিন দিন।

যোগমায়াকে মুখ বিকৃত করিতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, মুখখানা অমন সিঁটকে আছিস্ কেন মায়া?

কি জানি মা, গা কেমন পাকিয়ে উঠছে—পেটটায় মোচড় দিচ্ছে।

আঁা, তাই নাকি! খানিক জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, তাই ত উনিও এখনও ফিরলেন না—কি যে করি। মুলি ধাইমাগীকে একটা খবরই বা দেয় কে?

রামজীবন ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া দাওয়ায় উঠিলেন।

লবঙ্গলতা বলিলেন, ওগো গা-হাত মুছে আর একবার ধাইবাড়ী যেতে হবে। তাল পাতার টোকাটা মাথায় দিয়ে যাও।

শ্রাবণের মধ্য রাত্রিতে মুষলধারে বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রের গর্জ্জনও শুনা যাইতেছিল। সেই প্রলয়-গর্জ্জনের মাঝে এ বাড়ীতে ক্ষীণতম একটি শঙ্খের ডাক গ্রামের কেহ শুনিতে পাইল না। যোগমায়াও না। সে তখন অবসন্নের মত চক্ষু মুদিয়া কাত হইয়া শুইয়াছিল। দেহের বত্রিশ নাড়ীতে তার টান ধরিয়াছে; সমস্ত বন্ধন শিথিল করিয়া পরম যন্ত্রণার মাঝে চরম কাম্যফলই বুঝি লাভ হয়। আকাশে মেঘলোকের উৎসব, প্রবল বৃষ্টিধারায় গাছপালা ও চালের মাথায় সব-একাকার-করা শোঁ শোঁ ধ্বনি—মাঝে মাঝে চোখ-ঝলসানো বিদ্যুতের প্রলয় শিখার মাঝে কানফাটানো বজ্রের শব্দ—প্রকৃতির সঙ্গে মিলাইয়া মানুষের দেহেও বিপ্লব বাধিয়া গিয়াছে যেন।

বৃষ্টির বেগ বুঝিয়া ছাঁচতলায় দরমার বেড়া-ঘেরা পাতলা-ছাওয়া খড়ের অস্থায়ী চালায় যোগমায়াকে স্থানান্তরিত করা হয় নাই! দাওয়ারই এক কোণে—রাজাধিরাজের মত যোগমায়ার সন্তান আসিল! লবঙ্গলতা সানন্দে সজোরে শঙ্খে ফুৎকার পাড়িয়া কহিলেন,—ওগো মায়ার আমার খোকা হ'য়েছে।

ঘরের মধ্যে উৎকণ্ঠিত রামজীবন পায়চারি করিতেছিলেন; দুয়ারের ফাঁকে মুখ বাড়াইয়া কহিলেন, খোকা?

ঘরের মধ্যে কাঁথাখানা গায়ে জড়াইয়া হরি তক্তাপোষের উপর বসিয়াছিল। কাঁথাখানা গা হইতে ফেলিয়া তড়াক করিয়া তক্তপোষ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—দিদির খোকা হ'যেছে।

আঁতুরঘর হইতে ধাই তখন বলিতেছে, একখানা কাপড় আর একটা ঘড়া নেব—মা-ঠাকরোণ। প্রথম পোয়াতি—

এ যেন আনন্দ-কাকলি ধ্বনি উঠিয়াছে। বর্ষার মধ্যেও এই ধ্বনি সুস্পষ্ট। বজ্রধ্বনি শঙ্খধ্বনির মধ্যে আত্মগোপন করিল। যোগমায়ার আচ্ছন্ন ভাবটা সেই মুহূর্ত্তে কাটিয়া গেল, মাথা উঠাইয়া সে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল।

ধাই ছেলেটিকে দুই হাতে উঠাইয়া দোলা দিতে দিতে বলিল,—এই নাও মা, আজপুত্তুর খোকা হয়েছে। আঃরে, আবার পুট্ পুট্ করে চাইছে দেখ!

যোগমায়া হাত বাড়াইল, ট্যাঁ ট্যাঁ করিয়া খোকা কাঁদিয়া উঠিল। যোগমায়া ছেলেকে বুকে টানিয়া ধরিল।

যোগমায়ার দু'চোখ ভরিয়া ঘুম আসিতেছে। খোকাকে বুকে চাপিয়াই সে পাশ ফিরিল।

সকলেরই যে লইবার পালা। পাঁচটের দিন নখ কাটিয়া দিবার সময় নাপিতানী বলিল, একটা সিকি দিয়ো মা, পেরথম খোকা।

ছয় দিনের দিন যোগমায়া শুনিল, মা বলিতেছেন, আজ রাত্রিতে বিধাতাপুরুষ কি লেখা লিখবেন ছেলের কপালে, কে জানে! মাটির দোয়াত আর কঞ্চির কলম একটা রাখিস হরি। আজ যা লিখবেন—তা খণ্ডাতে কেউ পারবে না।

হরি জিজ্ঞাসা করিল, বিধাতাপুরুষ কখন লিখবেন মা?

সেই দুপুর রাতে—সবাই যখন ঘুমোয়। তখন চুপি চুপি এসে লিখে যান তিনি।

হরি প্রশ্ন করিল, কেউ দেখতে পায় না তাঁকে?

যাদের তপিস্তে আছে—তারা পায় বই কি। একবার এক—

মায়ের গল্প শুনিয়া যোগমায়া মনে মনে বলিল, আমিও আজ জেগে থাকব। বিধাতাপুরুষ যদি কিছু মন্দ লেখাই আমার ছেলের কপালে লিখে দেন! তাঁকে মিনতি ক'রে সে লেখা পালটে নেব। এমনও তো হয়েছে।

গোবরের উপর ছয়টি কড়ি বসাইয়া ও কঞ্চি চিরিয়া তাহাতে তালপাতা লাগাইয়া কাদার তালের উপর পুঁতিয়া রাখা হইল। দোয়াত ও কলম পাশে সাজানো রহিল।

ক্রমে রাত্রি গভীরতর হইল। মধ্যযামের শেয়ালগুলি এই মাত্র ডাকিয়া গিয়াছে। শ্রাবণের রাত্রি; বৃষ্টি নাই—কাজেই গুমোট আছে। গাছের পাতাটি নড়িতেছে না। গভীর রাত্রির থমথমে ভাব অতন্দ্রিত যোগমায়ার মনে লাগিয়া বুকের স্পন্দনকে দ্রুততর করিল। এমনই সময়—এই নিরালা মুহূর্তে—আঁতুড়ঘরের ছোট দরমার দুয়ারটি ঠেলিয়া বৃদ্ধ বিধাতাপুরুষ বুঝি পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া থাকেন! হয়ত এখনই আসিবেন তিনি। মাথায় তাঁর পাকা চুল, আবক্ষ-লম্বিত শুভ্র দাঁড়িগোঁফ—এই টানা টানা চোখ, টিকলো নাসিকা, গোলাপ ফুলের মত রং—আর বলিরেখাঙ্কিত শিথিল কপালে ও গালে সে রং যেন রূপের পসরা মেলিয়া ধরিয়াছে। সৌম্য প্রশান্ত রূপ। বীণা বাজাইয়া হরিগুণগান করিতে করিতে যে ঋষিপ্রবর প্রতিদিন জ্যোৎস্নাস্নাত রাত্রিতে মেঘের স্তরে স্তরে—স্বর্গলোকের কিনারায় ঘুরিয়া বেড়ান—তাঁরই মত অপরূপ তিনি। পরিধানে শুভ্র ক্ষৌম বাস, গলদেশে শুভ্র যজ্ঞোপবীত, তদুপরি শুভ্র ক্ষৌম উত্তরীয়। হাতে সোনার কলম, পায়ে সোনার বলো-দেওয়া খড়ম। খট্ খট্ করিয়া খড়মের ধ্বনি তুলিয়া তিনি সূতিকা-গৃহে প্রবেশ করিয়া নবজাতকের ললাট-লিপি লিখিয়া চলিয়া যান। কেহ জাগিয়া থাকে না বলিয়া, মনে করে, তিনি নিঃশব্দে আসিয়া—চুপিসারেই চলিয়া যান।

ও মায়া—মায়া, এত বেলা হ'ল—মেয়ের ঘুম দেখ একবার!

আঁ, বলিয়া যোগমায়া উত্তর দিল। তাই ত, দরমার ফাঁক দিয়া রৌদ্র দেখা যায়—অনেকখানি বেলা হইয়াছে। ধড়মড় করিয়া যোগমায়া উঠিয়া বসিল। পাশেই ছোট কাঁথাখানিতে শুইয়া খোকা ঘুমাইতেছে। দরমার ছিদ্রপথে ছোট্ট একটু রোদের ফোঁটা আসিয়া খোকার ছোট্ট কপালটিতে সোনার টিপ পরাইয়া দিয়াছে। তীক্ষ্নদৃষ্টিতে যোগমায়া খোকার সেই রৌদ্ররেখাঙ্কিত ললাটের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার ঘুমের ফাঁকে বৃদ্ধ বিধাতাপুরুষ কি লেখা সেখানে লিখিয়া রাখিলেন কে জানে?

আটদিনের দিন সন্ধ্যাবেলায় পাড়ার অনেক ছেলেমেয়ে যোগমায়াদের উঠানে জড়ো হইয়া কলরব তুলিল। লবঙ্গলতা একখানি ভাঙ্গা কুলা লইয়া দাওয়ার উপর হইতে বলিলেন,—হারে, তোরা সব কাঠি এনেছিস্ ত? বেশ ভাল ক'রে ছড়া না বলতে পারলে আট ভাজা দেব না।

ছেলেরা কলস্বরে বলিল,—হুঁ, খুব ভাল ক'রে কুলো পিটব, ফেলুন না কুলো। কঞ্চি, বাখারি, সজিনার ডাল প্রভৃতি উর্দ্ধে তুলিয়া তাহারা কুলা ফেলিয়া দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিল।

লবঙ্গলতা বলিলেন, বেশ ক'রে কুলো পিটে আঁতুড়ঘরের চালা ডিঙিয়ে ফেলে দিতে পারবে ত?

দলের মধ্যে বড় ছেলেটি বলিল, আপনি ফেলুন ত কুলো।

লবঙ্গলতা কুলা ফেলিয়া দিলে ছেলেরা সজোরে কাঠির আঘাত দিয়া উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিল:

আটকৌড়ে পাটকৌড়ে ছেলে আছে ভালো?
মার কোল জোড়া হ'য়ে ঘরটি কর আলো।

কি সে চীৎকার—কিসে কোলাহল! আঘাতে আঘাতে কুলার কাঠিগুলা ছাড়িয়া গেল বড় ছেলেটি তাহার লম্বা কাঠির ডগায় সেই শতধা-বিচ্ছিন্ন কুলাখানি তুলিয়া সজোরে আঁতুড়ঘরের চালার পানে ছুড়িয়া দিল; অতি উচ্চে আঁতুড়ঘর ডিঙাইয়া কুলা প্রাচীরের ওপিঠে গিয়া পড়িল। আট ভাজা কোঁচড়ে করিয়া ছেলেরাও মহানন্দে প্রস্থান করিল।

নয় দিনের দিন যোগমায়া স্নান করিয়া নখ কাটিয়া আর একবার আঁতুড়ঘরের সামনের দাওয়ায় বসিল। আজ অশৌচের অর্দ্ধেক নাকি কাটিয়া

গেল, বাকিটা কাটিবে ষষ্ঠীপূজা শেষ হইলে বার দিন পরে অর্থাৎ একুশ দিনে ষষ্ঠীপূজা সারিয়া শুদ্ধ হইবে যোগমায়া।

শ্রাবণ মাসের কৃপণ দিনে সূর্য্যের সাক্ষাৎকার কদাচিৎ ঘটে। তবু সকাল—দুপুর—বা বৈকালে যখনই আকাশের মেঘ-মহল হইতে সূর্য্যদেব উঁকি মারেন—যোগমায়া ছোট্ট পিঁড়িখানি আঁতুড়-ঘরের দুয়ার অভিমুখে ঠেলিয়া দিয়া খোকাকে রোদ পোহাইয়া লয়। যে বাগ্‌দী মেয়েটি তেঁতুল-কাঠের গুঁড়ি জ্বালাইয়া রাত্রিতে প্রসূতি ও সন্তানকে সেক তাপ দেয়—সে ও বলে, ওদের (রোদ) কাছে আর কি আছে মা-ঠাক্‌রোণ! আগুনের চেয়ে ওতেই ত উব্‌গার হয়—ছেলের গা-হাত শক্ত হয়।

নয়দিন কাটিয়া গেলে বাগ্‌দী-মেয়েটাকে লবঙ্গলতা ছাড়াইয়া দিলেন। দিন এক পালি সিদ্ধ চাউল, নগদ দু'টি পয়সা ও বিদায়কালে একখানি পুরাতন কাপড়; সচ্ছল সংসার হইলে ষষ্ঠীপূজা না-হওয়া পর্য্যন্ত গৃহস্থ ইহাদের রাখিতে পারে। 'নত্তা'র দিন কাটিলে আঁতুড়ঘর নাকি ততটা অশুচি থাকে না। লবঙ্গলতা রাত্রিতে মেয়ের কাছে শুইয়া সকালে একটা ডুব দিয়া অনায়াসে সংসারের কাজকর্ম্ম করিতে পারেন। তাহাতে নাকি তেমন দোষ নাই!

তা যোগমায়ার ছেলেটি ভারি শান্ত হইয়াছে। দুধের পলিতা মুখে পাইলে চুক্‌চুক্‌ করিয়া চোষে, স্তন্যপান করিয়াও চুপ করিয়া ঘুমায়। ছেলের রং বেশ ফর্সাই হইয়াছে। মা বলিতেছেন, ছেলের মুখখানি নাকি হুবহু যোগমায়া বসানো। মাতৃ-মুখী সন্তান সুলক্ষণের চিহ্ন! কিন্তু রং সে বাপের মত পাইয়াছে—তেমনই মটর ডালের মত ধবধবে। ছেলের হাত-পাগুলি লম্বা লম্বা, বাপের মতই সে লম্বা হইবে। তেমনই পাতলা হয়ত বা রোগাই হইবে। তেমনই শান্ত। বাবা যেমন মুচকিয়া মুচকিয়া হাসে—খোকা এখনও হাসিতে শেখে নাই —তবে ভাল করিয়া দেখিলে মুখের রেখা-বিকৃতিতে বোধ হয়, সেই রকম মুচকি হাসিই সে হাসিবে এবং হাসিবার কালে বাম গালে সামান্য একটু টোল পড়িয়া সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিবে।

সবই শোনে যোগমায়া, আর ছেলের মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া ভাবে, কোথায় এই সব সাদৃশ্য। এতটুকু রক্তের ডেলা—প্রত্যহ যে আকৃতির পরিবর্ত্তনে একটু একটু করিয়া চঞ্চল হইতেছে—তাহাকে লইয়া এত জল্পনা-কল্পনা কেন? আগে বাঁচিয়াই থাকুক। যোগমায়া সাবধানে আঁতুড়ের দুয়ার বন্ধ করিয়া দেয়, কোথাও বড় ফাঁক থাকিলে সেখানে নেকড়া গুঁজিয়া বাতাসের গতিরোধ করে। ছোট্ট ছেলে—একবার ঠাণ্ডা লাগিলে কি আর রক্ষা আছে।

ষষ্ঠীপূজার দিন অনেকখানি হাঁটিয়া যোগমায়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিল। স্নানান্তে একখানি লালপাড় শাড়ী পরিয়া ছেলে কোলে লইয়া পাড়ার আর পাঁচ জন সধবা স্ত্রীলোককে লইয়া ষষ্ঠীতলায় চলিল পূজা দিতে। গ্রামের বহু পুরাতন অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে খেলাঘরের মত ছোট ছোট কয়েকটি মন্দির আছে। হাত-দুই-আড়াই উঁচু হইবে মন্দির। এককালে চুণ বালির পলস্তারা হয়ত ছিল, আজ শুধু নোনাধরা পাতলা ইটগুলি বাহির হইয়া সেগুলিকে পতনের ভ্রূকুটি দেখাইতেছে। সেই ঈষৎ অন্ধকার ঘরে কয়েকটি শিলাখণ্ড সিন্দুর হলুদ বিচিত্রিত হইয়া ও শুক্‌না ফুলের মালায় সাজিয়া ষষ্ঠীদেবীরূপে বিরাজমানা। মন্দিরের মাথায় দড়ি বাঁধা অনেকগুলি মুচির (মাটির ছোট ভাঁড়) মালা ঝুলিতেছে।

বাঁশের চাঁচারি দিয়া প্রস্তুত ছোট ছোট একুশটি পেতে খই ও কলা সমেত সেখানে সাজাইয়া রাখা হইল। ফুল, নৈবেদ্য ইত্যাদি দিয়া পুরোহিত দেবীর অর্চ্চনা করিলেন। পুরনারীরা শঙ্খ ও হুলুধ্বনি দিয়া গ্রামের মধ্যে এই শুভবার্ত্তাকে প্রেরণ করিলেন। পুত্র কোলে যোগমায়া ষষ্ঠী পূজা সারিয়া গাড়ুর জলধারা দিতে দিতে ইঁহাদের অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া ঘরে আসিয়া উঠিল। মেয়ের কোল হইতে নাতিকে লইয়া লবঙ্গলতা তাহার গালে চুমা খাইতে খাইতে বলিলেন, আমার ধন—আমার মাণিক।

আদরের মাত্রাধিক্যে ছেলে কাঁদিয়া উঠিল। মেয়েদের মধ্যে একজন বলিল—তোমাকে নাতির পছন্দ হয় নি গো।

লবঙ্গলতা হাসিয়া বলিলেন, তাই বটে!

৩

রামচন্দ্র বিষ্ণুপুরে বদলি হইয়াছিল। সেখান হইতে সে যোগমায়াকে লিখিল: তোমার ছেলে কা'র মত হয়েছে না বললে আমি কিছুতেই যাব না। শুধু তোমার মতটি আমায় জানাবে।

যোগমায়া লিখিল : সবাই ব'লছেন, মোহর দিয়ে ছেলের মুখ দেখবার ভয়ে ওর বাবা এলেন না। সত্যি, একদিনও কি ছুটি পাবে না? আর তুমি না এলে আমি তো খোকার কথা কিছুই জানাবো না। আমাদের না হোক, ওর কি একটা দাম নেই?

রামচন্দ্র লিখিল : দাম বলে দাম! ও জিনিস অমূল্য! মোহর দিয়ে ছেলে দেখা ভাগ্যের কথা। তবে মোহর জোগাড় করতে আমাদের মত লোকের একটু দেরীই হয়। তুমি কবে আমাদের বাড়ী আসবে জানিও। তার আগেই অবশ্য আমি খোকাকে গিয়ে দেখে আসব। মোহর একখানা যোগাড় করেছি।

যোগমায়া লিখিল : এবার আশ্বিনে মলমাস ব'লে মা মেয়ে পাঠাবেন না, কার্তিকে শ্বশুর-বাড়ী গেলে নাকি ভায়ের দোষ হয়। আমার যেতে সেই অঘ্রাণ। তুমি কি ততদিন পরেই আসবে? পুজোর সময় কি ছুটি পাবে না?

রামচন্দ্র লিখিল : পোষ্টাপিসের বিধানে ছুটির কথা লেখাই বাহুল্য। তবে আমি পুজোর সময় যাবার চেষ্টা করব। শুনছি নাকি বিষ্ণুপুর থেকে আমায় সোনামুখী বদলি করবে। তাহলে দিন কতক ছুটিও পাওয়া যাবে।

অনেক দিন হইল বাপের বাড়ীতে আসিয়াছে যোগমায়া। এখানকার দিনগুলি আজকাল ভারি মন্থর বলিয়া বোধ হয়। দিন যদি কাটে ত রাত্রি আর কাটিতে চাহে না। অমন যে গাঢ় ঘুম ছিল যোগমায়ার—আজকাল এমন পাতলা হইয়াছে যে, খোকা হাত নাড়িলে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়—উঁ —আঁ করিলে তো কথাই নাই। সর্ব্বক্ষণ ছেলেকে বুকের উত্তাপে উত্তপ্ত করিয়া রাখিতে ভালবাসে সে। বাহিরের পৃথিবীতে নিত্যই ত রোগের ছোঁয়াচ ঘোরাঘুরি করে। সর্দ্দি, কাসি, গলায় ব্যথা, পেটের অসুখ, দুধ-তোলা—কচি ছেলের একটা-না একটা লাগিয়াই আছে। তবু এই সব ঠেলিয়া—যোগমায়ার মনে হয়—খোকা স্বাস্থ্যবান হইতেছে দিন দিন। পুরন্ত গালে তার রক্তের ছোপ গাঢ় হইয়াই লাগিয়াছে, ছোট চোখ দু'টি বড় হইয়াছে, মাথা ভরিয়া শোভা পাইতেছে ঈষৎ কটা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। হাত পা যেন অগ্রহায়ণের শিশির-খাওয়া সতেজ লাউডগাগুলির মত সুঠাম হইয়া উঠিতেছে। লাল শোলার কদম ফুল দেখিয়া খোকা একদৃষ্টে সেদিকে চাহিয়া থাকে। মুখের কুঞ্চিত রেখায় তার হাসির রূপটি যেন ধরা যায়।

যোগমায়া আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া ছেলেকে কোলে লইয়া ঈষৎ হাঁটু নাচাইতে নাচাইতে সুর করিয়া আবৃত্তি করে :

ও—ও আয় রে টিয়ে ন্যাজ ঝোলা,
আমার খোকাকে নিয়ে গাছে তোলা।

দুধ খাইতে খাইতে খোকা যদি কাসিয়া উঠে —যোগমায়া অমনি ষাট্ ষাট্ ধ্বনি করিয়া তাহার মাথায় ফুঁ দিতে থাকে।

লবঙ্গলতা হাসিয়া বলেন, মায়ার আদর দেখে আর বাঁচি নে। ছোটবেলায় কাঠের পুতুল নিয়ে ও অমনি করতো—মনে আছে তোমার?

রামজীবন হাসিয়া বলেন, তোমারও একদিন মাটির পুতুল নিয়ে অমনি দিন গেছে হয়ত।

লবঙ্গলতা বলেন, আমরা গুছোই বলেই তো ঘরদুয়োরের এমন ছিরি।

রামজীবন বলেন, আমরা ভাঙ্গি বলেই তোমরা গুছোতে ভালবাস।

তারপর অন্য প্রসঙ্গ আসে। লবঙ্গলতা বলিলেন, জামাই নাকি দু'খানা মোহর দিয়ে গেছেন মায়ার হাতে। খোকার ভাতের দিন ওর গলায় হাঁসুলি গড়িয়ে দিতে বলেছেন।

রামজীবন বলিলেন, খোকা নাকি ভারি পয়মন্ত। জামাই বলছিলেন—এই মাস থেকে পাঁচ টাকা মাইনে বেড়েছে, আর ইনস্‌পেক্টর হবারও আশা আছে।

তাই নাকি! নেস্‌পেকটার কি গো?

এই বড় চাকরি। যে চাকরি করছে, তার চেয়ে টাকাও বেশী পাবে, মানও বাড়বে।

আহা তাই হোক! মায়া আমার রাজরাণী হোক। হাঁ গো, তোমার একটা কথা মনে আছে?

কি কথা?

মায়া যখন পাঁচ বছরেরটি—সেবার গঙ্গাসাগর-ফেরত এক সাধু আমাদের গাঁয়ে ওই ষষ্ঠীতলায় এসে ধুনি জেলেছিলেন। রোজ মেলাই লোক তাঁর কাছে যেত—অনেক ছেলেমেয়েও তামাসা দেখতে যেত।

হাঁ, মনে আছে। মায়াকে কাছে ডেকে তিনি ওর হাতখানি দেখে বলেছিলেন, এ মেয়ের লক্ষণ ভাল। যার ঘরে ওঠবে—তার ধনে পুতে লক্ষ্মী উথলে পড়বে।

ওঘরে বসিয়া যোগমায়া সব শুনিল। শুনিয়া আনন্দে সে খোকার গাল দু'টি টিপিয়া আদর করিয়া কহিল,—দুষ্টু কোথাকার, বজ্জাত কোথাকার!

কার্তিকের শেষে কুঞ্জ ঘোষ আসিয়া একখানি চিঠি রামজীবনের হাতে দিয়া গেল। চিঠিখানি পড়িয়া রামজীবন সেখানি কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। দাওয়া হইতে লবঙ্গলতা তাহা দেখিয়া বলিলেন, হাঁ গা, কিসের চিঠি—ছিঁড়লে কেন?

রামজীবন বলিলেন, মায়ার পিস্‌শাশুড়ী কাল মারা গেছেন।

লবঙ্গলতা বলিলেন, আহা, আমাদের মায়াকে তিনি বড় ভালবাসতেন। বড়ীর বড় সাধ ছিল মায়ার ছেলেকে তিনি কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ করবেন। কি হয়েছিল গা?

রামজীবন বলিলেন, মনে হয় কলেরা। শীতকালেও ওসব রোগ হয়—আশ্চয্য! বেয়ান লিখেছেন, মৃত্যুকালেও তিনি মায়ার নাম করতে করতে চোখ বুজেছেন।

লবঙ্গলতা কহিলেন, মায়ারই কপাল। শাশুড়ী ওর একটু রাগী মানুষ, উনি ছিলেন একেবারে নিপাট ভালমানুষ—জোরে কথা কইতে জানতেন না। মায়া যেদিন এখানে আসে—চুপি চুপি ওঁর কানবালা মায়াকে দিয়ে বলেছিলেন—ছেলের ভাতের সময় যেন সোনার পুঁটে গড়িয়ে দেওয়া হয়। মায়ার শাশুড়ীকে লুকিয়ে দিয়েছিলেন কিনা।

মায়া কোথায়?

ছেলে নিয়ে বোধ হয় চাটুজ্জেদের বাড়ী বেড়াতে গেছে। ওদের মেজবউ আজ বাপের বাড়ী থেকে এলো কিনা।

তা মায়াকে শোনাবে এ কথা?

শোনাব না? তার অশৌচ না হোক—শোনাতে হবে বইকি। একটু থামিয়া বলিলেন, তাহ'লে ত অঘ্রাণের দোসরা-তেসরাই ওকে পাঠাতে হয়।

তা হবে বইকি। বেয়ান একা রয়েছেন।

হাত-পা ধুইয়া ও গঙ্গাজল মাথায় দিয়া যোগমায়া সব কথাই শুনিল। শুনিল, কিন্তু তার বিশ্বাস হইল না। এই ত সেদিন সে পিসিমাকে দেখিয়া আসিল। আর ইহারই মধ্যে—না না,—ছেলেকোলে যোগমায়া সেখানে গিয়া হয়ত দেখিবে, তিনি আধঘোমটা টানিয়া একটা পেতেয় তুলা ও একটা বাটিতে জল লইয়া ঘড়র-ঘড়র শব্দে চরকা কাটিতেছেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর বেলায় কালো ভোমরা যেমন ভোঁ-ভোঁ করিয়া ঘরের কড়ি বরগার পাশ দিয়া উড়িয়া বেড়ায়—তেমনই চরকার গুনগুনানি ধ্বনি তোলেন পিসিমা। তাঁর নিপুণ হাতের তৈয়ারী পৈতা ব্রাহ্মণেরা আদর করিয়া কিনিয়া লন। সামান্য উপার্জ্জন পিসিমার—তবু, তাহা বাঁচাইয়া তিনি কুটুম্ব অভ্যাগতের জলখাবারের ব্যবস্থা করেন। কোনদিন, কোনদিন দশমীর রাত্রিতে ছানা আনাইয়া শাশুড়ীকে পর্য্যন্ত জলযোগ করাইয়া থাকেন। তিনি না থাকিলে—সে-বাড়ীর একটা অংশই যে শূন্য হইয়া খাঁ-খাঁ করিতে থাকিবে।

খোকা কোলে শুইয়া মিটি মিটি চাহিতেছে। তাহাকে সহসা বুকে চাপিয়া ধরিয়া যোগমায়া একটি দীর্ঘনিশ্বাসও সেই সঙ্গে বুকের মধ্যে চাপিয়া ফেলিল।

৪

কুঞ্জ ঘোষের সঙ্গে পাল্কী করিয়া সেই বহুপরিচিত পথ দিয়া দীর্ঘ ছয় মাস পরে যোগমায়া শ্বশুর ভিটায় পদার্পণ করিল। শাশুড়ী দোরগোড়াতেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। পাল্কী আসিয়া থামিতেই তিনি নিজে একরূপ ছুটিয়া পাল্কীর দুয়ার খুলিয়া যোগমায়ার কোল হইতে খোকাকে টানিয়া নিজের কোলে লইলেন ও চুমায় চুমায় তাহার দু'টি গাল রাঙাইয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন,—আমার ধনমণি, আমার যাদুমণি, আমার বংশধর।

পাড়ার অনেকেই ছেলে দেখিতে আসিলেন। সকলেই ছেলের সুখ্যাতি করিয়া কহিলেন, বেশ ঠাণ্ডা নাতি হয়েছে গো। কোল বাছ বাছি নেই, কান্না নেই। আহা, বেঁচে থাক্।

সেই প্রাচীর-ঘেরা বাড়ীর মধ্যে সেই প্রশস্ত উঠান। আম, কাঁঠাল, লেবু গাছগুলি আসন্ন শীতের মুখে ঈষৎ যেন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে সারারাত্রি হেমন্তের শিশিরে ভিজিয়া—সকাল-বেলাতেই পাতাগুলি হইতে জল ঝরিতে থাকে—টুপটাপ্। বেলা আটটা হইতে চলিল—তখনও রৌদ্রের তেজে শিশির-বিন্দু শুকায় নাই। বেলা খাটো হইয়া আসিতেছে; সূর্য্যও উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তে সরিয়া আসিতেছেন।

সকালের দিকটা প্রায় ঠিক আছে—সন্ধ্যার দিকটা সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে। যোগমায়াদের উঠানে আম-কাঁঠালের শাখাপত্র ভেদ করিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা রৌদ্র উঠানময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে রৌদ্র শোভাই বৃদ্ধি করে, শীত নিবারণ করে না।

পা ধুইয়া যোগমায়া ঘরে আসিয়া বসিল। খোকার জন্য শাশুড়ী একখানি রেলিং-দেওয়া ছোট খাট তৈয়ারী করাইয়া দিয়াছেন। সেই খাটে পরিপাটী করিয়া ছোট বিছানা পাতা থাকে। মাথায় বালিশ, দু'পাশে বালিশ, পায়ের তলায় বালিশ। খাটের উপর একটা বিচিত্রিত কাঠের পুতুল ও একটা লাল চুষিকাঠি রহিয়াছে, মাথার উপর কাগজের লাল ফুল টাঙানো।

ছেলে শাশুড়ীর কোলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তিনি খাটের দিকে অগ্রসর হইতেই যোগমায়া অস্ফুটস্বরে বলিল—ওর দুধ খাবার সময় হয়েছে মা।

শাশুড়ী খোকাকে সন্তর্পণে খাটে শোয়াইয়া তাহার গায়ে মৃদু চাপড় দিতে দিতে বলিলেন,—তা হোক, খিদে পেলে ও আপনি জেগে উঠবে। ঘুমন্ত ছেলেকে কখনও উঠিয়ো না, বউমা।

হাত-পা ধুইয়া যোগমায়া আমতলার ঘরের পানে চাহিতেই শাশুড়ী বলিলেন, আহা, ঠাকুরঝি—আমার বংশধরকে দেখে যেতে পারলে না। কত সাধ ছিল—তোমার ছেলে মানুষ করবে। আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে তিনি কর্মান্তরে চলিয়া গেলেন।

যোগমায়া আমতলার ঘরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। না, ও ঘরের শিকল খুলিয়া নিষ্ঠুর সত্যকে জানিয়া লাভ নাই। তিনি যেখানেই থাকুন, এই বাড়ীতে কিংবা আকাশের উপর, যোগমায়ার কাছে তো তাঁহার মৃত্যু নাই। যে স্নেহ যোগমায়ার অন্তরে তিনি সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন—সেই স্নেহই আজ যোগমায়ার অন্তর উপচাইয়া আর এক ক্ষুদ্র আধারে সঞ্চারিত হইতেছে ধীরে ধীরে। 'রঘু'র সেই এক দীপ হইতে আর এক দীপ জ্বালার উপমা রামচন্দ্র একদিন যোগমায়াকে শুনাইয়াছিল। এই অনির্বাণ দীপ সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে জ্বলিয়া—কত নর-নারীর অন্তরের মণিকোঠা যে আলোকিত করিয়া তুলিতেছে আজ অবধি—আদি-অন্তের সেই ইতিহাস কোন মানুষই বুঝি লিখিয়া শেষ করিতে পারিবে না! ওই সূর্য্য যেমন কত দিন হইতে পূর্ব্বে উঠিয়া পশ্চিমে ঢলিয়া পড়েন, সঙ্গে সঙ্গে কলা-আবর্ত্তনে দেখা দেন চাঁদ, আকাশে একে একে অসংখ্য নক্ষত্র ফুটিয়া উঠে—প্রকৃতির আবর্ত্তনে সংসারও চলিতেছে তাল রাখিয়া। সূর্য্য কোন দিন মধ্য আকাশে দেখা দেন না, সূর্য্যের পাশে নক্ষত্র কোন দিন ফুটিয়া উঠে নাই। স্নেহের ধারা নদীধারার মত নিম্নগামী। ছোটদের সঙ্গে—অবোধদের সঙ্গে তার কারবার।

আহারাদি শেষ হইলে—খোকাকে কোলের কাছে লইয়া শাশুড়ী শয়ন করিলেন। যোগমায়াও খানিক সেখানে বসিয়া গল্প করিতে লাগিল। ক্রমে শাশুড়ীর তন্দ্রাকর্ষণ হইল, তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। একটু পরে খোকার ঘুম ভাঙিয়া গেল। ওদের ঘুমও যেমন পাতলা—জাগরণও তেমনি অল্পক্ষণের জন্য। পাখীর ছানার মত প্রহরে প্রহরে ক্ষুধার তাড়নায় কাঁদিয়া উঠে শিশু—বুকে মুখ ঘষিয়া মাতৃস্তন্যের সন্ধান করে।

ছেলেকে কোলে চাপিয়া যোগমায়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। নিস্তব্ধ দুপুর। চরকার গুন্‌গুনানি নাই, ও-ঘরে শিকল দেওয়া। উঠান পার হইয়া যোগমায়া আমতলার ঘরের রোয়াকে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর সন্তর্পণে ঘরের শিকল খুলিল। সন্তর্পণে—কেননা শাশুড়ীর ঘুম ভাঙিয়া যাইতে পারে। পিসিমার সঙ্গে যোগমায়ার যত কিছু গোপন হৃদয়-কথা—সবই চলিত শাশুড়ীর অগোচরে। তিনি জল, আর যোগমায়া যেন বালুচর। উপরে সংসারের কঠোর কর্ত্তব্যের সূর্য্যকিরণে সে বালু চিক্‌-চিক্ করিয়া জ্বলে,—বালুর নীচের স্নিগ্ধ জলের ধারার মতই যোগমায়ার সঙ্গে তাঁর সংযোগ।

ধীরে ধীরে দুয়ার খুলিল যোগমায়া। একটা ভাপ্‌সা গন্ধ বাহির হইল ঘর হইতে, যোগমায়ার বুকও বুঝি একবার দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। জীবনের রাজ্যে যে-মানুষের সঙ্গ কামনা করিয়া পরম প্রিয় ভাবিয়াছে এত দিন, মরণের রাজ্যে গিয়া তিনি যোগমায়ার ভয়ের বস্তু হইয়া দাঁড়াইলেন। ভয় ত যোগমায়ার জন্য নহে—খোকার জন্য। কি জানি, অশুভ দৃষ্টিতে কচি ছেলের যদি কোন অমঙ্গলই ঘটে! মনে মনে দুর্গানাম স্মরণ করিয়া যোগমায়া সেই ঘরের একমাত্র জানালাটাও খুলিয়া দিল। ঘরে আলো আসিতেই তার ভয় ভাঙিয়া গেল। ঘরের সব জিনিষই তেমন আছে, নাই শুধু পিসিমা। ঘোমটা-দেওয়া সলজ্জা নববধূটির মত সামনে চরকা রাখিয়া এক

হাতে তুলার পাঁজ—অন্য হাতে চরকার হাতল ঘুরাইয়া চলিতেছেন না তিনি। ঘরের মেঝেয় ধূলা জমিয়াছে কিছু। আরশুলা এখানে-ওখানে উঁকি মারিতেছে।

সেই ধূলার উপর ছেলে কোলে করিয়া বসিয়া পড়িল যোগমায়া। বসিয়া ভাবিল, কোথায় গেলেন পিসিমা? বকুনি খাইয়া সেই হাসি-হাসি মুখ, সেই ধীর প্রশান্ত মিষ্ট কথাগুলি, সেই সন্তর্পিত চলন,—কোথায় গেলেন তিনি? মানুষ কেনই বা এমনভাবে না বলিয়া এক দিন কোথায় চলিয়া যায়। সই এমনই নিঃশব্দে চলিয়া গিয়াছে—পিসিমাও গেলেন। সবাই বুঝি অমনই নিঃশব্দে পলাইয়া যায়। সুখের ভাগ যাহাদের ভাগ করিয়া দিবার কথা, যাহাদের সুখ বিলাইয়া আনন্দ চতুর্গুণ হয়—তাহারাই একে একে নিঃশব্দে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল।

খোকা না কাঁদিলে যোগমায়া আরও কতক্ষণ ধরিয়া সেই ধূলায় বসিয়া ওই সব কথা ভাবিত বলা যায় না। খোকার কান্নায় সে চিন্তার জগৎ হইতে বাস্তবের মৃত্তিকায় পা দিল। মুখে ঘোমটা টানিতে গিয়া দেখিল দু'টি গণ্ড চোখের জলে ভাসিয়া গিয়াছে; অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়াছে যোগমায়া।

রাত্রিতে আকাশে নক্ষত্র উঠিলে—অনেকক্ষণ যোগমায়া সেই দিকে তাকাইয়া রহিল। ওগুলির মধ্যে কোন্‌টি তাহার পিসিমা, কোন্‌টি বা সই? ওই ডবডবে উজ্জ্বল তারাটি?—না না, সই যখন বাঁচিয়া ছিল—তখনও ত তারাটি প্রতি সন্ধ্যায় উঠিত। ওর পাশে ওই মিটমিটে তারাটি? হইতে পারে। প্রত্যেক সন্ধ্যায় আকাশের যবনিকায় কত নক্ষত্র যে নবজন্ম লাভ করিতেছে—কে তাহার সংখ্যা গণনা করিবে বল! কত তারা স্বর্গবাস সমাপ্ত হইলে ওখান হইতে খসিয়া পড়ে, কত তারা মর্ত্যের অক্ষয় পুণ্য লইয়া অনন্ত স্বর্গ ভোগ করে। একটা চোখ বন্ধ করিয়া আরেকটা চোখ চাহিলে—তারারা চোখের উপর আলোর রেখা ফেলে। আলোর রেখা নয়, ওদের সস্নেহ স্পর্শ।

একটি দিনই যোগমায়া এই সব চিন্তা করিবার অবসর পাইল। পরের দিন একটি বেঁটে-মত বিধবা আসিয়া শাশুড়ীকে বলিল, দিদি, একটা কথা তোমায় বলি। গরীব-দুঃখী মানুষ—গতর খাটিয়ে খাই, কখন বাড়ী থাকি-না-থাকি, বউমাকে খাইয়ে-দাইয়ে তোমাদের বউমার কাছে রেখে যাই।

শাশুড়ী বলিলেন, বেশ ত, দু'টিতে গল্প করবে বসে বসে। আমারও এদিক-ওদিক ঘুরতে হয়, ঠাকুরঝি ছিলেন—কত ভরসা ছিল। বেশ ত ভাই, বউমাকে তুমি রোজ রেখে যেয়ো।

পরদিন বেলা এগারোটার পর একটি ছোট্ট বউকে লইয়া তাহার শাশুড়ী যোগমায়াদের বাড়ীতে রাখিয়া গেলেন। যোগমায়াদের তখন রান্না চড়িয়াছে মাত্র। কালো ছোট বউ—কতই বা বয়স, যোগমায়ার অর্দ্ধেকই হইবে—বড় জোর বছর-দশেক। নাকে নোলক, পায়ে মল, কোমরে রূপার গোট'ও একগাছি আছে। সোনার গহনা—শুধু দুই হাতে মুড়কি মাদুলি, উপর হাতে কিছু নাই। হাঁ, আর দুই হাত ভরিয়া অনেকগুলি এয়োতির চিহ্ন লোহা আছে।

ঘোমটার মধ্য দিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিতেছে বউটি। তাহার শাশুড়ী চলিয়া গেলে যোগমায়া পিঁড়ি পাতিয়া তাহাকে বসাইল। আলাপ করিবার জন্য বলিল,—তোমার নামটি কি ভাই?

বউটি মুখ না তুলিয়াই বলিল—শ্রীমতী নিস্তারিণী দাসী।

কাদের বউ তুমি ভাই? আমি ত কাউকে চিনি না।

বউটি বলিল, তিলিদের বউ। উই যে আপনাদের পাড়া ছাড়িয়ে নিকুড়ি পাড়ার প্রথমে যে বাড়ী। কালো হইলেও বউটির মুখখানি বেশ। চোখ দু'টি ডাগর, নাকটি ঈষৎ থাঁদা এবং থাঁদা বলিয়াই গোলগাল মুখখানি বেশ মানাইয়াছে। লজ্জা বউটির আছে, তবে সে-লজ্জার আগাছা দিয়া আলাপের ফুলগাছগুলিকে সে চাপা দিয়া রাখিল না। দশ বছরের মেয়ে, কথা শুনিয়া যোগমায়ার মনে হইল,—গৃহিণী পদবীতে উঠিবার সাধনা ওর যেন শেষ হইয়া গিয়াছে—অনেক আগে। এই গ্রামকে—যোগমায়া যা জানে না—নিস্তারিণী অনেক বেশী জানে।

বলিল, আপনাদের বাড়ী এই প্রথম এলাম, দিদি—কিন্তু বেশ লাগছে। সৃষ্যি কলুদের বাড়ী মা ক'দিন বসিয়ে রেখেছিলেন, প্রাণ যেন হাঁপাই-হাঁপাই করে।

যোগমায়া বলিল, কেন কলুবাড়ীর ঘানিঘোরা দেখতে ভাল লাগত না?

নিস্তারিণী বলিল, অরুচি! ক্যাঁ কোঁ ক'রে ঘুরচে ত ঘুরচেই রাতদিন। যে দুর্গন্ধ ঘরে।

ছেলেগুলো দিনরাত চেঁচায়, শাশুড়ীতে-বউতে খেয়োখেয়ি ঝগড়া—

যোগমায়া হাসিল, এখানে ছেলের চীৎকার নেই, ঝগড়াও নেই।

নিস্তারিণী বলিল, বেশ ঘরটি আপনার দিদি—খোকাটিও কেমন শান্ত। দেবেন আমার কোলে? কাঁদবে না তো?

যোগমায়া বলিল, না, খোকনের আমার কোল বাছাবাছি নেই। এই দেখ, টুঁ শব্দটি করলে না।

নিস্তারিণী বলিল, রোজ রোজ দেবেন ত আমার কোলে? আমি কিন্তু খোকাকে দুধ খাইয়ে দেব।

দিও।

আচ্ছা, কি নাম রেখেছেন এর?

নাম? নাম ত এখনও হয় নি ভাই। মা বলেন—হারাধন, আমি বলি, মধুসূদন।

আপনার বর কি বলেন?

তিনি বলেন—বিমল। আজকাল নাকি পুরানো নাম রাখার রেওয়াজ নেই।

কেন দিদি, ঠাকুর-দেবতার নাম কি মন্দ? বেশ ত ভাল নাম।

কি জানি, ওঁদের পছন্দ। চিঠিতে ওই নিয়ে আমাদের কত ঝগড়া হয়।

চিঠিতে ঝগড়া? সে কি রকম দিদি?

কেন, চিঠি লিখতে জান না তুমি?

নিস্তারিণী মাথা নাড়িয়া বলিল, না ত।

ও আমার কপাল! আচ্ছা, তোমার বরকে যখন চিঠি লিখবে—আমার কাছে এসো—লিখে দেব।

নিস্তারিণী মুখ নামাইয়া বলিল,—তাঁকে চিঠি লিখব কি ক'রে? তিনি ত বাড়ীতেই থাকেন।

বাড়ীতে থাকেন? কি করেন?

পাঁচকড়ি বিশ্বাসের দোকান আছে—চাল, ডাল, নুন, তেল, এই সব বেচে কিনা। সেইখানে চাকরি করেন।

ও। তা কখন দোকানে যান তিনি?

এই ত খাওয়া-দাওয়া ক'রে তিনি গেলেন দোকানে, আমি এলাম আপনাদের বাড়ীতে।

ও।

শাশুড়ী ডাকিলেন, বউমা, খাবে এস।

খোকাকে লইবার জন্য যোগমায়া হাত বাড়াইল। নিস্তারিণী বলিল, আমার কোলেই থাক না দিদি। আপনি খেয়ে আসুন।

তোমার ত কষ্ট হবে ভাই।

কেন কষ্ট হবে! পাঁচ বছর বয়স থেকে মা'র ছেলে বইছি। আমার অভ্যেস আছে দিদি।

ছেলে কাঁদলে রান্নাঘরে দিয়ে এসো।

আচ্ছা। একটু থামিয়া বলিল, আমি রান্নাঘরে গেলে আপনার শাশুড়ী বকবেন না?

যাইতে যাইতে যোগমায়া দাঁড়াইল। একটু কি ভাবিয়া বলিল, রান্নাঘরের রোয়াকে কি দোরগোড়ায় দাঁড়ালে কি আর বলবেন। উনি সে রকম মানুষ নন্।

অসমবয়সী, তবু, খোকাতে আর নিস্তারিণীতে যোগমায়ার মনের ফাঁকগুলি অতি দ্রুত পূরণ করিয়া দিল। এখন আমগাছতলার ঘরটিতে গিয়া বসিলে মন হু-হু করিয়া উঠে না, রাধারাণীও অনেকখানি অন্তরালে পড়িয়াছে। কোন সঙ্গীহীন নিরালা মুহূর্ত্তে হয়ত রাধারাণীর কথা মনে পড়িয়া যায়, কোন দ্বিপ্রহরে নিস্তারিণী না আসিলে আমতলার ঘরটিতে চরকার শব্দ শুনিবার জন্য কান হয়ত সচকিত হইয়া উঠে। সে কতক্ষণের জন্যই বা! খোকাকে খাওয়াইতে, টিপ ও কাজল পরাইতে, ভিজা গামছা দিয়া গা মুছাইতে, আদর করিতে অনেকখানি সময়ই যোগমায়ার কর্ম্মব্যস্ততায় কাটিয়া যায়। তার উপর জ্যেঠ্‌শ্বশুরের ভিটায় আবার পালং শাক, লাউ, সিম ও লঙ্কাগাছ দেওয়া সুরু হইয়াছে; সেখানেও সকাল-বিকালের খানিকক্ষণ কাটে। তা ছাড়া, সন্ধ্যা-দেখানো যোগমায়া নিজের হাতে লইয়াছে। কুষ্টিয়ার অভ্যাসটুকু সে ত্যাগ করিতে পারে নাই। যেদিন কোন কারণবশতঃ সে তুলসীতলায় সন্ধ্যাদীপ রাখিয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম ও প্রার্থনা করিতে পার না, সেদিন ভাল করিয়া ঘুমও যেন যোগমায়ার হয় না। অসন্তুষ্ট দেবদেবীরা আসিয়া সারারাত্রি অনুযোগ করিয়া যোগমায়ার পাতলা ঘুমটুকু ভাঙিয়া দেন। তাই সন্ধ্যার দীপ জ্বালিবার ও শুভ শঙ্খধ্বনি করিবার পূর্ব্বে—শাশুড়ীর কোলে ছেলেকে দিয়া সে বলে, একে একটু ধরুন ত, মা।

শাশুড়ী সন্ধ্যা-দেখানোর চেয়ে নাতি কোলে করিয়া বসিতেই ভালবাসেন। নাতিকে কোলে লইয়া বলেন, অমনি হরিনামের ঝুলিটাও পেড়ে দাও মা। জপটা সেরে নিই।

আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিয়া বাঁ-হাতের তালুর উপর খোকার মাথাটি রাখিয়া ঈষৎ হাঁটু দোলাইতে দোলাইতে ডান হাতে মালা জপ করিতে থাকেন।

ঠাকুরের নাম বা খোকার স্পর্শ—কোন্‌টি তাঁহাকে বেশী অভিভূত করে, কে জানে! একসঙ্গে পারলৌকিক কর্ত্তব্য সারা ও ইহলৌকিক সাধ মিটানো দুই-ই তাঁর হয়।

রাত্রিতে ঘুম ও খোকা যোগমায়াকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখে; তার ফাঁকে রামচন্দ্রও উঁকি দেয়। উঁকি দেয়, পত্রবর্ণিত বিষ্ণুপুরের পোষ্ট আপিস, রাজবাড়ী, দলমাদল কামান, মদনমোহনের রাখাল-বালক বেশে যুদ্ধ, বাগবাজারে আগমন ইত্যাদি অনেক কথা। সেবার খোকাকে দেখিতে উনি যখন হরিপুর গিয়াছিলেন, তখন কয়েকটি রাত্রির মধ্যে এইগুলি যোগমায়া শুনিয়াছে। ঠাকুরদেবতার মাহাত্ম্যের কথা—এত ভাল লাগিয়াছে তার যে, অনেক দুপুরবেলায় নিস্তারিণীর কাছে গল্পও করিয়াছে সে। কিন্তু বিষ্ণুপুরের ঐ সব চিত্র মনে উঠিলেই—ঠিক বিষ্ণুপুরটি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে না। বিষ্ণুপুরের শালবনের বদলে কুষ্টিয়ার কোর্ট-প্রাঙ্গণের চিরমর্ম্মরিত ঝাউশ্রেণীকেই সে দেখিতে পায়। কুষ্টিয়ার বাসাঘরসমন্বিত সেই পোষ্টাপিস, ছোট উঠানসমন্বিত সেই কোয়ার্টার, সেই পশ্চিম প্রাচীর পারে ছাতারে-পাখী-ভর্ত্তি ঝাঁকড়া ডুমুর গাছ, দীর্ঘ তালবৃক্ষের প্রতিটি বালদোয় ঝড়ের দোলা-লাগা অসংখ্য বাবুই পাখীর বাসা। বিষ্ণুপুরের রাজবাড়ীর বদলে—কুষ্টিয়ার বোসেদের নবনির্ম্মিত বাড়ীটা চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে, আর দীঘির বদলে গোরাই নদীর তীর। ইচ্ছা হয়, আবার বাসায় গিয়া সংসার পাতে। এবার সংসারের স্বাদ স্বাদুতর হইবে। এই পরিপূর্ণ আনন্দকে খণ্ডিত করিতে পূর্ণিমারা নিশ্চয়ই দেখা দিবে না! দেখা দিলেও খোকা যার আছে—তার আবার অভাব কিসের?

পরক্ষণেই মনে হয়, শাশুড়ী দিন দিন বৃদ্ধা হইয়া পড়িতেছেন। এ সময়ে তাঁহাকে ছাড়িয়া বাসায় যাওয়া ঠিক নয়। বৃদ্ধ বয়সে যদি পুত্রবধূর সেবা-শুশ্রূষাই না পাইলেন···? তার চেয়ে কিছু-দিনের ছুটি লইয়া রামচন্দ্র বাড়ী আসুক না কেন। স্বামী, পুত্র, শাশুড়ী লইয়া যোগমায়ার পরিপূর্ণ সংসার আনন্দ ও শান্তিতে ভরিয়া উঠুক।

নিস্তারিণীর মুখে গ্রামের কথা শুনিতে শুনিতে এই গ্রামখানিও যোগমায়ার পরিচিত হইয়া উঠিল। এখানে বৈশাখের শেষ সপ্তাহে যেমন ধুম করিয়া গাজিমের বিবাহ হয়, তেমনটি পৃথিবীর নাকি আর কোথাও হয় না। দুই দিন দুই রাত্রি ডগর বাজাইয়া—ছড়া কাটিয়া দলে দলে লোক পথে পথে ঘুরিতে থাকে। কাঁচামিঠে আম, লিচু, তালশাঁস, তালের পাখা, কত বিচিত্র রকমের মাটির ও কাঠের পুতুল, পাঁপর ভাজা মেলাতলায় বিক্রয় হয়। বাঘ-সিংহের খেলা আসে, আতস-বাজি পোড়ে। ধুমধামে তিনটি দিন গ্রামখানি যেন থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে।

দশহরার সমারোহ সে নিজেই দেখিয়াছে। গঙ্গার ঢালু তীরে থরে থরে নৈবেদ্য সাজাইয়া পুরন্ধ্রীরা শাঁখ, ঘণ্টা, কাঁসর বাজাইয়া ও ধূপধুনা পোড়াইয়া সেখানটা তখন মুখরিত করিয়া তুলেন!

কিন্তু রথের মেলায়—ফুলগাছ, পাখী, কাঁঠাল, আনারস, কাঠের পিঁড়ি, জলচৌকি প্রভৃতি কেন'-বেচার মধ্যে রথ টানিবার হুড়াহুড়ি—বেশ একটু উত্তেজনার সৃষ্টি করে। উল্টা সোজা দু'টি রথের টানে—একটি মাসের আনন্দের খোরাক সঞ্চিত হয়। গুপ্তিপাড়ার রথ টানিলে শ্রীক্ষেত্রের রথ টানার সমতুল্য ফল হয়। আবার উল্টারথের দিন দক্ষিণাভিমুখী টানে অক্ষয় পুণ্য। শাশুড়ী প্রতিবারই গিয়া থাকেন। প্রতিবারই শোলার দাঁড়ে-বসা টিয়াপাখী, সেপাই, আনারস, পিঁড়ি প্রভৃতি লইয়া আসেন। সুন্দর জিনিস; যোগমায়া দেখে, পাড়ার সকলে দেখিয়া প্রশংসা করেন, ঠকা-জেতার কথা বলেন।

দুর্গাপূজায় এই গাঁয়ে তেমন সমারোহ হয় না—যেমন সমারোহ হয় জগদ্ধাত্রী পূজায়। বারোয়ারী বলিয়া, ঠাকুর একদিন বাদে নিরঞ্জন হয়। ঢপ, কীর্ত্তন, পাঁচালী, যাত্রা প্রভৃতিতে গ্রাম গম্ গম্ করিতে থাকে। সন্ধ্যার পর গাজিম-উৎসবের মত ডগর বাজিয়া উঠে, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আনন্দোন্মত্ত বালক-বৃদ্ধ-যুবা পথে পথে ছড়া কাটিয়া ও নাচিয়া বেড়ায়। তার পর বিজয়ার দিন—সে কি ভিড়, পথে লোক ঠেলিয়া সামনের মুখুজ্জে-বাড়ীর ছাদে গিয়া বসিতেও কি কম বেগ পাইতে হয়। কত সং, ময়ূরপঙ্খীর গান, নহবতের বাজনা; ঠাকুরের আগে আগে আলো জ্বালিয়া চলিয়া যায়। গায়ে ময়লা কাপড় জড়াইয়া বুনো বাগ্দীর দল মশাল ধরিয়া দুই সারে শোভাযাত্রার পুরোভাগে চলিতে থাকে। কেরোসিন-তৈলসিক্ত ঘুঁটেগুলি লৌহবেড়ের মধ্যে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকে; বহু দূর হইতে দেখা যায়—আকাশ ধোঁয়ায় ভরিয়া উঠিয়াছে। মশাল নয়—উহাকে বলে গেঞ্জির আলো। তারপর ঠাকুরের সে কি

সাজ। রাংতা, জরি, চুম্‌কি, শোলার বস্কা, দেবীর কত রকমের কণ্ঠাভরণ—কত রকমের গহনা —কি চমৎকার মুকুট—কি সুন্দর চরণপদ্ম; সিংহের পিঠের উপর রত্নপীঠ, গেজ্রির আলোয় গর্জ্জন-তেল-মাখা দেবী-প্রতিমার মুখ জীবন-দীপ্তিতে চক্ চক্ করিতে থাকে। কর্ত্তিত হস্তী-শুণ্ডের উপর নখর-বিস্তৃত থাবা রাখিয়া কেশর-ফোলানো সিংহেরই বা সে কি দাঁড়াইবার দৃপ্তভঙ্গি! শোভাযাত্রায় অনেকগুলি প্রতিমা বাহির হন। গণিয়া কোন কোন বার তেইশ, কোন বার পঁচিশ হয়। শুধু জগদ্ধাত্রী নয়—কালী এবং দুর্গা-প্রতিমাও এই শোভাযাত্রার মধ্যে থাকে। সর্ব্বশেষ ঠাকুর চলিয়া গেলে তাহার পিছনের দিকে নাকি চাহিয়া দেখিতে নাই।

কেন নাই?

যে শেষ ঠাকুরের পিছন দেখে—আগামী বৎসরে ঠাকুর দেখিবার সৌভাগ্য নাকি তাহার আর হয় না। কাজেই অবগুণ্ঠন বাড়াইয়া পুরন্ধ্রীরা বিপরীতমুখী হন; অতি সতর্কতায় কেহ কেহ বা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসেন।

তার পর রাসের মেলা। এ মেলা আরও বিপুল; ইহার বিস্তারও অনেকখানি। বার দুই যোগমায়া ভাঙ্গা-রাস দেখিয়াছে। কোথা হইতে আসে এত লোক? কোথা হইতে উঠে সংকীর্ত্তনের এই কলরোল? দোকানের এত খাবার খায়ই বা কে, এত জিনিষপত্র কেনেই বা কাহারা? এক দিন নয়, দুই দিন নয়—একপক্ষ ধরিয়া এইসব দোকানে কেনা-বেচা চলে। মাদুর, ধামা, কুলা, পেতে, কাপড়, জামা, জুতা, খেজুর, চীনাবাদাম, পাঁপর, নিকেলের গহনা, পুঁতির মালা, ঝুমঝুমি—কত কি জিনিস। রাসের শোভাযাত্রা? বড় গোঁসাইবাড়ীর ঢাকের বাদ্যে কানে ত তালা লাগিয়া যায়। তারপর সানাই বাজাইতে বাজাইতে নহবৎ দেখা দেয়, তার পিছনে বিকটাকার এক রাক্ষসী সং। ছোট ছেলেরা সে সং দেখিয়া ককাইয়া মায়ের কোলে মুখ লুকায়, তরুণী মায়েরাও দুরু দুরু বক্ষে সেই রক্তাক্ত করাল দংষ্ট্রাব্যাদিত রাক্ষসীর পানে চাহিয়া থাকে। কুলার মত কান, মূলার মত দাঁত, তালগাছের গুঁড়ির মত হাত-পা, কোদালের মত নখ আর আগুনের হাপরের মত চোখ! তার পিছনে গাড়ীর পর গাড়ী সং। গাড়ীর ঝাঁকানিতে কোনটার হাত ভাঙ্গিয়াছে, কোনটার মাথা খসিয়াছে, কোনটা বা হেলিয়া পড়িয়াছে। সব শেষে সঙের সভা আসে। কি বিরাট সভা—কত লোক! কোনটায় রাম হরধনু ভঙ্গ করিতেছেন, বেত্রধারিণী-পরিবৃতা সীতা, উর্ম্মিলা, মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তি চারি বোন মালা হাতে লইয়া ওপাশে সাগ্রহ-প্রতীক্ষা করিতেছেন, কোনটায় বা নিন্দক চেদিরাজের মস্তক স্কন্ধচ্যুত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্র শূন্যমণ্ডলে আবর্ত্তিত হইতেছে, কোনটায় রাম রাজা হইয়া সিংহাসনে বসিয়াছেন, কোনটায় বা রাজসূয় যজ্ঞ হইতেছে।

সভার পর ময়ূরপঙ্খী। সেই কালো লম্বা মত চেহারার একটা আদিম জাতীয়া স্ত্রীলোক নথ নাকে দিয়া—কয়েকটি পুরুষের সঙ্গে টানিয়া টানিয়া অঙ্গভঙ্গির সহিত গান গাহিতেছে:

ওই—আমরা নারী—সারি সারি জল সইতে যাব।

তারপরই বালক-নাচের হাওদা; রাধাকৃষ্ণ সাজিয়া দুইটি কিশোর বালক হাত ধরাধরি করিয়া পায়ে তাল দিয়া নাচিতেছে। তারপর রাধিকা-রাজার হাওদা যখন নয়নপথবর্ত্তী হয—তখন মহিলারা সমস্বরে হুলুধ্বনি দিয়া উঠেন। হাওদায় পরমাসুন্দরী এক কন্যা সর্ব্বাঙ্গ সোনায় মুড়িয়া কিংখাবের গদির উপর বসিয়া—কিংখাবের বালিশ ঠেস দিয়া, লাল টুকটুকে হাত দু'খানি দু-পাশের বালিশের উপর রাখিয়া ও লাল টুকটুকে পা দু'খানি নীচেয় ঝুলাইয়া আধনিমীলিত নেত্রে শ্রীরাধিকার ঐশ্বর্য্য লইয়া বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার দুই পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত স্বল্পাভরণা দুইজন বালিকা শ্বেত চামর ঢুলাইয়া শ্রীরাধিকাকে ব্যজন করিতেছে। অতি ধীরে বেলোয়ারী ফানুসের ঠুনঠান্ আওয়াজ তুলিয়া হাওদা অগ্রসর হইতেছে। রাইবেঁশেদের লম্বা লম্বা বাঁশ ঘুরাইয়া ঘুরপাক দিয়া নাচ ও মুখে হা-রা-রা হুঙ্কারধ্বনি—যেন ডাকাত পড়িয়াছে—ভয় ও বিস্ময় জাগায় মনে। অনেকক্ষণ ধরিয়া শোভাযাত্রা চলে। একটি দু'টি তো নয়—যেমন জনতার স্রোত—তেমনই অসংখ্য বিগ্রহ—আঙুলের পর্ব্ব শেষ হইয়া গণনায় ভুল হইয়া যায়। পাশের তরুণী ও বৃদ্ধাতে ঠাকুর গোণা লইয়া হয়ত কলহই হইয়া গেল।

রাসের পর বড় উৎসব আর নাই। ছেলেরা তাই ছড়া কাটিয়া বলে:

রাস গেলেই ফাঁস (ফরসা অর্থাৎ শেষ)
বসে থাক তিন মাস।

ফাল্গুনে শিবরাত্রি ও দোলের মেলা। শিবরাত্রি এক রাত্রির পূজা—দোলের উৎসব সপ্তাহব্যাপী।

পূর্ণিমায় গোকুলচাঁদ ও প্রতিপদে শ্যামচাঁদের দোল, তৃতীয়ায় হরিপুরের মদনগোপালের দোল, পঞ্চমীতে জ্যেঠাগোপীনাথের দোল, সপ্তমীতে শ্রীঅদ্বৈত-পাটের সীতানাথের দোল। ফুটকড়াই ভাজা ও মুড়কি, চিনির কদমা, কাটাফেনি ও চিনির মঠ দোলের মেলাতে কিনিতে হয়। আবীরে ও রঙে মুখ ও কাপড় রাঙা হইয়া উঠে। হুড়াহুড়ি-দৌড়াদৌড়ির এ এক উৎসব।

দোলের উৎসবে রামচন্দ্রকে বেশী করিয়াই মনে পড়ে যোগমায়ার। দক্ষিণ হাওয়ার দাক্ষিণ্যে যে উৎসব—সেই উৎসব-দিনে প্রিয়কেই ত মনে পড়ে। আকাশের রং বদলাইয়াছে, গাছের ধূসর বিবর্ণ পাতাগুলি ঝরিয়া নবপত্রমঞ্জরীতে সেগুলি ঘন সবুজ হইয়া বসন্তদিনের বাতাসে কাঁপিতেছে, ফুলের গাছে ফুল-ফোটা সুরু হইয়াছে —আম্রমুকুলের মদাকুল গন্ধের সঙ্গে কোকিল আসিয়া সাধা গলায় সুর মিশাইয়াছে। এই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ পরিবর্ত্তনের জোয়ারে মানুষের মনও তাই সজীব ও চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। তাই ফাল্গুনের দিনে রামচন্দ্রকে যোগমায়ার বার বার মনে পড়িতেছে।

ফাল্গুনের শেষাশেষি রামচন্দ্র একদিন বাড়ী আসিল।

৫

শাশুড়ী বলিলেন, হঠাৎ যে বাড়ী এলি রাম?

রামচন্দ্র বলিল, হেড আপিসে বদলি হ'লাম মা। এবার আর গোষ্টমাষ্টার নয়—ইনস্পেক্টর হলাম।

নেসপেক্টার? মাইনে বাড়লো ত?

হাঁ মা, অনেক।

আহা, ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন এত দিনে। বউমার সব গহনা খালাস না হ'লে আমার রাত্তিরে ঘুম নেই বাবা। ছেলেমানুষ বউ, খালি হাত ক'রে বেড়ায়, দেখে বুকের গোড়াটা হু হু করে ওঠে।

মায়ের হাতে এক তাড়া নোট দিয়া রামচন্দ্র বলিল, রাখ।

ঘরের মধ্যে যোগমায়া আনন্দে একবার ঘুরপাক খাইয়া লইল। মাহিনা বাড়িয়াছে, ভাল কথা। কিন্তু বাড়ীটাও মেরামত করা দরকার। গেল বর্ষায় নাকি বড় ঘরের ভিৎ বসিয়া জল গড়াইয়াছিল, ছোট ঘরের জানালার খিলানগুলি ভাঙিয়া গিয়াছে। পাতলা ইট—ঘরের পিছন দিকে নোনা ধরিয়া এমন গর্ত্ত গর্ত্ত হইয়াছে। সিঁড়িটার দুরবস্থার কথা বর্ণনাতীত। যে-কোন দিন ওটি হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া যাইতে পারে। সিঁড়ি পড়ুক ক্ষতি নাই, কিন্তু মানুষ চাপা পড়িতে কতক্ষণ। শাশুড়ী ত রোয়াকের উপর এই সিঁড়িটার গা ঘেঁষিয়া বসিয়া সন্ধ্যাবেলায় বহুক্ষণ ধরিয়া মালা জপ করেন। সরিয়া বসিতে বলিলে বলেন, আর বউ মা, অপঘাত মিত্যু যদি কপালে থাকে, ঘটবে। মানুষের ত হাত নয়।

যোগমায়া ভাবে, কেন মানুষের হাত নয়? রোগে মরা আর সিঁড়ি চাপা পড়িয়া মরা—দুইয়ে অনেক তফাৎ। যেখানে একটু সাবধান হইলেই—

শাশুড়ী চিত্রিত ময়ূরের সাপ-ভক্ষণের গল্প করেন। যোগমায়া শোনে, পরক্ষণেই ভাবে, ওটা নেহাৎ গল্প। নহিলে দেওয়ালে আঁকা ময়ূর কি করিয়া সাপ গিলিতে পারে! খোকা কোলে আসিবার আগে সে-সব গল্প যোগমায়া নির্ব্বিচারে বিশ্বাস করিত, এখন সেই বিশ্বাসের ভিত্তি তার কিছু কিছু শিথিল হইয়াছে। খোকাকে কোলে পাইয়া তাহার সুখ ও স্বাস্থ্যের পানে যোগমায়ার দৃষ্টি প্রখর হইয়াছে। প্রখর দৃষ্টির তলে আর একটি নয়ন—হয়ত যুক্তি-বুদ্ধি দিয়া গড়া একটি নয়ন—তৃতীয় নয়ন ধীরে ধীরে উন্মীলিত হইয়া গিয়াছে! কপালে থাকিলে রোগ হয়; সেই রোগে মানুষ মরেও; কিন্তু ঠাণ্ডা না লাগাইলে সর্দ্দি কেন হইবে? ঠাণ্ডা লাগানোটাও অদৃষ্টসঞ্জাত বলিয়া মানিবার প্রবৃত্তি যোগমায়ার শিথিল হইয়া গিয়াছে। রোগে ঔষধ না খাইয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলেই কি রোগ সারে? তা যদি সারিত তো এত ডাক্তার-বৈদ্যের সৃষ্টি কেন? যে ব্যাধি দুরারোগ্য, সেইখানে অদৃষ্টের দোহাই দিলে নেহাৎ অশোভন বা অযৌক্তিক হইবে না। হয়ত অদৃষ্টবাদের মধ্যে অনেকখানি সান্ত্বনাও থাকে। কিন্তু পুরাতন বাড়ী মেরামত না হইলে—এক দিন যদি হুড়মুড় করিয়া মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়ে—আর সেই ভগ্নস্তূপের তলায় শাশুড়ী, যোগমায়া, সোনার খোকা—

বার বার মাথা নাড়িয়া যোগমায়া আপন মনে বলিতে লাগিল,—কাজ নাই আমার গহনায়। সব গহনার বড় গহনা আমার বজায় থাকুক; ও টাকায় আগে বাড়ী মেরামত করিয়া তবে অন্য কাজ!

রামচন্দ্রের পায়ে প্রণাম রাখিয়া মৃদু হাসিয়া যোগমায়া বলিল, কেমন আছ?

কেমন মনে হচ্ছে?

মন্দ কি। আমরা চিঠি দিলে দয়া ক'রে উত্তর দাও, এই পর্য্যন্ত। বাড়ীর কথা ত তোমার মনেই থাকে না।

মনে থাকে না ত এলাম কি ক'রে?

সেই কার্ত্তিকের প্রথমে এসেছিলে—আর এই ফাল্গুনের শেষ। এত বড় শীতটা কেটে গেল—

যোগমায়ার একখানি হাত টানিয়া লইয়া রামচন্দ্র বলিল,—দেখেছ ত পোষ্টাপিসের চাকরি, নিশ্বাস নেবার ফুরসৎ কই? তবু বছরে দু-তিনবার এলাম।

এবার বাসা করছ ত? আমি কিন্তু যাব না।

যাবে না? সবিস্ময়ে রামচন্দ্র বলিল, মানে?

মানে আবার কি? এই কচি ছেলে নিয়ে—কেউ নাকি বাসায় যায়? তা ছাড়া মায়ের বয়েস বাড়ছে, না কমছে? ও বয়েসে ওঁর সেবা-শুশ্রূষা যদি নাই হল—তবে ছেলের বিয়ে দিয়ে ওঁর লাভ।

তার পর? আমি না এলে তোমার কষ্ট হবে না ত?

তুমি আসবে না-ই বা কেন? বছরে তিনবারও ত আসতে পার।

তিনবার এলেই যদি তুমি খুসী হও, তাই আসব। কিন্তু চিঠিতে বার বার আসার কথা লিখবে না ত?

ইস্, আমিই যেন ওঁকে দেখতে চাই, উনি যেন চান না?

রামচন্দ্রের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যোগমায়া চক্ষু মুদিল।

রামচন্দ্র বলিল, আমার চেয়ে তা হ'লে সংসারই তোমার বড় হ'ল?

যোগমায়া চোখ না চাহিয়াই বলিল, তুমি ছাড়া সংসার আমার আছে নাকি? তবে তোমার চেয়েও বড় আর একজন আমার আছে।

তা ত বলবেই, বিয়ে ফুরোলেই ছাঁদনাতলায় লাথি! শেকড় কেটে ফুল নিয়ে অত মাতামাতি ভাল নয়, মায়া!

ইস্, আমার শেকড় কাটে এত বড় সাধ্যি কার তা ত জানি না!

রাত্রিতে যোগমায়া বলিল, যাই বল, গহনা না হ'লে একদিন মনে যা কষ্ট হত! আজ আর তা হয় না।

রামচন্দ্র বলিল, মা'র হাতে যা টাকা দিলাম—উনি বলেন, গহনা না ছাড়িয়ে আনালে তোমার পাড়ায় বেরুনো দায় হয়ে উঠেছে। নেমন্তন্ন খাওয়াও নাকি বন্ধ।

তা হলে ত আমি বড্ড রোগা হয়ে গেছি, নয়? সুগোল বাহু আন্দোলিত করিয়া যোগমায়া হাসল।

রামচন্দ্র বলিল, তা হলে তুমিই বুঝিয়ে বল মাকে।

না, তুমি বলবে। বউয়ের গহনা না ছাড়িয়ে বাড়ী হবার কথা শুনলে উনি খুসীই হবেন।

আচ্ছা মায়া একটা কথা আমায় বলবে? তোমরা মেয়েছেলেরা এই সংসার বলতে যা বোঝ—এই স্বামী, পুত্র, জা, ননদ, ঘরবাড়ী—এর মধ্যে কোন্‌টা তোমাদের কাছে বেশী ভাল লাগে?

সবটাই আমাদের ভাল লাগে।

তবু—ওরই মধ্যে কোন্‌টা বেশী?

যোগমায়া উত্তর না দিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসিল।

রামচন্দ্র বলিল, হাসলে হবে না, বলতে হবে।

যোগমায়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, আমার একটা কথার জবাব দাও ত? খিদে পেলে ভাত, ডাল, তরকারি কোন্‌টা তোমার বেশী ভাল লাগে?

খিদের সঙ্গে সংসারের তুলনা? খিদে পেলে খাওয়ার যা উপকরণ সবগুলিই ত ভাল লাগে।

যোগমায়া হাসিতে হাসিতে বলিল, পেটুক কোথাকার!

যোগমায়ার হাত টানিয়া ধরিয়া রামচন্দ্র বলিল, তাহ'লে তুমিও পেটুক। আমার খিদে পেটের—আর তোমার খিদে হ'ল গিয়ে মনের।

যোগমায়া হাসিতে হাসিতে উঠিয়া গেল।

খোকার বিছানা বদলাইয়া খোকাকে কোলে লইয়া সে ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল—রামচন্দ্রের সম্মুখে। রামচন্দ্র মুগ্ধবিস্ময়ে যোগমায়াকে দেখিতে লাগিল। লীলাচটুলা যোগমায়া যেন অতীতের স্মৃতিচিহ্নের মত মনের দেওয়াল-বিলম্বিত হইয়া আছে,—সম্মুখে দাঁড়াইয়া নূতন যোগমায়া। জননী—রামচন্দ্রের জননীই বুঝি নবকলেবরে এই তন্বী কিশোরীর মাঝে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ছেলে-বেলাকার সেই মাধুর্য্য-উদ্বেল আঁখিতারার মধ্যে, ক্ষীরসন্তপিত স্পর্শের মধ্যে ও উত্তীর্ণ কুমারীকালের প্রেমপরিবর্ত্তিত শুভ্র স্নেহের মধ্যে নবীভূত মাতৃ-মহিমায় তিনি জাগিয়া উঠিতেছেন। মা নহে, যোগমায়া নহে—শাশ্বত নারী।

যোগমায়া হাসিতে হাসিতে বলিল, হাঁ ক'রে চেয়ে দেখছ কি? ছেলেকে একবার কোলে কর।

রামচন্দ্র হাত পাতিল, যোগমায়া ঈষৎ অবনত হইয়া খোকাকে রামচন্দ্রের যুগ্মবাহুর আশ্রয়ে রাখিয়া বলিল, কেমন জব্দ!

রামচন্দ্র হাসিয়া বলিল, কিসের জব্দ?

বলেছিলে না—দায় পড়েছে আমার তোমার ছেলে কোলে করতে?

বলেছিলামই ত।

তবে এখন যে বড় কোলে করলে?

রামচন্দ্র হাসিয়া খোকাকে বুকের কাছে আনিয়া কহিল,—করলামই ত। এ যে আমার ছেলে।

ইস্! তর্জ্জনী হেলাইয়া যোগমায়া বলিল, শোবার সময় যদি ওকে কাছে রাখতে পার—তবেই বুঝব তোমার ক্ষমতা।

রামচন্দ্র নীচের বিছানা দেখাইয়া কহিল, আমায ওখানে শুতে হবে নাকি?

হবেই ত।

আর তুমি?

এই খাটে শোব, যেখানে তুমি বসে আছ।

পারবে শুতে? পাপ হবে না?

না গো না।

এমন সময় খোকা কাঁদিয়া উঠিতেই রামচন্দ্র শশব্যস্ত হইয়া কহিল, শীগ্‌গির নাও। আঃ—নাও না।

কেমন জব্দ? আমার ছেলে! ছোট্ট বলে ওর বুঝি বোধ নেই? আমার ছেলে! কেমন জব্দ! হাসিতে হাসিতে যোগমায়া ছেলেকে কোলে করিয়া মেঝেয় পাতা বিছানায় আসিয়া বসিল ও রামচন্দ্রের দিকে পিছন করিয়া তাহাকে শান্ত করিতে করিতে কহিল, আলোটা কমিয়ে তুমি শুয়ে পড।

তুমি শোবে না?

এই ত আমার বিছানা। খোকাকে চুপ করান তোমার কর্ম্ম নয় বলেই এই ব্যবস্থা করেছি। দুর্গা—দুর্গা।

যোগমায়া স্তন্যপানরত শিশুকে বুকে চাপিয়া রামচন্দ্রের দিকে পিছন ফিরিয়াই কাত হইল। অতঃপর তাহার গুন্‌গুন্ ধ্বনি শোনা গেল:

খোকা আমাদের সোনা

স্যাকরা ডেকে মোহর কেটে গড়িয়ে দেব দোনা।

নারী-কণ্ঠোত্থিত সেই অতি মৃদু সুর—অন্ধ ঘরের বাতায়ন দিয়া—অতীত ও অনাগত কালের তরঙ্গকে স্পর্শ করিবার আগ্রহে বিপুল পৃথিবীর বুকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

সমাপ্ত

প্রেম ও পৃথিবী

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

প্রেম ও পৃথিবী

সবে সকাল হইয়াছে—বাদুড় বাগানের প্রাসাদোপম অট্টালিকার ত্রিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া তপনের মা বলিলেন, বড় বউমা, আজ সতেরই ফাল্গুন না?

চারু বলিল, হ্যাঁ মা। কালীঘাটে যাবার সব বন্দোবস্তই ঠিক আছে।

তপনের মা বলিলেন, গরীব দুঃখীকে শুধু একখানা করে কাপড় দিলে হবে না বৌমা—তাদের পেট ভরে খাওয়াতে হবে যে।

বাবাকে বলিগে।

তপনের মা বলিলেন, না ম'—উনি রাগ করবেন শুধু। এ সব খরচ আমিই বইব। যে গহনা তপুর বউয়ের মুখ দেখব বলে রেখেছিলুম—তাই থেকেই—গলাটি তাঁহার ধরিয়া আসিল। একটু থামিয়া বলিলেন, নাই নিক গহনা—ওরা সুখে থাকুক—এই আমার যথেষ্ট। সোনার ভার আর বইতে পারি না মা।

কাঁদবেন না মা—ওদের অকল্যাণ হবে।

না মা কাঁদব কেন। তাড়াতাড়ি—আঁচলে চোখের জল মুছিয়া ফেলিলেন তপনেব মা।

এই প্রাসাদ কোনদিনই হয়তো সতেরই ফাল্গুনকে ভুলিতে পারিবে না। সতেরই ফাল্গুন এই প্রাসাদের গতানুগতিক ধারা'কে প্রচণ্ড ভাবে আঘাত করিয়াছে। সেই আঘাতের বেদনায় সকলেই কমবেশী মুহ্যমান।

এই দুঃসহ আঘাত সেদিন হইতে সুরু হয়—সতেরই ফাল্গুনের প্রায় ছ' বছর আগে—

* * * *

আঠারো বছর বয়সে তপন আই-এ পাশ করিল।

গৃহিণী উজ্জ্বল চোখে উপর পানে চাহিয়া ঠাকুর দেবতাকে মানত করিলেন। কর্ত্তা ছিলিম কতক তামাক উড়াইয়া ফট্ ফট্ চটি জুতার শব্দ করিয়া এ-ঘর ও-ঘর করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের তর্জ্জনী দিয়া কখনও কি রেখাপাত করিতে লাগিলেন, কখনও বা তাল দিতে লাগিলেন। রাত্রিতে বাজার হইতে ভাল মাছ আসিল, অসময়ের বেগুন আসিল এবং দোকান হইতে দই রাবড়ীও আমদানী হইল। বন্ধুবান্ধব হিতৈষী-স্বজন পরিতৃপ্তির সঙ্গেই ভোজন করিয়া কলরব করিতে করিতে চলিয়া গেল।

একটু নিরিবিলি পাইয়া গৃহিণী কর্ত্তাকে বলিলেন, যাক্—বাঁচা গেল। কর্ত্তা মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন।

তাঁহার হাসি দেখিয়া গৃহিণী স্থূলবপু লইয়া সন্নিকটবর্ত্তী চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। ক্যাঁচ করিয়া একটা শব্দ হইল। মুখ বিকৃত করিয়া গৃহিণী মন্তব্য করিলেন, মরণ! এমন পলকা চেয়ারও হরি ছুতোর তৈরি করে দিয়ে গেছে। ক'টাকা মজুরী দিয়েচ গা?

কর্ত্তা এবারও কথা না কহিয়া হাসিলেন।

গৃহিণী একবার সোজা হইয়া বসিয়া কহিলেন, কিছু বলবে? না বাপু, বসতে পারি না! চারিদিকে কাজ ছড়ানো—গায়ে আমার ছাট লাগচে।

কর্ত্তা বলিলেন, ভুতোর বিয়েতে ওরা কত দিয়েছিল মনে আছে?

গৃহিণী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, কে জানে, হাজার ছয়েক হবে বোধ হয়। সে কি আর দেওয়া!

কর্ত্তা সে কথার উত্তর না দিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, হরির বিয়েয়?

গৃহিণী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া জবাব দিলেন, সেও বুঝি আট হাজার। পোড়া কপাল, বাজনদার বিদেয়!

কর্ত্তা বলিলেন, ভুতোর বিদ্যে ফোর্থ ক্লাশ পর্য্যন্ত, হরির সেকেণ্ড।

গৃহিণী একটু ঝাঁঝালো স্বরে কহিলেন, বিদ্যে-বিদ্যে করচো কেন! ঘরটা দেখলে না? এতো আর খেতাবে রাজা নয়!

কর্ত্তা কহিলেন, তা বটে, কিন্তু বিদ্যেটাও আজকালকার দিনে ফেলনা নয়।

গৃহিণী বলিলেন, যার পয়সা নেই—তার মিথ্যে ও-সব। তোমার ভবানীপুরের-বাড়ীর সুকুমার বাবু? অত বড় ব্যারিষ্টার, শহর-জোড়া নাম, কিন্তু ব্যাঙ্কের খাতা যে একেবারে খালি। সেবার চাইতে এলো হাজার টাকা—বিশ্বাস করে দিলে কি এক পয়সা?

কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন, ও-সব কারবারের গুহ্য কথা। কিন্তু বিদ্যেটাও চাই,—বুঝলে? না হলে বড় বৌমা ও মেজ বৌমার বাপেরা কি আমাদের ঠকাতে পারতো?

গৃহিণী সক্ষোভে বলিলেন, তার মূলেও তুমি। ছেলের বিয়ে-বিয়ে করে এমন ক্ষেপলে যে, তারা মনে করলে দায় আমাদেরই। জো পেয়ে বসলো।

কর্ত্তা বলিলেন, যাক, ও-সব গতস্য শোচনা নাস্তি। খোকার বিয়ের ইচ্ছে আছে তার শোধ তুলবো।

এক গাল হাসিয়া গৃহিণী বলিলেন, পারবে?—হাঁ, যে মিউ-মিউয়ে তুমি—তোমার আর পারতে হয় না! এবার ফর্দ্দ করবো আমি। আমার পাশওলা ছেলে। তা হ্যাঁগা, বিয়ে কি এই আষাঢ়েই দিচ্ছ?

কর্ত্তা ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, না।

তবে?

কর্ত্তা বলিলেন, হিসাবটা করে রাখলুম, দেখলুম, তোমার মনে আছে কিনা।

গৃহিণী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, ভোলবার মেয়েই আমি বটে।

পরে কর্ত্তার দিকে চেয়ার টানিয়া সরিয়া আসিয়া বলিলেন, তা এখন দেবে না কেন? আমার ভূতো হরির বিয়ে যেটের এর ঢের আগে হয়েছিল।

কর্ত্তা বলিলেন, এবার নিয়ম পালটাবো—ভাবচি। অন্তত আরও বছর তিনেক বাদে। আর দুটো পাস দেওয়াতে পারি ত—। ভবিষ্যতের অতি-আনন্দ তাঁহার বার্দ্ধক্য-ম্লান চক্ষু দুটিতে চক চক করিয়া উঠিল।

ইঙ্গিতটুকু গৃহিণীও বুঝিলেন। বুঝিয়া দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করিয়া কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

* * *

সুখবর চাপা রহিল না। বড় বৌ শুনিল, মেজ বৌও শুনিল। অপ্রিয় মন্তব্য সহ গৃহিণী এই আসন্ন শুভ সংবাদটুকু প্রচার করিতে লাগিলেন। যদিও কয়েক বৎসর বিলম্বে এ কাজ হইবে, তথাপি পাসওয়ালা ছেলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কীর্ত্তন না করিয়া কোন্ মাতাই বা স্থির থাকিতে পারেন?

বড় বৌ চারু—ঘরের মেঝেয় বসিয়া ছোট খোকাকে দুধ খাওয়াইতেছিল; দামাল ছেলে হাত পা ছুড়িয়া চারুকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল। কিন্তু মুখের অনুচ্চ শাসনবাক্য ছাড়া ছেলের গায়ে হাত দিবার অধিকার তাহার ছিল না। যদি ছেলে ককাইয়া উঠে, শাশুড়ী আসিয়া অনর্থ বাধাইবেন। যতক্ষণ না বৌয়ের চোখে জলের ধারা বহিয়া যায়—ততক্ষণ অবিশ্রান্ত ভাবে চলিতে থাকে তাঁর রূঢ় বাক্য বর্ষণ। বিলীন অতীতকে টানিয়া আনিতে ও মর্ম্মস্থলে আঘাত দিতে শাশুড়ী সবিশেষ পটু। এমন অনেক বার হইয়াছে। নাকের জলে চোখের জলে ভাসিয়া বৌয়ের' প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, ছেলের গায়ে ইহজন্মে আর হাত তুলিবে না।

তাহারা জানে, ধাত্রীগিরি করিবার জন্য এ বাড়ীতে তাহাদের পদার্পণ, জননী সাজিবার আশা আকাশকুসুম।

লালনকারিণীর দুর্ব্বলতা ছোট ছেলেরাও কেমন যেন বুঝিতে পারে! ঠাকুরমার পদশব্দে তারা আঁতকাইয়া উঠে, চোখের চাহনিকে এমন ডরায় যে, মায়ের আঁচলের তলায় মুখ লুকাইয়া কয়েক মিনিট চুপচাপ পড়িয়া থাকে; কিন্তু তিনি চলিয়া গেলেই উপায়হীনা জননীর উপর আরম্ভ হয় আবদার উৎপীড়ন। মুখের তর্জ্জনকে তারা গ্রাহ্যের মধ্যেও আনে না।

চারুর ছোট মেয়েটা মেঝেয় গড়াইয়া গড়াইয়া খেলা করিতেছিল। তারপরের দুটি ছেলে খাটের পায়ায় সুতা বাঁধিয়া অন্য প্রান্তে কলিকা সংযোগে টেলিফোন তৈয়ারী করিয়া অনবরত 'হ্যালো'—'হ্যালো'—করিতেছে। সকলের বড়টি কাঁচের আলমারির গায়ে পেন্সিল দিয়া ঠুকঠাক্ শব্দ করিয়া কাঁচের আঘাত-সহিষ্ণুতার পরীক্ষা করিতেছে। ইতিমধ্যে বার তিনেক আলমারির কাঁচ বদলানো হইয়াছে, তথাপি উৎসাহী ছেলের কৌতূহল মিটে নাই। নিষেধ করিলে উৎসাহ বাড়িয়া যায় বলিয়া চারু ওদিকে কান পাতে না।

চারুর বয়স পঁচিশ। কিন্তু পঁচিশের স্বাস্থ্য-সুষমা বহুদিন হইল সে মুখ হইতে বিদায় লইয়াছে। 'কুড়িতে বুড়ি' এ প্রবাদ-বাক্যের সার্থকতা চারুতে পরিস্ফুট। সে জন্য চারুর দুঃখ নাই। সংসারে আসিয়া অনতিবিলম্বে যদি দেহে-মনে সে সংসারের

ছাপ না লাগিল ত সংসারী সাজাই মিথ্যা। দেহের আঁট-সাঁট বাঁধুনি কোনকালে ছিল বলিয়া মনে হয় না। মাংস শিথিল হইয়া মেদের সঞ্চার করিয়াছে। মুখখানা হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিলে যেমন ফুলিয়া উঠে,—তেমনি। গালে মাস লাগায় চোখের সৌন্দর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে, কিন্তু রংটা নাকি উজ্জ্বল হইয়াছে। নাক চিরদিনই একটু চাপা বলিয়া এখন তত ঠাহর হয় না। বৌ মানুষ—মোটা না হইলে সংসারের বদনাম। খাইবার পরিবার অভাব যেখানে নাই—লক্ষ্মীর আসনখানি যে অঙ্গনে প্রতিনিয়তই পাতা—সে বাড়ীর হাড়-ওঠা রোগা বৌ হইলে লোকেই বা বলে কি, নিজেদেরই বা মুখ থাকে কোথায়? মেজ বৌ যখন-তখন রহস্য করিয়া বলে, কিগো বুড়ো দাই, একটিনি ফুরুলো?

চারু মুখ ফিরাইয়া উত্তর দেয়, এ যে পারমানেণ্টো।

ইংরাজী না জানিলেও মেজ বৌয়ের মুখে এই শব্দটি শুনিয়া শিখিয়াছে। মেজ বৌ এক সময়ে বেথুনে পড়িত। সেলাই, গান বাজনা ও লেখাপড়া জানা মেয়ে বলিয়া তার একটা স্বতন্ত্র মূল্য এ বাড়ীতে আছে। অতিথি অভ্যাগতের আগমনে সেই মর্য্যাদার মূল্য বিশেষ ভাবেই যাচাই করা হয়, কিন্তু বাহিরের লোক চলিয়া গেলে হারমোনিয়মের ঢাকনায় এক ইঞ্চি ধূলা জমিলেও কেহ সেদিকে ফিরিয়া চাহে না। কলম হাতে দেখিলেই গৃহিণী গুমরাইতে থাকেন এবং সেলাই-ফোঁড়াই যাহা চলে—অতি সঙ্গোপনে। বেথুনের ফিরিঙ্গীয়ানার দোষটাও যখন তখন ধিক্কারে ও উচ্চ কণ্ঠে প্রচারিত হয়। এক ছেলে—বয়সও কুড়ি একুশ, তথাপি মেজ বৌয়ের গায়ে চর্ব্বি জমে নাই। মুখে যৌবনলাবণ্যের অনেকখানিই আছে এবং চলিলে সুর না হউক, ছন্দ একটি তৈয়ারী হইয়া যায়। বিরাট কলেবর মাসিকে ক্ষুদে টাইপে অনাদৃত অবস্থায় যেমন কখনও কখনও—সুকবিতা দুই একটি আত্মগোপন করিয়া থাকে, তেমনই এই সুবৃহৎ সংসারের এক কোণেই সে পড়িয়াছিল। কবিতায় হয়ির কোন দিনই আসক্তি ছিল না, তাই গান বাজনা সেলাই ছন্দ লইয়া মেজ বৌ অনাবিষ্কৃত কবিতা-মাধুর্য্যের মতই ধীরে ধীরে বিলীন হইয়া আসিতেছিল।

চারু ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছিল ও আপন মনে বকিতেছিল। বেলা দুপুর বাজে, এখনই কারবার হইতে স্বামী আসিয়া পড়িবেন। তাঁর পা ধুইবার জল, গামছা, সাবান, গন্ধ-তেল প্রভৃতি কলঘরে রাখিয়া খাবার সাজাইয়া বসিতে হইবে মেঝেয়। বড় ঘর হইলেও এ সময়ে ইলেকট্রিক পাখা খুলিবার নিয়ম নাই,—যা করেন তাল-বৃন্ত। তারপর পান সাজিয়া জরদা-ভরা কৌটাটি শিয়রে রাখিয়া শ্রান্ত স্বামীর পদসেবা বা মাথায় অঙ্গুলি চালনা। তাঁর নিদ্রাকর্ষণ হইলে বড় বৌ পাতের প্রসাদ পাইয়া থাকে।

ছেলে যতই হাত পা ছুড়িতে থাকে—চারুর ততই রাগ বাড়িয়া যায়, অবশেষে জোর করিয়া ঝিনুক দিয়া মুখখানা ফাঁক করিয়া চারু অবশিষ্ট দুধটুকু হড় হড় করিয়া খোকার মুখের ভিতর ঢালিয়া দিল। গলায় দুধ আটকাইয়া খোকা বার কয়েক কাশিল, হাত পা ছুঁড়িয়া কাঁদিল, কিন্তু চীৎকারটা সেরূপ ফুটল না। মেজ-বৌ সুলতা ঘরে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, এমনি করে বুঝি duty করচ, বড়দি। মা একবার টের পেলে হয়।

বড বৌ কোলের ছেলেকে মেঝেয় নামাইয়া মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, আপদ! যত জ্বালানি-পোড়ানি আমার। এখনও যে কত কাজ বাকি।

সুলতা খোকাকে কোলে লইয়া ভুলাইতে ভুলাইতে কহিল, কাজ কি এ বাড়ীর শেষ হবার? জনমভোর খাটলেও তবু ফুরবে না। নাও—ওঠ।

চারু কহিল, তোর ছেলেটা সুবোধ, তাই—

সুলতা কহিল, বোধ ওদের কারো নেই বড়দি, না ছেলের না বুড়োর। হাঁ, শুনেছ বড়দি? মেজ ঠাকুরপোর যে বে।

চারু কহিল, সত্যি? কবে লো?

সুলতা বলিল, কবের নাকি দেরি আছে, তবে এখন থেকেই কল্পনা জল্পনা চলচে।

চারু উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তবু শুনিই না?

সুলতা বলিল, বছর তিনেক বাদে।

চারু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তবু ভাল।

সুলতা বলিল, ভাল বিশেষ নয় দিদি। আমাদের বিয়ের সময়ের পাওনা-গণ্ডা নিয়ে খুব হৈ চৈ হচ্চে। পাড়ায় কোন ছেলে কটা পাস দিয়ে ক' হাজার ঘরে তুলেচে, সে খবরও এতক্ষণ বোধ হয় নোট-বইয়ে টোকাটুকি হচ্ছে।

চারু ম্লান মুখে বলিল, আমার বাবা গরীব মানুষ, ওই ক' হাজার দিতেই তাঁর জিব বেরিয়ে গেছলো।

সুলতা হাসিয়া বলিল, ওঁর মনের দিকে তাকাবার ফুরসৎ এঁদের আজও ত নেই দিদি।

চারু একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তা বটে। পরে সহসা প্রশ্ন করিল, হারে লতা, তোর বোনের সঙ্গে একবার যেন শুনেছিলুম না ঠাকুরপোর বিয়ের কথা?

সুলতা বলিল, ঠাকুরপো পাস হবার আগে—কনে দেখা—পছন্দ, সবই ত প্রায় হয়ে গিছলো। এখন ডিগ্রির গরমে সে সব হয় ত গলে গেল। তুমি ত জানই দিদি আট হাজারের বেশী আমার বাবাও দিতে পারেন নি।

চারু বলিল, কিন্তু এঁরা যে লেখাপড়া জানা মেয়ে চান। তোমার বাবা ত গরীব নন,—দেবার ক্ষমতা—

সুলতা বলিল, তাঁর আছে। কিন্তু অন্যায় উৎপীড়ন করে আদায় করাকে তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। আর লেখাপড়ার যা কদর এ বাড়ীতে তাতো তুমি জানই। ওঁদের বন্ধুবান্ধবরা যখন আসেন—তখনই বিদ্যার আড়ম্বর, গানের চর্চ্চা, আদব কায়দা! তারপর—

চারু ঈষৎ বিচলিত হইয়া কহিল, তা হোক। মেয়েমানষের বেশী বিদ্যে কি হবে? ছেলেমেয়ে নিয়ে কোন রকমে দিনগুলো কাটলেই হলো।

সুলতা বলিল, তুমি বল কি দিদি, ঘরের বাইরে রোদ উঠলো কি ঝড় বইলো, বর্ষা এলো কি বসন্তের ফুল ফুটলো—এ সব জানবার কোন দরকার নেই আমাদের?

চারু হাসিয়া বলিল, মা কি সাধে বকেন তোকে? লেখাপড়া জানলেই অল্পেতে লোক সন্তুষ্ট হয় না, তার মনে নানান চিন্তা!

সুলতা ঈষৎ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল, লেখাপড়া জানা খারাপ নয় দিদি—খারাপ এর চর্চ্চা!

পুরো অন্ধকার চোখে সয়, কিন্তু মাঝে মাঝে আলো পড়লেই চোখে বিভ্রম জন্মায়!

চারু বলিল, নে ওঠ। ঠাকুরপোর যদি পছন্দ হয়—টাকায় আটকাবে না।

সুলতা ম্লান হাসিয়া বলিল, এ বিয়ে না হওয়াই ভাল দিদি।

চারু বলিল, কেন? পরে চারিদিকে সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া চাপা গলায় বলিল, এঁরা আর কদিন? তারপর—

সুলতা বলিল, তারপর আমরাও যে ওঁরা হব না তার ঠিক কি? অভ্যাস যে বড় বালাই।

চারু রাগ করিয়া কোন কথা না বলিয়া কক্ষ ত্যাগ করিতে গেল।

বাধা দিয়া সুলতা বলিল, রাগ করলে দিদি?

চারু মুখ না ফিরাইয়া উত্তর দিল, রাগ কিসের! একটা আশায় মানুষ বাঁচে ত! তাই বলছিলুম।

সুলতা হাসিল। নিঃশব্দ ম্লান হাসি। সে আশা নিজেই কি সে পোষণ করে না? কিন্তু যতই দিন যাইতেছে—ততই কুয়াশা ঠেলিয়া সূর্য্যরশ্মি উঠানের মাঝখানে আসিয়া পড়িতেছে; উঠানের চারিধারে জঞ্জাল, আগাছা, ময়লা জল, শুকনা পাতা—সে আলোয় স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। এই সকলকে বাদ দিয়া ত সংসার-রচনা চলে না। মনের এক কোণে একদিকে অপরিচ্ছন্ন জঞ্জালের রাশি—আর একদিকে ভবিষ্যতের আশা। বাদ হয়ত কোনটাকেই দেওয়া চলিবে না। সুতরাং এ বয়সের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে উত্তর-জীবনের আশাকে গাঁথিয়া স্বপ্নজাল বুনিবার কি-বা প্রয়োজন? অন্যে যে পারে পারুক, সুলতা তা পারে না। তার স্বতঃ-প্রশ্ন-জিজ্ঞাসু মন উত্তর প্রত্যাশায় তেমন ব্যাকুল হইয়া উঠে না।

তবু আশা! সে-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়া কেন এই প্রলুব্ধার পায়ের মাটি সে সরাইয়া লইবে?

চারুর আঁচল টানিয়া বলিল, ঠিক বলেচ দিদি। আশায় মানুষ বাঁচে।

চারুর মুখে উজ্জ্বল হাসি ফুটিল। মুখ ফিরাইয়া সে আবেগ-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল, তা না হলে—দেখবি আমার পিঠটা? এই দেখ। বলিয়া স্থূল পৃষ্ঠের উপর হইতে কাপড় ও সেমিজ তুলিয়া দেয়ালের দিকে আর একটু সরিয়া আসিল। চারুর রং ফরসা হইয়াছে স্পষ্টই বোঝা যায়—তার পিঠের উপর ওখানে-এখানে কালো দাগ দেখিয়া। সে কালো দাগ বিগত ক্ষতের চিহ্ন নহে, ছেলে বেলাকার কাটা-পোড়ার দাগও নহে। এই সুবৃহৎ অট্টালিকার সুসজ্জিত কক্ষের গোপন লেখার কয়েকটি কালির আঁচড়। যিনি সে লেখা লিখিয়াছেন—তাঁহাকে লইয়াই চারু ভবিষ্যতের স্বপ্ন-আশায় বিহ্বল হয়। সুলতা শিহরিয়া চক্ষু নামাইল; চোখের কোল তার ভরিয়া উঠিল অশ্রু-বাষ্পে। চারু কাপড় জামা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া কহিল, তবু—আমি ভাবি, এ আর ক'দিন? এ-সংসার যেদিন আমার হবে—সেদিনের আশায় এ-টুকু অক্লেশে সওয়া যায়। ছেলেরা মানুষ হবে, জামাই আসবে, 'মা'

বলে ডাকবে—ভাবতে পারিস সে সব আনন্দের কথা ?

সুলতা মাথা নাড়িয়া কি বলিল বোঝা গেল না।

চারু আপন আনন্দেই বলিতে লাগিল, আজ যাকে মনে হচ্ছে ভূতের বোঝা, কাল সে হয়ে উঠবে দরকারী। সেখান থেকে আসবার সময় মা আমায় পই পই করে বলে দিয়েছেন,—কখনও উচু কথা বলো না মা—সহ্য করো। দেখবে মনের শান্তি কেউ তোমার ঘুচুবে না। দেখচি ত হাতে-হাতেই। আমি যদি তেমন হতুম ত সংসারে কাক চিল উড়তো।

সুলতা মৃদুস্বরে কহিল, শান্তি তুমি পেয়েচ, দিদি ?

চারু হাসিয়া বলিল, পাই বই কি ভাই—যখনই ভবিষ্যতের কথা ভাবি, যখনই ভাবি ওঁরা আর ক'দিন, এ-সংসার ত আমাদেরই। শান্তি না পেলে কি এগুলো দেখিয়ে তোর কাছে বড়াই করতে পারতুম রে।

সুলতা আর কথা না কহিয়া চলিতে লাগিল। এই লাঞ্ছনার অন্তরালে শান্তিকে পুষিয়া যে দুর্ভাগিনী ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া বসিয়া আছে—সে অনন্ত কাল ধরিয়া সেই প্রতীক্ষাতেই থাকুক্। যদি কোন দিন সে শান্তি তার অদৃষ্টে না মিলে ত এই প্রতীক্ষার ধৈর্য্যই হইবে দুর্ব্বহ জীবনের সব চেয়ে বড় সান্ত্বনা। পরিণামহীন সেই অনাগত দিনটির কথা ভাবিয়া বৃথা মনকে বিক্ষুব্ধ করিয়াই বা কি লাভ ? হয়ত সংসারে শতকরা নিরানব্বই জন এই কল্পিত সৌভাগ্যের সিংহাসনে বসিয়ে জয়ের স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন না দেখিলে আত্মহত্যা ছাড়া তাদের কোন পথই বা অবশিষ্ট থাকিত !

তবু সুলতা মনকে সে আশায় বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। পরিপূর্ণ অন্ধকার চোখে সয়—অল্প আলোতেই না বিভ্রম জন্মায় ? ভাবিতে গেলে আকাশ-পাতাল—ছাই-ভস্ম কত কি ভাবিতে হয়। সে ভাবনার সঙ্গে—স্বামী-পুত্র সংসার সবই ভাসিয়া যায়।

তপনের পড়িবার ঘরে আসিয়া সুলতা দেখিল তাহার তিন বৎসরের খোকাকে লইয়া তপন বালিশ বিছানা চাদর তোষক উল্টাইয়া হুড়াহুড়ি করিতেছে। দু'জনের হাসিতে ঘরখানি ভরিয়া উঠিয়াছে। বয়সের অভিজ্ঞতা তপনের যতই থাকুক অবোধ বালকের হাসির সঙ্গে সুরটি তার একই রাগিণীতে বাজিতেছে। বৎসরখানেকের বড় সুলতা অবাক হইয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া সে-সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে কতক্ষণ কাটিয়াছিল কে জানে! হয়ত মুখে গাম্ভীর্য্যের বিষণ্ণ ছায়া নামিয়াছিল, হয়ত বা চক্ষুতে অশ্রুবাষ্প উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল! তপনের অকস্মাৎ হাসিতে সুলতার চমক ভাঙ্গিল। ছোট নিশ্বাসটিকে অতি সন্তর্পণে বুকের মধ্যে চাপিয়া শুষ্ক মুখে জিজ্ঞাসা করিল, হাসলে যে বড় ?

তপন হাসিতে হাসিতে খোকাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, কাল দুপুর বেলা মেজদা ঠিক অমনি করে মাষ্টারের মত আমার পানে তাকিয়ে ছিল। কেমন জান ? আমাদের ফোর্থ মাষ্টার ক্লাসে এসেই এমন ভয়ানক ভাবে আমাদের পানে চাইতেন যে, মনে হলে আজও আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়। শুধু কি বেত মেজ বৌদি—মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি, পেটের মাংস টেনে ধরা, পায়ে বেত চালানো, এই সব ছিল তাঁর ছেলে শাসন করবার কায়দা !

সুলতা হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, সে সব শাসন কাটিয়ে উঠেও ত পাস করলে, ঠাকুরপো।

তপন বলিল, তা ক'রলুম, কিন্তু সে শাসনের জোরে নয়। কাল মেজদার কথাই বলি। দুপুর বেলাটা কি আর করি—অনিল ডাকতে এলো—চললুম ট্রামে করে জু—তে। এসপ্লানেডে ট্রাম চেঞ্জ করে যেমন আলিপুরের ট্রামে চেপেছি, দেখি ফাষ্ট ক্লাসে বসে মেজদা। আমরা ছিলুম সেকেণ্ড ক্লাসে। এমন গম্ভীর মর্ম্মভেদী চাউনি চাইলেন আমার পানে—। বলিয়া তাঁর মুখখানা কল্পনা করিয়া তপন হাসিয়া উঠিল।

সুলতা কোন কথা না কহিয়া অন্য দিকে চাহিয়া রহিল।

তপন বলিতে লাগিল, তারপর তখন ত বুঝতে পারিনি সে চাউনির মর্ম্ম, বাড়ী এসে বুঝলুম। মা খুব এক চোট নিলেন। বললেন, ছোট লোকের মত সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে বেড়াতে তোর লজ্জা হয় না ? হরির ত মাথা কাটা গিয়েছিল। তোর বন্ধুরা না হয় হতচ্ছাড়া—তা বলে···সব মনে নেই মেজ বৌদি। আচ্ছা মেজ বৌদি, যারা সেকেণ্ড ক্লাসে ট্রামে ওঠে, তারা সবাই কি কুলি-মজুর ? এমন ত আছে—যারা ভদ্রলোক অথচ গরীব—

সুলতা হাসিবার ভঙ্গী করিয়া কহিল, সে-কথা মাকেই জিজ্ঞেস করো ভাই, ও-সব জাত্‌বিচার করবার বিদ্যে আমার নেই।

তপন বলিল, ও-সব বাজে। যাক, তুমি একবার লক্ষ্মীটির মত ওই টুলে গিয়ে ব'সো ত। গান একখানা—

চোখেমুখে আতঙ্কের ভাব ফুটাইয়া সুলতা বলিল, এই দুপুর বেলায় গান গাইব আমি!

তপন কৌতুক করিয়া কহিল, হাঁ গো—তুমি। আমি এমন ভাল রেজাণ্ট করলুম—আর তোমাদের কাছে কোন Compliment কি পেতে পারি না?

সুলতা বলিল, Complimentএর যে অনেক Complain ভাই।

তপন কৃত্রিম ক্রোধে মুখ ফুলাইয়া কহিল, কিন্তু আমার Complain টাই হচ্ছে serious. যদি জানতে—

সুলতা অসহায়ের মত দুটি চক্ষে মিনতি ঢালিয়া কহিল, মাপ কর ঠাকুরপো।

তপনের কৃত্রিম কোপ চলিয়া গেল। অভিমানে কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল, কহিল, যত মাপ আমার বেলায়? বাইরের যাঁরা বেড়াতে আসেন—সকাল, দুপুর, সন্ধ্যে, রাত্রিতে—তাঁদের সামনে দিব্যি গলা ছেড়ে গাইতে তোমার একটুও বাধে না মেজ বৌদি!

এই অনুরোধ রাখিতে না পারিয়া সুলতার সারা মন এমনই উত্তাল হইয়া উঠিয়াছিল। তপনের কথায় অতি কষ্টে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া সে পিছন ফিরিল। আঁচলটা একবার চোখে তুলিয়াও দিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না,—তোমার সেকেণ্ডক্লাস ট্রামে চাপার মত এই অসময়ে গান গাওয়ার অপরাধ এ বাড়ীর পিনাল কোডের ধারায় গুরু শাস্তিই বহন করে। বাহিরে ওই ফাষ্ট ক্লাসে চাপিয়া সম্মান যেমন অব্যাহত ভাবে বাঁচিয়া যায়, সময়ে অসময়ে পাঁচজন অভ্যাগতের সামনে গান গাওয়াটাও তেমনি।

তবু সুলতা ফিরিল। আঁচলের উত্তাপে অশ্রুকে শুষ্ক করিয়া হাসি মুখেই ফিরিল এবং এই আদবকায়দা-অনভ্যস্ত সরল তরুণকে ব্যথা দেওয়ার অনুতাপে বিদ্ধ হইয়া নিজের লাঞ্ছনা-গঞ্জনাকে তুচ্ছ করিয়া টেবিল-হারমোনিয়মের সম্মুখে গিয়া বসিল।

তপন মনে মনে হাসিয়া কহিল, এত সাধ্য-সাধনাও তোমাদের করতে হয়।

সুলতা রীডে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে কহিল, সুর যে সাধনারই বস্তু, ঠাকুরপো।

তারপর গাহিল।

গান শেষ হইলে তপন আনন্দে বিছানায় চাপড় মারিয়া কহিল, চমৎকার! [শ্রু]

সুলতা বার বার শঙ্কিত দৃষ্টিতে দ্বারপথে চাহিয়া ঘামিয়া উঠিতেছিল। শেষ পর্য্যন্ত গান সব দিক দিয়াই চমৎকার হইল। গৃহিণী তখন এ সীমানায় ছিলেন না।

সুলতা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া হাসিমুখে কহিল এর চেয়ে বড় Compliment তোমায় যদি কেউ দেয় ঠাকুরপো?

তপন চক্ষুতে কৌতুক মাখাইয়া কহিল, বল কি! কই, কোথায়? নিয়ে এস।

সুলতা কহিল, সে কি এক দণ্ডের গান গাওয়া! এত বড় বাড়ীটায় নহবৎ বসবে, আলো জ্বলবে—

তপন সলজ্জিত মুখ ফিরাইয়া কহিল, আবার দুষ্টুমি আরম্ভ করলে?

সুলতার হাসির মাত্রা বাড়িয়া উঠিল। কহিল, এখন যে ভারি লজ্জা?

তপন কহিল, লজ্জা ত বটেই। মা হয়ত জানেন না সারদাজী যে আইন করেচেন—তাতে এ-রকম অনাচার আর চলবে না।

সুলতা কহিল, সেত dead law হয়ে রইলো। কত খোকাখুকীর বিয়ে হচ্ছে সে হিসেব রাখ কি?

তপন কহিল, রাখতেও চাই না। কি ধারণা তোমাদের মেজবৌদি, ছেলে যাই পাস করলো— অমনি তার গলায় বোঝা বেঁধে না দিলে যেন পৃথিবীটাই উল্টে যায়!

সুলতা কহিল, তবে পাস করে ছেলে করবে কি? পাস করার পরই ত লেজুড় জোড়বার পালা!

তপন কহিল, তোমায় কথায় পারবে কে, হার মানচি। বলিয়া উঠিল।

সুলতা কহিল, আহা! উঠলে যে, ঠাকুরপো? তা ভয় নেই, লেজুড় এখনই জুটছে না, তার অনেক দেরি।

তপন বিছানায় বসিয়া আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যাক, বাঁচা গেল। তাহলে হারমোনিয়মের ডালা খুলে আর একখানা—

সুলতা ত্রস্তে দ্বারপথে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল এবং আর কোন কথা না বলিয়া খোকাকে কোলে তুলিয়া দ্রুতপদে কক্ষ ত্যাগ করিল।

* * *

অনাগত শুভদিনের আয়োজন মানুষ বহু পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ করে। কয়েকদিন পরে এ বাড়ীতে সুলতার ছোট বোন ছায়ার নিমন্ত্রণ হইল। বাহিরের দু-চার জন সম্ভ্রান্ত অতিথিও

নিমন্ত্রিত হইলেন। মাসখানেক আগে ছায়া এ বাড়ীতে আসিয়াছিল, কিন্তু তখনও সম্বন্ধ-বন্ধনের সাধ গৃহিণীর মনে জাগে নাই। মেয়েটিকে তিনি পূর্ব্বে বহুবার দেখিলেও—এ বাড়ীর বধূরূপে কল্পনা করিয়া কোনদিন দেখেন নাই। কাজেই গৌরবর্ণের মধ্যে কোথায় খুঁত, চালচলনে বা হাসিতে কোথায় মাধুর্য্য—এ সব খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিবার জন্য এই নিমন্ত্রণ

অতিথিরা বৈঠক বসাইয়াছেন—গৃহিণীর শয়ন-কক্ষে। ঘরে আলো জ্বলিয়াছে, ছায়া আসিয়াছে। তাহাকে পালঙ্কে বসাইয়া গৃহিণী সমাগত মহিলা-বৃন্দের পানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। ভাবটা, তোমারাই বল এই মেয়েকে বউ করিয়া এ বাড়ীতে আনা যায় কি না?

উজ্জ্বল বিজলী-বাতির আলোয় ছায়ার গৌরবর্ণ দেহ হইতে একটা জ্যোতি বাহির হইতেছে। মুখের প্রসাধনটা কিছু কৃত্রিম ঠেকিলেও, বেমানান হয় নাই। কেন না, মেঝের দামী গালিচার উপর বসিয়া যে সব প্রৌঢ়া ও যুবতী জজ-ব্যারিষ্টার-গৃহিণী পান গালে দিয়া পরস্পরের অলঙ্কার-সৌষ্ঠব ও রুচির প্রশংসায় আসর জমাইয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই মুখে রুজ, পাউডার, লিপষ্টিক্ প্রভৃতি আধুনিক প্রসাধনের চিহ্ন বর্ত্তমান। ছায়ার খোঁপা এলো; দুই চারিটা পাথর দেওয়া ক্লিপ কালো চুলের উপর বেশ মানাইয়াছে। শাড়িখানি মাদ্রাজী মেয়েদের মত পরা। গায়ে অলঙ্কারের পরিপাট্য না থাকিলেও, যা দুই একখানি আছে, দামী এবং প্যাটার্ণ হিসাবে কিছুক্ষণ চাহিয়া দেখিবার মত।

একটা বড় গোছের পান গালে পুরিয়া ছোট রূপার কৌটা হইতে খানিকটা সুবাসিত জরদা বাহির করিয়া তপনের মা বলিলেন, এটুকু গালে না দিলে বাঁচি না। এখানকার ছাই ভস্ম মুখে তুলতে পারি না দিদি, তাই কাশী থেকে ফি হপ্তায় আনাতে হয়। দিব্যি ভুরভুরে গন্ধ—অথচ,—বলিয়া গালে ফেলিয়া দিলেন।

জজ-গৃহিণী বলিলেন, আমারও ওই দশা, লক্ষ্ণৌ থেকে আসে। ওঁর এক বন্ধু সেখান থেকে পাঠান। তা হ্যাঁগা নিস্তার, মেয়েটি ত দিব্যি—বউ করবার মত। গায়ের রং বল, আর গড়ন-পেটন বল, কোথাও খুঁত নেই। লেখাপড়াও জানে বোধ হয়। পরে ছায়ার পানে-ফিরিয়া বলিলেন, কতদূর পড়েছ মা?

ছায়া মৃদুস্বরে উত্তর দিল, এইবার ম্যাট্রিক দিয়েচি।

জজ গৃহিণী মাথা নাড়িয়া কহিলেন, বেশ বেশ। আমাদের সুমতি আসচে বার দেবে কি না—বেথুন থেকে। তা গান-বাজনা সেলাই-ফোঁড়াইও বেশ শিখেচ, না মা?

ছায়া মুখে উত্তর না দিয়া সম্মতি-সূচক লজ্জায় মাথা নামাইল।

জজ-গৃহিণী খুশী হইয়া কহিলেন, এ বউ তোমার ভালই হবে ভাই। বিদ্যে শিখেচে—অথচ অহঙ্কার নেই। বেশ নরম সরম।

কর্ত্তার আবার ধনুক ভাঙ্গা পণ—ছেলেকে আর দুটো পাস না দিইয়ে বিয়ে দেবেন না।

সমাগতদের মধ্যে ইঙ্গিতপূর্ণ অপাঙ্গ-বিনিময় হইয়া গেল।

ব্যারিষ্টার-গৃহিণী কহিলেন, শুধু এখানকার পাসে কি হয়, বিলেত না ঘুরিয়ে আনলে সভ্য বলে পরিচয় দেওয়া মিছে।

এ কথায় জজ-গৃহিণী ঈষৎ ঝাঁজালো সুরে কহিলেন, পরিচয়ের কথা যদি বললে ত বিলেতই বল—আর জার্ম্মানিই বল, খাস ভারতবর্ষের শিক্ষার মত কোন দেশেরই নয়। ওরা নাকি আমাদের শাস্তর ঘেঁটে কত কি তৈরী করেচে।

ব্যারিষ্টার-গৃহিণী কহিলেন, তবু দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা কি কম! উনি দু'বছর বিলেতে ছিলেন, যখন ফিরে এলেন—যেন সে মানুষই নন। শুধু কি ধরণ ধারণ, কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত ভুলে বসে আছেন!

জজ-গৃহিণী বলিলেন, ভাগ্যিস রক্ষে যে তোমায় চিনতে পেরেছিলেন!

ঘরে একটা হাসির রোল উঠিল।

ব্যারিষ্টার-গৃহিণী একটুও লজ্জিত না হইয়া সে হাসিতে যোগ দিলেন।

তপনের মা বলিলেন, কর্ত্তার সেকেলে মত। বলেন, বৌ ঝি গান গাইবে, নাচবে, এ-সব কি বাপু? আর বই বগলে ইস্কুলে যাওয়ারই বা কি দরকার ওদের! রামায়ণ মহাভারত পড়তে পারে—চিঠিটা আসটা লিখতে পারে—এমন বিদ্যে থাকলেই যথেষ্ট। আমার সঙ্গে এই নিয়ে তিন বেলা কথা-কাটাকাটি। আমি বলি, এ কি আমাদের গেরস্থ ঘর যে, পাট ঝাঁট বাসন মাজা রান্না নিয়ে বউ মেতে থাকবে! ওরা নবেল পড়বে, সেলাই করবে, গাইবে নাচবে—যখন যা খুশী করবে। যেমন কালের হাওয়া—কি বল গো দিদি?

জজ-গৃহিণী ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, তোমার মত শাশুড়ী পাওয়া ত শত জন্মের তপস্যার ফল। শাশুড়ী ত নও—মা।

তপনের মা পুলকিত হইয়া কহিলেন, এই দেখনা ভাই, জেদ করে কর্ত্তা বড ছেলের বিয়ে দিলেন এক মুখ্যুর ঘরে। কোন চর্চ্চা'ই কি তাদের নেই! খালি পারে ঘর ঝাঁট দিতে, বিছানা পাট করতে, আর ছেলেদের পহরে পহরে গেলাতে! পাঁচজন ভদ্দর মেয়ের সঙ্গে এক আসনে সে বসতেও পারে না। আর এই আমার মেজ বৌ। নিজে দেখে শুনে তবে মা লক্ষ্মীকে ঘরে এনেছি। গাইতে বাজাতে, সেলাই-ফোঁড়াইযে একেবারে চৌকস। বুদ্ধিই কি কম? মা আমার সবদিক দিয়েই লক্ষ্মী। বলিয়া সুলতার চিবুক স্পর্শ করিয়া একটি চুমা খাইলেন।

জজ-গৃহিণী বলিলেন, ছায়া বুঝি মেজ বৌমার বোন?

হাঁ, খাসা মেয়ে। যেমন ভদ্দর বংশ, তেমনি শিক্ষিত। ওই ত সম্বন্ধ করলে। বললে, মা আমাকে যেমন তোমার মেয়ে করে নিযেচ, তেমনি ছায়াটাকেও নাও। ছেলে-বেলা থেকে মা-হারা আমরা—নতুন করে তোমায় পেয়ে বর্ত্তে গেছি। আহা! বলিয়া অবনতমুখ সুলতার চিবুক স্পর্শ করিয়া আর একবার চুমা খাইলেন।

সমাগত মহিলারা কলরব করিয়া উঠিলেন, আহা—তা আর নয়। মা আর শাশুড়ী কি ভিন্ন।

জজ-গৃহিণী বলিলেন, তা পাওনা থোওনা বিয়ের একটা আছে—

তপনের মা হাস্যমুখে কহিলেন, কিসের অভাব আমাদের—যে ওদিক দিয়ে গোল বাধবে? আসল কথা পছন্দ। তোমরা পাঁচ জনে—আশীর্ব্বাদ কর—মত দাও—তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ওই বড় বৌমার বাবা যে একপয়সাও দেন নি, মেজ বৌমারও তাই। তা বলে আমরা কি গরীব হয়ে গেছি। ও-সব কিছু না মা, কিছু না। কুটুমের টাকা নিয়ে কেউ কখনও বড়লোক হয় নি।

আর একবার কলরবে প্রশংসার গুঞ্জনধ্বনি উঠিল।

অবনতমুখী সুলতা একবার মুখ তুলিয়া ছায়ার পানে চাহিল, লজ্জায় সে কাঠ হইয়া বসিয়া আছে। জীবনে অনেক বারই পরীক্ষা দিতে হয়, কিন্তু এমন কঠিন পরীক্ষা নারীজীবনের আর কি-ই বা আছে? জানিয়া শুনিয়া কেন সুলতা ছোট বোনটিকে এই মায়াজালে জড়াইতে ব্যগ্র হইয়াছে। সে-ও চারুর মত ভবিষ্যতের আশা রাখে বৈ কি। তপন ছেলে ভাল। বিদ্যায়, চেহারায়, ব্যবহারে এমনটি সুলতার চোখে পড়ে নাই। সংসারে উত্তাপ আছে স্বীকার করিলেও, সে ত চিরস্থায়ী নহে।

সুলতা এ সংসারকে জানে। বাক্যে ব্যবহারে কোথায় যে এর পার্থক্য বা বিরোধ, দিবালোকের মত তাহা সুস্পষ্ট। বাহিরে রুচি সভ্যতা বদান্যতার জয়ধ্বনি গীত হইলেও—সৌধান্তরালে পুঞ্জীভূত অন্ধকার। তবু বোনটি আসিলে নিজের স্নেহ-পক্ষপুট বিস্তার করিয়া এতটুকু ছায়ায় তাকে রাখিতে পারিবে, উত্তাপ-বিন্দুও গায়ে লাগিতে দিবে না। এই আশায় সুলতার এ বিষয়ে আগ্রহ সমধিক।

গানের পরীক্ষায় পাস করিয়া ছায়া সুলতার সঙ্গে নীচে নামিয়া গেল। যে ঘরে তপন বসিয়া নূতন পাঠ্য পুস্তকে মনঃসংযোগ করিয়াছে, সুলতা ছায়াকে লইয়া একেবারে সেই ঘরে উপস্থিত।

জুতার শব্দে তপনের মনোযোগ ভাঙ্গিল।

সুলতার পশ্চাদ্বর্ত্তিনীকে দেখিয়া সে একটু বিস্মিত হইল।

সুলতা হাসিতে হাসিতে কহিল, চিনতে পারচো না—ও যে ছায়া।

পরিচয়ের অন্তরালে ছোট ইঙ্গিতটুকু সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে তপন পুনরায় পুস্তকে মনোনিবেশ করিল। সুলতা আর একটু অগ্রসর হইয়া দুখানা চেয়ার টানিয়া ছায়াকে লইয়া জাঁকিয়া বসিল। মুখে মৃদু হাসি ফুটাইয়া কহিল, তোমার যে পড়া-শুনোয় ভারি মনোযোগ—একথা চাক্ষুষ না দেখলেও—

তপন মুখ না তুলিয়া উত্তর দিল, কিন্তু রাত আটটায় হঠাৎ এ ঘরে হানা দেওয়ার অর্থ কি, তাতো আমি বুঝতে পারচি না।

সুলতা কহিল, চুরির আশঙ্কা মিছে ঠাকুরপো—গৃহস্থ যখন সজাগ।

তপন কহিল, সজাগ গৃহস্থেরই চুরি হয় বেশী। তা যাক, যখন অযাচিত ভাবে এসেচ—তখন সুধাকণ্ঠের—

সুলতা কহিল, একখানা কেন—যত ইচ্ছে।

তপন খুশী হইয়া কহিল, হঠাৎ এত বদান্যতা কেন জানতে পারি কি?

সুলতা বলিল, মহামান্য অতিথির আগমন যেহেতু। আজ কিন্তু পচা পুরোনো গান নয়

ঠাকুরপো,—ওই যা ভুলে গেছি—। আমিই মরচি বকে, তুমি দিব্যি নেপথ্যেই রয়েচ!

তপন কহিল, আমাদের পরিচয় এত আকস্মিক নয় যে, আদবকায়দা নিয়ে রঙ্গমঞ্চে নামতে হবে!

ছায়া মৃদু হাসিয়া মুখ নামাইল।

তপন কহিল, অথচ একমাস আগের ছায়ার সঙ্গে আজকের ছায়ার সাদৃশ্য খুব কম। বিশেষ রকম আয়োজন করে ওকে যেন এ বাড়ীতে আসতে হয়েচে।

লজ্জায় ছায়া ত মুখ তুলিলই না, সুলতাও বোধ করি লজ্জায় অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। তপন রহস্যচ্ছলে কথাটা বলিলেও, তিন বৎসর পরের এক ভাবী শুভলগ্নের অসঙ্গত ইঙ্গিত সে কৌতুক-কণ য় ফুটিয়া উঠিল। পণ্য যাচাইয়ের মত সেটা অশোভন ও সম্মান-হানিকর। উভয়ের লজ্জানত মুখ দেখিয়া অনুমানে তপনও সে কথাটা বুঝিল। বুঝিয়া অনুতপ্ত স্বরে কহিল, দোহাই মেজ বৌদি, আমি অন্য কিছু ভেবে বলিনি।

সুলতা মুখ ফিরাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, জানি—ঠাকুরপো। তবু অবস্থার গতিকে আমরা বাধ্য হয়েই মেনে চলি। আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির ওপর চশমা আঁটা। তার ভেতর দিয়েই সংসারের সঙ্গে আমাদের পরিচয়।

কি কথা-প্রসঙ্গে কি কথা আসিয়া পড়িল! জীবনের আনন্দময় ক্ষণটির উপর সহসা কে যেন গুরু বোঝা চাপাইয়া দিল! তপন অপ্রতিভ ও ব্যাকুল হইয়া অর্গ্যানের কাছে উঠিয়া আসিল ও রীডের উপর অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে কহিল, তোমাদের স্বাগত জানানো আমার কর্ত্তব্য। তারপর কি গাহিবে ঠিক করিতে না পারিয়া পুরা একখানা গৎই বাজাইয়া গেল।

সুলতা হাসিয়া বলিল, এটা কি পটোত্তোলনের পূর্ব্বে ঐকতান?

তপন মাথা নাড়িয়া কহিল, না, মাঙ্গলিক।

সুলতা হাসিয়া বলিল, বটে, বটে! ঠাকুরপো ত খুব চালাক! কিন্তু ও সব আচার-অনুষ্ঠান আমাদের, সুতরাং ওঠ।

দারুণ লজ্জায় তপন উঠিয়া পড়িল। আজ তাহার হইল কি? কথায় কথায় এমন অপ্রস্তুত সে ত কখনও হয় নাই। কলেজে সে তর্কবীর, অথচ আগন্তুক এক তরুণীর সামনে সামান্য কথায় এমন অপদস্থ হওয়া···

সুলতা বলিল, ভয় নেই, লজ্জাও করো না। পরের কর্ম্ম পরের উপরই বরাত রইল। এখন—আয় না ছায়া। বোস।

কিন্তু ছায়াকে বসিতে হইল না। চারু আসিয়া দ্বারপথে উঁকি মারিয়া কহিল, তোরা বুঝি এ ঘরে? মা যে ছায়াকে খুঁজছেন। ওঁরা এক সঙ্গেই খেতে বসবেন কিনা।

সুলতা তপনের পানে চাহিয়া বলিল, সবটাই মুলতবী রইল, ঠাকুরপো। তা তুমি অমন হত-ভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন—বস। মনোযোগ-ভঙ্গকারীরা চললো, দেখ যদি পড়ায় মন বসে।

ছায়া হাত দুখানি তুলিয়া সুন্দর একটি নমস্কার জানাইয়া সুলতার সঙ্গে কক্ষত্যাগ করিল।

পড়ায় মনোযোগ বসিল না। সে-মনে তখন অনেক কিছু বিশ্লেষণ আরম্ভ হইয়াছে। আজিকার ব্যবহার কি খুব অসঙ্গত হইয়া গেল? ছায়া ভাবিবে কি? লোকটা ভাল রকম কথা কহিতেও জানে না, খালি পাশ করিয়া বোঝা বাড়াইতেছে! কিন্তু সে যাহা হউক, তপনের বিক্ষিপ্ত আচরণের অন্তরালে ছায়ার সজ্জা-পারিপাট্যের বাহুল্য প্রথম দেখার মুহূর্ত্তটি হইতে তটভঙ্গকারী তরঙ্গ তুলে নাই কি? একমাস পূর্ব্বের সেই শ্যাম্পেন রঙের শাড়ি পরা তেমনই সাদাসিধা ব্লাউজ গায়ে ছায়া—আজ বিলাতী ক্রীম-পাউডার-এসেন্স মণ্ডিত ছায়ার পাশে দাঁড়াইতেও পারে না। এত প্রভেদ! সেইদিনের বালিকা ছায়া আসিয়াছিল—অনাহত সুরের মত, নিয়ম-না-মানা ছন্দের মত, স্বতঃ-বিকশিত পুষ্প-মঞ্জরীর মত। আজ তার স্ফুরিত রক্তাধরে, সলজ্জ হাসিতে, চটুল দৃষ্টিভঙ্গিতে ও মৃদু মন্থর গতিতে সেই বাল্যকালকে লাঞ্ছিত করিয়া ফুটিয়াছে অনাগতের গৌরব-গর্ব্ব। তাইত মুখ হইতে সত্য কথাটাই অমন অতর্কিতে বাহির হইয়া গেল।

তপন হাসিল। সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে উঠার কথা তার মনে পড়িয়া গেল। দূর ছাই! এই সেদিনের পরিচিতা বালিকার সঙ্গে আবার কথা কহিবার আদবকায়দা? বয়স বাড়িতেছে—বিজ্ঞতা বাড়িতেছে বলিয়া পুরাতনকে নূতন পরিচয়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ করিয়া নূতন কৃত্রিমতার সৃষ্টি করা কেন? মনের একটা বড় দোষ—ভাবিতে আরম্ভ করিলে—থামিতে সে চায় না।

চটি পায়ে দিয়া সে সুবোধের সঙ্গে দেখা করিতে বাহির হইয়া গেল।

* * * *

সুবোধ তপনের চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়। বি, এ, পাস করিয়া বৎসর খানেক নানা স্থানে হাঁটাহাঁটি করিয়াও কোন দরজায় মাথা গলাইতে না পারিয়া তপনদের কলেজে ফিজিক্যাল ডিরেক্টার হইয়াছে। শরীরচর্চ্চার শিক্ষা দিয়া সকাল বিকাল সে কিছু কিছু উপার্জ্জন করে। কলিকাতার খরচ চালাইয়া বাড়ীতে বেশ দু-পয়সা পাঠাইতে পারে বলিয়া দুশ্চিন্তার কালোছায়া মুখের পেশীকে সঙ্কুচিত করিতে পারে নাই। তাহার বিস্তৃত বুকের মধ্যে আশা ও সাহস দুই-ই ছিল প্রচুর।

বছর দুয়েক পূর্ব্বে—কি একটা উৎসব উপলক্ষে তপনদের কলেজে সে স্বাস্থ্য চর্চ্চা দেখাইবার নিমন্ত্রণ পায়। তাহার সুগঠিত দেহ ও ব্যায়াম-কৌশল দেখিয়া সকলেই ধন্য ধন্য করেন। সেই ধন্যবাদের পালা শেষ হইলে—তপন চুপি চুপি তাহার হাত ধরিয়া বলিয়াছিল, আমায় একটু শিখিয়ে দেবেন, স্যর?

সুন্দর ছেলেটির আগ্রহ দেখিয়া সুবোধ সানন্দে সম্মত হয়। সেই হইতে শিষ্যত্ব ও বন্ধুত্ব।

এই অসাধারণ শক্তিশালী যুবকের বাহ্যিক শক্তির মূলে যে অনন্ত-সঞ্চয়, তার সন্ধান তপন কিছু কিছু রাখে। সুবোধ অন্তরে বাহিরে—মেঘলেশহীন আকাশের মধ্যাহ্ন-সূর্য্য। তার ব্যবহার ও চরিত্রে কোথাও ছায়ার কণা মাত্র নাই। সে যাহা বলে, যাহা করে—সরল, সুন্দর অথচ তেজপূর্ণ। আপিসের দুয়ারে আসিয়া উদার-বিস্তৃত হৃদয় তাহার তাই চাটুবাদের সঙ্কীর্ণতার লজ্জায় বার বার ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। এত আবর্জ্জনা ও জঞ্জাল সঞ্চিত আছে ওই বিদ্যুতা-লোকোদ্ভাসিত সুদৃশ্য সৌধান্তরালে! শতবর্ষাধিক মনোবৃত্তির অটুট আধিপত্য ওই চেয়ার গুলিতে যেন মাখানো। আলোর দীপ্তিতে, পাখার হাওয়ায়, টেবিলের খাতা কলমে নিত্যই কি আত্মাবমাননার কৃষ্ণজ্যোতি নিঃসারিত হইতেছে না? ওই ধূম্রমলিন কক্ষে বসিয়া যান্ত্রিক জীবনের কর্ত্তব্য সাধন এই জীবনে তাই তাহার ঘটিয়া উঠিল না। সে মেসে থাকিয়া ওই সব অট্টালিকার কাহিনী বহুদিন শুনিয়াছে। শুনিয়াছে, অন্যায় পাপ অবিচার দয়া-দাক্ষিণ্য-হীনতার চক্রতলে সহায়হীন জীবনের মর্ম্মন্তুদ নিষ্পেষণ-ইতিহাস। শুনিয়াছে—প্রতিকারহীন আলস্যের ভীরু অভিশাপ, ভয়ব্যাকুল অন্তরের অজস্র ইতর গালিগালাজ। প্রসাদ-কণার লোভে কেমন করিয়া মানুষ অধোগামী হয়—সে সব তথ্যও সুবোধের অবিদিত নহে। তথাপি সে তাহাদের মধ্যেই বাস করে। শ্রী-ভ্রষ্ট ভগ্ন বাড়ী, ধূলিপূর্ণ কক্ষ এবং চারি পার্শ্বে এই সব স্বার্থ-সঙ্কীর্ণ দাসমনের প্রাচীর। কুৎসার কলরোল উঠিলে সুবোধ পেশী সঞ্চালনে মনোনিবেশ করে; কলহ উত্তাল হইলে চটি পায়ে দিয়া পার্কের হাওয়া খাইতে বাহির হয়। অভাব অভিযোগ নিত্যই শোনে, মন্তব্য প্রকাশ করিয়া কোন পক্ষের উৎসাহ সে বর্দ্ধন করে না। এই আবেষ্টনীর চেয়ে ভয় করে সে নিজের মনকে বেশী। ছোট একটি বীজ উত্তপ্ত পাষাণ শিলায় পড়িয়াও যেমন ক্ষুদ্র এক কণা মাটির আশ্রয়ে কখনও কখনও অঙ্কুরিত হয়, নির্লিপ্ত মনের তলায় অমনই এক কণা মাটি আছে। কৌতূহলের বীজ যদি তাহাতে পড়িল ত রক্ষা নাই। লোককে খাটো করিয়া নিজের বড় হইবার প্রয়াস—প্রতিনিয়তই যে চোখের সম্মুখে দৃষ্টান্ত রচনা করিতেছে। কম-বেশী এই দুর্ব্বল বৃত্তিকে লালন করিবার লোভ কোন্ মানুষেরই বা নাই?

সন্ধ্যার ব্যায়াম বহুক্ষণ শেষ হইয়াছে। পার্কে পায়চারি সারিয়া সুবোধ আপন কক্ষে আসিয়া বসিয়াছে। ক্ষুদ্র কক্ষ। সব ঘরগুলির শেষে—একটু নির্জ্জনও বটে। সীট্‌রেণ্ট বেশী হইলেও এই নির্জ্জনতাটুকুর লোভে সে এই ঘরখানিই বাছিয়া লইয়াছে। ঘরের আসবাব খুব কম। একখানা জারুল কাঠের তক্তাপোষ, তাহাতে সতরঞ্জি ও বালিশ গোটা দুই। শীতকালের ব্যবহারোপযোগী র‍্যাগটা এক পাশে গুটানো আছে। ঘরের এক কোণে একটা র‍্যাক। র‍্যাক ভর্ত্তি ব্যায়াম সম্বন্ধীয় অনেকগুলি বই; রামকৃষ্ণ কথামৃত ও বহু মনীষীর জীবনবৃত্তান্ত। র‍্যাকের পাশে যে ছোট জানালাটি আছে, তাহার মাথায় রামকৃষ্ণ ও কালীমাতার ছবি টাঙানো। এ দিকের দেওয়ালে-কাপড় জামা রাখিবার ছোট একটা দেওয়াল আলনা ও তার উপরে দেশ-বিদেশের ব্যায়ামবীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি। কোণে বড় একটা ট্রাঙ্কের মাথায় ছোট সুটকেশ, অন্য কোণে জলের কুঁজা।

গ্রিপ ডাম্বেল, চেষ্ট এক্‌স্‌প্যাণ্ডার প্রভৃতি জিনিষগুলি ছোট একখানা তক্তার উপর সাজানো আছে। ঘরখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সুবোধ প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় নিজের হাতে ধূনা জ্বালিয়া

দেয়; কখনও কখনও রামকৃষ্ণ ও কালীমাতার গলদেশে পুষ্পমাল্যও বিলম্বিত হয়।

সুবোধ তক্তাপোষের উপর বসিয়া Mullarএর বই পড়িতেছিল। তপন আসিয়া তার পাশে বসিল।

সুবোধ মুখ তুলিয়া হাসিয়া কহিল, কিরে, এমন অসময়ে?

তপন বলিল, একটা কথা আছে। কিন্তু সুবোধদা, আমার ভারি আশ্চর্য্য বোধ হয়, এত হট্টগোলের মধ্যে পড়ায় মনোযোগ দাও কি করে? ওইত পাশের ঘরেই পাশার হট্টগোল, তার পাশে বেসুরো হারমোনিয়মের উপদ্রব—সব ওপরে ম্যানেজারের গলাবাজী।

সুবোধ বই মুড়িয়া রাখিয়া কহিল, প্রথম যখন ক'লকাতায় আসি—তিন রাত্রি ঘুমোতে পারিনি। ঘর্ঘর ট্রামের আওয়াজ, লরির ঘর-কাঁপিয়ে চলা, ট্যাক্সির ভোঁ, ঘোড়ার গাড়ীর কলরব, তার ওপর নতুন জায়গায় নতুন লোকের মধ্যে বাস। ক্রমে সব সয়ে গেল। এখন সবেতেই মনোযোগ দিতে পারি। শব্দগুলো ওঠে কিন্তু কানের বেশী দূর পর্য্যন্ত পৌছয় না কিনা।

তপন হাসিয়া কহিল, রক্ষে কর তোমার অভ্যাস। আলাদা ঘর নিয়েছ বটে, অসুবিধা একটুও দূর হয় নি! অন্য মেস দেখ না কেন সুবোধদা?

সুবোধ বলিল, এক মূক বধিরের আশ্রয় হলে মন্দ হয় না, অন্য সব জায়গাই ত এমনি।

তপন বলিল, তবু ধর তেতলায় নিরবিলি ঘর একখানা। তা হলে এঁদের হৈ-হৈ হট্টগোলের হাত থেকে অন্তত বাঁচতে পার।

সুবোধ বলিল, এই সদুপদেশ দেবার জন্যই কি রাত্রিতে এতদুর ছুটে এসেছ?

তপন ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিল, না। তুমি আবার ও-সব চর্চ্চা সইতে পার না—

সুবোধ বলিল, চর্চ্চা মাত্রেই খারাপ, যদি তা উঁচুদরের না হয়। যে অবস্থা তোমার অসুবিধা ঘটাচ্ছে না, তা নিয়ে অনর্থক যুক্তি উৎসাহ খরচ করা—আমার মতে সময়ের অপব্যয়। শরীর সম্বন্ধে দু'একটা উপদেশ নেবে বোধ হয়?

তপন বলিল, না, সে কথা বলতেও আমার লজ্জা বোধ হচ্ছে।

সুবোধ বিস্মিত হইয়া কহিল, লজ্জা!

তপন মাথা নীচু করিয়া কহিল, হাঁ আমার বিবাহের সম্বন্ধে—

সুবোধ কহিল, তোমার বিবাহ! নিশ্চয়ই তুমি রহস্য করচো না, তপন?

তপন চিন্তাকুল মুখখানি তুলিয়া কহিল, রহস্য ত নয়ই—এ এক ঘোর সমস্যা। আমাদের পারিবারিক প্রথা—

সুবোধ বলিল, কিছু কিছু জানি। বাল্য-বিবাহ তার মধ্যে একটি।

তপন বলিল, আমার সৌভাগ্য ও-জিনিষটি এত শীঘ্র আমার কাঁধে চাপছে না। অন্তত বছর তিনেক দেরি।

সুবোধ বলিল, তবে চিন্তার কারণ?

তপন বলিল, বিবাহটা এখন না চাপলেও বন্ধনটা যেন চেপেছে বলে বোধ হচ্ছে। আজই এক কুমারী কন্যা এসে হাজির।

সুবোধ বলিল, বাক্যদানের পালা বুঝি?

তপন বলিল, হাঁ—তাই। বাড়ীর সকলের আগ্রহ অত্যধিক; তিন বছর বাদে ওরই সঙ্গে তাঁরা আমায় বাঁধবেন। কিন্তু—

কিন্তু কি?

কিন্তু আমার পক্ষে—শুধু আমারই বা বলি কেন, তোমার যদি ওই রকম অবস্থা হত ত তুমিই কি ভাবতে না? তার রূপ গুণ জানলুম, তিন বছর বাদে সেগুলি যদি উগ্র হয়ে ওঠে—তবেই ত মুস্কিল।

সুবোধ বলিল, হয়ত উগ্র না-ও হতে পারে। দু'জনকেই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়—তবে আসে মিলনের আনন্দ। আমার বিশ্বাস দু'জনের মনের আদান প্রদানের ফলে সে ত্যাগ আপনিই আসবে।

তপন কোন কথা কহিল না।

সুবোধ বলিতে লাগিল, ও সব ভবিষ্যতের কথা এখন থাকুক। তিন বছরের রঙিন স্বপ্নটা বয়ে বেড়ানোই কি তোমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে তপন?

তপন মুখ নামাইয়া কহিল, স্বপ্ন ও চিন্তা দুই-ই। এ ভাবে কথা দেওয়ার মানে আমায় নষ্ট করা।

সুবোধ হাসিল, যে নষ্ট হবার জন্য বসে আছে—তার কথা আলাদা। কিন্তু এই একটু আগের কথাই ধর, ও ঘরের হৈ চৈ হট্টগোলে আমার পড়ার ব্যাঘাত হয়নি বলে তুমি আশ্চর্য্য

বোধ করছিলে, অথচ বেশ জান, শব্দ কানে নেওয়া ও মনে নেওয়ায় কত তফাৎ।

তপন বলিল, তোমার সঙ্গে আমার তুলনা?

সুবোধ বলিল, আমরাও একদিন কুড়িতে ছিলাম, তারপর অনেকগুলি ধাক্কা সামলে পঁচিশে এসেছি।

তপন বলিল, তবু— স্বপ্ন দেখার কালে তোমার আত্মীয়-স্বজন বোধ হয় ইন্ধন যোগান নি, যেমন আমার বেলায় হচ্ছে! তুমি আছ নিরিবিলিতে। তোমার বই, ডাম্বেল—

সুবোধ বলিল, ও-গুলো যে পন্থা। তোমারও কলেজ তেমনি। বাপ মার কথা বাদ দাও, ওঁরা ছেলের জন্ম থেকেই—ওই বাসনার ইন্ধন যোগান। একটা গল্প শুনবে? আমাদেরই দেশে এক ঘর গরীব তাঁতী থাকতো। বড্ড গরীব তারা, কায়ক্লেশে তাদের সংসার চলতো। চারদিকে দেনাও কিছু ছিল। তাঁতীর একমাত্র ছেলের বয়স যখন ষোল, তখন বাপ মা দু'জনেই হঠাৎ মারা গেল। একদিন আমাদের বাড়ীতে পাড়ার মেয়েরা বসে সেই তাঁতীর মরার খবর নিয়ে দুঃখ করছিলেন। হঠাৎ বাড়ীর প্রবীণা গোছের এক ঠান-দি বললেন, তা বোন, দুঃখু মিছে। যা হোক বেচারীরা একটা ভাল কাজ করে গেছে, ছেলেটাকে মানুষ করে গেছে।

কে একজন বললেন, সে কি ঠান-দি, ছেলেটা শুনেছি—কোন কাজ করে না, টো টো করে ঘুরে বেড়ায়!

ঠান-দি হেসে বললেন, শুনিস্‌নি ছেলের যে গেল ফাল্গুনে বিয়ে দিয়েচে! এই কথায় আর কেউ কথা কহিলেন না। বেশ বুঝলাম, তাঁরা আশ্বস্ত হয়েছিলেন।

তপন হাসিয়া বলিল, মস্ত বড় নিভাবনার কথাই বটে!

সুবোধ বলিল, দেনাপত্র যাই থাক, সংসার করার ইচ্ছেটা সকলের রয়েচে কিনা—তাই তাঁরা খুশী হয়েছিলেন। আমাদের দেশে এত অভাব হাহাকারের মূলেও এই মনোভাব। জীবনে যদি বিদ্যা না আসে, অর্থ না আসে ত ক্ষতি নেই, একটি বধূ এলেই নিশ্চিন্ত!

তপন বলিল, এ বোধ হয় slave mentality?

সুবোধ বলিল, ও বিষয় নিয়ে তর্ক এখন থাক। ইতিহাসের অন্ধকার যুগে অর্থাৎ আমাদের স্বাধীন পূর্ব্বপুরুষগণ কি আচার নিয়ম মেনে চলতেন—তা বলা এখন বড় শক্ত। ভেবোনা, তিন বছরে অনেকগুলি দিন, সে সব দিনের চিন্তা এখন নাই বা রইলো?

তপন বলিল, তোমায় যে ঠিক বোঝাতে পারচি না, সুবোধদা! কন্যাটি দেখ্‌তে পড়ে, আমার মেজ বৌদির বোন। তার যাওয়া আসা বন্ধ করবার হাত আমার নেই যে।

সুবোধ সহসা কোন উত্তর না দিয়া কি যেন চিন্তা করিল। তার প্রশস্ত ললাটে কুঞ্চন-রেখা ফুটিয়া উঠিল। ভ্রূনিম্নে অর্দ্ধ মুদ্রিত চক্ষু; ওষ্ঠের উপর ওষ্ঠ চাপিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত সে ধ্যানমগ্নের মত বসিয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে বলিল, তোমার বিবাহ করাই উচিত, তপন।

তপন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, তুমিও এই কথা বললে সুবোধ দা?

সুবোধ বলিল, উচিত। কেন না প্রবল একটা কিছুকে দমন করতে হলে প্রবলতর একটা কিছু চাই। তোমার কলেজের চেয়ে বাড়ী হয়ে উঠেছে —রমণীয়।

তপন শুষ্ক মুখে কহিল, না, না—

সুবোধ কহিল, না যদি ত ভাবীর চিন্তায় এত উদ্বিগ্ন হয়েছ কেন? মনে করতে পার না কেন— ও সব এখন তোমার পক্ষে জঞ্জাল। তোমার পড়ার সঙ্গে স্বপ্নকে মিশিয়ে হাঁপিয়ে উঠচো কেন?

তপন ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, হয়ত আমি দুর্ব্বল, তাই। সুবোধদা, সত্যি বলতে কি, এ বিষয়ে আমার বাড়ীই হয়েচে আমার কাল। সেখানে কেবল ওই সব আলোচনা—ওই সব কথা।

সুবোধ তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া সস্নেহে কহিল, কিছু না। তুমি মনের মধ্যে এক দুর্গম দুর্গ তৈরী কর—যেখানে ও সব গোলাগুলীর কোন কিছুই পৌঁছবে না। মনে কর, এ তোমার তপস্যা।

তপন উজ্জ্বল মুখে বলিল, চেষ্টা করবো। তুমি দিনকতকের জন্য তোমাদের দেশে আমায় নিয়ে চলো না। এখানে মন যেন হাঁপিয়ে উঠচে।

সুবোধ বলিল, আসচে পুজোয়, কি বল?

তপন উৎসাহিত হইয়া বলিল, সেই ভাল। বাড়ীর পুজো ত ফি বারেই দেখি—এবার পাড়াগাঁয়ে ঘুরে আসা যাবে।

* * *

পরের সপ্তাহে।

তপন আপন নির্জ্জন কক্ষের দুয়ার বন্ধ করিয়া

পাঠ্য বিষয়ে মনঃসংযোগ করিয়াছে: এমন সময় বাহিরে করাঘাত হইল।

প্রথমটা তপন মনোযোগ দিল না। কিন্তু ঘরের বাহিরে কাঠের কপাটে আঘাতটা ক্রমাগত বাজিতে থাকায় সে বিরক্ত হইয়া দুয়ার খুলিয়া দিল।

মেজ বৌদি সুলতা হাসিতে হাসিতে কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, ঠাকুরপো কি স্মৃতি-ধ্যানে মগ্ন ছিলে?

তপন জানিত ইহার কাছে বিরক্তি প্রকাশ করার অর্থ রহস্যের উৎস উৎসারিত করিয়া দেওয়া। তাই সে কথায় কান না দিয়া গম্ভীর ভাবে কহিল, কাল ক্লাসে সাহিত্যের একটি লেকচার আছে।

সুলতা বলিল, এদিকেও একটা সুখবর। সুনীল ওবেলা এসেছিল, কাল রাত্রিতে আমাদের বাগবাজার যেতে বলে গেচে।

তপন কহিল, কিন্তু আমার ত সময় হবে না, মেজ বৌদি। কাল সন্ধ্যের পর এক জায়গায় ফিজিক্যাল ফীটস্ দেখবার নিমন্ত্রণ।

সুলতা বলিল, তা কি হয়? ওদের এই বলার অর্থ তোমাকে বাদ দিয়ে নয়। যাওয়া চাই।

তপন বিপন্নের মত কহিল, খুব হয়, তুমি একটু বুঝিয়ে বলো।

সুলতা বলিল, নিমন্ত্রণ নিয়ে না গেলে ভদ্রলোককে সম্মান দেখানো হয় না—এ বোধ হয় জান?

তপন বলিল, বিশেষত তাঁরা একেবারে অনাত্মীয় নন। এ ক্ষেত্রে তোমাকেও খাটো হতে হবে। তবু মেজ বৌদি, আমায় মাপ করো।

সুলতা সাশ্চর্য্যে কহিল, তার মানে? ভদ্রলোকের বাড়ী নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যাওয়া তোমার পক্ষে খুবই শক্ত বুঝি? এতটা আদবকায়দা কবে থেকে শিখলে, ঠাকুরপো?

তপন এক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া কহিল, তবে শোন। আদবকায়দার আবরণ আমার সহ্য হয় না। তোমরা মনে মনে যে আকাশকুসুম ফুটিয়ে তুলচো আমার সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই। ওতে আমার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই বলেই ও-সব avoid করতে চাই।

সুলতা অল্প একটু আহত হইয়া কহিল, তুমি মস্ত বড় বীরপুরুষ সন্দেহ নেই ঠাকুরপো! সহজ ভদ্রতাকেও আমলে আনতে চাও না।

তপন সুলতার অভিমান-গদ্‌গদ্ স্বরে অপ্রতিভ হইয়া কহিল, ঠিক তা নয়। আমার মনের কথা তোমায় ঠিক বোঝাতে পারচি না বলে তুমি দুঃখ করচো। দেখ মেজ বৌদি, এখন পড়াশুনার সময় ও সব চর্চ্চা করায় কি ক্ষতি হয় না?

সুলতা মুখ না ফিরাইয়া কহিল, বেশ ত, আমি ফোনে বারণ করে দিচ্চি তাদের।

তপন ব্যস্ত হইয়া কহিল, সে বড় বিশ্রী দেখাবে! তার চেয়ে—থাক, আমি না হয় যাব। কিন্তু এই শেষ। ভবিষ্যতে এ বিষয়ের প্রসঙ্গ মাত্র তোমরা আমার কাছে তুলো না।

সুলতা বলিল, কাজ কি ঠাকুরপো বাধা জন্মিয়ে। একটা অসুখের অছিলে করে ফোনে বারণ করলেই—

তপন কহিল, সামান্যের জন্যে মিথ্যে বলবে!

সুলতা ম্লান হাসিয়া কহিল, মিথ্যে! ঠাকুরপো, তোমরা যে-জগতে আছ—ওখানে সত্যের আদর খুব বেশী। অনেক সাধু ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বইয়ের পাতায় পাতায়। কিন্তু আমরা যেখানে চলতে সুরু করেছি—সেখানে ওর আলো নেই বল্লেই চলে। এই ঘরে ইলেক্‌ট্রিক আলোর মধ্যে ওই কোণে যদি মাটির-প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখি—কেই বা তা চেয়ে দেখবে বল?

তপন ব্যথিত স্বরে বলিল, মেজ বৌদি. তোমার আজ হলো কি? সব কথাই উল্টো করে ধরচো কেন?

সুলতা তপনের পানে না চাহিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিল, আমিই ভুল আশা পুষে এতদিন মিছে ঘুরছি! তোমরা জান না ঠাকুরপো—এই ছোট বাড়ীর গণ্ডীর মধ্যে যে কটা আশা আমরা বুকে পুষে রাখি, তা এত অল্প যে, আঙুলে গুণতে হয় না। অথচ সেই অল্পের মধ্যেই আমাদের জীবনের সুখ তৃপ্তি যা কিছু। তোমরা বাইরের বিস্তীর্ণ জগৎ পেয়েচ, কাজেই এ সব আশাকে তুচ্ছ বা আকাশ-কুসুম মনে হয়। একে ভাঙ্গতে কখনও দ্বিধা বা মায়া বোধ কর না। অথচ যদি জানতে—রুদ্ধকণ্ঠ সুলতা কক্ষ ত্যাগের উপক্রম করিল।

তপনের আর ধৈর্য্য রহিল না। সুবোধ যে দুর্গের কথা বলিয়াছিল, সে দুর্গ এই করুণ বেদনার গোলায় এক নিমিষে ভূমিসাৎ হইয়া গেল। সুলতার সামান্য আশাকে ভাঙ্গিয়া দেওয়ার মত নিষ্ঠুর কাজ এ জগতে আর কি-ই বা আছে? হয়ত মেসের আত্মীয়শূন্য কক্ষে বাহিরের প্রচণ্ড কোলাহল বারুদ-হীন বিস্ফোরণের মতই ব্যর্থ হইয়া যায়—

অন্তর-রাজ্যে দুর্গম দুর্গের পাদদেশ সে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু সংসারের মধ্যে বাস করিয়া স্নেহ মমতাকে নির্ম্মমের মত পদদলিত করিয়া অটল অবিচলিত চিত্তে কোন্ নির্ব্বিকার মানুষ তপস্যামগ্ন থাকিতে পারে? যে পারে—তার চিত্ত যে-ধাতুতে তৈয়ারী, সে কঠিন ধাতু—তপনের নাই।

খাট হইতে ত্বরিতে নামিয়া সুলতার নিকটে আসিয়া সে ডাকিল, মেজ বৌদি।

সুলতা উদ্গত অশ্রু গোপন করিতে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিল—কি?

তপন কহিল, আমায় মাপ কর। তোমার এতটা বাজবে জানলে—

সুলতা অশ্রু মুছিয়া তপনের পানে চাহিয়া কহিল, ও কথা বলতে না? না ভাই, নিজের প্রতিষ্ঠা যদি ইচ্ছা কর ত পরের পানে চেয়ো না। যদিও কথাটা স্বার্থপরের মত, তবু সংসারীর। হয়ত আমরাই ভুল বুঝেচি। তোমার মনের খবর না জেনে নিজের মনেই ভাঙ্গচি, গড়চি। এ-ও ভাল নয়, ভাই।

তপন ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে কহিল, মনের খবর জানতে চাইলেই জানা যায় না—এ কথা খুব সত্যি। তবু আজকের ব্যবহারের জন্য—

সুলতা হাসিয়া কহিল, বার বার মাপ চেয়ে খাট হয়ো না, ঠাকুরপো। পরে গম্ভীর হইয়া কহিল, না ঠাকুরপো—সত্যিই এ অন্যায়। তোমার পড়াশোনা—ও যে আলাদা জগতের তপস্যা। দৃঢ়নিষ্ঠ না হলে অনেক বাধাই জন্মায়।

তপন গভীর বিস্ময়ে সুলতার পানে চাহিয়া শ্রদ্ধাপুলকিত স্বরে বলিল, এ বাড়ীর মধ্যে তোমায় বেশী শ্রদ্ধা করি এই জন্য যে, তুমিই জান—এই অমূল্য মণির মর্য্যাদা।

সুলতা লজ্জার হাসি হাসিয়া বলিল, অথচ জেনে শুনেও তোমায় বিরক্ত করি। এমনই অসার মন বটে স্ত্রীলোকের! একটা আশার সুতো যদি পেলে ত জাল বুনতে থাকে মনের মধ্যে। যতক্ষণ না জাল বোনা শেষ হয়—ততক্ষণ তার নিস্তার নেই। এত কৌতুহলী করে কেন যে ভগবান আমাদের গড়েচেন, কে জানে?

তপন বলিল, আমি জানি—মেজ বৌদি।

সুলতা বলিল, তুমি বুঝি ভগবানের ওপর?

তপন বলিল, না, সেই হৃদয়হীনের অনেক নীচে। তিনি ত ওই আকাশের মধ্যে ধোঁয়ার মত—আকার, রূপ, কথা, ব্যবহার, সবেতেই অস্পষ্ট। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি—অতি কৌতুহলী হয়েই তোমরা তাঁর জগৎকে সুশৃঙ্খলে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ।

সুলতা কৌতুকের হাসি হাসিয়া বলিল, যথা?

তপন বলিল, যথা স্নেহ, মমতা, আনন্দ, উৎসাহ—সবগুলিকে সুতোয় গেঁথে মালা তৈরী করেচ বলেই জীবন-সংগ্রাম আমাদের পক্ষে কখনও তিক্ত, নীরস বা বিস্বাদ হয় না। এই যে এত ব্যস্ততা ছোটাছুটি, কলহ কোলাহল, ঝগড়া মারামারি—এ-সবের মূলে অমৃতধারা ঢালচ তোমরাই।

সুলতা হাসিয়া বলিল, অর্থাৎ আমরাই অশান্তি কোলাহল বাঁচিয়ে রেখেচি!

সুলতা হাসিমুখে কক্ষত্যাগ করিল।

* * *

নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে তপনের একটুও ভাল লাগিল না। প্রকাণ্ড প্রাসাদ দীপমালায় সজ্জিত হইয়াছে; তোরণে পত্রপুষ্পের সমাবেশ নাই, শুধু আলোর প্রাচুর্য্য, কক্ষে কক্ষে অতিরিক্ত সজ্জাবাহুল্য এবং যে সকল অতিথি এ বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রসাধন-পারিপাট্যে শ্রীর পরিবর্ত্তে আড়ম্বরপ্রিয়তাই ফুটিয়া উঠিতেছে। বাড়ীর সামনে ছোট একটি বাগান। বেলা, গোলাপ, গন্ধরাজ, হেনা, চম্পক, যুঁই প্রভৃতি গাছের এমন ঘন-সন্নিবেশ যে, দেখিলেই মন ক্লান্তি নয় বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিয়া উর্দ্ধ গগনের নীল নীড়ে আশ্রয় খুঁজিতে থাকে। একটা কৃত্রিম উৎস হইতে জলধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। কৃত্রিম উৎসের মতই সুসজ্জিত নরনারী পরিমিত হাসি, কথা ও শিষ্টাচার দ্বারা পরস্পরকে অভ্যর্থনা করিতেছে! সর্ব্বত্রই কেমন একটা সন্ত্রস্ত ভাব; এতটুকু ত্রুটি বিচ্যুতিতে যেন এমন অঘটন ঘটিবে—যাহার মার্জ্জনা সভ্যতার ধারায় লেখা নাই! প্রতিটি পদক্ষেপ মাপিয়া মাপিয়া করিতে হইতেছে। পকেট হইতে সুগন্ধি রুমাল বাহির করিয়া কপালের ঘাম মুছিবার সতর্ক ভঙ্গিটিও উল্লেখ-যোগ্য!

তপন এই সমস্ত কৃত্রিমতা পরিহার করিতে অদূরে ছায়াচ্ছন্ন আমগাছের তলায় গিয়া বসিল। মনে মনে ভাবিল, এই সব অপরিচিতের সম্মুখে কুণ্ঠিত হইয়া বেড়ানোর চেয়ে—নির্জ্জনতা ভাল। কি কথা বলিয়াই বা আলাপ জমাইবে? শরতের নির্ম্মেঘ আকাশ। গ্রীষ্ম নাই যে, সে প্রসঙ্গ

তুলিয়া খানিক কাটাইবে। আসন্ন-শীতের আলোচনাও এখন অসম্ভব, বর্ষা যে বহুকাল গত হইয়াছে।

কিন্তু তার এই একাকীত্ব বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। খুঁজিতে খুঁজিতে ছায়াই প্রথম আমগাছ তলায় তপনকে আবিষ্কার করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

কহিল, আপনি এখানে?

তপন ক্লান্তিভরা চক্ষে ছায়ার পানে চাহিয়া বলিল, বেশ আছি। তুমি বরং অন্য অতিথির দিকে মনোযোগ দিতে পার।

ছায়া মৃদু হাসিয়া কহিল, তা পারলেও আপনাকে অবহেলা করা উচিত নয়। এক কাপ চা খাবেন?

তপন ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল।

ছায়া পুনরায় প্রশ্ন করিল, সরবৎ?

তপন পুনরায় ঘাড় নাড়িতেই ছায়া ক্ষুণ্ণ-কণ্ঠে কহিল, বেশ, না খান নাই খাবেন—ড্রয়িং রুমে চলুন। ওঁরা সবাই আপনার গান শোনবার জন্য ব্যস্ত হয়েচেন।

তপন হাসিয়া বলিল, আমার গানও শোনবার মত হলো? না, ছায়া—এত বড় compliment পাবার যোগ্যতা আমার নেই। তুমি একটু বসবে?

ছায়া না বসিয়াই বলিল, কিছু বলবেন?

তপন ছায়ার পানে ভাল করিয়া চাহিল। উপরের আকাশে অষ্টমীর আধখানা চাঁদ; জ্যোৎস্নার আলো অস্পষ্টভাবে পৃথিবীতে মায়াজাল বুনিয়াছে। এই ক্ষীণ আলোয় তীব্রদৃষ্টিকে আয়ত্ত করিলেও অনেক কিছুই রহস্য-মণ্ডিত হইয়া থাকে। ধূপছায়া রঙের শাড়ি, ব্লাউজ হয়ত শাড়ির সঙ্গেই মিল করা। মুখে ক্রীম, পাউডার ও ঠোঁটে লিপষ্টিক আছে কিনা বোঝা যায় না; মুখখানা উজ্জ্বল বলিয়াই বোধ হয়! এসেন্সের গন্ধে সারা বাগান ভুর ভুর করিতেছে। কোমল ঘাসের উপর হালকা স্যাণ্ডেলের আওয়াজটুকু বাহির না হইলেও অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় জুতার জরি চক্ চক্ করিতেছে। মাথায় এলো খোঁপা।

তপনের ইচ্ছা হইল, আজই এ বিষয়ের একটা মীমাংসা করিয়া লয়। সুলতার সে দিনের দীর্ঘ-নিশ্বাস-ফেলা কথার মধ্যে যে বেদনার সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল—তপনের কানে সে ধ্বনি এখনও বাজিতেছে। সুলতার ক্ষুদ্র আশায়—বৃহৎ আনন্দময় জীবন ও অতুল তৃপ্তি লুকানো আছে। তাইত সেই ক্ষণেই তপনের দৃঢ়সঙ্কল্প গলিতে আরম্ভ হইয়াছে। সেই মুহূর্ত্তেই সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, আজিকার শুভক্ষণে যাহা হউক একটা কিছু স্থির মীমাংসা তাহাকে করিতেই হইবে। তিন বৎসর পরের অনাগতকে এই মুহূর্ত্তেই সুস্বাগত করা তার উচিত।

তপনকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া ছায়া বলিল, কৈ, কিছু বললেন না ত?

তপন বলিল, বসবে? হাঁ, ওই ঘাসের ওপর। হয়ত তোমার শাড়ির ওপর ভাঁজ পড়বে!

ছায়া লজ্জিত হইয়া তপনের অদূরে বসিয়া পড়িয়া কহিল, পড়ুক।

তপন হাসিয়া বলিল, তাহলে ও ঘরে যাঁরা আছেন, তাঁরা হয়ত ভ্রূকুঞ্চিত করবেন!

ছায়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, এই কথাই বলতে চাইছিলেন?

তপন অপ্রতিভ হইয়া কহিল, না,—না, সভ্যতার আদবকায়দা…হাঁ, শোন। সেদিন আমাদের বাড়ীতে আমার ঘরে বসে তুমি গান গাইতে পার নি—হঠাৎ বড় বৌদি ডাকলেন বলে।

ছায়া মৃদু হাসিয়া কহিল, তা সেই অভাবটা এই বাগানে বসে পূরণ করতে বলেন? কিন্তু ভারি অসুবিধে এখানে! অর্গ্যান নেই, আলো নেই…

তপন আরও অপ্রতিভ হইয়া কহিল, না, গান আমি শুনতে চাইচি না। আমি…, বলিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সহসা সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিয়া ফেলিল, সেদিন যা বৌদি বলছিলেন অর্থাৎ আমাদের সম্বন্ধে, তা বোধ হয়—

ছায়া মুখ নীচু করিয়া নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

তপনের সঙ্কোচ অনেকখানি কাটিয়া গিয়াছিল। সে বলিতে লাগিল, সেই ইঙ্গিতকে স্পষ্ট করে যদি একটু আলোচনা করি ত আশা করি আমার দোষ ধরবে না। বড় নিরুপায় হয়েই এ আলোচনা আমায় করতে হচ্ছে।

ছায়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। মুখও তুলিল না, কথাও বলিল না। শুধু ঘাড় নাড়িয়া তপনের কথার সমর্থন করিল।

তপন গলাটাকে পরিষ্কার করিয়া বলিল, অথচ তুমি জান তিন বৎসর একটা উদ্বেগ বুকে পুষে রেখে ভবিষ্যৎ জীবনকে সমৃদ্ধ করা কি দুরূহ! কলেজের ক্ষতি তাতে অনেকখানিই হবে।

ছায়া মুখ তুলিয়া তপনের পানে চাহিল।

তপন বলিতে লাগিল, সে কথা তোমায় বুঝিয়ে বলাই বাহুল্য। কিন্তু বাড়ীর লোকদের ত জান! তাঁরা ভবিষ্যতের আশা নিয়েই বর্ত্তমানকে চালাতে ভালবাসেন। তাঁরা ছেলে মেয়ের জন্মক্ষণ হতেই সংসার পাতার কল্পনা করে থাকেন।

ছায়া মৃদু স্বরে বলিল, আপনি কি করতে বলেন?

তপন বিস্মিত হইয়া বলিল, করতে! না, না, এ বিষয়ে তোমার একটা মত—

ছায়া বলিল, আমাদের মতে যখন এ কাজ হচ্চে না—তখন আমাদের ভাবনা মিছে।

তপন ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বলিল, তা বললেই কি ভাবনা আসে না? নদীর ওপর দিয়ে ষ্টীমার চলে গেলেই যে জলে ঢেউ ওঠে।

ছায়া মুখ নামাইয়া বলিল, কিছুক্ষণের জন্য। তারপর জল আবার স্থির হয়ে আসে।

তপন উত্তরোত্তর উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল। গলার স্বর আরও একটু উঁচু করিয়া কহিল, বেশত, ষ্টীমার চলে যাক ক্ষতি নেই, কিন্তু বার বার যদি সে যাওয়া আসা করে, জলের আলোড়ন কি থামে তাতে? আজ তোমাদের বাড়ীর এই যে উৎসব—

ছায়া বলিল, জানি। এ সম্বন্ধটাকে যদি মেনেই নেন ত আপনার দুশ্চিন্তার কারণ কি থাকতে পারে!

তপন একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, এ কি রকম জান? জীবনের এত বড় একটা কাজ, না জেনে শুনে চোখ বুঁজে ওষুধ গেলার মতই অপ্রীতিকর।

ছায়া বলিল, আপনি কি বলতে চান, স্পষ্ট করেই বলুন, আমিও হয়ত স্পষ্ট উত্তর দিতে পারবো।

তপন আর ইতস্ততঃ না করিয়াই কহিল, তিন বছর বড় কম সময় নয়। এই তিন বছরে তুমিও অগ্রসর হবে, আমিও। আমাদের ব্যবহারে রুচিতে অনেকখানি পার্থক্যই হয়ত ফুঠে উঠবে। আজ যা সহজ—সেদিন তাই হয়ে উঠবে রহস্যময়—দুর্ব্বোধ্য। সে দিনের সেই ক্ষণগুলিকে আজকের বাক্‌দানের মধ্যে যদি আমরা না-ই সার্থক করে তুলতে পারি?

ছায়া বলিল, সার্থক করে তুলতেও পারি। অবশ্য আপনার সন্দেহ মিছে নয়। কিন্তু সেই অনাগত আশঙ্কাকে জাগিয়ে রেখে আজ আমাদের কি লাভ বলুন ত? আজ ত আর তিন বছর পরের সেই আশঙ্কা-ব্যাকুল দিন নয়!

তপন বলিল, তুমি বল কি! আজ থেকে বাক্যদান করে সেদিন যদি সে প্রতিজ্ঞার বন্ধন শিথিল হয়—

ছায়া নির্লিপ্ত স্বরে উত্তর দিল, তাতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হবেন না, আমিও হব না। কারণ আজকের কথা দেওয়ার জন্য আমরা ত দায়ী নই।

ছায়ার এই স্পষ্ট উত্তরে তপনের বুকে খচ্ করিয়া কোথায় একটা কাঁটা ফুটিল। ছায়া দিব্য নিশ্চিন্তেই ত উত্তর দিয়া গেল। এই মিলন-প্রসঙ্গে এতটুকু আন্তরিকতা তার স্বরের উপর মৃদু কম্পন-রেখা জাগাইয়া তুলিল না। অথচ, তপনের তরুণ মনে সৌন্দর্য্যের জন্য একটা ধূমাচ্ছন্ন প্রত্যাশা সর্ব্বক্ষণ সচকিত হইয়া উঠিতেছে। এক একবার এই বন্ধনের বেদনায় মন মুহ্যমান হইয়া পড়িতেছে, পরক্ষণেই স্বপ্ন-বাস্তবে মিলিয়া অপূর্ব্ব শিহরণ তুলিতেছে!

চঞ্চল মনের চপল বৃত্তিকে রোধ করিবার জন্য মীমাংসা তার চাই। তাই নিরালায় বসিয়া সে স্পষ্ট ভাষায় ভাবী জীবন সম্বন্ধে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিতে পারিয়াছে। কিন্তু এখন মনে হইতেছে—জিজ্ঞাসা বুঝি অস্পষ্টই রহিয়া গেল। ঠিকমত বোঝাইবার ভাষা তার নাই।

ছায়া তাহার পানে চাহিয়া বলিল, আপনি যে উত্তর দিচ্ছেন না? সত্যিই ভেবে দেখুন দেখি—যা আমাদের আয়ত্তাতীত তাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করায় কি লাভ? বরঞ্চ আজ যদি আমরা সত্যিকারের বাঁধনে বাঁধা পড়তুম ত সেই হতো ভাবনার কথা!

তপন ম্লান মুখে বলিল, হয় ত আমি ঠিক বোঝাতে পারলুম না।

ছায়া হাসিয়া বলিল, আজ এর চেয়ে বেশী বোঝাবারই বা দরকার কি? স্কুল কলেজের গণ্ডি ছাড়িয়ে এর পর—এ সব বিষয়ে ভাববার যথেষ্ট অবসর পাব। কি বলেন?

ছায়া কি রহস্য করিতেছে? অন্ধকারে যে মুখ দেখা যায় না! অন্ধকার না থাকিলেও তপন কি ছায়ার পানে চাহিতে পারিত? এমন অকুণ্ঠ লজ্জালেশহীন সুস্পষ্ট উত্তর! তপন ভাবিয়াছিল, তার প্রস্তাবে সরম-সঙ্কুচিতা কিশোরীর বহুক্ষণ ধরিয়া হয়ত কথাই ফুটিবে না! বহু আরাধনায় যদি ফোটে, লজ্জাবিজড়িত অর্দ্ধস্ফুট ধ্বনি—মাধুর্য্য-

মণ্ডিত ইঙ্গিতে মনোভাব ব্যক্ত করিতে হয়ত বা অতি লজ্জায় সন্নিকটবর্ত্তী তপনের বুকে মুখখানি গুঁজিয়া পরম বার্ত্তাটি নিঃশেষেই নিবেদন করিয়া দিবে। তারপর, নিঃশব্দ নক্ষত্র-খচিত আকাশের পানে চাহিয়া অনাদি অনন্তকালের পুরাতন লেখাটিকে নূতন করিয়া পাঠ করিবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবে। মাঝের তিনটি বৎসর তারপর আর দুঃসহ বোধ হইবে না।

ছায়াই কথা কহিল, এখন উঠুন, ওদিকে ওঁরা হয়ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

যন্ত্র-চালিতের মত তপন উঠিল।

দুর্গম দুর্গে শত্রুপক্ষের জ্বলন্ত গোলা আসিয়া পড়িল না, বোমাও সশব্দে ফাটিল না। অ-বিদারিত —অটুটই রহিয়া গেল। তবু নরচক্ষুর অন্তরালে সমস্ত ভিত্তি তার প্রবল কম্পনে বারংবার নড়িয়া উঠিতে লাগিল।

* * * *

মোটরে ফিরিবার সময় সুলতা নূতনতর সম্পর্ক লইয়া অনেক পরিহাসই করিল, কিন্তু নিরুত্তর তপনের মর্ম্মভেদ করিতে পারিল না। মোটরের ম্লান আলোকে তপনের মুখ ভাল দেখা যাইতেছিল না। সুলতা তাহার অবনত মুখ দেখিয়া মনে করিল, লজ্জা। একে ত তরুণ বয়স—তার উপর এই সব আয়োজন। বাকপটুতা থাকিলেও লজ্জা আসে বৈকি! সমস্ত পথ সে আপন আনন্দে কৌতুক করিতে করিতে চলিল। তপনের মুখ হইতে একটি অনুকূল উত্তর না পাইয়াও উৎসাহ তার স্তিমিত হইল না। লাখ টাকার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে ভিখারীর সহসা অর্থপ্রাপ্তির মত অত্যুল্লাসে সে মগ্ন হইয়াছিল। মন উজ্জ্বল থাকিলে মেঘময় আকাশের পানে চাহিয়াও নাচিয়া উঠে।

বাড়ীতে আসিয়াই সুলতা চারুর সঙ্গে দেখা করিল। চারুর তখন পরিপাটী বিছানা তৈয়ার হইয়া গিয়াছে। খুব খানিকটা জোরে জোরে পাখার বাতাস করিয়া নেটের মশারির ধারগুলি সে সন্তর্পণে গুঁজিতেছিল।

সুলতা আসিয়া কহিল, দিদি নিজের ঘরখানি নিয়েই হাঁপিয়ে উঠেচ যে?

চারু ঘাড় ফিরাইয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, মিথ্যে নয়। মেজ ঠাকুর-পো আর ওঁর মেজাজ এমনি কড়া যে, তিলকে তাল করে তোলেন এক দণ্ডে। জানিস ত ভাই—একটা মশা যদি পোঁ পোঁ করে ত সারা রাত ঘুমুতে পারবে না।

সুলতা কহিল, কেবল সেজ ঠাকুরপো যা দলছাড়া—গোত্রছাড়া, নয়?

চারু বলিল, হুঁ, তা ওখানে কেমন হলো?

সুলতা বলিল, তুমি দিদি বড় কুণো হয়ে যাচ্ছ দিন দিন। এত সাধলুম—কিছুতেই গেলে না!

চারু মুখ ম্লান করিয়া কহিল, আমরা ভাই সেকেলে মানুষ অসভ্য। কি বলতে কি বলবো। ও সব জায়গায় যাওয়া কি সাজে আমাদের?

সুলতা চারুর অন্তরের বেদনা বুঝিয়া প্রসঙ্গান্তরে মনোনিবেশ করিল।

জান দিদি, ওদের দুটিকে ত কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। শেষে আমার মামাত ছোট বোন লিলি পা টিপে টিপে বাগানে গিয়ে দেখে এলো দু'টিতে মুখোমুখী বসে গল্প করছে।

চারু বিস্মিত স্বরে কহিল, বলিস কিলো! গাছে না উঠতেই এক কাঁদি!

সুলতা হাসিতে হাসিতে বলিল, ঠাকুরপো ভারি চাপা, মুখে এদিকে দেখায় যেন ভাজা মাছখানি উল্টে খেতে জানে না, অথচ···তা বিয়েটা শীগ্‌গির হলেই ভাল হতো, নয়?

চারু বলিল, তা আবার নয়। ও মা গো! ঠাকুরপোর কথা শুনে আমি ত অবাক্ হয়ে গেচি!

সুলতা রহস্য করিয়া কহিল, তা তো হয়েচ—কিন্তু তুমি যখন এ বাড়ীতে এসেছিলে, তখন বটঠাকুরের বয়স কত শুনি?

চারুর সুগোল মুখে লজ্জার লাল রঙ ফুটিয়া উঠিল। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, মরণ! আমি না তোর দিদি হই?

সুলতা হাসিয়া কহিল, তা হও, কিন্তু ব্যথার ব্যথী ত!

চারু কহিল, আজে বাজে বকিসনি, এখন আসল কথা বল।

সুলতা বলিল, আসল ত সেই তিন বছর পরে!

চারু একটু আগাইয়া আসিয়া কহিল, এদিকে কিন্তু খবর আছে। তোরা যাবার পর ওঁরা পরামর্শ করছিলেন।

সুলতা বলিল, কি পরামর্শ?

চারু তাহার উদ্বিগ্ন মুখের পানে চাহিয়া কহিল, ভয় নেই—খবর ভাল। তবে,—বলিয়া চারিদিকে সশঙ্ক দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, ছাদে চ!

ছাদে আসিয়াও চারু ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, জানিস ত ওঁদের টাকার খাঁই। সেই কথাই হচ্ছিল।

সুলতার উদ্বেগ কমিল না, শুষ্ক কণ্ঠে কহিল, কি ঠিক হলো ?

চারু বলিল, পনেবো হাজারের এক পয়সা কমে নয়। ছেলে ভাল, ভবিষ্যতে আরও দুটো পাস দেবে। আর আমাদের বেলায় যে লোক-সানটা হয়েচে—তা-ও পুষিয়ে নেওয়া চাই ত !

সুলতা কোন উত্তর দিল না।

চারু কহিল, তা তোব এত ভাবনা কিসের ? কর্ত্তায় কর্ত্তায় বোঝাপড়া করুন গে। হাঁ, বিয়ে তিন বছর বাদে হলেও অর্দ্ধেক টাকা এঁরা আগাম চান।

সুলতার চিন্তাকুটিল মুখে গাঢ় কালো ছায়া পড়িল। ভ্রূকুঞ্চিত করিযা সে কহিল, এ কি দাদন ?

চারু বলিল, তা কথা পাকা হওযা ভাল। গণ, পণ ও টাকায় মিল হলে বাঁধন একটা থাকা ভাল নয কি ?

ঘৃণায় সুলতাব কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিযাছিল। অতি কষ্টে সে কহিল, ভাল আবার নয় ? ভগবান না করুন, কোন পক্ষে ভালমন্দ একট. কিছু হলে টাকাটার দায়িত্ব আর রইল না। খুব ভাল !

চারু বলিল, ষাট্, ষাট, ও কি কথা ! কিন্তু এমন একটা ভাল সম্বন্ধ, জানা ঘর—খুঁজে বার করাও কঠিন।

সুলতা দৃঢ়স্বরে কহিল, মোটেই কঠিন নয়। গঙ্গার জল এর চেয়ে স্পষ্টতর। সেখানে ভাসিয়ে দিলে তবু বুঝতে পারা যায় মেয়ের পরিণাম। একটু ম্লান হাসিয়া কহিল, অথচ দেখ দিদি, আশ্চর্য্য মানুষের মন, সব জেনে শুনেও এইটাকেই ভেবে-ছিলুম পরম কাম্য ! ওঁদের তুমিও জান, আমিও জানি, তবু পোড়া আশা এমনি যে, দু'চোখে ঠুলি পরিয়ে অন্ধ করে রাখে। এমন যে হতে পারে তা একবারও ভাবিনি ? আশ্চর্য্য !

চারু কহিল, ভেবে আর কি হবে—

সুলতা অদ্ভুত হাসি হাসিয়া কহিল, ভাবনা করি না। এ কাজ যাতে না হয়, তারই জন্য চেষ্টা করবো।

চারু কহিল, সে কি, ওঁরা যদি জানতে পারেন ?

সুলতা বলিল, তোমার মত আমারও পিঠ না হয় ক্ষতবিক্ষত হবে। তা হোক, তবু জেনে শুনে তার সর্ব্বনাশ আমি করতে পারবো না দিদি।

চারু কহিল, তার চেয়ে এক কথা শোন, চুপ করে থাক। ওঁরা ত চিরদিনই থাকবেন না।

সুলতা কহিল, চিরদিন না থাকুন, যে ক'দিন থাকবেন—তাতেই চিরদিনের লেখা লিখে দিয়ে যাবেন। সে লেখা মোছবার ক্ষমতা আমাদের কারো নেই দিদি।

চারু নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তবু থাক বোন। উৎসাহ তুই দিসনি, মিথ্যে লাঞ্ছনা কেন ডেকে আনবি ? তোব বাপ যে রকম তেজী, তাতে তিনিই হয়ত শেষ পর্য্যন্ত রাজি হবেন না।

কথাটা সুলতার মনে ধরিল। এমন আত্মাব-মাননার কাজে কিছুতেই তাহার পিতা সম্মত হইবেন না।

বুকের প্রকাণ্ড বোঝা নামিয়া গেল। সুলতা চারুর হাত ধরিয়া কহিল, ঠিক বলেচ দিদি। চল, নীচে যাই।

উপরে নক্ষত্র-খচিত আকাশ-আবরণে অলক্ষিত নিয়ন্তার মুখ হয়ত ক্ষণেকের তরে ছায়াচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। মাথার উপর দিয়া কর্কশ স্বরে একটা পাখী ডাকিয়া গেল।

সে ডাকে চারু ও সুলতা দুইজনেই চমকিত হইল।

* * *

মাস খানেক পরে।

বটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াইতে বেড়াইতে বটগাছের ও-দিকে হঠাৎ তপনের দৃষ্টি প'ড়িল। কয়েকটি তরুণ-তরুণী মিলিয়া হাস্য-কলরবে জায়গাটি মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। শ্যামল তৃণের উপর সাদা কাপড় বিছাইয়া চক্রাকারে বসিয়া তারা পরমানন্দে পিক্‌নিক্ করিতেছে। উর্দ্দিপরা এক চাপরাসী গরম চায়ের কেটলিটা লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে, অদূরে জলন্ত ষ্টোভের উপর জল গরম হইতেছে। অপরাহ্নের বর্ণময় আকাশ সমস্ত বাগানখানির উপর স্নিগ্ধ প্রশান্তি বিছাইয়া দিয়াছে। তাহারই কোলে তরুণ জীবনের এই আনন্দ-কোলাহল ভারি চমৎকার মানাইয়াছে ! তপন দূরে দাঁড়াইয়া সে আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল।

উহাদের মধ্যে কেহ হয়ত তপনকে দেখিয়া থাকিবে। তপনের পানে চাহিয়া একটি মেয়ে আর একটি মেয়ের কানে কানে মৃদুস্বরে কি বলিল। কথা শুনিয়া মেয়েটি মুখ ফিরাইয়াই লাফাইয়া উঠিল এবং তপনের দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে হইতে কহিল, হাল্লো, আপনি যে !

সে ছায়া।

তপনের বিস্ময় কাটিল, কিন্তু মুখে আকস্মিক সাক্ষাতের উল্লাস-জ্যোতি ফুটিল না। সমাগত তরুণ-তরুণীর উপর দৃষ্টি বুলাইয়া আগ্রহহীন স্বরে বলিল, হঠাৎ ভাল লাগলো না, তাই বেড়াতে এলুম। ওঁরা কারা? তোমার কলেজের সহপাঠী নিশ্চয়ই।

ছায়া বলিল, মিঃ অটল রায়কে জানেন না? রায় বাহাদুর। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সাম্নে প্রকাণ্ড বাড়ী। তাঁর দুই ছেলে তরুণ আর অরুণ। মেয়ে রেবা, লিলি। ওখানে যাঁরা বসে, তাঁরা হচ্ছেন··· আসুন পরিচয় করিয়ে দিই।

তপন কহিল, না থাক। এমন আনন্দটা পরিচয়ের বিড়ম্বনা দিয়ে মাটি করি কেন?

ছায়া আব্দারের সুরে বলিল, বাঃ, বেশ ত! আপনি না গেলে ওঁরা মনে করবেন কি অভদ্র ওরা! চলুন না। হারমোনিয়ম আছে, তরুণবাবুর গান শুনবেন—চমৎকার!

তপন বলিল, আমায় অভদ্র বলুন—সইতে পারবো, কিন্তু তুমি হয়ত—

ছায়া বলিল, আঃ, কি যে বলেন! আসুন। বলিয়া তপনের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল।

নমস্কার শিষ্টাচারের মধ্যে দু'পক্ষের পরিচয় হইল।

ছায়া তাহার পার্শ্বোপবিষ্ট বাইশ বছরের যুবকটির পানে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, তপন-বাবুকে আপনার গান শোনাব বলে ডেকে আনলুম, নৈলে কিছুতেই উনি আসছিলেন না।

তরুণ মৃদু হাসিয়া তপনের পানে চাহিয়া বলিল, ছায়া দেবীর কথা শুনবেন না। দেখবেন—শেষ পর্য্যন্ত লোকসান আপনার হবেই।

তপনও হাসিয়া বলিল, লাভ-লোকসান পরের কথা। আপাতত—

তরুণ বলিল, আমার আপত্তি নেই। সঙ্গে সঙ্গে সে হারমোনিয়মটা টানিয়া লইয়া গান ধরিল।

গলা মিষ্ট, গাহিবার একটা সহজ সরল ভঙ্গিও আছে; তথাপি তপনের মনে হইল, এত মিষ্ট গলা পুরুষের না হইলেই যেন ভাল হয়। ছায়া ত একদৃষ্টে হাঁ করিয়া গিলিতেছে। অন্য মেয়েগুলিও —মুগ্ধ চোখে প্রশংসা ভরিয়া চুপ করিয়া রহিয়াছে। তরুণ টানা টানা চোখ দু'টি অর্দ্ধনিমীলিত করিয়া—অধরে সযত্ন-সঞ্চিত হাসিটুকু মাখাইয়া (ঠিক যেমন মেয়েরা ঠোঁটের রঙ বাড়াইতে লিপষ্টিক ব্যবহার করে), কোঁকড়া চুল-ভরা মাথাটি মাঝে মাঝে মনোজ্ঞভঙ্গিতে হেলাইয়া সুরের ইন্দ্রজাল বুনিয়া চলিয়াছে। কানের ভিতর দিয়া সে সুর একবার পশিয়া অন্তরে গিয়াই আশ্রয় লয়, অন্য কান দিয়া বাহির হইয়া যায় না। গানের মোহ আছে। অল্প সিদ্ধি খাইলে সারা শরীরে অবসাদ, স্ফূর্ত্তি অথচ রক্ত-কণিকায় স্নিগ্ধ ঘুমের আমেজ যেমন ঘনাইয়া আসে, তেমনি!

এক, দুই, তিন। না পড়ে মেয়েদের চোখের পলক, না উঠে প্রশংসার গুঞ্জন-ধ্বনি। এত সুন্দর গান—যে, প্রশংসার কলগুঞ্জন তুলিয়া মনের মধ্যে স্থায়ী সুরকে নষ্ট করিতে কেহ রাজি নহে।

অবশেষে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেই তরুণ গান থামাইল।

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতার মধ্যেই কাটিয়া গেল।

ছায়া অতি সন্তর্পণে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করিল, সুন্দর।

লিলি বলিল, শুধু সুন্দর বললে কিছুই বলা হয় না—ও-কথা কে বলেন, ছোড়দা?

তরুণ মিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল, যেই বলুক—তোরা ত নয়।

লিলি গ্রীবা হেলাইয়া ভ্রূ নাচাইয়া কহিল, ইস্! আমরা না থাকলে তোমার অতবড় সমজদার জুটতো কিনা!

তরুণের পাতলা ঠোঁটের হাসিটি ভারি মিষ্ট। দাঁতগুলি যেন সাজানো মুক্তা। চোখের দু'ধার কুঁচকাইয়া এমন একটি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে যে, সমগ্র মুখখানিই হাসিবার কালে অপরূপ হইয়া উঠে। তরুণ হয়ত দর্পণে নিজের মনসিজ-মোহন সুন্দর মুখ বিশেষ করিয়াই লক্ষ্য করিয়াছে, নতুবা হাসি ছাড়া তার মুখ কল্পনা করা যায় না কেন? অন্তত চম্পা তাই বলে। তরুণের গানকে সুন্দর বলিলে সে চটিয়া যায়। বলে, তুলনা দিয়ে এমন অনুভূতিকে নষ্ট করা চরম অসভ্যতা। ফুল সুন্দর, আকাশ সুন্দর—এক জিনিষ, ভাষা সুন্দর—অন্য জিনিষ, আর সুর সুন্দর—সে-ওত সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সুতরাং বাঁধাধরা ফরমুলা কষে সুন্দরকে অমন কুৎসিত করতে লোকে কেন যে ভালবাসে!

লিলি যদি পরিহাস করিয়া বলে,—চম্পা আমার ছোড়দার গলা না হয় ছেড়ে দিলুম, ওর চেহারা কোন্ সুন্দরের পর্য্যায়ে পড়ে?

চম্পা উত্তর দেয়, চেহারা শুধু বাইরে মিলিয়ে যদি হতো ত এর উত্তর খুব সোজা। কথা, ব্যবহার, শিষ্টতা,-এ-সব চেহারার এক একটা অঙ্গ।

শুধু পলাশ বলতে যে ফুলটি আমরা পাই তা রূপ থাকতেও কুরূপ আর গোলাপের মধ্যে সৌন্দর্য্য অফুরন্ত। কেন জানিস? ওর গন্ধটাই রূপকে চিরস্থায়িত্ব দিয়েচে বলে।

লিলি হাসে, কবিত্বের কিছু বাড়াবাড়ি হলো চম্পা!

চম্পাও হাসিয়া বলে, তোমার কানের দোষও ত হতে পারে। ঠাট্টাই কর আর যাই কর, তোমার ছোড়দার গানকে আর কিছুর সঙ্গে তুলনা করতে আমার ভারি কষ্ট হয়।

লিলিও বলে, ছোড়দা বলেন, কাউকে কষ্ট দেওয়া মহাপাপ। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করলে নাকি—

চম্পা তাহার গালে ঠোনা মারিয়া বলে, তোমার নরক বাস। তারপর দুইজনেই হাসিতে থাকে।

আজ চম্পা এখানে ছিল না বলিয়াই লিলি কথাটাকে বন্ধু মহলে প্রচার করিয়া দিল।

তরুণ মৃদু হাসিয়া ছায়ার পানে চাহিয়া কহিল, অনেকে বলেন—গানে নাকি আমি effeminete!

ছায়া উত্তর দিল, তাঁরা হয়ত ও-কথার মানেই বোঝেন না—কিংবা সুর সম্বন্ধে তাঁদের idea নেই।

লিলি আনন্দে করতালি দিয়া উঠিল, মস্ত বড় compliment ছোড়দা। চম্পার ওপরেও এক ডিগ্রি।

সূর্য্য বহুক্ষণ অস্ত গিয়াছিল, তথাপি তপন স্পষ্ট দেখিতে পাইল, এই তরল অন্ধকারের মধ্যে ছায়ার মুখে সেই অন্তর্হিত শেষ রক্ত-রশ্মি।

তরুণ কৌশলী বটে! কণ্ঠস্বরে, গানে, ভঙ্গিতে, কথায় বা পরিহাসে flirt করিবার সাধনায় যেন সে সিদ্ধ। হাঁ, effemenate ত বটেই। ওই হাসিটুকু—পাতলা ঠোঁটের মিষ্ট হাসি, গ্রীবাভঙ্গি, কোঁকড়া চুল, মাঝে মাঝে আঙুল দিয়া সে-চুল পিছনদিকে ঠেলিয়া দেওয়া—কোন্‌টা নয়? অঙ্গ সঞ্চালনে বা বাক্যপ্রয়োগে এমন সহজ সরল মধুর ভঙ্গিটুকু—বিশেষ দৃষ্টিতে কৃত্রিমতা ছাড়া আর কি বলা যায়?

তপন ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তরুণের পানে চাহিয়া উঠিল।

ছায়ার মুগ্ধভাব তখনও হয়ত কাটে নাই, সে এ দিকে লক্ষ্যই করিল না।

রেবা বলিল, তপনবাবু উঠলেন যে? বসুন আর একটু, চাঁদ উঠলে জ্যোৎস্নাটা উপভোগ করে যাওয়া যাবে।

তপন সেজন্য বিশেষ উৎসুক ছিল না। ছায়ার পানে চাহিয়া কহিল, চাঁদ না উঠলেও এই পাতলা অন্ধকারকে বেশ উপভোগ করা যায়।

রেবা তপনের দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া কহিল, কি জানেন তপনবাবু, আত্মপ্রশংসা শুনতে সবাই ভালবাসে। বিশেষত—

লিলি টপ করিয়া বলিল, বিশেষত আমি। চম্পা বলে, পরের মুখে, বিশেষ করে পুরুষদের মুখে যদি সে প্রশংসার ধ্বনি উচ্চারিত হয় ত কোথায় লাগে স্বর্গসুখ! কথা শেষে সে সশব্দে হাসিয়া উঠিতেই ছায়ার আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া গেল। সে-ও টপ করিয়া উঠিয়া কহিল, চল, যাওয়া যাক।

লিলি কহিল, বাঃ, বেশ ত! নিজেই কি বলে এখানে আসা হয়েছিল মনে নেই বুঝি? চাঁদ না দেখে আমরা উঠবো না। এরই মধ্যে ভুলে গেলে সে-কথা!

তপন ছায়ার পানে চাহিয়া কহিল, ভোলাবার কারণ যখন বর্ত্তমান, তখন ভুলে যাওয়াটা বিশেষ অপরাধের কি?

ছায়া তপনের শান্ত স্বরের অন্তরালে উত্তাপ-টুকু অনুভব করিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল, মানে?

তপন মুখে হাসি টানিয়া কহিল, মানে—এই মাত্র যে সুর বর্ষণ হয়ে গেল, তার ওপর চাঁদ বেচারা বেশী জ্যোৎস্না কি আর ঢালবেন তা ভাবতেই পারি না! সুতরাং, জ্যোৎস্নাকে ভুলে সুরের ঘোরে যদি বাগান ছাড়া যায়—

ছায়া বলিল, বেশ একটা কিছু নিয়ে গেলুম বলে মনে হবে। একটা মহার্ঘ্য রত্ন—অমূল্য কিছু, নয়?

ছায়াও কি পরিহাসে পটুতা লাভ করিয়াছে? অথচ, উষ্ণতাহীন মৃদু কোমল কণ্ঠের মধ্য দিয়াই ঐ ক'টি কথা বাহির হইয়া আসিল!

পাশে কেহ ছিল না। তরুণ, লিলি প্রভৃতি পায়ে পায়ে গঙ্গার ওধারে চলিয়াছে, অস্পষ্ট অন্ধকারে তাদের উচ্চ আলাপধ্বনি শোনা যাইতেছে।

তপন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছায়ার পানে চাহিল।

বহুক্ষণ কেহ কোন কথা কহিল না। হয়ত কথা কহিবার কিছুই ছিল না। সময়ে সময়ে এমন কতকগুলি মুহূর্ত্ত আসে, ধ্বনি না দিয়াও

সে-গুলির অর্থ বোধে একটুও বিলম্ব হয় না। এই ক্ষণটি মুহূর্ত্তের অন্যতম।

মনে মনে দুইজনেই অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে লাগিল। দোষ না করিয়াও কোথায় যেন তার তীব্রতা পীড়া দিতেছে, কোথায় যেন কৈফিয়ৎ না দেওয়ার অসৌজন্য মনের স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করিতেছে। ছায়া হাঁপাইয়া উঠিল। মনের দুর্ব্বলতা দমন করিতে স্বর একটু চড়াইয়া বলিল, আর কিছু বলবার আছে আপনার?

তপন সে' কথায় আহত হইয়া উত্তর দিল, ছিল, কিন্তু এখন নেই।

ছায়া বলিল, না থাকাই সম্ভব।

তপন উত্তর না দিয়া ক্রোটনের কয়েকটি পাতাই চঞ্চল হস্তে ছিঁড়িয়া ফেলিল।

ছায়া পুনরায় কহিল, অথচ কি বিশ্রী ব্যাপার! এমন সুন্দর সন্ধ্যাটা চাঁদ উঠলে কোথায় উপভোগ করা যাবে—

তপন বলিল, সন্ধ্যাকে মাটি করতে প্রথমেই ভুল করেচ তুমি—তোমাদের আনন্দের মধ্যে অনাহুতকে ডেকে এনে—

ছায়া বলিল, অন্যায় করেচি?

তপন বলিল, হয়ত তোমার পক্ষে ভদ্রতার লেশমাত্র ত্রুটি হয় নি এবং আমার দিক থেকে সৌজন্যের। তবু একথা স্বীকার না করে পারি না ছায়া, দৈবক্রমে আহ্বানটা না করলেই করতে ভাল।

ছায়া কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া তপন বলিল, সময় সংক্ষেপ, ওই ওঁরা ফিরে আসচেন, কথাটা বলে নিই। আমরা পরস্পরকে জানি। দুদিন বাদে দু'জনের যে কোথায় আশ্রয় মিলবে—

ছায়া বাধা দিয়া বলিল, কি আশ্চর্য্য, ভবিষ্যতে কবে কি হবে তাঁর চিন্তায় এখন থেকে মন যদি হাঁপিয়ে ওঠে ত মানুষের বেঁচে থাকা যে মস্ত বড় বালাই।

তপন পরিহাস-তরল কণ্ঠে বলিল, ভবিষ্যৎই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে না?

ছায়া বলিল, কেন রাখবে? ভবিষ্যৎ ভাবতে গেলে যে-সময়টুকু আমার হাতে—তা নষ্ট হয়ে যায়। আমি এ-টুকুও নষ্ট হতে দেব কেন?

তপন সহসা গম্ভীর হইয়া কহিল, বেশ, ভাল কথা। তবে আমি বলছিলুম কি, মানুষ ত প্রজাপতি নয় যে, দু'দণ্ডের জন্যই তার খেলা, সৌন্দর্য্য, আনন্দ যা-কিছু।

ছায়া বলিল, খাঁচার পাখীও নয় যে বেঁধে রেখে কাকলি শুনবেন।

সহসা একটা তীক্ষ্ণ তীর বুকে আসিয়া লাগিলে যেমন অতি বেদনায় মুখ হইতে শব্দমাত্র বাহির হয় না—তেমনই তপন কোন উত্তর দিতে পারিল না। ক্রোটনের বড় ডালটাই ভাঙ্গিয়া বার দুই এ-ধার ও-ধার ঘুরাইয়া পায়ের তলায় ফেলিয়া দিল ও ছায়ার পানে না চাহিয়াই চলিতে আরম্ভ করিল।

ছায়া বলিল, রাগ করলেন?

তপন চলিতে চলিতে মুখ না ফিরাইয়াই কহিল, রাগ, দুঃখ, কিছু নয়। বরং আনন্দ। পরে মুখ ফিরাইয়া হাসি টানিয়া কহিল, মুক্তির আনন্দ—সত্যকার আনন্দ। তুমি ভবিষ্যতের চিন্তা থেকে আমায় মুক্তি দিলে এ জন্য তোমায় সহস্র ধন্যবাদ।

* * *

বাগান হইতে বাহির হইয়াই তপনের মনটা হাল্কা হইয়া গেল। সে ঠিক করিল—এখন বাড়ী যাওয়া হইবে না। বাগানের ধারে ছোট ঘরখানিতে গিয়া বসিলে এ মুক্তির উল্লাস মরিতে দণ্ড দুইও বিলম্ব হইবে না। বইয়ের রাশি সম্মুখে রাখিয়া অর্গ্যানটার দিকে পিছন ফিরিলেও মন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাগানের মধ্যেই ছুটিয়া যাইবে। ভবিষ্যৎ না আসুক, অতীত আসিতে পারে।

তার চেয়ে সুবোধের মেসে যাওয়া যাক্। হাঁ, সেখানে যাওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। আজ সুবোধকে জানাইবার ভাষা তার কণ্ঠে আসিয়াছে। দুর্ব্বলতা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, মনের মধ্যে দুর্গম দুর্গই গড়িয়া উঠিয়াছে। বাঃ, চমৎকার উত্তর সে ছায়ার মুখের উপর দিয়াছে! মুক্তি! মুক্তি!

চলিতে চলিতে সে সশব্দে হাসিয়া উঠিল। পথের দুইধারের লোকগুলা একবার চাহিয়া দেখিল, তপন সে-দৃষ্টিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না—ট্রামে গিয়া উঠিল।

মেজ বৌদির আগ্রহেই অমন একটা আশা মনে জাগিয়া ছিল বটে! যাক, ভালই হইল। সে-আলো ছায়াই ফুৎকারে নিবাইয়া দিয়াছে, তপনের দায়িত্ব ইহাতে কিছু নাই। হয়ত মেজ বৌদির মন এই আশাভঙ্গে মুহ্যমান হইয়া পড়িবে; কার মনই বা না পড়ে! এত অল্প বয়সে ঐ ছায়া-আলো-ভরা আশাকে স্থান দিয়া তপনের মনই কি ক্ষণে ক্ষণে দুলিয়া উঠে নাই! কিন্তু আশ্চর্য্য! যেমন অপ্রত্যাশিত আঘাতের সঙ্গে মুক্তি আসিল, প্রথমটা বেদনা—পরে উল্লাস। সে বেদনার তীক্ষ্ণতা বড়

কম নহে; উত্তেজনা দমন করিতে অত বড় ড লটাই ভাঙিয়া ছিল। আঃ—। এখন কোথায় সে বেদনা! তার পরিবর্ত্তে তেমনই অত্যুগ্র উল্লাস। এ উল্লাস একা সহ্য করা কষ্টকর। সুতরাং, সুবোধকে তার চাই।

গ্যাসের আলোর নীচে জ্যোৎস্নার নামগন্ধও ছিল না। তপন গুণ গুণ করিয়া গান ধরিল।

গান উচ্চ গ্রামে উঠিবার আগেই ট্রাম থামিয়া গেল। যাত্রী-অবতরণেব শব্দে তপনকেও গান থামাইয়া নামিতে হইল। ট্রানস্‌ফাব টিকেট পাওয়া সত্ত্বেও পোল পার হইয়া হাঁটিতে তার ইচ্ছা হইল না। একটু শীঘ্র যাওয়া চাই, বাসে উঠাই ভাল।

সুবোধের মেসের প্রবেশ-পথটি সঙ্কীর্ণ, সরু গলি, ইঁট দিয়া বাঁধানো—গাড়ী চলে না। উপরে চাহিলে নীল আকাশের ফালি অতি অস্পষ্টই চোখে পড়ে। সেটুকু কখনও অন্ধকারে নক্ষত্র-খচিত, কখনও বা জ্যোৎস্নায় ফিকে। সারারাত গলির উপর দাঁড়াইয়া উর্দ্ধে দৃষ্টিকে সজাগ রাখিলে তবে যদি চাঁদকে দেখা যায়। কিন্তু যাহারা সে-গলিতে বাস করে, তাহারা চন্দ্র-সূর্য্যের ধাব বড় একটা ধারে না। উপরের ঘরে খোলা জানালা-পথে যদি বা চাঁদ—জ্যোৎস্না-হাসি বিতরণ করেন, চক্ষু মুদিয়া মানুষ পরম অবহেলাতেই তাহা উড়াইয়া দেয়। কর্ম্মক্লান্ত নীরস জীবনের মধ্যে এমন একটা আর্দ্র পরিবেশ সর্ব্ব সময়েই যেন অসহ্য বা অদ্ভুত। শহরের ধূম্রমলিন আকাশের সঙ্গে মানুষ যে অতি মাত্রায় বাস্তববাদী হইয়া উঠিতেছে; এই গলির মধ্যে নির্ব্বাসিতা প্রকৃতিকে দেখিয়া এ জ্ঞান অনায়াসে জন্মে।

সুবোধেব মেসের দোর-গোড়ায় গ্যাসের আলো পড়ে নাই, এই ফালি আকাশের ফাঁক দিয়া জ্যোৎস্নাই আসিয়া পড়িয়াছে। এতক্ষণে তবে চাঁদ উঠিয়াছে। ময়লা আলো অন্ধকার গলিটাব স্থানে স্থানে বিগত ক্ষতচিহ্নের মত। ক্ষত অল্প-দিনের, তাই সাদা দাগ কালো হইয়া উঠে নাই। যাই হোক, গঙ্গার ধারে গ্যাস বিদ্যুতের আওতা ছাড়াইয়া এই আলোককে হয়ত সুন্দর বলা চলে, উপভোগ করাও যায়। খানিক ছুটাছুটি, খানিক কলহ-কোলাহল, খানিক বা শুইয়া শুইয়া উপর পানে চাহিয়া থাকা বেশ লাগে। বুড়া বটগাছের ফাঁকে ফাঁকে আলোর ফুলকি। আলো-অন্ধকারে লুকোচুরি খেলা। সারা বাগানটার পলাশ্রিত অন্ধকার ঐ বড় গাছটার তলায় আসিয়া জড়ো হইয়াছে। হাওয়ায় গাছের পাতা দুলিল ত অন্ধকারের কি সে কাঁপুনি!

দূর ছাই! এঁদো গলিতে দাঁড়াইয়া একটুকরা মরা-জ্যোৎস্না দেখিয়া তার মন একেবারে পাখা মেলিল যে!

দ্বার ঠেলিয়া সে মেসের মধ্যে প্রবেশ করিল।

সুবোধ ছাদে পায়চারি করিতেছিল। তপনকে দেখিয়া ছাদের অন্য কোণ হইতে পায়াভাঙ্গা বেঞ্চখানা টানিয়া আনিয়া কহিল, বোস।

তপন বলিল, বসলেই ত ভূমিলাভ।

সুবোধ বলিল, না, ও ধারটায় ভাঙ্গা দেওয়াল আছে, পডবিনে। এই দেখ। বলিয়া নিজে বসিল।

তপন বলিল, ঘরেই চলনা কেন?

সুবোধ হাসিয়া বলিল, দিব্যি জ্যোৎস্না। এ সময়ে আলো জ্বালিয়ে ঘরের মধ্যে বসতে ইচ্ছে করে?

তপন বলিল, তোমাকেও দেখছি কাব্যিতে পেয়েচে!

সুবোধ বলিল, কাব্যের বয়স এখনই কি পেরিয়েচে রে? যদিও ওব মাঝখানে মস্ত একটা ছেদ টেনেছি। কথা শেষ করিয়া সুবোধ আকাশের পানে চাহিল।

তপন উৎসুক হইয়া কহিল, সেই দুর্গম দুর্গের ইতিহাসটা বলবে, সুবোধ-দা?

সুবোধ বলিল, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ভাল নয়, ওতে মনটাকে ভারি কোমল করে। তার চেয়ে মাস্‌ল্ ডানসিং যদি দেখতে চাস—

তপন আর্ত্তের ভাণ করিয়া কহিল, রক্ষে কর তোমার মাস্‌ল্ ডানসিং—তার চেয়ে চাঁদের আলো সইতে রাজি আছি।

সুবোধ তপনের মুখের পানে নিবদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া সকৌতুকে কহিল, ব্যাপারটা বড় সুবিধের বোধ হচ্ছে না। শেষ বয়সে শ্লেষ্মা বৃদ্ধির ভয়ে যাঁরা চাঁদকে আমল দেন না, তুমি নিশ্চয়ই সে-দলের নও!

তপন বলিল, চাঁদ শুধুই শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করে না, সুবোধ-দা।

সুবোধ বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিল, তা বটে! প্রকৃতির ওপর ওর আলোটা চিরদিনই সক্রিয়। সমুদ্রে জল বাড়ে, নামে জোয়ার। মনেতে—

তপন কহিল, তোমার সায়ান্স রাখ। ঠাট্টা নয়, বলনা তোমার ইতিহাস?—

সুবোধ বলিল, ইতিহাস? মানে অতীত? অতীতের আলোচনায় মনের দৌর্ব্বল্যকে টেনে এনে দেখতে যারা ভালবাসে—আমি তাদের দলে নই, তপন। যা অতীত, তা সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়েই যাক। তার মূল্য যাচাই করতে মাঝে মাঝে দু-একটা দীর্ঘনিশ্বাস বা চোখের কোণে কয়েক ফোঁটা জল টেনে আনা আমার দ্বারা হবে না।

তপন বলিল, হয়ত তোমার উপকার না হতে পারে, কিন্তু যারা নতুন, তাদের শিক্ষার কিছু নেই এতে?

সুবোধ হাসিয়া বলিল, না, কিছু নেই। মনের মানদণ্ডে স্থিতিশীলতার গন্ধও তুমি খুঁজে পাবে না কোনদিন। যেমন ধরনা—মৃত্যু। চোখের উপর অহরহ ঘটচে, তবু অন্যায়, অত্যাচার, পাপ প্রভৃতি বিষয়ে মানুষকে কখনও সচেতন করে তুলতে পারলে না। যেমন প্রেম। অনন্তকালের বিরহ বয়ে আজও যমুনার জলে শ্রীরাধার বিলাপধ্বনি মর্ম্মরিত। কত ট্রাজেডি, কত না রাজ্য, প্রাণ, সম্মান, খ্যাতির পতন ঘটলো, তবু সাবধান হবার আগ্রহ মানুষের এলো না। অতীতের লেখা পাঠ করে কি হিসাবী মানুষ সাবধান হতে পারত না, তপন? পারত। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধির আলোর নীচের ওইটুকুই তার ছায়া, ওইটুকুই তার ফাঁক।

তপন বলিল, তা হোক। অতিবুদ্ধির চুলচেরা বিচারের মাঝে অসাবধান মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতাটুকু ভারি চমৎকার করে রেখেচে জীবনকে। এত বড় ফিলজফি যিনি সৃষ্টি করেচেন—

সুবোধ বলিল, তাঁকে কৃতজ্ঞতা পরে জানালেও কোন ক্ষতি হবে না! আপাতত তোমার বার্ত্তা কি? দেহের নয়, মনের!

তপন বলিল, দাঁড়াও, তোমার অতগুলো কথার উত্তর না দিলে মনে করবে বুদ্ধি আমার একদম ভোঁতা। আমি তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাইনে, যে-হেতু আমার বিশ্বাস তিনি বলে কোন পদার্থ এই বিশ্বমাঝে নেই।

সুবোধ বলিল, তবে ত তর্কেরও পরিসমাপ্তি।

তপন সে কথায় কান না দিয়া বলিতে লাগিল, শাস্ত্র আছে, যুক্তি আছে এবং যাঁদের আছে প্রচুর অবসর—তাঁরা তাঁর সম্বন্ধে গবেষণা করুন। আমার জীবনের দুর্ব্বলতা যদি আমি বুঝতে পারি সুবোধ-দা—ত বুদ্ধির সতর্কতায় কেন তাকে শুধরে নেব না?

সুবোধ বলিল, জীবনের এমন অনেক ক্ষণ কি আসে না—যখন ইচ্ছে করেও ভুল করতে ভাল লাগে?

তপন বলিল, হয়ত আসে, কিন্তু ভুলকে তখন ভুল বলে মোটেই মনে হয় না।

সুবোধ বলিল, ঐ ত মজা। ইতিহাস বারবার পাঠ করলেও নিম্নগতির স্রোত সব সময়ে রোধ করা সম্ভব নয়। যে ভালবাসে—দুঃখ জেনেই ভালবাসে।

তপন বলিল, না সুবোধ-দা, ভালবাসে নিজেকে সুখী মনে করে। হয়ত দুঃখ তার গৌণফল, তবু তার মধ্যে সে সুখের সান্ত্বনাই খুঁজে পায়।

সুবোধ বলিল, তবেই বোঝ—অন্ধত্ব তার ঘোচে না। মন যা চায় সে তা না করে পারে না, তা সে দুঃখই বল—আর সুখই বল।

তপন সুবোধের পানে ম্লানদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, তাই ত জ্যোৎস্না ভাল লাগচে না সুবোধ-দা। চল, ঘরে গিয়ে বসি।

সুবোধ মৃদু হাসিয়া বলিল, অন্তরে যদি জ্যোৎস্না ওঠে—বাইরের অমাবস্যায় কি যায় আসে! তোমার বিয়ের চিন্তাটাই বুঝি প্রবল হয়ে উঠেচে?

তপন একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ঠিক প্রবল নয়—অথচ কি জান, কিছুতেই ওটা ভুলতে পারচিনে। এমন আশ্চর্য্য এই পৃথিবী, যাকে একবার কামনার মধ্যে চকিতের জন্যও পায়, তাকেই মনে মিশিয়ে নেয়। যত বাধা বিপত্তি আসে, ততই কামনার বেগ বাড়তে থাকে।

সুবোধ হাসিয়া বলিল, ওটা মানুষের instinct. দেখনা, চোরকে সবাই মিলে ভর্ৎসনা প্রহারে নীতিশিক্ষা দিতে ক্রটি করে না, অথচ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মন অনুসন্ধান করলে বুঝবে—নীতিবিদদের মনেও চুরির জন্য ছোট্ট একটু কামনা দিনরাত মিটিমিটি জ্বলচে। যা আমরা নীতি-ধর্ম্মের ভয়ে পালন করতে পারি না, সেই নিষ্ফল কামনা অন্যের মধ্যে সাফল্য-লাভ করলেই ক্রোধে আমরা আত্মহারা হই। বাধা পেলে বৃত্তি ত প্রবল হবেই। তা না-হলে পৃথিবী-জোড়া এমন সুচারু সভ্যতার উদয় হয়ত কোন দিন ঘটতো না।

তপন বলিল, তুমি যে বলেছিলে মনের মধ্যে

রচনা কর—এক দুর্গম দুর্গ! সুবোধ-দা, এযে মানুষের মন। বাইরের গোলাগুলী ঠেকাতে ইঁট, পাথর, বালি, লোহা অতি প্রয়োজনীয়, কিন্তু এখানে ছোট একটি ফুল বা এক টুকরো জ্যোৎস্না অনায়াসে সে দুর্গকে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে পারে।

সুবোধ বলিল, তা ত পারেই। তাই ত অনুশাসন দরকার। কিন্তু আপাতত কি এমন হলো যে—

বলচি। কিন্তু দোহাই তোমার হেসো না। অন্যের কাছে ছেলেখেলা হলেও এ আমার জীবন-মরণের ব্যাপার।

অগত্যা সুবোধ চুপ করিল।

তপন একে একে সমস্তই বলিয়া গেল। বটানিকাল গার্ডেনের পিক্‌নিক হইতে আরম্ভ করিয়া তরুণের মেয়েলী গান—সম্মোহনের জাল বিস্তার—(এটা অবশ্য তপনের অনুমান) ছায়ার দুটি গণ্ডে অস্ত-সূর্য্যের রক্তাভা এবং সর্ব্বশেষ ছায়ার সেই মন্তব্য,—মানুষ ত খাঁচার পাখী নয় যে, বেঁধে রেখে কাকলি শুনবেন?

সুবোধ মন্তব্য করিল, my dear friend, don't talk rot।

তপন বলিল, বাজে! তুমি যদি এমন অবস্থায় পড়তে—

গম্ভীরভাবেই সুবোধ উত্তর দিল, তা হলে মেয়েলী অভিমান নিয়ে সেখান থেকে চলে আসতাম না নিশ্চয়। অতটা সেন্টিমেণ্ট্যাল হওয়া—

তপন অল্প উত্তেজিত হইয়া কহিল, তারা আমায় চায় না, অথচ নির্লজ্জের মত আমায় সেখানে থাকতে হবে! এত বড় আত্মসম্মান-হানিকর কাজ—

সুবোধ বলিল, পৃথিবীতে নেই। কিন্তু কাপুরুষের মত স্বত্বত্যাগ করে আসা তার চেয়েও মুখ্যুমি।

তপন উত্তরোত্তর অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল। বেঞ্চের উপর একটা চড় মারিয়া কহিল, তুমি হলে—

হাসিয়া সুবোধ বলিল, শেষ পর্য্যন্ত থাকতাম। ছায়াদেবীকে তাঁর বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দেবার ভারও হয়ত নিতাম। তিনি যখন ডেকে আমায় আনন্দের ভাগ দিলেন—তখন তাঁকে বিমুখ হবার সুযোগ দেওয়া—অন্তত আমার ভদ্রতায় বাধা উচিত।

তপন বলিল, এখনও কি শিভলরির যুগ আছে সুবোধ-দা? এ বীরত্ব তিনি হয়ত অন্যভাবে নিতে পারতেন।

সুবোধ বলিল, অর্থাৎ সাইকোলজির চর্চ্চাই তুমি পুরোদস্তুরই করেচ দেখ্‌চি। তিনি কি করতেন না করতেন তার চুলচেরা বিচার যদি করতে পারলে—তো তোমার কি করা উচিত ছিল তা কেন একবারও ভাবনি!

তপন কোন কথা না কহিয়া সুবোধের পানে হতবুদ্ধির মত চাহিয়া রহিল।

সুবোধ আশ্বাস দিয়া কহিল, ভাববার এতে কিছু নেই। যদি সত্যই তাঁকে ভালবেসে থাক—

তপন মাথা নাড়িয়া বলিল, ভালবাসার দুর্ব্বলতা বা অবসর আমার নেই।

সুবোধ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া বলিল, তবে?

তপন বলিল, তাই বলে আমার কামনার হন্তারক যে অন্যে এসে হবে, এ-ও সহ্য করতে পারবো না সুবোধ-দা। যে ব্যাপার বছর কয়েক পরে ঘটবে, সে ব্যাপারের মধ্যে—অন্যের ছায়া দেখতে আমার এতটুকু আগ্রহ নেই।

সুবোধ বলিল, একটু আগে বলছিলে এ খেলা নয়, তোমার জীবন-মরণের কথা। আমি দেখছি—খেলা ছাড়া এর মধ্যে একবিন্দুও সত্য নেই।

রূঢ় কণ্ঠের আভাসে তপন চমকিত হইয়া উঠিল।

সুবোধ বলিতে লাগিল, এ কি জান? ফুটবল খেলায় নেমে এক ঘণ্টার জন্য যেমন জীবনপণ করতে হয়, তেমনি। যাই খেলা শেষ হলো, সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনারও অবসান। তখন খোঁড়া পা নিয়ে কত না ব্যস্ততা! জীবনের সব ক্ষেত্রেই এত অল্পসময়ে হারজিতের মীমাংসা কখনও হয় না।

তপন অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলিল, ও-সব monitory ছাড়।

সুবোধ দাঁড়াইল। বারকয়েক ছাদে পায়চারি করিয়া তপনের সম্মুখে আসিয়া বলিল, স্কুলে যেমন মাষ্টারের দরকার, তোমাদের মত তরলমতি ছেলেদের তেমনি monitor. রাগ করো না, তিন বছর পরের সম্বন্ধকে এখন থেকে যদি সত্যি ভাবতে পার ত ভালবাসাকে লজ্জাকর মনে করচো কেন? মনে কর না কেন—ও আমার গৌরব এবং ওই গৌরবের জয়মাল্য একদিন আমারই কণ্ঠকে গৌরবান্বিত করবে।

তপন হাসিয়া কহিল, তুমি উত্তেজিত হয়েছ সুবোধ-দা।

সুবোধ পেশীস্ফীত বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া কহিল, হয়ত হয়েছি। মন যা স্বীকার করে, মুখে তা প্রকাশ করা লজ্জার, এই মনোভাবকে আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না। একটা বাহ্যিক ভাণ, মানুষকে নীচেয় নামাতে ওর অসাধারণ ক্ষমতা। যদি ভালবাসবে, সে-কথা স্পষ্টই স্বীকার করবে। লোকের মতামতের ওপর তোমার মনকে দাঁড় করিয়ে যদি চল ত—ছদ্মবংশের লজ্জা ও গ্লানি আজীবন তোমায় বইতে হবে জেনো।

সুবোধ আর সেখানে দাঁড়াইল না।

তপন কি ভাবিয়া একবার উপর পানে চাহিল। তীব্রগতিতে নীল আস্তরণ ভেদ করিয়া চাঁদ ছুটিয়া চলিয়াছে। আশেপাশে সঞ্চরণশীল মেঘের সঙ্গে তার প্রতিযোগিতা। কৌশলী চাঁদ দক্ষ রথীর মত কখনও বা পাশ কাটাইয়া, কখনও বা মেঘব্যূহ ভেদ করিয়া তৎপর করিয়া চলিয়াছে। যদি বা মালিন্য জমিতেছে মুহূর্ত্তের তরে, গতি নিমিষের তরেও ব্যাহত হইতেছে না।

উপর হইতে চক্ষু ফিরাইয়া সে ছাদের পানে চাহিল। ওধারে প্রকাণ্ড মারবেলটা পড়িয়া আছে। ছেঁড় কাগজ, ভাঙা বেতের চেয়ার, সাইকেলের চাকা একখানা কতকগুলি তক্তার সঙ্গে এককোণে জড়ো করা।…

তাল কথা, কি সে বলিতে আসিয়াছিল—সুবোধকে? মুক্তির কথা।. তার মোহের অবসান হইয়াছে, এই কথা না? কিন্তু এতক্ষণ ধরিয়া কি সব শোনাইল? তার না আছে অর্থ, না আছে যুক্তি। ওই ছেঁড়া কাগজ, ভাঙ্গা চেয়ার, তোবড়ানো চাকা ও অদরকারী কাঠের টুকরার মত তা নিতান্তই বাজে। মুক্তির সংবাদ দিতে গিয়া বন্ধনের বিস্তারকে সে এমনই ভাবে প্রচার করিয়া দিল!

* * *

সেদিন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে ঘুমাইতে পারিল না। কেবল সুবোধের কথা ও বাগানের ব্যাপার মনের মধ্যে পাক খাইতে লাগিল। সুবোধ ঠিকই বলিয়াছে, কাপুরুষের মত স্বত্ব ত্যাগ করিয়া আসা মূর্খতা। ঠিকই ত! কাল সকালেই সে ত্রুটি শুধরাইয়া লইবে। বারকয়েক প্রতিজ্ঞা করিয়া সে চক্ষু মুদিল এবং অচিরেই ঘুমাইয়া পড়িল।

সকালে উঠিয়াই সর্ব্বপ্রথম ভাবিতে লাগিল, কাল রাত্রিতে কোন স্বপ্ন দেখিয়াছি কি না। কৈ, না ত। বেশ গভীর সুনিদ্রাই হইয়াছিল। স্বপ্নে নাকি অনেক সময় ভবিষ্যৎ জীবনের ফলরেখা নির্ণীত হইয়া যায়। নব প্রকাশিত 'স্বপ্ন-রহস্য' প্রবন্ধে দিনকয়েক পূর্ব্বে সে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিয়াছে। অন্তত একটা দুঃস্বপ্ন দেখিলেও পাঁজি উল্টাইয়া ফলচর্চ্চায় খানিকক্ষণ কাটাইয়া দিতে পারিত। কিন্তু আশ্চর্য্য, মনের তুমুল ঝড় যেই মাত্র নিদ্রার রূপারকাঠি স্পর্শে শান্ত হইয়া গেল, অমনই কি সমস্ত অনুভূতি তার মরণের মত স্থির—শীতল।

আলমারির উপর বইয়ের রাশি গোছানো। টানিয়া মনোনিবেশ করিবে নাকি? তাই ভাল, ক্লাশে না যাইলে percentage লইয়া গোলযোগ বাধিতে পাবে।

বই ও খাতা লইয়া বসিল। অঙ্কশাস্ত্র নীরস কাঠের মত মাথার মধ্যে বারবার আঘাত করিতে লাগিল। বিজ্ঞান আরও বাজে। সাহিত্যে রসের তত্ত্ব মিলিলেও এখন মনে হইল, সে রস বড় ফিকা। মনকে মাতাইবার মত গাঢ়ত্ব তার নাই।

খালি পায়ে ঘরের মধ্যে বারকয়েক পায়চারি করিয়া অর্গ্যানটার সামনে গিয়া বসিল। রীডে অঙ্গুলি স্পর্শ হইতেই সেগুলা হইতে এমন বিকট আওয়াজ উঠিল যে, ত্রস্ত তপন ঘর ছাড়িয়া পলাইবার পথ পাইল না। অবশ্য যাইবার সময় চটিটা সে পায়ে দিয়াই গেল।

বাগানে নরম নরম ঘাসের উপর সুকোমল শিশির বিন্দু জমিয়াছে। কঠিন জুতার আঘাতে সে-গুলিকে দলিয়া শ্রীভ্রষ্ট করার মধ্যে কোথাকার ছন্দ যেন ব্যাহত হইল। অন্যদিন আপন মনে নীচের দিকে না চাহিয়াই তপন পায়চারি করে; আজ কোন কিছুই ভাল লাগিতেছে না বলিয়া—ছোট বিষয়ে তার মনোযোগ অসাধারণ। ও-সব চিন্তা বা চর্চ্চায় মন নিজেরই অজ্ঞাতে কোমল হইয়া আসে এবং তুচ্ছ বস্তুও অসামান্য হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। ঘাসের সঙ্গে আরও কি একটা কোমল জিনিষের সাদৃশ্য আপনা হইতেই মনে জাগে। মরসুমী ফুলের হাসিটুকুও কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া অপলকে দেখিলে সময়ের অপব্যয় হইল বলিয়া ত আক্ষেপ হয় না। জুতা খুলিয়া ফেলাই যাক।

আঃ. নরম কচি শিশির-ভেজা ঘাস—বৈঠকখানার পুরু গালিচার চেয়েও আরামপ্রদ। চিত্ত যেন এতক্ষণ এমনই একটা নিঃশব্দ মনোরম তাজাস্পর্শের প্রতীক্ষায় উন্মনা হইয়া ছিল। রাত্রির

আকাশ চন্দ্র-তারার পাশ দিয়া চলিতে চলিতে কখন বুঝি প্রভাতের স্বপ্নে বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল এবং তার সারা দেহের স্বেদজল শিশির হইয়া ধরণীর তৃণলতায় ঝরিয়া পড়িয়াছিল। এখন প্রভাত; রাত্রি মিলাইয়াছে, কিন্তু সুখস্বপ্নের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ তৃণশিরে এই শিশির বিন্দু। প্রকৃতি মানব মনকে মিলাইয়া ছন্দ গাঁথিতে ভালবাসে; বিজ্ঞানের এ একটা বিচিত্র তথ্য বটে। এ বিষয়ে একটা থীসিস্ লিখিলে……কিন্তু এ-সব চিন্তা থাক! পায়ের তলায় অতি সুকোমল শ্যামল স্পর্শ…তপন হাসিল। স্পর্শ শ্যামল? কাব্যের আর বাকি বা রহিল কি! পরমুহূর্তে গম্ভীরভাবে সে ঘাড় নাড়িল! হাঁ, শ্যামলই ত। মাটির রসে তৃণ যেমন শ্যামল অর্থাৎ প্রাণরসে রঙীন, তেমনি তার স্পর্শ। পায়ের তলা দিয়া হৃদয় ভেদ করিয়া একেবারে মাথায় গিয়া পৌঁছায়। না, বিজ্ঞানের তথ্য ভারি সহজ বলিয়াই বোধ হইতেছে। মাথায় পৌঁছিয়া—তারপর ধীরে ধীরে সে শিরায় রক্তকণিকায় ছড়াইয়া পড়ে। তার পর—বোধ—বা চেতন-শক্তির ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে চলাফেরা।

জুতাটা আবার সে পায়ে দিল। স্বপ্ন রাত্রিই ওই অসীম শূন্যের যাত্রী হইয়া দেখিয়াছিল বটে এ ং স্বেদজলে তৃণশিরে সে-মোহ এমন করিয়া মাখাইয়া রাখিয়াছে যে, স্পর্শমাত্র মানব মনও প্রমত্ত হইয়া উঠে। ঈষৎ তন্দ্রাতুর, ঈষৎ আলস্য। শীত-প্রত্যূষে উষ্ণ চায়ের স্পর্শমাত্র ওষ্ঠ যেমন অবসাদ-মিশ্রিত আরাম সংগ্রহ করিয়া সারা দেহকে স্নেহসিক্ত করিয়া তুলে।

বাসে উঠিয়া সেই দূর শ্যামবাজারে যাওয়া উচিত! কয়েক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া সে আপন মনেই হাসিল। ভয় দেখ একবার! কাল রাত্রির মধ্যে ছায়া যেন তরুণেরই ছায়া হইয়া গেল। সে যে-দিকে ফিরিবে তার বিপরীত দিকে পদতল-প্রসারিত দীর্ঘতায় তার অস্তিত্ব। আর এই যে দীর্ঘদিন পরে সম্বন্ধ-বন্ধনের সূত্রটি শক্ত হইয়া উঠিবার অপেক্ষায় দু'টি সংসারকেই রঙীন করিয়া তুলিতেছে—তার কি একবিন্দুও সত্য নহে? কল্পনার দোষ অনেক। কুযুক্তি তার একমাত্র সহায় বলিয়া, যত কিছু যুক্তিবিরুদ্ধ—সেই সবকেই মনে মনে পোষণ করে। আশ্চর্য্য!

* * *

কর্ণওয়ালিস্ স্কোয়ারের পাশ দিয়া বেথুনের বাস বাহির হইয়া গেল। বাসের পিছনে কতকগুলি মেয়ে হাঁটিয়া আসিতেছে। ছায়া নিশ্চয়ই ওই দলে।

বাসে বন্দিনী হইয়া যে সব মেয়ে—প্রতিদিন কলেজে পড়িতে যায়, তাহারা পর্দ্দার পিছনে থাকিয়া,—কিছু বা সম্ভ্রম বাঁচাইয়া শিক্ষার আলোকে ক্রমশঃ মনকে প্রশস্ত করিয়া তুলে। (কেহ কেহ যে দূরত্বনিবন্ধন বাসের আরোহিণী হইতে পারে—এ সম্ভাবনাকে তপন একদম আমলেই আনিল না। কেন, ট্রাম রহিয়াছে কি জন্য? সাধারণ বাস?) উঁহাদের বাড়ীর আচার-অনুষ্ঠান সবেমাত্র হয়ত বন্ধনসীমা অতিক্রম করিতেছে। সমাজকে সন্তর্পণে বাঁচাইয়া উঁহারা প্রগতির দিকটাকে বাছিয়া লইয়াছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে এক উদার সমাজ গঠনের কল্পনাও মনে মনে পোষণ করেন সেই সব শিক্ষিত সনাতনী হিন্দু পিতামাতার সন্তান ইহারা।

ছায়ার শিক্ষা কুণ্ঠা-সঙ্কোচশূন্য হইয়াই আরম্ভ হইয়াছে হয়ত। কর্ণওয়ালিস স্কোয়ার হইতে শ্যামবাজারের দূরত্ব অল্প নহে। বাঙালী মেয়ের ট্রাম বা বাসে উঠা আজকাল একটা দুরূহ ব্যাপার। মিহি শাড়ী ভেদ করিয়া কতজোড়া কামনা-কলুষিত দৃষ্টি যে তীক্ষ্ণ তীরের মত সর্ব্বাঙ্গে আসিয়া বিঁধে, তাহা একান্ত অবহেলায় গ্রাহ্য না করার মত শক্তি কয়টি মেয়েরই বা আছে? ক্রোধ হইলেও মুখ ফুটিবে না, লজ্জা হইলেও চক্ষুকে পল্লবাবৃত করিবে না বা মুখ ফিরাইয়া লইবে না—স্থির অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে হইবে। একা পড়িলে ত রক্ষা নাই। মুখ বুজিয়া যেন ফাঁসীকাঠের আসামী।

ছায়া ট্রামে উঠিল না, বাসের প্রতীক্ষায়ও দাঁড়াইল না—হাঁটিয়াই চলিল। সাহসিকা বটে। স্যাণ্ডেল পায়ে দু'পাশের কৌতূহলাক্রান্ত জনতার মাঝখান দিয়া পথ করিয়া চলা—যে-কোন বিশাল সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হওয়ার সমান। তপন মনে মনে ছায়ার উপর শ্রদ্ধান্বিত হইল। হাঁ মেয়েটির মনে তেজ আছে। অকুণ্ঠ—অদম্য সে তেজ। সূর্য্য-কিরণের মত যাতে পড়ে তাকেই উজ্জ্বল করিয়া তুলে। কর্ণওয়ালিস স্কোয়ার হইতে বাহির হইয়া তপন ছায়ার সন্নিহিত হইতে মোড় পার হইবার জন্য যে একমিনিট অপেক্ষা করিতেছিল, সেই এক মিনিট অকস্মাৎ যেন ঘণ্টার ঘরে আসিয়া ঠেকিল। ট্রামই একখানা সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। ট্রামের ফার্ষ্ট ক্লাসে কোঁকড়া চুলেভরা মাথাটি লইয়া পাশনে চোখে তরুণের মূর্ত্তি। ও-পাশে ফুটের পানে

চাহিয়া তার চক্ষু দুটি অকস্মাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মাথাটি মনোজ্ঞভঙ্গিতে হেলাইয়া স্মিতহাস্যে সে ছায়াকে (ট্রামের আড়ালে পড়িলেও তপন অনুমানের চক্ষুতে দেখিল) অভিবাদন জানাইল এবং হাত নাড়িয়া ট্রামে উঠিবার ইঙ্গিত করিল বোধ হয়। ছায়ার মূর্ত্তি তরুণের পাশে দেখা গেল না। ট্রামটা সেকেণ্ড কয়েক থামিয়া চলিয়া গেল বলিয়াই কি ছায়া উঠিবার অবসর পাইল না? না, ইচ্ছা করিয়াই উঠিল না? তরুণের ঐ সুষ্ঠু অভিবাদন, হাত তুলিয় ইসারা তপনকে যেন চোখ রাঙাইয়া শাসন করিয়া দিল! তরুণ জনসমাজে সুন্দর রুচি ও মার্জ্জিত ব্যবহারের সৌজন্যে অতি সহজেই স্থান সংগ্রহ করিয়া লইবার কৌশল জানে। গলা মিষ্ট, কথার প্রয়োগ-নৈপুণ্যও তার আছে। এই যে অসংখ্য মেয়ে পায়ে হাঁটিয়া বিদ্যায়তনের বাহিরে আসিল ও কৌতুহলী জনতার দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া কলহাস্যে সঙ্গিনীসহ পথ অতিক্রম করিতে লাগিল—একটু আগে তপন উহাদের সাহসিকতায় শ্রদ্ধান্বিত না হইয়া পারে নাই। কিন্তু এখন মনে হইল, কিছু অশোভনতা যেন এই সব সাবলীল স্বচ্ছন্দ গতির কোথাও-না-কোথা লুকাইয়া আছে। পুরুষের লালস-কলুষিত দৃষ্টি তীরের মত আসিয়া যখন রূঢ় আঘাত করে, তখনই মনে জাগিয়া উঠে অসন্তোষ; কিন্তু ভদ্রতার কোমল আবরণে মণ্ডিত হইয়া যে স্নিগ্ধদৃষ্টি চন্দ্র-কিরণের মত সর্ব্বাঙ্গে পুলকসঞ্চার করে, তাহার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন লালসার পঙ্কিলতা নাই—তাহাই বা কে বলিবে? সোজা দৃষ্টিকে অবজ্ঞা বা অন্য উপায়ে ব্যর্থ করা যায়, কিন্তু এই সব সৌজন্যভরা-আচরণের—কলুষ-ত্রুটি ধরিবার মত চক্ষু কয়জনের আছে? অতি লজ্জার মধ্যে জড়তামিশ্রিত সঙ্কোচ যেমন মনকে উত্যক্ত করিয়া তুলে, অতিসাহসিক আচরণেও তেমনই একটা অমার্জ্জনীয় রূঢ়তা।

হ্যাল্লো, মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে কি ভাবচেন?

তপন চমকিত হইয়া সম্মুখে চাহিল। সঙ্গিনীরা কেহ নাই, একাকিনী ছায়া। মনের মধ্যে অকস্মাৎ উল্লাসের একটা কলরব উঠিল। ছায়া সোজা না চলিয়া এ-পারে আসিল কেন? তপনকে দেখিয়া কি?

সে উত্তর দিল, হাঁ, মোড় পার হতে যাব, এমন সময় ট্রামখানা এসে পড়লো। এ-দিকে ফিরলে যে? বলিয়াই একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল। ছায়া হয়ত ভাবিতে পারে—তপন তাহাকে গেট হইতে লক্ষ্য করিয়াছে, নহিলে এমন একটা প্রশ্ন করিয়া বসিবে কেন?

ছায়া সে-সব কিছু না মনে করিয়াই বলিল, ফিরলুম এমনি। সামনেই বাগান, মনে হলো খানিক বসেই যাই।

অকারণ-উল্লাসের কলরব থামিয়া গেল।

ছায়াই কথা বলিল, আসুন বসবেন না?

তপন নিরুৎসাহভাবে উত্তর দিল, অনেকক্ষণ বেরিয়েচি।

ছায়া অনুনয়ের স্বরেই বলিল, তা হোক, খানিক গল্প করা যাক।

তপন ও ছায়া ঘাসের উপর বসিল, আলস্য উপভোগ করিবার জন্য নহে, গল্প করিবার জন্য। যদিও কার্য্যটা আলস্যেরই নামান্তর। কিন্তু কিছুক্ষণ কাটিয়া গেলেও কেহ কোন কথা কহিল না। সঞ্চরমান জনস্রোতের পানে চক্ষু নিমগ্ন হইয়াই রহিল, কখনও বা উর্দ্ধ আকাশ-প্রান্তে। শহর না হইলে তারাগণনার খেলা চলিতে পারিত, নদী থাকিলে নৌকাও হয়ত গণিত। দাঁড়ের জলে সোনা-জ্বলা দেখিবা যে-আনন্দ সে যুগের লোক পাইত—এই শতাব্দীতে সে-আনন্দ আর কেহ পাইবে বলিয়া ভরসা হয় না। (ষ্টীম এঞ্জিনের যুগ, মন্থরগতির তালে তালে অন্তর মন তিক্ত-বিরক্ত হইয়া উঠে) আর বনফুলের মালা? ফেরিওয়ালার নিকট হইতে কোন রকমে লুকাইয়া যদি বা কেনা যায়, গলায় পরিবার বা পরাইবার বর্ব্বরতা কোন তরুণ-তরুণীরই নাই। ও মালা যে শৃঙ্খলের প্রতীক, এ কাটথা এ-যুগের মত স্পষ্ট করিয়া কে কবে বঝিয়াছে?

যাহা হউক, ঘাসের উপর বসিয়া তারা, ফুল বা নৌকার জন্য অধীর না হইলেও কয়েকটি কথার অদম্য স্পৃহা দুইটি তরুণ বুকে খোঁচা মারিতে ছিল।

কথার অভাব ছিল না বলিয়াই হয়ত কথা-কহা ঘটিয়া উঠিল না। স্কুলকলেজের প্রশ্ন বহুবার বহুরকমে হইয়াছে। চোখে না দেখিয়াও বারান্দা-ওয়াল' ছাত্রীনিবাসগুলি তপন স্পষ্ট দেখিতে পায়। সারি সারি ঘর। ঘরে ছোট তক্তাপোষ, ছোট টিপয় বা গোলটেবিল, বইয়ের সেল্‌ফ, কাপড় জামা রাখিবার আলনা, চেয়ার টেবিল ল্যাম্প ইত্যাদি। টেবিলের উপর দোয়াত কলমের বালাই কম, ফাউণ্টেনেই লেখা চলে। ফুলদানির বাসি ফুলে রোজ অল্প জল ঢালিয়া কেহ কেহ চার পাঁচ দিন

সেই সৌন্দর্য্যকে অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা করে। কোন কোন ঘরের কোণে ষ্টোভটা সকাল সন্ধ্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠে ও মজলিস জমিতে বিলম্ব হয় না। দোতলা-বাসের দৌরাত্ম্যে পথের ধারে জানালায় পর্দ্দা বিলম্বিত থাকে বলিয়া তপন ছায়ার মুখে শুনিয়াই (অবশ্য সবটুকু সে শোনে নাই। যেমন ষ্টোভের গর্জ্জন, ফুলদানিতে জল ঢালা ইত্যাদি। ও গুলি তার কল্পনা-প্রসূত।) মোটা-মুটি এই অসম্পূর্ণ ছবিটি আঁকিয়াছে।

চশমা-আঁটা চোখের ভ্রূকুটি, রক্তলেশহীন করের সঞ্চালন, পায়ের স্যাণ্ডেল জুতার শব্দ ও সেমিজের উপর কাপড় পরিবার ধরণটিতে মাষ্টার চিনিয়া লইতে কষ্টবোধ হয় না। বেত হাতে না থাকিলেও সারা মুখখানিতে যে রুক্ষতা ফুটিয়া থাকে, সুকুমার-মতি বালিকাদের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। (ইহাও তপনের কল্পনা। কারণ প্রত্যেক নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। কোন বিশেষ মাষ্টারকে দেখিয়া এই ধারণা পোষণ অজ্ঞতারই নামান্তর নহে কি?)

পাঠ্যপুস্তকের কথা না তোলাই ভাল। একটি ম্যাট্রিক ক্লাসের মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিলে সেও অনায়াসে বি, এ, ক্লাসের পাঠ্য-তালিকা নির্ভুল মুখস্থ বলিয়া যাইতে পারে। খেলার বেলায়ও একথা বলা চলে। মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল, এরিয়ান্স প্রভৃতি ক্লাবের খ্যাত-অখ্যাত সকল খেলোয়াড়ের নাম, চেহারা বা বংশ-পরিচয় সংবাদ-পত্রের মারফৎ সকলেই এমন নিখুঁত জানেন যে, নিজের বংশ, গোত্র, ঘর-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে উত্তর না দিতে পারিয়া অপদস্থ হওয়ার মত দারুণ লজ্জা কোন কালেই ভোগ করিতে হয় না।

বাকি রহিল আবহাওয়া। প্রথম আলাপ জমাইবার এ এক মন্দ কৌশল নহে। কিন্তু পরিচিতকে কথা বলাইবার প্রয়াস—এই তথ্যের মধ্যে বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। শীতের সময় শৈত্যাধিক্য, গ্রীষ্মে তাপ এবং বর্ষার দিনে মেঘলা আকাশ ও অশ্রান্ত ধারাবর্ষণ লইয়া অনেকক্ষণ গল্পগুজব চলিতে পারে। শরতের নির্ম্মেঘ আকাশে —না শীত, না গ্রীষ্ম, না বর্ষার দিনে কি যে আলোচনা চলিতে পারে, তপন ও ছায়া ত ভাবিয়াই পায় না।

কবি হইলেও বা দুই এক ছত্র লিখিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইতে পারিত। কবি নহে বলিয়া সাহিত্যের নামগন্ধও তাহারা করিল না। তবে কি লইয়া কথা বলিবে?

সেদিন বোটানিক্যাল গার্ডেনের কথাটা তুলি তুলি করিয়াও কেহ তুলিল না। এবং পরস্পরের সাক্ষাৎ মুহূর্ত্তে সেই দিনের কথা মনে হওয়াতেই বোধ করি এই নিতান্ত সহজ জিনিষটিকে তারা ধরিয়া ছুঁইয়া পাইল না।

বারকয়েক চোখোচোখি হইতেই চারিটি অক্ষিতারাই শিহরিত হইল, চারিটি গণ্ডেই সঙ্কোচের পাণ্ডুরতা ফুটিল এবং দুইজনেরই মাথা বিপরীত দিকে অল্প একটু হেলিয়া পড়িল।

সঙ্কোচ, শিহরণ ও স্তব্ধতায় হয়ত না বলা কথাটি স্পষ্টতর হইয়া সহজ আলাপের সমস্ত উদ্যমকে ব্যর্থ করিয়া দিল।

অবশেষে গ্যাসের আলো জ্বলিতেই তপন চমকিত হইয়া কহিল, চল ওঠা যাক।

ছায়া লজ্জিতার মত হাসিয়া বলিল, হাঁ, এতক্ষণ ধরে খুব গল্প করলুম যা হোক!

তপন বলিল, দীঘির ধারে বসে গল্প করার চেয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখায়—বেশ একটা তৃপ্তি পাওয়া যায়।

ছায়া বলিল, একা একা হয়ত তাই ভাল লাগে।

তপন বলিল, অথচ কি গল্পই বা আমরা করতুম! পুরানো খবর—খেলা, স্কুল, কলেজ, প্রোফেসারদের কথা, বইয়ের নোট, আবহাওয়া—এইত!

ছায়া অদূরে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, ওরা এত বক্‌বক্ করচে কি করে? এত হাসি, গল্প—

তপন বলিল, মনের মেজাজ যদি ভাল থাকে ত কারণের জন্য আটকায় না। মানুষ অনেক রকম অস্থিরতা দেখিয়েই আনন্দ লাভ করে।

ছায়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, তা হলে মানতে হয় আমাদের মনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

তপন কহিল, তা কেন? আমরা নিঃশব্দে যা উপভোগ করচি—ওরা কলরবে তাই ব্যক্ত করচে। তাতে প্রমাণ হয় না—

ছায়া বাধা দিয়া বলিল, আপনার কথা না হয় বাদ দিলুম। কিন্তু আমার মনের অবস্থা যদি শোচনীয় না-ই হবে ত গল্প করতে ডেকে এনে চুপ করে বসে বসে বিকেলটাকে সন্ধ্যের দিকে ঠেলে দিলুম কেন?

তপন বলিল, গল্প করলেও বিকেল থেকে হতো

সন্ধ্যা এবং তারপর রাত্রি। বাজে বকার দায় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে গেলুম আমরা।

ছায়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, চলুন।

তপন মুগ্ধ চোখে চাহিল তাহার পানে। ছায়ার কৌতুকপ্রিয়তার মধ্যে অসামান্য যে জিনিষটি এই মুহূর্ত্তে তার চোখে পড়িল, সে সারল্য। কৃষ্ণতার আয়ত চক্ষুতে সরল সুন্দর দৃষ্টি (নির্ব্বোধের মত ভাবহীন নহে) সমগ্র মুখখানির শ্রীবিকাশ করিয়াছে। টিকলো নাসিকা হইতে পাতলা ঠোঁট দু'খানি ও চিবুক পর্য্যন্ত প্রসারিত একটি সুবিন্যস্ত সুসমঞ্জস রেখা—যাহা শিল্পীর গঠন-পারিপাট্যেরই শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। পাতলা ঠোঁটের অন্তরালে সাদা মুক্তার সারি দেখিলে—শুধু রমণীয়তা নহে, চরিত্র-মাধুর্য্য ও শিক্ষার গরিমাও উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। আর বাড়ীতে পান দোক্তার চর্ব্বণে এই জিনিষটাকে মেয়েরা এমন অপরিষ্কার করিয়া রাখে যে, আলোর মাঝে বার বার চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে না। কেশ হইতে কাপড় পর্য্যন্ত সুরুচি মাখানো। এমন কি, ঈষৎ আলুগাভাবে পায়ে স্যাণ্ডেলটি বিন্যস্ত করারও রমনীয়তা আছে। অথচ সেইদিন তরুণের গান শুনিয়া এই চোখেই মুগ্ধ···দূর হউক।

ছায়া পিছন ফিরিল। এক সময়ে গজেন্দ্রগমন কাব্যলোকে এবং বাস্তব জগতে সমাদর লাভ করিলেও—আজ মনে হয় ভাববিলাস। এমনই ঋজু, দৃপ্ত, ভঙ্গিহীন রেখাটির মত—আপনার স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করিয়া সুবিন্যস্ত পদক্ষেপ কাহারই বা দেখিতে ভাল না লাগে। কাব্য না লিখিয়াও, ওই অত্যন্ত সরল গতিটিতে এমন ছন্দ একটা মিলে যাহা কবিপ্রতিভার মতই দুর্লভ। ভাববিলাস বর্জ্জিত, অথচ রূঢ় নহে।

* * *

বাড়ী আসিয়া তপন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল। নিজের ঘরখানিতেই আসবাবগুলি এমন করিয়া সাজানো রহিয়াছে—যাহা বিশৃঙ্খলতারই নামান্তর। খাটখানা অবশ্য জানালার ধারে, হাওয়া আলো ওদিক হইতে প্রচুরই আসে—স্বাস্থ্যের পক্ষেও অনুকূল। কিন্তু মশারিটা কি বিশ্রী করিয়া টাঙানো মাঝখানে যেন দশ মণ ভার, এমনই ঝুলিয়া আছে। খাটের পায়াগুলি চকচকে, কিন্তু লতাফুলের মধ্যে একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে ময়লা যথেষ্ট পাওয়া যায়। ছবি যে-গুলি ঘরে টাঙানো আছে—কোনটার সামঞ্জস্য নাই। আটখানি ছবির মধ্যে কোনখানিরই ফ্রেমের বা সাইজের মিল নাই। যে-গুলি খিলানের মাথায় টাঙাইলে মানায় সে-গুলি আছে নীচেয় এবং খিলানের মাথায় যে-গুলি টাঙানো সেগুলি পাখা বা মশারির আড়ালে এমন ভাবে আধঢাকা পড়িয়াছে যে, বিষয়বস্তু বুঝিবার জন্য কাহাকেও মাথা ঘামাইতে হয় না। অর্থাৎ সে বিষয়ে কাহারও কৌতূহল জাগে না। আলনায় এলোমেলো কাপড় গুঁজানো, জামায়, গেঞ্জিতে, কাপড়ে, আণ্ডারঅয়্যারে এমন তালগোল পাকাইয়া আছে যে, দেখিলেই মনে হয় ধোপাবাড়ী দিবার জন্যই ও-গুলি ছাড়িয়া রাখা হইয়াছে, সে না আসাতেই এই জঞ্জালের সৃষ্টি।

বইয়ের সেলফ? ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য ঠাসাঠাসি। নোটের খাতাগুলিও তাই। যে খুঁজিয় ঠিক বইখানি বাহির করে—শীতের দিনেও তার কপালে ঘামের বিন্দু না ফুটিয়াই পারে না। অর্গ্যানটারই বা কি শ্রী? আছে, না আছে! বাজে—এই পর্য্যন্ত। একটা সুদৃশ্য পরদা ওই কোণে ফেলিয়া দিলেও অন্তত ঘরের চেহারা ফিরিত।

খাটের তলায় ছেঁড়া চটির রাশি। কখন কোনটা সে পায়ে দেয়—ঠিকঠিকানা নাই। তোয়ালেটা বিছানারই এক পাশে এবং টিপয়টার উপর টাটকা-ফুলে ভরা ফুলদানির পাশে কতকগুলি খালি চায়ের প্লেট কাপ জড়ো করা।

মুক্তাপংক্তির মত একসারি দাঁত দেখিয়া সমগ্র মানুষটির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সেদিন ছায়া এ ঘরে আসিয়া কি লইয়া গিয়াছে?

না, ছায়ার দোষ নাই। তরুণ যদি তাহাকে মুগ্ধ করিয়াই থাকে, সে গুণ তরুণের। বইয়ের রাশির মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া বাহিরের যে এতবড় জগৎটা প্রতিদিনকার সূর্য্যালোকে বিকশিত হইয়া উঠে—সকালে দুপুরে বৈকালে বিভিন্ন রাগিণীতে তার সুর-আলাপ চলে, সে কথা ত তপন একদম ভুলিয়াই গিয়াছিল। আকাশে মেঘ-সমাবেশে বিধাতার কৃতিত্ব বড় কম নহে। রাত্রির কৃষ্ণমণ্ডলে অগোছালো তারা একটিও নাই। সংকেতটি বিন্দুই উজ্জ্বল এবং নীল আস্তরণের উপর পরিপাটিরূপে সাজানো; এমন কি, ছায়াপথের আলো-ফুল-ঘেরা ঈষদ্দীর্ঘ মালাটি; মালা ছিঁড়িয়া গেলেও—সুচিক্কণ মেঝের উপর যেমন বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে, উপরের যবনিকাতেও তার প্রতিচ্ছবি। এতদিন এ-সব দৃশ্য চোখে পড়ে

নাই! উন্মুক্ত নয়নের অন্তরালে চির-আবদ্ধ দৃষ্টি অকস্মাৎ দৃপ্ত পদক্ষেপের শরাঘাতে সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে—তাই ঘরের মধ্যে চির-দিনের সঞ্চয়কে মনে হইতেছে স্তূপীকৃত জঞ্জাল।

তপন এ-ঘর ও-ঘর বারাণ্ডা সর্ব্বত্রই ঘুরিল। সর্ব্বত্রই অপরিচ্ছন্নতা, রুচিবিকার ও আলস্য পরিস্ফুট।

বড় বৌদি রহস্য করিলেন, কি ঠাকুরপো, ঘুরে ঘুরে কি খুঁজচো? মানিক বুঝি?

তপন তাঁহার পানে চাহিয়া হাসিল। সে হাসি করুণার্দ্র। বড়বৌদির রং ফরসা, বেশ মোটাসোটা মানুষ। কাপড়ের আঁচলখানি বার বার মাথা হইতে খসিয়া পড়িতেছে, খোঁপাটাও এলানো। গায়ে অতিরিক্ত গহনা—মুখের পান-দোক্তার মতই। মুখখানি যেন তন্দ্রাতুর—একটু ঘুমাইয়া লইলেই ভাল হয়। কিন্তু বৌদি ঘুমান সেই দুপুর-রাত্রিতে। সারাদিন ও রাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত ছেলে ও সংসার লইয়া তাঁহার ব্যস্ততার অন্ত নাই। এই অতিপরিশ্রমের ফলে বিশৃঙ্খল সংসারে এতটুকুও সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে না, লাভে হইতে তিনি তন্দ্রাতুর আলস্যে শিথিল পা দু'খানি টানিয়া লইয়া ফিরেন।

বড় বৌদি কহিলেন, হাসলে যে বড়?

তপন বলিল, মানিক এ বাড়ীতে কোথায় পাব বড় বৌদি, তোমাদের জ্বালায়—তা কি দেখবার জো আছে?

বড় বৌদি সজোরে হাসিয়া উঠিলেন ও হাসিতে হাসিতে মেঝের উপর বসিয়া কহিলেন, তা বটে! আর দু'টো বছর যাক, তখন দেখবে বৈ কি!

তপন হাত জোড় করিয়া কহিল, রক্ষে কর বৌদি, এই জঞ্জালের মধ্যে সে-জিনিষ না দেখাই ভাল।

বড় বৌদি কহিলেন, জঞ্জাল কি গো? একমুহূর্ত্ত থামিয়া হাসিয়া কহিলেন, জঞ্জাল কেন গো, অরণ্য বললেও পার। আহা! তোমার দুঃখ দেখে আমার চোখে জল আসচে ঠাকুরপো। বলিয়া হাসির মাত্রা বাড়াইয়া দিলেন।

তপন কহিল, কিন্তু তোমার দুঃখু দেখে সত্যিই আমার চোখে জল আসবার উপক্রম হয়েচে! থাম গো থাম।

বড় বৌদি থামিলেন, কিন্তু রহস্য করিতে ছাড়িলেন না। বলিলেন, আমাদের কথায় এখন জল ত আসবেই ঠাকুরপো! তা মা যে কিছুতেই শুনচেন না, সামনে অঘ্রাণ মাস—বল তো—

তপন বলিল, তা মন্দ কি। তোমরাও বাঁচ, আমিও নিশ্চিন্ত। একবার এই সংসার-কলে সেই জীবটিকে ফেলতে পারলে—ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতে হবে না। সহজ সরল জীবন। খাও দাও—গল্প কর, ব্যস্।

বড় বৌদি ঈষৎ ক্ষুন্ন হইয়া কহিলেন, উঃ, সে জীবটির ওপর তোমার দরদ দেখে যে আর বাঁচি না গো!

তপন হাসিয়া কহিল, দরদ হবে না! সে যে মানিক মুক্তো—এই একটু আগে তুমি যা বললে।

বড় বৌদি ত্বরিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও গমনোদ্যত হইয়া কহিলেন, দাঁড়াও, কথাটা মাকে বলে যাতে সে মানিক শীগ্‌গির আনবার ব্যবস্থা হয়—তাই করচি। বলিগে ঠাকুরপোর আর তর সইচে না!

তপন তাঁহার আঁচল টানিয়া ধরিয়া কহিল, দোহাই তোমার বড় বৌদি—ঘাট মানচি। মানিক-মুক্তোয় আমার এতটুকু লোভ নেই। তুমি বরঞ্চ এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাইয়ে আমার প্রাণ বাঁচাও।

চারু জল আনিয়া দিল।

তপন বলিল, আঃ! তোমাদের ভাষায় ধন্যবাদের বদলে কি বলতে হয় বৌদি?

চারু অবাক্ হইয়া কহিল, সে আবার কি?

নেপথ্য হইতে হাস্যচপল কণ্ঠের উত্তর আসিল, আমরা ধন্যবাদই বলি, যদিও জানি, ওটা এ দেশের প্রথা নয়।

তপন সুলতার পানে চাহিয়া কহিল, আমি বড় বৌদির কাছে হিন্দুশাস্ত্র শিখবার ইচ্ছা করেচি, তুমি হচ্চ তার হন্তারক।

সুলতা কহিল, বড়দি কি আজকাল মাষ্টার মশাই হয়ে উঠলে? দাঁড়াও গুরু-মা, আমিও তোমার কাছে পাঠ নেব। বলিয়া তাড়াতাড়ি খাটের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া ছোট মেয়ের মত ঘাড় দোলাইয়া পাঠ আবৃত্তি করিতে লাগিল।

চারু হাসিতে হাসিতে কহিল, মরণ!—এতও জান!

তপন হাসিতে হাসিতে মুগ্ধচোখে সুলতার রহস্য-উজ্জ্বল মুখের পানে চাহিয়া বলিল, স্কুলের দিনে ফিরে যেতে ভারি ইচ্ছে করে, না মেজ বৌদি?

সুলতার মুখে নিমিষের তরে ম্লান ছায়া ভাসিয়া

উঠিয়াই মিলাইয়া গেল। বুকের মাঝে একটি অতি ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাসও হয়ত। চোখ নাচাইয়া সে কহিল, লোভ হয়ই তো। তোমরা পড়বে বুড়ো বয়স অবধি, আর আমাদের বেলায় গৃহ-বন্ধন। আবার তোমরাই বলতে কসুর কর না—কুড়ি পেরুলেই বুড়ি। বলি, বুড়ি হবার ব্যবস্থাটা কারা করেচেন শুনি?

চারু কহিল, তা হোক, বুড়ি হওয়াই ভাল। ছেলে-মেয়ে ঘর-গেরস্থালী নিয়েই না মেয়েমানুষের তৃপ্তি।

সুলতা বলিল, এই তৃপ্তির লোভে মনে হয়, এক লাফে পনেরো থেকে পঁয়ত্রিশে গিয়ে উঠি। তারুণ্য থেকে একেবারে প্রৌঢ়ত্ব, না বড়দি?

চারু কহিল, হয়ই ত। ছোট বয়সের ঝঞ্ঝাট কি কম। এখানে—, বলিয়া তপনের উপস্থিতি ধারণায় আসিতেই কথাটা সামলাইয়া লইল। কথাটার ইঙ্গিত সুলতা স্পষ্টই বুঝিল। তপন দেওয়ালে-টাঙানো স্যাণ্ডোমূর্ত্তির পানে চাহিয়াছিল বলিয়াই কথাটায় কান দেয় নাই। কথা শুনিলেও ও-সবের অর্থবোধ তার পক্ষে দুরূহই হইত সন্দেহ নাই।

কি অসহ্য লাঞ্ছনায় অন্তর-বাহির ক্ষতবিক্ষত হইলে নারী যৌবনকে পিছনে ফেলিয়া দ্রুতবেগে প্রৌঢ়ত্বের পানে চলিতে চাহে—সে বেদনা বুঝিবার মত মন এক নারী ছাড়া কাহারই বা আছে।

সুলতা হাসাইতে আসিয়া বার বার কান্নার ঢেউ তুলিতেছে দেখিয়া অপ্রতিভ হইল। তপনের পানে চাহিয়া বলিল, কি বলছিলে ঠাকুরপো—এই ঘরদোর সম্বন্ধে?

চারু উত্তর দিল, এই সংসার নাকি ভারি অগোছালো! এর মধ্যে মানিক খুঁজে বেড়ানো মিছে।

সুলতা কহিল, সত্যি? কিন্তু ভাই, আজ দুঃখ করলে হবে কেন? তোমরাই ত বেছে বেছে এই অগোছালো মানুষগুলিকে নিয়ে এসেচ।

তপন কহিল, ধ্যেৎ! কি কথার কি উত্তর!

সুলতা হাসিয়া বলিল, ভাল উত্তর একটা মনে এসেচে। দাঁড়াও আসচি। বলিয়া সে দ্রুতপদে কক্ষান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এমন সময়ে কক্ষান্তরে চারুর পুত্রকন্যার কলহ-কোলাহল উঠিতেই চারুও আর সেখানে দাঁড়াইল না। চারু যাইতেই গোলমাল বাড়িয়া উঠিল। অভিযোগকারীরা ক্রন্দন ও তীব্র মন্তব্যের দ্বারা চারুকে হয়ত বা আচ্ছন্নই করিয়া দিল।

তপন মনে মনে হাসিল। সংসারের শৃঙ্খলা-বিধান! ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলিই মায়ের শাসন মানে না! কেন মানে না? চারু ঢিলা প্রকৃতির বলিয়া ছোটরাও এক আঁচড়ে চিনিয়া লইয়াছে। এই লোক চেনার কথায় একটা গল্প মনে পড়িল:

শহরের এক উকিল। পশার তাঁর খুবই আছে। বড় ছেলেটিকে উত্তরাধিকারী করিবার মানসে যতদূর পারিলেন—শিক্ষা দিলেন। শিক্ষাশেষে ছেলে আদালতে বাহির হইতেই বাপ বৃদ্ধাবস্থার অজুহাতে অবসর লইলেন।

কিন্তু দু'টি মাস কাটিয়া গেলেও ছেলের উপার্জ্জনের একটি পয়সাও সংসারের সচ্ছলতা বাড়াইল না। বাপ একদিন ছেলেকে ডাকাইলেন। সে আসিলে বলিলেন, হাঁরে, তোর রকম খানা কি? ঘর থেকে আমি বরঞ্চ তোর জলখাবার গাড়ীভাড়ার টাকা দিই, অথচ আজও পর্য্যন্ত একটা পয়সা ত তোর কাছ থেকে পেলুম না! বলি, মক্কেল টক্কেল হয় না বুঝি?

ছেলে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হয়ত বাবা! এত হয় যে, অন্য উকিলরা গাল পাড়তে থাকে।

বাপ সবিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, তবে? টাকাগুলো যায় কোথায়?

ছেলে বলিল, মক্কেলই হয় বাবা, পয়সা তো জোটে না।

বাপ বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া শুধুই চাহিয়া রহিলেন।

ছেলে বলিয়া চলিল, তারা আসে, মোটা ফীও কবলায়, কিন্তু কাজ মিটলে তারা একটা পয়সাও দেয় না—

বাপ ছেলের মুখের পানে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ক্ষণকাল চাহিয়া কহিলেন, হুঁ, বুঝেছি, তারা কেন যে পয়সা দেয় না—

ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, কি বুঝলেন বাবা?

বাপ বলিলেন, তুই যে একটা আস্ত বেকুফ, তা তোর মুখে চোখেই লেখা। ধূর্ত্ত মক্কেল দেখলেই বুঝতে পারে। থাক বাপু, কাল থেকে শামলাটা আর চাপিও না। এ লাইন তোমার নয়।

বড় বৌয়ের তন্দ্রা-শিথিল চক্ষু দেখিয়া করুণাই জাগে, ভয় পাইবার কথা নহে। তাই ছেলেমেয়েরা অকুণ্ঠ হইয়াই কোলাহল করে।

তপন নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল।

আসিয়া দেখে, গোল টেবিলের উপর পেপার-ওয়েট চাপা এক খানা কাগজ। সুন্দর অক্ষরে কয়েকটি লাইনে ইংরেজী কবিতার অংশ।

I have forgot much, * gone
with the wind,
Flung roses roses, riotously
with the throng.
Dancing, to pat thy pale, lost
lilies out of mind,

* * *

I have been faithful to thee, *
in my fashion.

নীচেয় * চিহ্নের নোট,: যে কোন প্রিয় নাম বসাইতে পার—নিজের ইচ্ছামত।

তপন হাসিল। মেজ বৌদিও আজক'ল quotation ধরিয়াছেন! কিন্তু এ-কথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই, তরুণ মনে এই যে আকস্মিক সৌন্দর্য্য-পিপাসা জাগিয়াছে, ইহার উৎসমূলে এক তরুণী!

কাব্যে, সাহিত্যে যে বিষয়ের এত বাগ্‌ব হুল্য, এত উচ্ছ্বাস—অবশেষে তাহার জীবনে কি সেই চিন্তাময়তার অলক্ষিত পদক্ষেপ!

সেইদিনের পরিচয় হইতে আজ সন্ধ্যার বিদায়-ক্ষণটি পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি ঘটনার অভিনিবেশে কোন্ জিনিসটি ফুটিয়া উঠে? দুর্ব্বলতা। মুক্তির মহিমা প্রচারই বল, তরুণের উপর অকারণ ঈর্ষাই বল—প্রতিনিয়ত সে দুর্ব্বল মনকেই প্রকাশ করিয়াছে। তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী ছায়া সে কথা সেই মুহূর্ত্তেই বুঝিয়াছে। হয়ত বা ভাবিয়াছে তপনের চিত্ত-চাপল্য। না, হাতের কাছে শেলী নাই, রবীন্দ্র-নাথের কাব্যগ্রন্থ আছে—দেখা যাক, আমাদের মরমী কবি এ বিষয়ে কি বলেন!

* * *

মাস কয়েক পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে সঙ্গে কাব্য-কুসুম চয়নও চলিল। এ-যেন এক অগাধ অনন্ত-বিস্তৃত সৌন্দর্য্য-পারাবার। রহস্যমণ্ডিত সৌন্দর্য্যের মতই অর্দ্ধপ্রকাশিত সূক্ষ্ম কুহেলী-অবগুণ্ঠনে আবৃত! সামাজিক আচার-ব্যবহারের বিভিন্নতা দেশ-কাল-পাত্র ভেদ সত্ত্বেও এক দেশের কবির সঙ্গে অন্য দেশের কবির কি চমৎকার অন্তরের যোগ। ইনি বীণায় ঝঙ্কার তুলিয়াছেন, উনি ক্লারিওনেটে; সুরসঙ্গতি ঘটিয়াছে সেই এক চমৎকারিত্বের মধ্যে! বিচিত্র অনুভূতি, আচার-ব্যবহার, কথা ও ভঙ্গিতে সেই পরম সুন্দরের বন্দনা-গান। যে সুন্দর—অতিবৃদ্ধ ধরণীকে বার বার তরুণ সূর্য্যালোকে স্নান করাইয়া নব নব রূপপরিকল্পনায় বল্পলোককে কমনীয় করেন, বার বার ফিরিয়া-আসা ঋতুবৈচিত্র্যে পুরাতন ফুলকেই নূতন করিয়া ফুটাইয়া তুলেন; আকাশকে নিত্য করেন সুনীল, ধূসর ছায়াপথের রহস্যময়তাকে সুনিবিড় এবং চাঁদ উঠিলে বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তরকেও প্রকাশ-ব্যাকুলতার অশ্রুতায় ভরাইয়া দিয়া উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে ফেনিল—তাঁরই আগমন-উপলক্ষ্যে অতিবৃদ্ধেরা যে গান শেষ করিয়া গিয়াছেন, অতিতরুণেরা তাহারই ছন্দে সুসংযোগ করিতেছেন। শুধু প্রকাশভঙ্গিমার অভিনবত্ব পুরাতনকে পুরাতন হইতে দেয় না।

মন একটি বৃত্তিকে মুখ্য করিয়া অচিরেই অপরটিকে গৌণ করিয়া তুলে। সুতরাং থার্ড ইয়ারের ফল সন্তোষজনক হইল না। বাড়ীতে এ-বিষয়ে বিশেষ কলরোল না উঠিলেও বন্ধুমহলে গুঞ্জনটা কিছু দিন ধরিয়া চলিল।

মুহ্যমান তপন মোহ কাটাইবার জন্য একবার চেষ্টা করিল। ছায়া যেন দুর্জ্ঞেয় প্রহেলিকা। প্রতিটি কথা তার কৌতুকরসের মধ্য দিয়া অন্তরকে স্পর্শ করে, আঘাত করে এবং সেই আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দও যে না জাগাইয়া তুলে তাহা নহে। তর্কে হারিয়াও যেমন তর্কপ্রবৃত্তি প্রবল হইয়া—প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করিবার উৎসাহে মাতে।

ছায়ার যে-টুকুতে সৌন্দর্য্য, সেইটুকু লইয়াই বহুক্ষণ ধরিয়া আলোচনা চলে। সৌন্দর্য্যের স্নিগ্ধতা বা প্রখরতা তপন অনেক দেখিয়াছে, কিন্তু বিন্যাসে যে সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট, তাহা তুলনাহীন। তাহাদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে মজলিস বসে। কখনও গাহিবার জন্য, কখনও বা এমনই, তপন মাঝে মাঝে সে মজলিসে যোগদান করে। নূতন ব্যারিষ্টার-পত্নী বিংশবর্ষীয়া মিসেস সেনের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সে বহুবার দেখিয়াছে। রং এমনই উজ্জ্বল যে, গাউন পরিয়া দাঁড়াইলে সহসা মেম বলিয়া ভ্রম না হউক, পার্শ্বরমণীর গোলাপ-গৌরবকে স্মরণ করাইয়া দেয়। দু'টি আয়ত চোখের তুলনা নাই। গঠন এবং প্রসাধন-পারিপাট্যের জন্য তিনি নাকি গতবার ফ্যান্সি ড্রেসের একখানি সোনার

মেডেলও পাইয়াছেন। তিনি যেদিন মজলিসে আসিয়া বসেন—সেদিন অন্য সকলে নিষ্প্রভ হইয়া যান। তবু ছায়ার সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে না। তাঁর উগ্র সৌন্দর্য্যের মধ্যে অপরিস্ফুট কিছু নাই; হয়ত-বা এই জন্যই সেই অপরূপ কিরণের তীক্ষ্ণতায় মুগ্ধ মন তৃপ্তিলাভ করে না। সাধারণ মানুষ, বিশেষ করিয়া তরুণ অন্তর চাহে—সৌন্দর্য্যের সঙ্গে রহস্যকে। আচরণে তুচ্ছ একটু ত্রুটি যাহা অনেক নীরব মুহূর্ত্তকে হাসিকৌতুকে বহুক্ষণ ধরিয়া সমুজ্জ্বল করিয়া তুলে এবং অবসর সময়ে যে চিন্তার অসীম তৃপ্তি। পরস্পরের কথাবার্ত্তা বা আচার-ব্যবহারের সামান্য স্খলন কৌতুকপ্রিয়তার মধ্য দিয়া দুইটি হৃদয়কে কাছেই টানে। একের গৌরববোধের উচ্চমঞ্চে যেই মাত্র অন্যে মুহূর্ত্তের তরে অবনতশির হয়, অমনই ভুলের মধ্যে করুণার ছায়া এবং তার পশ্চাতে সুনিবিড় বেদনাবোধ। এই বোধের মধ্যে যে বৃত্তি প্রতিদিন পরিপুষ্ট হইতে থাকে, হয়ত তাহাই ভালবাসা। হয়ত তাহাই পুরাতন পৃথিবীকে নূতন সৌন্দর্য্য দান করে, নারীকে করিয়া তুলে প্রিয়া।

তারপর, মিসেস সেন না আসিলে যে মেয়েটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সে রাইপুরের জমিদার-বাড়ীর মেয়ে রেণু। বয়স আঠারো। বিবাহিতা। শ্বশুরবাড়ীর কথায় রেণুর গৌরমুখে লজ্জার অরুণরাগ ফুটিয়া উঠে, কৃষ্ণপক্ষ্মাবৃত নয়ন দু'টি ধরণীর আলো দেখিবার জন্য বারেকের তরেও ব্যগ্র হয় না। সমগ্র ভঙ্গির মধ্যে সলজ্জ প্রকাশ। অবশ্য এই সলজ্জ-কুণ্ঠিত প্রকাশ নারীকে যে গৌরব-শ্রী দান করে—তাহার তুলনা অন্য দেশে দুর্লভ।

তীব্রতায় নয়ন যেমন আকস্মিক জ্যোতিপ্রবাহে ক্ষণেকের তরে নিশ্চল হইয়া যায়, মেদুরতার স্নিগ্ধমণ্ডলে তেমনই সে অসীম পরিতৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু চঞ্চল জগতে চোখ-কান বুজিয়া বাঁধা-ধরার মধ্যে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করা মানে—চক্ষুকে সৌন্দর্য্যের সুখদুঃখ হইতে চির নির্ব্বাসিত করা।

ছায়ার যত বয়সই হউক, সৌন্দর্য্য নাই থাকুক, কথার মধ্যে কোমলতার সঙ্গে যে পটু-পরিহাস ও সুমার্জ্জিত-তীক্ষ্ণতা, তাহাও হয়ত তপনকে তত আকৃষ্ট করে না, কিন্তু অবুণ্ঠিত তার প্রকাশ—বাক্যে ও ব্যবহারে, অথচ সুনিবিড় রহস্যজাল বুনিয়া নিজেকে দুর্ভেদ্য করিয়া তুলে—তাহারই চিন্তায় তপন তন্ময় হইয়া যায়। তপন জানে না, তরুণ বয়সে এমনটাই হয়। বিশেষ করিয়া তরুণীর অপর পার্শ্বে যদি কোন গুণমুগ্ধের শুভ আবির্ভাব ঘটে ত—সাধারণ কথা ও ভঙ্গিতেও সে দুর্জ্ঞেয় হইয়া উঠে।

হয়ত ছায়া খেলা ভালবাসে, তাই তরুণকে তার প্রয়োজন। তাই বোটানিক্যাল গার্ডেনে অমন একটা পার্টির আয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু বিশেষ করিয়া তপন ওই কথাটা ভাবে কেন? কেন অদম্য জয়তৃষ্ণা তাহার অন্তরকে আকুল করিয়া তুলে? ছায়াকে চাই। তরুণের গ্রাস হইতে সে তাহাকে উদ্ধার করিবে। মস্তবড় একটা শিভল্‌রি; যদিও বীরত্বের সে-যুগের শেষ হইয়াছে। অমন একটা গৌরবময় কার্য্যকে আজকালকার মেয়েরা গোঁয়ার্ত্তুমি বা দস্যুতা মনে করে।

তাই কি? না, কখনই নহে। হয়ত তরবারি দ্বারা বলপ্রকাশের দিন গিয়াছে, কিন্তু বীরত্ব মরে নাই। প্রতিযোগিতা না থাকিলে জগৎটাই যে লুপ্ত হইয়া যাইত! পরীক্ষার ক্ষেত্র এই যে কলেজ-জীবন ইহার মধ্যেও ত অপরিসীম বীরত্ব নিহিত। ব্যায়ামে বছর বছর পুরস্কার বিতরণ করা হয় কেন? ফুটবল খেলায়, ক্রিকেট ম্যাচে—কেন কাপ, শীল্ডের ব্যবস্থা? ডিগ্রি, পদক, খেতাব, খ্যাতি কিসের পুষ্প গুলি?

তপন হাসিল। সুতরাং ছায়াকে চাই।

কিন্তু দু'টি বৃত্তি একই সঙ্গে মুখ্য করিয়া রাখিলে কোনটিরই ফললাভ হইবে না। যা রেজাল্ট হইয়াছে থার্ড ইয়ারের। ছায়া ও তরুণের চিন্তায় আর কয়টা মাস কাটিলেই Finalএ তপন ধরাশায়ী হইবেই।

সুতরাং কাব্য-আলোচনাও এই সঙ্গে বন্ধ থাকুক।

সম্মুখে গ্রীষ্মের সুদীর্ঘ অবসর। গরম হাওয়া খাইয়া কিছু দিনগুলা মোলায়েম ভাবে কাটিবে না! কাব্য ড্রয়ারে বন্ধ করিলে চলে কৈ?

অর্গ্যানের রীডে অঙ্গুলি প্রহার করিতে করিতে তপন এই সব কথাই ভাবিতেছিল।

অকস্মাৎ তাহার মুখ প্রফুল্ল হাসিতে কোমল হইয়া উঠিল। ঠিক, ঠিক। শহরের দূষিত বায়ুতে সন্তরণ করিয়া মনের মাঝে ক্লান্তি ও অবসাদ জমা হইয়া উঠিয়াছে। ওই ধূমল আকাশ—বর্ণহীন, ভাবহীন, ভাষাহারা। ইঁটকাঠে-ঘেরা অরণ্যের কোন দিকেই শ্যামলতা চোখে পড়ে না। হেদুয়ার বাগানে দল বাঁধিয়া পাক খাওয়ায় বা গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা দেখিতে গিয়া নরসমুদ্রের ঢেউ গোণায় উন্মাদনা নাই। অত বড় প্রকাণ্ড গড়ের

মাঠ—গ্যালারি গড়িয়া, গ্রাউণ্ড তৈয়ারী করিয়া, তাঁবু ফেলিয়া প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ লোককে আহ্বান করে। ভিড়ের চাপে ঘাসগুলা পর্য্যন্ত সবুজ শ্রী হারায়, ফেরিওয়ালার চীৎকারে ক্রীড়া-কোলাহলে চিত্তকে অস্থির করিয়া তুলে। সর্ব্বোপরি মোটর ও বাইকের উৎপাতে রাস্তাঘাট যেন কণ্টকাকীর্ণ হইয়াই আছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে মানুষ ভূষণ পরাইয়াছে, কিন্তু ভূষণভার-গ্রস্তা প্রকৃতি অপঘাতে মরিয়াছেন।

সুবোধদের দেশে বেড়াইয়া আসিলে মন্দ হয় না। পূজার সময় যাওয়া হয় নাই। কাব্যালোচনায় সে-কথা ভুলিয়াই গিয়াছিল। এখন একবার শহরের বদ্ধকারা হইতে বাহির হইয়া উদার অবারিত আকাশতলে দাঁড়াইয়া সত্যকার প্রকৃতিকে দেখিবার ইচ্ছা করে। কাব্যের পাতায় পাতায় এই পল্লীরই কল্পনাবিলাস। শহরকে লইয়া মানুষ কেন যে কাব্য রচনা করে না! আচ্ছা, এ-তথ্য পরে জানিলেও বিশেষ ক্ষতি হইবে না—উপস্থিত সুবোধদের দেশে যাওয়াই স্থির।

* * *

নূতন যাত্রায় নূতন করিয়া যেন জীবনের আরম্ভ।

দুপুরবেলায় ট্রেণ ছাড়িল অসহ্য গুমোটের মধ্যে। পশ্চিম দিকের জানালা ঘেঁষিয়া তপন বসিয়াছে। মধ্যাহ্নের রৌদ্র ও-দিকটায় প্রখর বলিয়া জন-সমাগম কম। যদি বা কেহ বসিয়াছে, কাঠের কপাটটি দিয়াছে তুলিয়া—রৌদ্র প্রবেশ-পথ পায় নাই।

সুবোধ হাসিয়া বলিয়াছিল, আর একটু সরে এসে বোস রোদ্দুরে মাথা ধরাবি শেষে।

তপন বলিয়াছিল, ধরুক। হাওয়া আমার চাই বাইরের দৃশ্যটা দেখা হবে।

সত্যই শহরবাসীর পক্ষে এ এক নূতন দৃশ্য। মেঘশূন্য আকাশে মধ্যাহ্নের জ্বলন্ত রবি—প্রখর অগ্নিজ্বালায় সমগ্র ধরণীকে মুহ্যমান করিয়া প্রমত্ত উল্লাসে শূন্যপথ বিদীর্ণ করিয়া রথ চালাইয়াছেন। নিঃশব্দ দ্রুতগতি,—গর্জ্জনহীন দাহন। তাপদগ্ধা ধরিত্রীর বুকে ধূ-ধূ বিস্তীর্ণ মাঠে মাঠে আগুনের ধোঁয়া। মাঠ ফাটিয়া চৌচির, রুক্ষ প্রান্তরে এলানো লতাগুল্ম। কি দাহ, কি উল্লাস।

ট্রেণ ওই অতিদ্রুত নিঃশব্দ গতির তালে তালে শব্দ করিয়া ছুটিতেছে। রৌদ্রের ভয়ে এমন দৃশ্য না দেখিলে যে আক্ষেপের সীমা থাকিত না।

মাঠের বুকে এখানে ওখানে জলা। রৌদ্রতাপে সেখান হইতে বাষ্প উঠিতেছে, পাড়ে বসিয়া সাদা বক চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করিতেছে। District Boardএর পাকা সড়কের দুইধারে কৃষ্ণচূড়া, অশ্বত্থ ও আমের গাছ। ক্লান্ত পাখীর দল তারই ছায়ায় বসিয়া কলরব করিতেছে। কোথাও কোন দূর-দূরান্তরের যাত্রী ছায়াচ্ছন্ন বৃক্ষতলে পুঁটুলি ঠেস দিয়া বসিয়া থেলো হুঁকায় তামাক টানিতেছে ও শ্রান্তি দূর করিতেছে। ট্রেণের শব্দে হুঁকা হইতে মুখ সরাইয়া অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষু বিস্ময়বিস্ফারিত করিয়া এদিকে হয় ত চাহিয়াই রহিল। পুলের নীচে হাঁটুভর জল এখনও জমিয়া আছে। কয়েকটি মহিষ সর্ব্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া সেই জলটুকুতে দেহ ডুবাইয়া পড়িয়া আছে; রাখালের পাঁচনবাড়ির ইঙ্গিতেও উঠিবার লক্ষণ দেখাইতেছে না। ও-মাঠ হইতে একটা গাভী উর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া ছুটিতে ছুটিতে বড় সড়কের উপর আসিল এবং গর্জ্জমান চলন্ত ট্রেণের শব্দে কান খাড়া করিয়া খানিক দাঁড়াইল, তারপর—ট্রেণের সঙ্গেই পাল্লা দিয়া ছুটিতে লাগিল। এক একবার ক্লান্ত ঘুঘুর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতেছে, ট্রেণের ধস্ ঘস্ শব্দ না থাকিলে অলস মধ্যাহ্নে সেই একটানা করুণ স্বর ভারি মিঠা লাগিত।

মধ্যাহ্নরৌদ্রঝলসিত দিগন্ত-প্রসারিত মাঠের সুনিবিড় স্তব্ধতার মধ্যে এই ক্বচিৎ শব্দপ্রবাহ ও বাস্তব জগতের আকস্মিক প্রকাশ—কোকিল-কূজিত যে কোন শুক্লা-বাসন্তীনিশার বেলা-চম্পক-গন্ধামোদিত মোহময় মুহূর্ত্তগুলির চেয়ে অনুভূতিময়।

তপন এই অনুভূতি-রসে মগ্ন হইয়া গেল।

হয়ত একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। সেটুকু ভাঙ্গিতেই মধ্যাহ্নের মাঠ আর চোখে পড়িল না। সূর্য্য অনেকখানি পশ্চিমে হেলিয়াছেন। মুহ্যমান মাঠের চেহারা জরাতুর। পথে ও মাঠে লোক চলাচল সুরু হইয়াছে। উপরে চিলের চীৎকারও আর শোনা যায় না।

'চাই পুরি মিঠাই', 'গরম চা'—'পানি পাড়ে'—

লোকগুলা ষ্টেশন পাইয়া যেন বাঁচিয়াছে। কেহ গোগ্রাসে খাবার গিলিতেছে, কেহ চায়ের গরম পেয়ালাটা তাড়াতাড়ি নিঃশেষ করিবার জন্য চোখমুখ কুঞ্চিত করিয়া তুলিতেছে! জলের প্রত্যাশায় জানালা হইতে লোটা বাহির করিয়া কাহারও বা পানিপাঁড়ের নাম ধরিয়া সে কি বীভৎস চীৎকার। সময় নাই—সময় নাই।

এখনই ঘণ্টা বাজাইয়া ট্রেণ ছাড়িবে। পানের খিলিটা মুখে পুরিয়া চুণ চাহিবার অবসরটুকু নাই। বিড়ির ধোঁয়ায় ট্রেণের কামরা ত কলিকাতার শীতসন্ধ্যার মূর্ত্তি ধরিল!

ট্রেণ ছাড়িল। বাকি পয়সার জন্য ভেণ্ডাররা কেহ ফুটবোর্ডে পা রাখিয়া, কেহ বা প্ল্যাটফরমের উপর দিয়া ট্রেণের সঙ্গে সঙ্গে খানিক চলিল। তার পরেই গল্পে, কলরবে, ধোঁয়ায়, কাশিতে নির্ব্বাক মধ্যাহ্ন অকস্মাৎই মরিয়া গেল।

তাবপর কত ষ্টেশন চলিয়া গেল তপন মুখ তুলিয়াও চাহিল না।

অবশেষে সুবোধ তাহার কাঁধ ঠেলিয়া কহিল, ওঠ রে, আমরা পৌছে গেছি।

তপন ট্রেণ হইতে নামিল।

দিনের আলোর একবিন্দুও অবশিষ্ট নই। আসন্ন অন্ধকারে ছোট ষ্টেশনটি সাগর-পারের অচিন দেশের মতই দেখা দিয়াছে। দু'টি কেরোসিনের আলো মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। ভূতের মত লোকগুলা হাঁকাহাঁকি করিতেছে। আকাশকে ঢাকিয়া প্রকাণ্ড গাছের সারি প্ল্যাটফরমের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত। ষ্টেশনের ছোট ঘরে বসিয়া রেলেরই সিগন্যালার খট্‌ খট্‌ করিয়া কাজ করিতেছেন। টেবিলের উপর একটা বিড়াল পরম আরামে ঘুমাইতেছে; লণ্ঠনের মলিন আলোয় তাহার নধর কান্তি ও নির্ব্বিঘ্ন নিদ্রা দেখিয়া মনে হয়,—গৃহস্থের আদরের বস্তু। ও-পাশের ঘরে খাতাপত্রের মধ্যে ডুবিয়া বুকিং-ক্লার্ক হিসাব করিতেছেন। মাষ্টার ট্রেণ attend করিতে গিয়াছেন।

ঘণ্টা ও বাঁশীর সঙ্কেতে ট্রেণ ছাড়িয়া গেল। সুবোধ ও তপন অন্যান্য যাত্রীর সঙ্গে ষ্টেশনের বাহিরে আসিল।

সেখানে এক বিষম ব্যাপার। হোটেলওয়ালারা উত্তম আহার ও বাসস্থানের লোভ দেখাইয়া যাত্রী টানিতেছে। নৌকার মাঝি বাবুদের হাত হইতে মোট কাড়িয়া লইয়া নদী পারের জন্য সাদর অহ্বান জানাইতেছে।

সুবোধ বলিল, আমরা নৌকাতেই যাব। প্রায় এক ঘণ্টা যেতে লাগবে।

মিনিট দুইয়ের মধ্যে নদীর ধারে আসিতেই সেখানকার স্নিগ্ধ বাতাসে তপনের সারা দেহ যেন জুড়াইয়া গেল।

অন্ধকার-মাখা নদীতে চকচকে জল ও নৌকায় নৌকায় কেরোসিনের কুপি।

খানিকটা কাদা ভাঙ্গিয়া দুইজনে নৌকায় আসিয়া বসিল। তপন হাত দিয়া কেরোসিনের কুপি নিবাইয়া নৌকার মাথার দিকে ছইয়ের উপর বসিল। নাতিপ্রশস্ত নদীর এ-পার ও-পার দেখা যায়। অন্ধকার আকাশে তারাগুলি উজ্জ্বল হইয়াছে। ছপ্‌ ছপ্‌ করিয়া দাঁড় পড়িতেছে। উঁচু পাড়ের উপর গঞ্জের হাট এই মাত্র শেষ হইয়া গেল। জিনিষপত্র কিনিয়া গল্প করিতে করিতে দলে দলে লোক বাড়ী চলিয়াছে। তাহাদের অস্পষ্ট গুঞ্জনধ্বনি সন্ধ্যার তরল অন্ধকার ভেদ করিয়া শুভবার্ত্তাটির মত কানে আসিয়া পৌছিতেছে। শান্ত স্তব্ধ পল্লীজীবনের কত না বৈচিত্র্য এই হাট করিবার কালে ক্রীত দ্রব্যের সঙ্গে কুটীর গুলিতে গিয়া পৌছায়! ভাল মাছটি নাড়িয়া বাড়ীর ছেলে বুড়ায় দেখে, বার বার দর জিজ্ঞাসা করে। আনাজ-পাতিগুলি সযত্নে হাতে হাতে ফিরে। তারপর, সুদীর্ঘ পথের দীর্ঘতর যাতায়াত-কাহিনী। কে ঠকিল, কেই বা জিতিল। বিবাহের সম্বন্ধ কাহার সহিত কাহারা পাতাইল। অমুক মাসে নবান্নের সঙ্গে শাদিটাও হয়ত জাঁকজমক করিয়া হইবে। ধান চালের দর, পাটের রপ্তানী, খন্দ কুটা·········

নদীর এ-পারে ঢালু তীরভূমি; খানিকটা দূর গিয়া বনরেখা আরম্ভ হইয়াছে। তাহারই কোলে গ্রাম। অন্ধকারেও নদীর বালি চিক্‌ চিক্‌ করিতেছে। নৌকা নদীর মাঝখান দিয়া চলিল।

প্রথমটা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। ঝড়ের মত ট্রেণ ছুটিয়া আসিয়াছে—সারা দেহ স্নায়ুগুলির সহিত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। এ সময়ে নৌকায় উঠিয়া বসিতেই দেহ অবসাদে ভাঙ্গিয়া পড়িল। নৌকা চলে কি না-চলে! মাঝে মাঝে টাল সামলাইয়া বসিতে হয়। মাঝিগুলা তেমন মজবুত নহে, জোরে জোরে দাঁড় টানিতেও পারে না! ঐ নদীতীরের ঝোপটা মিনিট দুই আগে দেখা গিয়াছে, এখনও দেখা যাইতেছে। তার পাশে কলাবাগানটা, নাচের জেলেডিঙ্গিগুলা, নাঃ—জলে নামিয়া দৌড়াইয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

তপন অস্থির হইয়া সুবোধকে বলিল, ও-পারে নেমে হেঁটে যাওয়া যায় না?

সুবোধ বলিল, না। অন্ধকার পথ, অন্য ভয়ও আছে।

কিসের ভয়?

সুবোধ বলিল, শুনলে শিউরে উঠবি না ত? সাপ। এ সময়ে—

তপন মুখ ফিরাইয়া জলের পানে চাহিল। জলের উপর কালো কালো ও গুলা কি ভাসিয়া যাইতেছে?

সুবোধ তাহার দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া হাসিয়া কহিল, কচুরি-পানার দাম। বাংলার নদীগুলো ত ওতেই মজে হেজে গেল।

এক এক জায়গায় দাম ঘন জঙ্গলের মত হইয়াছে; নৌকা ঘস্ ঘস্ শব্দে অনেকক্ষণ তার উপর দিয়া চলিল। দামগুলির পুষ্পস্তবক তপনের পায়ে ঠেকিতেই সে সভয়ে পা তুলিয়া লইল।

নদীর এ-পারে একখানি গ্রাম দেখা গেল। নদীর ধারে ছোট ছোট হোগলা-ছাওয়া কুঁড়ে, জাফরি-কাটা ছোট জানালা, ভিতরে কেরোসিনের কুপি বা লণ্ঠন জ্বলিতেছে। আলোর রেখা অল্প খানিকটা জল ছুঁইয়াছে। কুটীর মধ্যে দিনান্তের গল্পও জমিয়াছে বেশ।

দূর হইতে মেঠো বাঁশীর সঙ্গে গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছে:

কে উদাসী—বন পিয়াসী—বাঁশের বাঁশী···

নদী এই খানটায় একেবারে বাঁকিয়া গিয়াছে। ও ধারে গল্প, ক্লারিওনেটের সুর ও কোলাহল। একদল ছেলে বসিয়া জটলা করিতেছে। বাঁক ঘুরিতেই সামনে আসিয়া পড়িল—বাঁধান ঘাটের সুবিস্তৃত সিঁড়ি। চাতালে বসিয়া পনেরো কুড়ি জন তরুণ। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফুটবল খেলা শেষ করিয়া হাত মুখ ধুইতে প্রতিদিন তাহারা নদীর ঘাটে আসিয়া জমে; ঘণ্টাখানেক হাসিগল্পে কাটাইয়া হৈ হৈ করিয়া চলিয়া যায়।

জলমগ্ন সোপানপ্রান্তে নৌকা থামিতেই পাঁচ সাত জন আগাইয়া আসিল, কে? সুবোধ-দা?

সুবোধ হাসি-মুখে বলিল, ভাল ত? কালিকেশের খবর কি?

কালিকেশ কহিল, বাবা সেরে উঠেছেন, কিন্তু দিদিমা হঠাৎ মারা গেলেন।

সুবোধ খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আর সব গাঁয়ের কে কেমন আছে?

কালিকেশ কহিল, ভালই। অন্যবারের মত এবার অসুখ নেই। মোট আমি নেব, দাদা। বলিয়া সুবোধের হাত হইতে পুঁটুলি কাড়িয়া লইয়া আগাইয়া চলিল।

সুবোধ বলিল, পেছনে মেয়েছেলে আছে, চৌধুরীবাড়ীর, মজুমদার বাড়ীর; মোট বিস্তর।

কালিকেশ উপবিষ্ট যুবকদের পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, ওরা রয়েচে কি করতে! ইনি?

আমার বন্ধু।

কালিকেশ তপনের পানে চাহিয়া আপ্যায়িতের হাসি হাসিল। কহিল, বিশ্রী পাড়াগাঁ! কাঁচা রাস্তা, মোটর বা ঘোড়ার গাড়ী চলে না, আলোও নেই; ভূতের মত অন্ধকারে পথ চলা!

তপন বলিল, এই ত বেশ।

কালিকেশ উৎসাহে মাথা নাড়িয়া বলিল, বেশ নয়? সত্যি বলতে কি, আমার ত ভারি ভাল লাগে, মশায়। একবার কলকাতায় গিয়ে যে কদিন ছিলাম, মোটেই ঘুমুতে পারিনি। যেমন শব্দ, তেমনি ধূলো, তেমনি আলোর ঝাঁজ। কি করে যে মানুষ থাকে!

তপন হাসিয়া বলিল, অন্ধকারে পথ চলতে ভয় লাগে না? শুনেচি সাপের ভয়ও আছে।

কালিকেশ হাসিয়া বলিল, সাপ? ও-ত শব্দ শুনলেই সরে যায়। জানেন, আমরা ওদের যেমন ডরাই—ওরাও মানুষের সাড়া পেলেই সুরুৎ করে সরে পড়ে। প্রাণের ভয় আর কার নেই।

খানিক থামিয়া বলিল, অন্ধকার তো আমার ভারি ভাল লাগে। ওই আকাশের মেঘ ঠেলে যেতে যেমন আমোদ, অন্ধকার চোখে মুখে গায়ে লাগলে তেমনি আরাম। পায়ে জুতো না রাখাই ভাল; নরম মাটি, নরম ঘাস পায়ের তলায় এমন সুড়সুড়ি লাগায়! ভাল লাগে না, সুবোধ দা?

সুবোধ বলিল, আমাদের গাঁ-কে—আমাদের তো ভাল লাগবারই কথা।

পাশের কুঁড়ে হইতে কে হাঁকিল, কে যায়?

সুবোধ বলিল, আমি ঘোষেদের সুবোধ।

ওঃ, ভাল ত?

ভাল। আপনি?

ভাল। অতঃপর—হুঁকার ভড় ভড় শব্দ উঠিতে লাগিল।

পথের দু'ধারে যেখানে কুঁড়ে কিংবা কোঠা পড়ে—সেইখান হইতে এই প্রশ্ন। পরিচয়ের পর—কুশল সংবাদের আদান-প্রদান।

তপন বলিল, আজ কি সারা গাঁয়ের খবর তোমার না নিলেই নয়?

সুবোধ বলিল, কি করি, গাঁয়ের শেষে বাড়ী, খবর দিতে ও খবর নিতে নিতে পথ চলতে হয়।

কালিকেশ দুঃখ করিয়া কহিল, ওই মোড়টায় আমাদের বাড়ী। ঠিক অর্দ্ধেক পথ। যদি সুবোধ-দার বাড়ীর কাছে বাড়ী হতো ত আরও কত লোকের খবর রোজ পেতাম! আপনার ভাল লাগচে না বুঝি?

তপন বলিল, সবই অদ্ভুত ঠেকচে। আপনাদের গাঁ যেন একটা বড় সংসার। কিন্তু আশ্চর্য্য এই—আমাদের বাড়ীর কে কেমন থাকে, রোজ তার খবরই আমরা নিই না।

কালিকেশ কহিল, সেই জন্যই ত শহরে আমার মন বসে না। কোনটার সঙ্গে কোনটার যোগ নেই; ভারি বিশ্রী!

মোড়ের মাথায় আসিয়াও কালিকেশ যাইতে চাহিল না। সুবোধ জোর করিয়া তার হাত হইতে মোট লইয়া কহিল, না, আর অন্ধকারে যেতে হবে না, বাড়ী যা।

কালিকেশ হাসিয়া বলিল, অন্ধকার! জান সুবোধ দা, দিদিমা যেদিন মারা যান—সেদিন যদি থাকতে! কালবোশেখীর ঝড় বিকেল থেকেই উঠলো—সন্ধ্যে নাগাত জল নামলো মুষলধারে। সে কি জল! বর্ষাকাল বলে ভাল আছি! সেই সময় দিদিমা গেলেন মারা। জলের বেগ কমলেও অন্ধকার ঘুটঘুটে হয়ে উঠলো, টিপিটিপি বৃষ্টি! লণ্ঠন হাতে সারা গাঁ ঘুঁড়লাম, এক প্রাণীও বেরুলো না বাড়ী থেকে। কি করি, বাবা, আমি, কাকা আর ও-পাড়ার বুড়ো কবিরাজ ঠাকুর্দা মিলে কোমর বাঁধলাম।

তপন কহিল, সে কি! এমন এক পরিবারের মত গাঁ—

কালিকেশ কহিল, গাঁয়ের সবাই ত এক জাত নয়, কাজেই জলঝড়ের রাতে বিপদ আপদ হলে মুস্কিলে পড়তে হয়।

তপন বলিল, ও-সব জাতের হাঙ্গামা কলকাতায় নেই।

কালিকেশ এক মুহূর্ত্ত থামিয়া কহিল, হয়ত কলকাতার গুণ, আর আমাদের দুর্ব্বলতা। কিন্তু তপনবাবু, গুণকর্ম্মবিভাগটা একেবারে উঠিয়ে দেওয়াও ঠিক কি?

তপন কহিল, তা না হতে পারে, কেননা, গুণ অনুসারে কর্ম্মের বিভাগ আপনিই ঘটে। তাই বলে উত্তরাধিকার সূত্রে—

সুবোধ বলিল, গুণ কর্ম্মের বিভাগ যে আপনি ঘটে না, আমি তার একজন ভাল সাক্ষী। আপিসের দরজায় ঢুকতে হলে দু'টি গুণ থাকা বিশেষ দরকার। এক, বড় চাকরেদের সঙ্গে নিকট-কুটুম্বিতা। দুই, তোষামোদ। তারপর বিদ্যে যদি থাকে ভাল, না থাকলেও কি যায় আসে!

তিনজনেই হাসিয়া উঠিল।

তপন তর্কের জের টানিয়া কি বলিবার উপক্রম করিতেই কালিকেশ সহর্ষে বলিয়া উঠিল, ঐ যে ঝোপের মধ্য দিয়ে দাদার ঘরের আলো দেখা যাচ্ছে।

নূতন স্থানে নূতন পরিবেশের সম্মুখীন হইবার সঙ্কোচটুকু তপনকে নির্ব্বাক করিয়া দিল। কি কথা বলিয়া আলাপ জমাইবে? তাঁহাদের প্রণাম করিয়া প্রথমেই কুশল প্রশ্ন করিবে কি? সে বড় বিশ্রী। হয়ত শিষ্টাচারসম্মত, কিন্তু মনের কোণে এই কুশল প্রশ্নের অশোভনতা বার বারই পীড়া দিতে থাকিবে। এতদিন কোথায় ছিলে বাপু? কার্ডে দু'ছত্র লিখিয়াও ত কুশল জানিতে চাও নাই! আজ দৃষ্টিপথের অতিথি হইয়া অন্তর তোমার ব্যাকুলতায় উদ্বেল হইয়া উঠিল। লোক-দেখানো এই প্রশ্নের সার্থকতাই বা কি! তার চেয়ে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা ভাল। তাঁহারা যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহার উত্তর দিলেই চলিবে। কিন্তু বেশীদিন এই সঙ্কোচপূর্ণ আত্মীয়তার অধিকার লইয়া এখানে বাস করা চলিবে না। বড় জোর দিন দুই, তারপর, বিদায় সে লইবেই।

ছোট পুকুর পাড়ে লণ্ঠন হাতে একজন রমণী এই দিকেই মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

সুবোধ দূর হইতে ডাকিল, মা?

রমণী লণ্ঠন লইয়া অগ্রসর হইতে হইতে কহিলেন, ওরে, ওইখানে একটু দাঁড়া। বড় অন্ধকার পথ, পরশু একটা লতা দেখা গিয়েছিল।

তপন সুবোধকে জিজ্ঞাসা করিল, লত কি?

কালিকেশ চুপি চুপি উত্তর দিল, সাপকে রাত্রিকালে লতা বলেন। ওঁদের ভয়—সাপ বললে—

আলো নিকটে আসিয়া পড়িল। রমণী ভর্ৎসনাপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, থাম বাপু, খুব বীর পুরুষ তুমি। আমার ছেলেকে আর ভয় দেখাতে হবে না।

কালিকেশ হাসিয়া বলিল, তোমার ছেলে যে কলকাতার, জেঠাইমা। কাজেই ওঁকে বুঝিয়ে না দিলে—

সুবোধের মা তপনের পানে ফিরিয়া কহিলেন, জান, বাবা, আজকালকার দুষ্টু ছেলেরা মাকে ভয় দেখাতেই ভালবাসে। তোরা ডাকাত নাকি রে! এই রাতবিরতে বনজঙ্গলের পথে আলো না নিয়ে প'য়ে হেঁটে আসচিস।

তপন তাড়াতাড়ি হেঁট হইয়া পায়ের ধূলা লইল।

তিনি সস্নেহে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিলেন, থাক বাবা, থাক। দীর্ঘজীবী হও। আমার মাথার যত চুল—তত পরমায়ু তোমার হোক।

কালিকেশ হা হা করিয়া হাসিয়া কহিল, তবু—তা হয় না কেন জেঠাইমা?

সুবোধের মা স্নেহ-সকোপ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া কহিলেন, আগে ছেলের বাপ হ, তখন বুঝবি কেন। হাঁ বাবা, তোমার বাড়ীর সবাই ভাল আছেন ত?

তপন ঘাড় নাড়িল।

সুবোধের ম' কহিলেন, সুবোধ ফি চিঠিতেই তোমার কথা লেখে; সে-সব পড়ে চোখের দেখা দেখতে বড় ইচ্ছে হতো। দেখ কালি, আমি মনে মনে তপনকে যেমনটি ভেবেছিলাম, এখন দেখচি ঠিক তেমনিটিই। তেমনি ছোট, তেমনি সুন্দর।

তপন লজ্জিত হইয়া অন্যদিকে চাহিল।

কালিকেশ কহিল, তোমাদের মনটাকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেওয়া উচিত, জেঠাইমা। সেখানে টেলিভিশন যন্ত্রের জন্য ওরা উঠে পড়ে লেগেচে। এমন মায়ের মন পেলে, শুধু কথা শুনে নয়, চিঠির লেখাতেও মানুষটাকে দেখতে পাবে। সে হবে একটা বিস্ময়কর আবিষ্কার।

সুবোধের মা বলিলেন, তা কি সবাই পায় বাছা। যারা মা তারাই শুধু পারে। তোদের যন্ত্রতন্ত্র না নিয়েও তা'রা ঠিক দেখতে পারে।

তপন মুখ না ফিরাইয়াই জবাব দিল, তা হয়ত পায় না। আমাদের বাংলা দেশের মত মা পৃথিবীর কোন্ দেশেই বা আছে!

সুবোধের মা বলিলেন, তোমরা বাংলা দেশের ছেলে বলে তাই ভাবচ। পড়েছ ত গর্কির মাদার। বাংলার মা বলে মনে হয় না?

তপন এই বর্ষীয়সীর মুখে গর্কির নাম শুনিয়া বড়ই বিস্ময় বোধ করিল। অন্ধকার পাড়া-গাঁ—বনঝোপে কত কি নাম-না-জানা কীটপতঙ্গ বিচিত্র সুরে তান ধরিয়াছে; পচা পানাভরা এঁদো পুকুরের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে এক পল্লীরমণীর মুখে সুদূরতম এক মহাদেশের বার্তা! বর্ষীয়সীর হাতের ম্লান আলোটিকে মনে হইল, বিদ্যুৎভরা উজ্জ্বল বাতি। ইচ্ছা হইল, আর একবার অবনত হইয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

দাওয়ার উপর মাদুর বিছানো ছিল। হ্যারিকেনটা পৈঠার উপর রাখিয়া সুবোধের মা বলিলেন, কালি বোস, পালাসনে যেন! একটু জলটল খেয়ে যাবি।

কালিকেশ বালতি হইতে জল লইয়া হাত মুখ ধুইল এবং গামছা দিয়া হাত মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল, তপনবাবু, জামা টামা ছাড়ুন, হাত মুখ ধুয়ে নিন।

তপন জামা খুলিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। শহরের সভ্যতার জল-হাওয়ায় বাড়িয়াছে সে, খালি গায়ে—অপরিচিত স্থানে বিশেষ রকমে সঙ্কোচ বোধ হয়।

কালিকেশের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে জামা খুলিতেই হইল। সঙ্কুচিত ভাবে হাত পা ধুইয়া মুখ মুছিল ও ভিজা গামছাখানি গায়ে জড়াইয়া মাদুরের উপর বসিল।

বেশ ঝিরঝিরে বাতাস বহিতেছিল—সুবোধের মায়ের কথাগুলির মত সারা দেহকে সুস্নিগ্ধ করিয়া তুলে।

* * *

অনতিবিলম্বে সুবোধের মা ও আর একটি তরুণী জলখাবার লইয়া আসিলেন।

মাদুরের একপ্রান্তে রেকাবিগুলি নামাইয়া সুবোধের মা তরুণীকে বলিলেন, জলের গেলাস-গুলো নিয়ে আয় ত, আভা। পানের ডিবেটাও, বুঝলি?

আভা চলিয়া গেল।

সুবোধের মা চালের বাতা হইতে একখানি পাখা টানিয়া লইয়া বাতাস করিতে করিতে বলিলেন, খাও বাবা, জল খাও।

তপন কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, এই ত বেশ বাতাস বইচে, আপনি আর কষ্ট করচেন কেন!

কষ্ট!—সুবোধের মা হাসিলেন। সে তৃপ্তিময় হাসি দেখিয়া কষ্টের কথা তুলিতে যাওয়ার মত লজ্জাকর আর কি থাকিতে পারে! প্রকৃতি মানুষের বিমাতা, যখন ইচ্ছা হয়—মানুষকে আলো হাওয়া দেন, কিন্তু অপ্রয়োজনে যাঁহাদের স্নেহ-সেবা

মানুষকে সুখে-দুঃখে লালন করিবার জন্য সদাসর্ব্বদা ব্যগ্র, তাঁহারা মা।

সহজ সরল নদীধারার মত সস্নেহ মাতৃহৃদয়; রেকাবিতে আয়োজনও করিয়াছেন তেমনই সুন্দর। পেঁপে, আম, জাম, ঘরের নারিকেল-নাড়ু, পাটালী, ক্ষীর ও গরুর দুধের ছানা কাটিয়া রসগোল্লাও তৈয়ারী করিয়াছেন।

সুবোধ রহস্য করিয়া বলিল, ওদের লুচি, সন্দেশ, চা, ডিম এই সব না হলে—

তপন বাধা দিয়া কহিল, একটুও কষ্ট হয় না। এখানে এসে যদি চপ-কাটলেট খাবার বায়না ধরি ত এ দেশে জন্মানোই আমার উচিত হয় নি। যারা বন্ধু তারা অনেক সময় শত্রুর মত আচরণ করে, কিন্তু মায়েরা সব সময়েই মা।

মা হাসিলেন, কেমন জব্দ!

কালিকেশ বঁ-হাতে মাদুর চাপড়াইয়া কহিল, ঠিক, ঠিক।

আভা তিনটি কাচের গ্লাস মাদুরের উপর নামাইয়া মাকে মৃদুস্বরে বলিল, সরবতের কথা ভুলে বসে আছ বুঝি!

মা সবিস্ময়ে কহিলেন, ওমা, তাইত! পোড়া মনও এমন, কোথায় প্রথমে সরবৎটুকু দেব, না বসে বসে গল্পই করচি।

কালিকেশ কহিল, তাতে কি? গল্প, সরবৎ, জলখাবার গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যেবেলায় কোনটাই কম নয়। তপনবাবু কি বলেন?

মা বলিলেন, তপনবাবু কি রে? তোকেও শহুরে-সভ্যতায় পেয়ে বসলো কালি?

আভা মুখে কাপড় চাপা দিয়া নিঃশব্দে হাসি লুকাইয়া ফেলিল।

কালিকেশ লজ্জিত না হইয়া কহিল, ওটা হচ্ছে অতিথির সম্মান, কি বল ভাই? বলিয়া ভিতরের সঙ্কোচটাকে প্রবল হাসির মাঝেই নিঃশেষ করিয়া দিল।

তপন হাসিয়া উত্তর দিল, তোমাদের ওই নদী পার হবার সময় শহরটাকে ওপারে রেখে এসেচি যে।

এমনই করিয়া কিছুক্ষণ গল্প চলিবার পর মা ও আভা উঠিয়া গেলেন। কালিকেশও কিছুক্ষণ পরে উঠিল। যাইবার সময় তপনকে বার বার করিয়া অনুরোধ করিয়া গেল, সকালে সুবোধের সঙ্গে সে যেন ও-দিক পানে বেড়াইতে যায়।

সুবোধ বলিল, আলোটা না-হয় নিয়ে যা, এইমাত্র মা বলছিলেন—

কালিকেশ অন্ধকারে অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। সেইখান হইতে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, ও-সব আমরা মন্তর জানি, সুবোধ-দা। দিনের বেলায় অসিত, আর্ত্তিমান, সুনীথকে স্মরণ করে রেখেচি। বলিয়া শিস্ দিতে দিতে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

সুবোধ তপনকে বলিল, কেমন লাগচে—পাড়াগাঁ?

তপন হাসিয়া উত্তর দিল, ঠিক তোমার মায়ের মত। নৌকো থেকে নেমে মাটিতে পা দিয়েই মনে হলো, আমার জন্যই বুঝি মাটি এমন নরম হয়ে রয়েচে।

সুবোধ বলিল, ট্রেণের বেগ মনে পড়চে না? নৌকোয় বসে ত বলছিলি হেঁটে যাওয়া যায় না?

তপন বলিল, এখন একখানা বই পেলে পড়তেও পারি!

সুবোধ বলিল, বটে! কাব্য, না—

তপন বলিল, নভেল। অতি সামান্য তার বিষয়বস্তু; এই ঘর-করনার খুঁটিনাটি নিয়ে লেখা।

সুবোধ হাসিতে হাসিতে বলিল, সাবাস।

সুবোধ চলিয়া গেলে তপন পাশ বালিশটায় মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল ও হাত দিয়া হ্যারিকেনের আলো স্তিমিত করিয়া দিল।

সুবোধের প্রাসাদ নাই। যদি থাকিত, এই বনের মাঝে সেই সুবৃহৎ পুরীর বিরাট স্তব্ধতা নিশ্চয়ই চারিপাশের বনজঙ্গলের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া ভয়াবহ প্রেতপুরীর বিভীষিকা জাগাইয়া তুলিত। গোল-পাতায় ছাওয়া চাল—মৃদু বাতাসে খড়-খড় শব্দ উঠে—অদূরে ঝিঁঝিঁপোকার রাগিণী ঝঙ্কারের মতই রহস্যময়। শাখায় শাখায় আলিঙ্গন-আবদ্ধ দেবদারুর পিট্ পিট্ ও ঝাউয়ের শোঁ-শোঁ শব্দ। আকাশভরা ঠাসাঠাসি নক্ষত্র—চুনিপান্নার মতই উজ্জ্বল। গাঢ় নীল সে আকাশ, কলিকাতার মত ফিকে নহে। তারায় তারায় যে অনুজ্জ্বল জ্যোতি —মাঝের শূন্য-পথ পর্য্যন্ত তাহাতে স্বল্পালোকিত। তির্য্যক্ সেই জ্যোতির রেখা দেবদারুর পত্রগুচ্ছে পড়িয়া চিক্ চিক্ করিতেছে। ও-পাশে বড় তারাটার আলো—এক চোখ বন্ধ করিয়া চাহিলে—অপর চক্ষুর পল্লবে আসিয়া মায়ের চুমার মত—স্নিগ্ধ স্পর্শ বুলাইয়া দেয়।

দাওয়ার কোল ঘেঁষিয়া কত গাছ মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া। হাত দিয়া তাহাদের ছুঁইবার

সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে অন্তর প্লাবিত হইয়া যায়। বন-জঙ্গলের কেমন একটা গন্ধ; ঈষৎ কটু—ঈষৎ তীব্র।

পুকুরপাড় হইতে 'হুম্' 'হুম্' শব্দে একটা পাখী ডাকিয়া উঠিল। গম্ভীর আওয়াজ, জল শুদ্ধ গুব্ গুব্ করিয়া উঠিল। ঝপ্ করিয়া জামগাছে কি একটা পাখী পড়িল। চালার উপর খড় খড় শব্দ বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইঁদুর নাকি? ঘরের পিছন হইতে অনবরত শব্দ উঠিতেছে, কট্-কট্—কটাস্।

তপন উঠিয়া আলোটা বাড়াইয়া দিল।

রান্নাঘর হইতে 'ছ্যাক্' 'ছ্যাক্' শব্দ আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ভর্জ্জিত দ্রব্যের সুগন্ধ। ঘরের মধ্যে বসিয়া উহারা মৃদুস্বরে গল্প করিতেছেন, কখনও বা হাসিতেছেন। হাসিগল্পের সঙ্গে কড়াইয়ের উপর খুন্তির ঠুন্‌ঠুন্ আওয়াজ উঠিতেছে—চুড়ির আওয়াজের সঙ্গে সুরের সঙ্গতি রাখিয়া। ছেঁচার বেড়া দিয়া জ্বলন্ত উনানের আলো ঘরের আনাচ-কানাচে উঁকি মারিতেছে। মাঝে মাঝে 'ম্যাও' 'ম্যাও' করিয়া একটা বিড়াল ডাকিতেছে।

এখানে একলা পড়িয়া থাকার চেয়ে ও-ঘরের দুয়ারে পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া খানিক গল্প করিয়া আসিলে ক্ষতি কি?

চিরদিনই বাড়ীর অবস্থা অন্যরূপ।

প্রকাণ্ড প্রাসাদের কোনদিকে রান্নাঘর, সে খোঁজ রাখিবার প্রযোজন হয় নাই। বাড়ীর মেয়েদেরও ধোঁয়া আগুন সহ্য করিয়া সেখানে গিয়া রান্না করিতে হয় না। দু'জন ঠাকুর আছে, তাহারাই সব করে।

লম্বা ভোজনকক্ষে সারি সারি আসন পাতিয়া জলের গ্লাস সাজাইয়া তাহারাই অন্নের থালা দিয়া যায়। মা আসিয়া কোন কোন দিন কাছে বসিয়া এটা ওটা ফরমাশ করেন। সব বন্দোবস্ত বাঁধা। বাটিখানেক দুধ, একটু ঘি, লেবু, রাত্রিতে লুচি ইত্যাদি।

আজ এইমাত্র জলখাবার খাওয়ার সঙ্গে যে মধুর স্নেহস্পর্শটি সে পাইয়াছে, তাহার অভিনবত্বে সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম সুশীতল হইয়া উঠিল। বাড়ীতে মা স্নেহ যে করেন না, এমন নহে। কিন্তু ঐশ্বর্য্যের আওতায় খণ্ডিত সেই স্নেহকে একান্তভাবে উপভোগ করিবার সৌভাগ্য আজও অবধি ত তাহার ঘটে নাই। বিজলীবাতির উগ্র আলোয় সারা বাড়ীটা দপদপ করিতে থাকে, স্তিমিত-জ্যোতি হ্যারিকেন জ্বালাইয়া পুত্রের প্রতীক্ষায় ব্যাকুল মন লইয়া তাঁহাকে ত কোনদিন পুকুরপাড়ে দাঁড়াইতে হয় নাই।

কেহ কোথা হইতে আসিলে মা প্রচুর জল-খাবারের আয়োজন করেন। খাওয়াইতে বসিয়া বার বার খাবার সম্বন্ধে ত্রুটি স্বীকার করিয়া অতিথিকে বিষম লজ্জা দেন। যে-ব্যবস্থার চেয়ে উৎকৃষ্টতর কিছু হইতে পারে না, তাহাই যদি অতি সামান্য বলিয়া ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব প্রচার করা যায় (এতদিন গর্ব্ব বলিয়া মনে না হইলেও, আজ সে মনে না করিয়া পারিল না) ত লজ্জায় মুখের কাছে হাত তুলিবার দুঃসাহস কোন্ অতিথিরই বা থাকে! ভিতরের সঙ্গে বাহিরের জাঁক-জমক ফুটাইয়া তুলিয়া একটা বিস্ময়ভরা সম্ভ্রম ও প্রশংসা লুটিয়া লইবার জন্য তাঁহাদের প্রাণপণ চেষ্টা!

দুই দাদা আহারে বসিয়া প্রতিদিনই বকাবকি করেন। ঠাকুর ভয়ে সম্মুখে আসিতে পারে না। মা বুঝাইতে গেলে তাঁহাকেও দু'কথা শুনিতে হয়। কয় সের মাছ কাটিয়া কয় টুকরা হইয়াছে, চাকর বামুন বাদ দিয়া বাড়ীর ছেলেমেয়েদের পাতে একটুকরা করিয়া দিলে—দু'বেলা সকলে পাইবে কিনা, দুধ ঘন করিয়া জ্বাল দিলে কতটুকুই বা হয় —ইত্যাদি বাঁধা ধরা নিয়মের কথা বুঝাইয়া গোল যোগের নিষ্পত্তি করেন। অপ্রসন্নমুখে আহার সারিয়া ছেলেরা উঠিয়া পড়ে।

যত্নের কথা উঠিলে বলেন, কেউ তো ছেলেমানুষ নয়, নিজের নিজের বুঝে-সুজে চলুক না।

দশ বছর বয়স হইলেই ছেলেরা স্বতন্ত্র শোবার ঘর পায়। বই, আলমারি, খাট, বিছানা—দরকারী আসবাব পত্র। স্বাবলম্বনের এমন উজ্জ্বল শিক্ষা মানুষ হইবার মুখে কি কম সহায়তা করে! মনের মধ্যে ধীরে ধীরে স্বতন্ত্র একটি ইচ্ছা জাগিয়া উঠে। এটি আমার, ওটি অন্যের।

সকাল-বিকাল পড়া তৈয়ারী করিয়া—অন্য ছেলেদের সঙ্গে হুড়াহুড়ি সারিয়া মাষ্টারের কাছে পাঠ লইতে হয়—নিয়মের একচুল এদিক-ওদিক হইবার জো নাই।

রাত্রিতে একলা ছোট বিছানায় শুইয়া প্রথম প্রথম মন উস্‌খুস্ করিত। ছেলেবেলা হইতে আত্মীয়-স্বজনের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে শেখার মধ্যে প্রচুর মিষ্টত্ব থাকে। সুকোমল শিশুচিত্ত—রূপকথার কাহিনী শুনিয়া নানা প্রশ্নে বহির্জগতের পরিচয় লাভ করিতে চায়। শুধু রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে মুখোমুখী করিয়া কোমল মনকে

দৃঢ় করিয়া গড়িলে উত্তর-জীবন হয়ত কর্ম্মঠ ও উন্নত হইয়া আদর্শ-চরিত্রে ইতিহাস সৃষ্টি করে; কিন্তু শুধু শহর লইয়া ত জীবন নহে। উজ্জ্বল বিজলী বাতিরই ম্লান অংশ—এই লণ্ঠনের আলো। প্রশস্ত পিচ-বাঁধানো রাজপথের শৈশব অবস্থা এইমাত্র বনরেখা-সজ্জিত অপরিসর কাঁচা পথের বুকে পা দিয়াই না স্মরণ হইল!

এমন মধুর প্রকাশ ত তপনের চোখে কোনদিন পড়ে নাই। হয়ত, ইহারই মধ্যে দুর্ব্বল মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুল প্রকাশ, তবু শহর যেমন পাড়া-গাঁ নহে, সেই মা-ও এই মা নহেন। ঐশ্বর্য্যের যবনিকাখানি তুলিয়া ধরিয়া সেই মাকে লণ্ঠন হাতে পুকুরধারে দাঁড় করাইয়া দিলে, তিনিও কি উতলা হইয়া 'লতার' ভয়ে ছুটিয়া আসিতেন না?

তপনের ভারি ইচ্ছা হইল, শহরের বিদ্যুৎঝলসিত প্রাসাদ-কক্ষ হইতে আবরণহীনা করিয়া সেই মাকে টানিয়া আনিয়া এই নিরাভরণ প্রকৃতির মাঝে অন্ধকার অঙ্গনতলে দাঁড় করাইয়া একবার দেখে, কিংবা দাওয়ায় এই মাদুরের প্রান্তে বসাইয়া তাহারই কোমল অঙ্কে মাথা রাখিয়া বলে, তুমি, তুমিই আমার মা। এই অন্ধকার আকাশ ও বনের গভীর নিস্তব্ধতার মাঝে বসিয়া গল্প করিয়ো না, শাসন করিয়ো না, জীবন-সম্বন্ধে কোনরূপ নির্দ্দেশও না; শুধু গাঢ়ঘন স্পর্শ চুলের মধ্য দিয়া শ্রান্ত মাথায় ঢালিয়া চোখের তন্দ্রাকে ঘনীভূত করিয়া বুঝিতে দাও, তুমি, তুমিই আমার মা।

* *

মা যেন ছেলের কামনা পূর্ণ করিতে সেইমাত্র শিয়রে বসিয়া মাথায় হাত দিয়া ডাকিতেছিলেন, ওঠ, ওঠ।

তপন উঠিয়া বসিল।

সুবোধের মা বলিলেন, সুবোধটা ত আচ্ছা! তোমায় এখানে একলা বসিয়ে রেখে দিব্যি রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে বসে গল্প করচে! আমায় বললে তুমি ঘুমিয়েচ।

তপন চোখ রগড়াইয়া বলিল, বেশ ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুম এসেছিল। বোধহয় অনেকক্ষণ ঘুমিয়েচি।

মা বলিলেন, চোখে মুখে জল দিয়ে নাও। খাবার হয়েচে, খাবে চল। পরে বলিলেন, ভাতই রাঁধলাম। একে গ্রীষ্মকাল, তায় তেতে-পুড়ে আসচ। সুবোধ বলে, ওরা রাত্রিতে ভাত খায় না; এই নিয়ে তার সঙ্গে খানিকটা ঝগড়াই হয়ে গেল। ছেলের শুকনো মুখ দেখে মা কি খাবার ব্যবস্থায় ভুল করে! মায়ের ব্যবস্থাতেই যে ওরা এত বড়টা হয়েছে—সে-কথা মাঝে মাঝে ভুলে যায়।

অদ্ভুত রান্নাঘর, অদ্ভুত তাহার দাওয়া। জিওল গাছের খুঁটি—পল্লববাহু মেলিয়াছে। সেই পল্লববিস্তারের মধ্যে শালিখ পাখী নীড় রচনা করিয়াছে। লণ্ঠনের আলো পাইয়া পাখীটা বার-কয়েক ডাকিয়া উঠিল। ডেড়কোর উপর রেড়ির তেলের প্রদীপ; আধ-অন্ধকার।

ঘরের পিছনে শব্দ উঠিল—কট্—কট্—কটাস।

মা বলিলেন, বাতাসে বাঁশঝাড় নুয়ে পড়চে—তারই শব্দ। হুতোমের ডাক শুনেচ, তপন?

একগ্রাস ভাত মুখে পুরিয়া তপন উত্তর দিল, হুঁ।

মা বলিলেন, জামগাছে বাদুড় পড়া দেখে সুবোধ বলছিল, তোমার ছেলে হয়ত ঘুম ভেঙে আঁতকে উঠবে। আমি বললাম, ষাট্! বালাই! কলকাতার ছেলে হলেও কি বাদুড় দেখেনি কখনও?

সুবোধ কৌতুকভরা স্বরে প্রশ্ন করিল, দেখেচ—তপন?

তপন সলজ্জে ঘাড় নাড়িল।

সুবোধ বলিল, জান মা, ওরাই বলে ধানগাছের তক্তায় দোর জানালা হয়।

মা বলিলেন, নে বাপু রঙ্গ রাখ। ওরা ঘাস খায় কিনা!

সুবোধ হাসিতে হাসিতে বলিল, ঘাস না খাক, ওর বিচি যে ওরা খায় না—একথা হলপ করে বলতে পারি।

আভা হাসিতে হাসিতে মুখে আঁচল দিল। মাও হাসিলেন।

তপনের গলায় 'বিষম' লাগিল।

মা 'ষাট' 'ষাট' করিয়া মাথায় বারতিনেক ফুঁ দিয়া কহিলেন, একটু জল খাও ত বাবা, 'বিষম' ছেড়ে যাবে।

তপন সামলাইয়া লইয়া বলিল, টেলিফোন নিয়ে ওঁর যা কাণ্ড একদিন। কলটা যত ক্রিং ক্রিং করে ডাকে, সুবোধ-দা ততই তার মাথা চাপড়ে বলে, wait, wait.

সুবোধ বলিল, তার ব্যবহার জানতাম না বলেই—

আভা হাসিতে হাসিতে বলিল, দাদা, এতদিন মিছেই কলেজে পড়ে পাস করেচ!

সুবোধ বলিল, সে কি আজকের কথা রে? তখন সবে কলকাতায় গিয়েচি। গল্পটা ওদের কাছে করেছিলাম বলে—যখন তখন আমাকে ওই নিয়ে জ্বালায়।

তপন বলিল, জ্বালাবে না? নৈলে ধানগাছের তক্তা না বানিয়ে তুমি ছাড়তে কিনা!

সকলেই হাসিয়া উঠিল।

হাসি-গল্পের মধ্য দিয়াই আহার শেষ হইল।

পূব-দক্ষিণ খোলা জানালার ধারে আড়াআড়ি করিয়া তক্তাপোষ পাতা। গোলপাতায় ছাওয়া ঘর, হাওয়ায় চালের উপর খড় খড় শব্দ উঠিতেছে। ঘরের মধ্যে আসবাবপত্র বেশী কিছু নাই। মাটির মেঝে পরিপাটী করিয়া নিকানো; কড়ির আলনায় লেপ তোষক প্রভৃতি শীতকালের শয্যা-উপকরণ গোছানো রহিয়াছে; তাহার নীচে কাঠের একটা বড় সিন্দুকের মাথায় কাঠের ছোট হাতবাক্স। পিতলের পিলসুজে তেলের প্রদীপ জ্বলিতেছে; ঘরটা আবছা-অন্ধকারে স্নিগ্ধ হইয়া আছে। সিন্দুকের ও-পাশে ছোট জলচৌকির উপর কয়েকখানা বাসন ঝকঝকে করিয়া মাজা, ক্ষীণ আলোতে চিক্ চিক্ করিতেছে। তার পাশেই পানের ডাবর। তক্তাপোষের দুইধারে কাঠের দেওয়াল-আলনা; কাপড়জামাগুলি সুবিন্যস্ত করিয়া গোছানো। শয্যায় শুইয়া গল্প শুনিতে সত্যই আরাম বোধ হয়।

কিন্তু মা যখন এ-ঘরে আসিলেন, তখন দুইজনেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মশারি খাটানো হয় নাই, মাঝে খানিকটা জায়গা খালি পড়িয়া আছে। ঈষৎ হাসিয়া মা হাতপাখা তুলিয়া লইয়া খুব খানিকটা বাতাস দিয়া ধীরে ধীরে মশারি ফেলিয়া দিলেন ও বিছানার চারিপাশের ধারগুলি গুঁজিয়া আলোটাকে স্তিমিত করিয়া সন্তর্পণে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

দুরন্ত ছেলেরা ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া মাতৃসোহাগের স্বপ্ন দেখুক।

প্রত্যুষের শীতল বাতাসে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শূন্য শয্যা, সুবোধ নাই। ছোট জানালা দিয়া অপরিচিত দেশের ঝিরঝিরে হাওয়া ও কোমল আলো আসিতেছে। চোখ বুজিয়া খানিক পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা করে না। কলিকাতায় করিত। বাতায়ন-বাহিরে অন্তর্হিত উষার পেলব পদচিহ্ন। ঝোপ-জঙ্গলে এখনও ঘোর-ঘোর লাগিয়া আছে। আম-কাঁঠালের বাগানের ফাঁকে ফাঁকে সুদূর-বিস্তৃত মাঠের বুকে আলোর বন্যা। পূর্ব্বদিকের আকাশ লাল টকটকে—সূর্য্য উঠিতে আর বিলম্ব নাই।

সহসা উঠানের উপর দৃষ্টি পড়িল। সাদা কাপড়ে গাছকোমর বাঁধিয়া উঠানের উপর বসিয়া সুবোধের মা গোবরজলভরা হাঁড়িতে ন্যাতা ডুবাইয়া উঠান নিকাইতেছেন। কলিকাতার বাড়ীতে এ-সময়ে একটা হৈ-চৈ উঠে। কলের জলের ছড় ছড় আওয়াজ, বালতি সরানোর শব্দ, ঝি চাকরের চীৎকার, সিমেণ্টের মেঝের উপর রূঢ় সম্মার্জ্জনীর কর্কশ আঘাত, ধপ ধপ করিয়া কাপড় কাচা, কচি ছেলেদের কান্না······চোখ কান বন্ধ করিয়া খানিক ঘুমাইতে ইচ্ছা করে। সে-সমস্ত থামিলে তবে তপন উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া চা খাইয়া পড়িতে বসে।

সুবোধের মা হাঁড়ি ন্যাতা লইয়া অতি নিঃশব্দে সমস্ত উঠান ও ঘরের দাওয়া নিকাইয়া ফেলিলেন। পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উঠিতেই—তাল-নারিকেল গাছের ফাঁক দিয়া কোমল কিরণ আসিয়া সেই গোময়লিপ্ত উঠানের শোভা শতগুণ বাড়াইয়া দিল। পাড়াগাঁয়ের প্রভাত প্রতি গৃহস্থের ভবনে প্রতিদিনই হয়ত এমন সুচারু অভ্যর্থনা পাইয়া থাকে।

সুবোধ গেল কোথায়?

বিছানা হইতে নামিতেছে, এমন সময় আভা ঘরে ঢুকিয়া কহিল, চা খাবেন কি?

তপন মৃদু আপত্তি করিল, না, না, এ-সময়টা আর ষ্টোভ জ্বেলে কাজ নেই।

আভা হাসিয়া বলিল, আমরা ষ্টোভ জ্বেলে চা তৈরী করি বুঝি? দেখুন, নারকোল পাতার রাশ পড়ে আছে। ঝাঁটার জন্য কাঠিগুলো চেঁচে নিয়ে পাতাগুলো ঝুড়ি বোঝাই করে রেখে দিই। দুধ জ্বাল, চা তৈরী—সব ওতে হয়।

তপন জিজ্ঞাসা করিল, সুবোধ কোথায়?

আভা বলিল, বোধহয় বেরিয়েছে। বাড়ী এলেই দাদা ভোর বেলাটায় হয় মাঠে—নয় নদীর ধারে কাটিয়ে দেয়। আজ আপনাকে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। হাতমুখ ধোবেন? চলুন না পুকুর দেখিয়ে দিচ্ছি। না, জল এনে দেব?

—না, না, পুকুরই ভাল।

—দাঁতন করবেন, না মাজন দেব?

—মাজনই ভাল।

আভা পথ দেখাইয়া চলিল।

পুকুর ছোট। অন্য দেশ হইলে ডোবাই

বলিত। জল বড় জোর হাঁটুভোর হইবে; গ্রীষ্মের উত্তাপে সে-টুকুও শুকাইতে আর বিলম্ব নাই। এদিকের ঘাটটি শান বাঁধানো।

গাড়ু গামছা মাজন চাতালের উপর গুছাইয়া রাখিয়া আভা সরিয়া গেল।

হাত মুখ ধোওয়া শেষ হইতেই আভা আসিল।

পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে কিসের একটা ঝোপ দেখাইয়া তপন বলিল, ওটা কি? বেশ পাতাগুলি—হাত দিতেই কাঁটা ফুটে গেল।

আভা উত্তর দিল, ও যে বেতগাছ, কাঁটা ত ফুটবেই।

তপন জিজ্ঞাসা করিল, বেতগাছ? ওরই কি ছড়ি হয়?

হাঁ, হয়ই ত। আবার ওই কচি বেতের ডগার সুক্তো এমন চমৎকার হয়।

সুক্তো! এত বয়স হইযাছে, রসনা পরিতৃপ্তির জন্য যে বিবিধ উপকরণ তৈয়ারী হয়, তপন তাহার কোনটাই বা জানে! রেষ্টুরেণ্টের কল্যাণে চপ, স্যাণ্ডউইচ, ডেভিল, পুডিং, কোর্ম্মা, কারি অজানা নহে; বাড়ীতেও ভাজা, ডালনা, ঝোল নিত্যকার বন্দোবস্ত মত পাওয়া যায়; কিন্তু সুক্তো?

কাল রাত্রিতে কয়েকটা অদ্ভুত তরকারি সে খাইয়াছে বটে, ভালও লাগিয়াছিল, কিন্তু কোন্‌টা কি জিজ্ঞাসা করিতে বাধ-বাধ ঠেকিয়াছিল। যে সুবোধ! ধানগাছের তক্তো লইয়া যখন-তখন পরিহাস করে।

সুক্তো থাক, একগাছি ভাল বেত ছড়ির জন্য সে সংগ্রহ করিবে।

চা তৈয়ারী হইয়া গিয়াছিল। সুন্দর চা। গরুর টাটকা দুধে তৈয়ারী—রংটা চাঁপাফুলের মত হইয়াছে।

চায়ের সঙ্গে এ সব কি আবার?

আভা হাসিয়া বলিল, তা হোক, খেতে পারবেন। ও-বাড়ীর রাঙা দাদা পরশু দার্জ্জিলিং থেকে এসেছেন। কিছু কপি কড়াইশুঁট পাঠিয়ে দিলেন। মা বললেন, ভালই হোল—ওঁদের জন্যে কচুরি শিঙাড়া হবে'খন।

তপন কচুরি মুখে দিয়া বলিল, এত সকালে এ সব করলে কখন?

কেন, ভোরে উঠে নেয়ে নিয়ে সব গুছিয়ে রেখেছিলাম যে। চা ভাল হয়নি বুঝি?

চমৎকার হয়েচে। পাড়াগাঁয়ে এমন ভাল চা হয়—এ-ধারণা আমার ছিল না।

আভা মুখ ফিরাইয়া বলিল, আমরাই কি ভাল জানতাম! দাদাই তো শিখিয়ে দিয়েচে।

তপন কহিল, কিন্তু সে গেল কোথায়?

অদূরে কাহার চীৎকার শোনা গেল।

আভা ব্যস্ত হইয়া কহিল, কালি দা আসচে। এখনই সব লণ্ডভণ্ড করে দেবে—যে অস্থির!

তপন হাসিতে হাসিতে কহিল, বেচারা এক কাপ চা-ও পাবে না?

আভা মুখ গম্ভীর করিয়া উত্তর দিল, হুঁ, চা খায় কিনা! উল্টে এমন লেকচার ঝাড়ে। কালি-দা দু'চক্ষে শহর দেখতে পারে না।

কালিকেশ উঠানে দাঁড়াইয়া ডাকিল, সুবোধ-দা কোথায়, জেঠাইমা? এখনও ঘুমুচ্চে বুঝি?

আভা তাড়াতাড়ি চায়ের সরঞ্জাম গুছাইয়া অন্য দুয়ার দিয়া বাহির হইয়া গেল।

কালিকেশ ঘরে ঢুকিয়া বলিল, একি, তুমি একলা যে?

তপন বলিল, আসামী বহুক্ষণ পলাতক।

কালিকেশ বলিল, কাল রাত্রিতে যা বলে গিয়েছিলাম—ভুলে গেছ বুঝি? বসে—বসে—বসে কতক্ষণ কাটালাম, তোমরা এলে না! অগত্যা আমাকেই বেরুতে হলো।

তপন বলিল, কি একটা মজার প্ল্যান তোমার মাথায় এসেছিল না?

কালিকেশ বিছানায় বসিয়া দ্রুতকণ্ঠে বলিল, সব মাটি, সব মাটি! ভেবেছিলাম সূর্য্য ওঠবার আগে তোমরা যাবে—চাঁড়ালদের পোড়ো ভিটের ওপর দাঁড়িয়ে তোমায় দেখাবো।

তপন বলিল, তবু বল-ই না শুনি?

কালিকেশ মুখে অবজ্ঞাব্যঞ্জকধ্বনি করিয়া কহিল, শোনা আর দেখা! পোড়ো ভিটের ওধারে জমিটা ঢালু হয়ে নেমে রায়দীঘির কোলে গিয়ে শেষ হয়েচে। মস্ত পুকুর—যেন নদীর টুকরো। তেমনি পুরনো, কালো মিশমিশে জল। পানফল কলমির দামে চারপাশের জলটুকু দেখবার জো নেই, কেবল মাঝখানটায় তক্‌তকে জল। এমন আশ্চর্য্য—ওই দশ-বার হাত জলের মধ্যে একটুকরো দামও গজায়নি কোনদিন। পুকুরের উত্তর-দক্ষিণ কোণে ঘন বেত, আশ্‌শ্যাওড়া ও চিরচিরের বন, কিন্তু পুবের মাঠ একদম খোলা। যখন প্রথম সোনার থালার মত সূর্য্য ওঠে, মাঝখানের জলটুকুতে কে যেন একখানা লাল

থালা বসিয়ে দেয়। এমন সুন্দর—মুগ্ধ কালিকেশ কথা শেষ করিতে পারিল না।

তপন জিজ্ঞাসা করিল, চা খাবে এক কাপ?

কালিকেশ বলিল, না।

তপনের ইচ্ছা হইল, চায়ের সম্বন্ধে তর্ক তুলিয়া কালিকেশের সঙ্গে খানিক গল্প করে। কহিল, কেন, শরীরটা বেশ ঝরঝরে হয়ে যাবে।

কালিকেশ হাসিয়া বলিল, তা হয় বটে। সঙ্গে সঙ্গে ইহকাল পরকাল।

তপন হাসি চাপিয়া গম্ভীর মুখে বলিল, কেন চা খাওয়া পাপ নাকি?

কালিকেশের চক্ষু ক্ষণেকের তরে জ্বলিয়া উঠিয়া নিবিয়া গেল। ধীরস্বরে বলিল, হয়ত পুণ্য। কিন্তু পুণ্য অর্জ্জনের শক্তি সকলের ত সমান নয়।

তপন বলিল, অক্ষমতার কারণ?

কালিকেশ আর আত্মদমন করিতে পারিল না। ঈষৎ ঝাঁজালো স্বরেই বলিল, কারণ আমরা পাড়াগাঁর লোক। সভ্যতা বুঝি না- উন্নতি বুঝি না। চায়ের পয়সায় কত দেশ ওপরে উঠে গেল, জাভার চিনিতে বাংলার কারখানা ভেঙ্গেচুরে কোথায় ভাসিয়ে দিলে—চোখ বুঁজে চায়ে চুমুক দিতে দিতে এ-সব কথা হয়ত কোনদিন ভাবতেও পারব না। তবু তপনবাবু, যে আগুন অন্ধকারকে উজ্জ্বল করে, সে আগুনের তলায় কত কাঠ কয়লা যে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, এ-খবরটা রাখতে আমরা ভুলে যাই কেন? তাই ত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সব ওই চায়ের সঙ্গে ঝরঝরে হয়ে আসচে।

কালিকেশ রাগ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

রহস্য করিতে গিয়া একি দুর্ব্বিপাক! তপন অপ্রতিভ হইয়া ভাবিতে লাগিল, কালিকেশকে ডাকিবে কিনা? এমন সময় হাসিতে হাসিতে সে নিজেই ফিরিয়া আসিল।

ঘরে ঢুকিয়াই তপনের হাতে প্রবলভাবে একটা ঝাঁকুনি দিয়া বলিল, মাপ কর ভাই। আমার একটা বদ অভ্যাস, নিজের মতটাকে সবচেয়ে বড় মনে করি। তর্কের স্থলে ত বটেই। কৈ রে, আভা মুখপুড়ি—চায়ের আনুষঙ্গিকগুলো রাখলি কোথায়?

রান্নাঘর হইতে উত্তর আসিল, যাই।

শিঙাড়া কচুরি খাওয়া শেষ হইলে কালিকেশ বলিল, বিশ্রী রোদ উঠলো, বেড়াতে যাবে নাকি?

তপন বলিল, তা হোক, বাগানের মধ্যে গাছের ছায়ায় ছায়ায়—

কালিকেশ অকস্মাৎ উৎফুল্ল হইয়া বলিল, তার চেয়ে এক কাজ করা যাক। চল, ডাব পাড়িগে।

তপন বলিল, গরম চা'য়ের পর ডাব।

কালিকেশ সে কথায় কান না দিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল, আভা, ওরে আভা—একখানা দা নিয়ে আয় ত। শীগ্‌গির।

দা আসিল। কালিকেশ তপনকে লইয়া বাগানে প্রবেশ করিল।

ডাব খাওয়া শেষ করিয়া ফিরিতেই তপন দেখিল, উঠানের উপর কতকগুলি ছেলে জড়ো হইয়া জটলা করিতেছে। তাহাদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া হাত মুখ নাড়িয়া সুবোধ কি বুঝাইতেছে। কালিকেশ চীৎকার করিয়া ডাকিল, সুবোধ-দা, মাছ বুঝি? খুব বড়? ক'সের হলো?

সুবোধ কালিকেশকে ডাকিল, এদিকে আয় ত রে,—আভা কুটতে পারচে না, যে ভারি।

কালিকেশ দুই লম্ফে ভিড়ের সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিল, আভা পারে শুধু রাঁধতে আর ঘর ঝাঁট দিতে। ওঠ—আর কাঁদুনি করতে হবে না।

আভা উঠিয়া দাঁড়াইল। অতিপরিশ্রমে তাহার সারা মুখ-খানিতে কে যেন সিন্দুর গুলিয়া দিয়াছে, টস্ টস্ করিয়া ঘাম প'ড়তেছে। অল্প হাঁপাইতে-ছিল বলিয়া কালিকেশের কথার কোন উত্তর দিল না।

কালিকেশ বঁটির উপর বসিয়া কৌশলী জেলের মত কান্‌কো ধরিয়া মাছটার মাথা কাটিয়া ফেলিল এবং বড় বড় কয়েকটা টুকরা করিয়া সর্ব্বশেষে আঁশ ছাড়াইতে লাগিল। মাছের তেল হইতে পিত্তটাকে আলাদা করিয়া একপাশে রাখিয়া দিল ও বড় পটকা লইয়া ছেলেদের দিকে ছুড়িয়া দিল। ছেলেরা আনন্দে কলরব করিয়া উঠিল।

মা দাওয়া হইতে বলিলেন, কালি, বাড়ীতে বলে আয়—আজ এইখানেই খাবি। সুবোধ, ছেলেদের হাতে দু'খানা করে মাছ দিতে বল আভাকে।

মাছ কোটা শেষ করিয়া কালিকেশ বলিল, একটু সরষের তেল দাও ত জেঠাইমা। অমনি স্নানটাও সেরে আসি।

সুবোধ বলিল, বেশী করেই তেল দাও মা, আমরাও নেয়ে নিই।

মা কাঁচের বাটিতে তেল ঢালিতে ঢালিতে বলিলেন, তপন কি পুকুরে নাইতে পারবে? নতুন জল—সর্দ্দিটর্দ্দি লাগতে পারে।

সুবোধ বলিল, কেন, বেশত পুকুর। না হয় কবিরাজদের বড় পুকুরে যাই।

মা বলিলেন, তার চেয়ে—বামুন পাড়ায় নিয়ে যা; টিউবওয়েলের জল ভাল, নেয়েও তৃপ্তি পাবে।

আভা সাবানের বাক্স ও ধুঁধুলের জালি নামাইয়া দিয়া বলিল, নাও কালি-দা।

কালিকেশ তপনের অলক্ষ্যে ভ্রূকুটি করিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিতে লাগিল। যেন সে-কথা শুনিতেই পায় নাই।

আভা নিঃশব্দে হাসিয়া সাবানের বাক্সটা সুবোধের হাতেই তুলিয়া দিল।

বেলা তিনটা বাজিতে-না-বাজিতে কালিকেশ চঞ্চল হইয়া উঠিল, ওহো আজ যে কপালীপাড়ার সঙ্গে স্কুলের ম্যাচ আছে। আমাকেই গ্রাউণ্ড ম্যানেজ করতে হবে। যাবে সুবোধ-দা?

সুবোধ জিজ্ঞাসা করিল, ক'টায় আরম্ভ হবে?

কালিকেশ বলিল, টাইম দেওয়া আছে সপাঁচটা, কিন্তু সবাই এসে জুটতে সাড়ে পাঁচটা হবে। তপনকে নিয়ে যেয়ো কিন্তু।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া কহিল, এ তোমাদের কলকাতার I.F.A. এর ক্যালক্যাটা-মোহনবাগানের চ্যারিটি ম্যাচ নয়। তা বলে তার চেয়ে কম interestingও নয়।

তপন কৌতুকভরে বলিল, playerদের চায়ের ব্যবস্থা থাকে ত?

কালিকেশ হাসিয়া বলিল, দেশী মতে লেবু নুন।

তপন বলিল, খেলাটা যখন এ-দেশের নয় তখন টিফিনটা দেশী মতে না করলেই ক্ষতি কি?

কালিকেশ যাইতে যাইতে বলিল, এ-তর্কের জের সন্ধ্যে বেলায় টানবো।

কালিকেশ চলিয়া গেলে সুবোধ বলিল, পাগল! ওর অদ্ভুত ধারণার কথা যত শুনবে ততই তুমি অবাক হবে। ও-হচ্ছে সেই দলের লোক যারা শহরের সব কিছুই মন্দ চোখে দেখে, পাড়াগাঁর দোষ যাদের চোখে পড়ে না। কালই শুনেচ ত ওর দিদিমা মারা যাওয়ার রাত্রিতে জল ঝড় বলে—এক প্রাণী দাহ করতে যায় নি, তবু তাদের ওপর ওর একটুও অভিযোগ নেই।

তপন বলিল, এ রকম অন্ধভক্তিরও একটা সার্থকতা আছে।

সুবোধ বলিল, ভক্তি হিসেবে হয়ত সার্থক কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে সে ভক্তির মূল্য অকিঞ্চিৎকর। অতিভক্তি আর কিছুর লক্ষণ না হোক—অনেক সময় বিপত্তি ঘটায়।

তপন বলিল, তবু তার forceকে তুমি অস্বীকার করতে পার না। চুলচেরা বিচার করে কাজে নামতে গেলে শেষ অবধি হয়ত কাজ করাই ঘটে ওঠে না, কিন্তু খানিকটা আবেগ যদি তার সঙ্গে থাকে ত দুরূহ কাজও সহজ হয়ে আসে।

সুবোধ বলিল, লেখাপড়ায় কালিকেশ ব্রিলিয়াণ্ট। সব কাজেই ওর দক্ষতা অসাধারণ। যখন মাতে, পরিপূর্ণভাবে দেহ মন প্রাণ ঢেলে দেয়। মাছকোটা রান্না থেকে স্কলারশিপ নিয়ে পাস করা ওর পক্ষে সমান সহজ।

আভা ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, চায়ের জল চড়াবো?

তপন বলিল, না। অন্তত যে কদিন এখানে থাকবো—ও পাট আর নয়।

আভা হাসিল, কালি-দার হাওয়া গায়ে লাগল বুঝি আপনার?

তপন বলিল, সত্যিই তোমার কালি-দার ওপর শ্রদ্ধা জেগেচে, সেইটুকু নিয়েই এখান থেকে যাব মনে করচি।

খেলা আরম্ভ হইতে আধঘণ্টা বিলম্ব ছিল। প্রকাণ্ড মাঠ—লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। কেহ ছাতা পাতিয়া, কেহ গাছের ডাল ভাঙিয়া বসিবার আসন করিয়া লইয়াছে। আসনে বসিয়া বিড়ি টানিতে টানিতে সঙ্গীর সঙ্গে ভবিষ্যৎ-খেলার অদ্ভুত আলোচনা করিতেছে।

কালিকেশ ভারি ব্যস্ত। দুই পক্ষকে যথাস্থানে দাঁড় করাইয়া খেলা আরম্ভ করিবার জন্য হুইস্‌ল দিল।

টস্ করিয়া খেলা আরম্ভ হইল।

চারিদিকে কি চীৎকারধ্বনি। কোথায় লাগে কলিকাতার বড় ম্যাচ। যদি কেহ কোন বল miss করিল ত সে কি অভদ্র গালাগালির হুঙ্কার। খেলোয়াড়ের জান শক্ত না হইলে এই সব কটু গালাগালি সহ্য করিয়াও বলের পিছনে দৌড়াইবার ধৈর্য্য ও সামর্থ্য থাকে না।

কালিকেশ শহরকে অগ্রাহ্য করিলে কি হইবে? কালস্রোতকে হাত দিয়া ঠেলিবার শক্তি মানুষের নাই। পাড়াগাঁ শহরের অভিমুখে প্রবলবেগে ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে—একদিন নাগাল পাইবেই।

বেচারা কালিকেশ

খেলা শেষ হইল, সূর্য্যও ডুবিয়া গেল।

সুবোধ বলিল, চল, বাড়ী ফেরা যাক। কালিকেশের অপেক্ষা করতে গেলে আরও ঘণ্টাখানেক দেরি হবে!

গ্রামের মধ্যে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। বড় তেঁতুলগাছ তলাটায় ও গুল্মঘেরা আম-কাঁঠালের বাগানে—সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যপথে বর্ষাসন্ধ্যার অপ্রসন্নতা। পথ চলিতে মনে হয়, নির্জ্জন সমাধিস্তূপের উপর দিয়া চলিতেছি। চারি পাশের বিরাট গাম্ভীর্য্য ও আবছা অন্ধকারে প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে। দুর্ভেদ্য অন্ধকারে চরাচর লুপ্ত হইয়া গেলে সে দৃশ্য তত কটু লাগে না, কিন্তু এই আবছা স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার, ঝিঁঝিঁপোকার ডাক, উইচিংড়ার একটানা শব্দ, শুকনো পাতার উপর ইঁদুর বা কাঠবিড়াল চলিবার খড়খড়ানি—সব মিলিয়া প্রাণে নিরানন্দের সৃষ্টি করে।

কুটীরগুলিতে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলিতে সুরু হইয়াছে, শঙ্খধ্বনিও সন্ধ্যাবন্দনা গাহিয়া উঠিল।

সুবোধের বাড়ীতে সেইমাত্র সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলিয়াছে। দুয়ারের চৌকাঠে গঙ্গাজল ছিটাইয়া গোয়ালের গরুগুলিকে জাবনা মাখিয়া দিয়া আভা বাখারির আগড়টা বন্ধ করিয়া দিল।

ও-দিকে পরিষ্কার তুলসীতলায় মাটির প্রদীপটি রাখিয়া মা গলবস্ত্রে প্রণাম করিতেছেন। প্রদীপের আলোয় মুখের যে-টুকু দেখা যায়, সেটুকু নিষ্ঠা ও ভক্তিতে কমনীয়; প্রণাম ও প্রার্থনার গাঢ় অভিনিবেশে ধ্যানমগ্ন।

কি চাহিতেছেন তিনি? প্রতিদিনকার কর্ম্ম অন্তে ক্ষুদ্র সংসারের উন্নতিশ্রী, পুত্রকন্যার শারীরিক ও মানসিক কল্যাণ। আসন্ন রাত্রির অঙ্কে সুকোমল নিদ্রায় তাহাদের জন্য একটি করিয়া মধুর স্বপ্ন।

হায়রে রাজধানীর সন্ধ্যা! গ্যাসের তাড়া খাইয়া যদি বা গৃহকোণে ভীরুর মত আশ্রয় লইতে যাও, বিজলীবাতির তীক্ষ্ণ শরে পঞ্চত্ব পাইতে তোমার একটুও বিলম্ব হয় না। পথে ধূলা কোথায়? বৈকালে পাইপে জল ঢালিয়া পিচের পথ ভিজাইয়া দেয়। গৃহে গৃহে মঙ্গলশঙ্খ যদি বা বাজে—মোটরের হর্ণে, ফেরিওয়ালার চীৎকারে, মাঠপ্রত্যাগত ছেলেদের কলরবে ও কলঘরে কাপড়-কাচার শব্দে সে ক্ষীণধ্বনি কোথায় ডুবিয়া যায়!

মা প্রণাম সারিয়া তুলসীতলার মাটি তপন ও সুবোধের মাথায় ছোঁয়াইয়া বলিলেন, বোস।

সেই দাওয়ায়—সেই মাদুর। আভা অনতিবিলম্বে সেই হ্যারিকেনটা জ্বালিয়া পৈঠার উপর রাখিয়া দিল। দাওয়া ছুঁইয়া বুনো গাছগুলি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া, উপরে উজ্জ্বল নক্ষত্রদ্যুতি দেবদারুপত্র স্পর্শ করিয়া পুকুরজলে চিক্ চিক্ করিতেছে। গাছের শাখা দোলাইয়া বাতাসও এতক্ষণে দেখা দিল। কোলাহল নাই, আড়ম্বর নাই, চাঞ্চল্য নাই, ত্বরা নাই। শান্ত নিরীহ পল্লীর উপর আশীর্ব্বাদের স্নিগ্ধধারাটি নিঃশব্দে আকাশসীমা হইতে ধরণীপ্রান্ত পর্য্যন্ত কোমল করিয়া তুলিতেছে।

পুরা একটি দিন পাড়াগাঁয়ে কাটিয়া গেল।

* * *

শান্ত সন্ধ্যায় বটানিক্যাল গার্ডেনের দুঃস্মৃতি ডুবিয়াছে। ধন ঐশ্বর্য্যের বিপুলতা ও আড়ম্বর-প্রিয়তাকে মনে হইতেছে, কাহিনী। সত্য রূপ যদি কোথাও থাকে ত এই পল্লীপ্রান্তরে—তৃণলতায়, ঝোপে-জঙ্গলে, নদীতীরে, প্রভাতগোধুলি-মাখা সঙ্কীর্ণ মেঠোপথে। প্রকৃত রূপ—আকাশে, তারায়, চন্দ্রে ও সূর্য্যে, নিঃশব্দ মৌন অন্ধকারে, প্রখর মধ্যাহ্নে ও অতলস্পর্শ রাত্রির রহস্যলীলায়!

যান্ত্রিক শহরের যন্ত্রধ্বনিময় অবয়বে এ-সব ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য খুঁজিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

সেদিন মধ্যাহ্নে আমবাগানের মধ্যে মজলিস বসিয়াছে। বড় আমগাছতলায় খেজুর চাটাই বিছাইয়া তপন ও সুবোধ আম ছাড়াইতেছে। আভা ছোট জলের বালতিটাতে আমগুলি ধুইয়া প্লেটে সাজাইয়া রাখিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে গল্প ও আহার দুই চলিতেছে। এমন সময় হৈ হৈ করিয়া কালিকেশ আসিল। প্রথমটা আমের টুকরাগুলি হুড়াহুড়ি করিয়া মুখে পুরিল, পরে আভার পানে চাহিয়া কহিল, কোন্ গাছের আম রে? কে পাড়লে?

আভা বলিল, পাড়বে আবার কে, টুপটাপ করে আপনিই পড়চে।

কালিকেশ হাসিয়া বলিল, দূর, পড়া আম কখন ভাল লাগে? ওই বোম্বাই গাছটায় উঠে কোঁচড় ভরতি করে আনছি, দাঁড়া। বলিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইল।

আভা পিছনে পিছনে নিষেধ করিতে করিতে গেল, উঠো না, উঠো না বলচি ও গাছে।

কালিকেশ বিস্মিতস্বরে বলিল, কেন রে?

আভা বলিল, যা লাল পিঁপড়ের ঝাঁক আছে, ছ্যাক-ব্যাকা করে ধরবে। ওই দেখছ না—গোল গোল পাতায় ঘেরা ওদের ঘর।

কালিকেশ বলিল, বটে! তা এতদিন বলিস নি কেন মুখপুড়ি! লাল পিঁপড়ের ডিমে যে খাসা মাছের টোপ হয়। মাছ ধরতে জান তপন?

তপন হাসিল। পাড়াগাঁর কোন্ কাজটাই বা সে জানে!

কালিকেশ বলিল, আচ্ছা, কবিরাজদের পুকুরে নিয়ে যাব কাল। বলিতে বলিতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গাছে গিয়া উঠিল সারি সারি লাল পিঁপড়া—গাছে উঠিয়া আম পাড়ে কাহার সাধ্য? কিন্তু কালিকেশ বাধা গ্রাহ্যও করিল না; নিঃশব্দে উঠিতে লাগিল। মুশকিল হইল আম পাড়িবার সময়। ডাল নাড়ার শব্দে ক্রুদ্ধ পিঁপড়ার দল সার বাঁধিয়া দ্রুতবেগে কালিকেশকে আক্রমণ করিল। প্রথমটা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সে আম পাড়িতে লাগিল। পিঁপড়ার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গেলে আম একটিও পাড়া হইবে না, লাভে হইতে তাহাকে ক্ষতবিক্ষত হইয়া অবতরণ করিতেই হইবে। রক্তবীজের বংশ মারিয়া শেষ করা অসম্ভব। কোঁচড় ভর্তি হইলে কালিকেশ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া সুবৃহৎ এক আমের শাখা ভাঙ্গিয়া লইল এবং প্রবলবেগে চারিধারে আঘাত করিয়া লাল পিঁপড়া বধ করিতে লাগিল।

আভা ভীত হইয়া কহিল, কর কি, কর কি, শীগ্‌গির নাম।

কে নামিবে? নিষ্ঠুর আমোদ কালিকেশকে তখন পাইয়া বসিয়াছে। অবিশ্রান্ত শাখা সঞ্চালনে পিঁপড়াবাহিনী আজ সে ধ্বংস করিবেই। কিন্তু ক্ষুদ্র শত্রুরা মার খাইয়া একটুও দমিল না—শ্রেণীবদ্ধভাবে কালিকেশকে আক্রমণ করিল। আঘাতে আঘাতে প্রথম শাখা নিষ্পত্র হইয়াছিল, দ্বিতীয় শাখা ভাঙ্গিবার মুহূর্তে কালিকেশের সারা-দেহ লাল রঙে ভরিয়া গেল। শাখা ভাঙ্গা হইল না। কালিকেশ দ্রুত অবতরণ করিতে লাগিল। কোঁচড়-গ্রন্থি খুলিয়া আমগুলি মাটিতে পড়িয়া গেল ও বহু উচ্চ হইতে কালিকেশ লাফাইয়া পড়িল। আভার তখন হাসিতে হাসিতে দম বন্ধ হইবার জো। কেমন জব্দ! যেমন কথা না শুনিয়া গাছে উঠিয়াছিলে!

গা হাত মুখ ঝাড়িয়া কালিকেশ আভার সম্মুখীন হইয়া সহসা ধাঁ করিয়া তাহার গালে একটি চড় মারিয়া কহিল, বাঁদরী মেয়ে, আর হাসবি?

ক্রোধে আভার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। ও-ধারে তপনের সঙ্গে দাদা বসিয়া আছেন, তাঁহারাই বা কি মনে করিবেন!

সে-ও ক্রোধে মুখ ভেঙাইয়া বলিল, বেশ করবো, হাসবো। ভারি বীরপুরুষ! পিঁপড়ে মারতে পারলেন না—যত মদ্দানী আমার ওপর।

কালিকেশ আরও চটিয়া আভার চুলের মুঠি ধরিয়া প্রবলবেগে নাড়িয়া দিতেই আভা যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিল।

ও-দিক হইতে সুবোধ হাঁক দিল, কি রে?

কালিকেশের ক্রোধে কে যেন জল ঢালিয়া দিল। কিন্তু আভাকে সান্ত্বনা দিবার পরিবর্তে চোখ রাঙাইয়া শাসন করিল, বুড়ো মেয়ের কান্না দেখ! ফের প্যান্‌প্যান্ করলে দেব এমন এক ঘুঁষি, দাঁতপাটি উড়ে যাবে। আমি যাচ্ছি, কিন্তু খবরদার, ফিরে এসে যদি শুনি—, বলিয়া অসমাপ্ত কথার সঙ্গে সঙ্গে বেড়া ডিঙাইয়া ও-পিঠে গিয়া পড়িল।

সুবোধ নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কালি অমন করে পালালো কেন? তুই বা কাঁদচিস কেন?

আভা পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, ওই আমের বোঝা ওপর থেকে আমার পিঠে ফেলে দিলে, লাগে না বুঝি?

সুবোধ বলিল, কালির কি হলো?

আভা হাসিয়া বলিল, দেখচ না লাল পিঁপড়ের ঝাঁক, এমন কামড়েছে যে, লজ্জায় পালাতে পথ পেলে না। বেশ হয়েচে! বলিয়া পরম উৎসাহে আম কুড়াইতে লাগিল।

সুবোধ হাসিয়া বলিল, এমন পাগলও দেখিনি!

আম কুড়ানো শেষ হইলে তিনজনে চাটাই-বিছানো গাছতলায় বসিয়া হাসি-গল্পে আমের সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল।

কালিকেশ আর আসিল না।

গল্প করিতে করিতে আভার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। কি ছেলেমানুষ এই কালিকেশ! এখনও যেন তাহারা ছেলেবেলাকার সেই খোকাখুকী আছে? গায়ে হাত তুলিতে এতটুকু লজ্জা বোধ হইল না। অনায়াসে সে আভাকে চড় মারিয়া বসিল। দাঁড়াও, এমন জব্দ করিব তোমাকে।

জব্দ করিবার পন্থাটা মনে উঠিতেই আভার মুখ খুশীতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ঠিক হইয়াছে।

চরকা সুতা একপাশে ঠেলিয়া রাখিয়া খদ্দরের কাপড়গুলি ট্রাঙ্কে ভরিয়া রাখিবে এবং বছর দুই আগের ছেঁড়া বিলাতী শাড়ীখানা পরিয়া কালিকেশের সম্মুখ দিয়া বিজয়িনীর মত চলিয়া যাইবে। ভাবিতে ভাবিতে আভা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া বাগান হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া ঘরে আসিয়া ঢুকিল এবং বেশ পরিবর্ত্তনে মনোনিবেশ করিল।

এদিকে বহুক্ষণ বেড়ার আসে-পাশে ঘুরিয়া কালিকেশ ভিতরে ঢুকিবার সাহস পাইল না। আভার দোষ কি? সে ত বারণ করিয়াছিল। পৌরুষ-গর্ব্বে সে-বাধা অগ্রাহ্য করিয়া কালিকেশ গাছে উঠিয়াছিল। ফল যাহা হইবার, তাহাই হইয়াছে। আভার হাসিতে ক্রোধে জ্ঞানহারা হইয়া সে তাহাকে প্রহার করিয়াছে। অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছে। বর্ব্বরতার চর। কালিকেশের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, ধব, আভাই যদি এমন একটা দুঃসাহসিক কাজ কবিত, সে কাজের অসাফল্যে সে কি হাসিত না?

কালিকেশ যতই ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার অপরাধের বোঝা ভারি হইয়া অন্তরকে পীড়া দিতে লাগিল। এমনধারা গোঁয়ার্ত্তুমি করা কোনমতেই উচিত হয় নাই। আভা যদি সুবোধকে সে কথা বলিয়া দিত ত সুবোধের কাছে সে কি মুখ দেখাইতে পারিত? কিন্তু আভা হাসিমুখে সব ঢাকিয়া লইয়াছে। বুদ্ধিমতী বটে! মনে মনে কালিকেশ অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। বেড়ার পাশ হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল, বিছানো চাটাইয়ের উপর বসিয়া হাসি-গল্পে উহারা দুপুরের অবসর-মুহূর্ত্ত জমাট করিয়া তুলিয়াছে। ওই চাটাইয়ের একপাশে তাহার যদি এতটুকু স্থান থাকিত! লোভীর মত কালিকেশ বেড়ার ও-পিঠে বহুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল। অবশেষে সে স্থির করিল —আভার কাছে ক্ষমা চাহিবে।

কালিকেশ নিঃশব্দে হাসিল। মনে মনে দিব্য নাটক গড়িতেছে সে! অপরাধ বা ক্ষমা কোন কথাই কি মুখে আনা যায়!

যত গোল বাধিয়াছে আভা মুখপুড়ী ধাঁ করিয়া বাড়িয়া উঠিয়া। এই ত বছর দুই আগেও পেয়ারার স্বত্ব লইয়া এমন মারামারি হইয়াছিল, যাহার চিহ্ন আভার হাঁটুতে এখনও খুঁজিলে পাওয়া যাইবে। কয়েক দিন সে শয্যাগত ছিল, জ্বরও হইয়াছিল। কালিকেশ—কৈ, অনুতপ্ত হইয়া একবারও শয্যালীনা আভাকে দেখিতে যায় নাই, কিংবা দু'টা মিষ্টকথা শোনাইবার প্রয়োজনও বোধ করে নাই। বয়স বাড়িয়াছে বলিয়া সেই আভার গায়ে হাত তুলিয়া কালিকেশকে আকাশ-পাতাল ভাবিতে হইতেছে।

ঐ যে আভা উঠিয়া বাড়ীর মধ্যে গেল না?

পা টিপিয়া টিপিয়া কালিকেশও দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল।

জেঠাইমা বাড়ী নাই, পাশের বাড়ীতে চাল তৈয়ার করিতে গিয়াছেন। ঢেঁকির শব্দ ও চাটুয্যেদের মেজ-বৌয়ের চুড়ির আওয়াজ পাওয়া যাইতেছে। কুলায় করিয়া ধান কুঁড়া ঝাড়িয়া মিহি চালগুলি পাশের ধামায় রাখিতেছেন ও কাজের অবসরে পাড়ার এ-বাড়ীর ও-বাড়ীর খবর লইতেছেন। জেঠাইমা পরনিন্দা পরচর্চ্চা কোনদিন ভালবাসেন না। তাই তাঁহার মৃদুকণ্ঠ কোনদিন উচ্চগ্রামে উঠে না, নীরবে কাজ করিতেই তিনি ভালবাসেন।

আভাও জেঠাইমার ধাত পাইয়াছে। ভারি শান্ত লক্ষ্মী মেয়ে। বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেবেলা-কার উদ্দাম চাঞ্চল্য ক্রমশঃ পরিমিত গাম্ভীর্য্যের রূপে আয়ত চক্ষু ও প্রফুল্ল মুখের উপর নিপুণ শিল্পীর রেখা-সৌন্দর্য্যকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছে।

আভা দুয়ার খুলিয়া বাহির হইয়া কালিকেশকে দেখিয়া চমকিত হইল ও নিজের বিজয়গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া চলিতে গেল।

কালিকেশ যে-কথা বলিবে না বলিয়া ক্ষণপূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সেই কথাটাই সহসা বলিয়া ফেলিল, আভা আমি বুঝতে পারিনি—হঠাৎ রাগ চড়ে গেল—

আভা মুখ ফিরাইয়া মৃদু হাসিল; বিদ্রূপ-মণ্ডিত অবজ্ঞার হাসি। শাড়ীর আঁচলটা একবার দোলাইয়া পুনরায় চলিবার উপক্রম করিল।

কালিকেশ হতবুদ্ধির মত খানিকক্ষণ সেদিকে চাহিয়া বলিল, একটা কথাও বলবিনে? আমি স্বীকার করচি—

আভা মনে মনে অত্যন্ত খুশী হইয়া মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিল, যা অন্যায় বলে জান তা কর কেন?

কালিকেশ নরম সুরে বলিল, রাগ না চণ্ডাল। তুই যদি অত না হাসতিস্!

আভা বলিল, যত দোষ আমার হাসির—বাঃ রে! বলিয়া কালিকেশকে বিঁধিবার জন্য বলিল, লোকের মনের ওপর জোর খাটাতে চাও, এ বড়

অদ্ভুত খেয়াল তোমার। জান, সবাই তোমার তাঁবেদার নয়?

কালিকেশ নরম সুরেই বলিল, অত বলচিস কেন আভা? সত্যি বলচি, তোকে মেরে অবধি আমার মনটা খচ্ খচ্ করচে। কেবলই মনে হচ্ছে বড় অন্যায় করেচি। কিন্তু কিসের যে অন্যায় ঠিক বুঝতে পারচি নে।

আভা বিদ্রূপ করিয়া বলিল, সে জ্ঞান তোমার এত শীঘ্র হবে, এ ধারণা আমারও নেই।

কালিকেশ কাতর দৃষ্টিতে আভার পানে চাহিল।

আভা সে দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া মুখ নামাইয়া লইল। মনে মনে সে যে আনন্দ পাইল তাহার তুলনা পৃথিবীর কোন বস্তু দিয়া পরিমাপ করা চলে না।

সেই মুহূর্ত্তে আভা সব অভিযোগ ভুলিয়া গেল। সব দ্বন্দ্ব তাহার ঘুচিল। প্রসন্ন-হাস্যে মুখ উজ্জ্বল করিয়া সে কালিকেশের সন্নিকটবর্ত্তিনী হইল। কালিকেশ নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। যাক, আভার মনে আর এতটুকু কষ্ট নাই। পরিপূর্ণ প্রসন্ন-দৃষ্টিতে আভার পানে চাহিয়া কি বলিতে গিয়াই পুনরায় তাহার মুখে মেঘ ঘনাইয়া উঠিল। হাত তুলিয়া সে পরুষকণ্ঠে কহিল, ও কি?

আভা স্তব্ধ হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। সূক্ষ্ম বিলাতী বস্ত্রে দেহ ঢাকিবার দুনিবার লজ্জায় সে যেন মাটিতে মিশিয়া যাইতে চাহিল। এতক্ষণ অভিমানে অন্ধ হইয়া কালিকেশকে বিঁধিতে সে এই আয়োজন করিয়াছে, কিন্তু নিজের পানে চাহিতেই ঘৃণায় তাহার সারা দেহ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। ছি—ছি! সে করিয়াছে কি। এই কাজ শুধু কি কালিকেশেরই অপ্রিয়? অশুচিজ্ঞানে যাহা সে এতদিন স্পর্শ পর্য্যন্ত করে নাই, আজ অন্যকে পীড়া দিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে নিজেকে সে এত নীচেয় নামাইয়া আনিয়াছে।

কালিকেশ নতমুখী আভাকে নিরুত্তর দেখিয়া তীব্রস্বরেই কহিল, ভুল বুঝে তোমার কাছে ছুটে এসেছিলাম আভা।

আশ্চর্য্য মানুষের মন। জোর করিয়া বাঁকাইতে গেলে সেই মুহূর্ত্তে সে অনমনীয় হইয়া উঠে। কালিকেশের রূঢ় স্বরে আভার লজ্জার আবরণ খণ্ডখণ্ড হইয়া ছিঁড়িয়া গেল। মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বের বিলীয়মান অভিমান—ধূমবহ্নি লইয়া অন্তরে জ্বলিয়া

সবেগে মুখ তুলিয়া সে কহিল, কেন ছুটে এসেছিলে? কে বলেছিল আসতে?

কালিকেশ ক্রোধে চক্ষু লাল করিয়া কহিল, আমার অন্তরের মধ্যে যে মানুষ আছে—সে বলেছিল আসতে। কিন্তু ভুল করেছিল সে। মানুষ মানুষের কাছে ক্ষমা চাইতে পারে—অমানুষের কাছে নয়।

ক্ষোভে আভার চোখ ফাটিয়া জলধারা গড়াইবার উপক্রম হইতেই মুখ ফিরাইয়া সে কহিল, তুমি, তুমি, এতবড় সাহস তোমার—আমায় যা তা বলচ?

কালিকেশ চীৎকার করিয়া কহিল, একশোবার বলবো, হাজারবার বলবো, লক্ষবার বলবো। তোমার মধ্যে এতটুকু মানুষের কণা নাই! তুমি এত নীচ যে—সে কথা বলতেও আমার ঘৃণা বোধ হয়!

আভাও ধৈর্য্য হারাইয়া কহিল, তার চেয়েও তুমি নীচ। আমার গায়ে হাত তুলতে তোমার লজ্জা করে নি!

কালিকেশ জ্বলন্ত চক্ষু আভার পানে ন্যস্ত করিয়া গম্ভীর নির্ঘোষে কহিল, জান, তোমার শাস্তি খুব সামান্যই হয়েছে?

আভাও জ্ঞান হারাইয়া এক পা অগ্রসর হইয়া কহিল, যে-টুকু বাকি আছে—দিয়ে যাও। যদি না দাও ত বুঝবো—

আভার নির্ভীক কণ্ঠস্বর ও দাঁড়াইবার ঋজু ভঙ্গি দেখিয়া কালিকেশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে চারিদিকে চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চালের বাতায় গোঁজা বেতের ছড়ি টানিয়া লইয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, ইচ্ছা করলে তা-ও পারি। কিন্তু তোমার গায়ে বেত ছোঁয়াতেও আমার লজ্জা!

আভা পাথরের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কালিকেশ ব্যঙ্গস্বরে বলিল, বরং আমি নীচ, কাপুরুষ বা যা তোমার খুশী বলতে পার,—তবু তোমাকে শাস্তি দেওয়ার দুর্ভাগ্য যেন আমার কখনও না হয়! বলিয়া সবেগে বেতগাছি দাওয়ার উপর ফেলিয়া কালিকেশ দৃঢ় পদেই নামিয়া গেল।

আভা আর আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না। সেখানে লুটাইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

* * *

তপন সেই সময়ে কি প্রয়োজনে বাড়ীর মধ্যে আসিতেই আভার চাপা-কান্নার শব্দে থমকিয়া দাঁড়াইল। দাওয়ার উপর পড়িয়া আভা মুখ

গুঁজিয়া কাঁদিতেছে। ক্রন্দনের উচ্চ স্বর নাই, কিন্তু অসহ্য বেদনায় সারাদেহ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। এই তো সে হাসিয়া আম ছাড়াইয়া দিতে দিতে গল্প করিতেছিল, ইহারই মধ্যে এমন কি হইল?

সান্ত্বনা দেওয়া উচিত, না নিঃশব্দে ফিরিয়া যাইবে? কি সান্ত্বনাই বা দিবে? না জানে সে রোদনের ইতিহাস, না বা সান্ত্বনার বাণী! কোন দিন এমন বিপদে ত পড়ে নাই।

কালিকেশ এইমাত্র বাহির হইয়া গেল। গম্ভীর থমথমে মুখ—তপনকে দেখিয়াও দেখিল না। নিশ্চয়ই এমন কিছু ঘটিয়াছে—

অকস্মাৎ মাসকয়েক পূর্ব্বের বটানিক্যাল গার্ডেনের কথা মনে পড়িল। তরুণ মনে অকস্মাৎই এই মেঘ জমে। তবে কি আভাও কালিকেশকে ভালবাসে? পরস্পরকে ভাল না বাসিলে এমন একটা দুর্দ্দান্ত অভিমান ও বেদনা মনের উপর আধিপত্য করিবে কি করিয়া?

ভালবাসা না-ও হইতে পারে। যে বেদনা যে চিন্তা না ভুলিতে পারিয়া তপন আজ পল্লী-প্রবাসী—সে কি ভালবাসা? হয়ত না। একটা কামনা—লোলুপ, বেগবান। যৌবন দৃপ্ত দৃষ্টি দিয়া সব কিছু সুন্দরকেই অসামান্য দেখে এবং আয়ত্বে আনিবার জন্য প্রাণপণ করে।

সুতরাং এই পাওয়ার কামনাকে ভালবাসা বলিয়া ভুল করিয়া কাব্য গড়া অনুচিত।

আভা কাঁদুক। ভালবাসা মনে করিয়া ভুলই যদি বোঝে, রাত্রির পক্ষপুটে বিশ্রাম লইলেই প্রভাতের সূর্য্য সে-বেদনা অনেকখানি লাঘব করিয়া দিবে। হাল্কা মনে সে আবার গৃহকর্ম্মে মাতিবে। একটা দাগ—অস্পষ্ট রেখা হয় ত মনের কোণে আঁকা রহিবে এবং তাহারই চারিধারে বর্ণ-বিন্যাসে রমণীয় একখানি ছবির মধ্যে দিনের পর দিন নির্ব্বাপিত-প্রায় কামনাকে উদ্দীপ্ত করিয়া মানুষের অমরকাব্য রচিত হইতে থাকিবে। ভালবাসার কাব্য।

তপন ফিরিয়া গিয়া সুবোধকে কোন কথা বলিল না। বরং পাছে সে বাড়ীর ভিতর আসিয়া আভাকে এইভাবে আবিষ্কার করিয়া তাহার রোদন-সমাধি ভাঙ্গিয়া দেয়, সেই আশঙ্কায় তাহার হাত ধরিয়া ছায়াঘেরা আমবাগানের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল।

তপন চলিতে চলিতে প্রশ্ন করিল, কালিকেশ তোমাদের স্বজাতীয় বুঝি?

সুবোধ বলিল, কেন বল ত?

তপন বলিল, এমনি জিজ্ঞাসা করচি। বেশ সদানন্দময় মনখোলা ছোকরা। দেখলেই আপন করে নিতে ইচ্ছে হয়।

সুবোধ বলিল, হাঁ। মা'র ভারি ইচ্ছে ওকে আপন করে নেন। আভার সঙ্গে match করবে ভাল, কি বল?

তপন বলিল, বেশ ত। কাজটা শীগ্‌গির মিটিয়ে ফেল ন', ভোজটা না হয় খেয়েই যাই।

সুবোধ একটি নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তা কি হবে?

তপন বলিল, কেন, ওঁদের বাড়ীর আপত্তি আছে বুঝি?

না।

তবে?

সুবোধ একটু ভাবিয়া বলিল, ওর মত চঞ্চল প্রকৃতির ছেলে—বিয়ের দায়িত্ব আছে ত একটা।

তপন হাসিয়া বলিল, বিয়ের দায়িত্ব!

সুবোধ গম্ভীরস্বরেই বলিল, এত বড় দায়িত্ব জীবনের কোন কাজেই নেই।

তপন হাসিতে হাসিতে বলিল, বল কি? তবে ত বিয়ে জিনিষটা সাংঘাতিক দেখচি!

সুবোধ সে-কথায় কান না দিয়া বলিল, কিন্তু সে জন্যও নয়। দায়িত্ববোধ ও সব বিষয়ে হয়ত আপনিই জন্মায়। অবস্থা ওদের ভাল, ছেলেও ভাল। সম্বন্ধ সব দিক দিয়ে কাম্য হলেও—

তপন ছেদ টানিল, কোন আপত্তিই উঠতে পারে না।

সুবোধ বলিল, পারে। আভার দিক দিয়ে। তুমি দেখেচ কালিকেশ অসম্ভব রকমের পল্লীভক্ত। পল্লীর জন্য পারে না—এমন কাজ বোধকরি পৃথিবীতে নেই। সেই জন্যই আমার ভয় বেশী।

তপন বলিল, অদ্ভুত ভয় তোমার সুবোধ-দা!

সুবোধ বলিল, অদ্ভুত নয়, অত্যন্ত স্বাভাবিক। ওই ভক্তির তলায় নির্ভীক যে প্রাণ—তা জলে-ডোবা পদ্মপত্রের মতই জলশূন্য। ও প্রাণের আগুন শুধু ওরই মধ্যে জ্বলচে না. যে কেউ ওর সংস্পর্শে আসে তাকেই পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। সে দাহন সহ্য করবার শক্তি আভার আছে কিনা জানি না।

তপন বলিল, তুমি যা বলচ—রাজরোষে পড়ে—

সুবোধ বলিল, খুবই সম্ভব তপন। ওই সব চঞ্চল কলঙ্কলেশশূন্য চরিত্রবান ছেলেরা প্রাণের মায়া মমতা রাখে না। আমি অনেককে দেখেছি, ওদের কেউ বলেন নির্ব্বোধ—কেউ বা করেন প্রশংসা।

তপন বলিল, তুমি কি বল?

সুবোধ তপনের পানে চাহিয়া মৃদু হাসিল। বলিল, ওদের কোন কিছু আখ্যা দিয়ে বাঁধতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। ওরা যা—ওরা তাই। আকাশকে লতাপাতায় সাজালে তার সৌন্দর্য্য বাড়ে না। কিন্তু কথা হচ্চে এই—আভা যদি হঠাৎ shock পায়? কালিকেশও হয়ত রাজী হবে না।

তপন বলিল, বিয়ের সত্যিকার দায়িত্ব যদি থাকে—একটু আগে তুমিই বলেচ, ওর পল্লীভক্তির মূলে সঞ্চয়ী মনের আবির্ভাব হবেই।

সুবোধ বলিল, তুমি জান না কালিকেশকে, তাই ও কথা বলচো। উন্নত ভবিষ্যৎ—এক কথায় কলেজের পড়া ছেড়ে দিলে। বাপ তাড়না করলেন, বাড়ী ছেড়ে পালালো। বার দুই জেলও খেটেচে। একটু থামিয়া বলিল, যাই হোক, তুমি কি বল? এ বিবাহ হওয়া উচিত?

তপন ভাবনায় পড়িল।

এই মাত্র দাওয়ায় অবলুণ্ঠিত আভার রুদ্ধ রোদনধ্বনি শুনিয়া আসিয়াছে। সে যদি কামনা হয়, যদি ভালবাসা না-ই হয়, তথাপি এই মিলন অবাঞ্ছিত বলিয়া ঘোষণা করিবার কণ্ঠের জোর তাহার কোথায়?

দ্বিধায় পড়িয়া সে কহিল, আমার মতে এ-সব বিষয়ে মেয়েদের মত নেওয়া দরকার।

সুবোধ বলিল, আভার মত একটা নিতে হবে বৈকি। এ-সব বিষয়ে গুরুজনদের উপর সব ভার তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়াকে আমি শিষ্ট, শান্ত ও ভক্ত সন্তানের কর্ত্তব্য মনে করি না।

তপন হাসিয়া বলিল, যেন বিবাহের অঘটন তোমার উপর একদিন পীড়নের মত চেপে বসেছিল!

সুবোধ তপনের হাসিতে যোগ না দিয়া পথপ্রান্তস্থিত কালকাসুন্দার ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া ঝোপের উপর বার কয়েক আঘাত করিয়া কহিল, চল, ফেরা যাক।

কালিকেশের বাড়ীর পথে আসিয়া পড়িতেই সুবোধ বলিল, চল দেখে আসি, কালিটা কি করচে।

উঠানে বেতের মোড়ার উপর বসিয়া সৌম্যদর্শন এক বৃদ্ধ বাকারি চাঁচিতেছিলেন। সুবোধ প্রণাম করিতেই অদূরে পতিত সেগুন কাঠের গুঁড়িটা দেখাইয়া কহিলেন, বোস। এটি?

আমার বন্ধু। কালি কোথায় কাকাবাবু?

বৃদ্ধ একটু আশ্চর্য্য হইয়াই কহিলেন, তোমায় বলে যায় নি? আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় ছিলি এতক্ষণ? বললে, সুবোধ-দার বাড়ী। সে যে এইমাত্র বাগেরহাটে চলে গেল।

সেখানে—কি জন্যে?

কি জানি—তাদের কি মিটিং আছে। বললে, শীগ্‌গির না-ও ফিরতে পারি।

আপনি যেতে দিলেন কেন কাকাবাবু?

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন, চাণক্যের নীতি আমি মেনে চলি সুবোধ। লোকে বলে, সে মন্দ ছেলে, হুজুগে। তবু সে যা ভাল মনে করে—তার ওপর বাধা দেবার যুক্তি আমি খুঁজে পাই নে।

সুবোধ বলিল, লোকে বলে, আপনি তাকে বেশী ভালবাসেন।

বৃদ্ধ বলিলেন, হয় ত বাসি। তার দাদারা সংসার পেয়েচে, উপার্জ্জন করচে। তাদের স্ত্রী-পুত্র নিয়ে তারা আজ সুখী। কিন্তু কালিকে দেখে মনে হয়, সংসারের সুখ ভোগ করার জন্য ও জন্মায়নি। তোমার বোনের সঙ্গে ওর বিয়ে দেবার কথা উঠেছিল, আমি রাজী হইনি।

সুবোধ বলিল, বিয়ে দিলে একটা দায়িত্ব হয়ত—

বৃদ্ধ বলিলেন, কিছু না। লাভে হতে মেয়েটা আজীবন জ্বলেপুড়ে মরবে।

সুবোধ বলিল, আপনারও ত কম কষ্ট নয় কাকাবাবু?

বৃদ্ধ হাসিলেন, কষ্ট! না, এখন আর কষ্ট হয় না। আমি সইতে পারি। বলিয়া বাখারির উপর দ্রুত দা চালাইতে লাগিলেন।

সুবোধ আর কোন কথা না বলিয়া বাহিরে আসিল।

তপন জিজ্ঞাসা করিল, কালি ফিরবে কবে?

সুবোধ বলিল, কাল ফিরতে পারে, দু'বছর বাদেও ফিরতে পারে, কিংবা না-ও ফিরতে পারে।

তপন সবিস্ময়ে বলিল, বল কি? তার এত ভালবাসার গ্রাম—

সুবোধ বলিল, এ গ্রাম তার ত পিছনে পিছনে

গেছে। তার ভালবাসায়, যেখানে থাকবে, সেইখানেই স্বর্গ সে গড়ে তুলতে পারবে।

তপন বলিল, তোমারও আজ উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি।

সুবোধ বলিল, দেখলে ত তার বাপের নির্ব্বিকার ভাব। ছেলে গেছে, সে চিন্তাই যেন নেই, আপন মনে বাকারি চাঁচছেন।

তপন বলিল, তা ত দেখলুম, কিন্তু—

সুবোধ বলিল, ওই কাজের অন্তরালে বুড়োর স্নেহময় অন্তরখানি আমি দেখতে পেলাম। যে ছেলে যত অক্ষম, বঞ্চিত, তার ওপর বাবা মার স্নেহ তত বেশী।

তপন প্রশ্ন করিল, কিন্তু কালিকেশ অক্ষম কিসে?

সুবোধ বলিল, সংসারী মানুষ আমরা সংসার দিয়েই বিচার করি। যে সংসারকে আয়ত্ব করতে পারলে না, তার জীবনকে আমরা বৃথা বলে ধরে নিই।

তপন বলিল, সংসারকে আয়ত্ব করবার কি পন্থা?

সুবোধ বলিল, কেন, উপার্জ্জন করতে শিখে বিয়ে করা। তারপর পুত্রকন্যা নিয়ে দিব্যি জাঁকিয়ে বসা। কলহ-কোলাহলের মাঝে চোখ বুজে ঝাঁপ খাওয়া আর কি!

তপন বলিল, শতকরা নিরানব্বুই জন এই শান্তির উপাসক—একে তুমি কোলাহল বলতেই পার না।

সুবোধ বলিল, সমুদ্রের সব চেয়ে বড় ঢেউটা মাঝে মাঝে বিপ্লব বাধায় বেশী। মনে হয়, সে-ই যত কিছু শান্তি ডাকাতের মত লুটে নিতে জন্মেছে। কিন্তু নৌকায় করে যারা ছোট ঢেউয়ের উপর দিয়ে চলে যায়, তারা জানে, যথার্থ কোলাহল কোনখানে।

তপন কোন কথা কহিল না। সে ভাবিতেছিল আভার কথা। অতঃপর আভা করিবে কি? শতকরা নিরানব্বুই জনের পন্থানুসরণ, না বিপ্লবী বড় ঢেউয়ের পানে চাহিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন? শ্রদ্ধা কথাটা ভাল, কিন্তু চিরজীবন শুধু শ্রদ্ধা বহিয়া নিঃসঙ্গ জীবন কাটানোর কোন অর্থ হয় না।

অপরাহ্ণ আগতপ্রায়। পুকুরধারে আসিতেই তপন দেখিল, একরাশ বাসন লইয়া আভা পুকুরের রাণায় বসিয়া ঘস্ ঘস্ করিয়া মাজিতেছে। ওই শব্দ যেন সান্ত্বনা। রূঢ় কর্কশ শব্দ—সমস্ত মনোযোগকে সচকিত করিয়া কর্ম্মের পানেই টানিতেছে। আভার গৌর ললাট বাহিয়া ঘাম ঝরিতেছে, পরিশ্রান্ত মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। তা উঠুক, ক্ষণপূর্ব্বের দুঃখ-বেদনা এই নিপুণ কর্ম্মের আঘাতে ধুইয়া মুছিয়া যাইবে। আভা শান্তি পাইবে।

* * *

পরদিন।

দাঁতন করিতে করিতে তপন একাই উত্তর-মাঠের প্রায় অর্দ্ধেকটা অতিক্রম করিয়াছে, এমন সময় পিছন হইতে ডাক আসিল। মাঠের যেখানটা বেড়া দিয়া ঘেরা, তাহারই সন্নিকটে আলের উপর বসিয়া একজন লোক থেলো হুঁকায় তামাক টানিতে টানিতে মজুর দিয়া বেগুন চারা পোঁতাইতেছিলেন। তপন তাঁহাকে না চিনিলেও তাঁহার ডাকে ফিরিল।

অপরিচিত আপ্যায়িত করিয়া কহিলেন, বোস। সুবোধের বন্ধু ত তুমি?

বসিবার আসন না দেখিয়া তপন কহিল, বেশ দাঁড়িয়েই আছি, বলুন কি বলবেন?

লোকটি নিবন্ত হুঁকাটা ভড়ভড় করিয়া টানিয়া কহিলেন, দেখচ একবার দেবতার আক্কেল? সারা জষ্টিতে একফোঁটা বর্ষালে না! জল্‌দি বেগুনচারায় জল ঢালতে গেলেই ত খাওয়াবে আমায় বেগুন! রোজ একটা জনের খরচ ত।

তপন উত্তর দিল না। এ সব বাজে আলোচনার চেয়ে সূর্য্য উঠিবার পূর্ব্বে ছায়াময় মাঠটি যদি সে অতিক্রম করিতে পারিত!

লোকটি প্রসাঙ্গান্তরে আসিলেন, সুবোধ ছোকরা ভারি ভাল। থাকে বিদেশে—বাড়ী আসতেই পায় না। এমন দেশ যদি প্রাণ ভরে না-ই দেখলে···কেমন লাগচে পাড়াগাঁ?

তপন সংক্ষেপে বলিল, ভাল।

—হুঁ—হুঁ, বলতেই হবে। সেবার ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব টুরে এসে বলেছিলেন, সারা বাংলায় এমন গাঁ একখানিও আমার চোখে পড়ে নি। পড়বে কোত্থেকে? তিন দিকে এমন নদী কোন গাঁয়ের? অসুখ-বিসুখ নেই বল্লেই চলে। উঁ-হু হু অত ঘেঁষাঘেঁষি নয়, ঠিক ওই বাকারির মাপে এক হাত অন্তর।

বেগুনচারার নির্দ্দেশ করিয়া তিনি তপনের দিকে মনোযোগ দিলেন, হাঁ, যা বলছিলাম, সুবোধ ছোকরা ত থাকে বিদেশে, দেশের কোন খবরই রাখে না, এমন কি বাড়ীর খবর পর্য্যন্ত না। এই গাঁয়ে কতকগুলো হাড়বকাটে ছেলে জুটেচে, তারা

আবার সমিতি গড়েচে, নাকি পাড়াগাঁর উন্নতি করবে। ছাই করবে! লাভে হতে দেখি কতকগুলো বনেদী ঘর উচ্ছন্ন দেবার মতলব। চরকা চালাও, খদ্দর পর, পুকুর কাটাও, বন সাফ. কর—এই সব ধুয়ো। আরে, সেবার আমার পিতমোর আমলের বড় পুকুরটাই দিল মাটি করে। যেই পানা তোলা, ব্যস্! পরের বোশেখে পুকুর শুকিয়ে আধখানা! আরে, তা হবে কেন? খোদার ওপর কি খোদকারি চলে!

কতক্ষণ বক্তৃতা চলিত বলা যায় না। নিবন্ত হুঁকাটায় বহুক্ষণ হইতেই ধুম উদ্গীরণ হইতেছিল না। ক্লান্ত ওষ্ঠকে বিশ্রাম দিয়া তিনি হুঁকাটি বেড়া ঠেস দিয়া রাখিলেন ও কাঁধের গামছা দিয়া হাতমুখ মুছিয়া পুনরায় আরম্ভ করিলেন, হাঁ, ওই বয়াটের দল কত মেয়ে-ছেলেকে যে ভুজুং লাগিয়েচে, তা কি আর বলবো। কালিকেশটা দলের চাঁই। দেখতে এক ফোঁটা হলে হবে কি, কথা খুব চ্যাটাং চ্যাটাং। বাপের দু'দশ বিঘে আছে কি না, তারই রস। বুঝলে, এই সুবোধের বাড়ী দহরম-মহরম ওর খুব বেশী। হাজাব হোক, ঘরে আইবুড়ো মেয়ে রয়েচে—তুই সোমত্ত ছেলে—

তপন অসহিষ্ণুস্বরে বলিল, রোদ উঠলো, আমি চলি।

তিনি ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, সবটা শোনই-না। মেয়েমানুষের মন ত, ভিজতে কতক্ষণ! লোকের মুখে কত কথাই শুনি! কেউ বলে ওদের বিয়ে হবে, কেউ বলে—

তপন ততক্ষণে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। লোকটিও তাহার পিছু পিছু চলিতেছেন। ভাল বিপদ যা হোক! ভদ্রতার এমন নিদর্শন শহরের ইতিহাসে সত্যই দুর্লভ।

লোকটি বকবক্ করিতেছিলেন, তাই বলচি, বেশীদিন ওখানে থাকা ঠিক নয়। একটা বদনাম ত?—আভাটা শুনতে পাই—

তপন আর কিছু না বলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইল। মাঠের সীমা পার হইয়া পিছনে দেখিল, অদূরে দাঁড়াইয়া লোকটি তাহারই পানে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিয়াছে। পাগল মনে করিল নাকি? তা করুক। সে-বিষ কণ্ঠস্থ করিবার শক্তি তপনের নাই। দূর ছাই, এমন সুন্দর প্রভাতকে ওই নির্ম্মম লোকটা যেন অকস্মাৎ গলা টিপিয়া মারিয়াছে!

* * *

দুপুরে সুবোধদের বাগানের জামগাছ দু'টিতে গ্রামের যত ছেলে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

মালকোঁচা মারিয়া কাপড় পরিয়া কাঁধে গামছা বা ছেঁড়া ন্যাকড়ার ঝুলি ঝোলাইয়া তালগাছের মত উঁচু জামগাছে পা জড়াইয়া তাহারা টপ্. টপ্. করিয়া উঠিয়া গেল। যাহারা নিতান্ত শিশু বা যাহারা উঠিতে পারিল না—তাহারা চীৎকার করিয়া জাম ফেলিয়া দিবার জন্য মিনতি করিতে লাগিল। জাম পড়িল ত নীচেয় মারামারি গালাগালি জমিয়া উঠিল। এই হাসি, এই কান্না, চটাপট চড় ও চড়বড় করিয়া জাম-পড়ার শব্দ মিলিয়া তপনের তন্দ্রাই ভাঙ্গিয়া দিল। জানালা খুলিয়া সে ছেলেদের জাম-পাড়া দেখিতে লাগিল। এমন জাম নাকি গাঁয়ের কোন গাছে নাই, তাই লোভীর দল প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে পঙ্গপালের মত গাছ দু'টিকে আক্রমণ করে। দিন পনেরো ধরিয়া চলে উহাদের ওই উল্লাস-উৎসব। তারপর জাম ফুরাইয়া গেলে ভগ্নশাখা গাছের পানে কেহ ফিরিয়া চাহে না।

জাম পাড়া হইয়া গেলে ছেলেরা গাছ হইতে নামিল। সমাগত সকলকে ঝুলি হইতে জাম বাহির করিয়া ভাগ করিয়া দিল। হিসাবহীন অবোধেরা ফরসা কাপড়ে জামের দাগ লাগাইয়া পরম আনন্দে ফল ভক্ষণ করিতে লাগিল, মাঝে মাঝে জিভ বাহির করিয়া দেখাইতে লাগিল কতটা নীল হইয়াছে।

তপনকে জানালা দিয়া এইদিক পানে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া উহারই মধ্যে বড় ছেলে দুটি আগাইয়া আসিয়া বলিল—খাবেন?

তপন হাত পাতিয়া জাম লইল ও মুখে দিয়া বলিল, বাঃ, সুন্দর ত!

একটি ছেলে বলিল, যদি বৃষ্টি হতো ত দেখতেন—এইসা ডব্বা ডব্বা হতো। সুবোধদাদের বাগানের মত জাম এ-গাঁয়ে আর নেই।

গ্রামের কোথায় কি ভাল ফল পাওয়া যায়, সে সংবাদও ইহারা তপনকে শুনাইতে ভুলিল না।

কাঁচামিঠে আম ভাদুড়ীদের বাগানে যেমন হয়, তেমন বড় ও মিষ্ট—কোন বাগানেই নাই। বৈঁচিফল কদমতলার ডোবার ধারে অপর্য্যাপ্ত ফলে! জামরুল মুখুয্যেদের উঠানের গাছের মত লাল ও মিষ্ট আর কোথাও নাই—লিচুও উহাদের চমৎকার।

কিন্তু লাঠি হাতে মুখুয্যে-বুড়া দিনভোর উঠানেয় ছায়ায় বসিয়া তামাক খান। রাত্রিতে পাছে বাদুড় পড়ে বলিয়া শামুকের খোলা গাছে

টাঙাইয়া দিয়াছেন; দড়ি ধরিয়া টানিলে খড়খড় করিয়া শব্দ হয়, বাদুড় গাছে বসে না। মুখুয্যেবুড়ো রাত্রিতেও কম ঘুমান। বাদুড় ত আছেই, ছেলেদের উৎপাতও কম নহে। পাকা ভাল আম প্রায় প্রত্যেক বাগানেই ফলে। ছেলেরা প্রত্যেক ভাল আমের নাম ও প্যাকিবার সময় পর্য্যন্ত বলিতে পারে। শীত শেষ হইলে গাব ফল। জেলে পাড়াতেই গাব গাছ বেশী, পাড়িতে গেলে তাড়া খাইতে হয়। তবু পাড়িতে তাহারা কসুর করে না। গোলাপজামের ভাল গাছ কোথাও নাই: ছেলেরা ও-ফলটা খুব পছন্দও করে না। তার চেয়ে কালোজাম ঢের ভাল।

কামরাঙা বা কয়েৎবেলের জন্য তাহাদের তাড়া খাইতে হয় না, পথের ধারে যেখানে-সেখানে গাছ। পাড়িয়া খাও—কেহ কিছু বলিবে না—এক অভিভাবক ছাড়া। তাঁহারা ছেলেদের ওই সব খাইতে দেখিলেই পীড়ার ভয়ে শঙ্কিত হইয়া উঠেন। পেয়ারার ভালমন্দ নাই; ডাঁসা পেয়ারা চিবাইতে যা আরাম! আর একটি লোভনীয় জিনিষ কুল। কিন্তু মাঠের ধারে পাতা ঢাকিয়া থলো থলো কুল পাকিয়া থাকে, সে কুল নহে, গৃহস্থের উঠানের সযত্ন-রোপিত গাছগুলির উপরেই উহাদের লোভ বেশী। ঢিল মারিলেই চড়বড় করিয়া পড়ে। ওদিকে গৃহস্থের গালাগালি আরম্ভ হয়, এদিকে কুল কুড়াইবার ধুম! যেমন গৃহস্থ তাড়াইয়া আসেন অমনই কে কোথায় দে ছুট্। আবার অসাবধান মুহূর্ত্তে বৃক্ষ আক্রমণ। খেলা ও খাওয়া দু'য়েরই আমোদই আছে। তাহাদের লোভ নাই—কলায়, আনারসে, পেঁপেয় বা কাঁঠালে। ও-সব জিনিষ টাট্কা পাড়িয়া খাইবার সুবিধা নাই। চুরি না করিলে, গাল না খাইলে, খাওয়ার অর্দ্ধেক আনন্দ মাটি। মাঠের ধারে তরমুজ, শশা, ফুটি খাইতে গিয়া যেদিন ধরা পড়িবার-মত হয় সেদিনকার গল্পই বেশী রোমাঞ্চকর। পুকুরের মাছধরা হইতে আরম্ভ করিয়া খেজুরের ভাঁড় নামাইয়া রস চুরি-করার মধ্যে যে বীরত্ব, জার্ম্মাণ-যুদ্ধ জয়ে মিত্রপক্ষ সেরূপ গৌরব পাইয়াছেন কিনা সন্দেহ। সে বীরত্ব ওয়াটার্লুর যুদ্ধেও ছিল না—পোর্টআর্থারের পতনেও না! যখন কোথাও কিছু না থাকে, নদীর ধারে কসাড় বন ভাঙ্গিয়া তাহারা চিবাইতে থাকে। 'নটা' নাকি আকের মতই মিষ্ট। পুকুর-জলে পানি-ফল তোলাতে বিপদ আছে, মাঝে মাঝে সাপ দেখা দেয়। সে অবশ্য জলঢোঁড়া। পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা দাঁড়স, হেলে বা জলঢোঁড়া দেখিয়া ডরায় না—লেজ ধরিয়া খানিক বন্ বন্ করিয়া হয়ত ঘুবাইয়া দিল। লিচু থাকিতেও নোনা-আতা ও ধলা-আঁকড়ার ফল (ছাড়াইলে লিচুর মত শাঁস পাওয়া যায়) তাহারা খাইতে কসুর করে না। বেল ত গাছের তলায় গড়াগড়ি যায়। বাতাবী লেবুর বাল্যাবস্থায় দিব্য ফুটবল খেলা হয়, পাকাও অবশ্য ভাল—কিন্তু কাঁচার মত আমোদ তাহাতে নাই।

তপন দু'কান ভরিয়া শুনিতেছিল। যেখানে এত বৈচিত্র্য, সেখানে না থাকিয়া মানুষ শহরে ছোটে কেন? কিসের লোভে? ট্রাম-বাসের ঘর্ঘরধ্বনি শুনিবার জন্য? মিলের চিমনির গাঢ় ধোঁয়া বাতাসের সঙ্গে বুকে পুরিবার জন্য? না, প্রমোদ-উল্লাসে মনকে পঙ্কিল করিয়া তুলিতে?

তপন বাল্যকালের সীমা ছাড়াইলেও বহুদিন-পরিত্যক্ত শৈশবের স্মৃতি তার সারা অন্তরে উষ্ণতায় ভরিয়া আছে। পল্লীর এই অসীম ঐশ্বর্য্য—বঞ্চিত বলিয়াই হয়ত বেশী করিয়া তাহাকে প্রলুব্ধ করিতেছে। মনে হইতেছে, যৌবনকে এই বিছানার উপর শোয়াইয়া রাখিয়া খানিক মাঠে-বনে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। জাম পাড়িয়া, আম কুড়াইয়া, ঝগড়া করিয়া, হাসিয়া, হাঁপাইয়া—শ্রান্ত ক্লান্ত হয়। তারপর নদীর জলে পা ডুবাইয়া বাঁশের বাঁশীতে রাগিণীঝঙ্কার তুলে। ভাবনাচিন্তাহীন দিনগুলি এমনি ভাবে কাটিলেই জীবন সহজ হইয়া আসে না কি?

বৈকালে কালিকেশের কথাই হইতেছিল।

সুবোধ মাকে বলিল, শুনেচ মা, কালিকেশ গাঁ ছেড়েচে। আভার বিয়ের কথায় তার বাবা কি বল্লেন জান?

মা প্রশান্তস্বরে উত্তর দিলেন, জানি। তিনি প্রায়ই ও-কথা বলেন কিন্তু যাকে ছেলের মত ভালবেসেচি একবার, তাকে ছেলের মত করেই পেতে চাই।

সুবোধ বিস্ময়ান্বিত হইয়া কহিল, তার মানে? মেয়েটার দুঃখ-দুর্গতির সীমা থাকবে না।

মা হাসিলেন। ললাটে তর্জ্জনী রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, দুঃখ!—এটায় লেখা থাকলে কেউ ঠেকাতে পারে না, বাবা। বাংলাদেশের মেয়ে আমরা, দুঃখকে ডরালে কি আমাদের চলে।

সুবোধ বলিল, কিন্তু—

মা বলিলেন, কাল আমি আভার মনের ভাব জেনেচি। সে—

সুবোধ বলিল, সে যদি সইতে পারে—

মা বলিলেন, সে রাগ করে বলেচে, এ বিয়ে হলে বিষ খেয়ে মরবে।

তপন ও সুবোধ বিস্ময়ে অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিল।

মা হাস্যমুখে বলিলেন, ওতে অবাক্ হচ্ছিস কেন। কালকের ব্যাপার আমি কতক জানি। দুঃখের ভয় আভার একটুও নেই, কালিকে সে অপছন্দও করেনি।

সুবোধ হতবুদ্ধির মত জিজ্ঞাসা করিল, তবে?

মা বলিলেন, যাই হোক, এ বিয়ে একদিন হবেই। সেই দিন তোকে বলবো সে-কথা।

তপন মনে মনে বলিল, আমি জানি। ওরা পরস্পরকে ভালবাসে। এ একটা মান-অভিমানের পালা চলচে বৈত না!

কিন্তু আশ্চর্য্য! আভা জীবনভোর দুঃখকে একটুও ডরায় না? সত্যই কি এ ভালবাসা, অথবা অন্ধ লালসার তীব্র আকর্ষণ। যে আবেগে মানুষ যুদ্ধক্ষেত্রে হাসিমুখে শত্রুর গোলা বুক পাতিয়া লয়—সেই আত্ম-বিসর্জ্জনের তীব্রতা আভার কামনায় ফুটিয়াছে!

* * *

অপরাহ্ণ না হইতেই সেদিন সহসা পশ্চিমদিক হইতে একখানা মেঘ উঠিয়া গ্রামের মাথায় চাপিয়া বসিল। সূর্য্য ত ডুবিলেনই—সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ধূমল অন্ধকারের যবনিকাখানি গ্রামের মাথায় ফেলিয়া দিয়া বাতাসটুকু বন্ধ করিয়া দিল।

প্রথমে দেবদারুশীর্ষ অল্প কাঁপিয়া উঠিল, ঝাউয়ের শাখা এ-দিক হইতে ও-দিক হেলিল, পথের ধূলা ও বাঁশের পাতা উড়িয়া পথঘাট একাকার করিয়া দিল। পরক্ষণেই বিকট শোঁ শোঁ রবে—আকাশপ্রান্ত হইতে তীরগতিতে ছুটিয়া আসিল কালবৈশাখীর ঝড়।

গাছের মাথা হেলাইয়া ভূমিস্পর্শ করাইয়া শক্তিমান বিজয়-অর্ঘ্য গ্রহণ করিল। এ-বাড়ীর জানালা-দরজাগুলি বন্ধ হইয়া সকালেই সন্ধ্যার দীপ জ্বলিল। বর্ষার ঘনঘোর দুর্য্যোগে অকালেই সন্ধ্যা-বন্দনা সুরু হইয়া থাকে।

কড়্—কড়্—কড়াৎ। গম্ভীর নির্ঘোষে গ্রামের বুকখানি গুর গুর করিয়া কাঁপিল। ভারি পেষণ যন্ত্রটাকে বলিষ্ঠ বাহুর অনায়াস-ঠেলায় গড়াইয়া দিয়া আকাশের এ-ধার হইতে ও-ধার পর্য্যন্ত বারুদ-বিস্ফোরণ শব্দে কাঁপাইয়া দুর্দ্দান্ত দেবশিশুদের সে কি উল্লাস-ক্রীড়া! আকাশের পাতলা আবরণ ছিঁড়িয়া গোলাটা যদি হঠাৎ গ্রামের বুকে গড়াইয়া পড়ে!

মত্তবায়ুর শোঁ শোঁ গর্জ্জনে, আকাশের গুরু-গম্ভীর নাদে ও পাতায় ধূলায় মিশিয়া প্রকৃতি যেন উন্মাদিনী হইয়া উঠিলেন।

অতঃপর ঝটিকাক্ষুব্ধ ধরণীকে শান্ত করিতে বৃষ্টি নামিল মুষলধারে। বাতাস কমিল না, শাখা-আন্দোলন শব্দে স্পষ্টই বোঝা যায়। তীক্ষ্ণ বক্র তরবারির মত বিদ্যুৎ আকাশকে ফালি ফালি করিয়া চিরিয়া ফেলিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে কর্ণ-বিদারী গর্জ্জন। দাওয়া হইতে মাদুর গুটাইতে হইল, তথাপি তপন দুয়ার বন্ধ করিল না। চৌকিখানা দুয়ার গোড়ায় টানিয়া আনিয়া সে কালবৈশাখীর রুদ্রলীলা প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিল।

শহরে জানালা বন্ধ করিয়া বিদ্যুৎবাতি জ্বালিয়া এমন দিনে ঘরের মধ্যে গল্প বা গান জমাইয়া তুলিতে ভারি আমোদ। চালকড়াই ভাজা চিবাইতেও বেশ লাগে। পাঠের উপর প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। শহরে ইনি আসেন শহরবাসীকে প্রমোদিত করিবার জন্য—ঘণ্টাখানেকের বৈচিত্র্য ও বিস্ময়। সুদৃঢ় অট্টালিকায় বসিয়া বসন্ত-সমীরণের মত ইঁহাকে নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে—চাখিয়া চাখিয়া উপভোগ করা যায়। কিন্তু উলঙ্গ প্রকৃতির মাঝে—এই সংহারমূর্ত্তি,—অন্তরীক্ষ, মাটি, গাছ-পালা, ঘর-বাড়ীর উপর তাণ্ডব নর্ত্তন, কাঁপাইয়া ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া উড়াইয়া এই যে ক্রুর ক্রীড়া—এ ক্রীড়ায় আনন্দ থাকিলেও প্রতিদণ্ডে জীবন ও আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রচুর। ঝড়ের বেগ বাড়িলে হোগলার চালা শূন্যে উঠিতে কতক্ষণ! কিংবা ঝড়ের ধাক্কায় ঐ প্রকাণ্ড গাছটা যদি ধরাশায়ী হয়—সে কি কুটীরখানিও সঙ্গে সঙ্গে নিষ্পেষিত করিয়া দিবে না? উঃ, কি আলো আকাশের গায়ে। সমস্ত বিদ্যুতের শক্তি একত্রিত হইয়া আকাশের পশ্চিমপ্রান্ত ফাঁসাইয়া দিল বুঝি!

তপন সে তীব্র তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া চোখ বুজিল, সঙ্গে সঙ্গে—বুক কাঁপাইয়া কান ফাটাইয়া শব্দ হইল,—কড়্—কড়্—কড়াৎ!

সুবোধের মা বার তিনেক দেবতার নাম উচ্চারণ করিলেন। ও-ঘর হইতে তপনকে

ডাকিলেন, বাবা, ছাতিটা মাথায় দিয়ে—এ-ঘরে এসে বসো। একলা থাকা ঠিক নয়, বাজ পড়চে।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেও ঝড়বৃষ্টি একেবারে থামিল না। কালবৈশাখী বাদল আনিয়াছে। শ্রাবণের এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যা। বৃষ্টি ও বায়ুর বেগ কথঞ্চিৎ শান্ত হইল বটে, একেবারে থামিল না। মাঝে মাঝে বর্ষণ চাপিয়া আসে, আবার থামিয়া যায়। বিদ্যুৎ আকাশের এ-ধার ও-ধার চলাফেরা করে, শব্দ কম। মেঘের চাপা গুম গুম্ শব্দ—দীর্ঘকাল-স্থায়ী খেলার আভাস।

সুবোধের মা বলিলেন, বর্ষা নামলো দেখচি। এ বেলা খিচুড়ি হোক, কি বল তপন ?

তপন পরম উৎসাহে মাথা নাড়িয়া বলিল, বেশ ত।

আভা মাথায় গামছা দিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল। বাদলপ্রকৃতির মতই অন্তর উহার দুর্য্যোগ-ময়ী। বসিয়া বসিয়া আর খানিকক্ষণ গল্প করিলেও পারিত। কিন্তু গল্প করিবে কে ?

ছোট ঘরখানিতে আভা আজ একাই শুইল। ঘরে কাঁসার বাসনপত্র আছে, বাদলদিনে চোরের সুবিধা বড় বেশী। মা বড় ঘর আগলাইবার জন্য ও ঘরেই রহিলেন। ছোট ঘরের সামনের ঘরে তপন ও সুবোধ আশ্রয় গ্রহণ করিল।

দীপ নিবিল। বাহিরে রিমিঝিমি বৃষ্টির তালে চক্ষু জুড়িয়া ঘুম নামিল। গভীর শান্তিপূর্ণ নিদ্রা।

* * *

আভা দুয়ার বন্ধ করিয়াই কিন্তু ঘুমাইতে পারিল না। দীপ নিবাইল, নহিলে মা ও-ঘর হইতে বকিবেন। কিন্তু ঘুম যেন আর আসে না। বাদলরাত্রির বাহিরের মাতামাতির সঙ্গে অন্তরের সুন্দর যোগ। আসুক ছাঁট। জানালা খুলিয়া আভা বালিশটা জানালার ধারে পাতিয়া তাহার উপর মাথা রাখিয়া বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল।

ব্যাঙ ডাকিতেছে—গোঙর-গোঁ। জলের উপর দিয়া ছপ্ ছপ্ করিয়া শিয়ালই একটা ছুটিয়া পলাইল হয়ত। ভিজা মাটির গন্ধ বেলফুলের সঙ্গে মিলিয়া ভারি বাতাসের কাঁধে চাপিয়া জানালাপথে আভার সর্ব্বাঙ্গ স্নিগ্ধ করিয়া দিল। পাকা আমের গন্ধও সেই সঙ্গে মিশানো। ওই বোম্বাই গাছটার পিঁপড়াগুলা সবই হয়ত বৃষ্টির জলে ভিজিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়াছে কিংবা ঝড়ে তাহাদের বাসা ভাঙিয়া কোথাও উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। কাল ওই গাছে উঠিলে বীরত্ব দেখাইবার কিছুই থাকিবে না। বেচারা—কালিকেশ !

স্পর্দ্ধাও তাহার কম নহে, আভাকে মারিতে চাহিয়াছিল। মারে নাই ঘৃণা করিয়া, কিন্তু দু'ঘা মারিলেই কি ইহার চেয়ে বেশী যন্ত্রণা হইত ? ঘৃণা ! আভাকে সে ঘৃণা করে ! আর দাদা ও মা মিলিয়া সেই গোঁয়ারটার সঙ্গে আভার জীবন সংলগ্ন করিবার পরামর্শ আঁটিতেছিলেন। আভা যেন খেলনা ? খেয়াল-খুশীতে যাহাকে ইচ্ছা বিলাইয়া দিলেই হইল ! চাই সে অবহেলায় একপাশে ফেলিয়াই রাখুক, কিংবা আছাড় মারিয়া ভাঙুক। বেশ বিধান যা-হোক !

কালিকেশ সত্যই কাপুরুষ। আভাকে প্রহার করিয়াই গ্রাম ছাড়িয়াছে। দোষ করিয়া ক্ষমা চাহিবার সাহসটুকু পর্য্যন্ত তাহার নাই। না, চিরদিনই কালিকেশ অমন। বাল্যকালের বহু ঘটনাই মনে পড়ে—বহু কলহ ও লাঞ্ছনার ইতিহাস। ক্ষমা সে কোন দিন চাহে নাই। অকারণে নির্য্যাতন করিয়াছে, নির্লজ্জের মত আসিয়া পরদণ্ডেই বলপ্রকাশে কলহ মিটাইয়া ফেলিয়াছে। কালিকেশের বড় বড় চোখ দু'টার পানে চাহিলেই ভয়ে আভার বুক কাঁপিয়া উঠে। এমন লোকের সঙ্গে কি কলহ করিয়া থাকা যায় ! মুখে ক্ষমা সে চাহে না, কিন্তু ক্রোধে আরক্ত আয়ত চক্ষুতে অগ্নি-কণা নিষ্ঠুরভাবে জ্বলিয়া উঠে ; সন্ধি-মুহূর্ত্তে সেই আয়ত চক্ষুই কোমল অশ্রুপতনের মাধুর্য্যে মনকে গলাইয়া দেয়। বলপ্রকাশের মধ্যে তাই ক্রোধ ও ক্ষমা দু'টি জিনিষই আশ্চর্য্যরূপে চোখের মধ্যেই ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়।

সে মহৎ—উদার ? আভাকে প্রহার করিয়া যত হীনতাই অর্জ্জন করুক না কেন, ঐ দু'টি বিশেষণ হইতে টানিয়া নামাইবার দুঃসাহস আভার নাই। দেশের সেবা-উপলক্ষ্যে খুব বেশী না হউক —যে টাকা তাহার হাতে আসিয়াছিল, সে টাকাটা অনায়াসে আত্মসাৎ করা চলিত। তার না ছিল পাকা লেখাপড়া, না ছিল ভাল হিসাব।

কাগজে মাঝে মাঝে এমন কাহিনী কতই তো বাহির হয়।

আভাকে শুনাইয়া কালিকেশ মুখ রক্তবর্ণ করিয়া কহিত, এই সব নরপশুরা কাজটা খালি পিছিয়ে দিচ্ছে, আভা। অর্থের এতই যদি লালসা তোদের—লেখাপড়া শিখে ফাঁকির পথ ধরলি কেন ?

আভা যদি রহস্য করিয়া বলিত, দেখা পেলে তাদের কি দণ্ড দিতে কালি-দা?

দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া কালিকেশ উত্তর দিত, প্রাণদণ্ড। উঃ, আইন যদি আমার হাতে থাকতো!

আভা হাসিয়া বলিত, তাহলে ফাঁসিকাঠে দেশ উঠতো ভরে।

কালিকেশ ক্রুদ্ধ চক্ষে চাহিতেই আভা হাসি থামাইয়া বলিত, থাম, বীরপুরুষ থাম; আমি বলছিলাম, কি, দোষীকে শোধরাবার অবসর না দিয়ে—

কথা শেষ না হইতেই হো হো করিয়া কালিকেশ হাসিয়া উঠিত, দোষীকে শোধরাবার অবসর! সে আইন কাদের জন্য জান? যারা মূর্খ, বোঝে না— তাদের জন্য! কিন্তু লেখাপড়া শিখে আইনের ধারা মুখস্থ করে যারা ফাঁকির চেষ্টায় ফেরে, তাদের ফাঁসি নয়, স্রেফ্ গুলী—স্রেফ্ গুলী!

দেশ দেশ করিয়া এত অল্প বয়সে এই যে অক্লান্ত দুঃখ, কষ্ট, বিপদ মাথা পাতিয়া লওয়া, সে কি মরণভীত সঙ্কীর্ণ অন্তরের কাজ? বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রিগুলি ইচ্ছা করিলে পাকা ফলের মত কালিকেশ বিনা আয়াসেই সংগ্রহ করিতে পারিত। বাপের জমিজমা যাহা আছে, তাহার ভরসা না করিলেও দুই দাদার সুপারিশে ভাল চাকুরি কি একটা মিলিত না? অতঃপর বিদ্যা ও বিত্তের বেড়া দিয়া নির্বিঘ্ন-সংসারে গৃহীজীবনের প্রতিষ্ঠা। কাব্য বল, কার্য্য বল, খ্যাতি বল, নাম বল—কি না পাওয়া যায়!

সে-কথা একদিন হইয়াছিল।

কালিকেশ হাসিয়া আবৃত্তি করিয়াছিল:

মোর তরে রুদ্রের প্রসাদ—
পথে পথে অপেক্ষিছে শ্রাবণ-রাত্রির বজ্রনাদ।

কালবৈশাখীর এই বজ্রনাদমুখরিত অন্ধকার ভরা গ্রামখানিতে—রুদ্রের প্রসাদ মাগিয়া গৃহহারা সেই পথিক—কোন্ তেপান্তরের মাঠে বিদ্যুতের শিখায় পথ দেখিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে, কে জানে?

আভা জানালার ধারে আর একটু সরিয়া আসিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বাহিরের পানে চাহিল। কিছুই দেখা যায় না, সূচীভেদ্য অন্ধকার। জলস্থল একাকার হইয়া গিয়াছে, শুধু দর্দ্দুরী-নির্ঘোষে গ্রামখানির পরিচয় মিলে।

কোথায়—কোথায় সেই গৃহহারা পথিক! সেই নিষ্ঠুর, নির্ভীক, মহৎ, উদার?

কালিকেশ কেন দু'ঘা মারিল না! আভা অভিমানের বশে যে-অন্যায় করিয়াছে, সত্যই তাহার মার্জ্জনা নাই। আজ এই ঘনঘোর দুর্য্যোগময়ী তামসী-নিশীথে কালিকেশের নিষ্ঠুরতাকে ছাপাইয়া আভার অপরাধই বার বার বিদ্যুৎ-বিদারণে অন্তরকে চিরিয়া চিরিয়া দিতেছে। নিশ্চিন্ত আরাম-শয়নে পড়িয়া অভিমানের ধ্যান করা বা ছবি আঁকা মন্দ নহে, ঘৃণা করাও সহজ; কিন্তু ঘৃণা-অভিমানের বাহিরে যে দুর্দ্দান্ত আশ্রয়হারা হইয়া জল-ঝড় মাথায় পাতিয়া দুর্গম পথ অতিক্রম করিতেছে, তাহার কথা ভাবিলে ওই বৃত্তিগুলিকে বিলাস ছাড়া কিছুই মনে হয় না।

ওকি? বৃষ্টির ছাঁট চুল বাহিয়া চোখের কোণ দিয়া বালিশে গড়াইয়া পড়িতেছে? না, আভা কাঁদিতেছে? অনুশোচনা? মন্দ নহে! দোষীর বিচার করিতে বসিয়া কান্না? দুর্য্যোগময়ী রজনীর এ কেমন নূতনতর বিলাস!

ছপ্—ছপ্—ছপ্! মস্ত বড় একটা শিয়াল জানালার ধারে দাঁড়াইল।

আভা কৌতূহলভরে মাথা তুলিল না। সে তখন তেপান্তরের মাঠে ঝড়জল মাথায় করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে।

পিছন হইতে কে ডাকিল, আভা।

আভা পিছনে না চাহিয়াই ছুটিল। ছুটিতে ছুটিতে সে ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল—সেই জল-কাদার উপর। একটা বিশ্রী ক্লেদার্দ্র স্পর্শ; শীতে ও ঘৃণায় সারা দেহ শিহরিয়া উঠিতেই তন্দ্রা টুটিয়া গেল। কিন্তু সেই ডাক মিলাইল না।

আভা চমকিত হইয়া চাহিতেই অন্ধকারমাখা একখানি হাত তর্জ্জনী উঠাইয়া কি যেন ইঙ্গিত করিল। ভয়ে আভা কথা বলিতে পারিল না। তর্জ্জনী নামাইয়া মূর্ত্তি মৃদুস্বরে বলিল, আমি।

আভা অর্দ্ধোত্থিত ভাবেই ফ্যালফ্যাল করিয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল। স্বপ্নঘোর কাটিয়াও কাটিতে চাহে না—এমনই মোহ বাদলরাত্রির!

মূর্ত্তি জানালার ভিতর হাত গলাইয়া দিয়া কহিল, হাত ধর, দেখ সত্যি কি না?

আভা অস্ফুট স্বরে বলিল, এ সময়ে—

মূর্ত্তি তেমনই নিঃশব্দ হাসিমাখা স্বরে বলিল, এই ত সময়। কিন্তু—আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ভিজবো বল? দুয়োর খোল, কথা আছে অনেক।

আভা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। বালিশের

তলা হইতে দিয়াশলাই লইয়া গৃহকোণের প্রদীপটি জ্বালিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল।

আগন্তুক ঘরে ঢুকিয়া দুয়ার অর্গলাবদ্ধ করিল।

আভা বিবর্ণ মুখে বলিল, চল না ও-ঘরে। মাকে ডেকে তুলে—

কালিকেশ বলিল, তা হলে মার কাছেই যেতাম, মাকেই ডাকতাম, এখানে এসে উঠতাম না।

আভা ম্লান মুখে কালিকেশের পানে চাহিয়া কি বলিতে গেল, কালিকেশ বাধা দিয়া বলিল, দোহাই তোমার—আগে ভিজে কাপড় ছাড়বার কোন ব্যবস্থা থাকে ত কর, তারপর না-হয় তোমার আপত্তি শোনা যাবে।

আভা বলিল, তাইত বলছিলাম—মাকে ডাকি।

অর্গলে হাত দিয়া কালিকেশ কহিল, ডাক, চল্লাম।

আভা কি যে করিবে, ভাবিয়াই পাইল না। এই নিশীথরাত্রিতে জলে, ঝড়ে, পৃথিবীতে তুমুল আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে, এমন সময় কালিকেশ কেন আসিল? একাকিনী কুমারীর ঘরে অর্গলাবদ্ধ করিয়া—হউক সে পরিচিত—মহৎ, উদার—কি এমন কথা তাহার? আভার বুক ভয়ে টিপ-টিপ করিতে লাগিল। সত্য বটে কালিকেশের অনুধ্যান করিয়া স্বপ্নে সে প্লাবন-বিস্তীর্ণ মাঠের উপর দিয়া ছুটিতেছিল, তাহার দুঃখের পশ্চাতে সহানুভূতিভরা কল্পনাকে প্রেরণ করিয়া মনে মনে শ্রদ্ধা নিবেদন সে করিতেছিল, কিন্তু এমন করিয়া মুখোমুখী—দীপালোকে? বাহিরের বাদল-অন্ধকারকে মুছিয়া সেইদিনের অপরাহ্ণকেই কক্ষমধ্যে দাঁড় করাইয়া দিয়া গেল যে! আভার ক্রমবর্দ্ধমান অভিমান বুক জুড়িয়া উঠিতে-না-উঠিতে অর্গল খোলার শব্দে—মিলাইয়া গেল। ক্ষিপ্রকরে আলনা হইতে সে একখানা শাড়ী টানিয়া লইয়া কালিকেশের দিকে ছুড়িয়া দিল, কোন কথাই বলিল না।

উষ্ণ কাপড়ের স্পর্শে কালিকেশ ফিরিল। ফিরিয়া মৃদু হাসিল ও দ্বার অর্গলাবদ্ধ করিয়া কহিল, যাক, আশ্রয় দিলে।

মুহূর্ত্তে সে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া দড়ির আলনা হইতে শুষ্ক গামছা টানিয়া লইয়া মাথা মুছিল ও স্তম্ভিত আভার পানে চাহিয়া কহিল, আলোটা নিবিয়ে দাও।

আভা আর সহ্য করিতে পারিল না। অভিমান-আর্দ্র স্বরে বলিল, সেদিনের বেত তোমার হাতে নেই কেন? না থাকে ত বল, আমি কুড়িয়ে এনে দিই। আমায় শাস্তি দিয়ে চলে যাও।

কালিকেশ স্নিগ্ধ হাসিতে মুখমণ্ডল ভরাইয়া কোমলস্বরে বলিল, ছি! এখনও সে কথা মনে করে রেখেচ? আমি ত সঙ্গে সঙ্গেই ভুলে গেছি।

আভা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, ভুলে গেছ ত আবার এলে কেন? আমার যে-টুকু অপমান বাকি ছিল—

কালিকেশ মধুর স্বরেই বলিল, অপমান তোমায় করবো এমন ইচ্ছা আমার কোন কালে হয় না। তোমায় বকি বা দু'ঘা মারি—মনে করি, নিজের ওপর পীড়ন করছি। দোহাই, আলো নিবিয়ে না দিলে— তুমি জান না আভা কি বিপদ ওই জলঝড়ের সঙ্গে বাইরে আমার জন্য অপেক্ষা করচে।

আভা সহসা ভয়ে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, তুমি কি খুন করে এসেচ?

কালিকেশ মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, না। এ ডিটেক্‌টিভের গল্প নয়। এ জগতে সত্যিকারের খুন খুব কমই হয়। খুন-করাকে আমি কোনকালে বাহাদুরী বলে মানি নে। অথচ মিথ্যাকে ঠেকাতে দু'টি সহজ সরল সত্যকথা বলেচ কি সবাই তোমায় চোখ রাঙাবে।

আভা কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় জানালা দিয়া একটা দমকা বাতাস আসিয়া আলো নিবাইয়া দিল।

আভা ব্যস্ত হইয়া ওধারে যাইতেই খট্‌ করিয়া একটা শব্দ হইল। কালিকেশ পকেট হইতে টর্চ্চ বাহির করিয়া সেইদিকে আলো ফেলিয়া দেখিল, আভার পায়ের কাছেই মাটির প্রদীপ উল্টাইয়া পড়িয়াছে—ভাঙ্গে নাই।

হাসিয়া বলিল, ভালই হলো। থাক, ওকে তুলো না। তুললেও তেল কোথায় পাবে যে জ্বালাবে? ভয় কি, তুমি ওই তক্তপোষের উপরেই বোস, আমি এখানে দাঁড়িয়ে যা বলবার বলে যাই। বলিয়া টর্চ্চ নিবাইয়া দিল।

রুদ্ধনিশ্বাসে আভা কালিকেশের কথার অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কালিকেশ বলিল, সে দিনের কথা, তুমি যে ইচ্ছে করে অমন একটা ঘৃণাজনক কাজ করনি, প্রথমটা রাগের মুখে বুঝতেই পারিনি। তারপর, এখান থেকে চলে গিয়ে বহুক্ষণ ধরে ওই কথাই ভাবলাম।

আভা অস্ফুটস্বরে বলিল, আজ ওসব কথা তোলবার কি দরকার?

কালিকেশ বলিল, আছে। আমরা কাউকে ব্যথা দেব না—এই পণ করেই সেবাব্রত গ্রহণ করেচি।

আভা শুষ্কস্বরে বলিল, তাই আমায় সান্ত্বনা দিতে এসেচ? তুমি কি মনে কর—এখনও আমি কচি খুকী যে—

কালিকেশ বলিল, জানি। কিন্তু বয়সের বিজ্ঞতায় কি চোখের জল চেপে রাখা যায়? যায় না বলেই ত জলঝড়ের মধ্যেই আজ এখানে আসতে হলো। আমায় আঘাত করতে সেদিন তুমি ওই কাজ করেছিলে, কিন্তু আমার তিরস্কারের চেয়ে তোমার কাজে কি তুমি বেশী ব্যথাই পাওনি?

আভা ব্যঙ্গ স্বরে বলিল, তুমি অন্তর্য্যামীত্বের বড়াইও করতে পার দেখচি!

কালিকেশ সে কথায় কান না দিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল, সত্যি বলতে কি, আমি অন্ধ। যে কাজ আমার সম্মুখে—তারই আলোয় সোজা পথটিকে আমি কর্ত্তব্যের মত চিনি। আসে-পাশে কোথায় কি রইলো বা গেল, সে হিসাব আমার থাকে না।

আভা বলিল, তবে এ অপূর্ব্ব মনস্তত্ত্বের খবর পেলে কোথায়?

কালিকেশ বলিল, একটা ঘটনা থেকে! কিন্তু থাক সে-সব অনাবশ্যক কথা। মন টানতেই ফিরলাম। বিশ্বাস কর আভা—তোমায় তিরস্কার করে পর্য্যন্ত একটি মুহূর্ত্তের তরে আমার মনে শান্তি ছিল না।

আভার সারা দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এ নিষ্ঠুর আজ বলে কি? গ্রামের সেবা ছাড়া আর কোনকিছুতেই যে কর্ত্তব্যকঠিন মনটি তাহার ক্ষণেকের তরেও জড়াইয়া গিয়া অশান্তি অনুভব করিতে পারে, এ-কথা কে বা জানিত! খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া আভা ব্যাকুলস্বরে বলিল, তা অন্ধকারে বিপদের কথা বলছিলে না?

কালিকেশ সে-কথায় কান না দিয়া বলিল, তাই ত ভাবলাম, জলঝড়ের রাত্রিতে একলা তোমায় পাব, অনেক কথা বলতে পারবো। পরিষ্কার দিনের আলোয় মেলাই কথা দিয়ে যা বোঝানো যায় না, এই নিস্তব্ধ অন্ধকারে একবারমাত্র তোমার হাতখানি ধরে কোন কথা না বলে তাই বোঝাবো। হাতের ভাষা আছে জানো?

আভা রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, না, আমি গণক নই!

কালিকেশ বলিল, আমিও নই। বাড়ী এসেই তোমার সঙ্গে দেখা করবো, এই হলো আমার প্রথম ইচ্ছা। বাবা বললেন—কবে ফিরবে? বললাম, জানি না। আবার বললেন, এমন কিছু খারাপ কাজ করো না যার লজ্জায় আমার মুখখানা পুড়ে যায়। তাঁর পা ছুঁয়ে বললাম, আপনি বিশ্বাস করেন আমার দ্বারা তেমন কাজ হবে? তিনি মাথা নাড়লেন। প্রণাম করে উঠতেই তিনি আশীর্ব্বাদ করলেন, 'মানুষ হও।" আভা, মানুষ কি আমি নই? আশ্চর্য্য আশীর্ব্বাদ, নয়?

বাহিরে বোধহয় বৃষ্টি ধরিয়া আসিতেছিল। শেষরাত্রির মেঘভাঙ্গা চাঁদ পাণ্ডুর আকাশের গায়ে উঁকি মারিলেন। বর্ষণসিক্ত গাছের ডালে ডানা ঝাপটাইয়া কয়েকটা পাখী—প্রভাত-বন্দনা গাহিয়া উঠিল।

কালিকেশ চমকিত হইয়া কহিল, হাঁ,—আসল কথাই বলতে ভুলে গেছি। বাবা বললেন, কাল নাকি তোমার দাদা আমাদের বাড়ী গিয়েছিলেন। তোমার মার ইচ্ছা তিনি জানিয়ে এসেচেন, বাবা রাজী হন নি। তাতে হয়ত জেঠাইমা মনোক্ষুণ্ণ হয়েচেন।

আভা কোন উত্তর দিল না।

কালিকেশ বলিল, আমাদের বিয়ে হতে পারে না—এতো স্পষ্ট কথা। নয় কি? এর মধ্যে আবার মনে-করা-করির কি দরকার আছে।

এবারও আভা কোন উত্তর দিল না।

কালিকেশ বলিল, তোমার মাকে বুঝিয়ে বলতে পারবে না কি? লজ্জা করবে?—তবে থাক।

আভার যাহা কিছু বলিবার ছিল, ওই একটি কথায় কালিকেশ সে পথ বন্ধ করিয়া দিল। একে নির্জ্জন রাত্রি, তায় অন্ধকার ঘর, বাহিরে বিশ্বের উপর প্রকৃতির বিপ্লব! মুখোমুখী তরুণ-তরণী সেই অন্ধকারে বসিয়া। দিব্য নিশ্চিন্তে কালিকেশ বিবাহের কথা বলিয়া গেল। দিব্য নিশ্চিন্তেই। আর পাঁচটা সাধারণ কাজের মত এও যেন একটা!

হায়! কিছু আগে ইহারই মুখে ব্যথার কথা শুনিয়া আভার দেহে রোমাঞ্চ জাগিয়াছিল!

কিন্তু বিবাহ হইতে পারে না কেন? সে-কথা কালিকেশ জানে, আভা জানে না।

কালিকেশ খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, তবে আসি। হয়ত আর দেখা হবে না, হয়ত—

আভা বলি-বলি করিয়াও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

কালিকেশ নিঃশব্দে হাসিয়া কহিল, হয়ত থাক। চরকা, খদ্দর, দেশ, এ-সব কখনও ভুলো না। তোমায় উপদেশ দেওয়াই মিছে, জানি তুমি ভুলবে না কোনদিন।

খিল খোলার শব্দ হইল। তথাপি আভা কোন কথা বলিতে পারিল না। তাহার আয়ত চোখের কোল বহিয়া নিঃশব্দে ধারা নামিয়া আসিল। কালিকেশ চলিল, হয়ত বা জন্মের মতই। কিন্তু কেন ও আজ দেখা দিতে আসিল? সেদিনের তীব্র ভর্ৎসনার ভিতর দিয়া নিষ্ঠুর যে বিষ ঢালিয়া দিয়াছিল, তাহার জ্বালায় জর্জ্জরীভূত হইয়া আভা ওর স্মৃতি অনায়াসে ভুলিতে পারিত। কেন আজ প্রসন্ন মনে ক্ষমার কথা না কহিয়াও অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া গেল ও! দেহে ও মনে এই অমেয় দান, এই অযাচিত স্নেহস্পর্শ—কি করিবে সে? কোথায় লুকাইবে মুখ? অন্তরের উত্তাল হাহাকার সশব্দে বুক বিদীর্ণ করিয়া বাহিরে আসিল।

কালিকেশ মুখ ফিরাইয়া টর্চ্চটা জ্বালিয়া ফেলিল।

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আভা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

বিস্মিত কালিকেশ পুনরায় দ্বার বন্ধ করিয়া আভার শিয়রে আসিয়া কোমল কণ্ঠে ডাকিল, আভা?

আভা রুদ্ধবেদনায় মাথা নাড়িয়া অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, তুমি যাও, তমি যাও, যাও।

কালিকেশের বিস্ময় বাড়িল। টর্চ্চ নিবাইয়া আভার মাথায় একখানি হাত রাখিয়া কহিল, ছি! আবার কাঁদে?

এই কথায় কান্না কমে না। সুতরাং প্রাণ ভরিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া আভা বড় কান্নাটাই কাঁদিল। বাহিরের যত মেঘ, যত বর্ষণ, যত বিদ্যুৎ বজ্র সমস্ত অন্তর আশ্রয় করিয়াছে। ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অশ্রুতে বাহির করিয়া না দিলে আভার মৃত্যু অনিবার্য্য। কালিকেশ নিঃশব্দে ডান হাতখানি আভার মাথায় রাখিয়া বসিয়াই রহিল।

কাঁদিয়া শান্ত হইয়া আভা উঠিয়া বসিল। কালিকেশের পানে অন্ধকারে অশ্রুভেজা দৃষ্টি মেলিয়া পরিষ্কার কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, আমাদের বিয়ে কেন হতে পারে না বলবে কি?

কালিকেশ হতবুদ্ধির মত বলিল, তা কি তুমি জান না? আমার মত হতভাগা, ছন্নছাড়া—

আভা সংযত কণ্ঠে বলিল থাক। কিন্তু—এই রাত্রিতে আমার এখানে এতক্ষণ কাটিয়ে গেলে কাল সকালে আমার যে মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না, তা তুমি জান?

কালিকেশ কহিল, অন্ধকারে এসেছি, দেখবার কেউ নেই।

আভা দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, আছেন। একজন আছেন।

কালিকেশ জিজ্ঞাসা করিল, কে?

আভা বলিল, ধর্ম্ম। তাঁর কাছে আমি কি কৈফিয়ৎ দেব? জীবনে আমিও যদি বিয়ে না করি এবং তাতে যদি লোকে কলঙ্ক রটায়, কিসের জোরে সে কলঙ্ক আমি ঠেকাবো— বলে দাও?

কালিকেশ বলিল, কেন, তোমার মনের জোরে। সত্যিই ত কোন মন্দ কাজ করি নি আমরা।

আভা বলিল, না করি নি। কিন্তু মনে আমার জোর নেই।

কালিকেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আভার পানে চাহিয়া বলিল, এ কথার অর্থ কি আভা?

আভা নতমুখে উত্তর দিল, মনে আমার জোর নেই।

কালিকেশ কহিল, তাহলে বিবাহ করাই তোমার উচিত।

আভা সবেগে গ্রীবা তুলিয়া কহিল, বিয়ে! মেয়েমানুষের কবার বিয়ে হয়?

কালিকেশ কহিল, দুর্ভাগ্যক্রমে তোমার হয়ত একবারই হবে।

আভার কণ্ঠে অস্বাভাবিক জোর ফুটিয়া উঠিল, হাঁ, একবারই! হবে নয়, হয়েচে। সেই অধিকার, —সেই ভার আমায় তুমি দিয়ে যাও। যেখানে তোমাব খুশী, ইচ্ছে হয় এসো, না-হয় এসো না— শুধু বলে যাও—

কালিকেশ ম্লান হাসিয়া বলিল, আমার ইচ্ছেয় যদি যাওয়া-আসা চলতো তাহলে অনায়াসে এ-ভার তোমায় দিয়ে যেতাম। তুমি ছেলেমানুষ, সারা-জীবন মানে কি বোঝ না। একটা উত্তেজনায় যা তা করে বসো না।

আভা চৌকি ছাড়িয়া অন্ধকারে উঠিয়া আসিয়া

কালিকেশের পদপ্রান্তে মাথা রাখিয়া বলিল, না, না, উত্তেজনা নয়, আমায় আশীর্ব্বাদ কর। নইলে আত্মহত্যা ছাড়া আর আমার পথ নেই।

ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে মাঠের পথে আসিতে আসিতে শূন্যস্খলিত হইয়া একটা বিদ্যুৎভরা বজ্র মহাশব্দে সম্মুখের তালগাছে পড়িয়াছিল। নির্ভীক কালিকেশ সেই শব্দেও বুঝি অন্তরে এতটা কাঁপিয়া উঠে নাই! এ আভা বলে কি? চিরজীবনের অধিকার? বিবাহ?

আভা কি জানে না, রাত্রির অন্ধকারে গগনের বিস্তার-সীমায় যে-সব নক্ষত্র সারিবাঁধা পথে নিজ নিজ গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া শৃঙ্খলা ও শান্তিকে সমৃদ্ধ করে, কালিকেশ সেই আকাশ-চারীদের কেহ নহে? মাঝে মাঝে জ্যোতির্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া অনন্ত শূন্যে দেউটি জ্বালাইয়া বে-লাইন যাহারা ইরম্মদবেগে অধোগামী হয়, কালিকেশের প্রিয় তাহারা। বশিষ্ঠ-অরুন্ধতীর তপোবনের ওপারে, সাতভাই বুধের বহুদূরে, চন্দ্রমণ্ডল ছাড়াইয়া, সন্ধ্যা ও শুকতারার পাশ কাটাইয়া ছায়াপথের অযুত তারা-দম্পতিকে নতি জানাইয়া নিত্যই সে অন্ধকারে পৃথিবীর আকর্ষণে অধোগামী হয়। রূপসম্পদশালিনী ধরিত্রী—তাঁরই কোমল মৃত্তিকায় মুখ গুঁজিয়া তারা জীবনের জ্যোতিকে নিবাইতে ভালবাসে। শূন্যে ঝুলিয়া অকারণ জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া লোকের প্রশংসা যদি সে না-ই লইতে পারে—পৃথিবীর পঙ্কশয্যা, কে বলিবে, তাহার মনোরম নহে!

পায়ের কাছে আভা মাথা রাখিয়া পড়িয়া আছে। পরম আশ্রয় তাহার চাই। সমস্ত জীবনকে কুৎসা গ্লানির উপর মেলিয়া ধরিয়া সূর্য্যের আলোককে প্রাণ ভরিয়া দেখিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার। সারাজীবনের পাথেয়—এই বাণী।

আভা পড়িয়া রহিল, কালিকেশও ভাবিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত যেন যুগের মধ্যে লুকাইয়া গিয়াছে! ধর্ম্ম—সমাজ!

বহুক্ষণ পর অস্ফুট স্বরে কালিকেশ বলিল, তুমি ধর্ম্ম মান আভা?

পদতললীনা আভা উত্তর দিল, মানি।

দুই হাতে মাথার চুল শক্ত করিয়া ধরিয়া কালিকেশ চঞ্চল কণ্ঠে কহিল, আমায় টেনে নামাতে তোমার এত আগ্রহ কেন আভা?

অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। মুহূর্ত্তে পায়ের উপর হইতে মাথাটা শুধু সরিয়া গেল এবং কানের মধ্যে সুরের শিখা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

—ধর্ম্ম না মানো ক্ষতি নেই, কিন্তু ভক্তি, বিশ্বাস, ও-গুলো মানুষকে নীচে নামায় না কোন দিন। কিন্তু তুমি এমনি স্বার্থপর যে, নিজের সুখের ভাগ দিতে চাও না কাউকে। বেশ দিও না, কিন্তু মনে রেখো, সাধনা করবার অধিকার সকলেরই আছে। দেশ তোমার একার নয়।

কালিকেশ আর শুনিতে পারিল না। দু'হাতে আভার মাথা তুলিয়া ধরিয়া কহিল, তবে ধর্ম্ম থাকুক পড়ে, নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের জোরে—এ অধিকার তুমি পাবে। আমার প্রবৃত্তির একটা রাশ তোমার হাতেই দিয়ে গেলাম আভা, মনে মনে টান দিয়ো, হাত একটা চমকপ্রদ খবরও তুমি আমার সম্বন্ধে সংবাদপত্রে পাবে না।

উত্তেজনা উদ্বেগ একটুও ছিল না। কালিকেশ শান্তভাবে টর্চ্চটা পকেট হইতে বাহির করিয়া জ্বালিয়া বিছানার উপর রাখিল ও আভার খোঁপা হইতে একটা কাঁটা টানিয়া লইয়া আপনার বাম বাহুতে বিদ্ধ করিয়া দিল। মুহূর্ত্তে তাজা রক্তে সেখানটা ভরিয়া গেল। বিস্মিত আভা কোন কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সেই রক্তাক্ত বাহু আনিয়া আভার সিঁথির উপর রাখিয়া কালিকেশ বলিল, আজ থেকে তুমি আমার স্ত্রী—সঙ্গিনী।

টর্চ্চের আলোয় আভার সিঁথি চক্‌চক্ করিয়া উঠিল, আনন্দে মুখখানি তার প্রভাত-পদ্মের মত টলটল করিতে লাগিল।

কালিকেশ ত্বরিতে টর্চ্চ নিবাইয়া দুয়ার খুলিয়া ফেলিয়া এবং আর কোন কথা না বলিয়া কোন দিকে না চাহিয়া বাহির হইয়া গেল।

* * *

একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তপনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। শেষরাত্রির পাণ্ডুর চাঁদের আলোয় সে দেখিল, আভার ঘর হইতে এক পুরুষমূর্ত্তি বাহির হইয়া উঠানের জলকাদা ভাঙ্গিয়া বাগানের ও-ধারে চলিয়া গেল। আভা দুয়ারে দাঁড়াইয়া সেই অপস্রিয়মান লোকটার পানে পলকশূন্য হইয়া চাহিয়াই রহিল। প্রফুল্ল মুখ, উজ্জ্বল চক্ষু। কে বলিবে দিন দুই পূর্ব্বের ম্রিয়মাণা তরুণী। বিস্রস্ত কেশপাশ পিছনে এলাইয়া পড়িয়াছে। পূব হইতে জ্বলজ্বলে প্রভাততারা ও পশ্চিম হইতে ক্ষীণকায় চাঁদ যে রশ্মিটুকু আভার প্রসন্ন মুখে ফেলিয়াছে—সিঁথির সিন্দুরবিন্দু তাহাতে বিশেষ উজ্জ্বল বোধ

হইতেছে না। কপালময় একটা তুরপনেয় কলঙ্কের দাগ—কালো হইয়া ফুটিয়াছে। এইমাত্র যে বাহির হইয়া গেল···ঘৃণায় তপনের অন্তর শিহরিয়া উঠিল। ওঘরে সুপ্তিমগ্ন মা জানেন না, এ-ঘরে অচেতন সুবোধও জানে না—বাদলরাত্রি কতখানি অগৌরব বহিয়া আনিয়া এই ছোট কুটীরখানিতে ভরিয়া দিয়া গেল। বইয়েপড়া সেই লাইনটি সে কয়েকবার উচ্চারণ করিল :

Frailty thy name is woman!

মিথ্যা নহে। হয়ত বা জগতের সমস্ত নারী-সম্বন্ধে চোখে একটা চশমা দিয়াই ঐরূপ উক্তি করা চলে। ছায়াকেও সে দেখিয়াছে। কথায় আচরণে কোথাও এতটুকু জড়তা তাহার নাই। তরুণকে সে Compliment দেয় অসঙ্কোচেই, তপনকে সম্বন্ধচ্ছেদের জন্য দুঃখ করিতে নিষেধ করে। মন তাহার পদ্মপত্রের জল, সদাই টল টল করিতেছে। আভাকে দেখিয়া সে অনেকটা তৃপ্তি পাইয়াছিল! নারীর সহজাত গুণ কোমলতা তার কার্য্যে ও ব্যবহারে কুসুমসৌগন্ধের মত পরিব্যাপ্ত। সে তর্কচ্ছলে কখনও অসঙ্গত কথা বলে না, বা ব্যঙ্গোক্তির দ্বারা কাহারও মন বিঁধিতে ভালবাসে না। তার ক্রোধের প্রকাশ যেমন সহজ, প্রসন্নতার আবির্ভাব তেমনই অনাড়ম্বর। ফ্যাশান লইয়া সে ব্যতিব্যস্ত হয় না; গৃহস্থের ঘরের মেয়ে—বিদ্যা বা সৌজন্যের বেড়ার ওপারে দাঁড়াইয়া নব আগন্তুকের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত রুচির কোন খুঁত আছে কি না খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখে না। অর্গ্যানে বসিয়া গান গাওয়া বা বাসে না চড়িয়া পদব্রজে যাওয়ার বড়াইও তার নাই। সরল। এত সরল যে সময়ে সময়ে তপনের মনে হয় জীবনকে কয়েক দণ্ডে পুরাতন করিয়া ফেলিয়া তবে তার নিষ্কৃতি। সেই ঐশ্বর্য্যশালিনী আভা সারল্যের অন্তরালে এতদিন যাহা লুকাইয়া রাখিয়াছিল, নারীর প্রকৃত রূপ বুঝি তাহাতেই নিহিত :

Frailty, thy name is woman!

আভা এতক্ষণে দুয়ার বন্ধ করিয়া কক্ষ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ঘুমের ঘোরে সুবোধ পাশ ফিরিল। আর একটু পরেই সকাল হইবে, আভা জলযোগের আয়োজন করিয়া এ-ঘরে ডাকিতে আসিবে। তখন ঘৃণায় সে যদি সেই খাবার মুখের কাছে তুলিতে না পারে! কেমন করিয়াই বা পারিবে। প্রত্যুষের আবরণে কামনাময়ী নারী শুচিস্নিগ্ধা কল্যাণীর মতই সংসারকে চালনা করিবার স্পর্দ্ধা করিবে! মায়ের হাতের কাজ কাড়িয়া লইয়া—ভায়ের সঙ্গে হাসিকৌতুক করিয়া অবহেলায় দিনকে সন্ধ্যার দুয়ারে ঠেলিয়া দিবে। তারপর রাত্রির কালো কুন্তলে নিজের কালো ছায়া মিলাইলে তাহার মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করে কে!

নারী অবিশ্বাসী নহে—অবিশ্বাসী এই বয়স। এই প্রভাত-কোমলধরিত্রীর মদময়তার আলস্যে প্রথম নয়ন মেলিয়া দুর্জ্জয় কামনাকে অন্তরে অন্তরে বন্দী করিয়া রাখিবার ব্যাকুলতা।

এ হয়ত ভালই হইল—এই অভিজ্ঞতা লাভ। একটা প্রাণান্তকর মোহ হইতে সে মুক্তিলাভ করিল। নারী-সম্বন্ধে তার কৌতূহল মিটিয়া গেল।

তপন হাতমুখ ধুইয়া দাওয়ায় আসিয়া বসিল। জলে জলে পথঘাট কর্দ্দমাক্ত, মৃদু বাতাসে গাছের জল ঝরিয়া মাথায় পড়ে, পাখীর কাকলী নাই—সূর্য্যের আলো ফুটিল না।

ভিজা ঠাণ্ডা বাতাস, কাপড়ের খুঁট গায়ে দিয়া বসিলে আরাম পাওয়া যায়।

দাওয়ার কোল ঘেঁষিয়া কতকগুলা কেন্নুই কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া আছে, ছোট ডুমুর গাছটা শুঁয়োপোকায় ভরা, উঠানের জলে ছপ্ ছপ্ করিয়া ব্যাঙ লাফাইতেছে। মাচার উপর সতেজ শসা গাছটার ডগায় গোল কি সব পোকা এক একবার পাখা মেলিতেছে জলে ভিজিয়াছে বলিয়া হয় ত উড়িতে পারিতেছে না। উঠানের উঁচু দিকটায় জল নাই, গুটি-চারেক কেঁচো ভিজা মাটির উপর দাগ কাটিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া রান্নাঘরের দাওয়ামুখীন্ হইতেছে। এই সমস্ত চোখে পড়িলেই গা ঘিনঘিন করিয়া উঠে।

সুবোধ বলিল, এই বাদলার দিনে এক কাপ গরম চা—

তপন বলিল, হাঁ, চা ত চাই-ই। কিন্তু নিজের হাতে তৈরী করে নিতে হবে।

সুবোধ বলিল, আভা আপত্তি করবে।

তপন বলিল, আমরা শুনবো না সে আপত্তি। এই জলে-ভেজা মাঠ, পিছল পথ, থমথমে গা—ঠায় চুপ করে বসে বসে কতক্ষণ দেখা যায় বল। ষ্টোভ জ্বাল।

ষ্টোভের গর্জ্জনে বিষণ্ণ ভাবটা অনেকখানি কাটিয়া গেল।

চা তৈরী হইল। তপন কাপে চুমুক দিতে দিতে বলিল, নাও না এক কাপ।

সুবোধ বলিল, না, আমার প্রতিজ্ঞা অত

হালকা নয়। বাদলবিলাসে তাকে ভিজিয়ে চেখে দেখতে আমার ইচ্ছা হয় না।

তপন হাসিয়া বলিল, তোমার প্রতিজ্ঞা তোমার পক্ষে পীড়ন। সোসাইটিতে মিশতে গেলে হাসিকৌতুক চেপে যেমন কতকগুলো এটিকেটের বোঝা ঘাড়ে না চাপালে চলে না, তেমনি।

সুবোধ বলিল, অসংযম যদি চিত্তদারিদ্র্যের মুক্তি ঘোষণা করে ত তার ঋণ শোধ করবার শক্তি আমার নেই—মানি। ফুলের কুড়িটাকে ছিঁড়ে উপভোগ করার চেয়ে ফোটার অপেক্ষা করা ভাল।

তপন বলিল, অথচ তোমার ভাগ্যে সেই দীর্ঘ-অপেক্ষিত মুহূর্ত্তে ফুল যদি ন-ই ফোটে?

সুবোধ বলিল, মানুষের মত প্রকৃতি অত খেয়ালী নন।

এমন সময় আভা কচুরি ও পাপর ভাজা লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল।

ডিস দু'খানি দুজনের সামনে নামাইয়া দিয়া কৌতুকোজ্জ্বল চক্ষে সুবোধের পানে চাহিয়া কহিল, প্রকৃতির কথা কি হচ্ছিল দাদা?

সুবোধ বলিল, এই বোবা প্রকৃতির কথা।

আভা বিস্ময়কৌতুকে গালে হাত দিয়া বলিল, প্রকৃতি বোবা! ও মা—যাব কোথায়! ছোড়দা, আপনি ত এই কালই বলছিলেন, পাড়াগাঁর নিজ্জনতা মনকে একটুও পীড়া দেয় না, এর গাছ-পালা পশুপাখী—সবাই মানুষের সঙ্গী। এমন কি আকাশ, মাঠ, ওই বাগানটা পর্য্যন্ত!

তপন ইচ্ছা করিয়াই আভার দিকে চাহিল না। রাত্রিশেষের পাণ্ডুর লেখা সে মুখের কোথাও হয়ত নাই। স্বরটি পর্য্যন্ত শুদ্ধ—অনাবিল। তবু এই শুচিস্নিগ্ধ বেশ, সেবা-মধুরতা, এই মিষ্ট হাসি সবই কৃত্রিমতায় ভরা।

আভা তপনের উন্মনা ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিল, ডিসটা যে পড়েই রইলো, খাবেন না?

ঘাড় নাড়িয়া তপন জানাইল, না।

আভা ঈষৎ শঙ্কিত স্বরে প্রশ্ন করিল, শরীরটা খারাপ হয়েছে বুঝি?

তপন কোন কথা না বলিয়া মাথা নাড়িল।

আভা বলিল, যাই, মাকে বলিগে। দাদা, ঝোলের মাছ আজ এনো। বলিয়া চলিয়া গেল।

সুবোধ উদ্বিগ্ন স্বরে বলিল, কি অসুখ? জ্বর, না—

তপন বলিল, কিছুই না। খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না, এই পর্য্যন্ত। সুবোধদা আজকের সকালে বাড়ী ফিরবার কোন ট্রেণ নেই?

সুবোধ বলিল, মাঠের জল দেখে সত্যিই কি মনে হচ্চে—জলে পড়েচ?

অপ্রতিভ হইয়া তপন বলিল, না, না, তবে এখানে আর ভাল লাগচে না।

সুবোধ বলিল, না লাগে বাড়ীই যেয়ো। কিন্তু মা তোমার শরীর অসুখ শুনলে কিছুতেই যেতে দেবেন না। যে ছেলে হাসিমুখে বিদায় নিতে না পারে—তার সম্বন্ধে মায়ের ব্যাকুলতা বড্ড বেশী।

তপন বলিল, বেশত, খেয়েই না হয় যাব।

মোটকথা—তপনের আর এখানে ভাল লাগিতেছে না। কাল রাত্রির দুঃস্বপ্ন নবাগত যৌবনের দুয়ারে বিভীষিকা বিস্তার করিয়াছে। আজ রাত্রি এখানে কাটাইলে ছায়ার কাছে গিয়া দাঁড়াইবার কামনাটুকু তার নিঃশেষে বিলীন হইয়া যাইবে। সুতরাং যাওয়া আজ চাই-ই।

মধ্যাহ্নে কলিকাতা হইতে একখানি পত্র আসিল। ডবল ষ্ট্যাম্প দেওয়া ভারি চিঠি। এত কিসের সংবাদ? মেজ বৌদি—কয়দিনের ঘটনাগুলি ঠাসিয়া পাঠাইয়াছেন বোধ হয়। অন্য কিছু না থাকুক, ছায়ার সংবাদ বিস্তারিত আছে। তামাসা করিবার দুরন্ত প্রলোভনকে মেজ বৌদি কখনও জয় করিতে পারেন নাই!

পত্র খুলিয়াই তপন আশ্চর্য্যান্বিত হইল। এতো মেজ বৌদির হস্তাক্ষর নহে। পরিষ্কার গোটাগোটা হরফে মুক্তার মত সাজানো সেই লেখা দেখিবামাত্রই যে চিনিয়া লইতে বিলম্ব হয় না! লাইন বাঁকা কাটাকুটি কালি-ধ্যাবড়ানো লেখার-তলায় স্বাক্ষর দেখিয়া আরও সে আশ্চর্য্য হইল।

চিঠি লিখিয়াছেন—বড় বৌদি! যিনি জন্মে কলম ধরিবার অবসর পান না—যাঁর কাজের তাড়া অফুরন্ত!

তাড়াতাড়ি সে পড়িতে লাগিল।

ভাই ঠাকুরপো, তুমি গিয়া অবধি কোন খবর দাও নাই, সে-জন্যে আমরা বড়ই ভাবিত আছি, পত্রপাঠ তোমার কুশল সংবাদ-দানে সুখী করিবে। এদিকে এক ব্যাপার ঘটিয়াছে। ব্যাপারটা তোমাকে জানাইতেছি এই জন্য যে, হয়ত বা এর প্রতিকার তোমাদ্বারা সম্ভব। তোমারই বিবাহ সম্বন্ধে। জান বোধ হয়, তোমাকে ছায়ার সঙ্গে বাঁধিবার জন্য যে-আয়োজন হইয়াছিল—তাহার

মুলে অর্থের যোগাযোগ ছিল—অর্থাৎ পণের মোটা টাকার ব্যবস্থা। সে-সব এমন কিছু দোষের নহে। আজকালকার দিনে পণ নেন না এমন একটিও লোক তুমি বাঙলায় দেখাইতে পার না। বিশেষত—ছেলে যদি বিদ্বান্, সচ্চরিত্র ও ধনবান হয় ত সোনায় সোহাগা। স্থলতার বাবা অকৃতী নহেন, দিবার ক্ষমতা তাঁর যথেষ্টই আছে।

তিন বৎসর পরে বিবাহ স্থির হইলেও পণের পরিমাণটাও ঐ সঙ্গে স্থির হয়। সম্বন্ধ পাকা করিবার জন্য উভয় পক্ষের লেনদেনও কিছু হইয়াছিল। যত গোল বাধিয়াছে ঐখানে। তুমি বোধ হয় জান, স্থলতার পিতা অত্যন্ত তেজী লোক, কোন রকম অন্যায়কে কখনও তিনি প্রশ্রয় দেন নাই। কিন্তু ভাই, আশ্চর্য্য দেখ, মানুষের তেজকে চূর্ণ করিতে স্নেহের মত অমন পদার্থ আর ভূভারতে নাই। যে মাথা মেয়ে দিয়াও হেঁট করেন নাই, স্নেহবিমূঢ়তায় সেই মাথা নামাইতে হইল! তিন বৎসর পরের সম্বন্ধকে তিনি অর্থে বাঁধিতে চাহিলেন।

এদিকে নাকি ব্যবসার বাজার মন্দা। সব সওদাগরী আপিসই টলমল করিতেছে। সু-র পিতা যে-আপিসের ক্যাশিয়ার ছিলেন—একদিন দেখা গেল—হঠাৎ পঁচিশ হাজার টাকা তহবিলে কম। আগের দিন তহবিল মিলাইতে আদেশ হওয়ায়—সু-র পিতা মিলাইতে গিয়া দেখেন—এই কাণ্ড! তিনি সদ্ব্যয়ী—উদার প্রকৃতির লোক। চিরকাল আত্মীয়-কুটুম্ব প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন। যেমন উপায় করিতেন—মুঠা ভরিয়া তেমনই তাঁর অকৃপণ খরচ ছিল। সুতরাং ঘর কুড়াইয়া মাত্র দশ হাজার টাকা পাইলেন। আর পাঁচ হাজার গহনা বাঁধা দিয়া যোগাড় হইল। বাকি দশ হাজার।

সে দিন রাত্রি তখন ন'টা, সু-র পিতা—আমাদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। বিশৃঙ্খল বেশ, চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখখানি শুকনো। বাবা বৈঠকখানায় বসিয়া হিসাব দেখিতেছিলেন, আসিয়াই—কচি ছেলের মত তাঁর হাত দু'খানি জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, আমায় বাঁচান।

বাবা ত অবাক্! অত বড় একটা মানী লোক, বলা নেই, কহা নেই—হঠাৎ হাত ধরিয়া কাঁদেন কেন? পাখাটায় পুরা দম দিয়া বাবা তাঁহাকে চেয়ারে বসাইয়া সুস্থ হইতে বলিলেন। তিনি বসিলেন, কিন্তু মুখের ব্যাকুলতা একটুও ঘুচিল না। সে ব্যাকুলতা এমনই যে, দেখিলে মনে হয়—সমস্ত প্রাণ বাহির হইবার অপেক্ষায় বুঝি মুখে আসিয়া জমিয়াছে। আমি তখন ছোট খোকাকে ঘুম পাড়াইয়া নীচে নামিতেছিলাম, হঠাৎ সু-র পিতার কাতর কাকুতি শুনিয়া কেমন কৌতুহল হইল, দোরের পাশে দাঁড়াইয়া ব্যাপার কি দেখিতে লাগিলাম।

তিনি বলিলেন, বেই মশায়, আজ রাত্রের মধ্যে দশ হাজার টাকা আমার চাই, নৈলে কাল জেল ছাড়া অন্য পথ নেই।

বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি?

তখন তিনি সমস্তই বলিলেন। সে-কথা উপরেই লিখিয়াছি। শুনিয়া বাবা বহুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তর দিলেন, তাই ত! বড় ভাবনায় ফেল্লেন আমাকে! তা এক কাজ করুন না বেই—গহনা বন্ধক দিয়ে—

তিনি বলিলেন, সে-সব বাঁধা দিয়ে যা যোগাড় করেছি, সবই ত বললুম আপনাকে। কোনদিকে কোন উপায় খুঁজে পাইনি বলে এখানে এসেচি। আপনি জানেন না, সে-টাকা ফেরৎ চাইতে আমার—মাথা কাটা যাচ্চে, কিন্তু উপায় কি! জেল ঠেকাতে এ-অপমানও আমি মাথা পেতে নিলুম।

বাবা বলিলেন, বাড়ী বাঁধা দেবার চেষ্টা—

তিনি হতাশাভরে বলিলেন, অসম্ভব। শরিকানী বিষয়, এই রাত্রে মর্টগেজ রাখবার লোক পাই কোথায়? আপনি রাখবেন?

বাবা হাসিয়া বলিলেন, পাগল হয়েচেন! কুটুমের সঙ্গে ও-সব হাঙ্গামা না রাখাই ভাল। পরে গম্ভীর হইয়া বলিলেন, কথা কি জানেন, আমরা ঘরে ত অত টাকা রাখি না, যে বাজার—কোত্থেকে কে লুঠে নেবে! সব ব্যাঙ্কেই জমা থাকে। আপনি তপনের বিয়ের যৌতুক বলে—যে দশ হাজার টাকা আগাম দিয়েছিলেন, তা তো চৌরঙ্গীর বাড়ী মেরামতিতে খরচ হয়ে গেচে। খাতাটা আগাইয়া দিয়া বলিলেন, এই দেখুন হিসেব।

সু-র পিতার অবস্থা দেখিয়া আমার ভয় হইল, হয়ত বা তিনি এখনই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবেন। অনেক কষ্টে তিনি সামলাইয়া লইয়া জড়িত-স্বরে কহিলেন, তবে কি টাকাটা পাব না?

বাবা বলিলেন, একটু বসুন, আপনার বেয়ানের সঙ্গে একটা পরামর্শ করে আসি।

তিনি ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, না, না, এ-সব

কথা তাঁকে আর বলবেন না, তাহলে লজ্জায় আমি মুখ দেখাতে পারবো না।

বাবা বলিলেন, কিন্তু তাঁর হাতেই যে টাকাকড়ি সব। দেওয়ার মালিকও তিনি। এখন ত লজ্জার সময় নয়।

তিনি কোন কথা কহিলেন না।

ভিতরে মার সঙ্গে কথা কহিয়া বাবা ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন, যা বলেচি, ঘরে পাঁচশো টাকাও খুচরো নেই—সব ব্যাঙ্কে জমা। আর আপনার বেয়ান ঠাকরুণ বল্লেন, এ-টাকা উঠিয়ে নিলেই ত খরচ হয়ে যাবে, আর কি তিনি মেয়ের বিয়ে দিতে পারবেন!

তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, আমি যদি বাঁচি—মেয়ের বিয়ে আটকাবে না। সত্যিই কি টাকাটা পাওয়া যাবে না?

না, বলিয়া বাবা চেয়ারে গিয়া বসিতেই তিনি উঠিয়া আসিয়া তাঁহার পা দু'খানি জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, দোহাই আপনার, বাঁচান।

তার পর ছোট ছেলের মত তাঁর সে কি বুক-ফাটা কান্না! কিন্তু সে কান্না বেশীক্ষণ শুনি নাই। সিঁড়ির উপর ধপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট আর্ত্তনাদ। ফিরিয়া দেখি—সুলতা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। সম্ভবত, আমারই মত সে আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিল।

সুলতাকে লইয়া আমরা ব্যস্ত রহিলাম। রাত্রি একটার সময় তার জ্ঞান ফিরিল।

আমাকে কাছে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া—ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, বাবা কোথায়?

বলিলাম, তিনি চলে গেছেন!

সুলতা কম্পিত করে আমার হাত দু'খানি চাপিয়া ধরিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, তুমি ত জান বড়দি, তাঁর প্রকৃতি! এই হয়ত তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা।

আমি তার চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলাম, চুপ কর। টাকা তিনি অন্য জায়গায় নিশ্চয়ই পাবেন।

সুলতা ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল, সে কথা আমার চেয়ে তুমি ভালই জান! কিন্তু বড়দি, সে দিনের কথা মনে পড়ে? তুমি বলেছিলে—এমন হীন কাজ তিনি কখনই করবেন না।

বলিলাম, পড়ে। শুধু মেয়ের মুখ চেয়ে তিনি এ-কাজ করেছেন।

সুলতা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, শুধু আমাদেরই জন্য। কেন যে বাঙলায় মেয়ে জন্মায়, কেন যে তাদের বিয়ে দেবার জন্যে এত আঁকু-পাঁকু! তারপর সে চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। বহুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকার পর তাহাকে নিদ্রামগ্ন ভাবিয়া আলো নিবাইয়া চলিয়া আসিলাম।

সকালে দেখি, কাল রাত্রির সু যেন অকস্মাৎ বদলাইয়া গিয়াছে। এক রাত্রিতে মুখের চেহারা হইয়াছে এক বছরের রোগীর মত। চোখের কোণে কালি, কণ্ঠার হাড় ঠেলিয়া উঠিয়াছে, মুখখানি শুকাইয়া হইয়াছে এতটুকু। তবু সুলতার মুখে হাসি লাগিয়াই আছে। সে এক অদ্ভুত হাসি। দেখিলেই চোখের জল চাপিয়া রাখা দুষ্কর হইয়া উঠে। ভিতরের দাহযন্ত্রণাকে চাপা দিবার জন্য সে অদ্ভুত আত্মপীড়ন আরম্ভ করিয়াছে—হাসি ফুটাইয়া, গতি চঞ্চল করিয়া। দেখিয়া বড় ভয় হইতেছে আমার। আশ্চর্য্য! বাবার কথা সে এক বারও জিজ্ঞাসা করে নাই। যেন তিনি মহাদায় হইতে মুক্তি পাইয়াছেন—এমনই সে নিশ্চিন্ত!

দুপুর উতরাইলেও সু-র পিতার কোন সংবাদ নাই। তিনি জেলে ঢুকিয়াছেন কি টাকা দিয়া অব্যাহতি পাইয়াছেন, জানি না। একবার সু-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, টাকা পাইবার অন্য কোন উপায় আছে কি না?

সু—বলিয়াছিল, না। তবে বড়দি তুমি মিছে ভেবো না, জেলে তিনি কখনই ঢুকবেন না।

তার দৃঢ়তায় অবাক হইয়া ভাবিলাম, হয়ত কোন উপায় আছে, নতুবা মেয়ে হইয়া সু—এরূপ নির্ভাবনায় রহিল কি করিয়া।

অপরাহ্ণে সু—একখানি পত্র ডাকে দিবার জন্য ছোট ঠাকুরপোর হাতে দিল। ঠিকানাটা দেখিলাম বাপের বাড়ীর! ছায়ার নামে। ভাবিলাম ছোট বোনের কাছে বাবার সংবাদ জানিবার জন্য—সে এই চিঠি দিল। পরদিন সে চিঠির কোন উত্তর আসিল না। আমি আশ্চর্য্য হইলাম। তোমার ঘরে দুয়ার বন্ধ করিয়া সে অর্গানের ডালা খুলিয়া দিব্য কিনা গান ধরিল! দোরে কান পাতিয়া শুনিলাম, গানটা মোটেই করুণ নহে। গান শুনিলে মনের মধ্যে আলস্য ও ভীরুতা দূর হইয়া যায়, একটা সাহস জাগে। বার তিনেক গানটি গাহিয়া সে দুয়ার খুলিল।

আমাকে সামনে দেখিয়াই হাসিল, কি বড়দি, চুরি করে গান শুনছো! জান, মা দেখতে পেলে আর রক্ষে রাখবেন না।

আমি বললাম, আর তোমার?

সে হাসিয়া বলিল, আমি ত শাসনের বাইরে। তিনি কতবার বকেচেন, শোননি! আর গণ্ডারের চামড়া কি না, ফোটে না! বলিয়া হি-হি করিয়া হাসিল।

তাহাকে টানিয়া আনিয়া ভৎসনা করিলাম, তুই কি পাগল! কাল বাপের এই বিপদ শুনলি, আর আজ—

সে হাসিতে হাসিতে বলিল, বাবার কিসের বিপদ, বড়দি? যে যেমন কাজ করে, সে তেমন ফলভোগ করে। তিনি মানী লোক—কেন মেয়ের জন্য খাটো হতে গেলেন!

বলিলাম, সন্তান যে কি জিনিষ তুই ত জানিস। ওদের জন্যে খাটো হতে বাপ মার এক তিলও লজ্জা নেই।

সুলতা ছুটিয়া গিয়া ছেলেকে খাট হইতে টানিয়া তুলিয়া অজস্র চুমায় তার গাল ভরাইয়া দিয়া কহিল, আমি কিন্তু এর জন্য একটুও খাটো হতে পারবো না—তা তোমায় বলে রাখচি, বড়দি!

আমি হাসিলাম। পাগল আর কাকে বলে!

ছেলের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে—কাঁদিতেছিল। সুলতা চুমা দিয়াও যখন তাহাকে ভুলাইতে পারিল না, তখন আমার কোলে ছেলে ফেলিয়া দিয়া বলিল, ভাল লাগে না তোর কান্না। বড়দি, এটাকে তোমায় দিয়ে দিলুম, মানুষ করো।

আমি বললাম, তা করবো, কিন্তু তুই কাঁদবিনে তো?

সুলতা বলিল, ইস বয়ে গেছে আমার কাঁদতে! ও যদি নেমকহারাম না হয় তো আমার জন্যে কাঁদবে, ঠিক যেমন কাঁদছে আজকে।

আমি রাগ দেখাইয়া বলিলাম, তোর কাঁদুনে ছেলে নিতে বয়ে গেচে আমার!

সুলতা হাসিয়া বলিল, তোমার কোন ছেলেটাই বা কাঁদুনে নয়?—তবু তুমি পরম ধৈর্য্যশীলা। যদি কেউ ছেলে মানুষ করতে পারে—সে তুমি। তুমি বর্ত্তমানে বাস করলেও ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখ। জীবন তোমার কাছে কোন অবস্থাতেই দুর্ব্বহ নয়।

এ-কথা সে যখন-তখন আমায় বলে। তুমিই বলত ভাই, আশা নিয়ে মানুষ বাঁচে। ভবিষ্যৎ কে না দেখে!

ছেলেকে সে আমার কোল হইতে না লইয়াই ছুটিয়া উপরে গেল। না, সুলতা যদি ইহার চেয়ে খানিক কাঁদিত ত সান্ত্বনা দিয়াও আমার তৃপ্তি আসিত। যে অবস্থা স্বাভাবিক, তাহার জন্য ভাবনা হয় না। দুঃখে মানুষ কাঁদিয়াই থাকে। কেহ কম, কেহ বেশী। তাই ত বড় ভয় হইতেছে। তুমি যত শীঘ্র পার চলিয়া আসিবে। এমন কাহাকেও পাইতেছি না যে, সু-র বাপের বাড়ীর খবরটা নিই। সু নিশ্চিন্ত—আমি মরিতেছি ভাবিয়া। তুমি সত্বর আসিবে। এবং পার যদি এই অপ্রীতিকর ব্যাপারের একটা নিষ্পত্তি করিবে। এখানকার অন্যান্য সংবাদ ভাল। শান্তি এতটুকু নাই। আশা করি কুশলে আছ। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদিকা—বড় বৌদি।

তপনের পাণ্ডুর মুখের পানে চাহিয়া সুবোধ জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি?

তপন কোন কথা না বলিয়া চিঠিখানি সুবোধের কোলের উপর ফেলিয়া দিল। সমস্ত পড়িয়া সুবোধের মুখেও ব্যাকুলতা ফুটিয়া উঠিল। কহিল, তাই ত! আজকের গাড়ী সেই রাত দশটায়!

তপন কহিল, তা হোক, আজই আমায় যেতে হবে!

সুবোধ বলিল—দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

তপন বলিল, কর!

সুবোধ প্রশ্ন করিল, তোমার মেজ বৌদির বাপের নাম কি?

তপন নাম বলিলে সুবোধ ঈষৎ চমকিত হইয়া বলিল, ও—! তিনি?

তপন বলিল, তুমি তাঁকে চেন নাকি?

সুবোধ বলিল, চিনতাম। ওঁদের বাড়ীর পাশেই আমাদের মেস ছিল।

তপন জিজ্ঞাসা করিল, চিঠি পড়ে তোমার কি মনে হয়?

সুবোধ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, তোমার যাওয়া উচিত।

তপন বলিল, কিন্তু আমি কি উপায় করতে পারবো!

সুবোধ বলিল, হয়ত কোন উপায়ই তোমাদ্বারা হবে না, তবু তোমার যাওয়া উচিত।

তপন ভীত স্বরে বলিল, এ-কথার মানে কি—সুবোধ-দা?

সুবোধ বলিল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। জানি না কতটা সাহায্য আমায় দিয়ে হবে, তবু যাব।

তপন ব্যাকুল স্বরে বলিল, তোমার কি মনে হয়, সুবোধ-দা?

সুবোধ বলিল, মনে ত অনেক কিছুই হয়। তোমার বড় বৌদির মত একটা ভয় জাগচে, কিন্তু সে অনুমান! মিথ্যে হতেও পারে।

—তবু—কি ভয়?

সুবোধ ধীরস্বরে বলিল, এ-অবস্থায় আত্মহত্যা করা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।

শুনিয়া তপন আঁৎকাইয়া উঠিল, কি হবে সুবোধ-দা?

সুবোধ তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া সান্ত্বনার ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিল, ভয় কি, জীবন এত হেলা-ফেলার নয় যে টপ করে তাকে দেহ থেকে বার করে দেওয়া যায়। তিনি জ্ঞানবান—পিছনে তাঁর বিপুল দায়িত্ব—একটা সংসার। তিনি কখনই এমন কাজ করবেন না।

তপন ঈষৎ আশ্বস্ত হইল।

সুবোধ বলিল, বোস, আমি কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করে দু' একটা কাজ সেরে আসি।

তপন বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

যদি অপমান লাঞ্ছনার হাত হইতে নিষ্কৃতি-লাভের জন্য সংসারকে—ছায়ার পিতা তুচ্ছ জ্ঞান করেন? মায়া-মমতার ডোর কাটাইয়া যদি-ই বা তিনি আত্মঘাতী হন, ছায়ার কি হইবে?

কাল রাত্রিতে নারীকে তপন ঘৃণা করিয়াছে। তরলমতি আনন্দ-উপবনে বসন্তের প্রজাপতি! যেখানে ঐশ্বর্য্যের আলো, সেইখানেই রঙীন বেশে নারীর আবির্ভাব। সমুদ্রমন্থন হইতে সেই যে সংগ্রাম সৃষ্টি-প্রত্যূষে আরম্ভ হইয়াছে, আজিও নারীকে লইয়া সে যুদ্ধের বিরতি ঘটিল না!

কিন্তু যদি অমনই একটা দুর্ঘটনা ঘটে, ছায়ার পাশে সেই ঘনঘোর দুর্দ্দিনে তপনকে দাঁড়াইতে হইবেই। অতীতকে ভুলিতে হইবে। বটানিক্যাল গার্ডেন মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। ছায়ার পাশে দাঁড়াইবার একমাত্র অধিকার—তপনেরই।

আসন্ন বিদায়কালে এত বিরূপতা সত্ত্বেও মৃদু বেদনা অনুভূত হইল। মা অশ্রুভেজা কণ্ঠে পুনরায় এখানে আসিবার জন্য তপনকে অনুরোধ করিলেন। আভা বিষণ্ণ মুখখানি লইয়া চৌকির ধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গৃহপালিত মার্জ্জারটির মুখেও বিদায়-বেদনার ছায়া!

স-পল্লব আমের ডাল জলপূর্ণ ঘটের উপর রাখিয়া মেঝেয় দু'খানি আসন বিছাইয়া মা সুবোধ ও তপনকে বসিতে বলিলেন। তাহাদের সম্মুখে ছোট রেকাবিতে জলখাবার নহে, কিছু সিদ্ধির গুঁড়া ও শুকনা বিল্বপত্র এই মাত্র আভা শিবমন্দির হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। দুপুরে পাতা খানিকটা দই—এক পাশে রহিয়াছে।

মা দু'জনের কপালে দইয়ের ফোঁটা দিয়া সিদ্ধি দাঁতে কাটিবার উপদেশ দিলেন। এবং শুকনা শিব-নির্ম্মাল্য মাথায় ঠেকাইয়া দু'জনের জামার পকেটে সন্তর্পণে রাখিতে বলিলেন।

কালী, দুর্গা, গণেশ, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি শুভবিধায়িনী দেবদেবীর নাম উচ্চারণ করিয়া গৃহদ্বারে স্থাপিত জলপূর্ণ ঘট দর্শন করিতে বলিলেন। সর্ব্বোপরি শিরশ্চুম্বনে সর্ব্বাঙ্গে ঘেরিয়া দিলেন অপূর্ব্ব অক্ষয় মাতৃস্নেহ।

তপন বড় তৃপ্তিতেই মায়ের পায়ে মাথা নামাইল।

আভা প্রণাম করিতেই তপন বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরাইতে পারিল না। বিদায়ক্ষণে আভার মুহূর্ত্তের ভুলকে বড় করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি তার হইল না।

আভা বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, গিয়ে চিঠি দেবেন।

তপন বলিল, দেব।

* * *

এত ভোরেই ট্রেণখানা প্ল্যাটফরমে ঢুকিল।

নিদ্রিত শহর সবেমাত্র পাশ ফিরিতেছে। ষ্টেশনের সূর্য্যপ্রভান্বিত বিদ্যুৎ-আলোগুলা কোথাও অন্ধকার রাখে নাই; উৎসব দিনের ঔজ্জ্বল্য ও প্রাচুর্য্য তার দীপ্তিতে। কুলির কোলাহল ও এঞ্জিনের দীর্ঘনিশ্বাসে ঘুমক্লান্ত যাত্রীদল চোখ মুছিতে মুছিতে মোটঘাট নামাইতে লাগিল।

গাড়ীবারান্দায় একখানা ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইল।

তপন হাতল ঘুরাইয়া ভিতরে গিয়া বসিল ও সুবোধকে বসিতে বলিল। সুবোধ আপত্তি করিল, এইটুকু ত পথ—হেঁটেই যাই না!

তপন বলিল, না সুবোধ-দা, যতই বাড়ীর কাছে আসচি—ততই আমার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করচে—না জানি কি দেখবো গিয়ে। তুমি আমার বাড়ী পর্য্যন্ত চল!

সুবোধ আর কোন কথা না বলিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। পথে কেহ কোন কথা বলিল না।

মিনিট কয়েকের মধ্যে বাদুড় বাগানের গেটওয়ালা বাড়ীর মধ্যে হর্ণ দিয়া ট্যাক্সিটা ঢুকিয়া পড়িল।

ভাড়া মিটাইয়া দিয়া তপন আর এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারিল না। শহরের প্রভাতের মতই বাড়ীটা বিষণ্ণ ও বাক্‌হীন। বৈঠকখানায় অনেকেই যেন বসিয়া আছেন ও চাপা কথায় কি-সব আলোচনা করিতেছেন। গত পরশ্ব রাত্রির ঝড় এখানেও বহিয়া গিয়াছে। বাগানের বহু তরু উন্মুলিত, শাখাপত্র বিপর্য্যস্ত; টেনিস গ্রাউণ্ডের উপর জলও খানিকটা জমিয়া আছে। আকাশের থমথমে ভাবটা যেন বাড়ীর মাথায় চাপিয়া বসিয়াছে!

বৈঠকখানার পাশের ঘর হইতে বড়দা বাহির হইলেন। চুলগুলি রুক্ষ, চোখ ফোলা, মুখের ভাব উদ্বেগ-ব্যাকুল। সারারাত্রি দুশ্চিন্তায় কাটাইলে যেমন হয়—তেমনই বিশৃঙ্খল বেশবাস!

তপনকে দেখিয়া কহিলেন, এসেছিস, আয়।

তপন প্রশ্ন-ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিল।

তিনি সুবোধের পানে চাহিয়া বলিলেন, কাল একটা দুর্ঘটনা হয়ে গেচে। মেজ বৌমা হঠাৎ মারা গেলেন।

তপন কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িতেছিল। সুবোধ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছিল?

—কলেরা। আসল এশিয়াটিক কিনা, আধ ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ।

তপনের অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, ওকে ধরে পাশের ওই ঘরটায় নিয়ে আসুন ত; আমি ফুল আনতে যাচ্ছি। এই রামপিয়ারি—গাড়ী লাগাও।

মোটর চাপিয়া বড়দা ফুল আনিতে চলিলেন। ওদিকে অট্টালিকার মাথায় সূর্য্যদেবও উঠিলেন। ঘরের মধ্যে তখনও বিজলীবাতি জ্বলিতেছে। প্রভাত যে কোনদিন এমন কদর্য্য কুৎসিত রূপে দেখা দিতে পারে, এ ধারণা কেই বা করিয়াছিল!

দামী মেহগনি খাটখানাই বাহির করা হইল। চকচকে পালিশ এখনও উঠে নাই, হয়ত বছর কয়েক পূর্ব্বে ফুলশয্যার রাত্রিতে ওই খাটে শুইয়া নব-দম্পতি সংসারের রঙীন স্বপ্ন দেখিয়াছিল। সাদা ধবধবে বিছানা—সুলতার নিজের হাতে সেলাইকরা ঝালর দেওয়া বালিশ; বালিশের কোণে সবুজ সুতার লতাপাতা ও লাল সুতার ছোট ফুল। চমৎকার কারুকার্য্য। সেই বালিশেই মাথা রাখিয়া সুলতা শুইয়াছে। এত লোকের সামনে লজ্জা-নিমীলিত নয়নে অরুণরাগ ফুটে নাই—স্থির, শান্ত, উদ্বেগহীন। সিঁথিতে সিঁদুর, মাথার খোঁপা পরিপাটি করিয়া বাঁধা, কাণে দুল। গলায় মফচেন্—দামী ঢাকাই শাড়ীর উপর বেশ মানাইয়াছে। এয়োতির লোহা ও গাছকতক বরফী-কাটা চুড়ি-শোভিত বামহাতখানি বুকের উপর আড়াআড়িভাবে স্থাপিত; ডান হাত বিছানার উপর শিথিল ভাবে ন্যস্ত। কোমর পর্য্যন্ত সুদৃশ্য সিল্কের চাদর প্রসারিত। পায়ের পাতা দু'খানি বাহির হইয়া রহিয়াছে, আলতায় লাল টুকটুকে। চারু এইমাত্র তাহার সুবাসিত তরল আলতার শিশি উজাড় করিয়া ঐ দু'খানি পা রঙাইয়া দিয়াছে।

ফুল এখনও আসে নাই। আসিলে সুলতা কুসুম আভরণে সাজিবে। সোনার গহনা তখন হয়ত দেহে থাকিবে না।

কর্ত্তা সে-কথা একবার বলিয়াছিলেন, কিন্তু তপনের মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছেন, বড় আদরের বউ, এয়োরাণী—ভাগ্যিমানী। ওর হাত খালি করতে কিছুতেই পারবো না গো। সেখানে তোমরা যা হয় করো, আমায় যেন চোখে না দেখতে হয়।

সুতরাং গহনা খোলা হয় নাই।

শাশুড়ী যে স্নেহশীলা, এ-কথা চারুও পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই। দামী খাট, শাড়ী, বিছানা, বালিশ কিছুই তিনি সরাইতে দিলেন না। বড় বাড়ীর বউ—স্বামী বর্ত্তমানে বৈকুণ্ঠধামে চলিল বলিয়াই ইহকালের তুচ্ছ সম্পদকে তিনি মর্য্যাদাস্বরূপ উপহার দিলেন। অথচ কয়দিন পূর্ব্বে সুলতার বাপ তাহার শ্বশুরের পায়ে ধরিয়াও মন গলাইতে পারেন নাই। সেদিন তাঁর মন গলিলে সুলতাকে—অকালে হয়ত এমন সৌভাগ্যবতী হইতে হইত না।

আশ্চর্য্য ছেলেটা! চারুর কোলে উঠিয়া পরম আরামে স্তন্যপান করিতে করিতে চোখ বুজিয়াছে—একবারও কাঁদে নাই। সুলতা সংসারে আসিল, কিন্তু স্বপ্ন দেখিল না। না ছেলে, না স্বামী, না বা সুখ-ঐশ্বর্য্য—কোন কিছুরই মায়ারজ্জু তাহাকে বাঁধিতে পারিল না। যাক, চলিয়া যাক, চারু কাঁদিবে না। এমন নিষ্ঠুর যে—তাহার জন্য কাঁদিয়া মরা কেন। কিন্তু অশ্রু বড় অকরুণ। পায়ে আলতা পরাইবার কালে, সিঁথিতে সিঁদুর লেপিবার সময়ে বড় বাদই সাধিল। দৃষ্টি জলে ঝাপসা হইয়া উঠে, লাল রঙ ফ্যাকাশে হইয়া

যায়। সুলতার রঙহীন মুখের পানে চাহিয়া চারুর অন্তর বুঝি বিদীর্ণ হইয়া গেল।

তপন একবার মাত্র সে-মুখ দেখিয়া ছোট ঘরের খাটে মুখ গুঁজিয়াছে, সুবোধ তাহাকে শান্ত করিতে পারে নাই।

বহুক্ষণ পরে তপন মুখ তুলিয়া কহিল, তুমি জান না সুবোধ দা—মেজ বৌদির সঙ্গে এ বাড়ীর হাসির পাট উঠলো।

সুবোধ বিষণ্ণ-গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, জগতের নিয়মই এই। সদ্য বিয়োগটা বড় তীব্র হয়েই বাজে, তারপর—আবার সব ঠিক হয়ে যায়।

তপন বলিল, কিন্তু এমন চোখের সামনে মৃত্যু—

সুবোধ বলিল, তুমি মৃত্যু কখনও দেখনি হয়ত। নশ্বর জীবনে একটা চৈতন্যের মতই সে আসে, কিন্তু সংসার সে চৈতন্যকে বেশীক্ষণ জেগে থাকতে দেয় না।

তপন আকুলকণ্ঠে বলিল, এ খেলা কেন প্রকৃতির?

সুবোধ বলিল, মৃত্যুকে সব চেয়ে বড় বেদনা বলে মনে করচো কেন! বেঁচে-থাকার মধ্যে ব্যর্থ জীবনে যে-ব্যথা দুঃসহ হয়ে ওঠে—মরণ অনেক সময় তাকে শান্তি দেয়! এ-সব কথা এখন থাক। আমি একবার তোমাদের বাগানটা ঘুরে আসি। দেখি কিছু ফুল পাই কিনা।

সুবোধ চলিয়া গেল এবং অনতিবিলম্বে একগোছা জুঁই ফুল লইয়া ফিরিয়া আসিল।

তপনকে বলিল, একবার ওঠ। এই ফুলের গোছা ওঁর শিয়রে রেখে আমি চলে যাব।

তপন উঠিলে সুবোধ তাহার হাতখানি ধরিয়া অনুনয় করিয়া বলিল, আর একটা কথা। শ্মশানে চিতায় যখন ওঁর দেহ তুলে দেবে, এই ফুলের গোছাটিও দিতে ভুলো না। না, না, শ্মশানে তোমায় যেতেই হবে—আমার এই অনুরোধ।

তপন সবিস্ময়ে সুবোধের পানে চাহিল। সুবোধের সংযম-রেখাঙ্কিত কপালে কতকগুলি শিরা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মুখের শ্যামলতায় রক্তের অজস্রতা রঙকে গাঢ়তর করিয়াছে এবং বিস্তৃত দুই চোখের তারা অনিবার্য্য অশ্রুপতনকে রোধ করিয়া লাল ও বিস্তৃততর হইয়াছে।

তপন তাহার হাত ধরিয়া বলিল, একটু, বোস, সুবোধ-দা, একটু বোস।

সুবোধ নিঃশব্দ-হাসির মধ্যে বুকের বেদনাকে বাহির করিয়া দিয়া কহিল, বোসবো। না রে, আমি অল্পেতে ভেঙ্গে পড়ি না। অনেক, অনেক সহ্য করিতে পারি। এই বাইসেপসের মতই শক্ত বুক! চল, ফুলটা রেখে আসি।

তপন বলিল, সুবোধ-দা, একটা কথা—

সুবোধ বলিল, না, কোন কথা নয়। আমার জীবন-ইতিহাসের শেষ অধ্যায় লেখা হয়ে গেছে। যিনি লিখলেন, সেই অন্তর্যামী জানেন—এর বেদনা। কিন্তু ভাই, মানুষের কাছে সে নালিশ জানিয়ে কি লাভ! যা গেল তা ত গেলেই।

তপন বলিল, তোমার কথা শুনে সাহস করে আমিও যেন দুঃখ করতে পারচি নে। এত তীব্র ব্যথা বুকে পুরে কি করে বেড়াচ্ছিলে সুবোদ-দা!

সুবোধ বলিল, ছুটোছুটি করে কোন লাভ নেই বলে। তপন, একটা কথা জেনে রাখ, নিজের দুঃখের কথা বলে কখনও পরের সহানুভূতি লাভ করবার চেষ্টা করো না। পৃথিবীতে ওর মত হাস্যাস্পদ আর কিছু নেই।

তপন বলিল, তুমি কেন অমাদের সঙ্গে শ্মশানে চল না?

সুবোধ একটু থামিয়া ব্যথাভরা দৃষ্টি তুলিয়া বলিল, আমি মানুষ, সহ্যের সীমা বিধাতা আমারও নির্দ্দেশ করে দিয়েচেন। পাছে সেই অসংযত মুহূর্ত্তে কাউকে খাটো করে ফেলি—এই আমার ভয়।

তপন অল্প উত্তেজিত হইয়া বলিল, কিন্তু সংসারের সর্ব্বত্র এই অবিচার। নারীর জন্য পুরুষকে অনেক সইতে হয়। নারী সৃষ্টির অভিশাপ।

সুবোধ বলিল, নারী দেবী। ওঁরা বিশ্বসৃষ্টির আশীর্ব্বাদ। তুমি জান না ভাই, ওঁরা যা সহ্য করেন--

তপন মাথা নাড়িয়া বলিল, না। নারীর ত্যাগ সাময়িক উত্তেজনা ছাড়া আর কিছু নয়। সহমরণ বা জহরব্রত তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সুবোধ বলিল, ও-সব তর্ক এখন থাক। আমি শ্রদ্ধা ছাড়া নারীকে আর কিছু দিতে পারি না।

তপন বলিল, অদ্ভুত শ্রদ্ধা তোমার! চোখের উপর যা দেখচি—

সুবোধ বলিল, চোখের দেখায় মন অনেক সময় সায় দেয় না, তপন।

তপন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তা দেয় না। চোখের ভালকে যদি এড়িয়ে চলতে পারতুম ত জীবনে অনেক দুঃখকষ্ট আমাদের ত্রিসীমানায়

ঘেঁষতে পারতো না। এ-মোহ কি কিছুতে যাবার নয়, সুবোদ দা?

সুবোধ জানালার বাহিরে বড আমগাছটার পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, ওর মোহ নেই অথচ জীবন আছে। নিস্পৃহ নিরাসক্ত আনন্দহীন জীবন। কিন্তু মানুষ গাছ নয়।

তপন বলিল, কতকগুলি মানুষ আছে—যারা সংসারে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে ভালবাসে। যে-কোন অবস্থায় ত্যাগ তাদের কাছে মূল্যবান। তুমি এদেরই দলে।

সুবোধ ম্লান হাসিয়া বলিল, ভাগ্য অনেক সময় জীবনগতি নির্দ্দেশ করে। এ-সব কথা এখন থাক, ওই শোন মোটরের শব্দ, বড়দা ফিরে এলেন বোধ হয়।

তপন বলিল, তবু আশ্চর্য্য সুবোধ-দা, এই ত্যাগকে, সংযমকে মানুষ শ্রদ্ধা না দিয়ে পারে না। এই থেকে অপরে কর্ত্তব্য শিক্ষাও করে থাকে! নিজের জীবনে যে জ্বালাকে মনে হয় অসহ্য, অপরের জীবনে সেই নিরুপায় সহ্যশক্তিকে সংযম বলে আমরা শ্রদ্ধা দিয়ে থাকি! আশ্চর্য্য নয়?

সুবোধ কোন কথা কহিল না।

তপন একটু থামিয়া বলিল, নারীর সহিষ্ণুতা প্রবাদ বাক্যের মত। কিন্তু আমরা জানি দুর্ব্বল বৃত্তির ভারে বেশী নুয়ে পড়ে বলেই অল্প সহ্যই তার পক্ষে প্রচুর। তাই তার স্তুতিবাদ। কিন্তু বাইরের সংঘাতবিক্ষোভ—পুরুষ যা সয় হাসিমুখে—পুরুষ যা অগ্রাহ্য করে—নারী সেইখানে হয় আত্মঘাতিনী।

সুবোধ তথাপি কোন উত্তর দিল না। তর্ক করিবার প্রবৃত্তি যেন তাহার নাই। যাহার পর পরিসমাপ্তির ছেদ, তাহার পর বই বন্ধ করিবার কথা—খানিক ভাবিবার কথা।

তপন সুবোধের বেদনাতুর মুখের পানে চাহিয়া আর তর্ক চালাইল না। তাহার হাত হইতে জুঁইফুলের গোছাটা লইয়া কহিল, চল না একবার ও-ঘরে।

মাথা নাড়িয়া সুবোধ অসম্মতি জানাইল। যে কাহিনী অসমাপ্ত রহিয়া গেল—এ জীবনে ক্রন্দন বা দীর্ঘনিশ্বাস ঢালিয়া তাহাকে লোকচক্ষে করুণ করিয়া কি লাভ!

সুবোধ চলিয়া গেল।

* * *

এই মর্ম্মান্তিক দুঃখের করুণ ইতিহাসটুকু তপন অবশেষে শুনিল।

চারুর মুখেই শুনিল।

দিন দুই আগে সুলতার পিতা টাকার যোগাড় করিতে না পারিয়া লোকচক্ষুর অবজ্ঞা দৃষ্টি এড়াইতে আত্মহত্যা করিয়াছেন। পিছনে প্রকাণ্ড সংসার তাঁহার মুখ চাহিয়া বসিয়াছিল, স্নেহ-ভালবাসার সহস্র শিকড়ে আঁকড়াইয়া প্রতিদিনকার জীবন মমতার রসধারা পান করিয়া পুষ্ট হইতেছিল, সে-সব একবারও ভাবেন নাই। নিজ জীবনের মর্য্যাদাকেই বড় করিয়া বুঝিলেন।

যাক্, তিনি ত চক্ষু মুদিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে এত বড় সংসারটাও ভাঙ্গিয়া দিয়া গেলেন। ছায়া নিরাশ্রয়া। সুলতা এ-আঘাত সহ্য করিতে পারিল না, পিতার পথগামিনী হইল। না হইয়াই বা সে করিত কি! এত বড় অবমাননার পর বাড়ীতে একদণ্ডও বাঁচিয়া থাকা তার পক্ষে পলে পলে মৃত্যুর সমান হইত। এ বিবাহ-প্রস্তাব সে-ই করিয়াছিল। অবশ্য কন্যাস্নেহমুগ্ধ পিতা এতটা নতি স্বীকার করিবেন—সুলতা ভাবিতে পারে নাই। চোখের সম্মুখে সেদিন সুলতার আত্মবিশ্বাস চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল, সে প্রচণ্ড আঘাত সে সহিতে পারে নাই। মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। জ্ঞান হইবার সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্যও তাহার স্থির হইয়া গিয়াছিল। শুষ্ক বিশীর্ণ অধরে তাই হাসির রেখা ফুটিয়াছিল—পিতার জন্য একবারও সে ভাবে নাই। চারু পত্রে তাহার যে-সব অসংলগ্নতা দেখিয়া শঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিল—কার্য্যকারণ-পরম্পরায় আজ মনে হইতেছে—তার চেয়ে স্বাভাবিক আর কিছু হইতে পারে না। তেমন দিনে সুলতা গান গাহিল, নিজের ছেলে পরকে বিলাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল; পিতার সংবাদ সংগ্রহের জন্য কিছুমাত্র ব্যাকুলতা তাহার মুখে ফুটিল না। চারু বুঝিতে পারে নাই—এ-সব বিদায়ের আয়োজন।

তপনের চোখের সম্মুখ হইতে ধীরে ধীরে সংসারের যবনিকা উঠিতেছে। মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে সুলতার যন্ত্রণাকে সুশীতল করিতে আসে নাই। জ্বালা সহিতে না পারিয়া অভাগিনী আত্মঘাতিনী হইয়াছে। বাহিরের কেহ এ-কথা জানে না। অর্থমহিমায় নারীর পরম কাম্য সৌভাগ্য লইয়া আলতা সিঁদুর পরিয়া ফুলের খাটে চাপিয়া সুলতা কোন্ মহাতীর্থের অভিমুখে

প্রয়াণ করিল? কেহ জানিল না, কেহ বুঝিল না—সৌভাগ্যবতীর পায়ের আলতা ও সিঁথির সিঁদুর অকস্মাৎ লাল হইয়া উঠিল কেন!

তপনের দৃষ্টি ক্রমশঃই স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছে। সুলতার জীবনের পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়গুলি আজ যেন চোখের সম্মুখে খোলা পড়িয়া আছে। জুঁইফুলের গোছা আগুনে তুলিয়া দিবার জন্য সুবোধের সেই ঐকান্তিক অনুরোধের মধ্যে বহুদিন পূর্ব্বের অনতিস্ফুট এক কাহিনী আকার লাভ করিতেছে। মানব-মনের চিরন্তনী কামনা বল কামনা, ভালবাসা বল ভালবাসা।

তপন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, সেইদিন সুলতা কেন আত্মঘাতিনী হয় নাই!

দৃষ্টির প্রসার বাড়িয়া গেল। সেইদিন—ঠিক সেইদিন হইতেই লোকচক্ষুর অন্তরালে জীবন-ক্ষয়ের সাধনা সুরু হইয়াছিল। নারীর সহ্যশক্তি অপ্রচুর নহে—অসীম। যে পিতার মর্য্যাদাকে ধুলিশায়ী দেখিয়া সুলতা জীবন-বিসর্জ্জনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইল এবং অনায়াসে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মত যে জীবন পরিত্যাগও করিল—বহু—বহুদিন পূর্ব্বে সেই পিতার মর্য্যাদা রাখিতে হয়ত বা সংসারের শান্তি অটুট রাখিতেই, সুলতা বিবাহের যুপকাষ্ঠে অবনতশির হইয়াছিল। হয়ত দরিদ্র বলিয়া সুবোধকে তাঁহারা উপেক্ষা করিয়াছিলেন, হয়ত বা অন্য কিছু। কিন্তু সংসারকে রৌদ্রোত্তাপ হইতে রক্ষা করিতে নারী চিরদিনই সহিষ্ণুতার ছায়া মেলিয়া ধরে না কি? তাই বুঝি সুবোধ সে-কথার প্রতিবাদ করে নাই; বাহিরের সংঘাত বিক্ষোভ পুরুষ যা সয়, হাসি মুখে পুরুষ যা অগ্রাহ্য করে—নারী সেইখানে হয় আত্মঘাতিনী। মিথ্যা, মিথ্যা এ কথা।

বিবাহের পর এ সংসারে আসিয়া একদিনও সুলতা মুখ ভার করে নাই। নিজ-জীবনের আনন্দদীপ নিবাইয়া সংসারের রশ্মিটিকে স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে সে প্রাণপণ করিয়াছে। সুলতার সঙ্গে সঙ্গে হাসি আনন্দ এই বাড়ী হইতে চিরদিনের মতই বিদায় গ্রহণ করিল।

না, নারীকে সে অবহেলা করিবে না। বাহিরের চক্ষু প্রতিনিয়ত প্রতারণা করে, সে চক্ষুর বড়াই করা মিথ্যা।

আজ ছায়ার পাশে দাঁড়াইবার প্রয়োজন ও অধিকার একমাত্র তপনের।

তপন ভাল করিয়া বেশভূষা করিল না। হাতকাটা সার্টটা আল্‌না হইতে টানিয়া গায়ে দিল ও স্যাণ্ডেলে পা গলাইয়া বাড়ীর বাহির হইল। মোটর তৈয়ারী থাকিলেও—সে মোটরে উঠিল না। হয় ট্রামে, নতুবা পায়ে হাঁটিয়া সে শ্যামবাজার যাইবে। মোটরে চড়িয়া শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দিতে যাওয়ার মত নিষ্ঠুর বিদ্রূপ জগতে আর কি-ই বা আছে!

বাড়ীর দুয়ারেই তরুণের সঙ্গে দেখা। সে ছড়ি ঘুরাইয়া শিস্ দিতে দিতে বাহির হইয়া যাইতেছে। শোক প্রকাশ করিতে আসিয়াছিল বোধ হয়। তপনকে দেখিয়া একটু মুচকিয়া হাসিল এবং কুশল-প্রশ্ন আদান-প্রদানের পর বিদায় গ্রহণ করিল।

তপন ভাবিল, ফিরিয়া যাই। যে-কার্য্য আমার করা উচিত ছিল—সেই কার্য্য সারিয়া তরুণই যেন চলিয়া গেল। মুখে তার বিজয়ীর গর্ব্বিত হাসি, ভ্রূকুটিতে তাচ্ছিল্য।

কিন্তু ছিঃ, এ-সব সে ভাবিতেছে কেন! সত্যকার সমবেদনায় অন্তর পরিপূর্ণ করিয়া সে এখানে আসিয়াছে, জয় পরাজয়ের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। নিরর্থক এই সব চিন্তা। তরুণের মত মুখোস পরিয়া কোনদিন সে ছায়ার সম্মুখীন হইবে না।

কুণ্ঠাহীন হইয়াই সে ভিতরে ঢুকিল।

চাকরটা বাহিরের ঘরে বসিয়া তামাক সাজিতেছিল। বাড়ীর ভিতরে কোলাহল স্তব্ধ। মাঝে মাঝে সকরুণ বিলাপধ্বনি বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। কোন নিকটতম আত্মীয়ের মর্ম্ম-ব্যথার প্রকাশ।

চাকরটা তপনকে নমস্কার করিয়া কান্নার সুরে কি কথা ফাঁদিতেছিল, বাধা দিয়া তপন ছায়াকে ডাকিয়া দিতে বলিল। অপ্রসন্ন মুখে সে উঠিল।

অনতিবিলম্বে ছায়া আসিল। পায়ে স্যাণ্ডেল নাই, বেশবাস বিশৃঙ্খল না হইলেও মলিন। লালপাড় মিলের সাধারণ শাড়ী পরনে, রুক্ষ চুল এলো করিয়া পিছনে বাঁধা, হাতে মাত্র দু'গাছি রুলি। ঝড়ের পর সুবোধদের গ্রামখানিকে যেমন দেখিয়া আসিয়াছিল—তেমনই। তেমনই থমথমে, তেমনই মলিন—অশ্রুমুখী।

তপন কোন কথাই খুঁজিয়া পাইল না। শোকে সান্ত্বনা দিতে আসাটাই মস্ত বড় চাতুরী বলিয়া তাহার মনে হইল! তবু যুগযুগান্তর ধরিয়া

এই কার্য্য মানুষেরই। নিজের কিংবা অপরের দুঃখ জানাইয়া—সে শোকার্ত্তের অশ্রু মুছাইতে চেষ্টা করে, শাস্ত্রের শ্লোক তুলিয়া জীবনের অনিত্যতার প্রমাণ দেয়। মৃত্যু শাশ্বত সত্য এবং জীবন মায়ামরীচিকা, মৃত্যু অমৃতলোকে উত্তীর্ণ হইবার সেতু এবং জীবন সেই আনন্দ-তীর্থপথের বিঘ্নস্বরূপ—একথা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিয়া—শোককে স্তব্ধ করিবার কি-ই বা সার্থকতা! নদীপ্রবাহের মত যাহার গতি নিশ্চিত, হাসিয়া হউক আর অশ্রু ফেলিয়াই হউক, তাহাকে বরণ করিয়া না-লওয়া ছাড়া উপায় কি।

কিন্তু এই মুহূর্ত্তে কিছু না বলিলেও অশোভন-মুহূর্ত্ত যুগ হইয়া দাঁড়াইতেছে।

ছায়া তাহাকে সেই মহা দায় হইতে নিষ্কৃতি দিয়া প্রথমেই প্রশ্ন করিল, কবে ফিরলেন?

কাল। বলিয়াই মনে হইল, এখানে একবার আসা উচিত ছিল।

ছায়া তাহাকে সেই লজ্জা হইতেও নিষ্কৃতি দিল। বলিল, বসুন।

যন্ত্রচালিতের মত তপন বসিল। তাহার মহাশোকে ছায়াই যেন সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছে!

বসিয়াই তপন কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তৎপূর্ব্বে ছায়াই প্রশ্ন করিয়া বসিল, দিদি পরশু রাতেই মারা গেছেন বুঝি?

তপন মাথা হেলাইতেই ছায়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ছায়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছিল? কলেরা? সত্যিই কি কলেরা হয়েছিল?

তপন কাসিতে আরম্ভ করিল। এ প্রশ্নের কি উত্তর সে দিবে?

প্রশ্ন করিয়া ছায়াই তাহার উত্তর দিল, উঃ দেখুন একবার অঘটন! বাবাকে সে ভারি ভালবাসতো, তাই ছেড়ে একটি দণ্ডও থাকতে পারলে না। কি আশ্চর্য্য দেখুন, বাবা যেদিন মারা যান, সেদিন মেসোমশাই এসে চুপি চুপি আমায় বললেন, আসল খবরটা চেপে যেতে হবে, না হলে তাঁর মর্য্যাদার হানি ঘটবে। ডাক্তারকে ঘুষ দিতে রাজী হইনি শুধু আমি, তাই লোকের কাছে তাঁর কলঙ্ক ছড়িয়ে পড়েচে। বলুন দেখি তপনবাবু, আসল ঘটনাটা চেপে যাওয়াই কি আমার পক্ষে উচিত কাজ হতো? ওকি অমন করচেন কেন। ভজুয়া—জল—জল—নিয়ে আয়।

চোখেমুখে জলের ঝাপটায় ও মাথায় পাখার বাতাসে তপনের অচৈতন্য ভাবটা কাটিয়া গেল। ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া সে কি বলিতে গেল।

ছায়া বলিল, ছিঃ, এই দুর্ব্বল দেহ নিয়ে এসেচেন এতদূরে! কি দরকার ছিল বলুন ত?

তপনের মনে হইল, ছায়ার প্রতিটি শব্দে বিদ্রূপের কশাঘাত! ছায়া যদি পিতার মৃত্যুর জন্য খানিক কাঁদিত বা তপনের পিতাকে অভিযুক্ত করিত, তপন শান্তি পাইত। দুর্ব্বল দেহই বটে! সুলতার মৃত্যু-রহস্য প্রকাশ করিবার মনের জোর তাহার নাই।

দিনকতক যাক, ছায়াকে আসল কথা সে বলিবেই। কিন্তু আজ নয়। ছায়ার সুকোমল মনে আঘাতের পর আঘাত দিয়া ধূলিতে মিশাইয়া দিলে—তপনের সত্যনিষ্ঠার গৌরব বাড়িবে না। না-হয় ছায়া তাহাকে আপাতত হীন বলিয়াই জানুক।

কি কথা বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া তপন বলিল, আসবার সময় দেখি—তরুণবাবু বেরিয়ে যাচ্ছেন।

ছায়া বলিল, হাঁ, উনি রোজই আসচেন। সত্যকথা গোপন না করায় বিপদও আমার কম হয়নি। ভাগ্যিস্ উনি ছিলেন! তরুণবাবু সম্প্রতি Special Branchএ ঢুকেচেন কিনা—ওঁর জন্যই পুলিশরিপোর্টে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।

এ-কথায় তপন একটুও আনন্দিত হইল না। যে কৃতজ্ঞতা তপনের পাওয়া উচিত ছিল—তরুণ তাহা দস্যুতা করিয়া লুটিয়া লইয়াছে। তরুণ পুলিশ বিভাগে চাকরি করিতেছে—আচরণটাও সম্ভবত—কিন্তু এ-সব পরচর্চ্চা থাক।

তপন বলিল, ভালই হয়েচে। আপাতত—

ছায়া বলিল, এ বাড়ীতে মন আমার হাঁপিয়ে উঠচে। যাঁরা আছেন, দিনরাত্রি তাঁদের হা-হুতাশে আমার দম আটকে আসচে। আশ্চর্য্য তপনবাবু, যে কান্নায় গলার স্বর বন্ধ হয়ে আসে, সে কান্নার কোন মূল্যই নাকি সংসারে নেই! অন্তত এঁরা ত তাই বলেন।

তপন বলিল, ভেতরটা খুব কম লোকই দেখতে জানে ছায়া।

ছায়া বলিল, তরুণবাবুও ঠিক এই কথা বলছিলেন। উনি বলেন, জেসিডিতে ওঁদের বাড়ী আছে, সেখানে গিয়ে দিনকতক থাকলে মনটা—

তপন বলিল, মন যার ভাল থাকে না—তার কোথাও থাকে না। আর এই সব আত্মীয়-বন্ধু ছাড়া হয়ে এ-সময়ে দূরে থাকাও ঠিক নয়।

ছায়া ঈষৎ বিস্মিত হইয়া কহিল, মানে? আত্মীয়-বন্ধুরা যে মনের খবর রাখেন না, এইমাত্র আপনিই ত এ-কথা বললেন। আমি চেঁচিয়ে কাঁদি না বলে ওঁরা কত কথাই পরস্পর বলাবলি করেন। কিন্তু বোঝেন না, ভেতরটা যার উত্তাপে শুকিয়ে গেল, তার চোখে জল আসে কোথা থেকে!

বলিতে বলিতে ছায়ার কণ্ঠস্বর আর্দ্র ও রুদ্ধ হইয়া গেল।

তপন দারুণ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, না, আমি সে-কথা বলিনি, তবে তোমার পক্ষে—

ছায়া আর্দ্রস্বরে বলিতে লাগিল, না ও-সব সমবেদনা সহ্য করবার শক্তি আমার নেই। আমায় পালাতেই হবে এখান থেকে। জানেন, শুধু আমারই জন্য তাঁর এই অকাল-মৃত্যু, শুধু আমারই জন্য।

তপনের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। এখনই বুঝি বিবাহের অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে! তা যদি হয় ত তপন লজ্জায় মুখ লুকাইবে কোথায়?

সে কথা উঠিল না। ক্ষণকাল মুহ্যমান ও মৌন থাকিয়া ছায়া বলিল, আমি ত মনে করেচি—পরশুই রওনা হব। তরুণবাবুকে কথাও দিলুম—এইমাত্র।

তপন অভিমানক্ষুন্নকণ্ঠে বলিল, হঠাৎ সব বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেলেচ, নৈলে আমি—

ছায়া বলিল, আমি জানি উপায় আপনিও একটা করতেন। এ জগতে বন্ধু যদি কেউ থাকেন ত—তরুণবাবু আর আপনি।

বার বার তরুণের নামটা তপনের প্রীতিপ্রদ হইল না। ছায়া অন্ধ। শোকে সান্ত্বনা দিয়া পিছন ফিরিয়া যে হাসিতে পারে, তাহার সমবেদনার অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে তপনের ঘোরতর সন্দেহ। তরুণ বন্ধু! সম্প্রতি পুলিশ বিভাগে ঢুকিয়াছে—জেসিডির বাড়ীখানা উদারতা দেখাইয়া ছাড়িয়া দিতেছে! আশ্চর্য্য, বুদ্ধিমতী বলিয়া ছায়ার উপর তাহার শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু তরুণের মোহজাল ছায়াকে এমন করিয়া ঘিরিয়াছে যে, তীক্ষ্ণদৃষ্টির জ্যোতিও সেই মেঘ-মালিন্যে নিবুনিবু। ছায়া কি বুঝিতে পারে না, তরুণ বসন্তের কোকিল। আম্রমুকুল-সৌরভের সঙ্গে ঘনপল্লবিত তরুশাখায় আশ্রয় লয়, বর্ষার দারুণ দুর্দ্দিনে উড়িয়া পলায়। নীড় বাঁধিবার পরিশ্রম ও সহিষ্ণুতা তাহার নাই। বেথুনের বাস-এ বসিয়া গবাক্ষ-পথে কোনদিন কি ছায়া এই সব সজ্জাসর্ব্বস্ব তরুণের লুব্ধদৃষ্টির লেখা পাঠ করে নাই?

তপন অবশেষে বলিল, তোমার জেসিডি যাওয়ার বিষয়ে যদি কিছু সাহায্য করতে পারি—

ছায়া বলিল, থ্যাঙ্কস্। ব্যবস্থা আমিই করে নিতে পারবো, আপনাকে আর অনর্থক কষ্ট দিতে চাই না। তা ছাড়া তরুণবাবু আমার সঙ্গেই যাবেন।

এবার সত্যসত্যই প্রচণ্ড অভিমান হইল। তপনকে ছায়ার কোনই প্রয়োজন নাই। পরামর্শ মন্ত্রণা যা কিছু তরুণের সঙ্গে হইয়া গিয়াছে এবং সম্ভবত বায়ুপরিবর্ত্তনের সুদীর্ঘ অবসর-মুহূর্ত্ত তরুণেরই সাহচর্য্যে পরম উল্লাসে কাটিয়া যাইবে। তাই যাক, অনাহূত ভাবে এখানে আসিয়া অযাচিত মন্ত্রণা দিবার লজ্জা হইতে তাহার শুভ বুদ্ধি তাহাকে রক্ষা করুক।

ঢালু জমির উপর জল ঢালিলে সে জলের গতি বুঝিতে যেমন দণ্ড মাত্রও বিলম্ব হয় না, নারীর মনও তেমনই মুহূর্ত্তে চিনিয়া লওয়া যায়। সম্মুখে যাহা পায় তাহাই সে অবলম্বন করে।

তপন আর একটিও কথা বলিল না। মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি কক্ষ ত্যাগ করিল। ব্যবহারটা খুবই আশ্চর্য্যজনক ও অসঙ্গত হইল হয়ত, কিন্তু কথা বলিতে গেলেই চোখের জল উপচাইয়া পড়িতেও ত বিলম্ব হইত না। সে দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া খাটো হইবার প্রয়োজন কি?

ছায়াকে আপন করিতে অন্তরের স্নিগ্ধ-কোমল স্পর্শ-ই তো যথেষ্ট। চোখের জল ফেলিয়া অক্ষমের মত আবেদন? ছি!

* * *

রাত্রিটাও অশান্তিতে কাটিল। জাগ্রত ও স্বপ্নে ছায়াই বার বার দেখা দিতে লাগিল। কখনও অশ্রুমুখী, কখনও বা উল্লসিতা। তরুণের বাহুনিবদ্ধ হইয়া কখনও সে বিলাসিনী, তপনের পায়ের তলায় বসিয়া কখনও বা আশ্রয়প্রার্থিনী! জাগ্রতে যে অতিদূরে চলিয়া গিয়াছে, মূর্ত্তিটাও যাহার ভাল মনে পড়ে না, স্বপ্নে সে সন্নিকটবর্ত্তিনী। বুকের উপর তাহার দীর্ঘনিশ্বাসের উষ্ণতা—ঘুম ভাঙিলেও, মনে হয় লাগিয়া আছে! কেশসুরভিতে নৈশপ্রকৃতি পর্য্যন্ত সুরভিত। একি দুর্দ্দম বাসনা

মত্ত দানবের মত মনে দাপাদাপি করিয়া ফিরিতেছে। দুর্লভ বলিয়া কামনার বল্গা টানিয়া রাখা যায় না, দুষ্কর জানিয়াও বিজিগীষা!

সকালে উঠিয়াই বইয়ের রাশি খুলিয়া বসিল, খাতা পেন্সিলে আঁক কষিতে লাগিল। পড়া অগ্রসর হইল না, আঁক ভুল হইল। বাগানে পায়চারি করিলেও মহা জ্বালা। সেই বটানিক্যাল গার্ডেন, সেই উৎসব-দিনের নিমন্ত্রণ! ভাল, পল্লী-প্রবাসের কথাই ভাবা যাক। সেখানেও আভা। আর একখানা পড়া-বইয়েব খোলা পাতা। মনের কোণে দাগ আভাই প্রথম কাটিয়া দিয়াছিল। দুর্যোগের রাত্রিশেষে আবছা অন্ধকারে খোলা দরজায় দাড়াইয়া আলুলায়িত-কুন্তলা আভা। রাত্রির মধ্যযামের প্রচুর অন্ধকার তার মুখে চোখে। নারীজাতি-সম্বন্ধে প্রথম চৈতন্য বলিতে গেলে আভাই আনিয়া দিয়াছে। তাই ত আজ নারী ও নদী সম্বন্ধে অমন সহজ ধারণাটা তপনের মনে স্বতঃ-উৎসারিত সত্যের মত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। নারী বুদ্ধি দিয়া বিচার করে না, প্রবৃত্তির বশে পথ চলে। নমনীয়তা কিংবা দুর্ব্বলতা যাই বল, নারীকে কতকটা যেন নির্ব্বোধ করিয়া রাখিয়াছে। পঙ্গু বা মোহাভিভূত হইয়া তাই সে অন্তর-আবেগে পরিচালিত হয়। এ মোহ এমন প্রচণ্ড যে, সহের সীমা অতিক্রম না করিয়াও অনায়াসে সে জহরব্রত বরে বা স্বামীর চিতায় পুড়িয়া মরে।

এই নারীকে স্তুতিবাদে—কবিরা করিয়া তুলিয়াছেন দেবী; সুতরাং, দুর্জ্ঞেয়। পুরুষের ভাগ্য ও নারীর চরিত্র নাকি দেবতারাও জানেন না। দেবতারা মানে—নারীচরিত্র-অনভিজ্ঞেরা। তাঁরা যে জানিবেন না—তাহা ত বিন্দুমাত্র আশ্চর্য্যের নহে। পৃথিবীতে বসিয়া মঙ্গলগ্রহের অধিবাসীদের আমরা কতটুকু জানি!

দুপুরে একখানা চিঠি সে পাইল। অজানা হস্তাক্ষর। উপরে ডাকমোহরের ছাপটা নিরীক্ষণ করিয়া তপন বুঝিল, সুবোধদের দেশ হইতে চিঠি আসিয়াছে। কে লিখিল?

খুলিয়া প্রথম সম্বোধন পড়িয়া তপন বিস্মিত হইল। আভা লিখিয়াছে:

শ্রীচরণকমলেষু,—

ছোড়দা, এখান হইতে যাওয়া অবধি আপনার পত্র পাই নাই। আশা করি, ভালই আছেন ও বাড়ীর সর্ব্বাঙ্গীন কুশল। কাল মা আমায় বার বার করিয়া পত্র দিতে বলিলেন। দাদার পত্র পাই নাই বলিয়া আমরা অত্যন্ত চিন্তিত আছি। আমি কিন্তু জানি, বাড়ীর সংবাদ যাহাই হউক, আপনি আমাকে পত্র দিবেন না। সম্ভবত এ পত্রের উত্তরও আসিবে না।

আপনি হয়ত আশ্চর্য্য হইতেছেন, এ মুখরা মেয়েটা বলে কি? ছোড়দা, আমি কি আপনার বিদায়দিনের মুখখানি ভাল করিয়া দেখি নাই! সকালে যখন জলখাবার দিতে গেলাম—তার বহু পূর্ব্বেই নিজের হাতে চা তৈয়ারী করিয়া খাইয়াছেন। অথচ কিছুদিন আগে চা না-খাইবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। সে-প্রতিজ্ঞা আমার সামনে করিয়াছিলেন বলিয়া হয়ত আমার সামনেই ভাঙ্গিয়া তার প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। তারপর আমার জলখাবার স্পর্শও করিলেন না। অথচ শরীর আপনার সুস্থই ছিল। তারপর সারাদিন যদি বা আপনার সামনে আসিয়া পড়িয়াছি, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়াছেন। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সংক্ষিপ্ত 'হাঁ' 'না' দিয়া সারিয়াছেন। কেবল বিদায়বেলায় প্রণাম সারিয়া উঠিতেই দেখিলাম, আপনার মুখ প্রসন্ন! সেই সাহসেই আপনাকে দু'ছত্র লিখিবার শক্তি আমার জন্মিয়াছে। আমি অন্ধ নহি। আপনার বিচিত্র আচরণের মর্ম্ম কতক অনুমান করিয়াছি—কতক বা বুঝিয়াছি। যেটুকু বুঝিয়াছি—সেইটুকুই বলিব। অবশ্য আপনার মনের সন্দেহ নাশ করিয়া আমার নির্দ্দোষিতাকে প্রমাণ করিবার জন্য এই লিপি-আড়ম্বর নহে। মানুষের চোখে মানুষ খাটো হইয়া গেলে কি ক্ষতি যে তার হয়—আজ নিজের হৃদয় দিয়া বুঝিতেছি বলিয়াই আপনাকে সমস্ত জানাইবার ইচ্ছা হইতেছে। আমি আপনার নিকট যে স্নেহ পাইয়াছি, জীবনে সেই স্নেহ হইতে বিচ্যুত হইবার ইচ্ছা আমার মোটেই নাই। একটা অঙ্গ নষ্ট হইলেও মানুষের তত ক্ষতি হয় না, যত ক্ষতি—একটি হৃদয়ের বিশ্বাসচ্যুতিতে।

সম্ভবত সেদিন রাত্রিতে কোন দৃশ্য আপনার চোখে পড়িয়াছিল। কিন্তু সে দৈবের জন্য আমিও সেদিন প্রস্তুত ছিলাম না। তথাপি যখন স্নিগ্ধ আশীর্ব্বাদের মত সেই দুর্বিপাক বাদলরাত্রির মাথায় চাপিয়া আমার দুয়ারে আসিয়া করাঘাত করিল, দুয়ার না খুলিয়া পারিলাম না। এবং সে ভার বহন করিতে মাথাও দিলাম পাতিয়া। তিনি আপনারই বন্ধু, নাম ধরিব না। হিন্দু যাহাকে

একবার অতি আপনার ভাবিয়া অর্দ্ধাঙ্গভুক্ত করিয়া লয়, অর্দ্ধাঙ্গের মতই নাম তার লুপ্ত হইয়া যায়। আপনি তাঁর পিতাকে দেখিয়াছেন, আমাদের ভাবি সম্বন্ধের কথাও শুনিয়াছেন। আরও হয়ত শুনিয়াছেন—তাঁর সঙ্গে আমার মিলন এ জীবনে অসম্ভব। কিন্তু বিশ্ববিধানে অসম্ভব কিছুই নাই। আমার জীবনেও তাই গ্রন্থি পড়িল। তিনি বাধাবন্ধহীন দুর্দ্দম, তবু তাঁকে বাঁধিবার রজ্জু আমিই প্রার্থনা করিয়া লইলাম। না লইলে তাঁকে হারাইবার ভয় আমার ছিল। লোকচক্ষে আমি অপরাধী, কিন্তু মনের উপর কোন জোর নাই। বহুদিন পূর্ব্ব হইতে স্বামীরূপে যাঁকে কল্পনা করিয়াছি—তাঁর কাছে লজ্জা আমার ছিল না। তাই অকুণ্ঠ-চিত্তে সেই রাত্রিতে ভিক্ষা করিতে পারিলাম। তিনিও প্রসন্নমনে ভিক্ষা দিলেন। আপনার জানালা দিয়া যদি দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করিয়া এ-ঘরে পাঠাইতে পারিতেন ও আকাশে প্রভাতের আলো ফুটিয়া উঠিত ত দেখিতেন, তাঁর দেওয়া পরম ঐশ্বর্য্য আমার সীমন্ত সেদিন কেমন রাঙাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু বাহিরে অন্ধকার ছিল বলিয়াই আপনার মনেও অন্ধকার রহিয়া গেল। এবং সমস্ত দিন ধরিয়া আপনার অবহেলার আগুনে—আমি দগ্ধ হইলাম।

ছোড়দা, আমি জানি, এ জীবনে তিনি হয়ত আর আসিবেন না, হয়ত লোকের জিহ্বার বিষে মা আমার অতিষ্ঠ হইয়া উঠিবেন। তবু পুরাণের সতী-নারীদের পথানুসারিণী না হইয়া পারিলাম না। আমার অতিবৃদ্ধা প্রপিতামহী শুনিয়াছি স্বামীর চিতায় পুড়িয়াছিলেন। রাজ-আইনে সে-পথ আজ বন্ধ। কিন্তু হিন্দুনারীর চিতারোহণ আটকাইতে পারে নাই সে আইন। আজও তারা স্বামীর পথ ধরিয়া চলে, আদর্শ সৃষ্টি করে। জীবনপথে একদিন যাকে সঙ্গী নির্ব্বাচন করে—আমরণ তারই ধ্যানে দেহপাত করিতে দ্বিধা বোধ করে না। একনিষ্ঠা ও পাতিব্রত্য যদি হিন্দুনারীর মহাদোষ হয় ত শতকরা নিরানব্বই জনের মত আমিও আপনার শাসনদণ্ডতলে মাথা পাতিয়া দিলাম। শাস্তি কিম্বা সান্ত্বনা যাহা ইচ্ছা দিন।

আমার প্রণাম জানিবেন।

পুঃ—

পত্র পাওয়া না-পাওয়ার উপর বিচারক কোন্ শাস্তি দিলেন বুঝিতে পারিব। ইতি

আশীর্ব্বাদপ্রার্থিনী আভা।

পত্র পড়িয়া তপনের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অকারণ সন্দেহ পোষণ করিয়া আভার উপর সে অবিচার করিয়াছে এবং নিজেও কষ্ট পাইয়াছে। এখন সন্দেহ কাটিয়া গেল। কিন্তু উল্লাস সে জন্যও নহে। এই মাত্র নারী-সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া সে যাহা স্থির করিয়াছে, আভার পত্র যেন তার অকাট্য যুক্তি। নারী সম্মুখে অবলম্বন পাইলে আঁকড়াইয়া ধরিতে মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব করে না এবং মোহের বশে অনেক সৎকর্ম্ম করিয়া ফেলে। আভা আজ সেই সৎকর্ম্মের গৌরবেই আত্মহারা।

নারীর বুদ্ধি অন্য বিষয়ে তীক্ষ্ণ হইলেও যেখানে হৃদয়ের সঙ্গে যোগ, সেইখানেই সে নির্ব্বোধ। প্রমাণ আভার পত্র। একটা কাল্পনিক আদর্শ ধরিয়া আভা যাত্রা করিয়াছে, জানে না অবোধ বালিকা শেষ ওই কল্পনাকে টিকাইয়া রাখা কত দুষ্কর! আদর্শবাদীর ভগ্নী বলিয়াই বুঝি এমন উৎকট আদর্শের বীজ ওর অন্তরে?

অপরাহ্নে ছায়ার একখানি ক্ষুদ্র পত্রে এত গবেষণা বিশ্লেষণ সব বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। সহজ সরল নারী আবার রহস্য-আবরণে মুখ ঢাকিল। মনে হইল, দেবতা মানে স্বর্গলোকবাসী নহেন—আমাদের পৃথিবীর অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা; নারীমন বিশ্লেষণ করিয়া যাঁহারা এ পর্য্যন্ত তার বিচিত্র রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে পারেন নাই।

ছায়া লিখিয়াছে:

এই পত্র পাওয়ামাত্র বৈকালে আপনার একবার আসা চাই। তরুণবাবুর সঙ্গে যে-সব পরামর্শ করিয়াছিলাম—উল্টাইয়া গিয়াছে। জেসিডি আমি যাইব না। কোথাও না। আপনি একবার আসিবেন কি? —ছায়া

গভীর অভিমান কোথায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল, নারী-সম্বন্ধে সহজ অভিজ্ঞতার বড়াইও আর রহিল না। তপন সে জন্য খুশীই হইল। আজ ছায়া তাহাকে ডাকিয়াছে। তরুণ নহে, তপনকেই ছায়ার প্রয়োজন।

ইচ্ছা হইল, ঘড়ির কাঁটাটাকে হাত দিয়া সরাইয়া অপরাহ্ন-অভিমুখী করিয়া দেয়, কিন্তু সূর্য্যের উপর মানুষের কোন হাত নাই। বিজ্ঞান সবে শিশু, কত বর্ষ পরে তার পূর্ণ পরিণতি হইবে, কে জানে!

* * * *

জানালার ধারে চেয়ার টানিয়া দু'জনে মুখোমুখী বসিল।

ভূমিকার প্রয়োজন ছিল না। ছায়াই ডাকিয়া পাঠাইয়াছে। সুতরাং ছায়াই কথা বলিল, সত্যি বলতে কি, এ বাড়ীতে আমার মন টিঁকচে না, অথচ জেসিডি যাওয়া হলো না। কি করি বলুন ত?

তপন বিস্মিতকণ্ঠে বলিল, জেসিডি যাওয়া হলো না কেন? তরুণবাবু সঙ্গী হতে রাজী হলেন না বুঝি?

ছায়া এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, ঠিক তার উল্টো। তাঁর অতি-আগ্রহই আমার না যাওয়ার কারণ। আশ্চর্য্য হবেন না, আজ সকালেও তিনি এসেছিলেন। তাঁর চোখের উজ্জ্বলতায় অনেক জিনিষই আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম।

তপন মনে মনে খুশী হইল। ছায়া তবে ভণ্ডটাকে চিনিয়াছে!

ছায়া কণ্ঠস্বর নামাইয়া কহিল, জানেন, আজ এক সপ্তাহও হয়নি বাবা চলে গেছেন, এরই মধ্যে—ছায়া ইতস্ততঃ করিল। হয়ত ক্ষণেকের তরে দ্বিধা আসিল। কিন্তু নিমেষে তার কুণ্ঠা দূর হইয়া গেল। কহিল, বায়ুপরিবর্ত্তন মানে আমোদপ্রমোদে গা ঢেলে দেওয়া নয়। শোক ভুলতে বিলাস বেছে নিতে পারলাম না। একটু ইতস্ততঃ করতেই তরুণবাবুর যা জিদ্! তাঁর চোখের পানে চেয়ে—না, না, থাক ও-সব অপ্রীতিকর কথা। পুরুষকে এত হীন কল্পনা করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।

কণ্ঠস্বর তপনকেও আঘাত করিল। বন্ধুত্বের সুযোগ পাইয়া আজ তরুণের চোখে যে আলো জ্বলিয়াছে, তাহাতে সে ছায়ার কাছে অনেক নীচু হইয়া গেল। আর সুযোগ পায় নাই বলিয়া তপন দুর্দ্দান্ত কামনার বহ্নি চাপিয়া রাখিয়া ছায়ার চোখে হইল মহৎ! কিন্তু ছায়া না জানিলেও তপন ত নিজের অন্তরকে জানে। ছায়ার পত্র পাইয়া যে আলো তার চোখে জ্বলিয়াছিল, সে আলো তরুণের নহে, তপনেরও নহে—সমগ্র পুরুষ জাতির। নারীসঙ্গলোলুপ নরের চোখেই অমন জ্যোতি নিঃসারিত হয়।

মনোভাব লুকাইয়া সাধু সাজিতে তপনের মন উঠিল না। বড় বিশ্বাসেই ছায়া আজ তাহাকে ডাকিয়াছে,—সে বিশ্বাস রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। মুখ নামাইয়া মৃদুস্বরে সে বলিল, আমার পরামর্শ দেবার কোন সাহস নেই, ছায়া, আমিও পুরুষ মানুষ।

ছায়া বলিল, আপনি সরল ও মহৎ। বটানিক্যাল গার্ডেনের কথা মনে পড়ে? সরল বিশ্বাসের জোরেই সেদিন আমায় বাঁধতে চেয়েছিলেন।

তপন ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, তবু আমায় বিশ্বাস করো না। তোমার এই বিপদের দিনে কোথায় নিঃস্বার্থ সান্ত্বনা দিতে আসব, না মনের মধ্যে কামনা পুষে এসেছি। তরুণকে আমি ঈর্ষা করি, সে-ও তোমারি জন্য।

ছায়া হাসিল। ম্লান পাণ্ডুর হাসি। কহিল, আমাদের মধ্যে এক দিন সম্বন্ধ-বন্ধনের সূত্রপাত হয়েছিল—হয়ত সেই জোরেই—

তপন দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, যাই হোক, আমার তরুণ মন তোমাকে চাইচে অহরহ—এ কামনা রোধ করবার শক্তি আমার নেই।

ছায়া মুখ নামাইল না, লজ্জায় রক্তিমবর্ণও হইল না। দিব্য সহজ কণ্ঠেই কহিল, শুনেছি মনের জোরে অনেক কিছু করা যায়। নারীর কামনা ত তুচ্ছ!

তপন বিষণ্নস্বরে বলিল, জানি এ সময়ে এ-সব কথা বলা শুধু অন্যায় নয়, বর্ব্বরতা। তোমার দুঃখের পরিমাণ নিজের সুখের মধ্যে ঠিকমত করতে পারচি না, তাই কামনা উত্তাল হয়ে উঠচে। তবু ছায়া, আজ হোক, দুদিন পরেই হোক—এ-কথা আমায় বলতেই হতো। না বলে আমার নিষ্কৃতি ছিল না। তখন আমার বন্ধুত্বের মধ্যে অবিশ্বাসের বীজ লুকোনো দেখে তুমি হয়ত বেশী যন্ত্রণা পেতে।

ছায়া বলিল, এ-কথা এখন জানিয়ে ভালই করলেন। কিন্তু—

তপন বাধা দিয়া বলিল, আমায় বলতে দাও। তুমি একদিন বলেছিলে বাইরের ভদ্রতা, শিষ্ট আচরণ প্রভৃতি যদি ছেটে ফেলা যায় ত মানুষ অনেকটা সরল হয়। সে কথা আজও ভুলিনি। এতদিন চেষ্টা করেচি, জীবন থেকে এ জট কিছুতেই ছাড়াতে পারিনি। সভ্যতা যে মানুষের কত বড় শত্রু, তা এই সঙ্গীন মুহূর্ত্ত যার এসেছে সেই জানে। কাল যখন এখান থেকে চলে গেলুম, তখন বুক-জোড়া অভিমান ও আঘাত নিয়ে গেছলুম। বুঝেছিলুম, জোর করে কিছু পাওয়ার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। আজ সেই বিশ্বাসেই তোমার এই দুর্দ্দিনেও ভালবাসার কথা বলতে আমার বাধলো না।

ছায়া বেশ সহজভাবেই প্রশ্ন করিল, কেন বাধলো না?

তপন বলিল, দেখলুম, পুরুষজাতি-সম্বন্ধে তোমার মনে সন্দেহ এসেছে। সন্দেহ যে সত্য—তার প্রমাণ তরুণবাবু এবং আমিও।

ছায়া বলিল, আপনাকেও যদি অবিশ্বাস করি—

তপন বলিল, স্বচ্ছন্দে। নিজের পাওনাটাই সব চেয়ে বড় মনে করতুম বলে এতদিন ভয়ে ভয়ে এ-সব কথা বলিনি। আমায় যদি অবিশ্বাস কর ত বুঝবো, ঠিকই করেচ।

ছায়া বলিল, আপনার কষ্ট হবে না?

তপন বলিল, হবে। খুবই কষ্ট হবে। তবু সান্ত্বনা আমার—যে কাউকে ঠকিয়ে কিছু নিলুম না। কষ্ট আমিই সইব—তোমাকে দেব মুক্তি। যাকে সত্য সত্যই আপন করে পেতে চাই—তাকে ত বাঁচাতে পারব অকল্যাণ থেকে, অগৌরব থেকে।

ছায়া বলিল, কিন্তু তপনবাবু, ভালবাসা জিনিষটা কি নাটকীয় ব্যাপার নয়? ওর স্থিতি ক'দিনের?

তপন বলিল, জীবনে যখন ওর স্পর্শ না আসে, নাটকের পাতায় তখনই ওটা হাততালির বিষয় বা হাসির কথা। কিন্তু জীবন যখন নাটক হয়, তখন হাসবার অবকাশ কোথায়! আর স্থিতির বিষয় যদি বল, এই পঞ্চাশ বছরের পরমায়ু অনন্তকালের তুলনায় কতটুকু?

ছায়া বলিল, আর বন্ধন?

তপন উজ্জ্বল চোখে তাহার পানে চাহিয়া কহিল, বন্ধনের কোনও মানে নেই, মুক্তিরও নয়। মন যখনই ক্লান্ত হয়, তখনই বিশ্রাম তার প্রয়োজন। কি মুক্তি, কি বন্ধন, কোনটাই মানুষের চরম কাম্য নয়।

ছায়া পুনরায় প্রশ্ন করিল, আজ আমরা ভালবাসা বলে যে বাঁধন গলায় নেব, কাল যদি তা ক্লান্তিকর হয়?

তপন বলিল, বুঝবো ভালবাসার অভিনয় করেচি আমরা—সত্যকার ভালবাসতে পারিনি। নিজের দেহটা নিজের কাছে কোনদিন অকাম্য হয় না কেন, ছায়া? নিজের গৌরবকে কোনদিন ম্লান করতে ভালবাসি না কেন?

ছায়া বলিল, কারণ আমরা স্বার্থপর, নিজেকে বড় ভালবাসি।

তপন বলিল, এই দেহ-বিনিময়ের মত প্রাণও বিনিময় করতে পারি। ভালবাসার মূল কথা কামনা; পৃথিবী-সৃষ্টির মূলেও তাই। দু'জনের মনের মিল সেইখানে, যেখানে পরস্পরের স্বার্থচিন্তা থাকে না।

ছায়া আর কোন প্রশ্ন করিল না। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, হয়ত তাই।

তপন বলিল, অনেক কথাই কইলুম, পাগলের মত যুক্তিহীন।

ছায়া বলিল, আমি কি করবো তা ত বললেন না!

তপন বলিল, সাহস নেই বলবার। তোমার সন্দেহ বা অবিশ্বাস—

ছায়া মুখ তুলিয়া কহিল, কিন্তু সত্যিই আপনাকে আমি বিশ্বাস করি।

তপন বিস্মিতনেত্রে ছায়ার পানে চাহিল।

ছায়া বলিল, ভাবচেন এত কথার পরেও? হাঁ, বিশ্বাস করি।

আনন্দে তপনের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কহিল, তুমি যে আমার এত বড় compliment দেবে—

ছায়া অনুনয় করিয়া কহিল, আপাতত এই দায় থেকে আমায় বাঁচান।

একটু ভাবিয়া তপন বলিল, এক কাজ কর। যদি পড়বার ইচ্ছে হয়, এ বাড়ী ছেড়ে বোর্ডিংয়ে যাওয়া ভাল।

ছায়া প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল, ঠিক। আমিও মনে মনে তাই ভাবছিলুম। কালই, কি বলেন?

তপন বলিল, বেশ ত।

ছায়া উঠিতেছিল, তপন বাধা দিয়া বলিল, আর একটা কথা বলবার আছে ছায়া। বোস। তোমার বাবার মৃত্যুর কারণ—সম্ভবত তুমি জান, সব জেনেও তুমি আমাকে সঙ্গী নির্ব্বাচন করলে যখন—

ছায়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, সে দৈবের ওপর—আপনার কি হাত?

তপন ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। ছায়া অকুণ্ঠিত বিশ্বাসে তাহার হাত ধরিয়াছে। এতদিন পরে হৃদয়ের দারুণ দ্বন্দ্ব মিটিল। ছায়া মনেপ্রাণে তপনেরই অনুবর্ত্তিনী হইল। এখন সেই অপ্রীতিকর কথা বলিয়া এই বিশ্বাস নষ্ট করা উচিত কি না?

মনে পড়িল, আভার পত্রের এক জায়গায় লেখা আছে, একটা অঙ্গ নষ্ট হইলেও মানুষের তত ক্ষতি হয় না, যত ক্ষতি—একটি হৃদয়ের বিশ্বাসচ্যুতিতে।

না, বিশ্বাসচ্যুত সে হইবে না, কোথাও আবরণ রাখিবে না। ছায়াকে হারাইবার ভয় আর তাহার

নাই। সমস্ত শুনিয়া যদি সে দূরে সরিয়া যায় যাক, নিকটে আসে আসুক। কামনার কলুষ কাটাইয়া সবেমাত্র সে ভালবাসার নির্মল নদীতে নামিয়াছে—বাহিরের পাওয়া না-পাওয়ার উল্লাস বা বেদনা তাহার কিছু নাই।

ছায়ার পিতার মৃত্যু রহস্য তপন একে একে খুলিয়া বলিল। মাথা নীচু করিয়া ছায়া সমস্তই শুনিল। মুখের একটি রেখাও কুঞ্চিত হইয়া উঠিল না, চক্ষু হইতে এক বিন্দুও জল ঝরিল না।

সুদীর্ঘ বিষণ্ন নিস্তব্ধতা।

তপন পুনরায় এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল, আরও আছে ছায়া। তোমার দিদির মৃত্যুকাহিনী—

ছায়ার স্থৈর্য্য রহিল না। দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া আর্তস্বরে সে কহিল, বলুন।

ছায়ার ভাব দেখিয়া তপন বড় ব্যথা পাইল। বলা কঠিন, না বলিলেও নিষ্কৃতি নাই। এ আঘাত ছায়া সহিতে পারিবে কি? কি কুক্ষণেই সে অকপট হইতে গেল!

ছায়া পুনরায় ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল, বলুন, বলুন। সে কি অসুখ হয়ে মারা যায় নি?

উপায়হীনের মত মাথা নাড়িয়া তপন বলিল, না। বাপের অমর্য্যাদা সইতে না পেরে তিনি আত্মহত্যা করেচেন।

ছায়ার কণ্ঠ হইতে ক্ষীণ চীৎকার বাহির হইল, হাত দু'খানি খানিকক্ষণ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মাথাটি চেয়ারের পিছনে শিথিলভাবে হেলিয়া পড়িল।

তপন ব্যাকুলভাবে চারিদিকে চাহিয়া পাখার সুইচটা টিপিয়া দিল। কুজা হইতে ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া ছায়ার মুখে চোখে ছিটাইতে লাগিল। মিনিট পাঁচেক পরে ছায়া চক্ষু মেলিল। হস্তেঙ্গিতে তপনকে কক্ষত্যাগের ইঙ্গিত করিতেই তপন তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, তুমি সুস্থ না হলে আমি যেতে পারবো না।

ছায়া কোন কথা কহিল না, চক্ষু মুদিয়া নিস্পন্দের মত পড়িয়া রহিল। তাহার নিমীলিত চক্ষু বাহিয়া দরদর ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল!

এ দৃশ্য তপন বেশীক্ষণ সহ্য করিতে পারিল না। চঞ্চল পদে কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিল। না করিলে ছায়ার নিস্পন্দ অশ্রুকলুষিত মুখের পানে চাহিয়া অসম্বরণীয় চিত্তবেগকে রোধ করা দুষ্করই হইত! বুকের মধ্যে করুণা ও বেদনা-বোধ এমন উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে যে, ছায়ার শিথিল দেহবল্লরী দু'টি করে আকর্ষণ করিয়া নিজ হৃদয়ের উত্তাপ দিয়া সমবেদনা প্রকাশের ইচ্ছা তাহার অত্যন্ত প্রবল হইতেছে।

ভিজা চুলের মধ্যে মৃদু অঙ্গুলি চালনা করিয়া সান্ত্বনা এবং ঈষৎ স্ফুরিত ওষ্ঠাধরে একটি সন্তপিত চুম্বন···স্মরণ মাত্রেই সারা দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। মানুষের মহৎ বৃত্তিগুলির মধ্যে এমন মত্ততাও থাকে। অসহ্য যন্ত্রণায় কাহারও হৃদয়-শোণিত চোখের ভিতর দিয়া গলিয়া পড়িতেছে, অদম্য সহানুভূতির উত্তাপে কেহ চাহিতেছে স্পর্শ, আলিঙ্গন ও চুম্বন।

কিন্তু দ্রুত পদচারণায় মাঝে মাঝে যে-সঙ্কোচ ও গ্লানি মনের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া উঠিতেছিল, ছায়ার অশ্রুধারা সেটুকু বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতে দিল না। হৃদয় আর যুক্তি মানিল না, অসঙ্গতি বিচার করিল না। ছায়ার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তপন ধীরে ধীরে তাহার একখানি শিথিল হাত পরম স্নেহভরে আপন হাতে তুলিয়া লইয়া ডাকিল, ছায়া।

দীর্ঘনিশ্বাসে ছায়ার বুক উদ্বেল হইয়া উঠিল। অবসন্নের মত সে চক্ষু মেলিল। পরিপূর্ণ দৃষ্টি। তপন দেখিল, বেদনামণ্ডিত হইলেও সেই দৃষ্টিতে আত্মসমর্পণের অসহায়তা। সে দৃষ্টি এমন স্নিগ্ধ ও কোমল যে, পৃথিবীর কোন বস্তু দিয়া তার তুলনা করা চলে না।

তপনের বক্ষঃস্পন্দন দ্রুততর হইল।

উজ্জ্বল চক্ষুর দৃষ্টি ছায়া দেখিল কি না বলা যায় না, পরম অবসাদে পুনরায় সে চক্ষু মুদিল এবং শিথিল হাতে তপনের হাতখানিতে ঈষৎ চাপ দিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

হাতের মধ্য দিয়া অন্তর বিনিময় হইয়া গেল।

এ অনুভূতি—অনভিজ্ঞ হইলেও তপন বুঝিল। আঙুলের ডগা দিয়া শিরায় এবং শিরা হইতে শোণিতে তীব্র বিষের মতই গতি তার দ্রুত।

ত্রিতলের ঐ একখানিই ঘর, সুতরাং নির্জন। অপরাহ্ণের শেষ হইয়া গোধূলি নামিয়াছে। ঘরের মধ্যে অন্ধকার, জানালার ধারে আলো অল্প ছিল বলিয়া পরস্পরকে দেখা যাইতেছিল। কে জানে, কয়টি মিনিট কিংবা দণ্ড এই আচ্ছন্নভাবের মধ্য দিয়া কাটিল। ছায়া চক্ষু মুদিয়াছে, তপনও এ-জগতে নাই। এত হাল্কা তাদের শরীর যে, ইচ্ছা করিলে ওই গোধূলি-ম্লান আকাশের ঘন স্তর

ভেদ করিয়া যে কোন অপরিচিত নক্ষত্রের দেশে পৌঁছানও তাদের পক্ষে অসম্ভব নহে!

ছায়া যখন চক্ষু মেলিল, কক্ষে তখন অন্ধকারের বন্যা। তপনের হাতখানি শুধু তার বহির্জগতের পরিচয়।

তপনের হাত হইতে ধীরে ধীরে হাতখানি মুক্ত করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণপরেই বিদ্যুতালোকে কক্ষ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আলোকের তীর খাইয়া অন্ধকার মরিল, স্বপ্নও মিলাইল। ছায়ার চোখের কোলে জলের দাগ—অশ্রু শুকাইয়াছে। ধীরে ধীরে আসিয়া সে ইজিচেয়ারটায় বসিতেই তপন উঠিয়া দাঁড়াইল ও তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া কোমলকণ্ঠে কহিল, ছায়া, আজ তোমাকে ক্ষণকালের জন্য যেমন পরিপূর্ণভাবে পেলুম, সমগ্র জীবনে এমনি পাওয়ার জন্য আমাদের তৈরী হতে হবে। কোনরূপ অসম্মানের মধ্যে আমরা কামনাকে লালন করবো না। তুমি লেখাপড়া শিখে স্বাধীন হবে, আমিও স্বাধীন হতে চেষ্টা করবো। তারপর আমরা মিলবো, কেমন?

মৃদু গ্রীবা হেলাইয়া ছায়া এ-কথা সমর্থন করিল হয়ত।

তপন আনন্দ-তরল কণ্ঠে বলিতে লাগিল, আমাদের বন্ধুত্বে কোনরূপ হীনতা বা শঠতা রইলো না. গ্লানিও আমরা ভোগ করব না এর জন্য। আমাদের এ আনন্দ এমন প্রবল যে, ইচ্ছা করলে তোমার হাতে হাত রেখে এই মুহূর্ত্তে মরতেও পারি।

ছায়ার গণ্ডে এতক্ষণে অরুণরাগ ফুটিল। লজ্জাভীরু চোখ দু'টিতে আবেশ-আবেগ, স্ফুরিত ওষ্ঠে মদময়তা, ঋজু এলায়িত দেহভঙ্গিতে অপূর্ব্ব পেলবতা।

তপন হেঁট হইয়া ছায়ার ওষ্ঠে পুলক-কণ্টকিত অতি-সন্তর্পিত—মুহূর্ত্তব্যাপী একটি সুকুমার চুম্বন আঁকিয়া দিয়া চক্ষু মুদিল। ছায়ার পলকও পক্ষ্মাবৃত।

দুইজনেরই মনে হইতেছিল, জীবনে যদি কিছু সুখের থাকে ত মৃত্যু। এই ক্ষণকালস্থায়ী অন্ধকারের অস্তিত্বকে যুগযুগান্তরে সমাহিত ও গাঢ়দুর্ভেদ্য করিয়া নামিয়া আসুক মৃত্যু। চরম আনন্দের পরিণতি মহা সমাধির মত, মিলনান্ত নাটিকার শেষে সবুজ যবনিকার মত।

* * *

কয়েক বৎসর পরে এ কাহিনীর যবনিকা উঠিতেছে।

তপনদের উপরের সেই ঘর খানিতে প্রাচীনা গৃহিণীদের মজলিস বসিয়াছে। জজ, ব্যারিষ্টার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ঘরের গৃহিণীরাই আসিয়াছেন।

কয়টি বৎসর কালস্রোতে ভাসিয়া গেলেও প্রৌঢ়া ও প্রবীণাদের সাজসজ্জার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। বলিরেখাঙ্কিত গণ্ডে রুজ-পাউডার এবং শুষ্ক ওষ্ঠে লিপ্‌ষ্টিক তেমনই অটুট। সভ্যতা ক্রমশঃ ধাপে ধাপে ঊর্দ্ধগামী হইলেও কাঁচা-পাকা চুলগুলি বব্‌ করিয়া ছাঁটিতে তাঁহারা পারেন নাই। দু'কূল বাঁচাইয়া এলো খোঁপা বাঁধিয়াছেন। গলায় মফ্‌চেন ও হাতে নূতন প্যাটার্ণের চুড়ি; নাক, কান, কোমর, পা প্রভৃতিতে বহুদিন হইতেই অলঙ্কার-নির্ব্বাসন ঘটিয়াছে। কেবল কোঁচানো কাপড়ের উপর একটি দামী পাথর বসানো ব্রুচ ও পায়ে চপ্পল বা নাগরা।

জজগৃহিণী অতি আধুনিকা নন। পান জরদা প্রহরে প্রহরে তাঁর চাই। লক্ষ্ণৌর সে বন্ধুটি এখনও জরদা পাঠান কি না জানা নাই, কলিকাতায় আজকাল নাকি ভাল জরদা তৈয়ারী হইতেছে।

ব্যারিষ্টারগৃহিণী স্বামীর সাগরপারের গল্প কিছু কমাইয়া দিয়াছেন। বিলাতের চেয়ে ভারতবর্ষেই তাঁহার স্বামী বেশী দিন আছেন এবং প্র্যাকটিসে বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিয়া তিনি নাকি বাংলা ভাষা ভালরূপই আয়ত্ত করিয়াছেন।

উকিল সিদ্ধেশ্বরবাবুর পত্নী হেমলতা চশমার ভিতর দিয়া ঘরের সাজসজ্জা ও লোকগুলিকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

সেদিনের সকলেই আছেন। নাই সুলতা, নাই ছায়া। সুলতা নাই, কিন্তু এ-বাড়ীর মেজ-বৌ আছে। চারুও আসিয়া এক কোণে ছেলে কোলে করিয়া বসিয়াছে। আজিকার আলোচনাটা কৌতূহলকর ও সমস্যাজনক। তপনের মার পরিবর্ত্তনের মধ্যে চুলের শুভ্র বিন্দুগুলি বিস্তৃত হইয়াছে। দেহ সমুদ্রের মতই জোয়ার-ভাটাহীন। মুখখানি গম্ভীর, কপালের কয়েকটি স্ফীত শিরা দুশ্চিন্তারই সাক্ষ্য দিতেছে।

জজগৃহিণীই সর্ব্বপ্রথম গুটিচারেক পান ও জরদা গালে ফেলিয়া কথা কহিলেন, তাই ত গা নিস্তার, এ তো বড় ভাবনার কথা!

তপনের মা মুখ খুলিলেন, তোমরা পাঁচজনে

আছ দিদি—যা হয় একটা সৎপরামর্শ দাও। আমি যে আর পারি নে, শেষকালে কি পাগল হয়ে যাব?

ব্যারিষ্টারগৃহিণী কহিলেন, বিলেতে শুনেচি ঐ রকম করে সাদা ছুঁড়িগুলো মানুষ ভুলিয়ে রাখে। শেষকালে এ দেশেও!

তপনের মা বলিলেন, ছুঁড়ির আক্কেল নেই, হায়াও নেই। ছোট লোকের বংশ ত!

উকিলগৃহিণী বলিলেন, সে কি দিদি! সেবার যখন ছায়াকে দেখি—কেমন শান্তশিষ্ট, এতটুকু দেমাক নেই। তুমি বললে, অমন ভাল বংশ নাকি হয় না।

তপনের মা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিলেন, ভিজে বেড়াল। বাপ মিন্‌সে ক্যাশের টাকা ভেঙ্গে জেল খাটবার ভয়ে আত্মহত্যে হলো। আমাদের মেজ-বৌ বাপ-সোয়াগী ত হাতে দড়ি দেবার যোগাড় করেছিল! কর্ত্তার যাই আলাপী বন্ধু-বান্ধব ছিল, তাই টাকার ঘন্ট করে সে দায় উদ্ধার হলেন। আবার আমার ছেলেটাকে নিয়ে ডাইনী মাগী কি কাণ্ড করচে—তোমরা পাঁচজনেই দেখ! অমন— ভদ্রবংশের আঁস্তাকুড়েও কেউ যেন কোন দিন না যায়।

একটু থামিয়া অকস্মাৎ তিনি ক্রন্দনের সুর তুলিলেন, তোমরাই বল দেখি, এমন বিপদ মানুষের কখনও দেখেচ? খাইয়ে পরিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে ছেলেটিকে যে এত বড়টি করে তুললুম—সে কি ওই ডাইনীর হাতে তুলে দিতে? মায়ের বুকে এমন করে ব্যথা দিলে ওর ভাল হবে?

জজগৃহিণী তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন, কি করবে বোন, অদৃষ্ট। যে যাই বলুক—এর লেখা খণ্ডাতে কেউ পারে না।

তপনের মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, এমন বরাত ভূ-ভারতে কারো নেই। ছেলে রয়েচে—অথচ আমার নয়!

সহসা কান্না থামাইয়া চক্ষু পাকাইয়া কহিলেন, কি বলবো বল, হারামজাদার নাগাল পাচ্চি না যে! নৈলে চুলের মুঠি ধরে কাঠগড়ায় নিয়ে গিয়ে দাঁড করাতুম না! হ্যাগা, এত নতুন নতুন আইন বেরুচ্চে—আর এ-সবের একটা বিহিত হয় না? বলিয়া তিনি করুণচক্ষে উকিল ও ব্যারিষ্টার-গৃহিণীর পানে চাহিলেন।

কিন্তু তাঁহারা কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বলিলেন, এই ত লক্ষ লক্ষ লোকের ছেলে রয়েচে, কার ছেলে মায়ের মুখের ওপর বলে, বিয়ে করবো না। কার ছেলে রাগ করে বাড়ী ছেড়ে চলে যায়? এই ত আমার মেজ ছেলে হরি, সোনার চুঁচ। বউ মরার ছটি মাস পেরুলো না, যেমন বলা, চেলি-টোপর পরলে।

জজগৃহিণী বলিলেন, তা ত বটেই। তবে আজকাল ফ্রীলভ না কি বলে ছাই—ওইগুলো বড্ড বেশী। বিলেতের মত। ছেলে মেয়েরা নিজের মতেই চলে।

তপনের মা সরোষে কহিলেন, অমন লেখাপড়ার মুখে আগুন! বাপ মার কথা যারা মানে না, তারা আবার মানুষ! বাপের কথায় রাম চোদ্দ বছর বনে রইলেন, পরশুরাম মায়ের মাথাটাই বেটে ফেললেন কচ করে। সে সব এক দিনই গিয়েচে! বলিয়া ফোঁস করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন।

তাঁহার কথায় রুজশোভিত গণ্ডগুলি সঙ্কুচিত হইল, লিপষ্টিকরঞ্জিত ঠোঁঠে বিদ্রূপহাস্য খেলিয়া গেল এবং অপাঙ্গ-বিনিময়ে অনেক কথাই ফুটিয়া উঠিল।

জজগৃহিণী উপদেশ দিলেন, এক কাজ কর, নিস্তার। রাগ করে কোন লাভ নেই। এ যেন হয়েচে চোরের ওপর রাগ করে ভুঁয়ে ভাত বাড়া। একবার ছুঁড়ির সঙ্গে দেখা কর। উঁচু কথায় নয়— যতদূর পার মিনতি করে বলবে, দু'এক ফোঁটা চোখের জল ফেলতে পার ত আরও ভাল, মেয়েমানুষ ত, রাজী হত্তেও পারে।

তপনের মা সন্দেহভরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না দিদি—যে খাণ্ডারণী! ওরা সব করতে পারে। আর তুমি ত জান না, তপু আমার কি হয়ে গেচে! অমন যে ভালমানুষ ছেলে, মুখের ওপর বললে কি না বিয়ে করব না! বছর কতক আগে বি, এ, পাস করতেই কর্ত্তা বিয়ের সম্বন্ধ করলেন। ছেলে বললে, এম, এ, না দিলে ও-সব কথা বলবেন না। ভাল, তাই সই। কর্ত্তা অপমান হলেন, তবু মুখ বুজে সব সইলেন। তারপর এম, এ, পাসের পর আবার চেষ্টা। আবার সেই ধনুকভাঙ্গা পণ,— আমায় বিলেত পাঠান, সেখান থেকে এসে যা হয় হবে। কর্ত্তা গেলেন চটে; কি কড়া কথাও বলেছিলেন বুঝি। ছেলে বাড়ী ছেড়ে চলে গেল। এই কলকাতাতেই আছে, কি ভাল একটা আপিসে চাকরি করে, কিন্তু বছরাবধি বাড়ীমুখো হয় নি। তারপর, বাগবাজারের শ্যামের জেঠি একদিন গঙ্গা নাইতে গিয়ে সব বললে। শুনে ত হাত-পা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে গেল!

কে একজন টিপ্পনী কাটিলেন, তাই এত!

তলে তলে টিপ্‌নী না হলে এক কথায় বাপ-মা ত্যাগ করতে পারে?

ব্যারিষ্টারগৃহিণী বলিলেন, ছেলে কি বলে? ওই মেয়েটিকে ছাড়া বিয়ে করবে না?

তপনের মা বলিলেন, না, তেমন কোন কথা বলে নি। তা বললেও যে বাঁচি। না হয় তেতো ওষুধ গেলার মত ওই ডুম্বিকেই বউ করে ঘরে তুলি!

জজগৃহিণী বলিলেন, বুঝচো না—একটা ঝোঁক। বয়সের নেশা আর কি! কিন্তু যাই বল নিস্তার, ও-সব শাপমন্নি বা ভয় দেখালে কোন ফল হবে না' বেত ভাঙ্গে না, নুয়ে পড়ে। ছেলে যদি ফিরে পেতে চাও, ওর খোসামোদ ছাড়া গত্যন্তর নেই।

তপনের মা সজল চক্ষে সকলের পানে চাহিয়া বলিলেন, তাই করতে বল তোমর'?

সকলেই সায় দিলেন।

তপনের মা বলিলেন, বেশ, তাই যাব। মাযের মন, নৈলে ওদের খোসামোদ করা—আমার মাথা কেটে ফেললেও পারতুম না। কর্ত্তা রাগ কবে কোন কথা কন না, যত পোড়া হয়েছে আমাব!

জজগৃহিণী বলিলেন, যদি দেখ ছুঁড়ি রাজী হলো না—তোমার ছেলেরও ধনুকভাঙ্গা পণ, তখন অগত্যা মধুসূদন, ওকেই বউ করে ঘরে তুলো। লেখাপড়া জানা মেয়ে এতটা অবুঝ হবে কি?

তপনের মা বলিলেন, লেখাপড়ার ওপর আমার এতটুকু বিশ্বাস নেই, দিদি। তবে তোমরা বলচো, কাল বিকেলে যাব একবার। দেখি—নারায়ণ কি করেন!

অতঃপব মজলিস ভঙ্গ হইল।

চারু নিঃশব্দেই উঠিয়া গেল। আজকাল সে কোন কিছুতে বড় একটা কথা কয় না। হয়ত স্বপ্নও দেখে না। সে মনে করে শাশুড়ী অনন্ত-কাল ধরিয়া শাশুড়ীই থাকিবেন, সে থাকিবে শাসনভীত লজ্জাকুণ্ঠিত বধূ। বধূও নহে, একটা যন্ত্র। ঘড়ির কাঁটার মত তাহার জীবনের কাজ-গুলিও চিহ্ন-দেওয়া ঘরে ঘুরিয়া মরিবে; এক চুল এদিক-ওদিক হইবে না।

সুলতা আজ অতীত। কক্ষে কক্ষে কার্পেটের সুদৃশ্য কারুশিল্পে তার পরিচয় লেখা। কিন্তু সে লেখাই বা আর কতদিন! পোকা, উই এবং সর্ব্বোপরি সর্ব্বধ্বংসী কাল সেগুলিতে দৃষ্টি দিয়াছে। সুলতার কোন চিহ্নই কয়েক বৎসর পরে আর থাকিবে না। এ-বাড়ীর লোকগুলির মধ্যে সুলতা হয়ত কোনদিনই আসে নাই, চারুও না। আসিয়া-ছিল এ-বাড়ীর মেজ বৌ, বড় বৌ। আজও তারা আছে। মেজ বৌ নূতন হইয়া আসিয়াছে, বড় বৌ মরিলেও নবকলেবরে ফিরিয়া আসিবে, তার আর সন্দেহ কি!

এখানে চারুর সার্থকতা কি? ঐ বাগানের মরসুমী ফুল-গাছগুলির মতই যতদিন সে ফুল দিতে পারিবে, ততদিন তার আদর। মরিয়া গেলে তদ্দণ্ডেই নূতন আসিয়া স্থান সংগ্রহ করিবে। গাছের চেয়ে তাহার গৌরব এইটুকু বেশী যে, ফুল ফুরাইলেও হয়ত বা চক্ষু-লজ্জার-খাতিরে মানুষ গাছের মত মানুষকে সংসার-উদ্যান হইতে উপড়াইয়া ফেলিতে পারে না—করুণা দিয়া বাঁচাইয়া রাখে। সেটুকু মানুষের মহত্ত্ব সন্দেহ নাই, কিন্তু সে মহত্ত্বে মানুষের লাভ কি!

এ-সব কথা চারু অল্প অল্প ভাবে। সুলতা যেন তাহার চোখ ফুটাইয়া দিয়া গিয়াছে। সুলতার মৃত্যুর পর ছ'টি মাসও গেল না, বাড়ীতে নববধূ আসিল। মেজ ঠাকুরপোর দিব্য হাসি-হাসি মুখ, যেন এই শুভঘটনার জন্যই তিনি তপস্যা করিতেছিলেন! স্বামী সম্বন্ধে চারু আজকাল বড়ই ভাবে। ভাবিয়া ভাবিয়া মাথার মধ্যে কেমন ঝিম্ ঝিম্ করিতে থাকে। ছেলেমেয়েগুলাকে কাছে বসাইয়া, কখনও বা বুকে চাপিয়া সে সেই যন্ত্র ভুলিতে চেষ্টা করে।

তপনের উপর অহেতুক শ্রদ্ধা জাগে। হাঁ, এ-বাড়ীর মধ্যে যদি কেহ থাকে ত সেজ ঠাকুরপো। সুলতা কেবল তাহাকে চিনিয়াছিল। ছায়ার জন্য সে আজ যাহা করিতেছে, লোকচক্ষে বা সমাজচক্ষে যতই নিন্দনীয় হউক, কিম্বা শিক্ষার দোষ ও ধৃষ্টতার চরম বলিয়া যে যাহাই বলুন, চারুর অন্তরে সে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করিয়াছে। সে মনে মনে প্রার্থনা করে, ঠাকুরপো সুখী হউক এবং এ-বাড়ীতে আসিবার সুমতি যেন তার কোন দিন না হয়। এ-বাড়ীর বদ্ধ বায়ুর মধ্যে জীবনক্ষয়ের বিষ লুকানো আছে।

ঠাকুরপো কোথায় আছে জানিলে সে তাহাকে একখানি পত্র দিত।—আশীর্ব্বাদী পত্র। ঠাকুরপো যদি একবার আসে! তার সঙ্গে দণ্ড দুই কথা কহিলেও চারু বাঁচিয়া যায়।

* * *

ত্রিতলের ঘরখানিতে ছায়া একাকিনী বসিয়া ছিল।

সাড়ে সাতটায় তপন আসিবে। প্রায়ই সে অবসরমুহূর্ত্তে এইখানে আসে। কয়েক মাস হইল ছায়া বোর্ডিং ছাড়িয়া দিয়াছে। আর পড়িবার ইচ্ছা তার নাই, যদিও তপনের একান্ত ইচ্ছা।

তপন পাস করিয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছে কিন্তু আসল কাজটাই এখন বাকি। পাসের পর সময় পাইয়াও বন্ধন গলায় লইবার অবসর তাহার হয় নাই। কারণ, বাড়ীর সাচ্ছল্যের আওতায় বাড়িয়া সংসার সম্বন্ধে পরিপক্কতা সে লাভ করে নাই। চোখে দীনদুঃখীকে দেখিয়াছে, দয়াপরবশ হইয়া ভিক্ষাও দিয়াছে, কিন্তু কি তাহাদের দুঃখ বুঝে নাই। অভাব না অভাব! বাড়ী ছাড়িয়া স্বেচ্ছাবৃত কষ্টের মধ্যে নামিতেই—এই অভাবের সঙ্গে মুখোমুখী পরিচয় লাভ হইল।

বুঝিল, অর্থ না থাকার কত অসুবিধা। দেহ, প্রাণ বা প্রেম সব কিছুকে জীবন্ত রাখিতে হইলে ঐ একটি জিনিষের অত্যন্ত প্রয়োজন। নিষ্ঠুর সংসার অন্নচিন্তার চমৎকারিত্বে এই দিক দিয়া মানুষকে ঘোরতর বাস্তববাদী করিয়াছে। তপন বিবাহ না করিয়া সর্ব্বপ্রথম তাই উপার্জ্জনে মন দিয়াছে।

একটি ঘটনা তার মনে আঁকা আছে। তখনও চাকরি হয় নাই, বাড়ী হইতে বাহির হইয়া মেসে সে একদিন একজনের কাছে দশটা টাকা চায়। লোকটি অম্লানবদনে বলিয়াছিল, টাকা তার নাই। অথচ তার ঘণ্টা দুই পরে Savings Bank এর বইখানি লইয়া পঁচিশটি টাকা জমা দিতে সে বাহির হইয়া গেল!

নূতন সংসার পাতিবার আয়োজন তাই তপনকে হিসাবী করিয়া তুলিয়াছে। ব্যাঙ্কের খাতায় কিছু জমিয়াছে।

আজই একটা কিছু নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিবার জন্য তপন ব্যগ্র হইয়াছে। সাড়ে সাতটার সময় সে আসিবে। বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, ঘরের ভিতর আবাছা অন্ধকার। ছায়া বসিয়া বসিয়া এই সব কথাই ভাবিতেছিল।

বাহিরের দরজায় মোটরের আওয়াজ হইল। তপন আসিল বুঝি? তাড়াতাড়ি সে জানলায় ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে গেল, কিছুই দেখিতে পাইল না। উঠিয়া সুইচটা টিপিয়া দিল। এবং আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া বেশবাস ঠিক করিয়া টেবিলের ধারে চেয়ারখানা টানিয়া একখানি বই তুলিয়া লইল। এখনও সাড়ে ছ'টা বাজে নাই। অফিসারদের ঘড়ির কাঁটা কি ঘোড়ার মত লাফাইয়া চলে!

বারান্দার কাঠের সিঁড়িতে জুতার শব্দ হইল না। দুষ্টামী করিয়া কেড্‌স পায়ে দিয়াছে বুঝি? আচ্ছা দাঁড়াও একটু, তোমার সময়-জ্ঞান লইয়া ঠাট্টায় এমন নাকাল করিব!

মনে মনে অত্যন্ত খুশী হইয়া ছায়া চোখের উপর বইখানি তুলিয়া ধরিয়া তাহারই ফাঁকে দ্বারপথে চাহিয়া রহিল।

তপন ঘরে ঢুকলেই ছায়ার পাঠে মনোযোগ গভীর হইবে।

চলাফেরার খস্ খস্ শব্দে বই হইতে চোখ না তুলিয়াই পরুষকণ্ঠে প্রশ্ন করিবে, কে আপনি?

হয়তো আগন্তুক বলিবে, জনৈক দর্শনপ্রার্থী!

ছায়া অতিকষ্টে হাসি দমন করিয়া স্বাভাবিক স্বরে বলিবে, দর্শনপ্রার্থী ত একেবারে শোবার ঘরে কেন? বাইরে থেকে কার্ড পাঠিয়ে দেখা করতে হয় এ সহজ শিষ্টাচারটুকুও কি ভুলে গেচেন? জানেন, এই অনধিকার প্রবেশের শাস্তি আপনাকে নিতে হবে!

আগন্তুক রহস্য করিয়া বলিবে, আমি প্রস্তুত। বলুন, আপনার পিনালকোডে কি ধারা এবং তাতে কি শাস্তি লেখা আছে।

সত্যই হাসি চাপা ছায়ার পক্ষে অসাধ্য হইবে। বইটাকে আরও মুখের কাছে তুলিতেই প্রবল হাসির ধমকে সে প্রচণ্ডভাবে কাসিয়া ফেলিবে। এবং সেই কাসির মধ্য দিয়াই রহস্যের পরিসমাপ্তি। হাসিতে হাসিতে দুইজনেই সন্নিকটবর্ত্তী হইবে এবং ভালবাসার পিনালকোডে একমাত্র যে ধারাটি বলবত্তর তাহা লইয়া কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা হইতেও পারে।

উপস্থিত এই দৃশ্যের কল্পনাতেই হাসির বেগ অদম্য হইয়া উঠিতেছে, পায়ের শব্দ পাইলে সমস্ত কৌতুক না ফাঁসিয়া যায়!

দুয়ারের কাছে পায়ের শব্দ হইতেই ছায়া বইয়ে মনঃসংযোগ করিল, কিন্তু কল্পনায় এইমাত্র যে-সব উত্তর-প্রত্যুত্তর হইয়া গেল—তাহারই পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনায় সত্য সত্যই সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বই নামাইয়া প্রফুল্লকণ্ঠে কহিল, আসুন, আসুন, আ—

তৃতীয় সম্বোধন সম্পূর্ণ হইল না। ছায়ার

মুখখানি রক্তহীনতায় ফ্যাকাশে হইয়া গেল। মুখের অর্দ্ধোচ্চারিত বাণীর সঙ্গে বুকের স্পন্দনও বুঝি থামিয়া যায়!

ছায়ার ভাব দেখিয়া তপনের মা-ও অল্প একটু বিচলিত হইলেন। ছায়ার সঙ্গে তিনি আপ্যায়ন করিতে আসেন নাই, আত্মীয়তার সূত্রে টানিয়া কোন স্নেহসূচক কুশল-প্রশ্নও নহে। অথচ সেই সবের ভান লইয়া এই মেয়েটির নাগপাশ হইতে পুত্রকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। মেয়েটি যতই দোষী হউক, ডাকিনী দুষ্টা বা যে কোন কু-আখ্যাতেই সে অভিহিত হউক না কেন, এ-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, সে তাঁহার পুত্রকে ভালবাসে। প্রাণ ভরিয়াই ভালবাসে।

মুহূর্ত্তকাল ছায়ার ম্লান মুখ দেখিয়া প্রশ্ন করিবার সাহস তাঁর হইল না। কিন্তু তিনি শক্ত মেয়ে; পরমুহূর্ত্তেই এই দুর্ব্বলতা কাটাইয়া উঠিয়া মুখে হাসি টানিয়া আপ্যায়িত করিলেন, ভাল ত, মা? আহা, ভাবনায় চিন্তায় বাছার মুখখানি শুকিয়ে গেচে?

ছায়ার মুখ তথাপি প্রফুল্ল হইল না। আগন্তুককে অভ্যর্থনা করিবার ভাষাও তার জুগাইল না!

তপনের মা দুই দুইটা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া বেশ হাঁপাইতেছিলেন। ছায়ার অভ্যর্থনার অপেক্ষা না রাখিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িলেন ও দরদমাখা স্বরে বলিলেন, শুনেচি সব, ভাল করেই বি, এ, পাস করেচ। শুনে যা আহ্লাদ হলো—তখনই ঠনঠনের কালিবাড়ীতে স'পাঁচ আনা পুজো পাঠিয়ে দিলুম। ক্ষেন্তি গিয়ে পুজো দিয়ে এলো।

ছায়া পাথরের মূর্ত্তির মত ঠায় বসিয়া আছে। চোখের পলক না পড়িলে মনে হইত প্রাণহীন প্রতিমা। ভয়ে তাহার বুকের স্পন্দন বাড়িয়া উঠিয়াছে, কণ্ঠতালু শুকাইয়া গিয়াছে—ভাষা বাহির হইবে কোথা হইতে!

তপনের মা-ই বলিলেন, বাড়ীভর্ত্তি দেখলুম মাসি-পিসির দল, আদর-যত্ন করে ত? না খালি—

হঠাৎ মনে হইল, ছায়া একভাবেই বসিয়া আছে। প্রথম ঢুকিবার মুখে যেমন দেখিয়াছিলেন আকস্মিক আঘাতে অচেতন-প্রায়—এখনও তেমনই। আবার মনটা তাঁহার দুলিয়া উঠিল। আহা! পিতৃ-মাতৃহারা! কিন্তু তিনি ত সত্য সত্যই দরদ জানাইতে আসেন নাই।

আঁচলের গ্রন্থি খুলিয়া পান-জরদার কৌটা বাহির করিয়া গোটাদুই পান ও খানিকটা জরদা গালে ফেলিয়া দিলেন এবং সেগুলি চিবাইবার সঙ্গে মনের সমস্ত দুর্ব্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, আমার স্পষ্ট কথা। তপুর খবর জানতেই এতদূর এসেচি। আজ বছরাবধি সে রাগারাগি করে বাড়ী ছেড়েচে। শুনতে পাই চাকরি করে, মুটে মজুরদের মত খাটে। জান মা, ওঁর দপ্তরখানায় চাকরি করে কতগণ্ডা মুহুরী সরকার পরিবার প্রতিপালন করচে, ওঁর ম্যানেজারের মাইনে দু'শো টাকা। হায়রে কপাল! কিসের জন্যে ছোঁড়া মুখে রক্ত তুলে খেটে সারা হচ্চে! শেষের দিকে তাঁহার স্বর কোমল হইয়া আসিল।

কোমলস্বরে তিনি বলিলেন, অনেকের মুখে অনেক কথা শুনি। শুনি আর বুকের ভেতরটা ফেটে যায়। মা, ছেলে হওয়া যে কি জ্বালা তা না হলে কি বুঝবে! লোকে বলে তোমার পাঁচ ছেলে, ভাবনা কি! ছেলে একই হোক, আর পাঁচই হোক—স্নেহ কি ভাগ করে কম বেশী বা সমান সমান মেপে দেওয়া যায়? সব জিনিষ ভাগ করে দেওয়া যায়, স্নেহ যায় না। ছেলে বকুক, গাল দিক বা মারুক, মা'র মন কিছুতেই বোঝে না। দশ মাস দশ দিন এত কষ্ট করে বুকের রক্ত দিয়ে পালন করলুম, সে পর হয়ে যাবে শুনলে বুকের আধখানা কি খসে যায় না? আজ কতদিন সে আমায় মা বলে ডাকে নি, বুকটা আমার খাঁ-খাঁ কচ্চে। উঃ! ঝর ঝর করিয়া তাঁহার চোখে জল ঝরিতে লাগিল। ভদ্রগৃহিণীর উপদেশ মত মায়াকান্না নহে, সত্যকার বেদনা অশ্রুতে আকার লাভ করিল।

ছায়ার মাথায় ততক্ষণে আকাশের বজ্র নামিয়াছে। যেমন আলো, তেমনই গর্জ্জন, তেমনই কি দাহ! সে কি দস্যুতা করিবে? এক শান্তিময় সংসারে আগুন জ্বালিয়া দিবে?

তপনের মা আঁচলে অশ্রু মুছিয়া বলিলেন, তার-জন্যে কত জায়গায় না খুঁজেছি, কোথাও পাই নি। দু-দু'বার খবর পেয়ে মেসে গিয়ে হাজির, শুনলুম সে বাসা বদলেচে। আমি এখনও যে কেন পাগল হয়ে যাই নি—এই-ই আশ্চর্য্য!

বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতেই তিনি ছায়ার সন্নিকটবর্ত্তিনী হইয়া অকস্মাৎ তাহার হাত দু'খানি চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, তুই মা আমায় বাঁচা। আমি শুনেছি সে তোর কথা শোনে, তোকে খুব—খুব—মানে। মনে কর, আমি তোরও মা,

মায়ের কোলে ছেলে ফিরিয়ে দেওয়ায় যে পুণ্য, তার মত কোন সৎকাজ পৃথিবীতে নেই বল, বল মা, সে কোথায়?

এতক্ষণে ছায়া কথা কহিল। মুখের পাংশুভাব কাটিয়া দৃঢ় কয়েকটি রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে, চোখের দীপ্তি অস্বাভাবিক। ছায়া হাসিল। তুলনাহীন দুঃখে মানুষ বুঝি না হাসিয়া পারে না!

শান্তস্বরে সে কহিল, তাঁর ঠিকানা আপনি পাবেন।

আনন্দে তপনের মা'র মুখে হাসি ফুটিল। একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি কহিলেন, শতজীবি হও মা, মনের সুখে—

ছায়া বাধা দিয়া শান্তভাবেই কহিল, দয়া করে আমায় আশীর্ব্বাদ করবেন না।

তপনের মা অপ্রস্তুত হইয়া কহিলেন, না, তা তপুর বিয়েটা আগে হয়ে যাক, তারপর তোকেও জোর করে বিয়ে দেব। হাজার হোক, একবারে পর ত নও।

ছায়া আবার হাসিল।

মৃদুস্বরে বলিল, মা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব, কিছু মনে করবেন না। একটু আগে বলেচেন, সব জিনিষের ভাগ চলে—স্নেহের চলে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—ভালবাসাই কি চলে?

তপনের মা'র বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। মেয়েটা বলে কি? কথার কায়দায় ফেলিয়া কোন কিছু আদায় করিয়া লইবে নাকি? সঙ্গে সঙ্গে মায়াও হইল। নিজের মনের দুঃখের আলোতে পরের মনের অস্পষ্ট লেখাগুলি অতি সহজেই পাঠ করা যায়। তাঁর মনে আজ অকস্মাৎ সেই আলো জ্বলিয়াছে।

তপনের মা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না মা, চলে না। একথা আমি জোর গলাতেই বলচি! তবু মনের দাগ।—

ছায়া তেমনই হাসিয়া বলিল, মনের কথা থাক। বলুন আর আমায় কি করতে হবে?

সে-কথা বলিতে গিয়া তপনের মা'র বাধিল। যত বড় স্পষ্টবাদিনীই তিনি হউন, এই নিঃসহায়াকে আঘাত করিতে কোথায় যেন বাজিতে লাগিল। একবার তিনি ছায়ার পানে চাহিলেন। চাহিয়াই মাথা নীচু করিলেন। এই একফোঁটা মেয়েটির অনেকখানি নীচেই তিনি নামিয়া গিয়াছেন মনে হইল। আশীর্ব্বাদ ত নয়ই, কোনরূপ শুভ কামনা এই মেয়েটির সম্মুখে উচ্চারণ করিবার অধিকারও তাঁর নাই।

মুখ নীচু করিয়াই তিনি বলিলেন, হয় ত তোমায় সে ভালবাসে। সে-যদি আমার কাছে আসতে রাজী না হয়?

ছায়া স্পষ্টভাবেই উত্তর দিল, যাতে রাজী হন —সে ভার আমার। আর কিছু?

তপনের মা কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, সব কথা বলতেও যে আমার বুক কেমন করচে মা। বুঝি সব, অথচ উপায় নেই। তোকেই যদি ঘরের বউ করে আনতে পারতুম!

ছায়া তেমনই স্পষ্ট কণ্ঠে বলিল, তা তো হবার নয়, মা। আপনি চাইলেও, আমার আপত্তি আছে। সেখানে গিয়ে দাঁড়াবার মত মনের জোর আমার নেই। একটু থামিয়া বলিল, বলুন, আর কি চান? সময় সংক্ষেপ, এখনই বেরুব।

তপনের মা মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, সে যাতে বিয়ে করে তার উপায় তোমায় করতে হবে।

তিনি মুখ তুলিলে দেখিতে পাইতেন, বুকে ছুরি চালাইয়া দিলে দারুণ যন্ত্রণায় চীৎকার চাপিতে গিয়া মানুষ কেমন করিয়া মূর্চ্ছাতুর হইয়া পড়ে! তীব্র বেদনায় ছায়া মিনিট দুই নির্ব্বাক হইয়া রহিল। সমস্ত ঘরে সূচীভেদ্য নিস্তব্ধতা!

টেবিলের উপর হইতে এক টুকরা কাগজ টানিয়া লইয়া ছায়া খস্ খস্ করিয়া কি লিখিল, বার দুই মাথাটা টিপিয়া ধরিল, তারপর অতি ধীরে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া তপনের মায়ের হাতে সেই কাগজের টুকরা দিয়া অতি কোমলস্বরে বলিল, এই তাঁর ঠিকানা। কিন্তু এটা বোধ হয় দরকার হবে না, তিনি কালই বাড়ী যাবেন। আর যাতে তিনি বিয়ে করেন, আপনার বাধ্য ছেলে হন—সে চেষ্টা করবো। বলিয়া অবনত হইয়া তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিল।

* * *

নির্জ্জন কক্ষে দুয়ার বন্ধ করিয়া ছায়া পত্র লিখিতেছে। খানিকটা লিখিয়া কাটিতেছে, আবার নূতন কাগজে কালির দাগ টানিতেছে। অবশেষে মনোনীত না হইলেও সে লেখা শেষ করিল :

তপনবাবু,

সাড়ে সাতটায় আপনার আসবার কথা, তার আগেই আমায় চলে যেতে হলো। যা'বার আগে দু'টি কথা বলে না গেলে আমার এই আকস্মিক

অন্তর্দ্ধান নিয়ে আপনাকে হয়ত বিব্রত হতে হবে। তাই জানিয়ে যাচ্ছি, বৃথা আমার খোঁজ করবেন না কোথাও। আশ্চর্য্য মানুষের মন! নিজেকে সে কোন দিন আবিষ্কার করতে পারে না। তেমনি দুর্ব্বল। মনে করুন, কিছুদিন আগেকার ঘটনা। আমার শোকে সান্ত্বনা দিতে এসে আপনি নিবেদন করলেন আপনার ভালবাসা। বেশ সহজভাবেই তা গ্রহণ করলুম। অথচ তখনও এক সপ্তাহ হয় নি—তার নীচের ঘরেই বাবা আত্মহত্যা করেছিলেন! মন এমনি—দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে সহানুভূতি পেয়ে শোক ভুলে গেল। একবারও বুঝলে না যে,—কিন্তু কি-ই বা সে বুঝতো! আসলে সুখে বা শোকে যেমন করেই হোক কামনা চরিতার্থ হলেই আমরা খুশী হই। দীর্ঘ দিন ধরে সেই কামনাকেই পোষণ করে এসেচি, কত স্বপ্ন দেখেচি! ভেবেচি ভালবাসা! আশ্চর্য্য নয়? অভ্যাসের মত কামনা যখন আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে—সেই মূঢ়-মুহূর্ত্তে আমরা ভালবাসার জয়গানে গগন বিদীর্ণ করি। ধ্বংসশীল পৃথিবীর বুকে প্রেমকে আমরা মনে করি—শাশ্বত—কালজয়ী! আরও মজা দেখুন, প্রতিজ্ঞা করলুম, আপনাদের বাড়ীতে বউ সেজে কোন দিন যাব না। সেখানে পা রাখবার হীনতা যেন কোন দিন আমায় বহন করতে না হয়! অথচ সেই বাড়ীর ছেলেকে নির্ব্বাচন করলুম আজীবনের সঙ্গী! স্বর্গে বসে বাবা নিশ্চয়ই আমার কথা শুনে হেসেচেন!

আপনি বাপ-মা ত্যাগ করলেন, ধর্ম্মও ত্যাগ করতে চাইলেন। কেন? এক টুকরো মাংসের লোভে নয় কি? তপনবাবু, আমরা যতই সভ্যতা-সংস্কৃতির বড়াই করি না কেন, আসলে পশুত্বের একটুও উপরে উঠতে পারি নি। তবু আমরা বড় বড় কথার রচনায় ঐগুলিকে করে তুলি অনবদ্য। দুঃখকে পরাই মহত্বের মুকুট, সুখকে বলি অনাবিল শান্তি এবং শোক প্রকাশ করতে সভা আহ্বান করি!

যাই হোক, এ কামনাকে পোষণ করতেও আমার ঘৃণা হচ্চে। মনে হচ্ছে, আপনাকে কর্ত্তব্যচ্যুত করতেই যেন আমার এই ষড়যন্ত্র! আপনি গৃহত্যাগ করেচেন, আত্মীয়স্বজন ছেড়েচেন, উচ্চকণ্ঠে বলচেন, আমাকে নিয়ে সুখনীড় রচনা করবেন! কিন্তু চিরদিন যাঁদের মধ্যে কাটিয়ে এত বড়টা হয়েচেন, তাঁরাই যখন আপনাকে সুখী করতে পারলেন না, দু'দিনের আলাপিতা আমাকে নিয়ে···না, না, এর মূলে যৌবনের ভোগ ছাড়া আর কিছু নেই। মধ্যাহ্ন সূর্য্য আকাশের উপর উঠলে পৃথিবীর রস শোষণ করাই তার একমাত্র কাজ। তেমনি যৌবনে ইন্দ্রিয় চায় ভোগ। এর কলুষ আমায় পীড়া দিচ্ছে। যত মহত্ত্ব মণ্ডিত করুন না কেন, ভালবাসা বলুন আর শাস্ত্রাচারই বলুন, এ বাঁধন গ্রহণ করতে পারবো না। আমায় ক্ষমা করুন। আজ তরুণবাবুকে আমার বেশী করেই মনে পড়চে। কালও তাঁর চিঠি পেয়েচি, জেসিডির ভিলা আজও তিনি ভাড়া দেন নি। লিখেচেন, আমার পদধূলি না পড়লে নাকি সে বাড়ী অমনিই তালা বন্ধ থাকবে। ভাবচি তালাটা না-হয় খুলে দিয়ে আসি। বাড়ীটা পড়ে যাওয়া কি ভাল? আপনি কি বলেন?

ভাবচেন রহস্য করচি?—কিন্তু সত্যি না। যে কর্ত্তব্যচ্যুত, বাপ-মাকে অনায়াসে ত্যাগ করতে পারে, তাকে বিশ্বাস করি কি করে বলুন ত? জীবনের পথে চলতে গিয়ে যে দশবার টাল সামলে নিচ্চে তার ওপর নির্ভর করতেও ভয় হয়।

ভয়ের কথাও থাক, কোন কারণেই আমরা মিলতে পারি না। মাঝখানে দিদির অকাল-মৃত্যু, পিতার আত্মহত্যা। যত কিছু আমায় নিয়েই ত। অথচ এই বিয়ের কল্পনায় ক'টিবছর কাটিয়ে দিলুম! গ্লানিতে আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হচ্চে! কিন্তু আমি দুর্ব্বল-ই। দুঃখ যখন আসে—অধীর না হয়ে তাকে মাথা পেতে নেওয়াই উচিত।

আপনার স্মৃতি? তার কি কোন মূল্য আছে? মাত্র কামনার বুদ্‌বুদে তার অস্তিত্ব। আর একটা প্রবল কামনা এলেই তা ভুলতে পারি। হাঁ, নিশ্চয়ই ভুলবো। বাবাকে ভুলতে পারলুম কি করে।

প্রার্থনা করি, আপনি আপনার কর্ত্তব্য ফিরে পান। বাপ-মার মনে দুঃখ দিয়ে সুখী হবার দুশ্চেষ্টা করবেন না। আজই বাড়ী ফিরবেন।

হাসিমুখে বিদায় নিচ্চি। জীবনে হয়ত বহুবার দেখা হবে, কিন্তু এই পুরাতন পরিচয়ের সৌহার্দ্দ্য-সূত্রটি তখন থাকবে না। অপরিচিতের মত যুক্তকর ললাটে ঠেকিয়ে আমরা পরস্পরকে অভিবাদন করবো এবং পরস্পরের সাংসারিক কুশল জিজ্ঞাসা করে খানিক তৃপ্তিও হয়ত পাব। আপনি মোটরে চেপে যেতে যেতে ফুটপাতে যদি কোনদিন

আমায় দেখে মুখ ফিরিয়ে নেন ত—তার জন্য একটুও দুঃখ আমি পাব না। সত্যি—সত্যি—সত্যি।

যদি বাড়ী না ফেরেন—আমার আশায় চারিদিক ছুটে বেড়ান ত বুঝবো, নীতির দিক দিয়ে আপনি অত্যন্ত দুর্ব্বল। ভোগকে আয়ত্বে না আনায় অশান্তি ভোগ করচেন।

তবু আপনাকে লালসামত্ত ভাবতে আমার কষ্ট হয়। কর্ত্তব্যচ্যুতই বা হবেন কিসের জন্য। আপনি উদার ও সরল, পত্রের প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করবেন। আমাদের মধ্যে আবরণ রাখা উচিত নয় বলেই আজ মোহের যবনিকা তুলে ধরলুম। মিলনগণ্ডীর বাইরে বিস্তীর্ণ জগতে এই অকুণ্ঠিত তেজকে আমরা যেন চিরকাল বাঁচিয়ে চলতে পারি। নমস্কার। ইতি—

ছায়া।

এতবড় মিথ্যা রচনা কোন কবি কল্পনাও করিতে পারেন না। 'মোহের যবনিকা তুলিয়া ধরিলাম, বড় আনন্দেই বিদায় লইতেছি।' তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিলে পত্রের স্থানে স্থানে অশ্রুচিহ্ন আবিষ্কার করা মোটেই আশ্চর্য্য নহে। কামনা বলিয়া লেখার ইরূপে যে ঘৃণা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই দুর্ব্বলতা বলিয়া যদি কেহ ধরিয়া ফেলে! বার বার কথায় জোর দেওয়া সুস্থ মনের পরিচয় নহে।

তপনকে ভুলিবে? কিন্তু ছায়া জানে ফুটপাতে দাঁড়াইয়া তপনের মোটর দেখার সৌভাগ্য তার কোন দিন হইবে না; সে শহর ছাড়িয়া পলাইবে। যদি-ই সে দুর্ভাগ্য ঘটে, পথচারীর সযত্ন শুশ্রূষায় বহু কষ্টে সে চৈতন্য ফিরিয়া পাইবে হয়ত!

সময় অল্প। তাড়াতাড়ি সুটকেশ গোছাইয়া ছায়া কক্ষ ত্যাগ করিল।

তখন সাতটা বাজিয়া কুড়ি মিনিট হইয়াছে।

* * *

সেই দিন রাত্রিতেই তপন বাড়ী ফিরিল।

মায়ের পায়ে প্রণাম করিয়া সে কহিল, মা, আমায় মাপ কর। আর কোনদিন তোমাদের অবাধ্য হব না।

মায়ের দুটি চোখে ধারা নামিয়াছে। ধারা বেগবান্। দীর্ঘ বৎসর পরে দেখা! তপন বাড়ী ফিরিয়াছে—এ আনন্দ রাখিবার ঠাঁই কোথায়?

কিন্তু আজ কেহ তাঁহার মনের সন্ধান লইলে দেখিবে, বেদনার ফল্গুও সে ধারার সঙ্গে মিশিয়া আছে। সেই সর্ব্বত্যাগিনী—স্বল্পভাষিণী—কচি মেয়েটার জন্য বুকের কোথায় যেন একটু খচ্ খচ্ করিতেছে। মেয়েটির উপর দুর্জ্জয় ক্রোধ পোষণ করিয়া এতদিন কত কটু-কাটব্যই না করিয়াছেন, সে কিন্তু তাঁহার পুত্রকে ফিরাইয়া দিয়া চমৎকার প্রতিশোধ লইয়াছে।

চারু তপনকে নিভৃতে পাইয়া কহিল, ঠাকুরপো, ছায়া এখন কোথায়?

মাথা নাড়িয়া তপন কহিল, জানি না।

আশ্চর্য্য হইয়া চারু কহিল, জান না! তবে এতদিন বাড়ী ছেড়ে গিছলে কোথায়?—আবার হঠাৎই বা এলে কেন?

তপন বলিল, আমার আসা কি তোমার ভাল লাগে নি, বড় বৌদি?

মাথা নীচু করিয়া চারু বলিল, না।

বল কি বৌদি, একটি টুকটুকে বউ আমার তুমি দেখতে চাও না?

চারু শুষ্কস্বরে কহিল,, চাই কিন্তু এ-বাড়ীতে নয়। তোমায় আমি মনে মনে ঢের উঁচু বলে কল্পনা করেছিলাম।

তপনের বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল। সেই চারু—নির্ব্বোধ, ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া যে বর্ত্তমানকে ভুলিতে প্রাণপণ করে, লাঞ্ছনার লেখা পড়িয়াও ভাগ্য পরিবর্ত্তনের স্বপ্ন দেখে! কিন্তু তপন ত জানে না, সুলতা মরিয়া গিয়া নির্জ্জীব চারুর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সে এখন শাসন-ভীত, কুণ্ঠিত, নির্ব্বাক চারু নহে। জীবনকে বিশ্লেষণ করিবার শক্তি সে পাইয়াছে। শৃঙ্খল লোহার হোক, আর সোনার হোক, বন্ধনই যে একমাত্র রূঢ়তা—সে-কথাও সে বুঝিতে পারে।

তপন বিস্মিতস্বরে বলিল, আচ্ছা বৌদি, আমি যদি সত্যিই আর না ফিরতুম, তুমি খুশী হতে?

চারু ঘাড় নাড়িল।

তপন বলিল, কিন্তু বাপ-মাকে ছেড়ে যাওয়া কি আমার উচিত? মনে করে দেখ দেখি—এই এতটুকু বেলা থেকে প্রতিপালন করে, এত বড়টি করে তুলেছেন ওঁরা। ওঁদের মনে কষ্ট দেওয়া কি অকৃতজ্ঞের কাজ নয়? তোমার ছোট ছেলেটি যদি এই রকম করে?

চারু পাংশুমুখে বলিল, তাহলে সত্যিই আমার কষ্ট হয়, ভারি কষ্ট হয়। তবু এ-কথা আমার বার বার মনে উঠচে কেন ঠাকুরপো?

তপন ম্লান হাসিয়া কহিল, ভাইয়ের মত আমায় ভালবাস বলেই হয়ত তুমি শুধু আমার দিকটাই দেখছো, ওঁদের দিকটা দেখ নি।

চারু কহিল, আচ্ছা ঠাকুরপো, কর্ত্তব্য বলে যদি বুঝেছিলে তবে তুমিই বা এঁদের ত্যাগ করে গিয়েছিলে কেন?

তপন বলিল, একটা বাসনার টানে, কোন কিছুর জ্ঞানই আমার ছিল না।

চারু বলিল, এখন হঠাৎ সে জ্ঞান জন্মাল কোথা থেকে?

তপন ম্লান হাসিয়া বলিল, এখন! সে-বড় অদ্ভুত কথা বৌদি! পরে একমুহূর্ত্ত থামিয়া বলিল, শুনবে? ছায়াই আমাকে এই কর্ত্তব্যের সন্ধান দিয়েচে। এই দেখ, যাবার সময় সে আমায় কি লিখে গেছে।

চারু মনোযোগ দিয়া পত্রখানি আদ্যোপান্ত পড়িল। পড়িয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, কোন কথা কহিল না।

তপন বলিল, কথা কইচ না যে?

চারু গলাটা পরিষ্কার করিয়া বলিল, কোন কথা বলবার অবকাশ ত সে রাখে নি। সে সয়েচে—সরে দাঁড়িয়েচে।

তপন বলিল, একটা জিনিষ সে ভুল বুঝে গেল, বৌদি? সে বলেচে আমি তার দেহটা চেয়েছিলাম, তারই লোভে বাবা-মাকে ত্যাগ করার অগৌরবকে পর্য্যন্ত ভ্রূক্ষেপ করি নি! তা ঠিক নয়। তা যদি চাইতুম ত তাকে ফেলে আবার কি এ বাড়ীতে আসি!

চারু বলিল, না পাওয়ার দুঃখে ব্যর্থতায় হয়ত তুমি ফিরে এলে।

ম্লান হাসিয়া তপন বলিল, না বৌদি, না পাওয়ার দুঃখেও নয়, ব্যর্থতায়ও নয়। আমি জোর করলে ধরা সে না দিয়ে থাকতে পাবে না। তুমি কি মনে কর—সারা ভারতবর্ষটা এতই বিস্তৃত ও আমার ধৈর্য্যের পরমায়ু এতই অল্প যে, তাকে খুঁজে বার করা এক রকম অসাধ্য? তা মোটেই নয়। কিন্তু সে রকম ইচ্ছা হলো না।

—কেন ঠাকুরপো?

—চিঠিখানা আর একবার পড, বুঝবে কেন।

পত্র পড়িয়া চারু বলিল, তরুণবাবু কে?

তপন বলিল, হয়ত আমার কুগ্রহ! তার জেসিডির বাড়ীখানা বন্ধ আছে, সেই চিন্তাই ছায়ার প্রবল হয়ে উঠেচে। বল দেখি বৌদি, এ অবস্থায় আমি কি করতে পারি!

চারু ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, তবে যে বললে, জোর করলে সে ধরা না দিয়ে পারতো না?

তপন বলিল, ঠিকই বলেচি। রাগ করো না বৌদি, মেয়েমানুষের মন বুঝতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। তারা স্রোতের তৃণ বা পদ্মপাতার জল। একটা কিছু আঁকড়ে ধরবার দৃঢ়তা তাদের নেই। কিন্তু জোর করে ধরে রাখবার প্রবৃত্তি আমার হলো না। এ কি পাঠশালার পড়া যে, বেতের ভয়ে আপনি মুখস্থ হয়ে যাবে?

চারু উজ্জ্বল চক্ষু তপনের পানে তুলিয়া বলিল, এমনও ত হতে পারে ঠাকুরপো, যে চিঠির কথাগুলো সব মিথ্যে! তোমাকে সুখী করতে সে এত বড় ত্যাগ করে গেল।

তপন হাসিল, ত্যাগ! হ্যাঁ, ত্যাগই বটে! তবু যদি আমরা পরস্পরকে না জানতুম?

চারু উৎসুক হইয়া বলিল, কি জানতে ঠাকুরপো, বল না?

তপন বলিল, আমাদের মধ্যে কোন কিছুর ব্যবধান ছিল না, দিনের মত পরিষ্কার করে অন্তর বিনিময় করেছিলাম। তবু সেখানে আজ মেঘের রাশি!

চারু বলিল, তুমি ভুল বুঝেছ ঠাকুরপো। ছায়া যতই শিক্ষিত হোক, যত প্রকার কুসংস্কার সে কাটিয়ে উঠুক, নারীর দুর্ব্বলতা তার আছে।

তপন জিজ্ঞাসা করিল, কি দুর্ব্বলতা?

চারু বলিল, আমরা এতটুকু স্বার্থের জন্য প্রকাণ্ড সংসার ছারেখারে দিই। আমাদের জন্যই ভাই-ভাইয়ের গায়ে হাত তোলে, ছেলে বাপমাকে কষ্ট দেয়। তবু ঠাকুরপো, যদি আমরা একবার বুঝি এ অন্যায় ত অমনি ফিরে দাঁড়াই। বাপের মুখে স্বামীনিন্দা শুনে সতী অনায়াসে দেহত্যাগ করেছিলেন। সেই বীজ যে এখনও আমাদের মনের মধ্যে রয়েচে।

তপন বলিল, আমার এক বন্ধু ছিল, সে এই রকম আদর্শ গড়তে ভালবাসতো। ভোগ বিমুখতাকে বলতো মস্ত বড় ত্যাগ, দুর্ব্বলতাকে বলতো ক্ষমা। এমন কি মরা ভালবাসার ধ্যান করে সারাটা জীবন হয়ত কাটিয়েই দেবে!

চারু বেদনা-কোমল কণ্ঠে কহিল, ভালবাসা কি কখনও মরে ঠাকুরপো?

তপনের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কণ্ঠে অস্বাভাবিক জোর দিয়া সে বলিল, না, মরে না।

কিন্তু সে দূরে ঠেলে দেয় না। সংসারের মধ্যে তার স্থিতি, পরমায়ু। যে ভালবাসা এ সবকে গ্রাহ্য না করে আরও উর্দ্ধে আশ্রয় খোঁজে, তাকে তুমি কি বলবে, বৌদি? খেয়াল ছাড়া—

চারু স্নিগ্ধস্বরে বলিল, সে খেয়াল নয়—ভালবাসাই।

তপন অধীরস্বরে কহিল, কিন্তু আমি তা চাই নে—চাই নে। একটা স্তোক মিথ্যা প্রবোধ—যার কোন মানে হয় না। আমি চাই সেই ভালবাসা যা tangible, যা মনকেও টানে, দেহকেও টানে। যা সংসারকে সুন্দর করে গড়তে চায়। যা রূঢ় বাস্তব জীবনে স্বপ্নের মত সুকুমার।

চারু তপনের উত্তেজিত গৌর মুখের পানে চাহিয়া হাসিল। কহিল, ছায়ার চিঠির একটা কথা তোমায় খুবই আঘাত করেচে দেখচি। যেখানে সে লিখেচে, তুমি তার দেহটা চেয়েছিলে!

তপন মাথা নাড়িয়া বলিল, লেগেচেই ত বৌদি, এত গভীর সে আঘাত যে কিছুতেই তাকে ক্ষমা করতে পারচি নে। বৌদি, দেহভোগই যদি সত্যিকারের ব্যাপার হয় ত এই সংসারের মত কুৎসিত সৃষ্টি আর নেই। কিসের সভ্যতা—কিসের ধর্ম্ম! লালসা মেটাবার আরও ত অনেক পথ রয়েচে—অথচ ছায়া এর বেশী ভাবতেই পারলে না!

তপন মুখ ফিরাইয়া লইল।

চারু বলিল, মুখ ফিরিয়ে চোখের জল লুকুলে কি হবে, ভাই! তোমার মনে এই যে বেদনা এইটাই পরম সত্য। এই হচ্ছে ভালবাসা। ও যে দেহ মন দুইই টানে।

তপন আর তর্ক করিল না। চোখের জল লইয়া তর্ক করা মিথ্যা। গলার সে জোর কোথায়। বৌদি যা বুঝিতে হয়, বুঝুন। কিন্তু আশ্চর্য্য! ছায়া এমন ভুল বুঝিল কেন? মোহের যবনিকা! সংসারটা কি প্রকাণ্ড মোহ?

চারু পত্রখানা তপনের হাতে দিয়া বলিল, সে তোমার ভালবাসার একটুও অসম্মান করে নি, ঠাকুরপো। দু'ছত্র লেখা দিয়ে কি মনের ভাব চেপে রাখা যায়? পার ত এখানা ছিঁড়ে ফেলো।

তপন মাথা নাড়িয়া বলিল, না বৌদি, ছিঁড়তে আমি পারবো না।

চারু চলিয়া যাইতে যাইতে সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, এখনও সময় আছে, চেষ্টা—

তপন বলিল, কিসের চেষ্টা?

চারু বলিল, আমি মাকে বলিগে, তিনি অমত করবেন না।

তপন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তা হবার নয় বৌদি। বিশেষত এই বাড়ীতে।

চারু বলিল, বাড়ীর জন্য আটকাবে না, আমি বলচি।

তপন নিষেধ করিবার পূর্ব্বেই চারু কক্ষত্যাগ করিল।

খানিক আপন মনে চিন্তা করিয়া তপন মাথা নাড়িয়া বলিল, না, বিয়ে করবো না। একটুকরো মাংসের লোভ? সেদিনের সন্ধ্যাটাকে কি এমনি করেই ভুললে, ছায়া?

ঝর ঝর করিয়া তপনের চক্ষু দিয়া জল গড়াইতে লাগিল।

* * *

মনের সঙ্গে দেহের নিকট সম্বন্ধ।

তপনের দেহ মন দুই ভাঙিয়া গিয়াছিল। দিন কয়েক পরে এক প্রাতঃকালে তপন আর মাথা তুলিতে পারিল না। প্রবল জ্বরে অচৈতন্য হইয়া সে কেবলই ভুল বকিতে লাগিল। ছায়া ভিন্ন তার মুখে অন্য কথা নাই।

অর্থের অপ্রতুল নাই, কলিকাতার সেরা ডাক্তারেরা দু'বেলা হাজিরা দিতে লাগিলেন। তিনটি দিন কাটিয়া গেলেও তপনের চৈতন্য ফিরিল না।

তপনের মায়ের দু'টি চোখে ধারার বিরাম নাই। সেই যে তিনি তপনের শয্যা-শিয়রে প্রথম দিন হইতে বসিয়াছেন, তিন দিনের মধ্যে অনুনয় বা বকাবকি করিয়াও কেহ তাঁহাকে উঠাইতে পারে নাই। পান জরদার নেশা তাঁহার ছুটিয়া গিয়াছে, আহার প্রায় বন্ধ, নিদ্রা নাই বলিলেই চলে, ঠায় বসিয়া ব্যগ্র চোখে অচৈতন্য পুত্রের পাণ্ডুর মুখের পানে চাহিয়া আছেন। দু'চোখ জ্বালা করিতেছে, মাথা ঝিম ঝিম করিতেছে, অবসাদে শরীর এলাইয়া পড়িতেছে, তবু তিনি উঠেন নাই।

চারু আসিয়া বহু সাধ্যসাধনা করিয়া অল্প দুধ ও কিছু মিষ্ট খাওয়াইয়া গিয়াছে। কর্ত্তার অনুরোধে খাটের রেলিঙে মাথা রাখিয়া অল্পক্ষণের জন্য চোখও বুজিয়াছিলেন। কিন্তু স্বপ্নে বিভীষিকা দেখিয়া পর্য্যন্ত চোখ বুজিতেও তাঁহার সাহস হয় না!

বলিতে নাই, পুত্রের ভালমন্দ কিছু হইলে তাঁহাকেও কেহ ফিরিয়া পাইবে না। তাঁহার ও আত্মীয়বর্গের জানাশোনা অসংখ্য দেবদেবীর

মানসিকের টাকা এত জমা হইয়াছে যে—একটা হাতবাক্সে সে সব ধরিতেছে না।

রাত্রি দশটা।

রোগীর ঘরে বিজলী বাতি জ্বালা নিষেধ বলিয়া ঘরের এক কোণে রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলিতেছে। ম্লান অথচ স্নিগ্ধ আলো।

একদৃষ্টে পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার মনে হইল, তপনের নিস্পন্দ ঠোঁট দু'খানি ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল, চোখের পাতাও একবার যেন নড়িল। আশান্বিত হইয়া তিনি মৃদুস্বরে ডাকিলেন, তপু?

স্বপ্ন নহে—সত্যই তপন চক্ষু মেলিল। দৃষ্টি বিস্ময়-বিস্ফারিত, যেন কোন অপরিচিত স্থানে আসিয়া অপরূপ দৃশ্য দেখিতেছে। পলকহীন ভাবে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে অবশেষে তপনের ওষ্ঠ ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল। কি যেন সে বলিতে চাহিতেছে!

মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মা বলিলেন, কি বাবা?

ক্ষীণস্বরে তপন বলিল, আমি কোথায়?

—তোমার ঘরেই ত শুয়ে আছে, বাবা। ঘুমোও।

অল্প মাথা নাড়িয়া তপন বলিল, কালিকেশ আসে নি? দেখ মা, আভাটা কি বোকা!

মা শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, কি বলচো, আমি ত বুঝতে পারচি নে!

হাসিবার চেষ্টা করিয়া তপন বলিল, আভা মুখপুড়ী ওকেই লুকিয়ে বে করলে। তা করুক। সমাজের ভয় তোমরা করো না, মা। মানুষের চেয়ে সমাজ কোনকালেই বড় নয়।

মা উপর পানে চাহিয়া কহিলেন, হে হরি, খোকার আমার জ্ঞান দাও।

তপন বলিল, এক দিন বড় ইচ্ছে হয়েছিল তোমার কোলে মাথা রেখে শোব। রাত অন্ধকার, গাছের হাওয়া বেশ ঝির ঝিরে। চুলের ভেতর আঙুল চালাতে চালাতে আমায় ঘুম পাড়াবে। মা, তুমি ঘুমপাড়ানি গান ভুলে গেচ বুঝি? তুমি যে মা, আমার মা—তা শুধু ওই আঙুলের ছোঁয়ায় বুঝিয়ে দেবে। বেশ মজা, না মা? বলিয়া শ্রান্তিভরে সে চক্ষু মুদিল।

আঁচলে চোখ মুছিয়া তপনের মা একখানা পাখা তুলিয়া লইলেন।

প্রভাতে ঘুম ভাঙিয়া তপন জিজ্ঞাসা করিল, এক রাত্রে কোথা থেকে কোথায় এলুম? কাল ছিলুম সুবোধদের দেশে—মার কোলে মাথা রেখে, ওকি তুমি কাঁদচ কেন, মা?

—না বাবা, চোখ কর কর করচে! বলিয়া তিনি আঁচলে চোখ মুছিলেন।

তপন ছেলেমানুষের মত খুশীর স্বরে বলিল, কাল তুমি ছিলে সুবোধের মা, আজ হয়েচ আমার মা। কিন্তু আশ্চর্য্য দেখ, দাওয়ার ওপর তোমার কোলে মাথা রেখে যাই চোখ বুজেছি, অমনি দু'জনে এক হয়ে গেচ! তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সেই বনজঙ্গলে যদি একবার যাও ত তুমিও পুকুর পাড়ে লণ্ঠন হাতে করে না দাঁড়িয়ে পারবে না। যাবে মা একবার?

—যাব।

—বেশ হবে তা হলে। আনন্দে তপন চক্ষু মুদিল।

দিন কয়েক পরে।

মা অতি সন্তর্পণে তপনের মাথায় অঙ্গুলি চালনা করিতেছিলেন।

একটা সাধ বার বার তাঁর মনে উঠিয়াছে, রুগ্ন পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া সে-প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন নাই।

কিন্তু বেশীক্ষণ সে উৎকণ্ঠা বুকের মধ্যে পুষিয়া রাখিতে পারিলেন না। ডাকিলেন, তপু?

চক্ষু না চাহিয়াই তপন উত্তর দিল, কি মা?

—আমার একটা কথা রাখবি বাবা?

তপন বলিল, কি কথা?

—বল, রাখবি?

না চাহিয়াই তপন উত্তর দিল, রাখবো। তুমি বল।

মা বলিলেন, আমার ইচ্ছে—ছায়াকে বউ করে—

তপনের সারা দেহে বিদ্যুৎ বহিয়া গেল। চক্ষু মেলিয়া মায়ের মুখের পানে নিষ্পলকে চাহিয়া রহিল, কোন কথা কহিল না।

মার মুখখানিতে এমন কোমলতা তপন কোন দিন দেখে নাই। বর্ষোন্মুখ মেঘের মধ্যেও এমন কোমলতা নাই।

মা ধীরে ধীরে বলিলেন, আমাদের বোঝবার ভুলে তোরা কেন চিরজীবন কষ্ট পাবি বাবা।

তপন চক্ষু মুদিয়া বলিল, কষ্ট! ইচ্ছে করলেই কি কষ্ট পাওয়া ঠেকানো যায়, মা!

মা ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, কতক যায় বৈকি বাবা। না, কোন কথা নয়, আমি ছায়াকে জোর করে আপনার করে নেব। মেয়েটা এমনি মায়াবী যে, সেদিন যখন আমার পায়ে মাথা রাখলে—তখন আমার মনে হলো তার সঙ্গে গলা ছেড়ে আমিও খানিক কাঁদি।

তপন ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, কোন দিন মা?

মা বলিলেন, তুই যেদিন বাড়ী ফিরে আসিস। সে ঠিকই বলেছিল, মা, আপনার ছেলে যাতে বাড়ী ফিরে যায়, তা আমি করবো।

অকস্মাৎ তপনের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কহিল, সত্যি মা, সত্যি?

—হাঁ। আরও বলেছিলে, যাতে তিনি বিয়ে করেন, আপনার বাধ্য ছেলে হন তা-ও করবো।

তপন আবেগভরে মাথা তুলিয়া বসিল, সে বলেছিল—বলেছিল এ কথা?

—হাঁ, বাবা। তবে এ-বাড়ীতে সে পা দেবে না প্রতিজ্ঞা করেচে। তার প্রতিজ্ঞাই বজায় থাক, তপু। আমি প্রার্থনা করি, তাকে যেন এখানে না আসতে হয়। তোরা শুধু বেঁচে থেকে সুখী হ—এর বেশী কোন প্রার্থনাই আমি করি না।

মায়ের মুখে বরদায়িনীর অপূর্ব্ব বিভা।

সে অভয়বাণী শুনিয়াও তপনের মুখের উজ্জ্বলতা ধীরে ধীরে নিবিয়া গেল। মায়ের কোলের উপর শ্রান্ত মাথাটি রাখিয়া মৃদু স্বরে বলিল, আর ত তা হয় না, মা। তার প্রতিজ্ঞারই জয় হলো, সে আর এ বাড়ীতে আসবে না।

মা শুষ্কস্বরে বলিলেন, কেন তপু, আমরা যদি জোর করে—

তপন কোন কথা না বলিয়া বালিশের তলা হইতে একখানা রঙীন খাম বাহির করিয়া মায়ের হাতে দিল এবং মায়ের কোল হইতে মাথাটি তুলিয়া বালিশের উপর মুখ গুঁজিয়া নিঃশব্দে, বোধ করি, কাঁদিতে লাগিল।

দামী ফুলকাটা চিঠিতে সোনালী অক্ষরে লেখা ছিল:

আসচে ১৭ই ফাল্গুন ছায়া দেবীর সঙ্গে আমার বিয়ে। শুভকাজে—সবান্ধবে যোগদান করা চাই-ই।

তরুণ কুমার।

অসম্বরণীয় অশ্রু আঁচলে চাপিতে চাপিতে মা উঠিয়া গেলেন।

চারু আসিয়া ডাকিল, ঠাকুরপো।

মুখ না তুলিয়া ভারী গলায় তপন বলিল, কি?

চারু তপনের শিয়রে বসিয়া তাহার মাথায় ডান হাতখানি রাখিয়া বলিল, এখনও অভিমান পুষে রাখবে?

তপন অশ্রুভেজা স্বরে বলিল, মান-অভিমানের পালা তো শেষ হয়েছে বৌদি—

চারু কণ্ঠে জোর দিয়া বলিল, না—হয়নি। ওঠ বলছি।

তপন সবিস্ময়ে মুখ তুলিয়া বলিল, কি বলছ—বৌদি! এই দেখ চিঠি—আজ পনরই ফাল্গুন—

জানি—আর সময় নষ্ট করা চলবে না। এখনই রওনা হও। চারুর কণ্ঠে আদেশের সুর।

তপনের বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল। সে বলিল, কিন্তু বৌদি, আমার এ যাওয়ার মানে বোঝ?

বুঝি—ওঠ বলছি। চারু তাড়া দিল।

এ পৃথিবীটা যত বড়ই হোক—ছায়া তো বেশী দূরে নেই। তাকে আত্মহত্যা থেকে বাঁচাবার দায় যে তোমারই। নইলে কেন মানুষ হয়ে জন্মেছিলে!

তপন উঠিয়া বসিল।

রাত্রির অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া সশব্দে ট্রেণ ছুটিতেছে। আকাশের একটানা নক্ষত্র-মিছিল অনুসরণ করিতেছে সেই গতিকে। কোন বাধাই গাড়ীর গতিকে রুদ্ধ করিতে কিংবা নক্ষত্রের মিছিলকে মুছিয়া দিতে পারিতেছে না। পৃথিবীর বিস্তার আর কতটুকু! প্রতি মুহূর্ত্তের গতিবেগে দূর যাত্রার অবসান ঘটিতেছে।

পকেট হইতে ছোট টাইম টেবলখানি বাহির করিয়া পাশের ঘুমন্ত যাত্রীর হাত-ঘড়িতে সময় দেখিল তপন। আর দেরী নাই। ভোর পাঁচটায় গাড়ী জেসিডিতে পৌছিবে।

সমাপ্ত

মায়াজাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

মায়াজাল

প্রথম অধ্যায়

১

পুরাতন বাড়ীর চারি পাশে—পোড়ো ভিটার বনে এই বাড়ীখানিও হয়তো মানাইত ভালো। কিন্তু নূতন বড়লোকের পক্ষে পাড়াগাঁর মধ্যে অপচারিত অবস্থায় থাকা যেমন পীড়াদায়ক—এই বাড়ীখানির সুসংস্কৃত ও বর্দ্ধিতায়ন দেহ-সৌন্দর্য্য তেমনই চারি পাশের অযত্নবর্দ্ধিত জঙ্গলমধ্যে আর আত্মগোপন করিতে পারিতেছে না। সীমানার খাটো প্রাচীর অনেকখানি মাথা উঁচু করিয়াছে; প্রাচীরের ও-পিঠে গুল্মঘেরা বন আর দেখা যায় না। সিং-দরজার মাথা খানিকটা ছাঁটিয়া ফেলিলেও—সুসংস্কৃত হইয়াছে; ভিতরে ঠাকুর-দালান তৈয়ারি না হইলেও—সদর দরজার মর্য্যাদা তাহার দেহানুপাতে বোঝা যাইতেছে। আর সঙ্কীর্ণ হইয়াছে বাড়ীর উঠান। ভাগ-বাঁটোয়ারার দ্বারা নহে, মানুষের অসাচ্ছল্যের দিনে যাহার বৃদ্ধি—সাচ্ছল্যের প্রসাদে তাহাকে সঙ্কুচিত হইতে হইয়াছে। সেই বহুপুরাতন পাতলা ইষ্টক-গ্রথিত অর্দ্ধভগ্ন ঘর দু'খানির কোলে ফালি রোয়াক-টুকুর অস্তিত্ব আর নাই; উত্তর সীমানা আরও বিস্তৃত হইয়া—উপর-নীচে দৈর্ঘ্য-প্রস্থযুক্ত, বহু দরজা-জানালা-সমন্বিত, আধুনিক স্বাস্থ্যানুমোদিত ছয়খানি ঘর উঠিয়াছে। উইপোকার ভয় কাটাইবার জন্য কাঠের কড়ি সেই সব ঘরে দেওয়া হয় নাই। ছাদের উপর বুক-সমান উঁচু আলিসা হইয়াছে। সে আলিসার জাফরি-কাটা সৌন্দর্য্য ওই বনসীমা ভেদ করিয়া পথের লোকের দৃষ্টিকেও ক্ষণেকের জন্য আকর্ষণ করে। পাঁচ হাত চওড়া বারান্দায় উঠান হইয়াছে সঙ্কীর্ণ। আম-কাঁঠালের গাছগুলিকে নির্ম্মূল করা হয় নাই, তবে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন তাহাদের সর্ব্ব অঙ্গে সুপ্রকট। বাড়ীর ছেলেরা শীতকালের দিনে ঘুড়ি উড়াইবার সময় প্রায়ই অনুযোগ করে। দ্বিতলের ছাদে উঠিলেই বা নিস্তার কোথায়! অট্টালিকার সঙ্গে পাল্লা দিয়া গাছগুলিও দুরন্তপনায় উর্দ্ধে শাখা-প্রশাখা মেলিতেছে। গাছের ডালে ঘুড়ি আটকাইয়া বালকদের ক্রীড়া-আনন্দে প্রায়ই বিভ্রাট বাধায়। কেনা বাড়ীটার সঙ্গে এ বাড়ীর এমন অদ্ভুত যোগসাধন হইয়াছে যে, আগেকার পৃথকত্ব কল্পনাতেও আনা দুষ্কর। নূতন ইঁদারা, রান্নাঘর ও গোয়ালঘর দুই বাড়ীর মাঝখানকার ব্যবধান ঘুচাইয়া অখণ্ড এক বাড়ীর অস্তিত্বই ঘোষণা করিতেছে। গৃহস্থের বাড়ী এখন বড়লোকের প্রাসাদের কৈশোর সীমায় সবেমাত্র পদার্পণ করিল বুঝি!

তিনটি ঘরের মাঝখানে সিঁড়িটা না করিয়া একেবারে প্রান্তদেশে তাহাকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। সিঁড়ির এমন মজবুত গঠন-নৈপুণ্য যে, আরও দু'টি তলা উঠিলেও উর্দ্ধগামী হইবার বাধা নাই। ঘোরানো সিঁড়ি—খিলানের উপর চার-পাঁচটি ধাপ লইয়া পূর্ব্ব হইতে উত্তরে ফিরিয়াছে, উত্তর হইতে পশ্চিম ও সেখান হইতে দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া পুনরায় পূর্ব্বাভিমুখী হইয়াছে। সিঁড়ির মাথায় ছোট একখানি ঘর—নির্জ্জন। নির্জ্জন বলিয়াই জপতপ বা পূজার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। সেই সিঁড়ির উপরে উঠিলে অনেকখানি আকাশের সঙ্গে অনেকখানি গ্রামাংশ চোখে পড়ে। সেই ছাদে আলো ও বাতাসের দাক্ষিণ্য অবারিত। মনও সেই খোলা পরিবেশে অনেকখানি প্রসারিত হইয়া যায়।

বাড়ীখানার রং গৈরিক অর্থাৎ এলামাটির প্রলেপে সে গৈরিক বসনে দেহ ঢাকিয়াছে। ঘরগুলির অভ্যন্তরে কলিচুণের গোলা দেওয়া। সাদা রঙে বকপাখীর পালকের মতো সেগুলি ধবধবে। এবং সেখানে যাঁহারা বাস করেন—তাঁহাদের মনে না গৈরিক—না শুভ্র রঙের ছোপ লাগিয়াছে। সবুজ আর লাল রঙের মিশ্রণে তাঁহারা সংসারকে সুচারু করিয়া সাজাইতেছেন।

তবু চিলে-কোঠার ঘরে কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিলে ও ফুল-চন্দন-ধূপ-ধুনার গন্ধ বাহির হইলে—বাহিরের গৈরিক রঙের সঙ্গে তাহার মিতালী গাঢ়তর হয়। অতিথি-অভ্যাগত বা দুঃস্থদের সেবায় তৎপর হইল সাদা রঙের ছায়াও তার মাঝে খেলিয়া যায় বইকি। সাতটি রং লইয়া সংসার রচনা চলিতেছে; এ বাড়ীতেও তার ব্যতিক্রম নাই।

তবু সংসারে রঙের পরিবর্ত্তন নিত্য দেখা যায়। সময়ের পরিবর্ত্তনে যে রং বদলায় এমন নহে, তবে সময়ের চিহ্ন দেহের চেয়ে মনেই লাগিয়া থাকে অধিকক্ষণ, এবং তার প্রসাদে দেহেরও পরিবর্ত্তন প্রত্যক্ষীভূত হয়।

সেদিনের বালিকা-বধূর সশঙ্কিত দৃষ্টি ও দ্বিধা-জড়িত চলন আজ অতীতের রূপকথা। সেদিনের বধূ আজ আধ-নিমীলিত চক্ষু তুলিয়া অগাধ বিস্ময়ের সঙ্গে প্রিয়-পরিজনের পানে চাহিয়া শ্রদ্ধা বা প্রেমের অনুভূতিতে বিগলিত হইয়া পড়ে না। সেই দিনের সঙ্কোচ সুনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছে বুঝি! যোগমায়ার কণ্ঠে মিনতির পরিবর্ত্তে কর্ত্তৃত্বের সুরই বাজে আজকাল। বধূ-জীবনের পটোত্তোলন সুরু হইয়াছে। সেই উত্তোলিত পটের মাঝখানে বাড়ীর চেহারা বদলাইয়াছে, বধূর মন ও দেহ বদলাইয়াছে, বদলাইয়াছে শাসন-কর্ত্তৃত্বের পটভূমিকা।

প্রাতঃকাল। অগ্রহায়ণের শেষ। নবান্ন শেষ হইয়াছে, বড়ি দেওয়া চলিতেছে। নবান্নের দিনে প্রথম দেওয়া বড়িগুলি এখনও ভালো করিয়া শুকায় নাই। চটের উপর হইতে বড় বড় কুমড়া-বড়িগুলি তুলিয়া উল্টাইয়া রোদে দেওয়া চলিতেছে প্রত্যহ; সেই সঙ্গে নানা প্রকারের ভাজা বড়ি, অম্বলের বড়ি, ছোট, মাঝারি, বড় বড়ি দেওয়া চলিতেছে। শাশুড়ী বুড়া হইয়া পড়িয়াছেন। তবু একবার ছাদে আসিয়া বসেন। রোদ-পোহানো ও বড়ি-আগলানো দু'টি কাজই হয়। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে, দশ হাত দূরের বস্তু ধোঁয়া ধোঁয়া দেখেন বলিয়াই শুচিতা সম্বন্ধে সারা চিত্ত তাঁহার বেশী করিয়া সচেতন হইয়াছে। নীচেয় থাকিলে অনর্গল বকুনির সঙ্গে—আচার-বিচারের বিধিনিষেধ ব্যাখ্যাত হইতে থাকে। বড়ি আগলাইবার ছুতায় যোগমায়া তাঁহাকে ছাদে তুলিয়া দিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়। তবু ছাদে উঠিয়াই কি নিস্তার আছে? বলেন, "ছাদটা ভালো করে ধুয়ে দিয়েছ তো বউমা? যে বাঁদরের উৎপাত! ছেলেরা আসছে আসছেই। একটু গঙ্গাজল ছিটিয়ে—"

যোগমায়া বলে, "হ্যাঁ মা, আপনি বরঞ্চ ঠ্যাঙ্গা হাতে করে ঐ দিকটায় বসুন। রোদও পাবেন।"

শুকনা সজিনার ডাল মাঝে মাঝে ছাদের উপর ঠুকিয়া তিনি বলেন, "যত রাজ্যের পায়রা বাসা বেঁধেছে দালানে। তা বাঁধুক, মানুষের ভাগ্যে সময়ে ওরা বাসা বাঁধে। শালিক-ছাতারের উৎপাতই কি কম! মানুষকে খুয়ে খেতে দেয় না। হ্যাঁ বউমা, সজনে গাছে এবার কুঁড়ি ধরেছে তো? গেলবারে মাঘ মাসের ঝড়ে আর জলে সব ফুল ঝরে—একটিও ডাঁটা বাঁধতে দেয় নি।"

এমনি অনেক কথা—উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া তিনি বলেন। সংসারের কর্ত্তৃত্ব করে যোগমায়া, নির্দ্দেশ দেন শাশুড়ী। এখনও বড় সিন্দুকের চাবিটা তাঁহার কোমরের ঘুনসির সঙ্গে বাঁধা। এখনও ছোট কাঠের বাক্সের চাবি খুলিয়া তিনি সংসার-খরচের টাকা-পয়সা বাহির করিয়া দেন। পূজার সংকল্প তাঁহার নামেই হয়। এখনও বাগানে শুকনা কাঠ ভাঙিবার শব্দ কানে পৌঁছাইলে যথাসম্ভব গলা চড়াইয়া হাঁকেন, "কে র‍্যা, কাঠ ভাঙে কে!"

নাতি-নাতনীরা বুড়ীকে কিছু জ্বালাতন করে। তবে সংখ্যায় তাহারা বেশী নহে বলিয়া যোগমায়াকে সর্ব্বক্ষণ অনুযোগ-অভিযোগের ভারে প্রপীড়িতা হইতে হয় না। বিমল বড় হইয়াছে, এইবার তাহার উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা দেওয়া হইবে। মেজ হৃষীকেশ বাপের প্রিয় বলিয়া পিতার সঙ্গে সঙ্গেই কর্ম্মক্ষেত্রে থাকে। রামচন্দ্র পদমর্য্যাদায় কিছু বাড়িয়াছে, কাজেই যোগমায়া বাসায় না থাকিলেও—ঠাকুর-চাকরে মিলিয়া সেখানকার শৃঙ্খলা বিধান করিয়া থাকে। বাড়ী হইতে যতখানি স্নেহ ও সতর্কতা দেওয়া চলে—তাহা যোগমায়া আর শাশুড়ী মিলিয়া পত্রযোগে পাঠাইয়া দেন। লোক মারফৎ বড়ি, ঘি, আনাজপাতিও মধ্যে মধ্যে প্রেরিত হয়। বাড়ি আসিলে রামচন্দ্র ঠাকুরের রন্ধন-নৈপুণ্যের প্রশংসা করে। লুচি, পোলাও, মাংস, দুধ সব কয়টি পুষ্টিকর খাদ্য যে প্রায়ই তাহাদের জোটে সে-কথাও বার বার বলিয়া থাকে: তবু ছেলের গায়ে হাত দিয়া মায়েরা বলেন (কেহ প্রকাশ্যে—কেহ বা মনে

মনে), "পোড়া কপাল ! এই বুঝি তোদের ভালো খাওয়া ? দিন দিন কি ছিরিই যে হচ্ছে !"

প্রতিবাদ করা বৃথা জানিয়া উহারা মৃদু মৃদু হাসিতে থাকে।

নাতিনীটি ছোট বলিয়া বেশী অসাবধান। প্রায়ই পাড়া-বেড়ানো কাপড়ে ঠাকুরমাকে ছুঁইয়া ফেলে। না ছুঁইলেও গায়ে কাপড়ের বাতাস লাগাইয়া বিভ্রাট বাধায়। আর কুচা কুচা যে দু'টি ছেলেমেয়ে এ বাড়ীতে আছে—তাহারাও দুষ্টামীতে গৌরীর চেয়ে কোন অংশে কম নহে। তাহারা যোগমায়ার রক্তসম্পর্কীয় কেহ নহে, অথচ এ সংসারে তাহাদের মূল্য অস্বীকার করা চলে না।

গহনা বাঁধা দিয়া একদা যে বাড়ীখানি যোগমায়ার শাশুড়ী কিনিয়াছিলেন, এবং যাহা অধুনা এই বাড়ীর অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে—ইহারা সেই বাড়ীর সম্পর্কীয়। যোগমায়ার জ্যেঠ্‌শ্বশুর বহুদিন হইল পরলোকগমন করিয়াছেন। কয়েক বছর পরে পালিত বোনপোটিও এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছে। নাবালকের বিষয় বিধবা রক্ষা করিতে পারে নাই। প্রায় সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া উহাদের হাত ধরিয়া আজ বছর দুই হইল সে এ-বাড়ী আশ্রয় করিয়াছে। যোগমায়া তো ইহাদের পাইয়া বর্ত্তাইয়া গিয়াছে। শাশুড়ীও অসন্তুষ্ট নহেন। তবু তিনি যে খুব প্রসন্নও নহেন—সে কথা পাকেপ্রকারে প্রায়ই বলিয়া থাকেন। পরের সংসারে পরের নাকি মমতা হয় না। যে বউ নিজের বিষয় রক্ষা করিতে পারিল না, তাহার লক্ষ্মীশ্রী সম্বন্ধে শাশুড়ী যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেন।

সত্য কথা বলিতে কি, বউটি কিছু অগোছালো। কেমন এলোমেলো ভাব। না জানে ছেলেমেয়ের যত্ন করিতে, না পারে সংসারের কাজ গুছাইয়া করিতে। বাসন মাজিতে বসিয়া বাসনই সে মাজিতে থাকে, যেন সারাদিন-ভোর এই কাজ ছাড়া আর কিছুই সে করিবে না। উঠান ঝাঁট দিবার পর এখানে-ওখানে পাতা-কুটা ইত্যাদি দেখা যায়, এবং গোবরজল ছড়ানোতেও বিশৃঙ্খলার একশেষ। যোগমায়ার তিরস্কার সহিয়া সে হাসিমুখে বলে, "দিদি, আজ কিন্তু আমি নিরিমিষ রাঁধব।"

যোগমায়া বলে, "হ্যাঁ, তা হ'লেই আর খাওয়া হবে'খন। আলোচালের ভাত তুমি পিণ্ডি করে রাঁধবে।"

সুহাস বলে, "তাই বলে শিখব না ? তুমি আঁশ-নিরিমিষ দুটো হেঁসেল নিয়ে যা নাকাল হও !"

"কি করি ভাই, আমার অদৃষ্ট।"

সুহাস বলে, "কি জানো দিদি, ঝাঁটপাট দেওয়া কি বাসন কোসন মাজা ও সব মুনিষ-জন করত—শাশুড়ী আমায় কিছুটি করতে দিতেন না। খালি ধান সেদ্ধ-করা আর ধান শুকোনো।"

এই প্রসঙ্গে জমি-জমার কথা আসিয়া পড়ে। যোগমায়া বলে, "তা হ্যাঁ রে—তুই এমনও বোকা ! কালনায় রেজেষ্টারি আপিসে গিয়ে সই দিয়ে এলি ? বললি—'জমি আমি স্বেচ্ছায় বিক্রী করছি' !"

"কি করব দিদি ! উনি মারা গেলেন, চাষা গাঁ—এমন একঘর লোক পেলাম না যে পরামর্শ করি। ভাই এলো। বললে, 'দিদি, সই না দিলে নাবালকের বিষয় আমি দেখতে পারব না।' আরও কত কি বোঝালে—ছাই মনেও থাকে না।"

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিল, "তা দেবোত্তর যে বিষয় আছে—"

সুহাস বলিল, "সে তো ছেলে সাবালক না হ'লে পাব না। এখন তারা অছি—তারাই দেবসেবা করবে আর বিষয় ভোগ করবে।"

"তা কাজকর্ম্মগুলো একটু মন দিয়ে শেখ ভাই। তোমারও তো ছেলেমেয়ে বড় হবে—সংসারধর্ম্ম করতে হবে।"

সুহাস হাসিয়া বলিল, "আর তুমিও যেমন দিদি, ওরা যদি বাঁচে তবেই তো ?"

"ষাট—ষাট ! ও কি অলুক্ষুণে কথা ! মা হয়ে এমন কথা তুই ভাবতেও পারিস !"

"না ভেবে উপায় কি দিদি ? আমার যে কপাল খারাপ।"

তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া সুহাস ইঁদারাতলায় চলিয়া গেল।

যোগমায়া আপন মনে বলিল, "আহা, নিজের সংসার ভেসে গেছে বলে—আবাগীর সংসারে আর যত্ন-আত্তি নেই। ভগবান ওর ভালো করুন।"

নূতন বড়ি দেওয়া হইতেছিল। শাশুড়ী ঠেঙ্গা হাতে ঠক্ ঠক্ শব্দ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওগুলো কি বড়ি, বউমা ?"

"তিলে বড়ি। আপনি ভাজা বড়ি খেতে ভালবাসেন, তাই—"

"পোড়া কপাল ! আর কি দাঁতের জুত আছে যে ভাজা বড়ি চিবুব ! হাত দিয়ে গুঁড়িয়ে—

পাকলে পাকলে—তা হ্যাঁ বউমা, শহরে নাকি আজকাল দাঁত বাঁধানো হয়েছে? ঠিক সত্যিকারের দাঁতের মতো, ছোলা-মটর চিবিয়ে খায় লোকে?"

"শুনতে তো পাই। আপনি কি বাঁধাবেন?"

"পোড়া কপাল! কোন্ মড়ার খুলি থেকে খুলে এনে বসিয়ে দেবে—ওয়াক্ থু—"

যোগমায়া বলিল, "মানুষের দাঁত কেন হবে, শুনেছি পাথরের দাঁত।"

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়িয়া তিনি বলিলেন, "তুমিও যেমন—পাথরের দাঁত নাকি আবার হয়! ওই বলে—না হ'লে মানুষ কিনবে কেন? দাঁত প'রে বুড়ো বয়সে জাতজন্ম খোয়াই আর কি!" একটু থামিয়া বলিলেন, "বেশী দিন থাকলেই ভুগতে হয়। রথচ্ছত্ব সবই যায়। বেয়াই-বেযান ভাগ্যিমানী ছিলেন—ড্যাংডেঙিয়ে কবে চলে গেছেন। আমি মহাপাপিনী—আকন্দর ডাল মুড়ি দিয়ে বসে আছি। যম বোধ হয় ভুলে গেছেন, বউমা।"

"ও কথা বলবেন না, মা আপনি আছেন—পাহাড়ের আড়ালে আছি।"

"থেকে তো সব কর্ম্মই কচ্ছি, মা। কুটোটি ভেঙে উব্গার নেই।" একটু স্বর নামাইয়া বলিলেন, "ও-পারের বউ কিছু করে—না, খালি থ্যাতাং থ্যাতাং করে বেড়ায়? ছেলেগুলোকে একটু সহবৎ শেখায় না। মাগো, খালি সত্যিক জাত ছুঁযে ঘর-দুয়োর নৈনেত্য করছে!"

"শোকতাপা মানুষ—শুনলে দুঃখ পাবে মা।"

"শোকতাপা কে নয়, মা? এক-কুড়ির কিছু বেশী বয়সে বিধবা হলাম—মাথার ওপর কেউ ছিল না। মানুষ করি নি নাবালক ছেলে? না বিয়ে দিই নি মেয়ের?"

"আপনাদের সঙ্গে কার তুলনা বলুন।"

"না মা, আমাদের সোনার কালের তুলনা আলাদা। এই তো তুমিও সতীকন্যে ঘর-দুয়োর কেমন গুছিয়ে করছ। যাকে যা ভক্তিচ্ছেদ্দা করবার—যা রাখবার ঢাকবার—লোক-লোকুতো—আচার-ব্যাভার সবই তো মানিয়ে করছ। ওদের ধারাই ওই। রেঢ়ো লোক—খালি ধান সেদ্দ ছাড়া আর কিছু পারে না।"

বড়ি দেওয়া শেষ করিয়া যোগমায়া নামিয়া আসিল। এইবার উনান জ্বালিয়া রান্না চাপাইতে হইবে।

বাহির হইতে কে হাঁকিল, "টেলিগ্রাম আছে গো মা-ঠাকরুণ—টেলিগ্রাম। যোগমায়া দেবী।"

রান্নাঘরের রোয়াকে দাঁড়াইয়াই যোগমায়ার আপাদ-মস্তক কাঁপিয়া উঠিল। শীত পড়িয়া অবধি প্রত্যহ দুপুর বেলা কয়েকটি দাঁড়কাক উঠানে-রক্ষিত বাসনের উপর বসিয়া ভুক্তাবশিষ্ট ডাঁটার ছিবড়া, ভাত ইত্যাদি খাইবার কালে যে কর্কশ কা-কা ধ্বনি করে, তাহাতেও প্রাণে এমন আতঙ্কের সৃষ্টি হয় না। মাঝরাত্রিতে ঘুম ভাঙিয়া গেলে—কায়েতদের পোড়ো ভিটায় কালপেঁচার ডাক শোনা যায়—সে ধ্বনিও কম অমঙ্গলজনক নহে। এ নাকি গাঁয়ে মড়ক আসিবার পূর্ব্ব লক্ষণ। ঢেলা ছুঁড়িয়াও পাখীটাকে তাড়ানো যাইতেছে না।

শাশুড়ী বলেন, "ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় অমনি কালপেঁচা ডাকত; এক দিন নয়, দু-দিন নয়—দু'টি মাস ধরে। পর পর অজন্মা হ'ল—লোক মরে কুড় উঠে গেল।" গভীর রাত্রিতে কাল-পেঁচার সেই অমঙ্গলসূচক তীব্র ধ্বনিও যোগমায়াকে এতটা বিচঞ্চল করিয়া তুলে না—অশুভ-বার্ত্তাবাহী পিওনের কণ্ঠস্বর যেমন বুকের মাঝে বিঁধিয়া গেল।

সহি দিয়া লাল খামখানি যোগমায়া তুলিয়া লইল। ইংরেজি সে জানে না, অথচ ওই টানা টানা দুর্ব্বোধ্য অক্ষরগুলির পানে চাহিয়া প্রাণ তাহার আকুল হইয়া উঠিল।

সুহাস বলিল, "কি লিখেছেন বটঠাকুর?"

"চিঠি নয়—টেলিগেরাম।" কম্পিতকণ্ঠে যোগমায়া বলিল।

টেলিগ্রামের গুরুত্ব সুহাস বুঝে না। কহিল, "তা পড়ো না।"

অকস্মাৎ যোগমায়ার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল। টেলিগ্রামের গুরুত্ব যে বোঝে না—তাহার উপর রাগ হওয়াই স্বাভাবিক। ঈষৎ ঝাঁঝালো কণ্ঠে সে কহিল, "ইংরেজি লেখা আমি পড়তে পারি! দেখ্, তুই যদি পারিস।"

যোগমায়ার এই ঝাঁঝালো উক্তিতে সুহাস বিস্মিত হইল। মুখের হাসি তাহার মিলাইল, আমতা-আমতা করিয়া কহিল, "তা বিমলকে দিয়ে—"

ক্রুদ্ধস্বরেই যোগমায়া বলিল, "এক্জামিন দিয়ে গেলে ধিঙ্গী সেজে বেড়াচ্ছেন! আর কি চুলের টিকি দেখবার জো আছে? কে রইল—কে ম'লো—", আবার শিহরিয়া সে জিভ কাটিয়া

দেবতার নাম উচ্চারণ করিল। দু'টি চোখের কোলে জলরেখা চক্ চক্ করিয়া উঠিল।

সুহাস ডাকিল, "ওরে রঘু—রঘু, তোর দাদাকে একবার ডেকে নিয়ে আয় তো। শীগ্‌গির।"

রঘু, লক্ষ্মী ও গৌরী তিন জনেই কলরব করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল এবং অনতিবিলম্বে বিমলের দু'টি হাত ও কাপড়ের প্রান্তভাগ ধরিয়া টানিতে টানিতে তেমনই কোলাহল করিতে করিতে ফিরিয়া আসিল।—

"আমি আগে ধরেছি, মা।"

"ইস্, আমি আগে নয়?"

"তা বই কি. আমিই তো বললাম—দাদা ছুতোর-বাড়ী বসে আছে। বলি নি?"

যোগমায়ার গম্ভীর মুখের পানে চাহিয়া ছেলেদের কোলাহল স্তব্ধ হইয়া গেল। হাত বাড়াইয়া টেলিগ্রামখানা বিমলের দিকে আগাইয়া দিয়া যোগমায়া বলিল, "পড়ো দেখি, খোকা।"

বিমল নিঃশব্দে পড়িতে লাগিল। পড়িয়া অর্থ বুঝিল বলিয়াই সে চুপ করিয়া রহিল। মুখখানি তাহার শুকাইয়া গেল।

অধীর কণ্ঠে যোগমায়া বলিল, "কি লিখেছে খোকা, বল্ না?"

শুষ্ক কণ্ঠে বিমল বলিল, "হৃষীকেশের অসুখ—খুব শক্ত অসুখ।"

অসুখ! দ্বিতীয় কথা উচ্চারণ করিবার সামর্থ্য যোগমায়ার রহিল না। দেওয়ালটা না ধরিয়া ফেলিলে সে হয়তো টলিয়া রোয়াক হইতে উঠানের উপরেই পড়িয়া যাইত।

বিমল মায়ের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া কহিল, "তুমি কাঁপছ, মা!"

বসিয়া পড়িয়াই যোগমায়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। প্রিয়-বিয়োগ বেদনার তীব্রতা এই মুহূর্তে সে অনুভব করিতেছে যেন। প্রাণের ভিতর এমন হু-হু করে কেন? কি যেন হারাইয়াছে, মাথা খুঁড়িয়া রক্তগঙ্গা হইলেও সে নিধি আর খুঁজিয়া মিলিবে না।

পড়িয়া রহিল রন্ধনের আয়োজন। যাত্রার আয়োজন যোগমায়াকে করিতে হইল। বিমল সঙ্গী হইবে। বাঁকুড়া আর কতটুকু পথ! একবার রাণাঘাট আর একবার হাওড়ায় গাড়ী বদল করিতে হইবে। অতটুকু ছেলে বিমল পারিবে তো তাহাকে লইয়া যাইতে? কেন পারিবে না? না লইয়া গেলে যে যোগমায়ার সর্ব্বস্ব যায়। ঘরের মটকায় আগুন ধরিলে প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টাই মানুষের সর্ব্বপ্রথম জাগে, ধন-সম্পদের কথা ভাবিয়া আকুল হইবার সময় তো সে নহে!

অশ্রুর সঙ্গে আহারের প্রতিকূল সম্বন্ধ। শাশুড়ী ও জায়ের অনুরোধে—বুক ঠেলিয়া বাহিরে আসিতে চাহিলেও—হাতের মুঠায় অন্নের পিণ্ড মুখের মধ্যে ভরিতে হইল। শুভযাত্রার যত কিছু আয়োজন—হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া শাশুড়ীই সম্পন্ন করিলেন। তিনি অভয় দিলেন, কাঁদিলেন, এবং 'তার' করিয়া সংবাদ জানাইবার পুনঃ পুনঃ অনুরোধের মধ্যে 'দুর্গা শ্রীহরি' ধ্বনিও উচ্চারণ করিলেন। ঘড় ঘড় করিয়া ঘোড়ার গাড়ীর আওয়াজ দূরে মিলাইয়া গেল। মধ্যরাত্রির কাল-পেঁচা বা দুপুর বেলাকার দাঁড়কাকের ধ্বনির মতোই সেই শব্দ অশুভ ইঙ্গিতই করিয়া গেল বুঝি।

তার আসিল না, সপ্তাহ পরে রামচন্দ্র সস্ত্রীক ফিরিয়া আসিল। ঘড় ঘড় শব্দে ঘোড়ার গাড়ী আবার দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। রামচন্দ্রের হাত ধরিয়া নামিল বিমল, পিছনে অবগুণ্ঠনবতী যোগমায়া। এক রাশ জিনিসপত্র গাড়ীর মাথা হইতে নামিল, নামিল না শুধু হৃষীকেশ।

বাড়ীর উঠানে আছড়াইয়া পড়িয়া যোগমায়া বুকভাঙা কণ্ঠে ডাকিল, "মা গো!"

শাশুড়ী বুক চাপড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "আমার সোনার ঋষিকে কোথায় রেখে এলে গো, বউমা!"

২

কয়েক দিন পরে।

রামচন্দ্র বলিল, "না খেয়ে আর কতদিন কাটাবে, মায়া?"

যোগমায়া বলিল, "অনেক খেয়েছি আমি—আর আমার খাবার কথা ব'লো না গো।"

তাহার চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে রামচন্দ্র বলিল, "আমাদের কর্ম্মফল, মায়া। নইলে—"

যোগমায়া বলিল, "কেন আমাদের কর্ম্মফলে ও চলে গেল?"

"কার কর্ম্মফলে কে চলে যায়—আমরা কি বুঝব, মায়া? ভগবান শঙ্করের একটা গল্প মনে পড়ল।—শঙ্করের ইচ্ছে হ'ল নদীতে নাইবেন, মা কিছুতেই যেতে দেবেন না। নদীতে কুমীর আছে,

ছেলের ফাঁড়ার কথা মা জানেন। কিছুতেই তিনি শঙ্করকে ছাড়বেন না। শঙ্কর তখন মাকে বোঝাতেন, 'মা, মৃত্যুর কথা ভেবে কেন তুমি কাঁদছ? আমাদের প্রতিদিনকার মৃত্যু যা চোখের সামনে ঘটছে দিনরাত—তা তো কই দেখেও দেখছ না! ছেলেবেলায় তোমার কোলে শুয়ে যখন খেলা করেছি—তখনকার সেই কোমল শিশুদেহের সঙ্গে —আজকের এই বয়ঃপ্রাপ্ত কঠিন দেহের তুলনা করো দেখি। সেই কোমল দেহের মৃত্যু কোন্‌কালে হয়েছে; আজ ইচ্ছে করলেও আমার এই দেহ নিয়ে তুমি তোমার কোলে শুইয়ে আদর করতে পারো না। 'সুতরাং কত বার আমাদের এই নশ্বর দেহের মৃত্যুই যে চোখের ওপর ঘটছে।"

যোগমায়া তাহাতে সান্ত্বনা লাভ করিল কিনা কে জানে, নিস্পন্দের মতো রামচন্দ্রের বুকে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

তত্ত্বকথা শুনাইয়া চির-বিচ্ছেদকে জয় করা দুরূহ। সংসারে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মৃতির আলোতেই না চিরবিদায়ী উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ঘটনার প্রদীপগুলি মনের মধ্যে আপনি জ্বলিয়া উঠে—আপনি আগুন জ্বালাইয়া পুড়াইয়া মারে। তবু রামচন্দ্র যে কয় দিন বাড়ীতে ছিল—পরস্পরের সান্নিধ্য লাভ করিয়া এবং পরস্পরকে সান্ত্বনা দিয়া, দিনরাত্রি কোন প্রকারে কাটিয়া যাইত। সে চলিয়া গেলে যোগমায়ার জ্বালা বাড়িল বই কমিল না। প্রতিবেশিনীরা কত সান্ত্বনা দিত—সে যেন না দিলে নয়—এমনই গোছের একটা কিছু। ছোট মেয়েটিকে কোলে বসাইয়া দিয়া বলিত, "ওকে কোলে করে ব'সো, মা। ভগবান করুন, আবার কোল আলো করে চাঁদের মতো একটি ফুটফুটে ছেলে—"

রূপে ভুবন আলো করিয়া চাঁদের মতো দশটি ছেলে আসিলেও—মায়ের মনে সেই একটি কুরূপ ছেলের জন্য যে বেদনা লাগিয়া থাকে—তাহা দূর হয় কিসে? অথচ এই সান্ত্বনাই উঁহারা দেন! এমন নাকি সকলেরই ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে! অশ্রু যখন চোখে না থাকে যোগমায়া সান্ত্বনাকারিণীদের মুখ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে। একদা ইঁহারাও শোক পাইয়াছেন, পুনরায় সন্তান কোলে পাইয়া সেই শোক ভুলিয়াছেন। মাঝে মাঝে কখনও বা হঠাৎ একটি দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে মনে হয়, সে বাঁচিয়া থাকিলে ঠিক এত বড়টি হয়তো হইত। সে রোজগার করিয়া টাকা আনিত, বিবাহ করিয়া সংসারকে কাঁপাইয়া তুলিত হয়তো। হয়তো রোজগার সে করিতে পারিত না, বিবাহ করিত কিনা—কে জানে, কিন্তু ব্যতিক্রমগুলি লইয়া মায়েরা চিন্তা করিতে ভালোবাসেন না। যোগমায়া তাঁহাদের বলি রেখাঙ্কিত মুখের পানে চাহিয়া ভাবে, কালে হয়তো সব ভুলিতে পারা যায়। কিন্তু সেই সব-ভুলিয়া-যাওয়ার শান্তিপ্রদ কাল কত দিনে যোগমায়ার কাছে ধরা দিবে!

কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় শাশুড়ী হরিনামের মালা পেরেকে টাঙাইয়া রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া সারা দিনের কর্মব্যস্ত মনের মধ্যে ধিকিধিকিপ্রায় আগুনকে খোঁচাইয়া তুলেন। নিজের চোখের জলে বুক ভাসিলেও তাঁহার মুখে আঁচল চাপিয়া ধরিয়া যোগমায়া সান্ত্বনা দেয়। শাশুড়ীর ক্রন্দনকে বিলম্বিত হইতে দেয় না, যেখানে থাকে ছুটিয়া গিয়া সেই উচ্চ চীৎকারধ্বনি রোধ করে সে। না রোধ করিলে ঐ তীব্র বিচিত্র সুর তীক্ষ্ণধার ছুরির মতো যোগমায়ার অন্তরকে বিদীর্ণ করিতে থাকে। দম তার বন্ধ হইয়া আসে। এক একবার সে ভাবে—অমনই ভাবে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে পারিলে বরং বুকের গুরুভার নামিয়া যায়। কিন্তু বউমানুষের অমন ভাবে চীৎকার করাটা যে অশোভন—সে সংস্কারও প্রবলভাবে তাহার চীৎকারের পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায়। সংস্কার এমনই প্রবল—সেই সুদূর বাদুড়ার বাসাতেও—শাশুড়ীর অনুপস্থিতি সত্ত্বেও যোগমায়া গলা ফাটাইয়া কাঁদিতে পারে নাই। হৃষীকেশ তো যোগমায়ার অপেক্ষা করিয়া ছিল না। সে পৌঁছিবার বহু আগেই রামচন্দ্র পুত্রের শেষকৃত্য সারিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিয়াছিল।

শাশুড়ীই প্রস্তাব করিলেন, "দিন কতক বাপের বাড়ী থেকে ঘুরে এসো বউমা। ও বাড়ীর বউ আছে—যেমন করে হোক্ সংসার চালাবে'খন।"

যাইবার ইচ্ছা যোগমায়ার ছিল না। এই সংসারের গুরু দায়িত্ব ও গভীর মমত্ববোধের চাপে কোথাও পা বাড়াইবার ইচ্ছা যোগমায়ার হয় না। নইলে স্বামীর কাছে দুই-এক মাস কাটাইয়া এই বাড়ীতে সে ফিরিয়া আসিত কেন? বাসায় সেই বন্দীশালায় অনেকখানি স্বাধীনতাই তো যোগমায়ার ছিল। খণ্ডিত আকাশ, খানিকটা প্রান্তর ও নিত্য-দেখা লোকজনের মাঝেও নিজের অখণ্ড কর্তৃত্বকে সে পুরাপুরিই ভোগ করিত। তবু বাড়ীর এই আম-কাঁঠাল-ছায়া ঘেরা উঠান, শাশুড়ীর নির্দেশ

মাথায় পাতিয়া গৃহকর্ম্মের শৃঙ্খলাবিধান, প্রতিদিনের বেড়াইতে-আসা প্রতিবেশীদের সম্মুখে আড়ষ্ট হইয়া প্রশংসা গলাধঃকরণ, সখীর সঙ্গে রহস্যালাপ—যোগমায়াকে নিয়তই টানিয়া আনিত। বিমলের জন্য—হৃষীকেশের জন্য নূতন করিয়া গৃহ-নির্ম্মাণের কল্পনা সে-ই করে, নিজের মনের রঙে রাঙাইয়া সংসারকে আঁকিতে আরম্ভ করিয়াছিল যোগমায়াই তো। বাসার মুক্তির ক্ষেত্রে সেই চিত্র আঁকা চলিত আরও সুষ্ঠু ভাবে। কিন্তু বদলির বাদল লাগিয়া যোগমায়ার চিত্রে কাঁচা, স্যাঁতসেঁতে ও সাদা দাগে অস্পষ্ট হইয়া উঠিত। যে আম-কাঁঠাল গাছ সে নিজের হাতে বাসার অঙ্গনে পুঁতিয়া গেল—তাহার ক্রমবর্দ্ধমান রূপটি দেখিবে অপরে। আবার অবিরত জল-সিঞ্চনে যে-গাছের মুকুল ধরিতে সে দেখিল—ফল পাকিবার অনেক আগেই সে গাছের মায়া তাহাকে কাটাইতে হইবে। মানুষের সঙ্গে হৃদ্যতা জমিবার মুখেই তাঁর ভাঙিবার হুকুম আসে।

কুষ্টিয়ার কালিতারা আজ কোথায়—কে জানে? কেষ্টার মা এখনও কি বাঁচিয়া আছে? আর পূর্ণিমা? এমন কত স্মৃতিই তো পিছনের তরঙ্গ প্রহারে আগের তরঙ্গে ভাঙিয়া দিবার মতো মনের মাঝে কল্লোলধ্বনি তোলে। যেখানে প্রতিমুহূর্ত্তে নীড়-ভাঙার মহোৎসব লাগিয়া আছে—নীড় গড়িবার মমতা সেখানে পুঞ্জীভূত হইবার অবসর পাইবে কেন? তবু, স্থিরভাবে বাসা পাতিবার দিন যোগমায়ার আসিয়াছিল। রামচন্দ্র ইন্‌স্পেক্টার হইয়া বড় আপিসে বদলি হওয়ার সঙ্গে—নিত্য বাসা-বদলানোর হাঙ্গামা অনেকটা কমিয়াছিল। কিন্তু যোগমায়ার মনের ভীরু ক্ষেত্রে মমতার বীজ তখন আর উপ্ত হইবার অবসর ছিল না। এক দিকে বয়োজীর্ণ শাশুড়ী একাকিনী সংসার লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন—অন্য দিকে ছেলেদের পড়াশুনা। নিত্য স্কুল বদলানোর ফলে উহাদের বিদ্যাশিক্ষার বাধা রামচন্দ্র পছন্দ করিত না। পদোন্নতির সময়ে বড় ছেলে বিমল দেশের স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িতেছিল—তাহাকে স্কুল ত্যাগ-করানো রামচন্দ্র যুক্তিযুক্ত বোধ করে নাই। বুড়া শাশুড়ীর ঘাড়ে ছেলের সময়-বাঁধা স্কুলের ভাত দেওয়ার কাজ ফেলিয়া যোগমায়া প্রবাসিনী সাজিতে পারে নাই। সংসারের যে দিকে ছায়া—যে জমিতে সার পড়িয়াছে—মমতার ফসল সেইখানেই আপনি বোনা হইয়া গেল। ছায়াভরা আম-কাঁঠালের গাছের তলায়, ও-বাড়ীর নটে-পালং-কুমড়া-লাউয়ের ক্ষেতে, পুরাতন বাড়ী নূতন করিয়া গড়িবার মুখে—তার শ্রী-শোভাকে মনোরম করিতে যোগমায়ার সঙ্কল্প কখন সংযুক্ত হইয়া গেল। নূতন রূপে নূতন আকর্ষণ আনিল এই জন্মভিটা। শ্বশুর-কুলের ভিটা—স্বর্গের চেয়ে গরীয়সী যে মাটি—মরণ যেখানে বহুপূর্ব্ব হইতেই পুণ্য-সূর্য্যের প্রথমোদয় দেখিবার উল্লাসে চির-প্রতীক্ষমান। বহুদিনকার শোনা কথা—নূতন বাড়ীর রূপে প্রত্যক্ষীভূত হইয়া যোগমায়ার রক্তধারার সঙ্গে যোগমায়ারও অজ্ঞাতে কখন মিশিয়া গেল।

এই বাড়ীই আজ শোকের সমুদ্রটিকে স্ফীত করিয়া তুলিতেছে। হৃষীকেশ অদেখা হইয়া ছলছল পাংশু মুখে সে বাড়ীর শূন্যমণ্ডল ভরিয়া আছে। চোখ চাহিলে ছোটখাটো-বস্তুপুঞ্জে হৃষীকেশ জীবন্ত হইয়া উঠে, চোখ বুজিলেও হৃষীকেশ মুছিয়া যায় না। উপরের দক্ষিণ-দুয়ারী বড় ঘর দু'খানা—একখানা বিমলের—একখানা হৃষীকেশের। পাশের পূজাগৃহটি অবশ্য যোগমায়ার জন্য কিংবা বিমল-হৃষীকেশের অনাগত অংশীদারের জন্যও হইতে পারে। বাহিরের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ যেখানে মুছিয়া গেল, মনের অস্পষ্ট ইঙ্গিতকে লইয়া আবার কল্পনার জাল বুনিবে যোগমায়া কোন্ সাহসে? ও ঘরের দুয়ারে সন্ধ্যাদীপ লইয়া দাঁড়াইবার সামর্থ্য যোগমায়ার নাই, ওদিকে চাহিবার অধিকার—

বাবা-মাকেই বেশী করিয়া মনে পড়িল। বাপের সেই পিঙ্গল চোখের কটা তারা—মায়ের নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর। না থাকুক সেই সব—সেই বাড়ী আছে। সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেও মনে হইবে—বাবা-মায়ের কোলে শোকার্ত্ত সন্তান ফিরিয়া আসিয়াছে। দুরন্ত কাল—নির্ব্বোধ কাল—সর্ব্ব-সন্তাপহারী কাল—বহুদিন হইল ওদিকে স্মৃতির চিতা নির্ব্বাণ করিয়া দিয়াছে। সুখের মুহূর্ত্তে তাঁহাদের স্মরণ করিয়া মন চঞ্চল হয়, শোকের মুহূর্ত্তে তাঁহাদের বিয়োগব্যথার মধ্যে এই সদ্যপ্রাপ্ত বেদনাকে মিশাইয়া দিলে—যোগমায়ার মন কি মা-বাপের কোলে ফিরিয়া যাওয়া দুঃখী মেয়েটির মতো শোকসন্তাপ ভুলিয়া যাইবার মন্ত্রটিকে আয়ত্ত করিতে পারিবে না?

কালের ব্যবধান দূরত্বের হ্রাস করিয়াছে। পাল্কী উঠিয়া গিয়াছে। গোযান আছে—তাও অচল হইয়া আসিতেছে। ঐ মেঠো পথে ঘোড়ার গাড়ীই

চলে আজকাল। দু-ঘণ্টার পথ আধ ঘণ্টায় পাওয়া যায়।

পরিবর্ত্তন সর্ব্বত্রই সুস্পষ্ট। ভাইয়ের সংসারে নূতন ব্যবস্থা। বড় আটচালার বদলে দু'খানি কোঠাঘর সেখানেও উঠিয়াছে। সে বাড়ীর উঠানও সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। বকফুলের গাছ, জাতি ফুলের গাছ, পেয়ারা গাছ, নানা জাতীয় ফুলের সেই শোভা, ঘৃতকুমারীর ঝাড়—কিছুই নাই। কুয়াতলার কাঁঠালগাছ—কুয়াসমেত নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। শুধু উঠানে শুইয়া শাখাসমৃদ্ধ লেবুগাছটা ফলে ফুলে সাজিয়া সেদিনের কথা আজও মনে রাখিয়াছে। বাপের কর্ত্তৃত্ব শেষ হইয়াছে—ভাইয়ের শাসন-যুগ এই সংসার বহন করিতেছে। কলমি-ডোবার বিলোপ ঘটিয়াছে—বড় একটা আমবাগান সেখানে মাথা তুলিয়াছে। বাৎসরিক আয়ের অঙ্ক বাড়িয়াছে। যে-তেঁতুল গাছে হুতোম পাখী ডাকিলে অন্ধকার রাত্রিতে যোগমায়া মায়ের কোল ঘেঁসিয়া ওই পাখীটার ডাকের গল্প শুনিতে চাহিত—সেই ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছটা কাটিয়া বছর খানেক ধরিয়া নাকি জ্বালানি কাঠ পাওয়া গিয়াছিল। পুরাতন মানুষের পুরাতন সঙ্গীরা এমনই করিয়া আত্মগোপন করে, নূতন মানুষেরা নূতন সাথী জুটাইয়া লয়।

ভাইয়ের সংসারে পোষ্য বেশী নাই। বউয়ের বয়স কম, মাত্র দুটি ছেলে লইয়া সে হাঁপাইয়া পড়িয়াছে। পিত্রালয় সম্পর্কীয়া এক পিসিমা আসিয়া বছরের দশটি মাস বউয়ের সাহায্য করেন। তিনি বিধবা। নিঃশেষিত-প্রায় শ্বশুর-কুলের দাবি নাই, পিতৃকুলের আশ্রয়ে আসিয়া কর্ত্তৃত্ব না হউক—যেমন পাঁচজনে থাকে তেমনই হয়তো ছিলেন। এ-বাড়ীর গৃহিণী না থাকায় নূতন বউকে সংসার গুছাইয়া ও চিনাইয়া দিবার জন্য লগনের দিন হইতেই আসিয়াছেন। তার পর বউ সংসার চিনিলেও—আঁতুড় তোলার হাঙ্গামা—পাল-পার্ব্বণের হাঙ্গামা—অসুখ-বিসুখের হাঙ্গামা ইত্যাদিতে দশটি মাস তাঁহাকে এখানে থাকিতে হয়। শীতের দু'টি মাস তাঁহাকে ধরিয়া রাখা দায়। বলেন, "বুড়ো হাড়ে শীত সহ্যি হয় না। সকালে উঠে উঠোন ঝাঁট, গোবরজল ছড়া দেওয়া—যখন বয়েস ছিল—সেই কোন্ ভোরে কাক-কোকিল ডাকতে-না-ডাকতে উঠে সব সেরেছি। এখন কি পারি?"

কিন্তু সেইটাই আসল কথা নয়। ঐ সময়ে তিনি পিত্রালয়েও থাকেন না। শ্বশুরালয়ে চলিয়া যান। শ্বশুরালয়ে লোক না থাকুক—কিছু সম্পত্তি আছে। একটা ছোট পুকুর (ডোবা সংস্করণ), গোটাকতক আম-নারিকেল গাছ সমন্বিত বাগান, আর ভিটের পোড়ো জমিতে গোটা চল্লিশেক খেজুর গাছ। শীতকালে শিউলিয়া গুড় তৈয়ারি করিবার জন্য গাছগুলি জমা লয়। প্রতি গাছ চার আনা। জেলেদের যৎসামান্য দামে পুকুরটা জমা দিয়া দেন, আর মাঘ মাসে আমের মুকুল ধরিলে মুচিদের গোবরা আসিয়া মা-ঠাকুরাণীর ছিচরণে গোটা-পাঁচেক টাকা প্রণামী দিয়া বাগানটুকুর ব্যবস্থা করিয়া লয়।

মা-ঠাকুরাণী অর্থাৎ বিন্দু পিসি জানেন—হাজার দর-দস্তুর করিলেও গোবরা মুচি ভক্তি গদ্‌গদ বাক্য ছাড়া একটি আধলাও বেশী খরচ করিবে না। তবু অভ্যাসবশতঃ বলেন, "হ্যাঁ রে গোবরা, গেল বার শুনলাম নারকোলই বেচেছিল সাত টাকার—"

গোবরা হাত জোড় করিয়া বলে, "আর মা ঠাকরোণ, এই বাগানের শীতে হিমে চোর আগলে সেই যে জর হয়েছিল—বদ্যি খরচ তিনটে মাসে গেল দু'কুড়ি ছ' টাকা। তোমার বউরে এখনও যমে মানুষে টানাটানি করছে। ওর যদি কিছু হয়—রইল ঘর-দুয়োর মা-ঠাকরোণ—যেদিকে দু'চক্ষু যায়—"

চোখের জলে গোবরের কথা বন্ধ হইয়া যায়।

বিন্দু-পিসি যেন মনে কাঁপিয়া উঠিয়া বলেন, "আহা, সেরে উঠবে বই কি। এমন জাজ্জ্বল্যিমান সংসার—ভগবান কি এমনিই করবেন! আমি আশীর্ব্বাদ করছি"

মাটিতে মাথা ঠুকিয়া, কাঁদিয়া হাসিয়া—অনেক ভক্তি গদগদ কথা বলিয়া, গোবর মুচি বাহির হইয়া যায়।

বিন্দু-পিসিও জানেন—যথা লাভ। সেবার মধুসূদনের কথায় (মধুসূদন তাঁহার জ্ঞাতি দেবর। তাহাদের বাড়ীতেই সামান্য খরচ দিয়া বিন্দু-পিসি এই দু'টি মাস যাপন করিয়া টাকা ক'টি আদায় করিবার সুযোগ পান) ছিরু ভুঁইমালিকে জমা দিয়া একটি পয়সাও আদায় করা যায় নাই। টাকা বেশী বলিয়া ছিরু একখানি খৎ লিখিয়া বাগান জমা লয়, এবং মনিঅর্ডারে টাকা পাঠাইবার প্রতিশ্রুতি দেয়। তার পর যা হয়। পর বৎসরেও বিন্দুপিসি সে টাকা আদায় করিতে পারেন নাই। ছিরু সাফ জবাব দিয়াছিল, "কোথায় পাব

মা-ঠাক্‌রোণ? এমন জায়গায় জমি—চোর ঠেকাতে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। তার পর চোতের ঝড়ে আম পড়ে ধুলধাবাড়। বেড়া বাঁধার খরচটা উঠল না।"

শাপমন্নির ভয় দেখাইলে ছিরু হাসিয়া বলিয়াছিল, "ভগমান তো তোমার একা নয়—সব দেকছেন উনি। উনিই এর বিচের করবেন।"

সুতরাং গোবর মুচি ছাড়া গত্যন্তর কি? সে যে ঠকাইয়া লয় তাহা বিন্দু-পিসি যেমন বোঝেন—সেও তেমনি। কিন্তু নগদ টাকাটা দিয়া গোবর ধর্ম্মকে বাঁচাইয়া রাখে। আর মুখের সেই ভক্তি-গদগদ বাক্যগুলি! দরাদরি করিবার কালে সেগুলির প্লাবনে বিন্দু-পিসিও কোথায় ভাসিয়া যান। ভাবেন, "ওই আমার ভালো। বিধবার হয়ে কেই বা দেখে শোনে—কেই বা দরদস্তর করে। তবু গোবরের ধর্ম্মভয় আছে।"

পরের সংসারে বিন্দু পিসি স্থান পাইয়াছিলেন, এক সময়ে কর্ত্তৃত্বও করিয়াছিলেন কিছু, কিন্তু তারিণী মানুষ হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে—সূর্য্য উঠিলে কুয়াশা অন্তর্হিত হইবার মতো—বিন্দু-পিসিও অন্তর্হিত হইতেছিলেন। বলেন, "যার সংসার সেই চিনল যখন—আমার কেন মাথাব্যথা! আমার ধর্ম্ম আমি করলাম—ওদের ধর্ম্ম এখন ওরা করুক

বউয়ের নাম তারিণী। দীনতারিণী, কি জগত্তারিণী কিম্বা বিপত্তারিণী—সে কথা কেহ জানে না। বিন্দু-পিসিও বলেন "শতয় আমার কাজ কি বাপু, তারিণী কেমন মিষ্টি নাম!"

কেহ যদি বলিত, পুরুষের নামও তো তারিণী হয়, পিসি।"—বিন্দু-পিসি চক্ষু বিস্তৃত করিয়া জবাব দিতেন, "হয়! মা-দুগ্‌গার এক নাম তারিণী। পোড়া কপাল! ব্যাটা ছেলের আবার ওই নাম রাখে! কালে কালে কতই শুনব!"

বিন্দু-পিসিই যোগমায়াকে অভ্যর্থনা করিলেন, "এসো মা, এসো। আহা—শোকাতাপা মানুষ—পুত্তুর শোকের তুল্য কি আর আছে? বুকে দিবেরাত্তির কুলকাঠের আংরা জেলে রাখে। আহা, চুপ করো মা, চুপ করো। মা না থাকুক—আমরা তো আছি, দু'টি দিন জুড়িয়ে যাও।"

রসগোল্লার হাঁড়িটা তারিণীই হাত পাতিয়া লইয়াছিল। উলঙ্গ ছেলে দু'টি লোলুপ দৃষ্টিতে হাঁড়ির পানে চাহিয়া মায়ের আঁচল ধরিয়া টানিতেছিল। তারিণী ঝাঁঝিয়া উঠিল, "মর্, মর্, আপদরা—দিন-রাত্তির খালি খাই—খাই! এত গিলেও তো আয়িত্তি মেটে না!"

বিন্দু-পিসির বুকের মধ্যেই যোগমায়া শিহরিয়া উঠিল। সন্তানের মৃত্যু কামনা মা করে কি করিয়া!

তারিণী একটুখানি দাঁড়াইয়া হাঁড়ি ও পশ্চাদ্ধাবমান পুত্রসমেত ও-ঘরে চলিয়া গেল। যোগমায়া অশ্রু মুছিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "বউ কি ছেলেদের অমন করে গাল দেয়, পিসিমা?"

"আর মা," ফিস্ ফিস্ করিয়া বিন্দু-পিসি বলিলেন, "দিন-রা ত্তর দাঁতের কসে ফেলে চিবুচ্ছে। বললে আরও বাড়ায়। নিজেরই না-হয় হয় নি, বুঝিও নে কি বুক-ছেঁচা ধন ওরা? কত আরাধনার জিনিস? কে বলবে বলো?—নিজের ভাই-ঝি বলে বলছি নে, এমন—"

কথা শেষ হইল না, তারিণী ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "হাত-মুখ ধোও, ঠাকুরঝি। তোমার ভাই আবার গেছেন গয়েশপুর; আজ বিকেলে আসবেন কিনা—কে জানে।"

"গয়েশপুর কেন?"

"কে জানে, শ্রীমন্তর মা বুঝি মন্তর নেবে। মাঘ মাস হ'লে তো তোমার ভাইয়ের চুলের টিকিটি দেখবার জো নেই।"

বিন্দু-পিসি বলিলেন, "ওই দেখ না, তারিণীর শরীর খারাপ বলে ভালো রকম আদায়-পত্তর না করেই মাঘের শেষেই চলে এলাম। বলি, রয়েছি গিন্নীর মতো বাড়ীতে—ওদের সুখ-সুবিধে তো দেখতে হবে?"

তারিণী কিন্তু বিন্দু-পিসির কথায় বিগলিত না হইয়া কহিল, "কাঁথাগুলো আজ রদ্দুরে দিয়েছিলে, না ভিজে জব্ জব্ করছে। ঠাকুরঝি তো তোমার মতো নয় যে—ভিজে কাঁথা গায়ে জড়িয়েই ঘুম মারবে!"

যোগমায়া বলিল, "কাঁথা ভিজল কেন?"

"কেন আবার? হাতের ঠোর কত! এক গেলাস জল গড়িয়ে খেতে গিয়ে এই কাণ্ড। সংসারের কত সুসারই যে কচ্ছেন!"

বিন্দু-পিসি বলিলেন, "তা বয়েস হয়েছে—রথ-ছড়তের যুৎ নেই, আগেকার মতো গুছিয়ে করতে পারি কি সব?"

তারিণী ঝাঁঝালো কণ্ঠেই বলিল, "বয়েসের সঙ্গে মানুষের সবই কমে—কমে না শুধু মুখখানি। যেমন বচন—তেমনই গেলন!" কথাশেষে তারিণী ফর্‌কাইয়া ওদিকে চলিয়া গেল।

বিন্দু-পিসি চোখের জল মুছিতে মুছিতে চুপি চুপি বলিলেন, "কি করি মা, জীব দিয়েছেন যিনি—তিনি আহারের ব্যবস্থা করেছেন। আজ যদি আমার কিছু হয়—"

তারিণীকে দেখিবামাত্রই তিনি হবিতে চোখে আঁচল ঘষিয়া উত্তাপহীন কণ্ঠে কহিলেন, "যোগমায়া আমার কাছেই শোবে'খন, নেপটা না-হয় তোমার ঘর থেকে পাঠিয়ে দিও।"

তারিণী জবাব দিল, "সে হুঁস আমার আছে! ঠাকুরঝি, তক্তাপোষের ওপর শুয়ো রাত্তিরে—ওঁর আবার ঢুকুর-ঢাকুর আছে তো, জল পড়া আশ্চয্যি নয়।"

যোগমায়া বিন্দু-পিসির পানে চাহিতেই তিনি চারি দিকে চাহিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিলেন, "রাত্তিরে জল খাই কি না—তাই বললে। তা বুড়ো মানুষ অন্ধকারে ফেরে খুঁজে পাই তো কলসী খুঁজে পাই নে।"

"আলো জ্বালেন না কেন?"

"আলো?" বিস্ফারিত চোখে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "তিরিশ দিনে তিরিশটি কাঠি—সবগুলো কি জ্বলে ছাই! দেশলাই জ্বালার শব্দ হ'লেই যা করে। তারিণী বলে বটে ক্যাটকেটিয়ে—কিন্তু হিসিবী মেয়ে।"

ঘর হইতে বাহিরে আসিল তারিণী, বলিল, "বলি সাধে! রোজগার ক'তে তো ঐ একটি মানুষ; ওর মুখের দিকে যদি না চাইলাম তো—"

বিন্দু-পিসি বলিলেন, "দেমাক করে বলছি নে—নিজের ভাই-ঝি বলেও নয়—ওর মতো বুদ্ধি—"

বিন্দু-পিসির এই খোসামোদ যোগমায়ার ভালো লাগিল না। বয়সের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া নীচে নামিলে মিষ্ট ব্যবহার মিলিতে পারে—সম্মান দুষ্প্রাপ্য হইয়াই উঠে। পিসি নিজের মর্য্যাদা নিজে কেন রাখিতে পারেন না? বাৎসরিক সামান্য কিছু আয়ও তো তাঁহার আছে, শ্বশুরভিটায় একখানি চালা করিয়া থাকিলেও তো এমন লাঞ্ছনা ভোগ তাঁহাকে করিতে হয় না। কিন্তু লাঞ্ছনা গায়ে মাখিবার মনোবৃত্তি বিন্দু-পিসির নাই। তিনি হাসিমুখেই তাঁহার অতীত দিনের গল্প করিতে লাগিলেন।

যোগমায়ার কানে সে গল্পের সবই প্রবেশ করিল হয়তো, কিন্তু মনে রাখিবার মতো এক টুকরাও লাগিয়া রহিল না। ভাইয়ের সংসারে অভাব আছে, বাপের সংসারেও ছিল, সদ্য-আগত কোন লোক সেই অভাব বুঝিতে পারিত না।

আহারের লিপ্সা এমনই যোগমায়ার ছিল না, নতুবা সে লক্ষ্য করিলে অবাক হইত—গৃহস্থের ঘরে এই ছন্নছাড়া ভাব কেন?

বিন্দু-পিসি ওবেলা কয়েক প্রকার শাক রাঁধিয়া একখানি পাথরে অল্প অল্প সাজাইয়া শিকের উপর তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। যোগমায়া খাইবার সময় নামাইয়া দিয়া বলিলেন, "মেয়ে আসবে শুনে এটা ওটা রাঁধলাম।"

তারিণী বলিল, "আমার পাতে নয়, তোমার অমত্ত্য রান্না—ও ঠাকুরঝি খেতে পারবে না। হয় নুনে বিষ—নয় আলুনি।"

"এই শুষনি-শাকের ঝোলটুকু খাও তো মেয়ে। নুন কম হয় একটু দিয়ে নাও। কলমি-শাক, উচ্ছে দিয়ে চচ্চড়ি, সজনে ডাঁটার নিম ঝোল।"

যোগমায়া পিসিমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বলিল, "কেন বউ, বেশ তো রেঁধেছেন, পিসিমা।"

তারিণী মুখ মচকাইয়া বলিল, "তুমিই খাও ঠাকুরঝি! ও অমত্ত্যে আমাদের অরুচি ধরে গেছে। একখানা তরকারিতে তো পিসির হয় না।"

বিন্দু পিসী বলিলেন, "আমি যেন নিজের জন্যেই রাঁধি! তোমরা পাঁচজন আছ—"

তারিণী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "অত রকম শাক আর অত রকম অম্বল আলাদা আলাদা না রেঁধে একসঙ্গে যদি বাঁধো তো সময়ের অনেক সুসার হয়।"

শুইবার সময় বিন্দু-পিসী বলিলেন, "তারিণীর ওই কাটাকাটা বুলি, কিন্তু মনটি ভারি সাদা। যখন বললে, ব্যস্, তার পর গঙ্গাজল।"

যোগমায়া বলিল, "আপনি শ্বশুরবাড়ীতে থাকেন না কেন, পিসীমা?"

"কোথায় থাকব মেয়ে? ছোটবেলা থেকেই যে তিন কুল খেয়ে বসে আছি। ভাইয়ের সংসারে গেলাম—সেখানে মাথায় করে রাখলে। রাজা ভাই। বললে, 'দিদি, তারিণীর সংসারে আমার কেউ নেই, তার সংসারটা গুছিয়ে দিয়ে এসো।' তাই এলাম।"

খানিক পরে যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিল, "বউ চড়া কথা বললে আপনার কষ্ট হয় না?"

"কষ্ট! ওকে যে হাতে করে মানুষ করেছি আমি!" অন্ধকারে বিন্দু-পিসি হাসিলেন। "ছেলেবেলা থেকে ও অমনি অভিমানী।"

"আমার কিন্তু লাগে।" যোগমায়া সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করিল।

"আহা, তা লাগবে বইকি মেয়ে। আমায় যে তুমি ভালোবাসো। তা দু'দিন থাকলেই দেখবে ওসব কিছু নয়।"

যোগমায়া বলিল, "আমার বাপের আমলে দেখেছি—মা কাউকে চড়া কথা বলতেন না। এত খাটতেন দিন-রাত, সর্ব্বদাই হাসি-মুখ। সংসারে যেখানে কথান্তর হয় না, সেইখানে মা-লক্ষ্মী বিরাজ করেন, পিসিমা।"

"সে কথা একশোবার মেয়ে। কিচি-কিচি ঝিকি ঝিকিতে কি মা-লক্ষ্মী তিষ্ঠুতে পারেন! কক্ষনো না। তুমি এসেছ—শোকাতাপা মানুষ—তোমার তো ভালোই লাগবে না।"

"সত্যি ভালো লাগে না আমার।"

যোগমায়া চুপ করিল। অন্ধকারে বোঝা গেল না সে কাঁদিতেছে কি না। বিন্দু-পিসিও খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "মেয়ে, ঘুমুলে?"

"না।" অস্পষ্ট স্বর।

"আলোটা জ্বালব?"

"না।"

"একটু জল খাবে।"

"না।"

বিন্দু-পিসি আরও খানিকক্ষণ থামিয়া বলিলেন, "তবে আমি একটু জল খাই মা।"

জল ঢালার শব্দ যোগমায়া শুনিল। খানিকক্ষণ ধরিয়া চক্ চক্ একটা শব্দও উঠিল যেন। যোগমায়া কহিল, "ঘরে আদুড় দুধটুধ নেই তো, পিসিমা? বেরালে যেন চক্ চক্ করে কি খাচ্ছে।"

চাপা কণ্ঠে বিন্দু-পিসি উত্তর দিলেন, "না।" সঙ্গে সঙ্গে প্রবল কাসির শব্দে ঘর ভরিয়া উঠিল।

যোগমায়া ব্যাকুল হইয়া কহিল, "কি হ'ল, পিসিমা?"

ঢকঢক্ করিয়া জল পান করিয়া বিন্দু-পিসি বলিলেন, "জল গলায় বেধেছিল, মা। ও কিছু নয়। কালী, দুর্গা, তারা, শয়নে পদ্মনাভঞ্চ—"

অবিলম্বে বিন্দু পিসির নাসিকা-গর্জ্জন শোনা গেল। অশ্রুপ্লাবিত চক্ষে উপাধান সিক্ত করিয়া যোগমায়া জাগিয়া রহিল। মনে আজ অতীতের আনাগোনা সুরু হইয়াছে। বহুদিনের হারানো-জনের স্মৃতিতে রাত্রি অন্ধকারের সঙ্গে অশ্রুময়ী হইয়া উঠিল। বুকের কাছটা এমন খালি খালি বোধ হইতেছে! মাগো!

খুব ভোরে উঠিয়াই যোগমায়া পাড়া বেড়াইতে গেল। খানিকটা পথ যাইতেই কুমুদিনীর সঙ্গে দেখা। না চিনিবারই কথা। সৌভাগ্যবতী এয়োতির কোন চিহ্নই কুমুদিনীর মধ্যে খুঁজিয়া মেলে না। কোলে একটি ছোট ছেলে, হাত ধরিয়া আর একটি মেয়ে—বছর দু'য়েকের বড়ই হইবে হয়তো—কি যেন আব্দারের ভঙ্গিতে মায়ের ডান হাতখানি ধরিয়া মাটিতে শুইয়া শুইয়া পড়িতেছে। গায়ে তাহার শত-তালি-দেওয়া ঝলঝলে একটা গরম কোট—বহু বৎসর মালিকের সেবা করিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে, কোলের খোকাটি অবশ্য আঁচল ও বুকের উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া স্তন্যপানের জন্য মায়ের চুল ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। কুমুদিনীর পরণে সাদা থান কাপড়—খাটো এবং ময়লা, চুল রুক্ষ, হাতে কোন অলঙ্কারের চিহ্ন নাই। কুমুদিনীকে দেখিলেও বুঝা যায় না—সে কোন কালে বধূরূপে কোন বাড়ী শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে।

সে-ই ডাকিয়া বলিল, "কি লো যুগি, কবে এলি?"

যোগমায়া ফিরিয়া বলিল, "তুই—কুমুদিনী?"

কুমুদিনী মুখে হাসি টানিয়া কহিল, হ্যাঁ ভাই, কপাল পুড়েছে আজ বছর দুই হ'ল। এই কোলের কাঁটাটা তখন পেটে।"

যোগমায়া বলিল, "আহা, কথার ছিরি দেখ না—কত আরাধনার ধন ছেলে হ'ল—কাঁটা!"

কুমুদিনী বলিল, "সাধ করে বলি ভাই? উনি স্বগ্‌গে গেলেন না তো—আমায় পথে বসিয়ে গেলেন—তিনটি মেয়ে—দুটি ছেলে নিয়ে অকূল পাথারে ভাসছি। ঝাড়া হাত-পা হ'ত—গতর খাটালে যেখানে হোক্—"

যোগমায়া বলিল, "তা বাপের বাড়ী পড়ে আছিস কেন ভাই? যেখানে জোরের জায়গা—"

কুমুদিনী বলিল, "জোরের জায়গা! মেয়েমানুষের জোরের জায়গা কোথাও আছে নাকি—এক স্বামী ছাড়া!"

যোগমায়া অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিল।

কুমুদিনী বলিতে লাগিল, "নইলে এতগুলি কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে আমায় ভাসতে হয়? রাঢ়দেশে আমার বিয়ে হয়, এখনও শ্বশুর-শাশুড়ী বেঁচে, তিন দেওর—ভাসুর। ধেনো জমি যা আছে—মোটা

ভাত মোটা কাপড়ের অভাব কোন দিন হবে না বলেই বাবা দিয়ে দিলেন ওখানে।" একটু থামিয়া বলিল, "কিন্তু ভাই—অদেষ্টে যার নেই কো ঘি, ঠক্‌ঠকালে হবে কি! আমারও হয়েছে তাই।"—বলিয়া ম্লান ভাবে হাসিল।

যোগমায়া প্রশ্ন করিল, "কেন, খাবার পরবার ভাবনা যখন নেই—তখন সেইখানে থাকাই তো ভালো। এরা তো ওঁদেরই বংশধর।"

কুমুদিনী বলিল, "উনি যত দিন বেঁচে ছিলেন—তত দিন ওরা ছিল ধন, মাণিক, সোনা। এখন হয়েছে শুয়োরের পাল। পাঁচ-ছ'টা মানুষের দু-বেলা দেড় কাঠা চালের কম তো দিন যায় না।"

যোগমায়া বলিল, "তা হোক্, তবু সেইখানে থাকাই তোর উচিত।"

কুমুদিনী বলিল, "উচিত যে সে-কথা সবাই বলবে, আমিও জানি। কিন্তু কপালে না থাকলে শ্বশুরবাড়ীর ভাত ক'টা মেয়ের ভাগ্যে জোটে, যুগি? তুই বলবি—সেখানে হাজার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা খেলেও—সেই ভাত খাওয়ায় অপমান নেই। দাসীবিত্তি সেখানে—এখানেও। তবে—"

যোগমায়া বলিল, "তা আমি বলছি নে। এগুলোকে মানুষ তো করতে হবে।"

কুমুদিনী বলিল, "মানুষ করা! ওদের বাঁচিয়ে রাখবার কর্ত্তা ভগবান। পাখীর বাচ্চাদের যিনি আহার দেন—গরীব দুঃখীও তাঁর রাজত্বে দিনান্তে এক মুঠো খেয়ে জীবন ধারণ করে—তিনিই বাঁচিয়ে রাখবার মালিক ভাই। সেখানকার কথা শুনবি? তারা আমার কুকুর-শেয়ালের মতো দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে। জমির এক মুঠো ধান—তাও নাকি"—বলিতে বলিতে কুমুদিনী থামিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। যে মেয়েটি মায়ের আঁচল ধরিয়া বায়না করিতেছিল—সে এতক্ষণ অবাক হইয়া যোগমায়ার সালঙ্কারা মূর্ত্তির পানে চাহিয়া ছিল, হঠাৎ মায়ের মুখের কাছে মুখ আনিয়া কহিল, "মা—বাড়ী।"

কুমুদিনী আপনাকে সংবৃত করিয়া আগ্রহভরা কণ্ঠে কহিল, "আচ্ছা যুগি, বাপ থাকতে ছেলে মারা গেলে নাকি বউ সে বিষয় পায় না? তুই জানিস—আইন?"

ঘাড় নাড়িয়া যোগমায়া বলিল, "না ভাই। আইন না থাকুক, ধর্ম্ম তো আছে।

কুমুদিনী বলিল, "অনাথার মুখের পানে চাইবার কেউ নেই ভাই। তোর ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ে, যুগি? আমিই যখন তখন বড় গলা করে বলতাম না—মেয়েমানুষের স্বামীর ঘর ছাড়া আর কিছু আছে নাকি? ভগবান আমার সে দর্প চূর্ণ করেছেন।"

কুমুদিনীর চোখের জলে এমন সকাল বেলাটা কলুষিত হইয়া উঠিল।

বাল্যকালের পাঠ শেষ হইয়াছে। পৃথিবীর নূতন আলো, বিচিত্র রং, অপরূপ শোভা আর অফুরন্ত প্রাণ-প্রবাহ ইহারই মধ্যে স্তিমিত হইয়া আসিতেছে যেন। আশার মধ্যে যে সৃষ্টির আনন্দ-সৌধ প্রতিদিনের আলো-অন্ধকারের খেলার সঙ্গে আপনিই গড়িয়া উঠিত—যৌবনের শেষপ্রান্তে সেই সৌধ ক্রমশঃই ভঙ্গুর বলিয়া বোধ হইতেছে। চারিদিকে বিয়োগের বেদনা ঘনাইয়া উঠিতেছে। যোগমায়ার মনের ব্যথা শুধুই কি যোগমায়ার মনে লাগিয়া আছে, এই পৃথিবীর চারিদিকে—সঙ্গী-সাথীদের মুখে—চোখে—কাহিনীতে ও অশ্রুতে সে যেন পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। কি করিবে কুমুদিনী—এতগুলি সোনার বাছা লইয়া কতকাল আর লাঞ্ছনার অন্ন মুখে তুলিয়া ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া সুখের স্বপ্ন দেখিবে?

"অপির খবর শুনেছিস্? অপির?"

কুমুদিনীর প্রশ্নে যোগমায়ার চমক ভাঙিল। সে কহিল, "না তো। অনেক দিন তাকে দেখি নি?"

কুমুদিনী বলিল, "দেখবিও নে আর। সে-ও জ্বালা জুড়িয়েছে।"

"কেন? অপি কি তবে—"

কুমুদিনী বলিল, "ভাগ্যিমানীর মরণ নয় রে—বড় কষ্টের মরণ। যে-আঁচলের চাবি দুলিয়ে সে গরব করত—সেই আঁচলই গলায় বেঁধে—"

"আহা!" যোগমায়ার চোখ চিক্ চিক্ করিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পরে সে কহিল, "এমন ধারা হ'ল কেন?"

"কেন? ভাগ্যি। এইমাত্তর বলছিলাম না—একজন ছাড়া মেয়েমানুষের আর কেউ নেই। কিন্তু সে কথাও সত্যি নয় ভাই। অপির মিত্যুর কথাটা জানলে মনে হয়—আমরা জাতটাই অখদ্যে। অপির স্বামী মদ খেয়ে এসে এক দিন তাকে লাথি মেরেছিল। আর এক দিন একটা মেয়েকে এনে—"

"থাক্ ভাই, আর শুনতে পারি নে।" চোখ মুছিতে মুছিতে যোগমায়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।

পিছন হইতে কুমুদিনী ডাকিয়া কহিল, "বিকেলে যাব তোদের বাড়ী, থাকিস।"

যোগমায়া চলিয়া গেল।

দুঃখ আর যোগমায়ার মনে নাই। কিম্বা দুঃখের অতলস্পর্শী সমুদ্রে ডুবিয়া তাহার দুঃখবোধ বিলুপ্ত হইয়া গেল। মানুষ কত অসহায়, কত পর-নির্ভরশীল। সন্তানহারার দুর্ভাগ্য মায়ের সব চেয়ে বড় দুর্ভাগ্যকে টানিয়া আনে, কিন্তু নানা প্রকারের আরও যে-সব দুর্ভাগ্য সংসারে তীক্ষ্ণমুখী শরের মতো নারীর হৃদয় লক্ষ্য করিয়া জ্যাযুক্ত ধনুকের মধ্যে যোজনা করা রহিয়াছে—কাহার ভাগ্যে কোন্ অশুভ লগ্নে সেই জ্যামুক্ত তীর ছুটিয়া আসিয়া বুকে বিঁধিবে—কে বলিতে পারে?

বিন্দু-পিসি বলিলেন, "মেয়ে, সক্কালবেলায় কোথায় গিয়েছিলে? হাত-মুখ ধুয়ে একটু জলটল মুখে দাও। মন্তর নিয়েছ তো? মন্তর? এখনও নেও নি?"

যোগমায়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "এখন জল খাব না, একেবারে বাঁওড়ে নেয়ে এসে—"

"ওমা, সে কি কথা! পিত্তি পড়বে যে। আমরা রাঁড়ি-বালতি মানুষ—আমাদের কথা আলাদা। এ কাঠ পেরাণ বেরোবার নয়—"

যোগমায়া পা ধুইয়া দাওয়ার উপর বসিয়া বলিল, "প্রাণ কারও কাঠ নয়, পিসিমা। যখন যায়—ঠুস্ করেই বেরিয়ে যায়।"

"আহা, বাছা রে! কথা শুনলে বুক জুড়িয়ে যায়। ব'সো মা, ব'সো। এই সকালবেলার কম্ম—কুটনোগুলো কুটে রাখি। তারিণী তো চেয়েও দেখে না এসব।"—বলিয়া বটির উপর উবু হইয়া বসিয়া তিনি আলুর খোসা ছাড়াইতে লাগিলেন।

যোগমায়া নীরবে বসিয়া রহিল। বিন্দু-পিসি বলিতে লাগিলেন, "এই মোচার ঘণ্ট হোক, বেগুন-নিমপাতা দিয়ে ভাজা হোক্, সজনে ফুলের চচ্চড়ি, মটর ডালের বড়া দিয়ে নাউয়ের ঝাল—আর—"

তারিণী কোথা হইতে আসিয়া বলিল, "সবগুলো তরকারিই কি একদিনে গিলতে হবে? লাউ আজ থাক, ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে অত আলুই বা কুটছ কেন? কোন যদি একটা বিলিব্যবস্থা আছে!"

বিন্দু-পিসি অবাক হইয়া কহিলেন, "ওমা বলে কি তারিণী! দেখতে এই এতগুলো তরকারি—রাঁধলে আর কতটুকু? পাঁচখানা মুখে দিলে কি কুলোয়, মা? তুমিই বলো তো মেয়ে?"—বলিয়া যোগমায়ার পানে চাহিলেন।

যোগমায়া বলিল, "ওতেই হবে পিসিমা, কাল বরঞ্চ লাউয়ের ঝাল রাঁধবেন।"

বিন্দু-পিসি হাসিয়া বলিলেন, "কাল হবে? আচ্ছা, কালই হবে। তবে কচি নাউ শুকিয়ে যাবে না? খানিকটা নাহয় মুগের ডালে দেই।"

"তাই দেও। ও লাউ না কুটে যখন স্বস্তি নেই—তখন তাই দাও।"

চলিয়া যাইতে যাইতে তারিণী ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "হ্যা পিসি, সক্কালবেলায় আমার ঘরে ঢুকেছিলে?"

"সক্কালবেলা? ওমা সে কি কথা! এই তো উঠোন ঝাঁট দিয়ে—রান্নাঘর নিকিয়ে—কাপড় কেচে সবে কুটনোর পেতে ডালা নিয়ে বসেছি।"

"তবে ঘরময় রসের ছড়া কেন? যে ছিকেতে কাল রসগোল্লার হাড়িটা রেখেছিলাম—হাঁড়িটা রয়েছে কাৎ হয়ে, অনেকগুলো রসগোল্লাও যেন কম কম মনে হ'ল। আর ঘরের দুয়োর পর্য্যন্ত রসের ফোঁটা পড়েছে।"

"ওমা বলিস কি! যে দস্যি ছেলেপিলে তোর—"

"দস্যি হলেও তারা উঁচুদিকে কি হাত দিয়ে নাগাল পায়?"

বিন্দু-পিসি হাসিয়া বলিলেন, "তোর ছেলের কথা আর বলিস নে, তারিণী। পরশু দেখলাম ঘড়েঞ্চে টুলটা ওই ওখান থেকে টেনে উঠোনের পেয়ারা গাছতলায় নিয়ে গেছে। কি না—গাছে কলসী বেঁধে দেবে, পাখীরা বাসা করবে।"

এমন সময় বড়ছেলে মণি কোথা হইতে নাচিতে নাচিতে আসিয়া বলিল, "ও দিদা, আর একটা রসগোল্লা দিবি?"

তারিণী তাহার দিকে ফিরিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "হ্যারে মণে, সকাল বেলায় কটা রসগোল্লা খেয়েছিস? ঠিক করে বল্, নইলে বিতিয়ে পিঠের ছাল তুলে দেব।"

মণি নাকি সুরে কাঁদিয়া কহিল, "বাঃ রে, দিঁদাই তোঁ বঁললে—'মণি, রসগোল্লা খাঁবি'?"

বঁটি কাৎ করিয়া বিন্দু-পিসি চোখ দুটি বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, "বললাম তোকে? তুই তো বললি, 'ওই ছিকেয় আছে, পেড়ে দাও না।' নইলে কোথায় তারিণী কি রাখলে—আমি জানব কোত্থেকে?"

মণি প্রতিবাদের ভঙ্গিতে কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া তারিণী বলিল, "তুমি আবার জানো না? পেটের ভেতর লুকিয়ে রাখলে সে জিনিসের সন্ধান তুমি করো—আর—"

"বউ!" যোগমায়ার ধীর গম্ভীর স্বর শুনিয়া তারিণী চুপ করিল। যোগমায়ার শান্ত নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বরে এমনই একটি সংযত শাসনের ইঙ্গিত ছিল—যাহা এই তুচ্ছ বাক্‌বিতণ্ডার অশোভনত্বকে চোখের সম্মুখে উলঙ্গ করিয়া প্রত্যক্ষ করাইল। শাশুড়ী নহে—নিজেরই পিসি, যোগমায়ার সামনে তাঁহাকে লাঞ্ছিত করার যত কারণই থাকুক না কেন, দৃষ্টিকটু তো বটেই।

লজ্জায় মাথা নামাইয়া তারিণী বলিল, "তুমি বোঝ না ঠাকুরঝি। সত্যি কথার মার নেই। একটা রসগোল্লার জন্যেও বলছি নে। পিসির স্বভাবই হ'ল ওই: হাতে দই—পাতে দই, তবু বলেন, কই, কই!"

"তা বলুন। নিজের জন্যে তো তিনি বলেন না, তোমাদের জন্যেই বলেন।"

তারিণী কি প্রতিবাদ করিতে গেল, বাধা দিয়া যোগমায়া বলিল, "আর কোন কথা নয়, কাজে যাও।"

তারিণী চলিয়া গেলে বিন্দু-পিসি বলিলেন, "তারিণীর বুদ্ধি বড় কম। রাগলে জ্ঞান থাকে না তো, কাকে যে কি বলে।"

যোগমায়া গাত্রোত্থান করিতেছে দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, "লাউটা কুটেই ফেলি—কি বলো মেয়ে? তেবাষ্টে শুক্‌নো লাউয়ের ঝাল কি ভালো হয়, আজই রাঁধি।"—বলিয়া যোগমায়ার উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া লাউয়ের খোসা ছাড়াইতে লাগিলেন।

দুপুরবেলায় বাড়ীটা খাঁ-খাঁ করিতে থাকে। দাওয়ার ওধারে কম্বল বিছাইয়া বিন্দু-পিসি নাক ডাকাইতেছেন, ঘরের মেঝেয় তারিণীও কম্বল বিছাইয়া শুইয়াছে। ঘুম নাই শুধু ছেলেদের চোখে। তা তাহারাও বাড়ী নাই। মায়ের আলস্যের সুযোগে—নূতন দুরন্তপনার আবিষ্কারে গৃহত্যাগ করিয়াছে। খানিক দাওয়ায় বসিয়া যোগমায়া ঘরের পিছন দিকে বেড়াইতে গেল। ও দিকটায় হরিমতী অর্থাৎ খুড়িমার ভিটা ছিল। খুড়িমা বহু দিন হইল গঙ্গালাভ করিয়াছেন, ভিটার ইঁট-কাঠ কিছু নাই। মেয়েরা আসিয়া ইঁট-কাঠ বেচিয়া চতুর্থীর শ্রাদ্ধ করিয়াছে এবং ঐ পোড়ো ভিটা লইয়া দুই বোনের মনান্তরও হইয়া গিয়াছে। চতুর্থীর শ্রাদ্ধের পর দুই বোনের এমন শাপ-শাপান্ত হইয়াছিল—যাহা অতি বড় শত্রুদের মধ্যেও সচরাচর ঘটে না। অবশেষে পাড়ার পাঁচজনে মধ্যস্থ থাকিয়া ঐ ভিটা বহু অনুরোধ করিয়া রামজীবনবাবুকেই কিনাইয়াছিলেন। দুই বোনে টাকা ভাগ করিয়া লইয়া, আর একবার মড়াকান্না কাঁদিয়া ভিটা ছাড়িয়া গিয়াছিল। সে আজ পাঁচ বছরেরও উপরের কথা। স্বাস্থ্যসম্পন্ন ঝাঁকড়া লেবু গাছটা বুঝি খুড়িমার বিয়োগ-ব্যথা সহ্য করিতে পারে নাই, বৈশাখের খর রৌদ্রে একদা শুকাইয়া গিয়াছিল।

পোড়ো জমির উপর দাঁড়াইয়া আজ সেদিনের কথা যোগমায়ার মনে পড়িতেছে। কালকাসুন্দা ও বাদুড়নখীর ঘন বনে ভিটা আচ্ছন্ন হইয়া আছে, চলিতে গেলে বাদুড়নখীর ফল কাপড়ে আটকাইয়া যেন একটু দাঁড়াইবার জন্য মিনতি করিতে থাকে। একটু দাঁড়াইলেই অতীতের দিনগুলি যোগমায়ার চোখের সামনে ভাসিয়া আসিতে থাকে। ভিটা ঠিক তেমনই পড়িয়া আছে। খুড়িমার অভিশাপ, লেবু গাছ লইয়া ঝগড়া, এ বাড়ীর সঙ্গে মুখ-দেখাদেখি বন্ধ—কালপ্রবাহে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। প্রবল কালের সম্মুখে কত ঘটনাই যে ভাসিয়া যায়, স্মৃতির শুষ্ক মাল্যে শুধু গাঁথা থাকে তার দলগুলি। সুবাস নাই, সৌন্দর্য্য নাই, বর্ণ নাই—শুধু সুতায় গাঁথা শুকনা পাপড়ি কতকগুলি! অতীতকে সম্মুখে রাখিয়া তবু মানুষ নিজেকে সংশোধন করিতে শিখিল না আজও। ক্ষুদ্র ঈর্ষা-দ্বন্দ্বের স্বার্থ-সংঘাতে প্রতিনিয়ত ক্ষুব্ধ হওয়াই বুঝি জীবনের ধর্ম্ম!

ওদিকের বাগানে আমের মুকুল ধরিয়াছে অজস্র! ঝোপে যেন কোকিলও ডাকিতেছে। এবার মাঘের শেষেই শীতটা শেষ হইয়া বসন্তের হাওয়া বহিতে সুরু হইয়াছে। মাঘের শেষে ঝড়জল হয় নাই। হয়তো ধন্য রাজার পুণ্য দেশ এ নহে, কিন্তু মাঘের ঝড়-জলে আম্রমুকুল ও সজিনার ফুলের যে ক্ষতি হয়—তাহা হয় নাই। গাছ আলো করিয়া সজিনার ফুল ফুটিয়া আছে, ডাল নুইয়া বোল ধরিয়াছে। পুণ্য আর কাহারও না থাকুক, গরীবরা সস্তা আম ও অজস্র ফুল ও ডাঁটা খাইয়া তবু কয়েকটা মাস উদর ভরাইতে পারিবে।

"আরে, বাড়ীতে সব মরে-হেজে গেল নাকি? মণি—ওরে মণে—"

হরির গলা বোধ হইতেছে না? তাড়াতাড়ি যোগমায়া বাড়ীর মধ্যে আসিল।

"কে—দিদি! তুমি কখন এলে?"

"কাল।" যোগমায়ার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। আত্মীয়-পরিজনকে দেখিলে সহানুভূতি-প্রয়াসী দুর্ব্বল মন তখনই গলিয়া পড়ে বুঝি। প্রিয়জনকে ব্যথা বণ্টন করিয়া দিবার জন্য মন চঞ্চল হইয়া উঠে। হরি পুঁটুলি নামাইয়া যোগমায়াকে প্রণাম করিল।

সে তাহার মাথায় হাত রাখিয়া ধরা গলায় বলিল, "ভালো আছিস তো?"

মাথা নাড়িয়া হরি বলিল, "গয়েশপুরে শ্রীমন্তর মা মন্তর নিলে; সেখান থেকে গেলাম টিয়াবালির ঘোষেদের বাড়ী ছেলের অন্নপ্রাশনে; সেখান থেকে মদ্দই-শ্রীরামপুর—পাকা দেখায়।"

যোগমায়া সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, "হ্যাঁরে, মন্তর নিতে হ'লে কি কি উদ্যুগ করতে হয়?"

পা ধুইতে ধুইতে হরি হাসিয়া বলিল, "নেবে নাকি মন্তর? বলো তো—"

যোগমায়া বলিল, "হ্যাঁ, তুইও যেমন! আমার বরাতে আবার মন্তর নেওয়া হবে!"

"মন্তর নেওয়ার আর হাঙ্গামা কি।"

"হাঙ্গামা নয়, রোজ দু'বেলা জপতপ—"

"দু'বেলা না হাতী। একবেলা—তাও দু'মিনিটে সারা যায়। দশবার আঙুল ঘোরানো বই তো না।"

যোগমায়া কহিল, "বলিস্ কি, হরি! তোরা মন্তরদাতা গুরু—তোরা বলিস্ এই কথা!"

হরি বলিল, "বলি সাধে, যে দিনকাল পড়েছে—খালি কূটকচালে কথা জিজ্ঞাসা করে সব। মন্তর নেওয়ার সময় যা দরদস্তুর করে—যেন হাটে মাছ কি তরকারি কিনছে।"

"কেন রে, তোরা বুঝি ফর্দ্দটা খুব ভারি করে ওদের কাঁধে চাপাস?"

"ভারি কিসের? গুরু-প্রণামী ছাড়া কাপড়ই দিতে চায় না। লক্ষ্মীনারায়ণের জোড়—দেবার বেলায় দেয় গামছা, দশ-হাতির জায়গায় পাঁচ-হাতি—।"

যোগমায়া বলিল, "তা গরীব যারা—তাদের ওপর পীড়ন করা কি ভালো? তুই বোস্, বউকে ডেকে তুলি। দু'টি গরম গরম ভাত—"

হরি মাথা নাড়িয়া বলিল, "খিদে পেলে তোমার সঙ্গে বসে গল্প করতাম কি না, সে ধাতই আমার নয়। পথে আসতে বাগাঁচড়ায় রায়মশায়ের সঙ্গে দেখা। খুব এক পেট খাইয়ে দিলেন—ভাত-মাংস।"

"তুই মাংস খেলি? বাবার সময়ে তো বাড়ীতে মাংস আসত না।"

"বাঃ, মা বাগ্‌দেবীর প্রসাদ—না বলতে আছে? ছেলেগুলোও মাংস মাংস করে বলে আলাদা একটা হেঁসেলই ওর হয়েছে।" একটু থামিয়া বলিল, "হ্যাঁ, গরীবের কথা বলছিলে না? ওদের স্বভাবই হ'ল ওই। জমিদারের খাজনা দিতে গিয়ে কাছার খুঁটে টাকা লুকিয়ে রাখে। গুরুর প্রণামীর বেলাতেও মুখে ধান শুকোয়—খেতে পাই না, অজন্মা—এই সব।"

যোগমায়া অল্প হাসিয়া বলিল, "তা জমিদার আর গুরু যদি একই ধাতের হয়—একই রকম ব্যাভার পাবেন বই কি।"

"একই ধাতের! আমরা কি টাকার জন্যে ওদের শাস্তি দিই, মারি?"

"মারিস নে? পরলোকের ভয়—নরক-বাসের ভয়—ও যে দু'ঘা মারার চেয়ে অনেক বেশী।"

হরি মাথা নাড়িয়া বলিল, "পরলোকের ভয় দেখানোও আর বেশী দিন চলবে না।"

যোগমায়া একটু থামিয়া বলিল, "যাই হোক্, মন্তর নেওয়ার কি কি আয়োজন বললি না তো?"

হরি বলিল, "আয়োজন ভারি! গুরুর কাপড়, লক্ষ্মী-নারায়ণের জোড়, ফুল-বিল্বিপত্র—"

যোগমায়া বলিল, "যে সে দিনে তো মন্তর নেওয়া চলে না?"

"তা কি করে হবে? দীক্ষা-গ্রহণের দিন পাঁজিতেই আছে। মাঘ আর বৈশাখ প্রশস্ত মাস। তা তুমি মন্তর নিলে মুখুয্যেমশায় কিছু বলবেন না?"

"কি আর বলবেন? তিনি থাকেন চাকরিস্থলে। তাঁর আপিসের ভাত আমায় রাঁধতে হবে না, যে তাড়া। তা ছাড়া বয়স তো হচ্ছে, পরকালের চিন্তা এখন থেকে যদি না করব তো কবে হবে ওসব?"

"হ্যাঁ, এখন থেকেই বুড়ুটেপনা! ওসব চলবে না, দিদি।"

"ধর্ম্মকর্ম্মের আবার কালাকাল আছে নাকি? যখন চলতে পারব না, চোখে পাব না দেখতে, কানে পাব না শুনতে—তখন কি সাধনভজন হয়? খাবার ইচ্ছে না থাকলে উপোস দেওয়ার কি

মাহাত্ম্য? তা ছাড়া মন্তর নিলে শুনেছি মনও অনেকটা সুস্থির হয়।"

যোগমায়ার স্বরে অশ্রুজলের আভাস পাইয়া হরি আর তর্কের জের টানিল না। শুধু কহিল, "তাই নিয়ো, বোশেখ মাসেই নিয়ো। একজন সাধক আছেন আমার সন্ধানে, যদি বলো—"

যোগমায়া বলিল, "কুলগুরু ত্যাগ করতে নেই হরি, দীক্ষা আমি তাঁরই কাছে নেব।"

"বেশ তো, বেশ তো। সাধন-ভজনের কথা বললে কিনা—তাই বলছিলাম। দীক্ষা কুলগুরুর কাছে নিলেও—ধর্মগুরু বরণে বাধে না।"

"আগে একটা দীক্ষাই তো নিই। দেখ, হরি, একটা কথা তোকে জিজ্ঞাসা করি, বিন্দু-পিসির কথা। বুড়োমানুষ—তোদের সংসারে আছেন, খাটছেন কত—তাঁকে দুর্বাক্যি বলাটা ভালো নয়। কারও মনে ব্যথা দিয়ে কথা বলতে নেই।"

হরি বলিল, "বুড়ীর গুণ কত! সংসার গোছানোর নাম করে যা ডোক্‌লাপনা করে! এত এত তরকারি খায়, এটা-ওটা চুরি করে খায়—"

"ছিঃ—ছিঃ, বুড়ো মানুষ, খায়ই যদি—তাই নিয়ে হৈ চৈ করা কি ভালো? বুড়ো হ'লে অমন মানষের খাওয়ার ঝোঁক হয়। তোরও হবে—আমারও হবে।"

"হাঃ, অত বুড়ো থাকবার আশীর্ব্বাদ আর ক'রো না। বেশী বুড়ো হ'লে পরকালের চিন্তা গিয়ে—খালি সংসারে জড়িয়ে পড়ে মন।"

"তবেই বোঝ, ধর্মকর্মের বয়স ও নয়।"

ভাই-বোনের কথায় বাধা পড়িল। চোখ মুছিতে মুছিতে তারিণী বাহির হইতেছিল, হরিকে দেখিয়া একগলা ঘোমটা টানিয়া দু'পা ঘরের ভিতর পিছাইয়া গেল। খানিক পরে শাড়ীখানা ভালো করিয়া পরণে আঁটিয়া বাহিরে আসিয়া মৃদু কণ্ঠে যোগমায়াকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ঠাকুরঝি, জিজ্ঞেস করো না ভাই—ভাত চড়াব?"

মৃদু কণ্ঠ এত মৃদু নহে যে অন্যের অশ্রুতিগম্য। হরিই উত্তর দিল, "পতিব্রতা স্ত্রীর ধর্ম্ম দেখলে তো দিদি! দিব্যি ঘুমিয়ে উঠে আমার খবর নিতে এলেন। আমি যে ঘণ্টাখানেক ধরে এখানে বক্ বক্ করছি—"

তারিণী মৃদু কণ্ঠেই বলিল, "আচ্ছা ঠাকুরঝি, ঘুম না মানুষের মরণ। ডেকে তুললেই তো হয়।"

"ডাকি নি আবার? বাড়ী ফাটিয়ে ফেললাম। তোমাদের যে কুম্ভকর্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল—তা কেমন করে জানব বলো?"

ক্রুদ্ধা তারিণী এবার প্রকাশ্যেই বলিল, "তোমরা তো রামচন্দ্র, তা হ'লেই হ'ল।" দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া সে রান্নাঘরের দিকে গেল।

হরি হাসিয়া বলিল, "তোমার রাগ পেলেও—আমার খিদে নেই। উনুন ধরিয়ো না আর এই অবেলায়। এক জায়গায় নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছি।"

হরির চীৎকারে দাওয়ার ও-প্রান্তে বিন্দু-পিসি জাগিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "কে, হরি এলে? ওমা, কিছুই টের পাই নি আমি! একবার ডাকতেও কি নেই?"—বলিতে বলিতে উঠিয়া আসিলেন।

হরি বলিল, "ঘুম হ'ল?"

"আর ঘুম! কাক-নিদ্রে—এই সবে মাত্তর চোখ বুজেছি আর—"

হরি মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা বটে! তোমাদের পিসি-ভাইঝির ঘুম অমনি পাতলা। এই পুঁটুলিটা তোল, পিসিমা। উনি তো তুলবেন বলে বোধ হয় না।"

বিন্দু-পিসি হাসিমুখে পুঁটুলিতে হাত দিয়া টিপিয়া টিপিয়া জিনিসগুলি আন্দাজ করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "মেয়েটা ওই রকম। ছেলেবেলা থেকেই কেউ কিছু বলেছে কি—মেয়ের ঠোঁট ফুলেছে। দাদা আর বৌয়ের আদরে···ওমা দু'টো লাউ এনেছ যে! দেখলে তো মেয়ে—বলে লাউ কুটো না, কাল হবে। জিনিস বাসি করে রাখা আমি পছন্দ করি নে। হরির দৌলতে আমার তরকারির অভাব!"

বৃদ্ধার চোখ দু'টি চক্ চক্ করিয়া উঠিল। পরম মমতাভরে তিনি ভারি পুঁটুলিটি কাঁখে তুলিয়া লইলেন।

৪

গ্রামে সাধু-সন্ন্যাসী আসিলে সে খবর চাপা থাকিবার কথা নহে। সালঙ্কারে সবিস্তৃত সেই কাহিনী যোগমায়াও একদিন শুনিল। গ্রাম হইতে দুই ক্রোশ দূরে—পানপাড়ার শ্মশানঘাটে—এক সাধু আসিয়া ধুনি জ্বালিয়াছেন। যেমন রূপ সাধুর—তেমনই কি মিষ্ট কথা! যোগবলের অলৌকিক মাহাত্ম্যে তাঁহার বয়স নিরূপণ করিবার উপায় নাই। কিন্তু গ্রামস্থ অতিবৃদ্ধেরা শপথ করিয়া বলিতে পারেন, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বছর দুই পূর্ব্বে এই

সাধু একবার পানপাড়ার এই শ্মশানঘাটেই আসন করিয়াছিলেন। তখনও তাঁহার দেহবর্ণ তপ্তকাঞ্চন তুল্য ছিল, তখনও পিঙ্গল জটাভার দাঁড়াইলে পায়ের গোড়ালিতে আসিয়া লুটাইত, ক'টি কুঞ্চন রেখা মুখের বিভূতি বিলেপনের মধ্য দিয়াও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সেদিন ঠাহর করা যাইত—আজও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তেমনই প্রশস্ত ললাট, আয়ত রক্তবর্ণ চক্ষু বিস্তৃত বক্ষ ও আজানুলম্বিত বাহু। সেই মুখের হাসিটি তাঁহার অক্ষয় আছে ও সেই সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। সেবার সন্ন্যাসী বেশী দিন থাকেন নাই। সংসারী মানুষের নানাপ্রকার অভাব-অভিযোগের প্রবাহে তিনি বিরক্ত চিত্তেই স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছিলেন। তবে যাইবার পূর্ব্বে সকলকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন—সম্মুখে ভীষণ পরীক্ষার দিন আসিতেছে। সেই ভীষণ দিনে ঈশ্বরের চরণে শরণ লওয়া ছাড়া জীব যেন অন্য কার্য্য না করে। কারণ, মঙ্গলময় বিধাতার বিধান হাত দিয়া উল্টাইবার ক্ষমতা মানুষের নাই। সে এক অগ্নি-পরীক্ষা গিয়াছে। বয়োবৃদ্ধেরা নিশ্চয় করিয়া বলিতেছেন, ইনিই সেই মহাত্মা।

সুতরাং তাঁহার মাহাত্ম্য বহুদিকে কীর্ত্তিত হইতে লাগিল।

একদিন কুমুদিনী বলিল, "যাবি যুগি? হাত-খানা একবার দেখিয়ে আসি, চ।"

যোগমায়া বলিল, "না ভাই, আমার বড় ভয় করে। যদি সন্ন্যাসীঠাকুর কিছু খারাপ বলেন?"

কুমুদিনী বলিল, "জন্মালেই মানুষের মরণ আছে। যদি মৃত্যুর কথাই বলেন—"

বাধা দিয়া যোগমায়া বলিল, "মৃত্যু কেন ভাই, মরলে তো সব চুকেবুকেই গেল।"

কুমুদিনী বলিল, "বেশ, তুই না যাস—আমি যাব।" একটু থামিয়া বলিল, "ছেলেগুলোর ভাগ্যে কি আছে জানতে ভারি ইচ্ছে করে। ওরা যদি সুখী হয়—"

যোগমায়া বলিল, "ওদের হাত দেখে উনি যদি খারাপ কিছু বলেন?"

কুমুদিনী বলিল, "আমি মন বেঁধেছি ভাই। কথায় বলে না,—'অল্প শোকে কাতর! অধিক শোকে পাথর।'—আমারও হয়েছে তাই। যার ধন তিনি যদি নেন—কি করব ভাই?"

যোগমায়া খানিক কি ভাবিয়া বলিল, "তবে চ—আমিও যাই। যা থাকে কপালে। হাত না দেখাই—কিছু উপদেশ শুনলেও মনটা ঠাণ্ডা হবে।"

গঙ্গাস্নানের নাম করিয়া দুই সখীতে প্রাতঃকালে পানপাড়ায় রওনা হইল। পরিচিত পথ। দু'ধারে আমবাগান ও মাঠ। পথে হাঁটু-ভোর ধূলা। ফাল্গুনের মাঠে শস্যাঙ্কুর নাই, যত দূর চোখ যায় ধূ ধূ করিতেছে। আমবাগানের মধ্যে রাশি রাশি ঘেঁটু ফুল ফুটিয়া আছে। ভোর-বেলায় মৌমাছিরা গুন্ গুন্ শব্দ তুলিয়াছে। ঘেঁটু ফুলের সুগন্ধও বাহির হইতেছে। আমের বউল ঝরিয়া ছোট ছোট গুটি বাহির হইয়াছে, ঘেঁটুফুলের গন্ধের সঙ্গে তাহার মিষ্ট গন্ধও পথ চলিবার কালে ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে আকুল করিয়া তোলে। শিমূল গাছে বড় বড় লাল লাল ফুল ফুটিয়াছে। কোথাও কোন গৃহস্থবাড়ীর উঠানে বাতাবি লেবুর ফুল ফুটিয়া এই পথের ধারে সেই ঘন সুগন্ধকেও বহিয়া আনিয়াছে। অশ্বত্থের কচি পাতায় হাওয়ার কাঁপন সুরু হইয়াছে। লাল লাল পাতাগুলি আগুনের শিখার মতো বায়ুর সুখস্পর্শে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। আকাশ নীল।

কিন্তু এসব দিকে যোগমায়ার দৃষ্টি ছিল না। পানপাড়ার সুউচ্চ তটভূমির সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া দুইজনেরই বুক দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল। তটভূমি হইতে দেখা যায়—গঙ্গাবক্ষের ক্ষীণকায় নৌকাগুলি পাল তুলিয়া স্রোতের মুখে ভাসিয়া চলিয়াছে। উঁচু পাড়ের নিচেয় উচ্ছে-পটোলের ক্ষেত। বড় বড় রুক্ষ মাটির ঢেলার উপর ক্ষীণকায় উচ্ছে-লতা দেহভার ন্যস্ত করিয়াছে, বালুর সমুদ্রে পটোলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারাগুলি সবে ডগাগুলি বাহির করিতেছে। কুমড়ার লতা চক্রাকারে মাটির ঢেলাগুলি ঘিরিয়া ফেলিতেছে এবং তরমুজ কাঁকুড়ের লতায় ফুল ধরিয়াছে।

স্নানের ঘাট হইতে শ্মশানঘাট আধ মাইল রাস্তা।

কুমুদিনী বলিল, "চ, আগে সাধু দেখে আসি। শ্মশানের রাস্তাটাও তো ভালো নয়, এসে চান করলেই হবে।"

ওদিকে পা বাড়াইতে যোগমায়ার বুক কাঁপে কেন? অন্তর্যামী সাধু যদি কোন অশুভ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করেন? যদি ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মতো কোন ভাবী প্রলয়ঙ্কর ঘটনার আভাস দিয়া অন্তর্হিত হন? যদি তীব্র দৃষ্টিতে যোগমায়ার পানে চাহিয়া...

না না, যোগমায়া কিছুতেই তাঁহার পানে চাহিতে পারিবে না।

কুমুদিনীর আঁচল চাপিয়া ধরিয়া সে অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, "না ভাই, ফিরে চ।"

কুমুদিনী সবিস্ময়ে পিছন ফিরিয়া কহিল, "তুই ভয় পেয়ে গেছিস, যুগি? সাধু-সন্ন্যাসী কি লোকের খারাপ করেন? ভালোই করেন ওঁরা।"

কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসীর মন্দ করিবার কাহিনীও যোগমায়া অনেক জানে। অবশ্য ইচ্ছা করিয়া উঁহারা কাহারও অমঙ্গল করেন না। কিন্তু লোকে অনবধানতাবশতঃ উঁহাদের অনাদর করিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ নিজেরাই ডাকিয়া আনে। যাঁহারা লোকের মনে কোথায় কি হইতেছে—চোখের এক পলকের চাহনিতে বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের কাছে ক্ষুদ্র এতটুকু ভয়, তাচ্ছিল্য বা পাপ গোপন থাকিবার কথা নহে! সন্ধ্যা-বন্দনার সময় অতিক্রান্ত হয় দেখিয়া ঋষিধর্ম্ম পালনের জন্যই তো ব্যাকুলা জগৎকারু ঋষির নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছিলেন! পুরস্কার মিলিল—মুনির অভিশাপ! সশিষ্য দুর্ব্বাসার পারণ-দিনে শ্রীকৃষ্ণ না থাকিলে শূন্য অন্নথালি লইয়া দ্রৌপদীকে কি অভিশাপের মুখেই না পড়িতে হইত! অন্যমনস্কতার দরুন স্বামী-চিন্তা-ব্যাকুলা শকুন্তলা সেই অভিশাপের অনলে নির্দ্দোষী হইয়াও তো দগ্ধ হইলেন! অষ্টাবক্রকে উপহাস করিতে গিয়া যদুবংশের ধ্বংসের বীজ রোপিত হইল। আর কর্ণের অজ্ঞানকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত—মেদিনী কর্ত্তৃক রথচক্রগ্রাস। এমন ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত যোগমায়ার মনে পড়িয়া গেল। তবুও সম্মুখের পা দু'খানি আগাইয়া গেল। অমঙ্গল ভীরু মন কেবলই বিমুখ হইতে লাগিল।

শ্মশানভূমির পাশ কাটাইয়া বড় শিমুল গাছটার তলায় আসিলেই আশ্রম দেখা যায়। গোটাচারেক ঘনপল্লবিত বট-অশ্বত্থ গাছের তলায় ছোট একখানি চালাঘর। চালার সামনে হাত-পঞ্চাশেক জমিতে নানাজাতীয় দেশী ফুল। চালায় প্রবেশ করিবার মুখে বাখারি দিয়া একটা গেটও কে তৈয়ারি করিয়া দিয়াছে! গেটের মাথায় অপরাজিতা ও মাধবীলতা ঘন হইয়া আশ্রমের শোভাবৃদ্ধি করিতেছে। মাসখানেক হইল সাধু এখানে আসিয়াছেন। এই অত্যল্প কালের মধ্যে গঙ্গার তীরে শান্তরসাস্পদ এক তপোবন গড়িয়া উঠিয়াছে। সেই চালার উঁচু দাওয়ায় বাঘছাল বিছাইয়া ভস্মবিলেপিত-দেহ কৌপীনধারী সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন।

সন্ন্যাসীর সম্মুখে ক্ষুদ্র জনতা। এক দিকে পুরুষেরা বসিয়া আছেন—অন্য দিকে মেয়েরা। রূপ আছে বটে সন্ন্যাসীর—ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। তেজঃপুঞ্জ কলেবর, সহাস্য আনন, কোমল চক্ষু। চক্ষুর দৃষ্টি যদি তীক্ষ্ণ হইত—যোগমায়া সেদিকে চাহিতে পারিত না। জনতার পিছনেই যোগমায়া ও কুমুদিনী মাথা লুটাইয়া প্রণাম করিল। অন্তর্য্যামী সন্ন্যাসী সহাস্যে চাহিয়া কল্যাণ বাণী উচ্চারণ করিলেন। কি গম্ভীর সুস্নিগ্ধ বাণী! যোগমায়ার মনের যত কিছু ভয়—উদ্বেগ—দ্বন্দ্ব সেই বাণীর প্রশান্তিতে ধুইয়া মুছিয়া গেল। কুমুদিনীর কানে কানে সে বলিল, "উনি বুঝতে পেরেছেন, নয়?"

কুমুদিনী মাথা নাড়িয়া বলিল, "পারবেন না! ওঁরা কি না বুঝতে পারেন?"

সন্ন্যাসী তখন বলিতেছিলেন, "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি—এই মৃত্যু কেমন? না, যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে মানুষ নতুন বস্ত্র পরিধান করে—তেমনি আত্মাও জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ আশ্রয় করে। আত্মার বিনাশ নাই। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি, নৈনং দহতি পাবকঃ। এই আত্মা অস্ত্রের দ্বারা ছিন্নবিছিন্ন হয় না, আগুনে তাকে দগ্ধ করা যায় না, জল বায়ু কোন কিছুর দ্বারাই সে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না।"

কে একজন প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা বাবা, আত্মা যদি ধ্বংস হয় না, তবে অকালমৃত্যু কেন? যে দেহ জীর্ণ হয় না—সে দেহ ত্যাগের জন্য আত্মা চেষ্টা করে কেন?"

সাধু বলিলেন, "দেহ জীর্ণ হওয়া না-হওয়া আমরা কি বুঝব? কর্ম্মফল অনুসারে মানুষের ভোগ। এক জন্মের কর্ম্মফল জন্মান্তর অনুসরণ করে। তা যদি না হবে তো—এই জন্মে পাপ কাজ করেও কাউকে দেখলাম সুখে কাটিয়ে গেল—কেউ দিনরাত ঈশ্বরকে ডেকেও অনন্ত দুঃখকষ্ট ভোগ করলেন।"

প্রশ্ন হইল, "যদি আমরা মনে করি এই জন্মের সঙ্গেই সব শেষ?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমরা তাই তো মনে করি। তা মনে করি বলেই আমাদের এত দুঃখ। এই দুঃখ ঠেকাবার একমাত্র পথ হচ্ছে দিব্যজ্ঞান। সে দিব্যজ্ঞান আসবে কোথা থেকে? মন থেকে। মনের রাজ্য যিনি জয় করতে পেরেছেন—তিনি পরম যোগী।"

"কিন্তু মনকে জয় করাই যে সব চেয়ে শক্ত।"

"শক্ত বলেই তো গীতায় ভগবান বলেছেন: অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহম্ চলম্। অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।—অভ্যাসের দ্বারাই মনকে বশীভূত করা যায়? মন বশীভূত না হ'লে আত্মোপলব্ধি হয় না। আমি কে? কোথা থেকে আসছি—যাবই বা কোথায়? এই জিজ্ঞাসাই হ'ল—আত্মোপলব্ধির প্রথম সোপান।"

অতঃপর সন্ন্যাসী জন্মান্তর রহস্য, আত্মাপরমাত্মা-তত্ত্ব, জগৎসৃষ্টির হেতু ও জীবের কামনাময় কর্ম্ম-ফলের পরিব্যাপ্তি অনেক কথাই বলিয়া যাইতে লাগিলেন। বেলা বাড়িতে লাগিল, জনতাও সেই তত্ত্বকথার অন্তরালে গা ঢাকা দিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। সন্ন্যাসীর তন্ময়ত্ব আজ অসীম। তিনি শূন্য শ্মশানভূমিকে উদ্দেশ করিয়াই যেন এই পরম রহস্যময় গুহ্য কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। যে তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়াও মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনে, সে কথার ধ্বনিতে অতীন্দ্রিয় জগতের আভাস পাইয়া মানুষ সুখ-দুঃখ ভুলিয়া যায় এবং যে আত্ম-উদ্বোধনের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হইয়া মানুষ সংসারের আর এক স্তর উর্দ্ধে উঠিয়া ভ্রূমধ্যস্থিত জ্যোতির্বিন্দুর দর্শনাশায় যোগবিভূতির আশ্রয় লইবার জন্য ব্যাকুল হয়। শ্মশান-বৈরাগ্যের মতো এই আত্মোপলব্ধিও ক্ষণিকের। গঙ্গার ঐ উচ্চ তটভূমিতে পা রাখিলেই সাধুমুখবিনিঃসৃত এই পরম বাণীও মহাব্যোমের শব্দতরঙ্গে অর্থহীন শব্দসমষ্টিতে পরিণত হয়। তবু মন্ত্রমুগ্ধের মতো যোগমায়া ও কুমুদিনী শেষ পর্য্যন্ত বসিয়া রহিল। এক জন পুত্রশোকের আঘাত ভুলিয়া, আর একজন দারুণ দুঃখকষ্টের আবর্ত্তকে তুচ্ছ করিয়া, আকাশের মধ্যপথগামী আদিত্যের কথা ভুলিয়া গেল।

সাধু সস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া উভয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বেলা হয়েছে, ঘরে যাও মা।"

কুমুদিনী বলিল, "বাবা একবার হাতখানা দেখুন, আর কত দুঃখকষ্ট সইব?"

"দুঃখ? কিসের মা! যখনই দুঃখ পাবি, মনে করবি, তোদের দুঃখকষ্ট সেই একজন বুক পেতে নিচ্ছেন। তিনি না নিলে মানুষের সাধ্য কি সহ্য করে।"

"তবু মন বোঝে না, বাবা।"

"বোঝা মনকে। তোর সুখ তোর দুঃখ সেই একজনের পায়ে ফেলে দে। নিজের বলে কিছু রাখিস নে। জলকে কেউ হাত দিয়ে বেঁধে রাখতে পারে? সময়কেও কেউ পারে না। সময়ে গাছের ফল পাকে, ঝরে পড়ে। অসময়েও পড়ে। যা হবে—কেউ তাকে রোধ করতে পারে না, মা। যখন কিছু হবে—ভাববি তিনি করছেন। তা হ'লেই শান্তি পাবি।"

যোগমায়া বলিল, "আমায় মন্তর দেবেন বাবা?"

সন্ন্যাসী হাসিলেন, "মন তৈরি না হ'লে মন্ত্র নিয়ে কি হবে, মা? আগে মন তৈরি হোক্, গুরু আপনি আসবেন। তোর মন চাইছে সংসার, মন চাইছে সুখ-সাধ। মুখে মন্ত্র আউড়ে কোন শান্তি হবে না, মা। যারা দু-নৌকায় পা দেয়—তারা ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারে না। আর ঈশ্বরে ভরসা রাখতে পারে না বলেই সংসারেও শান্তি পায় না।"

কুমুদিনী বলিল, "সংসারে জড়িয়ে চিরকালই বদ্ধ থাকব আমরা? মুক্তি পাব কবে?"

"মুক্তি?" সন্ন্যাসী হাসিলেন, "সংসারের বাইরে মুক্তি কোথায় মা? সংসারের মধ্যেই তো তোমাদের মুক্তি। তোমরা যা পারবে—তাই দেবে। ভক্তি। শুধু ভক্তি আর বিশ্বাসের মধ্যেই তোমাদের মুক্তি মিলবে, মা। সংসারের বাইরে যে মুক্তি তা কি ইচ্ছে করলেই পাওয়া যায়? জানো তো ভরত ঋষির উপাখ্যান?"

যোগমায়া প্রণাম করিয়া অশ্রু-গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিল, "জানি।"

পথ চলিতে চলিতে কুমুদিনী বলিল, "লোকে বলে সন্ন্যাসীঠাকুর হাত গুণতে জানেন, কিন্তু কিছুই তো বললেন না।"

যোগমায়া শুধু বলিল, "তবু ভাই, ওঁর কথায় আজ ভারি শান্তি পেলাম। হাত গুণিয়ে কি এর চেয়ে শান্তি পেতাম, ভাই?"

৫

আশ্চর্য, যেমন মনে প্রশান্তির একটু ছায়া পড়িয়াছে, অমনই যোগমায়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। হরিপুর যেন চোখের সম্মুখ হইতে নিবিয়া যাইতেছে, শ্বশুরবাড়ীর ভিটা আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে।

তারিণী বলিল, "আজ কি তোমার শরীর ভালো নেই, ঠাকুরঝি? কিছুই তো খেলে না।"

বিন্দু-পিসি ডাঁটা চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন, "খাবে কি বাছা, ডাঁটাচচ্চড়িতে যে দু'বার নুন

দিয়ে মরেছি! দেখলাম তরকারির রংটা স্যাক্‌সেঁকে—"

যোগমায়া বলিল, "না, নুন তেমন লাগছে না। তবু কেমন খেতেও ইচ্ছে করছে না।" একটু থামিয়া বলিল, "কতদিন হ'ল এখানে এসেছি, বউ?"

তারিণী বলিল, "কতদিন আর, এই তো সেদিন!"

বিন্দু-পিসি বলিলেন, "তা হবে বৈকি মেয়ে। আমিও এলাম গোপালপুর থেকে—তুমিও—"

তারিণী তাঁহার পানে চাহিয়া ধমকের সুরে কহিল, "তুমি থামো। ত্রয়োদশীর দিন ঠাকুরঝি এলো—অনেক দিন হ'ল?"

তথাপি অবুঝের মতো বিন্দু-পিসি বলিলেন, "তারপর পুন্নিমে গেল, আমাবস্যে গেল—"

"গেল তো গেল! লোকজন এলে তোমার ভালো লাগে না—তা জানি। কাঁড়ি কাঁড়ি চাল-ডাল-তরকারি তো খেতে পাও না।"

যোগমায়া বলিল, "থামো না, বউ? ভারি তো তরকারি।"

বিন্দু-পিসি কহিলেন, রাঁড় মানুষের খাওয়ার আর আছে কি মেয়ে? না মাছ, না দুধ। এই তো শাক-পাতা, তাও যদি—"

তারিণীকে থামাইয়া যোগমায়া বলিল, "এখানে ভালো লাগছে না কেন জানো, বউ? ঘরে অথর্ব্ব শাশুড়ী, আমার জা তো সব গুছিয়ে করতে পারে না—"

তারিণী হাসিয়া বলিল, "তা নয় ঠাকুরঝি। ছেলে মেয়ের জন্যে তোমার মন কেমন করছে। তা তোমারও অন্যায়, ঠাকুরঝি। বিমলের নাহয় ইস্কুল আছে সেখানে—গৌরীকে কেন নিয়ে এলে না সঙ্গে করে? কোলের মেয়ে—মা ছাড়া হয়ে থাকতে পারে কখনও?"

যোগমায়া হাসিয়া বলিল, "ঠাকুমার ন্যাওটো কি না, তাই মার কষ্ট হবে ভেবে ওকে আনলাম না। তা ছাড়া যা দুষ্টু মেয়ে।"

তারিণী বলিল, "তা নয়, ঝাড়া-হাত-পা হয়ে এসেছ, আমাদের পর মনে করো বলে।"

যোগমায়া বলিল, "পর! পর মনে করার এতে কি হ'ল, বউ? পরই যদি মনে করব তো এলাম কেন এখানে?" যোগমায়ার স্বর অশ্রুরুদ্ধ হইল।

তারিণীর চোখেও জল আসিল। তাড়াতাড়ি ভাতের গ্রাস গিলিয়া সে বলিল, "সত্যি বলছি ঠাকুরঝি, আমরা গরীব, তাই অনেক কথা মনে হয়।"

যোগমায়া হাসিয়া বলিল, "আমিও তো গরীবের মেয়ে—গরীবের বউ। চাকরির পয়সায় যাদের ভালো জামা-কাপড়-গহনা জোটে—তাদের বড়লোক বলে না, বউ।"

তারিণী বলিল, "তুমি রাগ করলে ঠাকুরঝি?"

"রাগ নয় ভাই, মনে ভারি কষ্ট হ'ল। রাজ-ভোগ খাব বলে তো বাপের বাড়ী আসি নি—"

বিন্দু-পিসি বলিলেন, "তা বটেই তো। দুজ্জয়ে শোক—"

তারিণী সকাতরে যোগমায়ার হাত ধরিয়া কহিল, "আমি বুঝতে পারি নি, ঠাকুরঝি।"

বিন্দু-পিসি বলিলেন, "আমিও ওর কথা ধরি নে, মেয়ে। তারিণী যতই ক্যাট ক্যাট করে বলুক, ছেলেমানুষ তো!"

সত্য বলিতে কি, চোখের জলের মধ্য দিয়া যোগমায়া আজ তারিণীকে নূতন করিয়া চিনিল। সংসারের অভাব তারিণীর মনের মধ্যেও বাসা পাতিয়াছে। সামান্য আনাজ-পাতির উপর এই প্রীতি, বিন্দু-পিসিকে কটু বাক্য বলা, সংসার গুছাইবার নামে এই কার্পণ্য—সবেরই মূল ভিত্তি ঐ অভাব। এবং এ কথাও সত্য—মেয়েকে না লইয়া আসার মূলেও হয়তো ভাইয়ের সংসারের এই দিকটার কথাই যোগমায়া এক সময়ে ভাবিয়াছিল। এখানে আসিয়াও তারিণী তাহার সঙ্গে মিশিতে পারে নাই। শোকবিহ্বলা যোগমায়ার এক একবার মনে হইত, তারিণীর এই যত্ন-পরিচর্য্যা কাছে না টানিয়া ব্যবধানই গড়িয়া তুলিতেছে দিন দিন। এ পিত্রালয় নহে। ভাইয়ের সংসার, এবং সেই সংসারে যোগমায়া কয়েক দিনের অতিথি মাত্র। অনেক দিন আগেকার কথা মনে পড়িল। শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিলে—মায়ের সেই সযত্ন পরিচর্য্যা। সেই পরিপাটি করিয়া ভাত বাড়িয়া, বাটিতে ডাল ও পাঁচ রকম ব্যঞ্জন সহযোগে মেয়েকে সম্মানীয়া কুটুম্বিনীর মতো খাওয়াইবার প্রচেষ্টা! বিবাহ হইলেই চিরদিনের পরিচিত সংসার হইতে কন্যার যে নির্ব্বাসন ঘটে—সেই ইঙ্গিতই বুঝি ওই সযত্ন পরিচর্য্যার মধ্যে পরিস্ফুট। তবু মায়ের বেলায় সে কথা ভাবিতে পারে নাই যোগমায়া। চিরদিনের জন্য যে মেয়ে পৃথক্ হইয়া পড়িল—পিত্রালয়ে তাহার আদর-যত্ন—বিশেষ করিয়া মায়ের আদর-যত্ন—সে তো সন্তানস্নেহেরই

রূপান্তর। সেখানে মর্য্যাদার প্রশ্ন আসে না, শ্বশুরবাড়ীর সম্ভ্রম-ঐশ্বর্য্যের কথাও নহে, ঘটনার তরঙ্গে পৃথকীভূত মেয়েকে বুকে জড়াইয়া ধরিবার ব্যাকুলতা —পরিচর্য্যার নানা আকারে প্রকাশ পায়। সে কালের সেই সদ্য-কুমারীজীবনোত্তীর্ণ যোগমায়া সে কথা হয়তো বুঝিতে পারিত না, কিন্তু আজ জননী যোগমায়ার ভুল হইবে কেন?

চোখের জলে তারিণী নিকটে আসিলেও সেই দিন অপরাহ্ণে যোগমায়া বলিল, "কাল-পরশুই যাব ভাবছি, বউ! শাশুড়ী একলা রয়েছেন।"

"না।" তারিণী দৃঢ়স্বরে বলিল, "আর দু'দিন তোমায় না রেখে আমি কিছুতেই যেতে দেব না।"

"কেন ভাই?"

"জানি না কেন। কষ্ট ভুলতে এসে যে কষ্ট নিয়ে যাবে সে হবে না, ভাই। এই মাসটা তোমার থেকে যেতেই হবে।"

যোগমায়া আপত্তি করিল না, একটু হাসিল মাত্র।

কিন্তু পরের দিন দুপুরবেলায় গৌরীকে লইয়া বিমল উপস্থিত। সঙ্গে সে গাড়ী আনিয়াছে।

যোগমায়া শুষ্কমুখে বলিল, "হঠাৎ এলি যে বিমল?"

"বাঃ রে, কাকিমা যে বাঘনাপাড়ায় চলে গেলেন। ঠাকুমা বললে, 'তোর মাকে নিয়ে আয়, নইলে ইস্কুলের ভাত দেবে কে'?"

"ও-বাড়ীর বউ চলে গেল? হঠাৎ যে?"

"পরশুই তো, তাঁর ভাই এসে উপস্থিত। বললেন, 'জমির কি গোলমাল হয়েছে—তোমার সই না হ'লে মিটবে না।'—তাই তো গেলেন।"

"কবে আসবে কিছু বলে গেছে?"

"তা আমি কি জানি।"

মামাতো ভাই ফণি আসিয়া গৌরীর কাছে দাঁড়াইল। খানিক তাহার পরিচ্ছন্ন ও জমকালো বেশভূষার পানে চাহিয়া মৃদু স্বরে কহিল, "এই, তোমার জামায় হাত দেব?"

গৌরী ঘাড় বাঁকাইয়া কোঁকড়া চুল নাচাইয়া বলিল, "কেন হাত দেবে?"

"তোমার জামা যে চক্‌চক্ করছে! বাঃ, ভারি নরম তো!"—বলিয়া সন্তর্পণে দুটি আঙুল দিয়া সে গৌরীর জামার হাতাটি টানিয়া ধরিল।

গৌরী ঘাড় বাঁকাইয়া ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল, "ইঃ, তোমার হাতে যে ময়লা, আমার জামা খারাপ হয়ে যাবে না বুঝি?"

যোগমায়ার কানে গৌরীর অভিযোগ যাইতেই সে বলিল, "দাদা হয়, দিলেই বা জামায় হাত।"

"দাদা হয়? তবে যে দাদা বললে, মামার বাড়ী যাচ্ছি?"

তারিণী হাসিয়া বলিল, "মামার বাড়ীই তো। আমি যে তোমার মামী হই।"—বলিয়া আদর করিয়া গৌরীর গাল টিপিয়া দিল।

গৌরী হাততালি দিয়া বলিল, "দাদা, সেই ছড়াটা বলব? বলি?"—বলিয়া বিমলের চক্ষুর নিষেধ ইঙ্গিত সত্ত্বেও আরম্ভ করিল।

"তাই, তাই, তাই—মামার বাড়ী যাই,
মামার বাড়ী ভারি মজা—কিল চড় নাই।"

যোগমায়া হাসিয়া বলিল, "তোর নিজের বাড়ীতে রোজ কত কিল চড় খাস, গৌরী?"

গৌরী সে কথায় কান না দিয়া ছড়া আবৃত্তি করিতে করিতে সদ্য-আলাপিত মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

তারিণী বলিল, "শাশুড়ী তোমার একলা রয়েছেন, না হ'লে কিছুতেই ছাড়তাম না, ঠাকুরঝি।"

যোগমায়া বলিল, "আবার আসব, বউ।"

"তোমার তো কথা? সংসার ঘাড়ে পড়লে আর এসেছ!"

যোগমায়া বলিল, "সত্যি বউ, সংসার হয়েছে পায়ের বেড়ি। আগে শাশুড়ীর মাথায় ছিল সংসার, যেখানে খুশী গিয়েছি—এসেছি। আজ নিজের সংসার হয়ে নিজের পায়েই পরেছি বেড়ি। তা জগদ্ধাত্রী-পূজোর সময় তুমিও একবার যেয়ো না, বউ।"

তারিণী বলিল, "যেতে তো সাধ হয়, কিন্তু ওই অসাব্যস্ত মানুষ নিয়ে আমার হয়েছে জ্বালা। এমন খাবেন যে পেটের অসুখ যখন-তখন। সাধ করে কি টিক্‌টিক্ করি, ঠাকুরঝি? ঐ যে আসছেন।"

বিন্দু-পিসি ঘুঁটের ঝুড়ি উঠানের এক পাশে রাখিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ গা মেয়ে, দুয়োর গোড়ায় ঘোড়াগাড়ী দাঁড়িয়ে কেন?"

"আমি যাচ্ছি, পিসিমা"—বলিয়া হেঁট হইয়া যোগমায়া তাঁহার পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইল।

"আহা, থাক্ থাক্। এমনিতেই আশীর্ব্বাদ করছি—রেতের প্রাতঃবাক্যে বেঁচে থাকো। জন্ম-এয়োস্ত্রী হও—পাকাচুলে সিঁদুর পরো। তারিণী, চুলটা বেঁধে একটু আলতা-সিঁদুর পরিয়ে দে বাছা। এয়োস্ত্রী মানুষ—অমনি ট্যাংটেঙিয়ে যাবে কি?"

"পিসিমা, আপনি একবার আমাদের বাড়ীতে পায়ের ধুলো দেবেন।"

"দেব বৈকি মেয়ে, দেব বৈকি। তারিণীর সংসার নিয়ে কি আমার নড়বার জো আছে? কচিকাচা···তা যাব শীতকালে। নলেন পাটালি গুড় উঠুক, খাসা মোয়া উঠুক—"

তারিণী মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া বলিল, "তাই যেয়ো। খাসা মোয়া উঠলেই যেয়ো।"

উৎসাহিত হইয়া বিন্দু-পিসি বলিলেন, "আহা, ডাক-সাইটে মোয়া! সেই তোর সাধের সময় পাঠিয়েছিল মেয়ে, এখনও যেন জিভে লেগে আছে।"—বলিয়া জিহ্বা দ্বারা সংক্ষিপ্ত একটি 'চুক্' শব্দ করিয়া চুপ করিলেন।

বিদায়ের আয়োজন সর্ব্বত্রই সমান। হৃদয়ের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া উঠুক আর নাই উঠুক, বিষাদের একটি ম্লান ছায়া সকলের মুখেই ভাসিয়া উঠে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা পর্য্যন্ত এই ভাষার অর্থ গ্রহণ করিয়া বিষণ্ণ হইয়া পড়ে। মামাতো ভাইদের লইয়া গৌরী আগেই গাড়ী চাপিয়া বসিয়াছে এবং গাড়ী চড়িবার আনন্দে পথের অস্পষ্ট অনেক কথা সে অনর্গল বলিয়া চলিয়াছে। মামাতো ভাইয়েরা গৌরীর সঙ্গী হইবে মনস্থ করিয়াছে। উহারাও সেই আমবাগানের পাশ দিয়া—ঘুটঘুটে অন্ধকার-ভরা তেঁতুল গাছটার তলা দিয়া, বক ও হাঁসে ভরা পুকুর দেখিতে দেখিতে গৌরীদের শহরে গিয়া পড়িবে। শহর নহে তো কি! রাস্তায় এমন হাঁটুভোর ধুলা নাই, কত গাড়ী চলে, কত কোঠাঘর আছে, রোজ সন্ধ্যাবেলায় কে রাস্তায় আলো জ্বালিয়া দেয়, ইস্কুলের ঘণ্টা বাজে, ঠাকুরের আরতি হয়—ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিদায় প্রণাম সারিয়া তারিণী ছেলেদের উদ্দেশ করিয়া বলিল, "আয়, নেমে আয় বলছি সব!"

তাহারা প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া আপত্তি করিল।

তারিণী কোমল কণ্ঠেই বলিল, "কাল তোদের গাড়ী করে ঠাকুরঝিদেব বাড়ী দেখিয়ে আনব। লক্ষ্মীটি—নাম্।"

বড় ছেলে মণি ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, "ইস্, মিথ্যে কথা! রোজই তো বলো গাড়ী করে বেড়াতে নিয়ে যাব। যাও নাকি?"

"আচ্ছা নাম্ তো, এবার সত্যি নিয়ে যাব।"

অবাধ্য ঘোটকের মতো ঘাড় বাঁকাইয়া ছেলে বলিল, "না।"

এবার কোমল কণ্ঠস্বর রক্ষা করা তারিণীর পক্ষে দুঃসাধ্য হইল! শাসনের সুরে সে বলিল, "মণে, নাম্ বলছি—"

মণি যোগমায়ার পানে চাহিয়া দৃঢ়ভাবে ঘাড় দোলাইয়া বলিল, "ইস্, নামবে বইকি?"

তারিণী দুই পা আগাইয়া আসিয়া কহিল, "দেখবি হতভাগা ছেলে, তোর হাড় এক ঠাঁই—মাস এক ঠাঁই করে দেব। নাম্ বলছি!"

মণি করুণ নয়নে যোগমায়ার পানে চাহিয়া বলিল, "ও পিসিমা!"

যোগমায়া তারিণীকে বলিল, "আমি ওদের বোঝাচ্ছি, বউ!" পরে ছেলেদের পানে ফিরিয়া আঁচলের গ্রন্থি খুলিতে খুলিতে বলিল, "যে আগে নামবে, সে একটা টাকা পাবে

মুখের কথা বাহির হইতে যা বিলম্ব। হুড়মুড় করিয়া মণি ও ফণি নামিয়া পড়িল এবং দুইজনেই যোগমায়াকে ঘিরিয়া কলরব তুলিল, "আমি আগে নেমেছি, পিসিমা—আমি আগে নেমেছি!"

এই আগে-নামার স্বত্ব প্রমাণ করিতে দুই জনের মধ্যে হাতাহাতির উপক্রম হইতেই যোগমায়া দুই জনের হাতেই দুইটি টাকা দিয়া সব বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া দিল।

"তবে আসি বউ।" গাড়ীতে বসিয়া যোগমায়া জন্মভিটার পানে সজল নয়নে চাহিয়া রহিল।

ঘড ঘড় করিয়া গাড়ী অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছু দূর অগ্রসর হইলে তারিণীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "এই মণে—এই ফণে, দে বলছি টাকা আমার হাতে। হারিয়ে ফেলবি কোথায়—তুলে রাখি বাক্সে।"

"হ্যাঁ—তোমায় দিলে আর দেবে কিনা!" পরক্ষণেই ছেলে দুইটির বিকট চীৎকারে যোগমায়া গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া সেই দিকে চাহিল। পথের ধুলায় পড়িয়া ছেলে দু'টি হাত-পা ছুঁড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছে, আর গলা ফাটাইয়া চীৎকার করিতেছে। তারিণী ধীর পদে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

বিমল বলিল, "আমি দেখতে পেলাম মা, মামীমা হাত মুচড়ে ওদের কাছ থেকে টাকা কেড়ে নিলে।"

যোগমায়া বিমলের পানে চাহিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "নিলে বলতে নেই, নিলেন বলতে হয়

গৌরী বলিল, "হ্যাঁ মা, মামীমা কেড়ে নিলেন

৬

শাশুড়ীকে প্রণাম করিতেই তিনি যোগমায়ার চিবুক ধরিয়া কহিলেন, "তুমি বাড়ী নেই—বাড়ী যেন খাঁ-খাঁ করছিল। না যত্ন সংসারের—না যত্ন ছেলেমেয়ের। পর দিয়ে কখনও কাজ চলে?

যোগমায়া বলিল, "ছোট বউ চলে গেল কেন মা?"

"কে জানে কেন! বিধবা মানুষ—একটু যদি আচার-বিচার আছে? এড়া কাপড়ে কুয়োর জল তোলা, এড়া কাপড়ে ঘর-দুয়োর নৈবেদ্য করা—দু'চক্ষে দেখতে পারি না। আর এমন ব্যাদড়া ছেলেগুলো—খালি ছুঁই-ছুই!"

যোগমায়া বুঝিল, সুহাস শুধু শুধু এ গৃহ ত্যাগ করে নাই। এই অনিয়ম অনাচারের কাহিনীর পিছনে অনেকখানি ঘটনা আছে—যাহার জন্য সুহাসের ভাইয়ের আগমন হইয়াছিল। কে জানে, সুহাস আর আসিবে কি না। মেয়েটা সত্যই সরল ছিল। কাজকর্ম্মের কোন শ্রীছঁাদ ছিল না, আচার-বিচারের খুঁটিনাটি মানিয়াও সে চলিতে পারিত না। তাহার আচরণে যোগমায়াও কতবার বিরক্ত হইয়াছে, কত কটু কথা বলিয়াছে। সুহাস কড়া কথা শুনিয়া রাগ করে নাই কোন দিন। হাসিয়া বলিয়াছে "আমার ভুলো মন দিদি, সব ভুলে যাই। শাশুড়ী ছিল না ঘরে—যা করেছি সব আমি। কিসে কি হয় অত আমি বুঝতে পারি নে।"

বধূটির উপর শাশুড়ীর অভিযোগ চলিতেই লাগিল। যোগমায়া কতক শুনিল, কতক বা শুনিল না। এ কাহিনী অনেকবার শোনা। বিধবা মানুষের শুচিতা রক্ষার জন্য ওই সব-ভোলা বধূটি কত বার কত অনিয়ম করিয়াছে—কত মর্ম্মভেদী বাক্যও শুনিয়াছে! অথচ শাশুড়ীই দয়াপরবশ হইয়া ওই মূর্ত্তিমতী অনিয়মকে ঘরে ঠাঁই দিয়াছিলেন একদিন।

শাশুড়ীকে এত দিনে যোগমায়া বুঝিতে পারিয়াছে। সংসারকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার যত কিছু অনুশীলন বৃত্তি। এই সংসারের ক্রটি বা অনিয়ম বা অনাচার যাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়—তাহাকেই তিনি নির্ম্মমভাবে আক্রমণ করেন; যে সংসারকে চালাইবার দক্ষতা লাভ করে—সেই তাঁহার প্রিয়। সংসারের বাহিরে যে জগৎ—শাশুড়ীর চোখে তা অকিঞ্চিৎকর। সেখানে কেহ মরিলে অভ্যাসবশতঃ তিনি খেদ করেন। কেহ সৌভাগ্যবতী হইলে মুখে আনন্দ প্রকাশ করেন। লোকলৌকিকতায়, আচার-ব্যবহারে কোথাও মর্য্যাদা বা সৌজন্যের অভাব ঘটিতে দেন না। উপার্জ্জনে অক্ষম পুত্রের দোষ ও রূপহীনা বধূর ক্রটি তাঁহার চক্ষে সমান পীড়াদায়ক। কথায় কথায় তিনি ভগবানের দোহাই দেন, কিন্তু ভগবানের আরাধনায় সত্যকারের যে সময় ব্যয়িত হয়—সেটুকু সময় বিলাইবার কার্পণ্যও তাঁহার যথেষ্ট। ষষ্ঠীপূজা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক ক্ষুদ্র-বৃহৎ পূজায় দেবার্চ্চনার ক্রটি হইবার উপায় নাই, আবার সংসারের অকল্যাণ হইলে দেব-দেবীরাও গালি-গালাজ হইতে রেহাই পান না। যেমন হৃষীকেশের মৃত্যু-সংবাদে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন, "একচোখো ভগমানের একি অবিচের, মা! আমি তিনকেলে বুড়ী রইলাম পড়ে, আর···ঘোর কলি কাল, ওনাদের মাহিত্তির আর নেই।" অথচ শীতলা লইয়া কেহ ভিক্ষায় আসিলে বলেন, "ঠিক দুপুরবেলায় আসো কেন তোমরা? সারাদিন মাকে না খাইয়ে···এই নাও পয়সা। খাওয়া হয়ে গেছে, চাল তো দিতে নেই। অপরাধ নিয়ো না মা, অপরাধ নিয়ো না।"

সংসারে অনেক কাজ। যোগমায়ার ভাবনার অবসর নাই। অবসর থাকিলে সে নিজের বহুকাল-বিস্মৃত বধূজীবন লইয়া ভাবিতে পারিত। কিন্তু আশ্চর্য্য, বধূজীবনের কথা আজকাল যোগমায়ার অল্পই মনে পড়ে। কখনও কোন ঘটনায় হয়তো সামান্য ঢেউ উঠে, কিন্তু বুদ্বুদের ন্যায় মুহূর্ত্তকাল স্থায়ী সেই ঢেউ। বুদ্বুদ্ ফাটিয়া যায়—নূতন বুদ্বুদ্ ফুটিয়া উঠে।

পরদিন নিস্তারিণী (তিলিদের সেই ক্ষুদে বউটি। আজ আর সে বধূ নহে—শাশুড়ীর মৃত্যুতে পুরাদস্তুর গৃহিণী হইয়াছে) দেখা করিতে আসিল।

"কই গো দিদি, কবে এলে বাপের বাড়ী থেকে? সব ভালো?"

"হ্যাঁ ভালো, তুমি ভালো আছ? নিশু, আশু ভালো আছে?"

"হ্যাঁ দিদি, তা গায়ে-পায়ে ভালো আছে।" একটু সরিয়া আসিয়া কণ্ঠস্বর নামাইয়া কহিল, "এবার একলা সংসার ঠেলা—কত কষ্টই না হবে—"

যোগমায়া হাসিয়া বলিল, "তুমিও তো একলা সংসার ঠেলছ, ভাই!"

নিস্তারিণী চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিল, "আমার সংসার—আর তোমার! দু'খানা ঘর—একটু উঠোন—কতক্ষণই বা লাগে ঝাঁট দিতে? গরু-বাছুরের পাট নেই।"

যোগমায়া বলিল, "নিজেরই তো সংসার, চলে যাবে কোন রকমে।"

একটু থামিয়া নিস্তারিণী বলিল, "তা এক কাজ করো না দিদি, একজন ঝি রাখো। গরুর কাজ, বাসন মাজা, উঠোন ঝাঁট, রান্নাঘর নিকোনো—"

"দূর! শাশুড়ীদের আমলে উনি সব করেছেন, আমি রাখব ঝি? অত বড়মানুষি সইবে না, ভাই। তা ছাড়া ভোরবেলায় উঠে নিজের হাতে পাটঝাঁট না সারতে পারলে—আমারই মন খুঁতখুঁত করবে, ভাই।" যোগমায়া হাসিল।

নিস্তারিণী বলিল, "সাধে কি আর পাড়ার সবাই বলে, বউ দেখতে হয়তো মুকুয্যে-বাড়ী যা; যেমন অরুণের গতর—তেমনি কাজেকর্ম্মে ছিরিছাঁদ।"

যোগমায়া হাসিয়া বলিল, "তাই বুঝি যখন তখন আমায় দেখতে আসো?"

"আসিই তো। তোমার সঙ্গ পাওয়া তো পুণ্যির কথা—ভাগ্যির কথা। ছোট্টটি ছিলাম, শাশুড়ী বসিয়ে রেখে যেতেন তোমার কাছে। আমার যা কিছু শিক্ষে—"

"থাক্ ভাই।" নিজের প্রশংসা যোগমায়া বেশীক্ষণ সহ্য করিতে পারে না।

নিস্তারিণী বলিল, "একটা কথা শুনলাম, সত্যি?"

"কি কথা?"

"তুমি নাকি দিদি বাসায় যাবে?"

"বাসা! বাসায় যাব যদি তো এখানে সংসার সাজিয়ে বসলাম কেন, ভাই? না ভাই, বাসায় আর যাব না।" একটি দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে যোগমায়ার চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল। মুখ নামাইয়া সে কুলার উপর ছড়ানো ডাল হইতে কুটা বাছিতে লাগিল।

সান্ত্বনার কথা নিস্তারিণী বলিল না। বলিলে অবাধ্য চোখের জলকে শাসন করা মুশকিল বলিয়াই হয়তো বলিল না।—খানিক পরে অন্য প্রসঙ্গ পাড়িল, "একটা কথা জিজ্ঞেস করব, দিদি? যদি রাগ না করো তো—"

"রাগ করব কেন?"

তথাপি ইতস্ততঃ করিয়া নিস্তারিণী বলিল, "বিশ্বেসদের রাশুর মা, বেনেদের মুরারির বউ, সুশীল ডাক্তারের বউ, বোন সব জয়দেবে যাচ্ছে। ভাবছিলাম—"

যোগমায়া স্থির দৃষ্টিতে নিস্তারিণীর পানে চাহিয়া বলিল, "তুমিও যাবে?"

"মনে করছিলাম, সঙ্গ ভালো, নাহয় ওদের সঙ্গে—"

যোগমায়া বলিল, "তোমার স্বামীকে বলেছ?"

সলজ্জে আরও খানিকটা মাথা নামাইয়া নিস্তারিণী জবাব দিল, "বলেছি। জনোই তো—মাটির মানুষ।"

যোগমায়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া নিস্পৃহ কণ্ঠে কহিল, "তবে আর কি, যাও না।"

"না দিদি, তুমি না বললে—"নিস্তারিণীর স্বর আগ্রহ-কম্পিত।

"তোমার স্বামী যখন মত দিয়েছেন, আমি অমত করব কেন?"

"না, তবু তুমি বলো।"

যোগমায়া নিস্তারিণীর পানে চাহিয়া ম্লান হাসিয়া বলিল, "আমার কথা শুনে যদি দুঃখু পাও? যদি বলি—যেয়ো না।"

নিস্তারিণী বলিল, "কক্খনো যাব না। তুমি তো অন্যায় বলবে না।"

"তা হ'লে ভাই যেয়ো না। গেরস্তর বৌ ঝি—হুট হুট করে মেলায় যাওয়া আমি পছন্দ করিনে। দল বেঁধে যাওয়া মানেই—"

যোগমায়া কথাটা শেষ করিল না, নিস্তারিণীও শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল না।

একটু পরে নিস্তারিণী বলিল, "সত্যি দিদি, তোমার কথায় মনটা ঠাণ্ডা হ'ল। ওদের সাধ্য-সাধিতে এমন হয়ে গিয়েছিলাম! সংসারের ভাবনা—ছেলে দু'টোর ভাবনা, তুমি বাঁচালে।"

"ওঁরা হয়তো আমার মুণ্ডুপাত করবেন।"

"ইস্! তোমায় কথা বলে এমন মানুষ তো গাঁয়ে দেখি নে।—"বলিয়া নিস্তারিণী উঠিল। "আজ আসি দিদি।"

"এসো।"

কষ্ট একটু হয় বৈকি। তথাপি যোগমায়া পরম তৃপ্তিও অনুভব করে। সময়ের পাখা আছে। এদিকের কাজ সারিয়া উনানে আঁচ-দেওয়ার আধ ঘণ্টা পরেই বিমল স্কুলের ভাতের তাড়া দেয়।

আলুভাতে আর আধসিদ্ধ কলাইয়ের ডাল দিয়া সে আহার সারিয়া উঠে। ঘন দুধ খানিকটা পাতে না দিলে যোগমায়ার তৃপ্তি হয় না, কিন্তু এমন ছেলে—দুধ খাইবার কালে ঘোরতর আপত্তি জানায়। সবটা খায় না। যোগমায়ার অনুরোধ ও মৃদু ধমকেও সে অবিচলিত স্বরে বলে, "একপেট খেলেই বুঝি গায়ে খুব বল হয়? মাষ্টারমশায় বলেন, পেট ভরে খেলে পড়ার ক্ষতি হয়।"

"হয়! এই দশটায় খাওয়া—আর বিকেলে খাওয়া, মানুষ থাকতে পারে? মাষ্টারের কি?" যোগমায়া গজগজ করিতে থাকে।

বিমল বলে, "বাঃ রে, মাষ্টারের বুঝি খিদে পায় না?"

"খিদে পেলে আর অমন কথা বলতে হয় না"

অদ্ভুত যুক্তি যোগমায়ার, কাটানো দুষ্কর। বিমল হাসিতে থাকে।

যোগমায়া বলে, "তা টিফিনের সময় খাস্ তো? না, পয়সা পুতুপুতু করে রেখে দিস? না, মারবেল্ কি লাটিম কিনিস?"

বিমল বলিল, "রোজ দু-পয়সার ছোলা সেদ্ধ কিনি।"

"কেন রসগোল্লা কিনে খেতে পারো না? অত ছোলা-সেদ্ধ রোজ রোজ খেলে অসুখ করবে যে।"

বিমল জবাব দেয়, "আমি একলা খাই কিনা, সবাই মিলে খাই। একটা রসগোল্লা কার মুখে দেব?"

"কেন, যে যার পয়সা দিয়ে কিনে খেলেই তো হয়?"

"সবাই পয়সা পায় কিনা।"

যোগমায়া আর কোন কথা কহিল না। নিজের ছেলে রসগোল্লা খাইবে—অন্যেরা তাকাইয়া তাকাইয়া সেই খাওয়া দেখিবে সে কল্পনা যোগমায়া করিতে পারে না। ভাইয়ের ছেলে মণি ও ফণির কথা তাহার মনে হয়। আহা, কচি ছেলে সব—অভাবের ওরা বোঝেই বা কি!

যোগমায়া ছেলের পুষ্টির জন্য অন্য ব্যবস্থা করে। দুধের সর হইতে মাখন তুলিয়া ঘরে গাওয়া ঘি তৈয়ারী করিয়া রাখে এবং বিমল খাইতে বসিলে গরম ভাতে খানিকটা ঘি দিয়া বলে, "ভাত ক'টা বেশ করে মেখে নে।"

বিমল বলে, "যে গন্ধ তোমার ঘিয়ে।"

যোগমায়া বলে, "অমন ভুর্ ভুর্ করছে গাওয়া ঘিয়ের গন্ধ, তোমার ভালো লাগছে না? তবে ভালো লাগে বুঝি ছোলা-সেদ্ধ?"

বিমল বলে, "সত্যি মা, দোকানের ছোলা-সেদ্ধ এমন সুন্দর হয়! আর আলুর দম।"

"বাড়ীর তেল-ঘি-দেওয়া আলুর দম বুঝি তেতো লাগে?"

"তেতো লাগবে কেন, দোকানের মতো হয় না।"

"আচ্ছা, এনে দিস্ তো একদিন, খেয়ে দেখব কেমন আলুর দম তোর দোকানে রাঁধে।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বিমল বলে, "সে আলুর দম তুমি হয়তো খাবে না, মা।"

"কেন রে, তোদের ভালো লাগে—আর আমার ভালো লাগবে না?"

"সে যে পেঁয়াজ-দেওয়া।"

যোগমায়া অবাক্ হইয়া বিমলের পানে চাহিয়া বলিল, "তুই পেঁয়াজ খাস?"

বিমল মায়ের বিস্মিত দৃষ্টির তীব্রতা সহ্য করিতে পারিল না, মুখ নামাইয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল, "সবাই তো খায়।"

"হুঁ।" যোগমায়ার মুখ ও কণ্ঠস্বর দু-ই গম্ভীর হইল। "আর কি খাস, খোকা? কুঁকড়োর মাংস?"

"কুঁকড়োর মাংস বুঝি দোকানে হয়!" বিমল আড়চোখে মায়ের পানে চাহিয়া দুই-এক্ পা করিয়া পিছনে হটিতে লাগিল।

যোগমায়া একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তাই বাড়ীর ভাত-ডাল তোর মুখে রোচে না, বাড়ীর তরকারি ভালো হয় না! হ্যাঁরে, পেঁয়াজ খেতে বুঝি খুব ভালো লাগে?"

বিমল বলিল, "মাংসর নাকি পেঁয়াজ না দিলে জমে না।"

"তুই রাঁধতেও জানিস! আমরা কিন্তু পেঁয়াজ না দিয়ে মাংস রেঁধেছি—সবাই খেয়ে ভালোও বলেছে। তবে সেকালের রান্না কিনা—"

বিমল বলিল, "না মা, আজ থেকে আর আমি পেঁয়াজ খাব না।"

যোগমায়া ম্লান হাসিয়া বলিল, "তোর যদি ভালো লাগে তো কেন খাবি নে, খোকা? বাড়ীতে কোনকালে পেঁয়াজ আসে নি বলে তোরা কেন খাবি নে?"

"তুমি রাগ করবে না?"

"না। তবে ওই কুঁকড়োর মাংস-টাংসগুলো

খাস্ নে। মাংস খেলে গায়ে যত জোরই হোক, দুধ খেয়ে তার চেয়ে বেশী জোর হয়।"

বিমল চলিয়া যাইতেছিল, যোগমায়া ডাকিয়া কহিল, "আর একটা বছর পরে তোর এখানকার পড়া শেষ হবে, তখন শহরে গিয়ে যা ইচ্ছে করিস। দেখতেও যাব না—বারণও করব না।"

বিমল তর্ক তুলিল, "তোমাদের যত সব! বিশ্বামিত্র স্থষ্টি করলেন পেঁয়াজ—তা হ'ল অখাদ্য। স্থষ্টি করলেন—নোনা আতা—হ'ল অখাদ্য।"

যোগমায়া হাসিয়া বলিল, "নারে, সুখাদ্য। আমাদের কালে অখাদ্য ছিল—এখন হয়েছে সুখাদ্য।"

বিমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "সুখাদ্যই তো। জানো, আমাদের বইয়ে—"

যোগমায়া বলিল, "ওই ইস্কুলের ঘণ্টা বাজল, এখন তর্ক রেখে পড়তে যাও।"

সত্য বলিতে কি—ছেলের সঙ্গে এই তর্ক যোগমায়ার ভালোই লাগে। কিশোর বিমল হাত নাড়িয়া ঘাড় বাঁকাইয়া তর্ক করে। ওরা মনে করে, পৃথিবীর সব কিছু রহস্য ওদের জানা হইয়া গেছে। খাওয়া, সাজসজ্জা করা, বেড়ানো, দেশবিদেশের কথা, কত রকমের ভাষা, পৃথিবীর নানাবর্ণের জাতিদের নানা-প্রকারের অদ্ভুত অদ্ভুত আচার-ব্যবহারের কথা—সব কিছুই বিমল জানে। একাদশীতে উপবাস করিবার হেতু বিমল বোঝে না; পূর্ণিমা অমাবস্যায় মানুষের দেহ কেন খারাপ হইবে; তিথি অনুসারে খাদ্যদ্রব্য কেন অভক্ষ্য হয়; পেঁয়াজ, মসুর ডাল ও পুঁইশাক খাইলে বিধবাদের জাতিপাত হয় কেন—কত কথা লইয়াই সে তর্ক করে। যোগমায়ার ধমক খাইয়া কখনো সে চুপ করিয়া হাসে—কখনো বা ছুটিয়া পলায়। কণ্ঠস্বর বিমলের মিষ্ট হইয়াছে, মাথায় অনেকখানি বাড়িয়াছে, কিন্তু এই সব পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়াও দেহের মেদ তেমন বৃদ্ধি হয় নাই। ছেলে মোটাসোটা নাদুস নুদুস না হইলে মায়ের খুঁতখুঁতানি যে যায় না। তবু অনেকে বলে, "কোঁকড়া চুল ও ফরসা রঙের একহারা ছেলেটি তোমার সুন্দর, ভাই!" অমন টিকলো নাক, টানা চোখ ও ঘন ভ্রূর শোভাই কি কম? ঠোঁটের তিলটি বিমলের মানাইয়াছে। কেননা, পাতলা ঠোঁট—ফুরফুরে বাতাসে ঈষৎ কম্পিত ফুলের মতোই মনোহর। ছেলে স্থির হইয়া থাকিতে চাহে না একদণ্ডও। যেন ভিতরে খানিকটা উত্তাপ ওর সঞ্চিত হইয়াই আছে। কথার ঝাঁকে ও চলার গতিতে সে উত্তাপ প্রায়ই অনুভূত হয়। বুক ক্রমশঃ চওড়া হইতেছে—কোমরের কাছটা সরু হওয়াতে বুঝা যায়। বিমলের হাসিটি ভারি সুন্দর। হাসিলে মুক্তার সারির মতো না হউক—সাজনো দাঁতগুলি ঝক্‌ঝক্ করিতে থাকে। উপর ওষ্ঠে ঈষৎ কালির রেখা পড়িয়াছে—চোখেও চঞ্চল স্বপ্নময় দৃষ্টি। নিজের ছেলেটিকে কাহারই বা ভালো না লাগে? তবু বিশেষ করিয়া যোগমায়ার মনটা খুঁতখুঁত করিতে থাকে আর একটু মোটা—আর একটু ফরসা ও যদি হইত। আসলে সেটা সন্তানের শ্রী দেখিয়া মায়ের মনে যে অমঙ্গল আশঙ্কার অস্পষ্ট ধোঁয়া উঠে, তাহারই ইঙ্গিত। মনকে যোগমায়া প্রতিনিয়তই বলে, যেমন সুন্দর হইলে লোকের চোখ লাগিয়া ছেলেদের শরীর খারাপ হয়—তেমন স্বাস্থ্য বিমলের নাই। অন্ততঃ যোগমায়ার চক্ষু ভুলিলেও—মন তা স্বীকার করিবে কেন?

৭

পুরা সংসারই যোগমায়ার ঘাড়ে চাপিয়াছে; তবু পুরা দায়িত্ব যেন যোগমায়ার নাই। মাথার উপর বৃদ্ধা শাশুড়ী এখনও বর্তমান। সংসার সম্বন্ধে যা-কিছু আবশ্যকীয় পরামর্শ তাঁহার সঙ্গেই চলে। মাসকাবারে কখনও রামচন্দ্র বাড়ী আসে—কখনও মনিঅর্ডারে আসে টাকা। শাশুড়ী মুখে বলেন, "আমাকে কেন আর ওর মধ্যে জড়াও বউমা, তোমার ঘর-দুয়োর তুমি বুঝে সুঝে নিয়েছ—এখন মা দুগ্‌গার চরণ চিন্তে করতে দাও।"

সে-কথা রামচন্দ্রও একদিন বলিয়াছিল, মাসকাবারে সংসার-খরচের টাকা যোগমায়ার হাতে দিয়া বলিয়াছিল "এই নাও, মায়া—সংসার-খরচ।"

যোগমায়া হাত সরাইয়া উত্তর দিয়াছিল, "আমায় কেন, মার হাতে দাও।"

"মা যে নিতে চাইছেন না।"

"না চান—তবু ওঁর হাতেই দেওয়া উচিত। উনি বেঁচে থাকতে আমার হাতে টাকা দিলে লোকে নিন্দে করবে। তা ছাড়া ওঁরও মনে কষ্ট হ'তে পারে। সে আমি কিছুতেই সইতে পারব না।"

অগত্যা শাশুড়ীকেই সে টাকা হাত পাতিয়া লইতে হয়। কিন্তু অত টাকা তিনি নিজের কাঠের

ছোট হাতবাক্সটিতে রাখিতে ভরসা করেন না। বলেন, "সামান্য বাজার খরচের খুচরো পয়সা রেখে কাঠের সিন্দুকে টাকা তুলে রাখো, বউমা। যে ভারি সিন্দুক—আমি কি ডালা তুলে নাড়তে পারি ?"

প্রকারান্তরে যোগমায়ার হাতেই টাকা আসিয়াছে, কিন্তু খরচের প্রয়োজন হইলে শাশুড়ীর পরামর্শ ছাড়া সে কোন কাজ করে না। কাঠের সিন্দুকের বড় চাবিটা সে-ই জোর করিয়া তাঁহার কোমরের ঘুন্‌সিতে বাঁধিয়া দিয়াছে।

শাশুড়ীর চোখের দৃষ্টি ক্রমশঃ ঘোলাটে হইয়া আসিতেছে। অনেক দূরের জিনিসপত্র কেমন ধোঁয়া-ধোঁয়া ঠেকে। নাতি-নাতিনীদের দূর হইতে ছুটিতে দেখিলে প্রশ্ন করেন, "দৌড়য় কে, বউমা ? গৌরী বুঝি ?"

লোকে বলে চোখে ছানি পড়িয়াছে—কাটাইলে চক্ষু পরিষ্কার হইতে পারে।

শাশুড়ী বলেন, "কেন, কি দুঃখে সত্যিক জাত ছুঁয়ে চোখ কাটাতে যাব ? আমার অন্ধের নড়ি বউমা রয়েছে। বউ তো নয়—মেয়ে।"

শ্রবণ-শক্তিও তাঁহার হ্রাস হইতেছে বলিয়া যোগমায়াকে কণ্ঠস্বর চড়াইতে হইয়াছে। আজ সেই বহুবর্ষ পূর্ব্বের সলজ্জা ভীরু বধূটির মৃদু কণ্ঠস্বর —যে কণ্ঠ আমতলা হইতে কাঁঠাল তলায় পৌছিত না—কোমল রাগিণীর মতো বাজিয়া উঠে না—সে-কণ্ঠ শাসনের অনুশীলনে গম্ভীর। আদেশের ভঙ্গিতে মর্য্যাদাব্যঞ্জক।

জ্যৈষ্ঠমাসের তখন শেষ হইতে চলিয়াছে। শেষ জয়মঙ্গলবারের পালন সারিয়া শাশুড়ী যোগমায়াকে বলিলেন, "আচ্ছা বউমা, রাম কবে বাড়ী এসেছিল তোমার মনে আছে ?"

নতমুখে যোগমায়া উত্তর দিল, "গুডফ্রাইডের সময়। সেই চোত মাসের শেষে।"

শাশুড়ী হিসাব করিতে লাগিলেন, "চোত এক, বোশেখ দুই, জষ্টি—"

যোগমায়া সংশোধন করিল, "তিন মাস নয় মা, দু-মাস হ'ল।"

শাশুড়ী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কি জানি মা, মনে হচ্ছে যেন কত দিন ওকে দেখি নি। এমনও পোড়া চাকরি—যে সারাটা বছর বিদেশেই থাকে বাছা।"

শাশুড়ীকে অন্যমনস্ক করিবার অভিপ্রায়ে যোগমায়া বলিল, "আপনি তো আজ ফলার মোটেই খেলেন না, মা ?"

শাশুড়ী বলিলেন, "কি জানি মা, খেতে গেলে কেমন বুকের ভেতরটা হাঁচড়-পাঁচড় করে। কতকাল হ'ল—আকন্দর ডাল মুড়ি দিয়ে রইছি মা, মরণও নেই। চোখের ওপর সোনার বাছা আমার চলে গেল—আর আমি আবাগী—"

যোগমায়া উঠিয়া গেল। কাহারও কান্না সে আজকাল সহিতে পারে না। কেহ কাঁদিলে মনে হয়, তাহারই বুকের গোড়ায় সেই আর্ত্তধ্বনি মাথা কুটিয়া মরিতেছে। সে ধ্বনি তো কাহারও শোকের ধ্বনি নহে—সে মাকে দেখিবার জন্য হৃষীকেশের মৃত্যুকালীন আকুল প্রার্থনা।

খানিক পরে ফিরিয়া আসিতেই শাশুড়ী বলিলেন, "দেখ বউমা, আজকাল আমার মনে ভারি ভয় হয়। তুমি একলা—দুটো কচি ছেলে নিয়ে নিবন্ধ্যা পুরীতে এই দলা বুড়ীকে আগলাচ্ছ, যদি হঠাৎ আমার কিছু হয়—"

যোগমায়া ব্যাকুল স্বরে বলিল, "অমন কথা বলবেন না মা, আমার ভয় করে।"

শাশুড়ী হাসিয়া বলিলেন, "ভয় করে বললে যমরাজা ছাড়বে কেন, মা ? আমার নামটা হঠাৎ যদি তাঁর মনে পড়ে—যদি জোর তলব আসে—তুমি কচিকাচা নিয়ে কি আতান্তরে যে পড়বে মা —তাই ভাবি।"

যোগমায়া সাহস দিবার ছলে বলিল, "এরই মধ্যে ও-সব কথা ভাবছেন কেন মা ? বিমলের বউ আসুক, নাতবউ নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করুন।"

শাশুড়ী বলিলেন, "ইচ্ছে হয় বৈকি মা, কিন্তু ভয়ও করে। বেশী দিন বাঁচলে শুনেছি—ভালোর চেয়ে মন্দই হয়। রতছড়ৎ থাকতে থাকতে দুগ্‌গা বলে যদি যেতে পারি মা—"

যোগমায়া বলিল, "মঙ্গলচণ্ডীর কথা বলুন।"

আশ্চর্য্য, মঙ্গলচণ্ডীর কথা সেদিন ভালো জমিল না। মৃত্যুর প্রসঙ্গ উঠায় শাশুড়ী ও বধূ দুই জনেই উন্মনা হইয়া পড়িয়াছিলেন। কাহিনী বর্ণনে শাশুড়ী কতবার ভুল করিলেন, শ্রোত্রী বধূও অন্যমনস্কতার দরুণ সে ভুল সংশোধন করিবার অবসর পাইল না।

কাহিনী শেষ করিয়া শাশুড়ী বলিলেন, "আজ তোমাকে একটা কথা বলে রাখি, বউমা : যদি আমার অসুখ-বিসুখ করে—যদি কথা বলতে না পারি—তুমি আমার সর্ব্ব অঙ্গে গঙ্গামৃত্তিকে দিয়ে

ইষ্টনাম লিখে দেবে, কানে ইষ্টি মন্তর শোনাবে। আর—আর—"

যোগমায়া আর অমনোযোগী থাকিতে পারিল না, শাশুড়ীকে নিষেধও করিল না, ব্যগ্রস্বরে বলিল, "আর কি, মা?"

"আর রাম যদি না আসতে পারে—বিমল যেন আমার মুখাগ্নি করে, মা। তুমি করলেও ক্ষেতি নেই। বউ তো' নও, মা।"

আঁচলে চক্ষু মুছিয়া যোগমায়া উঠিল।

শাশুড়ী বলিলেন, "কি জানি, আমার খালি মনে হচ্ছে ওপার থেকে ডাক এলো বলে—রামকে বুঝি দেখতে পাব না আর। তাই তার জন্যে মনটা ভারি কেমন করে, মা।"

শাশুড়ী আজকাল প্রায়ই মৃত্যুর কথা বলেন। যোগমায়া প্রতিবাদ করে, নিরুপায় হইয়া কখনও বা সে কাহিনী শোনে। মরণ যেন চোরের মতো ওই কায়েতদের পোড়ো ভিটায় ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। এ-বাড়ীর উঁচু প্রাচীর ডিঙাইয়া যে-কোন মুহূর্তে যে কাহারও কাছে আসিতে পারে। নিষ্ঠুর চোরের মতো—যে-কোন প্রিয়বস্তুকেও ছিনাইয়া লইতে পারে। সারা শীতকাল-ভোর বাগানের পিঁটুলি গাছে কালপেঁচা ডাকিয়াছে। মনে হইয়াছে—কায়েতদের পোড়ো ভিটার জামগাছটায় পাখী বসিয়া আছে। হৃষীকেশের মৃত্যুর পর যোগমায়ার সে ভুল ভাঙিয়াছে। মৃত্যু-দূতরূপী ওই পেঁচাটা জামগাছে বসিয়া ডাকে নাই—ডাকিয়াছে তাহাদেরই বাগানের পিটুলি গাছটায় বসিয়া। নিস্তব্ধ রাত্রির মধ্যযামে সেই রহিয়া-রহিয়া তীব্র ধ্বনি যোগমায়ার বুকের গোড়া কাঁপাইয়া কাটিয়া দিয়া গিয়াছে। সভয়ে সে বিপত্তিভঞ্জন মধুসূদন নাম স্মরণ করিয়াছে। কিন্তু বিপদ কাটে নাই। এখন পাখীর ডাক, দূরে ডাকিলেও মনে হয়—ঘরের কানাচে বসিয়া বুঝি ডাকিতেছে। পিঠাপিঠি দুই বাগানের সীমা নির্দ্দেশই বা করিবে কে? যাহার সংসারে অশুভ ঘটিয়া যায়—পাখী বসিবার সীমানা পরম দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সে স্মরণ করে। আজ কয়দিন হইতে পাখীটা আবার যেন ডাকিতেছে। কোকিলের ভাঙা কণ্ঠস্বরের তালে তাল দিয়া তাহারই গলার সঙ্গে পাল্লা দিয়া সে চীৎকার করিতেছে বুঝি! শাশুড়ীর মনেও নূতনতর বিপদপাতের আশঙ্কা জাগিয়াছে। তাই তিনি নিজের মৃত্যুকামনা করিয়া সংসারের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন।

পরের দিন সকালে শাশুড়ী বলিলেন, "বউমা, আজ আমি শিবপূজো করব।"

"আপনি অত দূর যেতে পারবেন কেন, মা?"

"তা হোক, তুমি ধরে ধরে নিয়ে যাও, মা। অনেক দিন বাবার মাথায় জল-অঘ্যি দিই নি।"

পূজা সারিয়া বলিলেন, "আজ ওদের ভোঁদাকে বলে পাঠাও, নতুন বামুন, খিচুড়ি করে দাও—মিষ্টি আনিয়ে দাও। সংক্রান্তির দিন।"

যথাসময়ে ব্রাহ্মণ ভোজনান্তে দক্ষিণা লইয়া চলিয়া গেল।

যোগমায়া ডাকিল, "এইবার খাবেন চলুন, মা।"

শাশুড়ী বলিলেন, "একবার কাছে এসো তো, মা। দেখি, তোমার হাতখানি? আঃ—কেমন ঠাণ্ডা!"

যোগমায়া চমকিত হইয়া কহিল, "আপনার গা যে গরম হয়েছে, মা! জ্বর হয়েছে নাকি?"

শাশুড়ী হাসিয়া বলিলেন, "কি জানি মা, ক'দিন থেকেই যা খাই কেমন তেতো তেতো লাগে। কিছুতেই রুচি নেই। তা ভয় নেই মা, আমি এত শীগ্‌গির মরছি নে। আমি যদি মরব তে ভুগবে কে?"

যোগমায়া ভীতকণ্ঠে বলিল, "আপনার ছেলেকে নাহয় আসতে লিখি।"

"তাকে ব্যস্ত করবে কেন, মা? সে এলেই কি আমি ভালো হয়ে যাব? যদি তার হাতের আগুন পাওয়া আমার ভাগ্যিতে থাকে—কেউ ঠেকাতে পারবে না, মা। চলো খাইগে।"

"আজ নয় দুধটুকু খেয়ে—"

শাশুড়ী জোর করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, "কচি ছেলের মতো ঢক্ ঢক্ করে দুধ খাওয়া আমি পছন্দ করি নে। কি রেঁধেছ মা? উচ্ছে দিয়ে কলমি-শাক চচ্চড়ি করেছ তো? শয়ন পড়লে আবার কলমি শাক খাওয়া চলবে না। চলো, দুই মায়ে-ঝিয়ে খেয়ে নিই গে।"

মধ্যরাত্রিতে যোগমায়ার ঘুম ভাঙিয়া গেল। অস্ফুট গোঙানির শব্দ—ও ঘর হইতে আসিতেছে। শাশুড়ী গোঙাইতেছেন কি? কি বিশ্রী রাত! গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে অন্ধকার খানিকটা তরল দেখায়, কিন্তু আজ বৈকালে হঠাৎ মেঘ করিয়া রাত্রির আকাশে অন্ধকার জমিয়া উঠিয়াছে। সেই অন্ধকারের মধ্যেও কালপেচকের ঘুৎকার ধ্বনি শোনা যাইতেছে। উঠানের পাতায় কিসের চলা-

ফেরার খস্ খস্ শব্দ। তার উপর পাশের ঘরে অস্ফুট কাতরোক্তি। নানা অশুভ ইঙ্গিতের জঞ্জাল লইয়া রাত্রি ক্রমশঃই ভয়ঙ্করী হইয়া উঠিতেছে। ভয়ে যোগমায়ার বুকের গোড়া ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল। অন্য দিন লণ্ঠনটাও স্তিমিত হইয়া জ্বলে—আজ অসাবধানে দমটা বেশী কমাইয়া দেওয়ায় সেটিও নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। এমন সময় শিবাদল প্রহর ঘোষণা করিয়া যদি না ডাকিয়া উঠিত তো বালিশের তলায় আড়ষ্ট হাতে হাতড়াইয়া দীপ-শলাকার বাক্স খুঁজিয়া লইবার সাহসটুকুও কি যোগমায়া সঞ্চয় করিতে পারিত? আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ঢিপঢিপানি কমিয়া গেল। বিমলকে ঠেলা দিয়া তুলিয়া যোগমায়া বলিল, "ও বিমল, বিমল রে—ওঠ, না বাবা?"

ঠেলাঠেলিতে বিমল উঠিয়া চক্ষু কচলাইতে লাগিল।

যোগমায়া এক হাতে আলোটা লইয়া অন্য হাতে পুত্রের হাত ধরিয়া বলিল, "ও ঘরে তোর ঠাকুমা যেন গোঁঙাচ্ছেন, বাবা।"

শাশুড়ীর শিয়রে আসিয়া যোগমায়া ডাকিল, "মা,—ও মা?"

মাথা নাড়িয়া শাশুড়ী একবার মাত্র বলিলেন, "অ্যাঁ?" তার পর ক্রমশঃ যেন সমুদ্রের অন্ধকারে তলাইয়া যাইতে লাগিলেন।

যোগমায়া আবার আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিল, "মা—ও মা!"

সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া শাশুড়ী কোমরের ঘুনসিতে হাত দিলেন। যোগমায়া ইঙ্গিত বুঝিয়া বড় কাঠের সিন্দুকের চাবিটা খুলিয়া তাঁহার হাতে দিল। তিনি মুঠাশুদ্ধ সেই হাত দিয়া যোগমায়ার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বিস্ফারিত নয়নে একবার চারিদিকে চাহিলেন। মুখে সন্তোষ ফুটিল—কি বিষাদের ছায়া গাঢ় হইল—লণ্ঠনের স্তিমিত আলোয় তাহা অপঠিতই রহিল। আর এক বার শেষ উদ্যমের সঙ্গে তিনি ডান হাতখানি উঠাইলেন। কাঁপিয়া কাঁপিয়া সেই হাতখানি শয্যার উপর পড়িয়া গেল। কয়েকবার ঠোঁট নড়িয়া উঠিল ও চক্ষু ধীরে ধীরে বুজিয়া আসিল।

যোগমায়া আর্ত্ত চীৎকার করিয়া ডাকিল, "মা—ও মা!"

পরদিন প্রাতঃকালে রামচন্দ্রের কাছে যথারীতি তার গেল, কিন্তু সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও রামচন্দ্র যখন পৌঁছিল না, তখন বিমলকে লইয়াই পাড়াপ্রতিবেশীরা শেষকৃত্যের জন্য শ্মশানঘাটে রওনা হইল। আকাশে মেঘসঞ্চার না হইলে আরও কিছুক্ষণ তাহারা অপেক্ষা করিত হয়তো।

নিস্তব্ধ রাত্রি। গৌরী কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। একজন বর্ষীয়সী বিধবা প্রতিবেশিনী যোগমায়াকে আগলাইবার জন্য মেঝের উপর আঁচল পাতিয়া শুইয়াছেন। তাঁহার মৃদু নাসিকা-গর্জ্জনও শোনা যাইতেছে। বাগানের গাছে আজ রাত্রিতে পাখীটা আর অশুভবার্ত্তা বহিয়া রাত্রির আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে না। সে অশুভবার্ত্তা শোনাইবার প্রয়োজন বুঝি তার শেষ হইয়াছে। শৃগাল এখনও প্রহর ঘোষণা করে নাই। গুমোটে গাছের পাতা নড়িতেছে না, ক্বচিৎ পাকা কাঁঠাল পাতা পড়ার টুপ করিয়া শব্দ উঠিতেছে। যোগমায়া কান খাড়া করিয়া বিনিদ্র নয়নে বসিয়া আছে। বিমলেরা এখনও শ্মশান হইতে ফিরে নাই। শ্মশানযাত্রীদের পা ধুইবার জন্য ঘড়ায় করিয়া জল তোলা আছে, আগুন পোহাইবার জন্য কয়েকখানি ঘুঁটে ও খড় এক আঁটি যোগাড় করা আছে, দাঁতে কাটিবার জন্য নিমপাতা ও মিষ্টমুখের জন্য আখের গুড়ের ব্যবস্থাও আছে। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া দূরশ্রুত হরিধ্বনির আওয়াজ কানে আসিলেই যোগমায়া নিদ্রামগ্ন প্রতিবেশীনীকে ঠেলিয়া তুলিয়া ওই সব ব্যবস্থাই হয়তো ধীরে ধীরে করিয়া দিবে। ভয় যোগমায়ার মনে নাই, শোকও স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান লইয়া দণ্ডোত্তীর্ণ রাত্রি যোগমায়াকে ভ্রূকুটি করিবার সাহস পাইতেছে না। শাশুড়ীর দেওয়া বড় কাঠের সিন্দুকের চাবিটা শুধু মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া দূরশ্রুত হরিধ্বনির জন্য সে কান পাতিয়া বসিয়া আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১

এ রাত্রির কিন্তু তুলনা নাই। অমাবস্যা-অভিমুখী তিথি; আকাশে মেঘের সঞ্চার দেখা যায়—কিন্তু এই বাড়ীখানির কোথাও মুখ লুকাইবার জায়গা অন্ধকার পায় নাই। কয়েকটা পেট্রোম্যাক্স ও গ্যাস পূর্ণ তেজে জ্বলিতেছে। চারিদিকে আলোর বন্যা। বৈশাখের অপরাহ্নে মাঝে মাঝে

দুর্য্যোগ নামে বলিয়াই যা একটু ভয়মিশ্রিত আশঙ্কা সকলের মুখে। বাড়ীতে জায়গা আছে প্রচুর, তবু বৈশাখীর ঝড়ে ও জলে সমস্ত আয়োজন পণ্ড করিবার দিবার শক্তিও যথেষ্ট। কর্ম্মকর্ত্তারা ঘন ঘন আকাশের পানে চাহিতেছেন। দুর্য্যোগ শুধুই ভ্রূকুটি দেখাইতেছে—সশরীরে দেখা দিবে না নিশ্চয়। বৈঠকখানায় কিংখাবের বিছানায় কিংখাবের ওয়াড়-দেওয়া বালিশ কয়েকটা সাজানো আছে। মোমবাতিযুক্ত ফানুসের আলো দুই পাশে জ্বলিতেছে, ফুলদানিতে গোলাপ, বেল, গন্ধরাজ প্রভৃতি মিশ্র ফুলের তোড়া সাজানো। ময়ূর পুচ্ছসমন্বিত দুখানি সুন্দর পাখা বিছানার উপর পড়িয়া আছে। আতরদান ও গোলাবপাশের সঙ্গে একগাছি মল্লিকার মোটা মালাও গুছানো রহিয়াছে একখানি রূপার রেকাবির উপর। সে ঘরে উজ্জ্বল আলো জ্বালিয়া ঘরের স্নিগ্ধতা ও রহস্যময়তাকে কেহ নষ্ট করে নাই। ছোট ছেলেমেয়েদের এখনও বিছানার ধারে ঘেঁষিতে দেওয়া হইতেছে না। গন্ধ ও ফুলের উপর উহাদের লোভ সর্ব্বজনবিদিত। বাতিদানের ফানুসের উপর বা কিংখাবে মোড়া বালিশের বিছানার উপরও যে লোভ নাই—এমন কথাও বলা যায় না। বরাসনে বসিয়া মালা গলায় দিয়া আরসিতে মুখ দেখিবার আকাঙ্ক্ষা আর একটু বড় কিশোরদের মধ্যে হয়তো আছে। কিন্তু তাহারা আজ ফরসা ধুতি ও গেঞ্জি গায়ে দিয়া বিজ্ঞের মতো এধার-ওধার ঘুরিয়া ছোটদের উপর হুকুম চালাইয়া আরসির সামনে আসিয়া অকারণেই হয়তো বা একবার মুখ হইতে বুক ও পিঠ যতটা দেখা যায়—ভঙ্গি সহকারে দেখিয়া লইতেছে এবং সেই অপূর্ণ সাধকে মিটাইয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছে।

তবু তাহাদের হুঁসিয়ার করিয়া যুবকেরা অভ্যর্থনার কায়দাগুলি বারবার বুঝাইয়া দিতেছে—

"বরযাত্রীরা এলে—গোলাপ জলের পিচকিরি ছুড়বে। গলায় মালা দেবে সকলের—বাড়ী ঢোকবার মুখে। এই থালায় করে পান-সিগারেট দেবে। যে চায়—চা দেবে। তোমরা দেবে মালা, তোমরা ছিটোবে গোলাপ জল, তোমরা পান-সিগারেট—"

অস্থায়ী রন্ধনশালায় উপদেশ চলিতেছে।—

"কুমড়োর ছক্কাটা নামিয়ে পটোলের দম চাপিয়ে দাও, ঠাকুর। খবরদার, লুচি এখন ভাজবে না, বরযাত্রীরা বসলে গরম গরম ভেজে দেবে। পারবে না ঠাকুর? মোটে এক-শ জনের জায়গা হয়েছে ছাদে? আচ্ছা—আচ্ছা—কিছু লুচি তো ভেজে রাখো—তারপর দুটো উনুনে—"

বারান্দার মধ্যে যেখানে বিবাহ-অনুষ্ঠান হইবে সেখানে পুরোহিতের কণ্ঠস্বরের প্রভাব: "একখানা জলচৌকি করে দানসামগ্রী সাজিয়ে রাখতে হয়—এ ব্যবস্থা কি কোথাও দেখ নি? দূর পাগল! নোট কখনও দেয়! থালায় করে টাকা সাজিয়ে সামনে রাখবে। দুব্বো, তুলসীপাতা, ফুল, চেলি, পৈতে সব এই ডান দিকে রাখো। হ্যাঁ, ঘিয়ের প্রদীপ তো জ্বলবেই। ঘট কই? জলপূর্ণ ঘট? কন্যা-সম্প্রদানের সময় উলু দেবে সব ডাঁকিয়ে।"

ছাঁদনাতলায় বর্ষীয়সীদের নানাকণ্ঠ: "হ্যাগা, কলার তেড়গুলো যেন হেলে রয়েছে—আর একটু পুঁতে দাও না। শিলখানা একটু উত্তুর মুখে সরিয়ে দাও। চিতের কাঠি, ধুতরোর পিদিম, মাকু, স্যতো, ছিবি, বরণডালা সব গুছিয়ে রেখ। এক এক এয়ো মাথায় করে—ঘুরবে—আর উলু দেবে। বাঃ, খাসা আলপনা হয়েছে পিঁড়িতে, কে দিলে? পিঁড়ি-বইয়েদের পিঠে গুমাগুম করে জোরে কিল বসিয়ে দিবি কিন্তু। নাপতে মুখপোড়া ছড়া বলতে পারবে তো শুভদৃষ্টির সময়, না কমলাদের বড়ীর মতো—"

মেয়েকে ঘিরিয়া তরুণীদের গুঞ্জনধ্বনি শোনা যায়: "তা যাই বলো না ভাই—বাউটি, নারকোল-ফুল, ওসব সেকেলে গয়না না পরানোই ভালো। বরফিকাটা চুড়ি, হাঙ্গরমুখো বালা, অনন্ত, হেলে হার, সিঁথি—বেশ মানাবে। পাইজোড় দিতেও পারো, গলার চিকও না হয় থাক। ময়ূরকণ্ঠি বেনারসী শাড়ীতে গৌরীকে বেশ মানাচ্ছে, ভাই! আজ বুঝি চুল বাঁধতে আছে? এলো খোঁপাই থাক্। কাজললতা হাতে করে থাকবি গৌরী, খবরদার ভুলে যেন কোথাও ফেলিস নে।"

নিচের ঘরে কমলা যোগমায়াকে বুঝাইতে-ছিলেন, "কাঁদিস কেন বউ, এমন আনন্দের দিনে—"

যোগমায়া বলিলেন, "যার কথা মনে পড়ে ভাই, হৃষীকেশের কথা মনে পড়ে।"

"আনন্দের দিনে সবাইয়ের কথা মনে পড়ে। তাঁরা স্বর্গে থেকে ওঁদের আশীর্ব্বাদ করবেন ভাই। আয়, আর কি গুছোতে হবে দেখিগে।

আরও কয়েকটি বছরের জোয়ার যোগমায়ার দেহের উপর দিয়া বহিয়াছে। নদীর গতি যেমন বক্রগামিনী, তেমনই বক্রগামিনী রূপের গতিতে

যোগমায়ার তট-মৃত্তিকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যেখানে ছিল শ্যামল শস্যক্ষেত্র—সেখানে জমিয়াছে ধূসর বালু। যে তটের উচ্চতা ছিল আকাশমুখী—সে তট ভাঙিয়া ঢালু কিনার গড়িয়াছে। চুলে শুভ্রবিন্দু ফুটিয়াছে, গালের চামড়া লোল হইয়া অসংখ্য রেখায় আকীর্ণ হইয়া মুখ-লাবণ্যকে চুরি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। রোমহীন ভ্রূ, ঈষৎ ঝুলিয়া-পড়া ওষ্ঠ, বলিরেখাঙ্কিত ললাট—তবু রং যেন আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। প্রৌঢ়ত্বের শেষ সোপানে পা রাখিয়া কোন কোন নারী এমনই মহিমান্বিতা হইয়া উঠেন।

অলস গতিতে যোগমায়া উপরের ঘরে উঠিয়া গেলেন। যে ঘরে সঙ্গিনীপরিবৃতা গৌরী বসিয়া আছে—সেই ঘরের খোলা দ্বারপথে একবার উঁকি মারিলেন। সঙ্গিনীরা গৌরীর বেশভূষা প্রায় সমাপ্ত করিয়া দিয়াছে। সেকালের অলঙ্কার গৌরীর গায়ে দেখা যায় না, তবু গৌরীর মাজা-রঙের সুঠাম তনু ঘিরিয়া ময়ূরকণ্ঠী বেনারসী শাড়ী পরাইবার পারিপাট্য যোগমায়ার ভালোই লাগিল। এ কালের গহনাগুলিও গৌরীর গায়ে চমৎকার মানাইয়াছে। ফাঁপাইয়া এলো খোঁপা বাঁধিবার সুষ্ঠু রীতি আর কনেচন্দনআঁকা দেহবর্ণের চেয়ে উজ্জ্বল মুখ—নীলসায়রের জলে রূপসৌন্দর্য্য ভরা একটি পদ্ম-ফুলের মতোই ফুটিয়াছে। কবরীর উপর গোঁজা কাজললতাটি পদ্মকোরকের মতোই উদ্যত হইয়া আছে। আজকাল বাল্যবিবাহ উঠিয়া যাইতেছে; চতুর্দ্দশী গৌরীর যৌবন-লাবণ্যের সঙ্গে এই সজ্জা ঝলমলে বা আড়ষ্ট বোধ হইতেছে না। মায়ের চোখে নিজের সন্তান সুন্দরই দেখায় চিরকাল, তবু চিরকালের মমতা-মাখা দৃষ্টি না লইয়াও যে কেহ গৌরীকে আজ অসঙ্কোচে সুন্দরীই বলিবে। উপবাসক্লিষ্টা গৌরী—একবারও ক্ষুধার কথা মাকে জানায় নাই। কোন বর্ষীয়সী যদি বলিয়াছেন, "যা হোক্ একটু কাঁচা দুধ বা সন্দেশ খেতে পারো। খাবে মা?"—গৌরী হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়াছে সে প্রস্তাব। চতুর্দ্দশী মেয়ে—শ্বশুরবাড়ী সম্বন্ধে কোন ভীতিজনক সংস্কার তার মনে নাই, সংস্কারের কল্যাণ-অকল্যাণের ব্যাপারও সে বুঝিতে পারে, শুধু আজন্ম-পরিচিত এক বাড়ী হইতে সম্পূর্ণ অপরিচিত অন্য এক বাড়ী যাওয়ার উদ্বেগ ও আনন্দ সেই মুখের লজ্জা-কোমল হাসি বা সংক্ষিপ্ত কথার মৃদু সুরের মধ্যে মাঝে মাঝে ফুটিয়া উঠিতেছে। চারিদিকে যে-সব সঙ্গিনী—হাসি গল্পে গৌরীকে মাতাইয়া রাখিয়াছে—তাহারাও নারীর এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রমের স্বরূপতত্ত্ব বারবার হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেছে বুঝি। মেয়ের বিচ্ছেদে যোগমায়ার মনে ব্যথাও জমিতেছে, মেয়ের হাসি-হাসি মুখ দেখিয়া খুশী মনে ভগবানকে ডাকিতেছে তেমনই, "হে ভগবান, ওদের দু'টিকে সুখী ক'রো, হে ভগবান!"

বাহিরের বাদ্যভাণ্ডের তুমুল ধ্বনি উঠিল। বাড়ীর প্রত্যেক ব্যক্তিটি ভীষণ ভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিল। কোলাহলে কে কাহার কথা শোনে! বর আসিতেছে। গৌরীর সঙ্গিনীরা ঠেলাঠেলি করিয়া বারান্দা দিয়া পাশের ঘরে প্রবেশ করিতে লাগিল। বৈঠকখানার পাশেই দ্বিতলের ওই ঘরের জানালায় গিয়া দাঁড়াইলেই শোভাযাত্রাসমেত বরকে ভালোভাবেই দেখা যাইবে। ঘরে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় অনেকে ছাদের উপর উঠিলেন।

কমলা নিচে হইতে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া যোগমায়ার কাছে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "ছাদে চলো, বউ। লাজের ধামাটা আমি নিয়ে এলাম, সবাইয়ের আঁচলে কিছু কিছু দেব।"

তুমুল শঙ্খ ও হুলুধ্বনি এবং প্রবল বেগে লাজবর্ষণের মধ্যে সদর দুয়ারে আসিয়া বর নামিল।

এ-বাড়ীর রোশনচৌকির ক্ষীণ সুর ডুবাইয়া কর্ণবিদারী রবে উহাদের ইংরেজি বাজনা বাজিতে লাগিল। রামচন্দ্র আসিয়া বরকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

ছাদের আলিসায় হেলিয়া-পড়া যোগমায়ার চোখের কোণ হইতে—এমন আনন্দের ক্ষণেও টপ টপ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল। তাঁহার হৃষীকেশ বাঁচিয়া থাকিলে—এমনটিই হয়তো হইত।

ছাদের উপর হইতে সকলেই নামিয়া গেল, যোগমায়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন শুধু। প্রায়ান্ধকার ছাদ, সিঁড়ির মুখে একটি আর দক্ষিণ কোণে একটি করিয়া গ্যাস জ্বলিতেছে। অবশ্য একটু পরে আরও কয়েকটি বাতি উপরে জ্বলিলে এইটুকু অন্ধকার আর থাকিবে না। এখন নীচের অত্যুগ্র আলোকরশ্মি ছাদের আলিসা স্পর্শ করিয়া আম-কাঁঠাল গাছের পাতাগুলিকে স্নান করাইয়া দিতেছে। নিচের কোলাহল ও কলরব জমিয়া উঠিয়াছে। এই বাড়ীর চারিপাশেই একটা ঝড় উঠিয়াছে—আনন্দের ঝড়। তবে এই

ঝড়ের পরমায়ু খুব বেশী নহে, কাল-বৈশাখীর মতোই সে কয়েকটি মুহূর্ত্তকে সচকিত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। মাথার উপর আকাশের এক কোণে খানিকটা মেঘ এখনও লাগিয়া আছে; ছড়ানো নক্ষত্রের দ্যুতিতে আকাশের বেশীর ভাগেই প্রসন্নতা সুস্পষ্ট। যোগমায়ার মনে হইল—ওই সর্ব্বব্যাপী নীলাম্বরের নির্ব্বাক মহিমার ছটা তাঁহার ললাট স্পর্শ করিতেছে। আকাশের মতো বিস্তারও বাড়িতেছে, আকাশের রত্নদ্যুতিতে তিনি দ্যুতিষ্মান এবং ওর প্রসন্নতার ছোঁয়াচ তাঁহার অঙ্গে আসিয়া লাগিতেছে। কাহাকে ঘিরিয়া এহ সংসার? এই সুন্দর রচনা কোন্ শুভ প্রভাতে কোন্ কল্যাণময়ীর কোমল করস্পর্শে প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল? এই বংশের গৌবব বহিয়া যে অনামী পূর্ব্বপুরুষেবা এক দিন এই ভিটাব কোলে উৎসবেব মাঙ্গলিক সুরু করিয়াছিলেন—অনন্ত কাল তাঁহাদের হয়তো বা ওই আকাশের রাজ্য নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে মিশাইয়া দিয়াছে। বস্তু-ভার-নিপীড়িতা পৃথিবীতে বহু বস্তুরই বিলোপ ঘটিতেছে, কিন্তু সমস্ত মণিব গ্রন্থন-কার্য্যে যেমন একটি সূত্রেই পরিচয়-লিপির প্রকট—তেমনই এই বংশের ইতিহাস। ইহার পূর্ব্বেব ইতিহাস যোগমায়া জানেন না, পরের ইতিহাস রচনার ভার যাঁহাদের হাতে দিয়া যাইবেন—তাঁহারা প্রথা অনুসরণ করিবেন, কি রীতি লঙ্ঘন করিবেন সে-সব ভাবিবার অবসর যোগমায়ার নাই, তবু 'রঘু'র সেই এক প্রদীপ হইতে আর এক প্রদীপ জ্বালার মতো—কতকগুলি আচার-নিয়মের মধ্য দিয়া এই বংশের ধারাটিকে লালন করিবার নির্দ্দেশ শুধু তিনি দিয়া যাইবেন। প্রথা নহে—সিন্দুকের চাবি। বংশকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য এই সিন্দুকের চাবি যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এক হাত হইতে অন্য হাতে ঘুরিতেছে।···এমনই অস্পষ্ট একটা ভাব-তরঙ্গ যোগমায়ার মনকে নাড়া দিতে লাগিল। আজ আকাশের নক্ষত্ররাজির পানে চাহিয়া অপরিচিত পূর্ব্বপুরুষদের উদ্দেশে নতি ছাড়া তিনি কিছু দিতে পারিলেন না, আশীর্ব্বাদ ছাড়া অন্য প্রার্থনা তাঁহার মনে আসিল না। আজ সমাগত কুটুম্ব কুটুম্বিনীগণের মান-মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সতর্ক চক্ষু ও অনলস কর্ম্ম ছাড়া অন্য কোন নৈপুণ্যের মূল্য তাঁহার কাছে নাই।

বিবাহ-বাড়ীর প্রচণ্ড কোলাহল ও তীব্র আলোর ঊর্দ্ধে থাকিয়াও তাই মুহূর্ত্তের জন্যই হয়তো তাঁহার মনে হইল, এই সমস্ত তাঁহারই রচনা। ঈশ্বরকে বাদ দিয়া সে রচনা তাঁহার নহে, কিন্তু মানুষকে কাছে টানিবার আয়োজন ঈশ্বরেরই ইঙ্গিতে মানুষকে নিজের হাতে করিতে হয়। কাজের শৃঙ্খলা বিধানের জন্য সুকর্ত্রীত্বের যথেষ্ট মূল্য আছে।

নিচেয় নামিয়া আসিলেন। বিমলের ব্যস্ততার অন্ত নাই। সকাল হইতে আহার করিয়াছে কিনা সে সংবাদ লইবার অবসর যোগমায়ার হয় নাই। না'ই বা খাইল, ওর শুক্‌না মুখের পানে চাহিয়া মাতৃস্নেহ উদ্বেল হইয়া উঠিবার মতো অবসর আজ যোগমায়ার নাই। উপবাসী স্বামী কর্ত্তব্যের এক বাহুতে প্রসারিত হইয়া এক দিক ধরিয়াছেন, অর্দ্ধভুক্ত বিমল আর এক বাহুরূপে অন্য দিকের কর্ম্মভার সুশৃঙ্খলিত করিতেছে—মাঝখানে হৃদয়-রূপিণী যোগমায়া। আজ কেহ কাহারও পানে চাহিলে কর্ত্তব্যত্রুটিতে বংশের অপযশ ঘটিতে পারে। সুতবাং কেহ কাহারও পানে চান নাই। ক্লিষ্ট মুখের হাসির দ্বাবা, কর্ম্মোৎক্ষিপ্ত করের দ্বারা, চঞ্চল পায়ের গতির দ্বারা শুধু নিমন্ত্রিতদেব তৃপ্তি বিধান কবিতেছেন; একটির পর একটি কাজ—শরৎকালের পুকুর ভরিয়া পদ্ম-ফোটার ধ্রুব সৌন্দর্য্যের মতো—একটির পর একটি কাজ জন্মলাভ করিতেছে।

"মা, পাতাগুলো ধুয়ে কোথায় রেখেছে, জানো?" হাঁপাইতে হাঁপাইতে বিমল প্রশ্ন করিল।

ছুটিতে ছুটিতে যোগমায়া বারান্দার কোণে আসিয়া বলিলেন, "এই যে।"

"ভাঁড়ারে কে আছেন? জিনিসপত্তর সব ঠিকমত বার করে দিতে পারবেন তো?"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ—তোর মামীমা আর মামাকে ভাঁড়ারে রেখেছি।" গলা নামাইয়া বলিলেন, "পাড়ার লোকের স্বভাব তো জানি! শেষকালে অসম্ভ্রমে পড়ব।"

রান্নাঘরের পাশে তর্জ্জন ও ক্রন্দনের ধ্বনি শোনা গেল। যোগমায়া সেই দিকে ছুটিলেন।—

"কি হ'ল, ঠাকুরঝি?"

"হবে আবার কি! তোমার আদরের মুকী-ঝি কুটনোর খোসার মধ্যে মাছ নিয়ে পালাচ্ছিলেন। ধরা পড়ে এখন কান্না!"

মুকী ওরফে মোক্ষদা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমি কি করে জানব মা, যে ওর মধ্যে মাছ রয়েছে? বলি, জঞ্জালটা ফেলে দিয়ে আসি। যে

এ কাজ করেছে সে যেন চোখের মাথা খায়, সে যেন—”

“চুপ কর্ মুকী, গাল-গালাজ করিস নে। যেই করুক, কাজটা অন্যায়। চুরি বিদ্যে কেন? যার যত ইচ্ছে পেটপুরে খাও না—বারণ তো কেউ করছে না।”

মোক্ষদা ক্রন্দন ছাড়িয়া সবিস্তারে আরম্ভ করিল, “খাওয়ার কি কমতি কিছু আছে মা? এই এত মুড়ি—এত মণ্ডা—এত ভাত-মাছ। এত খেয়েও যাদের এই ব্যাভার—তাদের যেন—”

“যা, গেলাসগুলো ঝুড়ি করে ওপরে উঠিয়ে দিগে।” আদেশ দিয়া যোগমায়া মেয়েদের অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন, “এসো—মা, এসো। বউমাকে নিয়ে এলে না যে? অসুখ? কি অসুখ? কৈ—তা তো শুনি নি। গৌরীকে আশীর্ব্বাদ করে আসুন। আরে আমার একি ভাগ্যি—তুমি যে বাপের বাড়ী থেকে এসে পড়বে স্বপ্নেও ভাবি নি। ছেলেরা এসেছে তো? বেশ, বেশ। ঠাকুরঝি, তুমি ভাই একটি কাজ করো—যিনি নেমন্তন্নয় যে-সব মেয়েরা এসেছে—তারা যেন ফিরে না যায়। তাদের পাতা পেতে পেট ভরে খাইয়ে দিও, ভাই। ওদের খাওয়ানোই আসল কাজ। পুরুতমশাই বুঝি ডাকছেন? আমি চললাম ভাই।”

কর্ম্মের স্রোতে ঈষৎ ভাটা পড়িলে যোগমায়া বাসরঘরের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সে-ঘরে তখন হারমোনিয়মের সুরে সানুনাসিক গলায় একটি মেয়ে গান ধরিয়াছে। গান না বলিয়া নাকি সুরের ছড়া আবৃত্তি বলিলেই ভালো হয়। সেই গানের যথেষ্ট প্রশংসা ও স্তুতি শেষ হইলে আর একবার গাহিবার জন্য অনুরোধ চলিতেছে। গৌরী এক কোণে আধ-ঘোমটার মধ্যে মুচকি মুচকি হাসিতেছে, জামাই ইহাদের সুর-সঙ্গতের মধ্যে নিতান্ত অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। বেচারার মুখ দেখিলে মায়া হয়। সারারাত্রি যদি এইরূপ গানের প্রস্রবণ বহিতে থাকে—ছেলেমানুষ জামাইয়ের অসুখ করিতে কতক্ষণ! যোগমায়ার কয়েকবার নিষেধ সত্ত্বেও মেয়েদের উৎসাহ তিলমাত্রও স্তিমিত হয় নাই। জামাই গান জানে না বলিয়া হাত জোড় করিয়াছে, অনেক তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ সহ্য করিয়াও গীত-শক্তির পরিচয় সে দিতে পারে নাই। সেই আক্রোশে বা সুযোগে মেয়েদের গীত-স্পৃহা হয়তো বা প্রবলতর হইয়াছে। বাড়ীতে কাহারই বা গান গাহিবার কতটুকু অবসর মিলে? এমন দুই-একটি বাসর ঘর না বসিলে—ছেলেবেলার শেখা সুর-বিদ্যার কি দুর্দ্দশাই না ঘটিত!

দুয়ারে মাঝে মাঝে আসিয়া দাঁড়াইবার এইটিই একমাত্র হেতু নহে। যোগমায়া জানেন, আজিকার নিষেধ নিষ্ফল। জামাইয়ের কষ্ট হইবে—কিন্তু অসুখ না-ও করিতে পারে; সকলেরই এমন পরীক্ষার সময় আসে। তবু নিষেধ করার অজুহাতে জামাইটিকে মাঝে মাঝে দেখিবার প্রলোভন তিনি দমন করিতে পারিতেছেন না। এ যে বিমল নহে—তাহা তিনি জানেন, কিন্তু পুত্র না হইয়াও পুত্রের স্নেহে এবং আরও কোন অলক্ষ্য—প্রসারিত রজ্জুর দ্বারা ও যেন যোগমায়াকে আকর্ষণ করিতেছে—তাহাও তিনি বুঝিতে পারিতেছেন। শ্যামবর্ণের ছিপছিপে ছেলেটির চোখ দু'টি ভারি সুন্দর; ঘনযুগ্ম ভ্রূ—কোমল মুখে সলজ্জ হাসি—চন্দন-অঙ্কিত সুগঠিত প্রশস্ত ললাট—ঈষৎ কোঁকড়া ও ঈষৎ লম্বা কালো চুল। ঘাড় হেলাইয়া ও যখন গান গাহিবার অক্ষমতা জানায় ও হাত নাড়িয়া যখন পান লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে—তখন কি সুন্দরই যে দেখায় ওকে! যোগমায়ার ইচ্ছা করে—কাছে বসাইয়া একটু গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া ওকে আদর করেন, খানিকক্ষণ ধরিয়া ওর সঙ্গে কথা বলেন। ওর একবার অস্পষ্ট সলজ্জ 'মা' ডাক শুনিয়া সারা শরীর শিহরিয়া উঠিয়াছে যোগমায়ার। না, এমন কোমল চেহারা যাহার—তাহার হাতে পড়িয়া গৌরী সুখীই হইবে।

“ওরে অনেক রাত হয়েছে, তোরা একটু শুতে দে বাছাকে।”

মেয়েরা কলরব করিয়া আপত্তি জানাইল, “আঃ, জ্যেঠিমা যেন কি! আমরা কি তোমার জামাইকে খেয়ে ফেলব বাপু? একটা গান শুনিয়ে দিলেই তো পারেন। এত সাধছি—কাঠের মানুষ হ'লেও গেয়ে ফেলে—তা তোমার জামাই বাপু—”

হাসিতে হাসিতে যোগমায় পলাইয়া যান।

রাত্রি আরও গভীর হইয়াছে। আকাশে মেঘ আর এক টুকরাও নাই—উজ্জ্বল নক্ষত্রে সে আকাশ মাথার উপর ঘন নীল দেখাইতেছে। বাড়ীর চারিদিকে আলোর বন্যায় টান ধরিয়াছে। অনেক-গুলি গ্যাসই নিবিয়া গিয়াছে, কয়েকটা স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে; ডেলাইট দুইটাও প্রায় নিবিয়া আসিতেছে। সকলের আহারাদি শেষ হইয়াছে। যে যেখানে পারিয়াছে—চাদর মুড়ি দিয়া বা খালি গায়ে ঘুম দিতেছে। প্রাচীরের ওপিঠে ফেলিয়া

দেওয়া পাতা, গ্লাস ও খুরি-মুচির উপর ভোজ্যলোভী সারমেয়দলের বিবাদ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

দ্বিতলের ছাদে উঠিবার সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া যোগমায়া স্তব্ধ প্রকৃতির পানে একবার ফিরিয়া চাহিলেন। সারা দিনের গুরু পরিশ্রম—সুযোগ বুঝিয়া পায়ে ও সারা অঙ্গে ক্লান্তির বোঝা নামাইয়া দিয়াছে; সেই আলস্যের ভারে চোখের পাতা দুইটিও ভারি হইয়া আসিয়াছে। ঘরের মধ্যে আজ স্থানাভাব। ছাদেরই এক কোণে না-হয় একটু বিশ্রামের আয়োজন করিতে হইবে।... আকাশের অনেকগুলি তারাও ম্লান হইয়া ছল ছল করিতেছে, কৃষ্ণা তিথির কলা-ক্ষীণ চাঁদ পশ্চিম আকাশের প্রান্তে ছোট কাস্তের মতো দেখা দিয়াছে, তার একটু দূরে জলজ্বলে প্রভাতী তারাটা উঠিয়াছে। রাত প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আধ-নিবন্ত গ্যাসটা হাতে লইয়া যোগমায়া উপরে উঠিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্রও একটা গ্যাস হাতে করিয়া নামিতে-ছিলেন। মাঝ পথে দুইজনের দেখা। স্তিমিত গ্যাসের আলোয় পরস্পরকে অদ্ভুত দেখাইতেছিল। যোগমায়া গ্যাসটা সিঁড়ির এক প্রান্তে রাখিয়া কহিলেন, "এত রাত্তির অবধি ছাদে কি করছিলে? খাওয়া হয়েছে?"

রামচন্দ্রও গ্যাসটা নামাইয়া রাখিয়া কহিলেন, "এত রাত্রে খাবার ইচ্ছে নেই, একটু শোবার জায়গা খুঁজছি।"

যোগমায়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বাড়ীর কর্ত্তা তুমি—না পেলে খেতে—না হ'ল তোমার শোওয়া!"

রামচন্দ্র হাসিলেন, "বাড়ীর গিন্নীর অবস্থাও বিশেষ সুবিধে বলে বোধ হচ্ছে না!"

মাথা নাড়িয়া যোগমায়া বলিলেন, "যাই হোক্, এ সব ব্যবস্থা বাড়ীর গিন্নীরই হাতে। দেখি, বউকে তুলে ভাঁড়ারের চাবিটা খুলি। একটু মিষ্টি অন্ততঃ—"

রামচন্দ্র আরও দুই ধাপ নামিয়া আসিয়া যোগমায়ার পাশ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইলেন ও তাঁহার কাঁধে একখানি হাত রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "চলো, এক সঙ্গেই খাওয়া যাক্।"

"আমার খিদে নেই।"

"আমারও তাহ'লে নেই।"—বলিয়া প্রৌঢ় রামচন্দ্র একবার দ্রুত দৃষ্টিতে আকাশের পানে চাহিয়া যোগমায়ার মুখের উপরে সেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিলেন, "আকাশ ফিকে হয়ে আসছে—রাত আর নাই।" পরে যোগমায়ার কাঁধের উপর সস্নেহ দোলা দিয়া রহস্য করিলেন, "আমাদেরই মতো ফিকে হয়ে আসছে, মায়া!"

"ধ্যেৎ!" প্রৌঢ়ার ক্ষণ-লজ্জিত মুখে অরুণ-রাগ ফুটিল। গ্রীবাভঙ্গী করিয়া যোগমায়া হাসিয়া উঠিলেন।

মুগ্ধ রামচন্দ্র যোগমায়ার মুখের কাছে মুখ নামাইয়া অস্ফুট স্বরে এবং হয়তো বা গদ্‌গদ্ স্বরেও বলিলেন, "না মায়া, ভুল বলেছি। আমাদের রাত ফিকে হবে না কোন দিন।"

আত্মদমন করিয়া যোগমায়া রামচন্দ্রের হাত ধরিয়া উপরে টানিতে টানিতে বলিলেন, "এসো, রাত পুইয়ে গেলে অনেক কাজ। তোমার সঙ্গে কথা কইবার সময় এর পর অনেক পাব।"

পূবের আকাশ যেমন পশ্চিমের আকাশকে শাসন করিতেছে—এই শাসনও অনেকটা সেই প্রকার। তবে পশ্চিমের আকাশের গায়ে পূর্ণ না হউক—কলাক্ষীণ এক টুকরা ঐশ্বর্য্য এখনও লাগিয়া আছে, তাই পূবের আকাশের রক্তময় ভ্রূকুটিকে ভ্রূক্ষেপ করিবার অবসর তাহার নাই। এখনও সে রাত্রির মায়াস্বপ্নে বিভোর।

২

অষ্টবর্দ্ধনে মেয়ে-জামাই আসিলে যোগমায়া নূতন করিয়া মাথার ঘোমটা তুলিয়া দিলেন। শাশুড়ীর মৃত্যুর পর দীর্ঘ কয়টি বৎসরে যোগমায়া পুরা গৃহিণীতে পরিণত হইয়াছেন। পুত্রকন্যার সম্মুখেই মাথায় কাপড়টা মাত্র দিয়া রামচন্দ্রের সঙ্গে সংসার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলেন, বাদানুবাদও চলে। আজ নূতন একটি প্রাণীকে লইয়া—পুরাতন হইয়াও যোগমায়া পুনরায় নূতন হইলেন। শুধুই ঘোমটা টানিলেন না, গলার স্বরটিও কোমল করিলেন, মন্থর হইল পায়ের গতি।

রামচন্দ্র অলক্ষ্যে মুখ টিপিয়া বার কয়েক হাসিয়া এক অবসর সময়ে চাপা গলায় বলিলেন, "বেশ লাগছে মায়া, তোমার এই নতুন হওয়া। কি করব বলো, অনেকগুলো চুল আমার হঠাৎই পেকে গেল—নইলে—"

"মেয়ে-জামাই রয়েছে না ও-ঘরে?" চাপা ভর্ৎসনায় যোগমায়া স্বামীকে শাসন করিলেন।

রামচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হায় রে সেকাল!"

যোগমায়া হাসিয়া ফেলিলেন, "সেকালের অপরাধ?"

"অপরাধ অনেক। দিনের বেলায় তোমার দর্শন পাওয়া ছিল অনেকটা কঠোর তপস্যার শেষে বরলাভের মতো। আর একালেও মেয়ে-জামাইয়ের ভয়ে দিনের বেলায় দুটো সুখ-দুঃখের কথাও কইতে পারি নে। কপালটাই আমার মন্দ।"

যোগমায়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তাই ওদের সামনে—"

"না না, আমাদের লজ্জাটা'ই চিরকাল বাঁচিয়ে এসেছি—চিরকালই বাঁচাতে হবে। ওরা তো লজ্জার ধার ঘেঁষেও গেল না।"

যোগমায়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিলেন, "তা যাই বলো বাপু, একালের মেয়েছেলেরা সব বেহায়া। দেখলে না, গৌরী শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় যখন প্রণাম করতে এলো—গাঁটছড়া-বাঁধা জামাইটিকে পর্য্যন্ত হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে এলো। আমার সামনে কত কথাই বললে।"

রামচন্দ্র বলিলেন, "তোমার কি মনে হ'ল?"

"ভারি লজ্জা করতে লাগল। এক রাত্তির বিয়ে হয়ে যেন কতকালের জানাশোনা ওদের।"

"জন্ম-জন্মান্তরের বাঁধন—এ কি যে সে কথা!"

"যাও—রাগিয়ো না! অমন বেহায়াপনা—"

রামচন্দ্র বলিলেন, "কালের যা গতি—কেউ হাত দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে পারে? বিমলের যখন বউ আসবে—"

"হ্যাঁ, ভালো করে না দেখে শুনে যে-সে ঘর থেকে বউ আনছি কিনা?"

"ছেলে যদি লভে পড়ে বিয়ে করে?" যোগমায়াকে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া রামচন্দ্র হাসিলেন, "লভে মানে, ওদের ভালোবাসা হয়ে যদি বিয়ে হয়?"

যোগমায়া বলিলেন, "বিয়ে হ'লেই তো ভালোবাসা হবে।"

"না না, সে হ'ত আমাদের কালে। এখন বিয়ের আগে ভালোবাসা।"

"পোড়া কপাল!" মুখ ফিরাইলেন যোগমায়া। মুখে কয়েকটি রেখা ফুটিল; বলিলেন, "তাহ'লে ঘোর কলিকাল বলো?"

"কলিকালই তো। আমারও মাঝে মাঝে লোভ হয়, মায়া—এই কলিকালের মানুষ হতে।"

"তা হ'লেই তো পারো।"

"কৈ আর পারি? যে সত্যযুগের বাধনে বেঁধে রেখেছ।"

"কেন, খুলে দিচ্ছি বাঁধন—ভালোবাসা করে বিয়ে করোগে।"

"গালের চামড়া থল থল করছে—মাথার চুল সাদা হয়ে আসছে।"

"তা হোক। আশী বছুরে বুড়ো যদি বিয়ে করতে পারে—"

"তুমি রাগ করলে, মায়া?" দু'হাত দিয়া যোগমায়ার ঘাড় ঘুরাইয়া রামচন্দ্র হাসিলেন।

"করলামই তো রাগ। আমার তো মনে হয়, আমাদের কালই ছিল ভালো। ছিল কি না?"

সজোরে হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া রামচন্দ্র বলিলেন, "নিশ্চয়—নিশ্চয়।"

যোগমায়া বলিলেন, "ঠাট্টা রাখো। আজ সকাল সকাল বাজারে গিয়ে ভালো মাছটাছ নিয়ে এসো। আর দেখ—শান্তিপুরের ভালো জরিপাড় ধুতি এক জোড়া আনবে।"

"প্রণামীর অনেক টাকা পেয়েছ বুঝি?"

"সে টাকা বুঝি খেয়ে বসে থাকব? টাকা বাড়িয়ে দিতে হবে না?"

"বটে! দেনা-পাওনার জের এখনও চলবে?"

"যাও দেখি বাজারে।"—রামচন্দ্র চলিয়া গেলে যোগমায়া রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিলেন। এমন সময় গৌরী আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল।

"কিরে গৌরী, কিছু বলবি?"

গৌরী মুখখানা একটু নামাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আজ কি রান্না করছ মা?"

"কি আর! গ্রীষ্মকালে কি আর ভালো তরিতরকারী পাওয়া যায়—খালি পটোল। ওঁকে বললাম ভালো দেখে মাছ আনতে—"

গৌরী বলিল, "ওদের বাড়ী খাবার যা হাঙ্গামা দেখে এলাম—তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

"কি হাঙ্গামা রে?" যোগমায়া সোৎসুকে প্রশ্ন করিলেন, "যদি জামাইয়ের কিছু অসুবিধে হয় তো—নাহয় বল্।"

"অসুবিধে কি জানো?"—বলিয়া গৌরী একখানি পিঁড়ি টানিয়া মায়ের কাছ ঘেঁষিয়া বসিল ও কণ্ঠস্বর নামাইয়া কহিল, "ওঁদের কাণ্ডই হ'ল আলাদা। মাংস, পেঁয়াজ, সব এলাহি কাণ্ড! শ্বশুরের রোজ মাংস না হ'লে খাওয়াই হয় না।

তাই কি যা-তা রান্না। সত্যিকারের এই এত পেঁয়াজ দিয়ে রান্না।"—দুই করতল একত্র করিয়া পিঁয়াজের পরিমাণ দেখাইয়া গৌরী মাকে বিস্মিত করিয়া দিল।

যোগমায়া বলিলেন, "আমাদের তো পেঁয়াজের হাঁড়ি নেই, মা। বাসায় যা হয়েছে—হয়েছে। শাশুড়ী থাকতে এ বাড়ীতে পেঁয়াজের পাট তো ছিলই না, আমি মন্তর নেবার পর থেকেও—"

গৌরী বলিল, "তা তুমি যদি বলো—উঠোনে ইঁটের উনুন পেতে আলাদা হাঁড়িতে আমি নাহয় রেঁধে দিতে পারি।"

"তুই রাঁধবি? নারে, আমিই নাহয় এ দিকের রান্না সেরে কাপড় ছেড়ে করে দেব'খন।" একটু ভাবিয়া বলিলেন, কিন্তু অনেক দিন রাঁধি নি, হয়তো—"

"আমি দেখিয়ে দেব'খন। আর দেখ মা, খানকতক আলু ভাজা করো। ওরা তরকারি বড় একটা খায় না—ঐ ভাজাভুজি দিয়েই—"

"আচ্ছা—আচ্ছা।" অপার বিস্ময়কে দমন করিয়া যোগমায়া ডালের কড়াইয়ে কাঁটা চালাইতে লাগিলেন। কাঁটা দেওয়া শেষ হইলে কহিলেন, "হ্যারে গৌরী, তোরও তাহ'লে এ ক'দিন ভালো খাওয়া হয় নি বল্?"

গৌরী হাসিয়া কহিল "তা কেন! একদিন কেমন গন্ধ লাগল। তারপর দিন সব ঠিক হয়ে গেছে। পেঁয়াজ খেতে তো বেশ মিষ্টিই, মা।"

"তা ঠিক।" অত্যন্ত সন্তর্পণে যোগমায়া নিশ্বাস ফেলিয়া ডালে সম্বরা দিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। গৌরী বলিতে লাগিল, "ওদের বাড়ীর সব ধরণ-ধারণই আলাদা, মা। শ্বশুর আবার টেবিলে বসে কাঁটা-চামচে দিয়ে খান। উনিও বলেন, হাতে কত ময়লা লেগে থাকে—কাঁটা-চামচেয় খেলে অসুখ করে না।"

"বলিস কি? সায়েব বল্।"

"সায়েব না, ছাতী। সায়েবরা সন্দেশ খায়? সায়েবরা মুড়ি ফুটকড়াই ভাজা খায়? না, আমের অম্বল ভালোবাসে?"

"কি জানি, মা!" একটু থামিয়া সশঙ্কিত স্বরে বলেন, "তোর সঙ্গে বাংলায় কথা বলেন তো?"

গৌরী হাসিয়া ফাটিয়া পড়িল।

"আমি নাকি মেম—তাই ইংরেজীতে কথা বলব? তবে জুতো পরে বেড়ালে শ্বশুর খুশী হন।"

"হুঁ।" গম্ভীর মুখে যোগমায়া পটোল ভাজিতে লাগিলেন।

গৌরী অনর্গল গল্প করিতে লাগিল, যোগমায়া 'হুঁ' 'হাঁ' দিয়া রন্ধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এ কালের এমন উদ্ভট চালচলনে মানুষ কি করিয়া সুখী হইতে পারে? ঘরময় এঁটো করিয়া মানুষ কেমন করিয়া ঘুমায়? হাত দিয়া না খাইলে কি তৃপ্তি লাগে! না, আসন-পিঁড়ি হইয়া না বসিয়া ভাতের গ্রাস মুখে তোলা যায়? কলিকালই বটে! মাত্র কয়েক দিনের জন্য শ্বশুরবাড়ী গিয়া মেয়ে সেখানকার খুঁটিনাটি তথ্য এমন নিখুঁত সংগ্রহ করিয়াছে—যাহা তাঁহাদের কালে স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কতকাল পরে তবে যোগমায়া রন্ধনের অনুমতি লাভ করিয়াছিলেন। প্রকাশ্যে স্বামীসেবা বা স্বামীসঙ্গ লাভ শাশুড়ীর মৃত্যুর পর তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে। মাথার দীর্ঘ ঘোমটা খাটো হইয়া সীমন্তে আসিয়া পৌছিয়াছে—সেখান হইতে বিচ্যুত হইয়া স্কন্ধাশ্রয় করে নাই। আর এমন মুখরার মতো আলাপ! নিজের মেয়ের চালচলন নিজের মন্দ লাগে না—তবু পীড়া জন্মায় মনে। সেকালের গৃহিণীরা চিরকালই একালের মেয়েদের আচরণে এমনই পীড়া বোধ করেন হয়তো।

মাঝে মাঝে মনকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন, যে কালের যা পছন্দ। মেয়ের সুখ-সৌভাগ্য যাহাতে লাভ হয়—তেমন ভাবে মেয়ে যদি নিজেকে মানাইয়া লইতে পারে—তাহার চেয়ে আনন্দের আর কি আছে? মেয়ে যে ঘর করিবে—সেই ঘরকেই যেন সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়া আপন করিয়া লইতে পারে।

কনকাঞ্জলির কথা মনে পড়িল। এক কাঠা চালে পিতৃঋণ পরিশোধের সময় রামচন্দ্রের চোখের ধারা যেমন অবিরল বহিয়াছিল, তেমনই গৌরী কাঁদিয়া ভাসাইয়াছিল। ঋণশোধের মর্ম্মটুকু রামচন্দ্রের মতো গৌরীও হয়তো বুঝিয়াছিল, তাই এক সংসার হইতে বিদায়গ্রহণমুখে কান্না তাহার অমনই প্রবল হইয়াছিল।

যোগমায়ার বাল্যকালের কথা মনে পড়ে না ভালো। পিতা চক্ষু মুছিতে ছিলেন, যোগমায়া—ন বছরের বালিকা যোগমায়া—সেই সব বিচিত্র অনুষ্ঠানে শুধু কৌতুক বোধ করিয়াছিল। কনকাঞ্জলির মর্ম্মবিদারী সত্যটুকু পর হইবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি হয়তো ভালো করিয়া বুঝিতেই পারেন

নাই। সুখ বা বেদনার মর্ম বুঝিতে যোগমায়ার বহু বৎসরই লাগিয়াছিল।

জামাইটি লাজুক। কেমন মিষ্ট ধীর কথাবার্ত্তা। যে জিনিসটি ভালো না লাগে—স্পষ্ট সে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়। শুধু মাথা নাড়িয়া বলে, 'আর যে খেতে পারছি না, মা।"

এই 'মা' ডাক ভারি মিষ্ট লাগে যোগমায়ার। বিমলের 'মা' ডাকের চেয়েও মিষ্ট।

একে একে গাঙ্গুলী-বাড়ী, বাঁড়ুয্যে-বাড়ী ও মুখুয্যে-বাড়ী জামাইয়ের নিমন্ত্রণ হইল। যোগমায়া মেয়েকে ডাকিয়া সাবধান করিয়া দিলেন। নূতন জামাই পাইলে মেয়েদের বংশের নদী যেন সমুদ্র হইয়া উঠে; মেয়ে যেন জামাই-ঠকানো প্রক্রিয়াগুলি উহাকে ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিয়া সতর্ক করে।

গৌরী হাসিল, "বলো কি মা! তোমাদের কালে পিঁড়ির নিচেয় সুপুরি দিত? পড়ে গিয়ে কেউ যদি হাত-পা ভাঙে?"

"তা কি আর ভাঙ্‌ত না?"

"ছি-ছি! কি অসভ্য ঠাট্টা বাপু!" নাক সিঁটকাইয়া গৌরী মুখে অবজ্ঞাব্যঞ্জক শব্দ করে। খানিক পরে বলে, "এখন ওসব চাষাড়ে ঠাট্টা কেউ করে না। খাবার জিনিস নিয়ে ঠাট্টা!"

যোগমায়া ক্ষীণ হাসিয়া বলেন, "চাষাড়েই হোক—আর যাই হোক—সেকালে ওই চলন ছিল। আমোদও হ'ত খুব।"

গৌরীর হাসি শব্দমুখর হইয়া উঠিল। "আমোদ আবার নয়? হাত-পা ভেঙে একেবারে হাসপাতালে। খুব আমোদ!"

যোগমায়া ঈষৎ অপ্রসন্ন স্বরে বলিলেন, "ঠাট্টা না করলেই ভালো?"

গৌরী বলিল, "হ্যাঁ মা, একটা কথা বলব?"

"কি কথা রে?"

"আমরা চলে গেলে নাকি প্রণামীর কাপড় নিয়ে খুব গোলমাল হয়েছিল?"

"গোলমাল? কৈ, না তো।"

"না কি? নিস্তার-কাকীমা কাল বলছিলেন যে, প্রণামীর কাপড় ও-বাড়ীর কাকীমা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন?"

"না রে—তা নয়। নিস্তারকে একখানা কাপড় দিয়েছিলাম কি না, তাই পাড়ার গিন্নিদের কারও রাগ হয়েছে। আমরা বামুন হয়ে পেলাম না, আর তিলিবৌয়ের ভাগ্যে…তা ওকে তো প্রণামী হিসেবে দিই নি—ভালোবাসি বলে দিয়েছি।"

"তাই বলো। দুর্গা পিসিমা এমনভাবে কথাটা বললেন—যেন কত কাণ্ডই হয়ে গেছে!"

"ওদের স্বভাবই ওই। তা রাত্তিরে শশাঙ্ক কি খায় রে?"

মেয়ে লজ্জা পাইয়া বলিল, "আমি জানি নে।"

যোগমায়া হাসিয়া বলিলেন, "নতুন জামাইকে তো ভাত দিতে পারব না, তাই জিজ্ঞেস করছি!"

"কেন জিজ্ঞেস করলে?"

"সেদিন গাঙ্গুলী-বাড়ীর নতুন বরকে লুচি ভেজে দেওয়া হয়েছিল, সে খায় নি। বলেছিল, গরম কালে লুচি নাকি খাওয়া যায়! তাই।"

মেয়ে কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। যোগমায়া সকৌতুকে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "কিছু বলবি নাকি, গৌরী?"

গৌরী কোন কথা না-বলিয়া অঞ্চল-গ্রন্থি হইতে ছোট একটি সোনার আংটি খুলিয়া মায়ের হাতে দিল, কোন কথা বলিল না।

যোগমায়ার বিস্ময় বাড়িল। বলিলেন, "এ আংটি নিয়ে আমি কি করব রে! এ যে জামাইয়ের আংটি।"

"হ্যা, তুমি রাখো। বাবাকে বলে এটা হাল-ফ্যাসানের মতো গড়িয়ে দিও।"

তথাপি যোগমায়াকে বিস্ময়াভিভূত দেখিয়া সে মুখ নামাইয়া বলিল, "সেকেলে আংটির রেওয়াজ তো একালে নেই।"

যোগমায়া এতক্ষণে গৌরীর বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করিলেন। মুখ তাঁহার প্রসন্ন হইল না। গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "জামাই বলেছে বুঝি?"

"না তো!" গৌরী তাড়াতাড়ি বলিল, "ওর বন্ধুরা কি ঠাট্টা করেছিল বলে—খুলে আমায় রাখতে দিয়েছিল।"

"ও:।" যোগমায়ার গাম্ভীর্য্য কাটিল না। "তা কি রকমের আংটি হবে?"

"আজকালকার পাথর-দেয়া—কি সাপ-আংটি।"

"বেশ, বলব ওঁকে।" যোগমায়া পিছন ফিরিতেই গৌরী ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মা, শুনছ? আমি যে আংটি তোমায় দিয়েছি, খবরদার ও যেন না জানতে পারে। ওকে তো বলি নি।"

যোগমায়া মুখ ফিরাইয়া হাসিলেন। মেয়ের এই অহেতুক উদ্বেগে জামাইয়ের সরল হাসিমাখা মুখখানি তাঁহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল।

কত ভ'লো জামাই তাঁহার, আংটির জন্য সে অনুযোগ করে নাই। হাল্কা সুরে বলিলেন, "না রে, এ কথা বলব কেন? সত্যিই তো—সেকালের বুড়ুটে পছন্দ—একালের ছেলেদের কাছে চলে না।"

হাসিলেন বটে, সমস্ত গ্লানি ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিলেন না। গৌরী আজ পর হইয়া গিয়াছে। মায়ের কাছে পাইবার দাবী লইয়া আজ সে অন্য সংসারের মেয়ে হইয়া উঠিয়াছে। মাকে ভালোবাসিবার দিন সেকালে যেমন ছিল—এ কালেও কি তেমনই আছে? না থাকুক, মেয়েদের যা কাম্য—ঘর চিনিবার এই যে সর্ব্বপ্রকারের শিক্ষা ও যত্ন—ইহার মধ্যে স্বার্থ কখনও কখনও বা অশোভন তীব্রতায় আত্মপ্রকাশ করিয়া মাতৃ-স্নেহকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলে। কিন্তু এই তো সত্য, এবং ইহাতেই তো নারীর সার্থকতা। গ্লানিটুকু হয়তো দূর হইয়া গেল। গৌরীর হাত ধরিয়া যোগমায়া সস্নেহে ডাকিলেন, "আয়, খাবি আয়।"

সেই দিন রাত্রিতেই রামচন্দ্র বলিলেন, "আমার ছুটি তো ফুরিয়ে এলো, এবার বর্দ্ধমান বা কৃষ্ণনগর নয়—ঢাকায় যেতে হবে। গুছিয়ে নাও সব।"

যোগমায়া বলিলেন, "ঢাকায়?"

"হ্যাঁ, আর ক'টা বছর কাটলে বাঁচি। টানা-পোড়েন পোষায় না শরীরে।"

খানিকক্ষণ ভাবিয়া যোগমায়া বলিলেন, "আমি তো বাসায় যেতে পারব না।"

"পারবে না? মানে? ছেলে তো তোমার কলকাতায় পড়ছে, মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল—"

যোগমায়া মৃদু হাসির দ্বারা রামচন্দ্রকে নিরস্ত করিয়া কহিলেন, "সেই জন্যেই তো আমার যাওয়া হবে না। বিয়ে হ'লেই তো মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিতে পারি নে। জামাই আসবেন মাঝে মাঝে, আমার যাওয়া কি ভালো দেখায়?"

"কেন, মেয়ে আমাদের সঙ্গে ঢাকায় যাবে? জামাইও সেখানে ইচ্ছে হ'লে—"

"দূর! ও যে এখন পরের বউ। হুট বলতে ওকে যেখানে-সেখানে নিয়ে ঘুরতে পারি? ওর শ্বশুরবাড়ীর মান-মর্য্যাদা বাঁচিয়ে আমাদের চলতে হবে না?"

"তা হ'লে উপায়? আমি যে বাসা ঠিক করবার জন্যে আজই পোষ্টমাষ্টারকে চিঠি লিখে দিলাম।"

"লিখেছ তো কি হয়েছে? চাকর-বামুন রেখে বাসায় থেক?" একটু থামিয়া বলিলেন, "আর সুবিধে হ'লে আমিও না-হয় গিয়ে দিনকতক থেকে আসব।"

রামচন্দ্র বুঝিলেন, কোথায় যোগমায়ার টান। বলিতে গেলে, এই সংসারের তিনি কতটুকু। সেই জীর্ণ কোঠা ঘুচিয়া প্রাসাদোপম অট্টালিকার উদ্ভব—মলিন জরাজীর্ণ বাসগৃহের এই চোখজুড়ানো মনোরম মূর্ত্তি—এ রচনা যোগমায়ারই। রামচন্দ্রকে ভালোবাসা, এবং বিমল ও গৌরীকে ভালোবাসার বিভিন্ন রূপের মতো, এই বাড়ীও ভালোবাসার দাবীতে যোগমায়ার হৃদয়ের আর একটি অংশ দখল করিয়াছে।

"কিন্তু তোমাদের একটা ব্যবস্থা তো করতে হবে। একলা থাকতে তো পারবে না।"

"দিন রাতের একজন বিশ্বাসী ঝি আমি রেখে দেব। চার দিকে লোকজন রয়েছে—বিমল ছুটি পেলেই বাড়ী আসছে।"

রামচন্দ্র যোগমায়ার স্কন্ধে হাত রাখিয়া হাসিবার ভঙ্গি করিয়া বলিলেন, "কিন্তু গেলেই বেশ হ'ত, মায়া।"

যোগমায়া প্রত্যুত্তর না দিয়া শুধু হাসিলেন।

৩

আগে আগে ছুটি হইলেই বিমল বাড়ী আসিত, আজকাল তাহারও বাড়ী আসা কমিয়া গিয়াছে। অনুযোগ করিলে বলে, "এই বছরে শেষ পরীক্ষা দেব কিনা—তাই। না পড়লে পাস করব কি করে?"

যোগমায়া অত শত বোঝেন না। যদি বিমল শনিবারে বাড়ী আসে—বৃহস্পতিবার হইতে তাহার প্রিয় খাদ্যতালিকা সম্বন্ধে অবহিত হইয়া উঠেন। সোনা-মুগ ভাজিয়া রাখা, মোচা কিনিয়া আনা, রাঙা নটে বা পালং শাক জোগাড় করা, সজিনার ফুল বা ডাঁটা পাড়াইবার ব্যবস্থা করা, সময়ের ফল—আম, জাম, পেঁপে, লিচু অথবা বেল সংগ্রহ করা—সংগ্রহের নেশায় ক'টি দিন যোগমায়ার বেশ কাটিয়া যায়। কোন বার বিমল আসে—কোন বার আসে না। আসিলে বলে, "সকাল থেকে যা দিয়ে যাচ্ছ—তা আমাদের হোষ্টেলশুদ্ধ ছেলের খাবার। এত খেতে পারে মানুষ?"

যোগমায়া বলেন, "না খেয়ে-খেয়েই তোদের এই দশা।"

শক্ত বাইসেপস্ ফুলাইয়া বিমল বলে, "রোজ এক্সারসাইজ করি—জানো তো?"

"ছাই করো, তা হ'লে হাড়-সার চেহারা হ'ত না।"

বিমল মাকে কিছুতেই বুঝাইতে পারে না—মেদভারগ্রস্ত দেহের চেয়ে ওই দেহই শক্তির আধার। বাঙালীর ভুঁড়ি-বাহির-করা নাদুস-নুদুস্ নন্দদুলালের মতো চেহারা বিদ্রূপেরই বস্তু।

যোগমায়া বিমলের কথা শুনিয়া হাসেন। ঘাড় নাড়িয়া বলেন, "যারা খেতে দেয় না তারাই বলে ও কথা। তেলে-জলে-দুধে-ঘিয়েই না মানুষের শরীর।"

বিমল উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলে যোগমায়া রাগ করিয়া উঠিয়া যান। কতক্ষণের জন্যই বা সে রাগ? বিমল পিছু পিছু গিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলে, "দাঁড়াও দিকি—কেমন তোমার শক্তি বুঝি?"

যোগমায়া বলেন, "ছাড়—ছাড়, খুব বীরপুরুষ হয়েছিস! আঃ, সকাল বেলায় এঁড়া কাপড়ে আমায় ছুঁলি তো?"

"ছুঁলাম তাই কি হ'ল! তুমিই না বলো, আড়াই পা বাড়ালে বামুন শুদ্ধ!"

"হ্যা—বলিই তো। তাই বলে যত নোংরা মাড়িয়ে এসে—"

স্নেহের বাদানুবাদ, স্থায়ী মনোমালিন্যের ভিত্তি সেখানে কোন কালেই পত্তন করিতে পাবে না। মা হাসেন, ছেলেও হাসে, এবং কখন এক সময়ে তাঁহাদের বিবাদ মিটিয়া যায়।

ভাদ্র মাস। সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিন। বিমল চিঠি লিখিয়াছে, সে বাড়ী আসিবে। তাহার দুই-এক জন বন্ধুও আসিতে পারে। বাড়ী আসিয়া এমন একটা আশ্চর্য্য জিনিস মাকে দেখাইবে, যাহাতে তিনি অবাক হইয়া যাইবেন। পাগল ছেলে।

অরন্ধনের পর্ব্ব পালন করা এই বাড়ীর চিরন্তন প্রথা। এটি ভাদ্র-সংক্রান্তির অবশ্য-পালনীয় অরন্ধন। কাল এ বাড়ীতে উনান জ্বালিতে নাই। পাছে, কেহ উনান জ্বালেন, সেই জন্য উনানের পাড় নিকাইয়া, আলিপনা দিয়া, মনসা গাছের ডাল উনানের মধ্যে রাখিয়া, পুরোহিত ডাকাইয়া রীতিমত পুষ্প-অর্ঘ্যাদি দিয়া পূজা করিতে হয়। একবার অরন্ধনের সময় রামচন্দ্র বাড়ী ছিলেন। মাছ না হইলে তাঁহার খাওয়া হয় না বলিয়া মায়ের সঙ্গে তর্ক করিয়া তিনি ইট দিয়া উঠানে অস্থায়ী উনুন পাতিয়া মাছ রাঁধিবার উদ্যোগ করেন। কিন্তু উদ্যোগই সার, সঙ্গে সঙ্গে একটা হেলেজাতীয় সাপ কুয়াতলায় দেখা যায়। শাশুড়ী ছেলেকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিয়া সেই মাছ টান মারিয়া বাগানে ফেলিয়া দেন ও মা-মনসার উদ্দেশে মোটা রকমের পূজা মানত করিয়া তবে স্বস্তি বোধ করেন। হেলে সাপ নাকি বিষহীন, এই তর্ক রামচন্দ্র একবার করিতে গিয়াছিলেন—কিন্তু শাশুড়ীর অনর্গল বাক্যপ্রবাহে সে তর্ক জমিতে পারে নাই। সেই হইতে অরন্ধনপর্ব্ব এই বাড়ীতে প্রবল প্রতাপে চলিয়া আসিতেছে। এমন কি, দুধ গরম করিবার প্রয়োজন হইলে—যাঁহাদের অরন্ধন নাই—তাঁহাদের বাড়ী কাজটা সারিয়া লইতে হয়।

কয়েকজন বন্ধু আসিবে শুনিয়া যোগমায়া একটু চিন্তিত হইয়াই পড়িয়াছেন। বিমল জানে এ বাড়ীতে কোন পর্ব্বই বাদ যায় না, তবু কতকগুলি ছেলেকে আনিয়া কষ্ট দিবার কি প্রয়োজন তাহার? বাসি রান্না অতিথিকে দেওয়া যায় কখনও? আর কি সে রান্না! কচুর শাক, মটরের ডাল, ওই ডালেরই বড়া, পাঁচ রকম ভাজা, চালতার অম্বল। নিরামিষ হেঁসেল বলিয়া মাছের চলন শাশুড়ী কখনও করেন নাই, কাজেই মাছ না-রাঁধাই প্রথায় দাঁড়াইয়াছে। একটু দুধ—তাও খোসামোদ করিয়া অপরের বাড়ী হইতে জ্বাল দিয়া আনিতে হইবে।

আপন মনেই যোগমায়া কুটনা কুটিতেছিলেন, এমন সময় নিস্তারিণী বেড়াইতে আসিলেন।

"কি হচ্ছে গো দিদি? কচুর শাক কুটছ? একটু বেশী করে কুটো, তোমার অনেক খদ্দের।"

"নিস্তার, এসেছিস বোন? দেখ্ দেখি ভাই—বিমলের আক্কেল! চিঠি দিলে—কাল আসবে। ঘরের ছেলে ঘরে আসুক—শাক-পান্তা যা হোক্ দিয়ে খেতে পাবে, কিন্তু সঙ্গে করে আবার বন্ধু জুটিয়ে আনা কেন, ভাই?"

নিস্তারিণী অবাক হইবার ভঙ্গিতে বলিলেন, "ওমা—তাই তো।—গেরো দেখ একবার!"

এতটা সহানুভূতি অবশ্য যোগমায়া আশা করেন নাই। ঈষৎ বিরক্তিভরা কণ্ঠে কহিলেন, "গেরোর কথা নয়—ছেলের হুঁসের কথা ভাবছি। শুধু কচুর শাক দিয়ে মানুষকে পান্তা ভাত দেওয়া যায়?"

নিস্তারিণী বলিলেন, "তাই তো।"

"তা ভাই তুমি এই কচু কটা কুটে দাও তো—আমি ততক্ষণে চালদা ছাড়াই। সবই তো ল্যাঠার কুটনো।"

নিস্তারিণী বঁটির উপর উবু হইয়া বসিয়া বলিলেন, "একলা মানুষ ক-দিকই বা সামলাবে। মটর ডাল বাটা না থাকে তো আমাকে দাও বেটে দিই।"

কুটনা কুটিতে কুটিতে দুই জনে গল্প করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে—"বৌমা, বাড়ী আছ গা?"—বলিতে বলিতে এক বৃদ্ধা লাঠি ঠুক্‌ঠুক্ করিতে করিতে বাড়ী ঢুকিলেন।

"কে—পিসিমা? আসুন।"

"না,বউমা—বসব না আর। অরন্ধনেব কুটনো কোটা হচ্ছে বুঝি? ও কে—তেলি বউ? তা কুটনো কোট মা। একটা ভারি বিপদে পড়ে তোমার কাছে এলাম, মা। একবার ইদিকে আসবে?"

বঁটি ছাড়িয়া যোগমায়া তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "কি বিপদ, পিসিমা?"

"আর মা,"—চাপা আক্ষেপের স্বরে তিনি বলিলেন, "রাশুর ছেলে এই মাত্তব মারা গেল। রাশু এক হাতে চোখের জল মুছে লোক ডাকতে গেছে—আমি এলাম টাকার জোগাড়ে।"

"আহা! কি হয়েছিল পিসিমা?

"ভুগছিলই তো। ম্যালোয়ারি না কি? দুবেলা পেটভরে দু'টি খেতেই কি পেত? তা তোমার কাছে গোটাদশেক টাকা হবে, মা? না দিলে আতান্তরে পড়ব, মা। এই রূপোর গোট ছড়া রেখে—"

যোগমায়া ক্ষণকাল কি ভাবিয়া বলিলেন, "গোট ওইখানে রাখুন—গঙ্গাজল দিয়ে তবে সিন্দুকে তুলব। টাকা দিচ্ছি।"

বৃদ্ধা চলিয়া গেলে নিস্তারিণী বলিলেন, "ভরসন্ধ্যে বেলা টাকা যে দিতে নেই, দিদি। তার ওপর পুন্নিমে লেগেছে, মরা-মিত্যু!"

যোগমায়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "মরা-মিত্যু বলেই তো দিলাম ভাই। মানুষের দায়-অদায় যদি না দেখব তো সিন্দুকে টাকা রেখে লাভ?"

"সবাই বলে, অকল্যাণ হয়।"

যোগমায়া ক্ষুদ্র একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "না রে, টাকা ধার দিয়ে সুদ নেব—তার আবার অকল্যাণ। সন্ধ্যে হয়ে এলো—হাতটা একটু চালিয়ে, ভাই। হ্যাঁরে, নারকোল পাওয়া যায় দোকানে? আমি তো ছিষ্টি খুঁজেও নারকোল যোগাড় করতে পারি নি ভাই।"

"কোথায় নারকোল, দিদি! শান্তিপুরের বড়বাজারে নাকি মেলে। তা সে নারকোল আনতে গেলে তোমার কচুর শাক, আর রেঁধেছ!"

"যা বলেছিস! বেশী করে মটর ডালের বড়া দেব—কি বলিস?"

বিমল বাড়ী আসিল—আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে। সঙ্গে মাত্র একজন ছেলে আসিয়াছে। তবু রক্ষা যে কোন প্রকারে মান রক্ষা করা যাইবে। কিন্তু একি চেহারা ছেলের! পরনে মোটা আধ-ময়লা ধুতি, মাথার চুল রুক্ষ, গায়ের জামাটারও কি কোন মানান নাই? মাকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া সে হাসিয়া বলিল, "এই মা, প্রণাম কর্ শরৎ।"

শরৎ যোগমায়ার পায়ের ধুলা লইল। যোগমায়া ইতিপূর্ব্বেই মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়াছিলেন। প্রসন্ন কণ্ঠে বলিলেন, "এসো বাবা, চিরজীবী হয়ে বেঁচে থাকো।"

পাতলা ছিপছিপে ছেলেটি। রং ময়লা, চুলগুলি বড় বড়, মুখখানি ছোট—চোখ দুটি আর কপালটি ওরই মধ্যে যা একটু বিস্তৃত। শ্যামল মুখে হাসি তাহার লাগিয়াই আছে। মমতা বোধ হয় সে হাসি দেখিলে। ও ছেলের মা কি বাঁচিয়া নাই? থাকিলে এমন ক্ষীণকায় হইবে কেন? কাপড় জামারই বা এমন শ্রী কেন?

বিমল বলিল, "হঠাৎ অরন্ধনের দিন কেন এলাম না, জানো মা? যদিও শরৎ বললে—অনেক দিন পান্তা ভাত আর কচুর শাক খাই নি। আমি তো আর ওসব ভালোবাসি নে!"

যোগমায়া হাসিয়া বলিলেন, "নাঃ—তা বাসবে কেন? তা পরের ছেলেকে কষ্ট দিতে যে আনিস নি—ভালোই করেছিস।"

শরতের পানে ফিরিয়া বিমল বলিল, "কষ্ট দিতে তোকে আনছিলাম, শরৎ?"

শরৎ হাসিমুখে বলিল, "আনছিলেই তো।"

"শয়তান!" বলিয়া বিমল তাহার পিঠে একটি সশব্দ চাপড় বসাইয়া দিল।

যোগমায়া সশঙ্কিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ষাট্! ষাট্! ও কি আদিখ্যেতা, বিমল?"

শরৎ হাসিমুখেই বলিল, "দিনরাত আমাকে মারে মা! আপনার ছেলেটি একটি আস্ত গুণ্ডা।"

একবার 'ষাট' ধ্বনি মনে মনে উচ্চারণ করিলেন যোগমায়া। ভরা পূর্ণিমার দিন ছেলের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কেহ কিছু বলিলে যোগমায়া সহ্য করিতে পারেন না। মুখে শুধু বলিলেন, "দুটিই তোমরা বীর পুরুষ। এসো, হাত পা ধুয়ে জিরিয়ে একটু জল-টল খাও।"

"জল তো খাবই—কিন্তু তার আগে"—বলিয়া পকেট হইতে হলদে সূতা বাহির করিয়া বিমল মায়ের হাত টানিতে টানিতে কহিল, "দেখি মা তোমার হাত?

শরৎও তাড়াতাড়ি পকেট হইতে সূতা বাহির করিয়া যোগমায়ার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "আমি আগে বাঁধব।"

দুইজনের টানাটানিতে বিব্রত হইয়া যোগমায়া বলিলেন, "কি বাঁধবি রে?"

"রাখী। আজ রাখী-পূর্ণিমা কিনা—এর জন্যেই তো আমরা এলাম, মা। তোমার হাতে আগে রাখী বেঁধে—পাড়ায় বেরুব সব রাখী বাঁধতে!"

বলিতে বলিতে দুইজনেই যোগমায়ার কর-প্রকোষ্ঠে রাখী বাঁধিয়া দিল। দুইজনেই সমস্বরে বলিল, "বন্দে মাতরম্!"

বিমল বলিল, "বলো-না মা—বন্দে মাতরম্।"

যোগমায়া হাসিয়া স্নেহ-সকোপ কটাক্ষে তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, "তেতেপুড়ে আসছিস—জিরোনো চুলোয় গেল—আমার হাতে সুতো বেঁধে ছেলেমানুষি তোদের! আয়, খাবি আয়।"

"না মা, তুমি বন্দে মাতরম্ না বললে আমরা খাব না।"

কি আর করেন! যোগমায়া দ্রুতকণ্ঠে বলিলেন, "ওসব বেরয় না বাপু আমার মুখ থেকে। বন্দে—কি মা—"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ—মা।"—বলিয়া দুইজনেই উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "বন্দে মাতরম্!" তার পর বিস্মিত যোগমায়াকে অধিকতর বিস্মিত করিয়া মিষ্ট কণ্ঠে গাহিয়া উঠিল:—

"বাংলার মাটি—বাংলার জল,
বাংলার হাওয়া, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক—পুণ্য হউক—পুণ্য হউক
হে ভগবান।"

যোগমায়া আহারের অনুরোধ করিবার পূর্ব্বেই দুই জনে গান গাহিতে গাহিতে বাহির হইয়া গেল।

এমন সময় নিস্তারিণী আসিয়া বলিলেন, "কি গো দিদি, চুপটি করে দাঁড়িয়ে রয়েছ যে? ও মা, হাতে আবার হলদে সুতো বাঁধা যে!"

যোগমায়া হাসিয়া বলিলেন, "পাগল ছেলেদের কাণ্ড। হাতে সুতো বেঁধে দিয়ে বললে—বন্দে না কি মা।"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ—একপাল ছেলে জুটে হৈ হৈ করছে বটে। বেশ মিষ্টি গান গাইছে দিদি।"

"তা জলটুকু পর্য্যন্ত মুখে না দিয়ে বেরুল, দেখ দেখি! নিজে না খেয়ে থাকতে পারিস থাক্, পরের ছেলেটিকে কষ্ট দেওয়া কেন! তোর হাতে ফেরো কিসের রে নিস্তার?"

"ওদের জন্যে একটু দুধ নিয়ে এলাম, দিদি।"

"নিয়ে তো এলি, খাবে কে বল্ দিকি? এসে বলে কি জানিস? বলে—আজ রাঁধতে নেই। এমন ছেলেও দেখি নি বোন।" খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "কোথায় দেখলি ওদের?"

"গড়ের বাজারের দিকে যাচ্ছে। বললে, কাপড় পোড়ানো হবে।"

"কাপড় পোড়ানো? সে আবার কি!"

"কি জানি দিদি, বিলিতি কাপড় সব নাকি পুড়িয়ে দেবে। স্বদেশী করবে।"

যোগমায়ার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এতক্ষণে রহস্যের অর্থ তিনি হৃদয়ঙ্গম করিলেন যেন। বলিলেন, "তাই বল্—স্বদেশী। কালে কালে কত ঢেউ যে উঠবে!"

নিস্তারিণী শিকার উপর দুধ তুলিয়া রাখিয়া বলিলেন, "যদি পারো তো এক বার আমাদের বাড়ী যেয়ো, উঠোনের উনুন গোবর দিয়ে নিকিয়ে রেখেছি। কাঠ, ঘি, ময়দা, সব আনিয়ে রেখেছি, খানকতক লুচি ভেজে—"

"ওমা তুই অত হাঙ্গামা করতে গেলি কেন?"

"হাঙ্গামা আবার কি? ব্রাহ্মণের সেবা হবে—এ তো আমাদের পরম ভাগ্যি। যেয়ো দিদি, ভুলো না।"

যোগমায়া বলিল, "তুই কিন্তু কাল এখানে প্রসাদ পাবি।"

"সে তুমি বললেও খাব—না বললেও খাব। শাশুড়ী বুড়ো মানুষ—তার জন্যে পেসাদ তো আমার নিতেই হবে।"

স্নান সারিয়া শুদ্ধ বস্ত্র পরিয়া যোগমায়া বহুক্ষণ হইল জপপূজা সারিয়া বসিয়া আছেন। রেকাবিতে শসা ও বাতাবি লেবু কাটিয়া নুন মাখিয়া রাখিয়াছেন, মর্ত্তমান কলা ও অসময়ের আনারস ছাড়াইয়া রাখিয়াছেন; গাছের গোটা-চারেক ভালো আতা চালের হাঁড়ি হইতে বাহির করিয়া রাখিয়াছেন। ময়রা-বাড়ী হইতে ভালো কাঁচা-গোল্লাও আনাইয়াছেন। কিন্তু ছেলেরা এখনও ফিরে নাই। এই আসে—এই আসে করিয়া জপটুকু পর্য্যন্ত যোগমায়া ভালো করিয়া সারিতে পারেন নাই। ভাত ঠাণ্ডা হইবার ভয় নাই, কিন্তু দুরন্ত ছেলেদের ক্ষুধাও কি লাগে না? ছোট নহে যে শাসন করিবেন! বকিলে হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। যোগমায়া মুখে ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারেন—আর মনের মাঝে উদ্বেগ বৰ্দ্ধিত করিয়া বড় জোর কম কথা কহিয়া ছেলের সম্মুখে অভিমান প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সে অভিমান নিজের মনেই একাকী বহন করিতে হয়, নিজের দুঃখের আগুনের আঁচে নিজের দেহেই জ্বালা ধরে।

দুপুরবেলায় বিমল ফিরিলে যোগমায়া সত্য সত্যই তাহাকে ধমকাইলেন। বিমল সে ধমক গ্রাহ্যও করিল না। হাতে একখানি কাপড় লইয়া বলিল, "আগে এখানা পরে তোমার কাপড়খানা ছেড়ে দাও দেখি।"

কাপড়খানা রোয়াকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া যোগমায়া পাশের ঘরে গিয়া বসিলেন।

বিমল পিছু পিছু গেল। অনেক সাধ্যসাধনা করিল তাঁহাকে, কিন্তু সে সাধ্যসাধনায় যোগমায়ার মন গলিল না। স্নেহপ্রকাশের দুয়ার বিমল এমন ভাবে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে যে, শত অনুরোধেও সে দুয়ারের অর্গল খোলা যাইবে না বুঝি।

অবশেষে বিমল ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িল, বলিল, "শরৎ, চ ভাই—কলকাতা ফিরে যাই। যার মা কথা কয় না, তার বাড়ীতে থেকে লাভ!"

যোগমায়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "আমারই যত দোষ! এই যে বেলা দুপুর পর্য্যন্ত জলটুকু মুখে না দিয়ে টো টো করে ঘুরে বেড়ালি—পিত্তি পড়ে জ্বর-জারি হলে কে ঠেকাবে বল্ দেখি?"

"কৈ জলখাবার? ওই তো। শরৎ, এদিকে আয়। পাড়ায় পেট পুরে তো খুব খেলি—এদিকে ঘরের জলখাবার না খেলে মার রাগ যে ভাঙে না রে! পারবি খেতে?"

রোগা শরৎ সোৎসাহে বলিল, "ওই তো ফল। এই দেখনা"—বলিয়া দুইজনে পরম উৎসাহে যোগমায়ার সযত্নরক্ষিত জলখাবারে মনোনিবেশ করিল।

যোগমায়ার মনের মেঘ কাটিয়া গেল। খুসীভরা কণ্ঠে কহিলেন, "পাড়ায় আবার কে খাওয়ালে রে?"

"কত লোক। তুমি তো আর একলা মা নও—কত মা গাঁয়ে আছে।"

"থাকলেই ভালো।"

"উঠলে হবে না, মা, এই কাপড়খানা পরো। অশুদ্ধ নয়—এই গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিচ্ছি।"

"আঃ—কি করিস!" কাপড়খানি হাতে লইয়া যোগমায়া হাসিমুখে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে পাশের ঘরে গেলেন।

ফিরিয়া আসিতেই বিমল বলিল, "দাঁড়াও, তোমার পায়ের ধুলো নিই। শরৎ—"

শরৎ টুপ করিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "কিন্তু ভাই—মার কাপড়খানার সদ্গতি করতে হবে। ওখানা আহুতি দিয়ে—আমরা এ গাঁয়ের যজ্ঞ শেষ করি।"

"ঠিক বলেছিস।"—বলিয়া এক লম্ফে পাশের ঘরে গিয়া বিমল শুধু সেই কাপড়খানাই নহে, আলনায় যে কয়খানি কাপড় ছিল, টানিয়া উঠানে আনিয়া জড়ো করিল এবং যোগমায়ার বিস্ময় কাটিবার পূর্ব্বেই সেই বস্ত্রস্তূপে অগ্নি সংযোগ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "বন্দে মাতরম্!"

শরৎও সেই চীৎকারে যোগদান করিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে অগ্ন্যুৎসবে কাপড় ক'খানি পুড়িয়া গেল। আম-কাঁঠালের পাতাসমেত গুটিকয়েক ছোট ছোট ডাল সে আগুনে ঝলসাইয়া গেল—আর দালানে দাঁড়াইয়া নিস্পন্দ যোগমায়া নির্ব্বাক্ হইয়া ছেলেদের এই বহ্ন্যুৎসব দেখিলেন।

৪

বহ্ন্যুৎসবে যোগমায়ার হৃদয়ও নূতন করিয়া আলোকিত হইয়া উঠিল। মূঢ় স্নেহে এত দিন যে বিমলকে তিনি একান্ত আপনার বলিয়া মনে করিতেন—আজিকার অগ্নি যেন সেই নিশ্চিন্ত-জানার ক্ষেত্রটিকেও দগ্ধ করিয়া দিতেছে। এ কি তাঁহার সেই বিমল? বৰ্দ্ধিত দেহের সঙ্গে মনের পরিবর্ত্তনও যথেষ্ট হইয়াছে বিমলের। একান্ত মাতৃগতপ্রাণ—স্নেহের আব্দারে, অবাধ্যতায়, দৌরাত্ম্যে ও ভালোবাসায় গড়া সে বিমল ধীরে

ধীরে সরিয়া যাইতেছে। যে বিমলের চোখে জ্বলিত আদর-স্পন্দিত দুরন্তপনা, প্রতিবাদ-নম্র অবাধ্যতা, দায়িত্ব ও বিচারহীন দৌরাত্ম্য এবং মা বলিয়া বাহুবেষ্টনে যোগমায়াকে বাঁধিয়া মীমাংসা-প্রবণতার মধ্যে ভালোবাসার প্রচ্ছন্ন রূপটির প্রকাশ সে ঘটাইত, সেই বিমলের চোখে আজ বেদনা-দীপ্ত অগ্নিকণা, কণ্ঠে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুর, আচরণে যত চাঞ্চল্যই প্রকাশ পাক—একটি নিশ্চিন্ত লক্ষ্যের সঙ্কেত। মায়ের সঙ্গে রহস্য-প্রিয়তায় সেই প্রচ্ছন্ন ভালোবাসা টুক্‌রা-টুক্‌রা রূপে প্রকাশ পায়—তবু আরও কি যেন এক বৃহত্তর বস্তু ওর ভালোবাসার ক্ষেত্রটিকে জুড়িয়া বসিতেছে। মাতৃস্নেহের চেয়ে কত রমণীয় সেই বস্তু যা বিমলকে অমন করিয়া আকর্ষণ করিল? যা অমন করিয়া বিমলকে সব ভুলাইবার পথে টানিয়া লইতেছে!

সংসারকে কেন্দ্র করিয়া যোগমায়া যেন আবর্ত্তিত হইতেছেন। সংসারের ক্ষতি তিনি সহ্য করিতে পারেন না। পরের ছেলে শরৎ না থাকিলে এই ক্ষতি লইয়া বিমলকে তিনি ভৎর্সনা করিতে পারিতেন। এবং ভৎর্সনা না করা পর্য্যন্ত ক্ষতির ক্ষতটা তাঁহার টনটন্ করিতেই থাকিল।

অপরাহ্নে বিমলকে একান্তে পাইয়া বলিলেন, "হ্যারে, তোদের একটুও হুঁস-পর্ব্ব নেই? অতগুলো কাপড় না-হোক্ পুড়িয়ে দিলি?"

"দিলামই বা, মা!" বিমল হাসিল।

"কি যে হাসিস—দেখে গা জ্বলে যায়? বয়স হচ্ছে—এখন সংসারের ক্ষেতি-অপচো যদি না বুঝবি—"

"ক্ষতি বুঝি বলেই তো পুড়িয়ে দিলাম ওগুলো। আজ প্রায় দেড়শো বছর ধরে ওরা এই কাপড় যুগিয়ে যে ক্ষতি আমাদের করেছে—তা কি কোনদিনই আমরা বুঝব না? আমরা চিরকালই জাহাজ-বোঝাই কাপড় এনে এ ভাবে লজ্জা নিবারণ করব?"

যোগমায়া বিমলের চক্ষে সেই অগ্নিকণা জ্বলিতে দেখিলেন। ছেলের কথার এক বর্ণও বুঝিলেন না। তবু সশঙ্ক মাতৃ-হৃদয় ঐ দৃঢ় প্রত্যয়ান্বিত সুরে কেমন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

বিমল বলিতে লাগিল, "আজ আমাদের ঘুম ভেঙেছে মা। ও কাপড় পরে আমরা পূজোর ঘরে ঢুকতে পারব না, ও কাপড় লজ্জা না ঘুচিয়ে লজ্জা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। আমাদের তাঁতিদের যারা অকর্ম্মণ্য করে দিলে, আমাদের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে যারা জুড়ি-চৌঘুড়ী হাঁকাচ্ছে, বড় বড বাড়ী তুলে স্ফুর্ত্তি-আহ্লাদ করছে—তাদের বাহবা দেবার ক্ষমতা আমাদের নেই।"

যোগমায়া তর্ক তুলিলেন, "তা পয়সা দিয়ে কেনা কাপড়গুলো যা পোড়ালি, ক্ষেতিটা হ'ল কার?"

"সামান্য ক্ষতি তো হবেই। যে-ক্ষতি দিনের পর দিন নিঃশব্দে হয়ে চলেছে—তার তুলনায় এ কতটুকু? আবার দেশী কাপড় চালু হ'লে আমাদের সবাই পেট ভরে খেতে পাব।"

যোগমায়া বলিলেন, "তুই থাম্ বাপু, কেউ যেন তোকে পেট ভরে খেতে দেয় না!"

বিমল বলিল, "মা, তুমি অনেক বোঝ—এইটে বুঝতে পারো না যে, আমি একলা পেট ভরে খেলেই দেশ বাঁচবে না, আমার একলার মুখের হাসিই সত্যিকারের হাসি নয়।"

যোগমায়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আমি অত বুঝতেও চাইনে বাপু। তোরা খেয়ে-পরে সুখে থাকিস, এর চেয়ে বড় প্রার্থনা আমার ভগবানের কাছে নেই।"

বিমল বলিল, "আমি তোমার ছেলে বলেই আমার সুখটাই তোমার লক্ষ্য, কিন্তু আমাদের সবাইকে নিয়ে যে দেশ, সে দেশকে তুমি দেখতে পাও না, মা।"

যোগমায়া বলিলেন, "তোরাই আমার দেশ—অন্যদেশ আমি জানিনে।"

"না মা, তুমি শুধুই মা—আর কিছু নও।" একটু থামিয়া বলিল, "তবু তোমাদের জানতে হবে—তোমাদেরও সইতে হবে।"—বলিয়া আবৃত্তি করিল।—

"না জাগিলে সব ভারত ললনা
এ ভারত কভু জাগে না—জাগে না।

তোমার হাতে রাখী বেঁধে দিলাম আজ, সে রাখী কি মিছেই বেঁধে দিলাম!"

বিমল অশান্ত পদে ঘরের মধ্য হইতে বাহির হইয়া গেল। যোগমায়া আপন মনে বলিলেন, "ভালো স্বদেশীর ঢেউ এলো বাপু! ছেলেগুলো এক দণ্ডও স্থির থাকে না।"

আর একটু পরে বাহির হইতে ডাক আসিল, "বউমা, বাড়ার মধ্যে থাকো তো একটা কথা শুনে যাও। আমি বাইরের ঘরে বসলাম।"

শ্বশুর স্থানীয় দ্বারিক ভট্টাচার্য্যের গলা নয়?

যোগমায়া বাহিরের ঘরের দুয়ারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া শিকল নাড়িয়া জানাইলেন—তিনি আসিয়াছেন।

দ্বারিকের পুত্র বঙ্কু-ঠাকুরপো বলিতে গেলে রামচন্দ্রেরই সমবয়সী এবং এক সময়ের সহকর্মী। পদবৃদ্ধি হইলেও রামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কটি পূর্ব্ববৎই আছে। যোগমায়া বউদিদি সম্পর্কীয়া হইলেও কখনও ইহার সম্মুখে বাহির হন নাই। রহস্য বা আলাপ যা-কিছু এক পক্ষ হইতেই হইত এবং অন্তরালে থাকিয়া যোগমায়া তাহা শুনিতেন। কখনও পুত্র বা কন্যার দ্বারা প্রত্যুত্তর দিতেন। বঙ্কু বহুবার এই বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, এবং রন্ধনের সুখ্যাতি করিয়া যোগমায়ার মনে একটি বিশিষ্ট স্থানও দখল করিয়াছেন। সেই সম্পর্কেই বৃদ্ধ দ্বারিক যোগমায়াদের আত্মীয় গোষ্ঠীভুক্ত। রামচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে এই বৃদ্ধই যোগমায়ার সংসারের সংবাদাদি লইতেন এবং কোন বিষয়ে পরামর্শ করিবার প্রয়োজন হইলে ছেলে বা মেয়েকে দিয়া যোগমায়া ইঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। বৃদ্ধ দ্বারিকের সম্মুখে যোগমায়া কখনও বাহির হইতেন না, অন্তরালে থাকিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন। দুই পরিবারের অল্পবয়স্ক যে কোন ছেলেমেয়েকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া তাঁহাদের কথোপকথন চলিত।

দ্বারিক ছোট নাতিটিকে সঙ্গে করিয়াই আনিয়াছিলেন। আট বছরের বালক—একটু বেশী চঞ্চল। ইঁহাদের কথোপকথনের মধ্যবর্ত্তিতা করিবার চেয়ে খেলার দিকেই তাহার মনটা পড়িয়াছিল, কাজেই বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, "এক্ষণি কথা শেষ করে ফেল দাদু—নইলে আমি থাকতে পারব না বলে দিচ্ছি।"

বৃদ্ধ দ্বারিক হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁরে শালা, ভারি খেলোয়াড় হয়েছিস তুই!"

নাতি দুয়ারের কাছে আসিয়া বলিল, "আমি চললাম দাদু।"

"যা। ভেবেছিলাম কলকাতা থেকে একটা ফুটবল আনিয়ে দেব তোকে—তা তোর বরাতে নেই। নাদুকেই দেব'খন।"

"ইস—দেবে বই কি! জ্যেঠিমার সঙ্গে কথা বলতে রোজ নাদুদা আসে নাকি?"—বলিয়া দ্বারিকের নিকটে আসিয়া তাঁহার একখানি হাত ধরিয়া বলিল, "এমন করলে তোমার লাঠি কেড়ে নেব কিন্তু।"

যে কথা—সেই কাজ। লাঠি লইয়া নাতি ছুটিয়া অন্তরালবর্ত্তিনী যোগমায়ার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

দ্বারিক হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "দেখলে বউমা, তোমাদের ছেলেপুলের কীর্ত্তি। ওরা খালি চায় আমাদের জব্দ করতে। আর সেই কথা বলতেই আমার আসা।"—বলিয়া কাসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইলেন।

ছেলেটি দুয়ারের এ পিঠে আসিয়া যোগমায়ার সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি কথা কহিল, তার পর সেইখান হইতেই উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "তামাক খাবে দাদু?"

"আর খাতিরে কাজ নেই, ভাই। গরু মেরে জুতো দান! তুই বরঞ্চ আমার লাঠিগাছটা আমায় দিয়ে যা।"

"তুমি ন'দুদাকে বল দেবে না বলো?"

"তা কি করে দেব ভাই? যে একদিনও দৌত্য করে নি—তাকে বল দিই কি করে!"

"আচ্ছা, এই নাও লাঠি।"—বলিয়া অন্তরাল হইতেই ঠক্ করিয়া লাঠিটা মেঝের উপর দিয়া দ্বারিকের দিকে ঠেলিয়া দিল।

অতঃপর মধ্যবর্ত্তীর সাহায্যে তাঁহাদের কথোপকথন চলিতে লাগিল।

দ্বারিক বলিলেন, "দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে, বউমা, একটু সাবধানে থাকা ভালো।"

যোগমায়া বলিলেন, "বলো না পন্টু, ও কথা বলছেন কেন?"

দ্বারিক বলিলেন, "আমাদের বিমলের যে বন্ধু এসেছে—ওরই কথা বলছি। এই বন্দেমাতরম্ গান, কাপড় পোড়ানো—এই সব নিয়ে পুলিসে খুব ধরপাকড় হচ্ছে। বরিশালে তো দাঙ্গা-হাঙ্গামাই হয়ে গেল।"

যোগমায়া বলিলেন, "বলোনা পন্টু—আজ-কালকার ছেলেরা কি কারও কথা শোনে?"

দ্বারিক বলিলেন, "শুনতেই হবে। আজ সারা দিনটা গ্রামে যে হৈ হৈ হ'ল—ভেবেছ পুলিস সে খবর রাখে না? সব খবর ওরা রাখে। আমাদের মহীতোষ এখানকার থানার দারোগা কি না—সেই আধঘণ্টা আগে সাইকেল করে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। বললে, "জ্যেঠামশায়, বিমল ছোকরার বাবা শুনলাম দেশে থাকে না—আপনিই ওদের অভিভাবক, একটু সাবধান না হ'লে বড় বিশ্রী ব্যাপার হবে কিন্তু।"

দ্বারের অন্তরালে যোগমায়া আর উদ্বেগ চাপিয়া

রাখিতে পারিলেন না। সরাসরি প্রশ্ন করিলেন, "কি ব্যাপার, বাবা?"

"সে অনেক কথা। কিছু মারপিঠ—জেল, সবই হতে পারে।"

পুনরায় যোগমায়ার উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "আপনি ওকে বুঝিয়ে দিন, বাবা।"

দ্বারিক ম্লান হাসিয়া বলিলেন, "বোঝাই নি মা? —যথেষ্ট বুঝিয়েছি। কিন্তু রাগ করে না তো ওরা, খালি হাসে। সবই বোঝে—অথচ কিছুই না বোঝার ভাণ করে। তোমাকেই শক্ত হতে হবে, মা। রাম বাড়ী থাকলে—সে দায়িত্ব ছিল তার।"

"যদি আমার কথা না শোনে?"

"ভয় দেখাবে—শাসন করবে। না শুনলে নিজেদেরই তো ক্ষতি। তোরা ইস্কুল-কলেজের ছেলে—লেখাপড়া ছেড়ে ও রকম হৈ হৈ করলে চলে? আজ বাদে কাল পাশ দিয়ে চাকরিতে ঢুকবি, বিয়ে করবি।"

আরও অনেক সদুপদেশ দিয়া, যোগমায়ার অন্তরে যথেষ্ট ভয়-সঞ্চার করিয়া, দ্বারিক চলিয়া গেলেন।

যোগমায়া ভাবিতে লাগিলেন। শাসন তিনি কেমন করিয়া করিবেন বিমলকে? অভিমান করিয়া বড় জোর কথা না কহিতে পারেন, মুখে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তীক্ষ্ণ বাক্যও প্রয়োগ করিতে পারেন, কিন্তু বড চতুর যে ছেলে। মায়ের মন ওর কাছে যেন আয়নার মতোই স্বচ্ছ। সে অভিমান ভাঙাইবার কৌশল জানে, মৌখিক ক্রোধকেও গায়ে মাখে না। মাকে জড়াইয়া ধরিয়া এমন মিষ্ট আর ব্যথাভরা কথাগুলি বলে—কথা বলিতে বলিতে এমন ছল ছল করিয়া উঠে দু'চোখ, এমন গদগদ হইয়া উঠে কণ্ঠস্বর—সেই দুর্ব্বলতা ব্যাধির মতোই যোগমায়াকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া সস্নেহে তিনি হাসিয়া ফেলেন, এবং চোখের কোলে আঁচল চাপিয়া আনন্দাশ্রুও মুছিতে হয়। ছেলের কাছে মা তাই স্বচ্ছ দর্পণতুল্য।

কিন্তু শাসন না করিলে ছেলের লাঞ্ছনা ঘটিবে। জেল হওয়াও আশ্চর্য্য নহে। জেলের মধ্যে ঘানি টানা—পাথর ভাঙা ইত্যাদি অমানুষিক পরিশ্রম-গুলির কথাও তাঁহার মনে জাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কল্পও দৃঢ় হইল।

আর একবার বিমলকে একান্তে পাইবার জন্য যোগমায়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সে ফিরিল অনেক রাত্রিতে; উনানে ভাত চাপাইয়া দিয়া যোগমায়া মালা জপ করিতেছিলেন। ইষ্টমন্ত্র যত না জপিতেছিলেন—নানা চিন্তার ভারে প্রপীড়িতা ঈষৎ তন্দ্রাতুর আলস্যে চোখ দু'টি বুজিয়া দেওয়াল ঠেস দিয়া বসিয়াছিলেন।

বিমল হুড়মুড় করিয়া ঘরে ঢুকিয়া কহিল, "শীগ্‌গির ভাত দাও মা—বড় ক্ষিদে পেয়েছে।"

যোগমায়ার জপ বা ঢুলুনি ভাঙিয়া গেল। সচকিতে আলস্য ছাড়াইতে ছাড়াইতে একটু আড়মোড়া ভাঙিয়া কহিলেন, "এত রাত অবধি তোদের কি হচ্ছিল? রাত্তিরেও কি কাপড় পোড়াচ্ছিলি?"

"না মা, শরৎকে না হয় জিজ্ঞাসা করো—রায়দের বৈঠকখানায় বসে তর্ক করছিলাম। এত তর্ক করেছি বলেই তো বেজায় ক্ষিদে পেয়েছে।"

"তা কিসের এত তর্ক?"

"ওরা বসে বসে খালি তাস পাশা খেলে—পরের নিন্দে করে। বললাম, ওসব ভালো নয়। তার চেয়ে দেশের কাজ করো।"

"বিমল!" যোগমায়ার তীব্র আর্ত্তস্বরে বিমল চমকিত হইল। ম্লান প্রদীপের আলো, তবু যোগমায়ার তীব্র কণ্ঠস্বরের সঙ্গে দৃষ্টিও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কপালের কুঞ্চনে কয়েকটি রেখা উঠিয়াছে ফুটিয়া—আর সারা মুখে সে কি অসহায় কারুণ্য সেই সূক্ষ্ম রেখাগুলিতে পরিস্ফুট। বিমলের মনে হইল, মার বয়স যেন অকস্মাৎ অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছে দুর্ব্বল ভাবপ্রবণতার মুহূর্ত্তগুলিকে জয় করিবার শক্তি তাঁহার নাই। বিস্তৃত চক্ষের তারকায় শাসনের চেয়ে ভয়ের চিহ্নই প্রবল। হাসিবার চেষ্টা করিয়া সে কহিল, "তুমি এমন করে চাইছ—যেন আমি—"

"হ্যাঁ বিমল, আমাদের দুঃখু না দিলে তোদের বুঝি আনন্দ হয় না? তোরা দেশ-দেশ করে ছুটবি—কিন্তু নিজের মায়ের দুঃখু বুঝবি কবে?"

না, মার বয়স সত্যই বাড়িতেছে। এমন তুচ্ছ কথায় চোখের জলও বাহির করিতে পারেন। আগাইয়া আসিয়া তাঁহার একখানি হাত ধরিয়া বিমল বলিল, "তোমার দুঃখ বুঝি বলেই তো ভাত খেতে চাইছি। ওই দেখ—শরৎ আসছে।"

যোগমায়া তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বলিলেন, "খেয়ে দেয়ে একবার আমার কাছে যাবি —কথা আছে।"

যোগমায়ার আহার যখন শেষ হইল—তখন বিমলরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যোগমায়া আজ

বিমলের সঙ্গে বুঝাপড়া না করিয়া ঘুমাইতে পারিবেন না। পা টিপিয়া টিপিয়া সন্তর্পণে তিনি উপরের ঘরে আসিলেন। ভেজানো দুয়ার খুলিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন। দুই জনেই ঘুমাইতেছে। মাথার বালিশটা ভালো করিয়া টানিয়া লইবার তর সহে নাই, মশারিটা টাঙানো আছে—ফেলা হয় নাই, পাশবালিশ হাতখানেক দূরে পড়িয়া আছে। বিশৃঙ্খল কেশপাশ—মুখে নিদ্রাতুর অসহায় ভাব, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ফুটিয়াছে—যত প্রয়োজনীয় পরামর্শ থাকুক—বিমলকে জাগাইতে বড় মায়া হইল তাঁহার। সারাদিন যা হুড় হুড়ি করিয়া বেড়াইয়াছে—ইহাদের গভীর নিদ্রা যদি না আসিবে তো রাত্রি আসিবার সার্থকতা কি? শরৎ ছেলেটির উপর সারাদিন যোগমায়া প্রসন্ন হইতে পারেন নাই। তাঁহার বিমল তো এমন ছিল না। বাড়ী আসিয়া হৈ হৈ করিয়া বেড়ানো, স্বদেশী গান করা, কাপড় পোড়ানো—এই সব উদ্ভট খেলার সর্দ্দারই হইল—ওই শরৎ। যেমন কালো—তেমনই রোগা ছেলেটি। মা-বাবা বাঁচিয়া থাকিলে কি আর অমন ছন্নছাড়ার মতো ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিত? বিমলের পাশে সে-ও ঘুমাইয়া আছে। কতটুকুই বা দেহ? ওর ওই দেহের মধ্যে আছে দুর্জ্জয় সাহস? আছে অফুরন্ত প্রাণশক্তি? আছে অন্যকে কাজে মাতাইবার দক্ষতা? বিমলের পাশে যাহাকে অত্যন্ত অসহায় বলিয়া বোধ হইতেছে—সে চালাইবে বিমলকে? সে মন্ত্রণা দিবে বিমলকে খারাপ হইবার?

যোগমায়ার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। পাগলামি আর কাহাকে বলে! দ্বারিক ভট্টাচার্য্য বুঝিতে পারেন নাই—ছেলেমানুষের খেয়াল ছাড়া—নূতন খেলার আনন্দ ছাড়া—ওই স্বদেশীয়ানার মধ্যে এতটুকু সত্য বস্তু নাই। পাখার হাওয়া করিয়া মশারিটা ফেলিয়া দিলেন। পাশের বালিশ দু'টি মশারির মধ্যে গুছাইয়া রাখিলেন এবং আর একবার অসহায় নিদ্রাতুর ছেলে দু'টির পানে চাহিয়া মৃদুহাস্যে দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া যোগমায়া বাহির হইয়া গেলেন। তখনও তাঁর অনেক কাজ বাকি। আজ দুখানা ভালো তরকারি রাঁধিয়া উহাদের পাতে দিতে পারেন নাই। কাল কি রাঁধিবেন—সেই চিন্তাটাই এইক্ষণে তাঁহার মনে প্রবল হইয়া উঠিল।

বৈকালে বিমল আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "মা, আজ আমরা কলকাতায় যাচ্ছি।"

শরৎ বলিল, "জগদ্ধাত্রী পূজোর সময় আবার আসব, মা।"

যোগমায়া বিস্মিত স্বরে বলিলেন, "ও মা, এক্ষুনি যাবি কি? আজ যে সরি গয়লানীকে পাতক্ষীর দিয়ে যেতে বলেছি।"

বিমল হাসিয়া বলিল, "গাড়ীতে যেতে যেতে খাওয়া যাবে—কি বলিস শরৎ?"

শরৎ বলিল, "চমৎকার!"

যোগমায়া বলিলেন, "তা যেন খেলি—ওবেলা যে তোদের ভালো করে খাওয়া হয় নি।"

বিমল হাসিয়া বলিল, "জানিস শরৎ, যদি এক মাস এখানে থাকিস্ তো শুনবি—কোন দিনই তোর ভালো করে খাওয়া হ'ল না! রোজই মা মনে করবেন—"

"তুই থাম্!"

"আর জানিস্ শরৎ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এত তরকারি আছে—আর তা এত রকমের রান্না হয় যে—এক বছর ধরে রাঁধলেও ফুরোয় না। তা ছাড়া যতই পাতে দেওয়া যায়, মনে হয় বড্ড কম হ'ল। নয় মা?"

যোগমায়া শরতের পানে চাহিয়া কহিলেন, "আজকের দিনটা থেকে যাও, বাবা।"

শরৎ নিরুপায়ের মতো বিমলের পানে চাহিল। বিমল বলিল, "যার ভাণ্ডার অফুরন্ত, অমন লোভীর মতো তাকাস নে শরৎ। বললাম তো পূজোর সময় আসবি—তখন ইয়া বড় বড় রুই মাছ—তিন আনা সের।"

যোগমায়া হাসিলেন, "রুই মাছ খেয়ে তো রক্ষে রাখো না। না, আজ তোমাদের যাওয়া হবে না।"

যোগমায়া চলিয়া গেলেন।

বিমল বলিল, "তুই তো তাকিয়ে সব মাটি করলি। ওবেলা বড় মাছ আনিয়েছেন—শেষ না হ'লে কি আর যেতে দেবেন!"

"বেশ তো, রাজভোগ খাওয়া যাক। কিন্তু রাজভোগ খাওয়ার চেয়ে ওঁর স্নেহের জন্যে অন্ততঃ আমায় থাকতেই হবে।"

যোগমায়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "এবেলা লুচি ভেজে দিই না হয়?"

"না মা, গরম লুচি ভাল্লো লাগবে না। কি বলিস শরৎ?"

শরৎ বলিল, "তা লুচিটাই বা মন্দ কি? মা যখন বলছেন।"

বিমল বলিল, "তোর বিশ্বাস মায়েরা খাওয়ার সম্বন্ধে কখনও ভুল করেন না?"

শরৎ বলিল, "তাই তো বিশ্বাস।"

"ভুল শরৎ। ওঁদের খাওয়ানোর অত্যাচারে ছেলে চিররুগ্ন হয়—তা জানিস্?"

যোগমায়া বলিলেন, "তুমি বিশ্বাস ক'রো না, বাবা। মা যদি ছেলের ধাত না বোঝে তো তাকে ছেলেবেলায় অনেক ভোগ ভুগতে হয়।"

বিমল বলিল, "তা হয়। শরৎকে দেখলে সেটা বেশ টের পাওয়া যায়, মা।"

"ষাট্! কথার ছিরি দেখ!" যোগমায়া সেখানে দাঁড়াইলেন না।

বিমল বলিল, "ছেলেদের খুঁড়লে মা সেখানে দাঁড়ান না। এমন অন্ধ স্নেহ—কোথাও দেখা যায় না, শরৎ।"

শরৎ বলিল, "যেখানে নিষ্ঠা বেশী—অন্ধত্ব সেখানে স্বাভাবিক। আমরা কবে এমন অন্ধত্ব নিয়ে দেশকে ভালোবাসতে শিখব, বিমল?"

বিমল বলিল, "স্নেহই বলো আর শ্রদ্ধা-ভক্তিই বলো—অন্ধত্ব ভালো নয়।"

শরৎ বলিল, "অন্ধত্বই তো শক্তি। ও শক্তিকে অস্বীকার করিস নে বিমল, পথ হারিয়ে ফেলবি।"

বিমল বলিল, "পথ চলব নির্বিচারে? বিচার করব না—এ তো ভালো নয়!"

"বিচার তর্ক আগে করে নিস্, কিন্তু চলবার কালে সামনে থাকবে শুধু পথ। শুধু চলবার সাধনা। তখন যদি বিচার করিস, তর্ক তুলিস—পথের লক্ষ্যে তোর পৌঁছনো হবে না।"

"এই কি তোমাদের দেশভক্তি শরৎ?"

"এই আমাদের ভক্তি। এর জন্যেই প্রাণ দেওয়া-নেওয়া চলে। বিচারের মূঢ়তা আমাদের আচ্ছন্ন করে না।"

বিমল বলিল, "কি জানি! আমার মনে হয়, ওই তোদের ফাঁক, ওরই মধ্যে নিষ্ফল হবার বীজ যেন পোঁতা রইল।"

শরৎ বলিল, "সেই জন্যেই বলছি—সঙ্ঘনেতার কাছে দীক্ষা গ্রহণ তোর আবশ্যক হয়ে পড়েছে।"

"দীক্ষার সময় হলেই নেব। তার আগে তোদের সঙ্গে হৈ হৈ করে দেশটাকে চিনে নেয়া যাক্। কে ওখানে?"

যোগমায়া সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "আমি। একটু জল খাবি আয়।"

বিদায়কালে যোগমায়া বিমলকে একটু দূরে লইয়া গিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিলেন, "আমার পা ছুঁয়ে দিব্যি কর্ বিমল—ওদের দলে তুই মিশবি নে।"

বিমল যোগমায়ার পাদস্পর্শ করিল, কিন্তু শপথ করিল না। শুধু বলিল, "আজ থাক, মা।"

"না খোকা, আজ তুই কথা না দিলে আমার ভাবনা ঘুচবে না।"

"তুমি নিশ্চিন্ত থাকো মা, কোন খারাপ কাজই আমি করব না।—তোমার যাতে মাথা হেঁট হয়, এমন কাজ।"

চিবুক ধরিয়া চুমু খাইয়া যোগমায়া বলিলেন, "থাক্, থাক্। তোদের জন্যেই না ভেবে মরি।"

মায়ের উদ্বেগ বিমলের মনেও গভীরভাবে সঞ্চারিত হইয়া গেল। সে আপন মনে বলিল, "পথ চলব—নির্বিচারে নয়। বিচার চাই, যুক্তি চাই—তবে কাজ।"

চিন্তার ভাগ কাহাকেও না দিয়া নিস্তার নাই। নিস্তারিণীর কাছে যোগমায়া সব খুলিয়া বলিলেন।

শুনিয়া গালে হাত দিয়া নিস্তারিণী বলিলেন, "ওমা, আমি যাব কোথায়! থানা-পুলিস—এসব ভালো কথা নয় তো দিদি। তুমি এর বিহিত করো।"

"কি বিহিত করব, বোন? ছেলে বড় হয়েছে—"

"বড় হয়েছে বলে মা'র কথা গেরাহ্যি করবে না?" একটু ভাবিয়া হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, যাতে গেরাহ্যি করবে, তার উপায়ও একটা আছে।"

"কি উপায় রে?" যোগমায়া সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন।

"ছেলের বিয়ে দাও, দিদি। ওর স্বদিশী-টদিশী কোথায় চলে যাবে।"

যোগমায়ার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নিস্তার যেন অন্ধকারে আলো জ্বালিয়া দিয়াছে। খুশীভরা কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "ঠিক বলেছিস, বোন! ওঁর তো খেয়াল নেই, চাকরি নিয়ে কোন্ তেপান্তরে পড়ে আছেন। আমি মরি আকাশ-পাতাল ভেবে। ঠিক বলেছিস।"

নিস্তারিণী বলিলেন, "তোমার ঠাকুরঝির দেশের সেই মেয়েটিকেই কেন দেখে এসো না, দিদি?"

"কালই গোছগাছ করছি। এই অঘ্রাণেই ওর বিয়ে দেব, বোন।" একটু থামিয়া বলিলেন,

"কা'কে বাড়ী আগলাতে রেখে যাই বল্ দেখি? বিশ্বাসী হয়—অথচ গরুগুলোর যত্ন করে।"

"লোকের অভাব কি? রতনের বউকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

"জিনিসপত্তর তছনছ করবে না তো? গরুকে শানি মেখে দেবে তো ঠিক সময়ে?"

"মাত্তর দু'টি দিন তো—সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি পরশুই জিরেটে যাও দিদি। বেনেদের জীবনকে সঙ্গে নেবে তো?"

"হ্যাঁ। ডাকতে-হাঁকতে ওই ছোঁড়াই তো যায়।—গণ্ডা আষ্টেক পয়সা দিলেই হবে।" একটু থামিয়া বলিলেন, "শুধু হাতে তো যাওয়া যায় না। কিছু মিষ্টি আর তরিতরকারি নিতে হবে। আজ বরঞ্চ ঠাকুরঝিকে একখানা চিঠি লিখিয়ে দিই।"

৫

আমবাগানের ঘাটে ষ্টীমার ভিড়িল। দূর হইতে ছবির মতো মনে হইতেছিল গ্রামখানিকে। গঙ্গার ঈষৎ উঁচু পাড়—ভাঙনের ভ্রূকুটি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এ নদীও একদিক ভাঙিয়া অন্য দিকে নিচু তট রচনা করিয়া যায়। তবে পদ্মার মতো ভূমিগ্রাসের লোলুপ ক্ষুধা ইহার নাই। পূর্ব্বে হাত ষাটেক দূরে শ্মশানঘাটের প্রান্তে আসিয়া ষ্টীমার লাগিত। কুড়ি বৎসরের মধ্যে ওইটুকু মাত্র জমি গঙ্গা গ্রাস করিয়াছেন। আমবাগানের কয়েকটি বৃক্ষও গঙ্গাগর্ভশায়ী হইয়াছে এবং আমবাগানের ও-পিঠেই কমলাদের বাড়ীখানি লইয়াও ভাবনার সৃষ্টি হইয়াছিল কিছুদিন আগে। এখন পূজা-অর্চনায় গঙ্গাদেবী তুষ্ট হইয়াছেন। ভাঙনের বেগ মন্দীভূত হইয়া খানিকটা সমতল বালু-আকীর্ণ প্রান্তরও যেন দেখা দিতেছে। বাগানটা বাঁচিলে বাড়ীখানিও রক্ষা পাইতে পারে।

গঙ্গার ঘাটে কমলা নিজে আসিয়াছেন। তাঁহার ছোট ছেলে ও নয় বৎসরের মেয়েটিও আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দূর হইতে ছেলেদের কাপড়-আন্দোলনের ঘটা দেখিয়া যোগমায়া সেটুকু অনুমান করিয়াছিলেন। ঘাটে ষ্টীমার ভিড়িতেই ছেলেরা কোলাহল করিয়া উঠিল, "মামীমা!"

কাঠের সিঁড়ি তখন ভালো করিয়া লাগানো হয় নাই, ছোট ছেলে লাফাইয়া ষ্টীমারে উঠিল। একজন চট্টগ্রামবাসী মাঝি মোটা নারিকেল কাছি ধরিয়া তক্তাখানি ঠিক করিতেছিল, বিরক্ত কণ্ঠে বলিল, "আঃ, লাফাইছেন ক্যান্ কর্ত্তা?" সারেং দোতলার ছোট ঘরটির বাহিরে রেলিং ঠেস দিয়া যাত্রীদের ওঠা-নামা দেখিতে লাগিল।

ভিড় একটু কমিলে যোগমায়া নামিয়া আসিলেন। মণীশ খালাসীদের মাল নামাইতে দিল না, নিজেই কাঁধে তুলিয়া লইল ও জীবনের কাঁধে কিছু বা চাপাইয়া দিল। কমলা হাসিয়া যোগমায়াকে অভ্যর্থনা করিলেন।

বেশ ছোট গ্রামখানি। বসতি ঘন না হইলেও বিরল নহে। সকলেরই বসতবাটী ছাড়া অন্ততপক্ষে একখানি বাগান আছে, একটা পুকুর আছে। মেটে পথ—ধূলা হাঁটুভোর নহে। মোড়ে মোড়ে সিমেণ্ট দিয়া বাঁধানো ঝাঁকড়া বকুল গাছ; অশ্বত্থ গাছের তলায় নোড়ানুড়ি অর্থাৎ ষষ্ঠীদেবীর আবাস-স্থল। ছোট ময়রার দোকান, মুদিখানা, ছোট পাঠশালা, গোপীনাথ ঠাকুরের মন্দির হইতে কাঁসর-ঘণ্টাবাদ্য সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় শোনা যায়। বাগানময় গ্রাম বলিয়া গুমোটভরা দিনেও বেশ স্নিগ্ধ বোধ হইতেছে। আমবাগানের মধ্যেই একটা পানাভরা পুকুর আছে—টোপা পানায় ভরা পুকুর। ঘাটের কাছে খানিকটা তকতকে জল দেখা যায়—লোকজনের হাতের ঠেলায় সেখানে পানা জমিতে পায় নাই। এ-ঘাটে পানার ভয়ে স্নান বড় কেহ করে না—শুধু বাসন মাজিবার জন্য কুলবধূরা সকালে ও দুপুরে এখানে আসে। স্নান করিবার জন্য ঠিক একখানি ফালি বাগানের ওপারে চক্রবর্ত্তীদের বড় পুকুর আছে। শান-বাঁধানো চওড়া ঘাট। ঘাটে যাইবার দু-পাশে অশোক, চন্দন প্রভৃতি তরুরাজি, আম, নারিকেল ও কাঁঠাল গাছের ঘনত্ব মনকে খুশী করিয়া তুলে।

আমবাগানের মধ্য দিয়া যোগমায়া কমলাদের বাড়ীর সামনে আসিলেন। প্রকাণ্ড সিং-দরজার দু-পাশেই দু'টি প্রশস্ত বৈঠকখানা। চওড়ায় হাত আষ্টেক হইলেও লম্বায় কুড়ি-পঁচিশ হাতের কম নহে। ঝাড়-লণ্ঠন, দেয়ালগিরি ও ছবি-আয়নায় বৈঠকখানা ঘর সুসজ্জিত। সবগুলিই বিলাতী ছবি নহে। বুয়র যুদ্ধের, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার, ইংলণ্ডের রাজ-দরবারের ছবির পাশে হরকোপানলে মদন-ভস্ম, গৌরীর পিত্রালয়ে আগমন, রাস পূর্ণিমায় গোপীমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যলীলা, শ্রীচৈতন্যের নগর-সঙ্কীর্ত্তন, বিজয়ায় হিমালয়পুরীর শোকমলিন ভাব—রুচিসম্মতভাবেই সাজানো। হরিশবাবু লোকটি রসজ্ঞ। সাপ্তাহিক 'হিতবাদী'র তিনি গ্রাহক এবং

হিতবাদী-প্রকাশিত শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে নাটক নভেল প্রভৃতির নিয়মিত সংগ্রাহক। এই সব সৎ গ্রন্থাবলীর কল্যাণে ক্ষুদ্র একটি পাঠাগার গড়িয়া উঠিয়াছে এখানে।

কমলার পুত্রবধূ আসিয়া যোগমায়ার পায়ের ধুলা লইল। দিব্য ফুটফুটে ছোটখাটো বউটি। সলজ্জ চলন, হাসি হাসি মুখ—আধঘোমটা দিবার ভঙ্গিটুকুও মনোরম। কোলের হৃষ্টপুষ্ট ছেলেটিও ভারি শান্ত। হাত পাতিতেই যোগমায়ার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। মিষ্টির হাঁড়ি পরে খোলা হইবে, যোগমায়া তাহার হাতে একটি টাকা দিলেন।

কমলা হাসিয়া বলিলেন, "টাকার তো সবই বোঝে ও!"

যোগমায়া বলিলেন, "বোঝে না কি ঠাকুরঝি? কাঠের পুতুলও টাকার জন্যে হাঁ করে। এই দেখ, কেমন শক্ত মুঠোয় চেপে ধরেছে!"

"আপ্তসারা ছেলে!"—বলিয়া গাল টিপিয়া কমলা নাতিটিকে আদর করিলেন।

বারান্দার ওপার হইতে হরিশবাবু বলিলেন, "হঠাৎ পুবের সূর্য্য পশ্চিমে উঠলো কেন, বউ?"

"পুবের সূয্যি পশ্চিমে না উঠলে তোমাদের দর্শন পাওয়া যায় না যে, ঠাকুরজামাই!"

"তবু ভালো! পর্ব্বত মহম্মদের কাছে না গেলেও মহম্মদ আসেন পর্ব্বতের কাছে।"

"তোমরা কি পর্ব্বত, ঠাকুরজামাই?"

"আর বয়স তো হচ্ছে। পাহাড়কে তবু নড়ানো সম্ভব—আমরা দিন দিন অনড় হয়ে পড়ছি। থাকবে তো দু-একদিন?"

"কোথায়! পরশুই যেতে হবে।"

"কেন, পায়ে কাক বেঁধে আসার মানে?"

"মানে পরে বোঝো'খন।"—কমলা চাপা ধমকের সুরে বলিলেন। "মানুষটা তেতেপুড়ে এলো—একটু জিরুক, তার পর তোমার উকিলের জেরা চালিও।"

"উকিল আমি নই, কনট্রাক্‌টারি করি। তা ভয় নেই, জলটল খেয়ে জিরোও। জেরা আর করব না।"

যোগমায়া হাত-মুখ ধুইয়া মাদুরের উপর বসিয়া বলিলেন, "দিব্যি ফুটফুটে বউটি এনেছ ঠাকুর-জামাই, দেখে হিংসে হয়।"

হরিশবাবু বলিলেন, "কনট্রাক্‌টার হলেও ঘটকালিতে আমার হাতযশ আছে। তোমার হিংসে দূর করবার ক্ষমতাও রাখি, বউ।"

"বেশ তো, আমার বিমলের জন্যে অমনি টুকটুকে আর লক্ষ্মী বউ একটি এনে দাও না।"

"টুকটুকে বউ এনে দিতে পারি, কিন্তু দেবীটেবী আনবার কথা দিতে পারি না। ওটা কপাল।"

"কপাল তো বটেই। ভালো ঘর—ভালো বংশ, এই সব দেখলেই যথেষ্ট।"

"তাই আছে। তোমার ঠাকুরঝি তোমাদের লেখেন নি কিছু?"

"লিখেছিলেন অনেক দিন আগে। তখন বিমলের বিয়ে দেবার ইচ্ছে আমার ছিল না।"

"আজ মেয়ে পরের ঘরে পাঠিয়ে পরের একটি মেয়ে আনবার সাধ বুঝি খুব বেড়ে উঠেছে!"

যোগমায়া হাসিলেন। একটু থামিয়া বলিলেন, "তা ছাড়া—শোন তবে, সব খুলে বলি।"

সমস্ত শুনিয়া হরিশবাবু বলিলেন, "তা ও রোগের যে ওই দাওযাই—তোমাকে বাৎলালে কে বউ?"

"কে আবার বলবে—আমি বুঝি জানি নে।"

হরিশবাবু খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তোমরা জানো না—এ কথা আমি বলি না। তোমরা যদি না জানবে তো ঘরে ঘরে আমাদের এমন সুশীল সুবোধ বালকরা এলো কোথা থেকে? একটি দু'টি নয়, ঘর বোঝাই।"

যোগমায়া অবাক্ হইয়া হরিশবাবুর মুখের পানে চাহিলেন।

হরিশবাবু বলিলেন, "অবাক্ হচ্ছ কেন বউ? শান্তিপূর্ণ সংসার তো তোমাদেরই সৃষ্টি। যেখানে আগুন জ্বলে—জল ঢেলে তোমরা নিবিয়ে দাও। যেখানে দুষ্টু ঘোড়া রাশ ছেঁড়বার যোগাড় করে—সেইখানেই বল্গা টেনে রাখো তোমরা। তোমরা যে শান্তিময়ী।"

যোগমায়া বলিলেন, "ঠাট্টা করছ, ঠাকুর-জামাই?"

"ঠাট্টা! কেন—শক্তিময়ী বলি নি বলে ঠাট্টা মনে করছ? তা বউ, শক্তিময়ীর দরকার তো চিরদিন থাকে না। সে এক কালে ছিল, যখন ওঁদের প্রভাব ছিল বেশী, স্তুতি করত লোকে। এখন শান্তির যুগ আসছে—কাজেই শান্তিময়ীর প্রশস্তিই আমরা করি।"

কমলা বলিলেন, "বসে বসে আদিখ্যেতার কথা

শুনিস্ নে বউ, মেয়ে যদি দেখতে চাস, আজ বিকেলেই দেখতে পাবি।"

"বেশ তো,—কোন্ মেয়েটি শুনি না।"

"জয়ন্তী দিদির নাম জানিস্ তো। বাঁডুয্যে-বাড়ীর জয়ন্তী দিদির একটি ভাইঝি আছে। পরমা-সুন্দরী। আর তেমনি গুণ। লেখাপড়াও জানে।"

হরিশবাবু বলিলেন, "সুর করে রামায়ণ-মহাভারত পড়তে পারে, দাশু রায়ের অনেক পাঁচালি তার কণ্ঠস্থ। আর রামপ্রসাদী গান এমন গায়!"

"কথা শুনে গা জ্বালা করে!" মুখ ঘুরাইয়া কমলা বলিলেন, "গেরস্তর বউ—গান গেয়ে কি করবে শুনি?"

"কেন, পরকালের পথে খানিকটা এগিয়ে দেবে। দেহতত্ত্বের গান।"

যোগমায়ার হাত ধরিয়া কমলা টানিয়া তুলিল ও ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "নাস্তিক মানুষের কথা শুনলেও প্রাশ্চিত্তি করতে হয়! তুই এ ঘরে এসে ব'স্ বউ।"

হরিশবাবু হাসিমুখে উঁহাদের উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "এক কাপ চা আর দুখানা বিস্কুট পাঠিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করো; তবে রোগ-নির্ণয়ে ভুল করলে বউ। ছেলের মধ্যে যদি তোমার বারুদ থাকে—লাভে হ'তে আর একটি প্রাণীকে জ্বালাবার ব্যবস্থা করছ।"

যোগমায়া বলিলেন, "ঠাকুরজামাই কি বললেন ভাই?"

"ওঁর ওই রকম। নিজে একবার স্বদেশী করে জেলের দুয়োর পর্য্যন্ত এগিয়েছিলেন কিনা, তাই।"

"উনি আবার স্বদেশী করলেন কবে?"

"সে অনেক দিন আগে। তখন বোম্বায়ে থাকতেন। প্রথম স্বদেশী সভা তো ওখানেই হয়। উনি গিয়েছিলেন।"

"তার পর?"

"তার পর আবার কি, দু দিনের সখ দু'দিনেই শেষ! একটু জল খেয়ে নাও।"

"ওমা, তুমিও আবার কুটুম্বিতে আরম্ভ করলে, ঠাকুরঝি!"

"কুটুমের বাড়ী এসেছ—কুটুম্বিতে করব না? নাও—ব'সো।"

আহার শেষ করিয়া একটু গড়াইতেই যোগমায়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। যখন জাগিলেন, বেলা অনেক পড়িয়া আসিয়াছে। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "যাঃ—সন্ধ্যে হ'যে এলো! আমায় জাগালে না কেন, ঠাকুরঝি?"

কমলা হাসিয়া বলিলেন, "মেয়ে তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না, কাল দুপুরে দেখলেই হবে।"

"কাল যে আমি ফিরব মনে করছি।"

"তোমার ঠাকুরজামাই কি সাধে বলেন—পায়ে কাক বেঁধে এসেছ!"

"বাড়ীতে কেউ নেই যে ভাই ঠাকুরঝি।"

"আচ্ছা—আচ্ছা—পরশু যেয়ো। একটি দিনে আর কিছু ভাঁড়ে ধাঁড় খেয়ে যাবে না।" একটু হাসিয়া বলিলেন, "তা ছাড়া বাচা নেমন্তন্ন কখনও ছাড়তে আছে!"

"কে আবার নেমন্তন্ন করলে?"

"জয়ন্তী ঠাকরুণ এসেছিলেন যে। ছেলের মা তুমি, তোমার এখন খাতির কত!"

"কি বললেন ঠাকরুণ?"

"বললেন, কাল একাদশীর পারণ, গুটি-পাঁচেক বামুন তো খাবেই—তোমরাও অমনি—"

"সৎসঙ্গে কাশীবাস বলো!"

"না লো ব্যাগারের দৌলতে গঙ্গাস্নান!"

কমলার পুত্রবধূটিকে যোগমায়া বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কেমন ঘুর ঘুর করিয়া ঘুরিতেছে। শাশুড়ীকে মৃদু ও মিষ্ট স্বরে কখনও বলিতেছে "পান খাবেন মা?" কখনও বলিতেছে, "দোক্তা আর একটু দেব? একটু পা টিপে দিই না মা? পাকা চুল তুলে দেব? চুলটা বেঁধে দিন তো। খোকাটা আজ বড় দুষ্টুমি করছে —একটু কোলে নিন না। আজ একটু তেঁতুলের টক খাব মা? না, খোকা তো এখন মাই ছেড়েছে—ওঁকে ওলের চাটনি করে খাওয়াব। মন্তর না নিলে হাতের জল শুদ্ধ হয় না কেন, মা?"

এমনি সব সেবা-মমতার অনুনয়, সহজ আব্দার ও নির্বোধ প্রশ্ন।

বউটির কথার মতো হাতের স্পর্শটিও ভারি মিষ্ট। একবার শাশুড়ীর নির্দ্দেশে যোগমায়ার পা টিপিতে আসিয়াছিল। যোগমায়া তাহার হাত ধরিয়া আদর করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার কষ্ট হবে মা, থাক্।"

"না তো! আমার কষ্ট হবে না।"

কেমন মিষ্ট কথা! সারা অপরাহ্ণ ও রাত্রির মধ্যযাম নিদ্রা না আসা পর্য্যন্ত এই সেবা-পরায়ণা ও প্রীতিময়ী বধূটিকে কল্পনা করিয়া

যোগমায়া আবিষ্ট হইয়া রহিলেন। উদ্যানের শোভা যেমন ফুল, সংসারের শোভা তেমন-ই বধূ।

বেলা দশটার পরই জয়ন্তীদের বাড়ীতে যোগমায়ারা আসিয়াছেন। মেয়ের মা আদর করিয়া গালিচা পাতিয়া ইঁহাদের বারান্দায় বসাইয়াছেন। জয়ন্তী দেবীও হাতাখুন্তি-হাতে একবার দর্শন দিয়া আপ্যায়িত করিয়া গিয়াছেন, "একটু ব'সো মা। পায়েসটা চাপিয়ে এসেছি—লুচি ক-খানা ভেজেই বেরাহ্মন-ভোজন করিয়ে—মেয়ে দেখাব'খন।"

সুতরাং ভাবী পুত্রবধূ ব্যতীত এই বাড়ীর অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে যোগমায়ার একটু-আধটু পরিচয় হইয়াছে। জয়ন্তী দেবীর প্রবল প্রতাপ এ-বাড়ীতে। তাঁহার আদেশ অমান্য করিবার সাহস মেয়েদের তো দূরের কথা—পুরুষদেরও নাই। তখন কৌলীন্য-প্রথার যুগ। কুলরক্ষার্থে জয়ন্তীর পিতা অশীতিবর্ষের এক দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী জমিদারের সঙ্গে অষ্টমবর্ষীয়া জয়ন্তীর বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের সেই ধুমধামের বর্ণনা এখনও জয়ন্তী দেবীর মুখে শোনা যায়, কিন্তু স্বামীকে লইয়া তিনি কোন দিন গৌরবের গল্প ফাঁদেন নাই। একবার মাত্র শ্বশুরবাড়ী গিয়া অর্দ্ধমুদ্রিতচক্ষে সভয়ে জয়ন্তী দেবী সেই আবক্ষলম্বিত পক্ব শ্মশ্রুযুক্ত পুরুষপ্রবরটিকে দেখিয়াছিলেন, আর দেখেন নাই। যাত্রাদলের নারদ ঋষিকে দেখিয়া জয়ন্তী দেবীর স্বামীর কথা মনে পড়িত এবং মুখ ঘুরাইয়া কতবার মন্তব্য করিতেন, "মুখপোড়া মিন্‌সের রকম দেখ! মরেও না!"

মনের অসুখকে ঢাকিতে বাবা ধনের পাহাড় চাপাইয়াছিলেন মেয়ের মাথায়। শ্বশুরকুলের বিষয় বুঝিয়া লইবার শিক্ষাও দিয়াছিলেন। ফলে বাপের আদরে, ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরে ও স্বাধীন চিত্তের অকুণ্ঠ প্রসারে জয়ন্তী দেবী মুখরা নারীতে পরিণত হইয়াছিলেন। অপ্রিয় সত্য উচ্চারণ করাতেই যেন তাঁর আনন্দ, লোককে রসনা-বাণ নিক্ষেপে ক্ষত-বিক্ষত করিয়াই বুঝি তাঁহার তৃপ্তি। তাঁহার সম্মুখে কাহারও মাথায় কাপড় খাটো হইবার উপায় ছিল না, জোরে হাসিবার শক্তি ছিল না; তিনি 'না' বলিলে 'হ্যাঁ' করাইবার সামর্থ্য কাহারও ছিল না। তীর্থধর্ম্মের উপর তিনি ছিলেন বীতস্পৃহ, কিন্তু প্রতি দ্বাদশীতে নিয়ম করিয়া পাঁচটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন। বলিতেন, "একদশীর জ্বালা—বড় জ্বালা। বোশেখ-জষ্টির দুপুরে জল-তেষ্টায় প্রাণ টা—টা করতে থাকে; বুকে ভিজে গামছা দিয়ে ছেলেবেলায় বেহুঁস হয়ে থাকতাম। মা কাঁদতেন, বাবা কাঁদতেন—তবু এক ফোঁটা জল কেউ খাওয়াতে পারে নি। বিধবার পেরাণ কি অমনি বেরয় গো! তাই বামুন খাওয়াচ্ছি, আর জন্মে যেন একাবশীর জ্বালা সইতে না হয়।"

জয়ন্তী দেবীর ভ্রাতৃ-বিয়োগের দিনটি এখনও এই গ্রামে গল্পচ্ছলে কথিত হয়। ভ্রাতার মৃতদেহ ঘিরিয়া সকলেই কাঁদিতেছে—জয়ন্তী দেবীও কাঁদিলেন। দাহকার্য্য শেষ হইবার পর তিনি উঠিয়া বসিয়া সংসারের কাজ করিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃবধূ তখনও কাঁদিতেছে দেখিয়া বলিলেন, "কাঁদবে না, অনেক সুখভোগ করেছে—অনেকক্ষণ ধরে কাঁদবে বইকি। আমি যতটুকু সুখভোগ করেছিলাম—ততটুকু কাঁদলাম।"

এখন জয়ন্তী দেবী বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছেন, বিষয়ের অধিকাংশ নষ্ট হইয়াছে। যাহা আছে—কোন প্রকারে তাঁহার জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত চলিতে পারে। আর কতদিনই বা! দেহের সামর্থ্য কমিয়া আসিতেছে; চোখের দৃষ্টি ও শ্রবণ-শক্তির হ্রাস ঘটিতেছে—শুধু সতেজ আছে রসনাটি।

কেহ যদি বলেন, "আর ক'টা দিনই বা, বৈকুণ্ঠে স্বামীর সঙ্গে শীগ্‌গির মিলবে দিদি।"

জয়ন্তী দেবী ঝঙ্কার দিয়া উঠেন, "কেন, কি দুঃখে ওর সঙ্গে মিলতে যাব লো? সুখের মধ্যে তো দিলেন সারাজীবন একাদশী, ওর সঙ্গে কোন্ সুখে মিলব লো? মরি—ভাগাড়ে টেনে ফেলে দিস, গঙ্গায় দিস্‌নে। আমার নরকই ভালো।"

বারান্দায় পাঁচ জন ব্রাহ্মণ বসিয়াছেন আহার করিতে। যোগমায়ারা পাশের ঘরে বসিয়া ইহাদের ভোজন-ক্রিয়া দেখিতেছেন। জয়ন্তী দেবী নিজে পরিবেশন করিতেছেন। অশীতিপর বৃদ্ধার কর্ম্মপটুত্ব অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন যোগমায়া। অতবড় পায়সের কড়াটা একাই টানিয়া আনিলেন জয়ন্তী দেবী। সর্ব্বকনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "আর দু'খানা লুচি দিই—পায়েস দিয়ে খাও।"

সে ছোকরা ঘাড় নাড়িয়া প্রবল আপত্তি জানাইতেই তিনি মুখ-ভঙ্গিমা সহকারে বলিলেন, "খাবে কোত্থেকে? বাড়ীতে না খেতে পেয়ে পেট

তো মরে গেছে। পায়েস খেয়েছ কখনও, না খাবার কপাল করেছ কখনও ?"

স্থূলোদর দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলিলেন, "আমাকে আর দু'খানা লুচি দেবেন, দিদি ?"

"দিই।" জয়ন্তী দেবী হাসিমুখে লুচি দিয়া বলিলেন, "আর দেব ?"

ঘাড় নাড়িয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তা দিন।"

ছোট ধামিতে যতগুলি লুচি ছিল দু'হাতে সবগুলি তুলিয়া তাহার পাতে ঢালিয়া দিয়া জয়ন্তী দেবী মুখভঙ্গিমা সহকারে বলিলেন, "খাও, রাক্ষস, খাও! দু'খানা খাব বলে রেখেছিলাম—তা তোমার গব্বেই যাক্।" এইবার অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা হাসিয়া উঠিলেন। এ ঘরে মেয়েরাও হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়িল।

জয়ন্তী দেবী এমনধারা অপ্রিয় কথাই বলিয়া থাকেন। তাঁহার কথায় লোকে রাগ করে না, কৌতুক অনুভব করে।

কনে দেখা ও পছন্দও হইল। ঠিক কমলার পুত্রবধূটির মতো সুন্দরী নহে, তবু যোগমায়ার ভালোই লাগিল। তাঁহার পা ছুঁইয়া মেয়েটি যখন প্রণাম করিল তখন স্নেহবিগলিত হইয়া যোগমায়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুমা খাইলেন। সেই প্রণাম ও চুম্বনের মধ্য দিয়াই ভাবী সম্বন্ধটি তিনি মনে মনে পাকা করিয়া লইলেন।

বলিলেন, "আর দেরী করব না, দিদি। বাড়ী গিয়েই ওঁকে চিঠি দেব। অঘ্রাণের প্রথমে যদি ভালো দিন থাকে—"

জয়ন্তী দেবী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "অঘ্রাণে তো হবে না, বোন। কুমুর বয়স কত লা ছোটবউ ?"

ছোটবউ অর্থাৎ মেয়ের মা বলিলেন, "গেল চোতে বারো উৎরে তেরয় পা দিয়েছে।"

জয়ন্তী দেবী বলিলেন, "তবে আসছে বোশেখে মেয়ে চোদ্দয় পড়বে। বোশেখ মাসেই দিন স্থির করো।"

"বড্ড দেরি হবে না ?"

"কি করব ভাই, যে বাড়ীর যে নিয়ম। চোদ্দয় না পড়লে এ-বাড়ীতে বিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ নেই, ভাই।"

জয়ন্তী দেবীর কথার উপর কথা চলে না। বিদায় লইবার সময় মেয়ের মা বাড়ীর দুয়োরগোড়ায় আসিয়া যোগমায়ার দু'টি হাত চাপিয়া ধরিয়া অনুনয়ভরা কণ্ঠে কহিলেন, "কুমুকে পায়ে ঠাঁই দেবেন দিদি। আমরা বড় আশায় রইলাম।"

যোগমায়া চিন্তিত মুখে বলিলেন, "বড্ড দেরি হয়ে যায়, তা ওঁকে চিঠি লিখি।"

"কথা দিন, দিদি।"

যোগমায়া হাসিয়া বলিলেন, "মানুষের কথার দাম কতটুকুই বা ? তবু অঘ্রাণে যদি খোকার বিয়ে না হয়, তো কথা দিলাম—তোমার মেয়েকেই ঘরের বউ করব। ভারি পছন্দ হয়েছে আমার।"

৬

আরও একদিন থাকিয়া যোগমায়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখেন—বিমল ও শরৎ বাহিরের ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছে। যোগমায়াকে দেখিয়া দুই জনেই বাহির হইয়া প্রণাম করিল। যোগমায়া অবাক হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "কখন এলি রে ?"

বিমল বলিল, "কখন কি, কাল দুপুরবেলায় এসে দেখি, বাড়ী ভোঁ-ভোঁ। শরৎকে বললাম—'পালাই চ।' ও বললে, 'দূর—তা কি হয়! মাকে দেখতে এসেছি—না দেখে যাব না। কাল তিনি নিশ্চয়ই আসবেন'।"

শরৎ বলিল, "তুই তো বাজী ফেলে বললি, কাল কক্ষনো আসবেন না। কেমন ?"

যোগমায়া বলিলেন, "কাল খেলি কি ?"

"কেন, তোফা খিচুড়ি রাঁধলাম এক বেলা—এক বেলা দুধ দিয়ে চিঁড়ের ফলার করলাম। শরৎ খাসা খিচুড়ি রাঁধতে পারে মা।"

"আজ সকালে কি খাওয়া হ'ল ?"

"আজ ভাত রাঁধলাম। ভাতে-ভোতে ভাত ঘি দিয়ে এমন মিষ্টি লাগে! একটু ফ্যান সপ্‌সপ করছিল কিনা, বেশ লাগল।"

"আঃ আমার কপাল! ফেনটা গালবার যুগ্যতা তোদের নেই! তাহ'লে তো উপোস করে আছিস বল্।"

"পিসিমার বাড়ী থেকে কি এনেছ, দাও না ? উপোস করার দুঃখ যাক।"

"দাঁড়া, হাত-পা না ধুয়ে জিনিসপত্তরে হাত দিচ্ছি কি না ?"

সত্য বলিতে কি শরৎকে দেখিয়া যোগমায়া প্রসন্ন হইতে পারেন নাই। বিমলকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন, "আবার হঠাৎ যে এলি ?"

বিমল বলিল, "শরৎ বললে—কালনা যাব। সেখান থেকে পূর্বস্থলী—কাটোয়া—"

যোগমায়া আর বিরক্তি দমন করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "তা ওর সঙ্গে হৈ হৈ করে তুমিও ঘুরবে নাকি? এই বুঝি তোমার পড়াশোনা! একেবারে পৈতে পুড়িয়ে ভগবান্ হয়েছ?"

মায়ের ক্রোধে বিমল কৌতুক বোধ করিল। কহিল, "পৈতে তো অনেক কাল খুইয়েছি, মা!"

"হ্যাঁরে একথা বলতে তোর লজ্জা করল না? বামুনের ছেলে হয়ে পৈতে ফেলে দিয়েছিস?"

"বারে আমি দিলাম বুঝি? সেদিন ধোপাবাড়ী গেঞ্জি খুলে দেবার পর দেখি পৈতে নেই। কখন গেঞ্জির সঙ্গে—"

"থাক—থাক, খুব বীরত্ব তোদের। কালই সকালে যদি পৈতে না নিবি তো মাথা খুঁড়ে মরব বলছি। আর"—একটু থামিয়া বলিলেন, "ওর সঙ্গে হৈ হৈ করে ঘুরতেও তোমায় দেব না।"

বিমল হাসিয়া বলিল, "কালনা যাবার পথে বললে, আমাদের বাড়ী একদিন থাকবে—তাই এলাম। তোমাকে ওর ভারি ভালো লেগেছে, মা।"

যোগমায়া মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "সকাল সকাল রাঁধতে যাই। সন্ধ্যের পরই খেয়েদেয়ে আমায় নিশ্চিন্দি ক'রো বাপু।"

বিমল ফিরিতেছিল, যোগমায়া ডাকিলেন, "শোন্ খোকা। কেন জিরেট গিয়েছিলাম, জানিস? ঠাকুরঝি অনেক দিন থেকেই যাবার জন্যে বলছিল। বাঁড়ুজ্জেদের চমৎকার একটি মেয়ে দেখে এলাম।"

বিমলের মুখে ছায়াপাত হইল। সে হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "তা যত ইচ্ছে মেয়ে তুমি দেখ, মা। কিন্তু—"

"কিন্তু কি? বিয়ে করবি নে?"

"করব—কিন্তু এখন নয়। পাস দিয়ে নিজের পায়ে ভর দিয়ে না দাঁড়ালে ও সব কথা তুলো না।" সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

যোগমায়া অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, শুধু চেহারায় নহে—কণ্ঠস্বরেও বিমলের যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা যায়, এবং নিজের মত জানাইয়া মায়ের মতামতকে লঘু করিয়া দিবার চেষ্টাও সে করে। কিন্তু সে ভাবনা অল্পক্ষণের জন্য। মৃদু হাসিয়া যোগমায়া মাথা নাড়িলেন। অর্থাৎ, তোমার মত তো আমি মানিয়া লইলাম আর কি!

যেদিন উহারা চলিয়া গেল—সেইদিন অপরাহ্ণে ঢাকা হইতে রামচন্দ্রের পত্র আসিল। এবং সেই পত্রই যোগমায়াকে ভাবাইয়া তুলিল। জিরাটের সংবাদ জানাইয়া যোগমায়া এখনও ঢাকায় পত্র দেন নাই, অথচ যোগমায়ার ভাবনাগুলি রামচন্দ্রের মনেও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে! নতুবা তিনি কি করিয়া লিখিলেন: "এই অগ্রহায়ণে খোকার বিবাহ দিবার মনস্থ করিয়াছি। তুমি বোধ হয় জানো—ঢাকায় সরকারী উকিল রায়বাহাদুর চুনিলাল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে। সম্প্রতি তিনি আমাকে বেয়াই বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মেয়েটি তাঁর সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা। এইবার এফ্-এ দিবে। তিনি অত্যন্ত জিদ ধরিয়াছেন—তুমি একবার এখানে আসিয়া মেয়েটিকে দেখিয়া যাও। কোষ্ঠীর মিল হইয়াছে, আমার অমত নাই। শুধু তোমার মতটি জানিতে পারিলেই—"

যোগমায়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। ঢাকা শহর তিনি কখনও দেখেন নাই। জিরাট গ্রামের ছবিই তাঁহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল এবং ব্রীড়াবনতমুখী উকিল-কন্যার স্থলাভিষিক্ত হইয়া কুমুদিনী সেই পটভূমিকায় স্পষ্টতর হইতে লাগিল।

বৃদ্ধ দ্বারিকের সঙ্গে যোগমায়া পরামর্শ করিলেন। সম্মুখে দণ্ডায়মান নাতিটিকে উদ্দেশ করিয়া দ্বারিক বলিলেন, "আমার মতে উকিলের মেয়েটিই ভালো, কি বলিস পল্টু? দেখতে শুনতেও ভালো—পাওনা-থোওনাও হবে।"

যোগমায়া বলিলেন, "পাওনা-থোওনার কথা আমি ভাবছি নে পল্টু, আমি যে কথা দিয়ে এলাম।"

দ্বারিক পাকা লোক। যোগমায়ার কাছে জিরাটের ঘটনা আনুপূর্বিক শুনিয়া কহিলেন, "পাকা কথা আর কি দিয়েছ, বউমা? যদি অঘ্রাণে বিয়ে হয়—তবেই তুমি বাক্যিদত্ত। কিন্তু ওঁরা তো অঘ্রাণে বিয়ে দিতে চান না।"

"মেয়ের মা আমার হু'টি হাতে ধরে—"

"মেয়ে থাকলে সবাই হাতে-পায়ে ধরে বউমা, ও তুমি ভেব না। শীগ্গির বিয়ে না দিলে—বলেছি তো স্বদেশী করে ছেলের তোমার পরকাল ঝরঝরে হবে।"

পুত্রের এই অপবাদ যোগমায়া সহ্য করিতে পারিলেন না। নম্রকণ্ঠে কহিলেন, "না বাবা, অঘ্রাণে এত তাড়াতাড়ি কিসের? ওঁর সঙ্গে ভালো করে পরামর্শ করি। আপনি বরঞ্চ একখানা পত্র গুছিয়ে লিখে দিন।"

কার্ত্তিক মাসের রাস পূর্ণিমায় শরৎকে লইয়া

বিমল পুনরায় বাড়ী আসিল। বলিল, "মা, শরৎ বললে কখনও শান্তিপুরের রাস দেখে নি।"

"বেশ করেছিস—এনেছিস। শান্তিপুরের রাস একটা দেখবার জিনিস। কত মুলুক থেকে কত লোক আসে—তবু সে জাঁকজমক আর নেই।"

শরৎ হাসিয়া বলিল, "তাই তো দেখতে এলাম। বিমল খালি বলে—মা রাগ করবেন।"

যোগমায়া স্নেহের দৃষ্টিতে বিমলের পানে চাহিয়া বলিলেন, "হ্যাঁরে খোকা, তুই কেবল রাগ করা ছাড়া আর কিছু দেখিস নে! পড়া কামাই করে নিত্যি হৈ হৈ করা অবিশ্যি আমি ভালোবাসিনে।"

বিমল বলিল, "শরৎটা যে হুড়ে! হৈ হৈ করা ছাড়া ওর কাজ আছে নাকি!"

"কেন, চাকরি করো না তুমি?" শরতের পানে চাহিয়া যোগমায়া প্রশ্ন করিলেন।

"কে আমায় চাকরি দেবে না? চাল নেই—চুলো নেই—"

"ষাট—ষাট! ওকি কথা! এত লোকের চাকরি হচ্ছে—"

বিমল বলিল, "চাকরি মানে তো খোসামুদি! সে ওর দ্বারা হয় না, মা! বলে, এক দাসত্বে জ্বলে পুড়ে মরছি—"

যোগমায়া বলিলেন, "তোদের ওসব কথা আমি বুঝতে পারি নে, খোকা। চাকরি না করলে সংসারধর্ম চলে কখনও?"

বিমল বলিল, "ও বলে কি জানো মা, সংসার করলেই তো ধর্ম্ম করা হ'ল না। ধর্ম্ম হ'ল আলাদা জিনিস।"

যোগমায়া স্নেহ-সকোপ কটাক্ষে তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, "বেশ তো, ওর কথা ওই বলুক না, তোমায় আর সদালুতি করতে হবে না।"

বিমল বলিল, "মাতৃ-আদেশ—অমান্য করবি নে শরৎ। সংসার মানে যদি ধর্ম্ম না হয় তো—ধর্ম্মের চেহারা কি রকম মাকে বুঝিয়ে দে।"

শরৎ হাসিয়া বলিল, "ধর্ম্মের তো একটা রূপ নয়—আমি বোঝাব কি? কেউ বোঝেন—সংসার করা ধর্ম্ম, কেউ বোঝেন জপতপ ধর্ম্ম, কেউ বোঝেন মাতৃপিতৃসেবা ধর্ম্ম, কেউ বোঝেন দেশসেবাই ধর্ম্ম, কেউ বোঝেন মানুষের সেবা—"

বিমল বলিল, "শুনছ মা, কত রকমের ধর্ম্ম আছে?"

যোগমায়া বলিলেন, "শুনছি। তোমরা ছেলেমানুষ বাবা—ধর্ম্মের কি-ই বা বোঝ? সে বোঝেন সাধু-সন্ন্যাসীরা। সংসারের মায়ায় আমরা যতটুকু করি—"

"তাও ধর্ম্ম মা—তাও ধর্ম্ম। কিন্তু মা, মানুষকে ঠেলে ফেলে দেবতাকে পুজো দেওয়া ঠিক ধর্ম্ম নয়।" যোগমায়ার চক্ষে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিতেছে দেখিয়া শরৎ তাড়াতাড়ি বলিল, "মানুষের মধ্যেও তো দেবতা বাস করেন মা, নইলে তোমাকে নমস্কার করি কেন?"

যোগমায়া সস্নেহে হাসিয়া বলিলেন, "পাগল ছেলে!"

তা শরৎকে যোগমায়ার নেহাৎ মন্দ লাগে না। ওর ওই হৈ হৈ করা বাতিক—যে বাতিকে বিমলকে পর্য্যন্ত টানিয়া নাচাইয়া ফিরে—ওইটুকুই যোগমায়ার ভালো লাগে না। কালবৈশাখীর হঠাৎ-ওঠা ঝড় গ্রামের হয় তো কল্যাণ করে, গৃহস্থকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয়। স্বাস্থ্যতত্ত্বের দূরপ্রসারী দৃষ্টি লইয়া তো গৃহস্থ সব-বিপর্য্যয়কারী বৈশাখী ঝড়কে খুশী মনে গ্রহণ করে না, আপাত ক্ষতির আশঙ্কাই তার মনে প্রবল হইয়া উঠে। স্বদেশীর গান গাহিয়া বেড়াক্ না উহারা, কিন্তু স্নান-আহার বন্ধ করিয়া অমন কণ্ঠ ফাটাইয়া চীৎকার করিবার প্রয়োজন কি? সেই চীৎকারের পিছনে পুলিসের ভয়ই যদি থাকে তো অমন গান গাহিবারই বা দরকার কি? আহা!—মা-মরা ছেলে, মা থাকিলে এমন হৈ হৈ করিয়া বেড়াইতে পারিত?

রন্ধন-ঘরে আজ যোগমায়ার অখণ্ড মনোযোগ। যত রকমের তরকারি সংগ্রহ করা যায় এবং সে-সব দিয়া যত রকমের ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়—সমস্তই আজ যোগমায়ার কাজের তালিকায় উঠিয়াছে। বৈকালে শরৎ কালনা যাইবে—কালনা হইতে ধাত্রীগ্রাম হইয়া নবদ্বীপ। সেখান হইতে তাহার গন্তব্যস্থান সে নিজেই জানে না। অদ্ভুত ছেলে। আহারের বিলাস ওর নাই, পরিচ্ছদের বাহুল্যও নাই, শয়নের আরামও কি করিতে জানে! তবু যোগমায়ার আশ্রয়ে আসিয়া যেটুকু স্বাচ্ছন্দ্য ও পায়—

"মা, তেল দাও, নাইতে যাব।"

তেলের বাটি আগাইয়া দিয়া যোগমায়া বলিলেন, "কোথায় নাইতে যাবি রে?"

"গঙ্গায় চান করে আসি। তোমার তো রান্নার এখনও অনেক দেরি।"

"তা বলে বেলা তিন প'র করে এসো না যেন। পায়েস হ'তে আমার বড় জোর ঘণ্টা দুই।"

"আমরা যাব আর আসব।"

বিমলেরা চলিয়া যাওয়ার আধ ঘণ্টাটাক পরেই হইবে—তখন বেগুন ভাজা নামাইয়া যোগমায়া সবেমাত্র পটোলের ডালনা চাপাইয়াছেন—বাহির হইতে ডাক আসিল, "বাড়ী আছেন? বলি কে বাড়ী আছেন—উত্তর দিন না গো।"

কর্কশ কণ্ঠস্বর। যোগমায়ার বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। অভ্যাসবশতঃ বাম হাতের উল্টা পিঠে মাথার ঘোমটাটা ঈষৎ টানিয়া দিয়া অনুচ্চ স্বরেই বলিলেন, "ছেলেরা কেউ বাড়ী নেই।"

উত্তর আসিল, "আপনি একবার এদিকে আসুন। ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু এসেছেন, কি জিজ্ঞাসা করবেন।"

হাত হইতে ঠকাস করিয়া খুন্তিটা পড়িয়া গেল—যোগমায়ার বুকটা আর একবার ধড়াস করিয়া উঠিল। এক মিনিট কাল দ্রুত স্পন্দমান বুকের টিপটিপানি শুনিতে শুনিতে তিনি উনানের জ্বলন্ত কাঠখানি টেলিয়া আঁচ বাড়াইবার কথাটুকুও ভুলিয়া গেলেন।

পুনরায় বাহির হইতে শ্রুত হইল, "একবার বৈঠকখানা ঘরে আসুন, ইন্‌স্পেক্টার বাবু গোটা-কতক কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবেন।"

বসন সংবৃত করিয়া যোগমায়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রান্নাঘরের জানালা বন্ধ করিয়া দুয়ারটার শিকল তুলিয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এমন সময়ে পল্টু ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল, "তোমায় যে ওরা ডাকছে, জ্যেঠিমা!"

"কে ডাকছে রে?"

"মেলাই পুলিশ। দাদুও এসেছে, ওদের সঙ্গে কথা কইছে। ও ঘরের চাবিটা দাও।"

অঞ্চল-গ্রন্থি হইতে চাবি খুলিয়া যোগমায়া পল্টুর হাতে দিয়া বলিলেন, "পুলিশ কি বলছে রে?"

"কি জানি। যা লাঠি সব হাতে—ইয়া বড় লাঠি।"—দুই হাত বিস্তার করিয়া লাঠির দৈর্ঘ্য দেখাইয়া পল্টু দ্রুত পদেই চলিয়া গেল।

বৈঠকখানা-ঘর লোকে লোকারণ্য। শুধু পুলিশের লোকই নহে—পাড়ার বহু লোকই আসিয়াছেন। চেয়ারের উপর স্ব-মর্য্যাদায় গম্ভীর হইয়া ইন্‌স্পেক্টারবাবু বসিয়া আছেন; তাঁহার নিম্নতম কর্ম্মচারী দুই জনের মুখেও অনুরূপ মর্য্যাদা ও গাম্ভীর্য্যের ছাপ। ভোজপুরী কন্‌ষ্টেব্‌লের লাল পাগড়ী, লম্বা মোটা লাঠি ও গালপাট্টাসমেত গোঁফ বুকের স্পন্দন দ্রুততর করিবার যথেষ্ট সহায়তা করে। আর প্রতিবেশী যে-সব অল্প বা অধিকবয়স্ক লোক ঐ ঘরে জমায়েৎ হইয়াছেন—তাঁহাদের মুখ থমথম করিতেছে। কি যেন আকস্মিক বিপদপাত যে-কোন মুহূর্ত্তে এখানে হইতে পারে। দ্বারিক শুধু দ্বারান্তরালবর্ত্তী যোগমায়াকে উদ্দেশ করিয়া সহজ কণ্ঠেই বলিলেন, "এঁরা তোমায় যা যা জিজ্ঞেস করবেন—ঠিক ঠিক উত্তর দেবে, মা। কোন ভয় নেই। তোমার জ্ঞানমত যা জানো—বলবে।"

কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব মোলায়েম করিয়া পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টার প্রশ্ন করিলেন, যোগমায়ার বুকে সেই প্রশ্ন তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের মতোই খোঁচা দিতে লাগিল। ভয় যথাসম্ভব দমন করিয়া মৃদু অথচ সুস্পষ্ট কণ্ঠে তিনি উত্তর দিতে লাগিলেন।

"শরৎ ছেলেটিকে আপনি কত দিন থেকে জানেন?"

"গেল আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন ও এখানে এসেছিল।"

"ঠিক জানেন, এর আগে কখনও আসে নি?"

"না।"

"আপনার ছেলে বিমলের মুখে ওর নাম এর আগে শোনেন নি?"

"না।"

"বিমলবাবু কোনদিন ওর সম্বন্ধে বা অন্য কোন ছেলের সম্বন্ধে আপনার কাছে কোন কথা বলে নি?"

"মনে পড়ে না।"

"ওরা কখনও কি বলে নি যে, ইংরেজকে তাড়াব ভারতবর্ষ থেকে?"

প্রশ্নের ধরণে যোগমায়ার ভয় কাটিয়া বিস্ময় বাড়িল। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর অধৈর্য্য স্বরে বলিলেন, "কথার উত্তর দিন।"

যোগমায়া বলিলেন, "আমি বুঝতে পারছি নে আপনার কথা।"

ইন্‌স্পেক্টর প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি করিলেন।

যোগমায়া বিস্মিত কণ্ঠে বলিলেন, "ওকথা ওরা বলবে কেন?"

ইন্‌স্পেক্টর হাসিয়া বলিলেন, "বলে, কেননা ওই ওদের অভ্যেস। তাহ'লে বলে নি ও কথা?" একটু থামিয়া প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা—আপনার ছেলে কতদিন থেকে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে?

জানেন না? ছেলেটি কি করে জানেন? তা-ও জানেন না? না জেনে-শুনে যাকে-তাকে বাড়ী ঢুকতে দেওয়া ঠিক নয়।"

যোগমায়ার অন্তর পুড়িতেছিল, ভয়ে নহে—অভুক্ত ছেলেদের কথা ভাবিয়া। ইন্‌স্পেক্টরের প্রশ্নের জবাবে 'হাঁ' 'না' কিছুই তিনি বলিলেন না। মনে মনে তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "আর একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব, ধর্ম্ম ভেবে সত্যি কথা বলবেন।"

যোগমায়া আর ক্রোধ চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। ঝাঁঝালো স্বরে কহিলেন, "মিথ্যে কথা বলা আমাদের স্বভাব নয়। বুড়ো হয়ে মরতে চললাম—ধর্ম্ম অধর্ম্মও কাউকে শেখাতে হবে না।"

ইন্‌স্পেক্টর ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "কিছু মনে করবেন না, আমরা কর্ত্তব্যবোধে অনেক অপ্রিয় কার্য্যও করে থাকি। ওই শরৎ ছেলেটি আপনার কাছে কোন পুঁটলি, কি বাক্স, কি অন্য কিছু রাখতে দিয়েছে কি?"

"না"

"ভালো করে মনে করে দেখুন।"

"না" সুস্পষ্ট, দৃঢ় কণ্ঠস্বর। এমন সময়ে তরকারি পোড়ার একটা তীব্র গন্ধ সকলের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "আর একটি কথা—"

পল্টু ও-পাশ হইতে বলিল, "জ্যেঠিমা চলে গেছেন।"

দ্বারিক বলিলেন, "বললাম তো সংক্রান্তির দিন ওই ছেলেটি গ্রামে আসে। আগে আমরা কেউ ওকে দেখি নি, বউমাও ওর বিষয় বিশেষ কিছু জানেন না। কেন, কিছু করেছে নাকি ছেলেটি?"

ইন্‌স্পেক্টর হাসিয়া বলিলেন, "খবরের কাগজ আপনারা পড়েন না?"

"রবিবারে সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' কি 'বঙ্গবাসী' আসে, তাই সকলে পড়ি।"

"কলকাতার রায়বাহাদুর ননী মজুমদারকে জানেন? সি-আই-ডির একজন নামজাদা অফিসার। তিনি খুন হয়েছেন।"

"কি সর্ব্বনাশ! আপনি কি মনে করেন—"

"সন্দেহ করি। ওদের একটা বিপ্লবী দল আছে—শরৎ সেখানকার এক জন বড় কর্ম্মী। এই দেখুন, ওর হুলিয়া আমাদের কাছে আছে।"

"কিন্তু অত ভালো ছেলে—"

"ভালো ছেলেদের নিয়েই তো আমাদের মাথা-ব্যথা। আচ্ছা আসি, নমস্কার।" দুই পা অগ্রসর হইয়া ঘাড় ফিরাইয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আমাদের সন্দেহ যদি সত্যি হয়—দেখবেন আপনাদের ভালো ছেলেটি গঙ্গাস্নান করে আর ফিরবেন না।"

ইন্‌স্পেক্টর চলিয়া যান দেখিয়া বৃদ্ধ দ্বারিক অগ্রসর হইয়া শুষ্ক কণ্ঠে কহিলেন, "আমাদের বিমলের কি কিছু—"

"কিছু নয়—যথেষ্ট বিপদ। সন্ধান নিয়ে সন্দেহের যদি কিছু না থাকে ছাড়ান পাবেন।"

"সত্যি-মিথ্যে বুঝবেন কি করে?"

"আমরা অন্তর্য্যামী। বৃটিশ প্রভুরা শুধু সামনে দুটো চোখ রেখেই রাজ্য চালান না—অনেকগুলো চক্ষু ওদের আছে।" সহসা ঘরের চারিদিকে সন্ধানী আলোর মতো দৃষ্টি বুলাইয়া হাসিলেন, বলিলেন "বাড়ীটা একদিন পুলিশ পাহারায় থাকবে। বাড়ী-সার্চ্চের একটা ওয়ারেণ্ট আনাতে হবে, আর বিমলবাবুর হোষ্টেলের ঘরটাও। সন্দেহজনক কিছু না পেলে উনি খালাস পেতে পারেন।"

গট্ গট্ করিয়া ইন্‌স্পেক্টর দলবলসহ নামিয়া গেলেন।

"গঙ্গার রাস্তা কোন্‌টা হে? দক্ষিণে? অল্‌রাইট।"

মোড়ের মাথায় বিমলকে দেখা গেল।

থানার দারোগা বলিলেন, "এই যে বিমলবাবু।"

ইনস্পেক্টর ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিমলের পানে চাহিয়া বলিলেন, "আপনিই বিমলবাবু? আপনার বন্ধুটি কোথায়?"

বিমল তাঁহার প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপাত্মক প্রশ্ন পরিপাক করিয়া সহজ স্বরেই জবাব দিল, "সে নবদ্বীপ গেল।"

"নবদ্বীপ!" দ্বারিকের পানে চাহিয়া ইনস্পেক্টার মৃদু হাস্য করিলেন। "নবদ্বীপ—কেমন? মায়ের হাতের প্রসাদটুকু খেয়ে যাবার অবসর তাঁর হ'ল না? কি এত জরুরী কাজ?"

"জানি না।"

"জানেন বৈকি কিছু কিছু, বন্ধু যখন আপনার।"

বিমলের চোখ মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। দৃঢ়স্বরে সে বলিল, "জানি না"

দ্বারিকের পানে চাহিয়া ইনস্পেক্টর কহিলেন, "আপনার বিমলবাবুর এ্যাটিচিউড্ ভালো নয়, ভুগতে হবে ওঁকে।"

বিমল বলিল, "মানে ?"

"মানে প্রাঞ্জল। এ বেলা মায়ের হাতের রান্না খাওয়া—আপনার অদৃষ্ট নেই! ভগবান্ যখন যাকে যেখানে মাপান। অদৃষ্ট—অদৃষ্ট!"—বলিয়া সব্যঙ্গে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

ধরা পটোলের ডালনা নামাইয়া যোগমায়া ততক্ষণে পায়স চাপাইয়াছেন। আরও কয়েকটি তরকারি কোটা পড়িয়া আছে। যোগমায়ার উৎসাহ নাই সেগুলি রাঁধিবার। উৎকণ্ঠায় উৎসাহ হ্রাস পাইয়াছে। ঘরের ঘড়িটা টং টং করিয়া অনেক বার শব্দ করিল। শব্দ শুনিয়া যোগমায়া বেলার আন্দাজ করেন। শুধু বারোটার পর কিছু গোলমাল হইয়া যায়। ঘড়ি দেখিতে জানেন না বলিয়া কেহ যোগমায়াকে ঠাট্টা করিলে বলেন, "উঠোনের রোদ দেখে বেলা বলে দিতে পারি—ভারি তো তোদের ঘড়ি! দম দাও রে, ঘর গোণ রে—অত হাঙ্গাম কে করে বাপু!"

অন্যমনস্কতার দরুণ আজ শব্দ গুণিতে ভুল হইয়া গেল। উঠানের কাঁটাল গাছের ছায়া পূর্বমুখী হইয়াছে দেখিয়া বেলা যে অনেকখানি বাড়িয়াছে—সেটুকু অনুমান করিলেন। উদ্বেগ বাড়িল। নিষ্ঠুর পুলিশের লোক বাছাকে দুটি খাইতে দিবে তো? শরতের আগমনে এই বিভ্রাটের সৃষ্টি, কিন্তু সেজন্য এতটুকু বিরক্তি তাঁহার মনে লাগিয়া নাই। আহার্য্য প্রস্তুত, ছেলে স্নানে গিয়াছে। হাজার অন্যায় করিলেও অভুক্ত সন্তানের উপর ক্রোধ পোষণ করিয়া ভৎর্সনার মহলা দেওয়া মায়ের যুক্তিতে বাধে। ক্রোধের সবটুকু বেগ বরঞ্চ এই শান্তিরক্ষক দলের উপর গিয়াই পড়িতেছে।

পায়স নামাইয়া যোগমায়া কর্পূর ও এলাচের গুঁড়া দিলেন। একখানি পরিস্কার থালা দিয়া হাঁড়ির মুখ ঢাকিয়া উনানের কাঠ টানিয়া আঁচ কমাইয়া দিলেন। মাটির হাঁড়িতে জল ঢালিয়া এইবার মৃদু আঁচে ভাত চড়াইয়া দিবেন; উহারা আসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতেই ভাত নামিয়া যাইবে।

পল্টু আর একবার ছুটিয়া আসিল। দুই চক্ষু বড় বড় করিয়া ভয়মিশ্রিত কণ্ঠে বলিল, "জ্যেঠিমা গো, বিমলদাকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেল!"

কার্ত্তিকী-পূর্ণিমার স্নিগ্ধোজ্জ্বল দিনটি এমনিই অকস্মাৎ মরিয়া গেল। এক ঘর রান্না ও ভরা বুকের আশা একটি মাত্র কথার আঘাতে নষ্ট হইয়া গেল। যোগমায়া জল স্পর্শ করিলেন না। নিস্তারিণী আসিয়া সাধ্যসাধনা করিলেন, প্রতিবেশিনীরা বুঝাইলেন। যোগমায়ার কণ্ঠে সেই এক কথা, "বাড়া ভাত বাছাদের সামনে ধরে দিতে পারলাম না, খাবার কথা আমায় ব'লো না গো!"

অগত্যা দ্বারিক রামচন্দ্রকে টেলিগ্রাম করিলেন। রামচন্দ্র একা আসিলেন না—ঢাকার সেই সরকারি উকিলটিও সঙ্গে আসিলেন।

বাংলায় তখন আগুন জ্বলিতেছে। বরিশালের যজ্ঞধূম বাংলার আকাশ-বাতাস ছাইয়া ফেলিয়াছে। বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ধ্বনিতে ঋত্বিক্‌রা নব জীবনের উদ্বোধন করিয়াছেন। বিপ্লবী বাংলার পূর্ণ জাগরণের দিন। ওরা রক্তচক্ষুকে ডরায় না, শক্ত লাঠির সামনে বুক ফুলাইয়া চলে, ওরা লাঞ্ছনা-নির্য্যাতনকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নবোদ্যমে চীৎকার তুলিতেছে—বন্দে মাতরম্! হে মাতা—তোমার বন্দনা করি। তুমি তো অচেতন ভূমিরূপিণী মাতা নহ, শস্যরূপিণী-জীবনী শক্তি নহ, সেবারূপিণী প্রিয়াও নহ, তোমার মাটিতে আমরা অগ্নিমন্ত্রের উপাসকেরা প্রণাম রাখিয়া দিলাম। ভক্তি-ভারাবনত শ্রদ্ধা শুধু আর বিগলিত হৃদয়বৃত্তির প্রণতি নহে, আপনাদের নব তপস্যালব্ধ জীবন-অঙ্কুরের দলগুলি প্রথম বর্ষাস্নাত শ্যাম দূর্ব্বার মতো তোমার রাতুল চরণ অর্ঘ্যমণ্ডিত করুক। আমাদের জীবন-অর্ঘ্যে তোমার মৃত্তিকারূপিণী দেহে প্রাণ সঞ্চার হউক। হে বরাভয়রূপিণী মাতা—অগ্নিরূপে তুমি উজ্জ্বল হও—আহুতিতে আমরা সেই তেজকে বিকশিত করিয়া তুলি। এই বন্দনা-গান।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের গভীর নিদ্রা ভাঙাইয়া এই বন্দনা-গানের ধ্বনি বায়ুতরঙ্গে ভাসিয়া চলে, শুব্ধ দ্বিপ্রহরের মূর্চ্ছাতুর পৃথিবীর বুকে এই ধ্বনি 'ফটিক জল'-প্রার্থী পাখীর স্বরের মতো মেদুর হইয়া উঠে, সকালে প্রভাতী বন্দনা আর সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনির সঙ্গে এই সুরের অদ্ভুত সংযোগ। যোগমায়া চমকিত হইয়া উঠেন। এই ধ্বনির সঙ্গে একটি দ্বিপ্রহরের কত আয়োজন—কত স্নেহ-মমতারই শেষ হইয়া গিয়াছে! কাঁদিতে গেলেও চোখে জল আসে না, বুকে শুধু ব্যথার কাঁটা খচ খচ করিয়া পীড়া দেয়। এত ব্যথার মাঝে প্রতিজ্ঞার বেগ দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। জল এবং জীবনধারণের জন্য যতটুকু আহার দরকার

সেটুকু যোগমায়া স্বীকার করিয়াছেন; শুধু অন্ন গ্রহণ করেন নাই। বিমল না ফিরিলে অন্নগ্রহণও তিনি করিবেন না।

রামচন্দ্র বলিলেন, "চেষ্টার ত্রুটি হবে না, কিন্তু তুমি শক্ত না হ'লে—"

গৌরী হাতে ধরিয়া কাঁদিয়াছে, "মা, একটু বোঝ।"

জামাতা সাহস দিয়াছে "আপনাকে দিয়ে দরখাস্ত দেওয়াব। বাড়ী সার্চ করে যখন কিছু পায় নি—"

নবাগত উকিলবাবু ভাবী সম্বন্ধের সূত্রটি পাকা করিয়াই বলিয়াছেন, "বেয়ান, স্থির হোন্। আপনার ছেলেকে উদ্ধার না করলে আমার প্রতিজ্ঞা যে ব্যর্থ হবে।"

নীরব শিরশ্চালনে যোগমায়া অন্নগ্রহণের অস্বীকৃতি জানাইয়াছেন। গত বারই তিনি চাতুর্মাস্য ব্রত করিয়াছিলেন। চারি মাস কাল অন্নগ্রহণ করেন নাই। পারলৌকিক পুণ্যসঞ্চয়ের চেয়ে পুত্রের কল্যাণ কামনা কিছু কম নহে।

আয়োজনের ত্রুটি রহিল না। সকলের সমবেত চেষ্টায় বিমল খালাস পাইল। অল্লায়ু অগ্রহায়ণের বেলাশেষে সদলবলে বিমল ফিরিয়া আসিল। যোগমায়া ছুটিয়া বহির্দ্বারে আসিলেন। লোক-লজ্জার বাধা মানিলেন না, বিমলের একখানি হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে একেবারে দ্বিতলের ঘরে আসিয়া উঠিলেন। বিমলকে প্রণামটুকু করিবার অবসর দিলেন না।

দুয়ারের খিল বন্ধ করিয়া বিমলকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বিমলের চক্ষুও শুষ্ক রহিল না।

প্রথম আবেগ কাটিলে যোগমায়া বিমলের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ডাকিলেন, "খোকা!"

"মা, একটু চুপ করো।"

কান্নার বেগ একবার একটু কমিয়া আসে, সেদিনের কথা মনে পড়াতে আবার বাড়িয়া উঠে। যে কথাটি বলিবার, অনেক কষ্টে ও অনেক বিলম্বে যোগমায়া হৃদয়-সমুত্থ অশ্রুর সঙ্গে মিশাইয়া ধরা গলায় বলিলেন, "আমার পা ছুঁয়ে দিব্যি কর্ খোকা—"

পূর্ণ দৃষ্টিতে যোগমায়া বিমলের পানে চাহিলেন। বড় শুকনা সে মুখ। কতকাল না খাইয়া, কত পীড়ন ও কষ্ট সহিয়া সে এমন শুকাইয়া গেল—কে জানে! বিমল ঘাড় হেঁট করিয়াই আছে। চোখের নিষ্প্রভ দৃষ্টি, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ তামাটে হইয়া গিয়াছে, সারা মুখে অবসাদ ও হতাশার সুস্পষ্ট ছাপ। পরিপূর্ণ পুষ্করিণীর জল সেঁচিয়া ফেলিলে সেখানকার পদ্মগুলি যেমন দল-সমেত ছাতাইয়া পড়ে—তেমনই হইয়াছে বিমল।

এই মুহূর্তে এই নির্জীব ছেলেটিকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইবার ক্ষণ ইহা নহে। মুহূর্তে যোগমায়া আপনাকে সংবৃত করিয়া কণ্ঠ আরও পরিস্কার করিয়া কহিলেন, "না, না, খোকা। দিব্যি তোকে করতে হবে না। আমি বলছি—দিব্যি তোকে—"

বিমল হেঁট হইয়া এতক্ষণে যোগমায়ার পায়ের ধুলা তুলিয়া মাথায় দিল। অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলিল, "সরকারকে যা লিখে দিয়ে এলাম, তোমার কাছে তা বলতে বাধা নেই। তোমার পা ছুঁয়েই বলছি—"

যোগমায়া পা সরাইয়া চমকিত হইয়া কহিলেন, "তুই কাঁদছিস কেন বাবা?"

"মা!" ছোট ছেলেটির মতো মায়ের বুকে মুখ গুঁজিয়া বিমল সমস্ত অভিযোগ, ব্যথা ও অপমানকে নিঃশেষ করিতে চাহিল হয় তো।

—

তৃতীয় অধ্যায়

১

কয়েক বৎসর পরে আর একটি অগ্রহায়ণের সকালে ছাদে বসিয়া যোগমায়া বড়ি দিতেছিলেন। বড়ি দিতে দিতে ডাকিলেন, "বউমা, ও বউমা—শুনে যাও।"

বধূ নিচে হইতে উত্তর দিল, "কি বলছেন, মা?"

যোগমায়ার সে উত্তর মনঃপূত হইল না। একালের মেয়েদের ধারাই এই। গলা বাহির করিয়া পাড়া জাহির না করিলে যেন কথা কহাই যায় না! বলিলেন, "দোতালার বড়ঘরে একখানা বড়ি দেওয়ার টিন আছে, দিয়ে যাও তো। অমনি সরষের তেলের বাটিটাও এনো।"

সে আসিলে বলিলেন, "বউ-ঝি মানুষ—অমন গলা বার করা ভালো নয়, পাড়ার লোকে নিন্দে করে।"

বধূ কহিল, "যে চারদিকে বন—এখানে কেউ কারো কথা শুনতে পায় বুঝি ?"

যোগমায়া হাসিলেন, "বনের আর কি-ই বা দেখলে, বউমা ? আমরা যখন আসি—অজগর-বন ওই কায়েত-বাড়ীটায়। বাড়ীর না ছিল পাঁচিল, না ছিল—"

বধূর কাছে সেকালের গল্প করিয়া উৎসাহ পান না তিনি; কাজেই অর্দ্ধপথে থামিয়া যান। একালের বধূরা সে-কাল সম্বন্ধে কৌতূহল পোষণ করে না; স্পষ্ট একটি অবজ্ঞা তাহাদের সূক্ষ্ম হাসিতে ফুটিয়া উঠে।

কম্পিত ভয়ে শিহরিয়া বধূ কহিল, "মাগো, আমরা হ'লে মরেই যেতাম !"

"বালাই—ষাট ! শহুরে মেয়ে তোমরা কথায় কথায় মবো-বাঁচো !"

বধূ হাসিয়া বলিল, "প্রথম যে-দিন ঘরের কানাচে শেয়ালের ডাক শুনলাম—এমনি বুকের গোড়ায় ধড়্ ধড়্ করে উঠল !"

"কেন, ঢাকা শহরে তোমাদের শেয়াল নেই—না সে শেয়ালগুলো ডাকে না ?"

"ডাকবে না কেন, অমন নিকটে ঠিক কান ফাটিয়ে ডাকে না তো !"

"বটে তো ! সভ্য শেয়াল বুঝি ?"

যোগমায়ার কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন পরিহাস ফুটিতেই বধূ নীরব হইল। একটু থামিয়া বলিল, "আজ আমি রাঁধব, মা।"

"তুমি ? কি রাঁধবে ?"

"ডাল, ডালনা, ভাজা—যা বলেন।"

"না, আজ থাক্। নবান্নর দিন, যদি গুরু-ঠাকুরই এসে পড়েন।"

"এলেনই বা।"

"তা হয় না। গুরুঠাকুর কারও হাতে খান না। তুমি রাঁধলে চলবে না।"

বধূ ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, "আমি তো বামুনের মেয়ে, তবে—"

যোগমায়া হাসিয়া কহিলেন, "বামুন-শুদ্দুরের কথা হচ্ছে না মা, ধর্ম্ম নিয়ে কথা। ভারি নিষ্ঠে-কাষ্ঠ ওঁর।"

"তবে আপনিই রাঁধুন।"

বধূ চলিয়া যায় দেখিয়া যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিমল কি এ শনিবারে বাড়ী আসবে ?"

ঘাড় নাড়িয়া বধূ নামিয়া গেল।

যোগমায়া আপন মনে বড়ি দিতে লাগিলেন—আর ভাবিতে লাগিলেন। কলিকাতার চাকরি ভালো। সপ্তাহান্তে প্রিয়-পরিজনের সঙ্গে মিলিবার সুযোগ ও সুবিধা আছে। শুধু কলিকাতা বলিয়া নহে—পোষ্টাপিস ছাড়া অন্য যে-কোন আপিসের চাকরিই ভালো। সপ্তাহে এক দিন ছুটি—পুরা একটি দিন বিশ্রাম। তা ছাড়া পূজার-বড়দিনে লম্বা ছুটি মেলে এবং বাঁধাবরাদ্দ ছুটি ছাড়া প্রতি সোম ও মঙ্গলবারেও বিমল বাড়ী থাকে। প্রথম প্রথম যোগমায়া আপত্তি করিতেন, "হ্যাঁরে খোকা, সোমবারে আবার কিসের ছুটি ?"

"এমনি ছুটি নিলাম।"

"এই সে-দিন চাকরি হ'ল—এর মধ্যে অত ছুটি নেওয়া কি ভালো ?"

বিমল হাসিয়া জবাব দেয়, "বড়বাবুর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়েছে, মা।"

"দেখিস বাপু—ক্ষতি না হয়। কত ঠাকুরের দোর ধরে চাকরিটুকু হয়েছে।"

"দোর আর কি ধরলে মা, চাকরি তো আপনিই পেয়ে গেলাম।"

"আপনি পেলি ! কথা শোন। বেয়াইমশায় বলে কত চেষ্টা-চরিত্তির করে—"

"তোমার বেয়াইমশায়ই চেষ্টা করেছেন—আমি তো করি নি।"

"খুব কথা শিখেছিস বাপু, সায়েবের চাকরি করিস কি না !"

বিমলের রহস্য-প্রফুল্ল মুখে মেঘ নামিয়া আসে, সে তাড়াতাড়ি সরিয়া যায়।

অন্তরে অন্তরে খুশী হন যোগমায়া, সময়ে সময়ে অশান্তিও বোধ করেন। এমন যখন-তখন ছুটি লওয়া—প্রতিবেশিনীরা ছেলের বধূ-প্রীতির উপর কটাক্ষ করে। বিমলের মাতৃভক্তির দৃষ্টান্ত দিয়া তিনি তাহাদের সন্দেহকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিয়া দেন; নিজের মনে সেই সন্দেহের অঙ্কুর কিন্তু বাড়িয়া উঠে। আজকাল মায়ের সঙ্গে যে সময়টুকু বিমলের কাটে, তা ঘড়ি না দেখিলেও যোগমায়া আঙুলের পর্ব্ব ধরিয়া বলিয়া দিতে পারেন। আর রুদ্ধদ্বার কক্ষে—সকাল, দুপুর, অপরাহ্নের খানিকটা এবং সমস্ত রাত্রি ধরিয়া যে অগুন্তি সময় মৃদু গল্পে ও নীরব হাসির মধ্য দিয়া নিঃশেষিত হয়—তা যোগমায়ার কাছে সুদীর্ঘ হইলেও—উহাদের পক্ষে অল্পায়ু।

"অনেক বেলা হ'ল—ওঠ্, না খোকা।"

"আর একটু ঘুমোই মা, কাল রাত্তিরে যা গরম গেছে!"

"রমেন বুঝি ডাকছে রে।"

"ডাকুক। সকালবেলায় ওর যত ডাকাডাকি! বলে দাও—বাড়ী নেই।"

"রোদ উঠলে বিছানায় শুয়ে থাকতে নেই রে—উঠে বোস্।"

এমনি সতর্কবাণী যোগমায়া কতদিন উচ্চারণ করেন। ছেলে কখনও শোনে—কখনও ছল-ছুতায় উড়াইয়া দেয়। যোগমায়া বুঝিতে পারেন কোন সঙ্গলাভের জন্য গৃহ কোণের ওই সময়টুকু সর্ব্বক্ষণই ছেলের কাছে অমূল্য সম্পদ্‌বিশেষ। মাতৃভক্তির গৌরব ফুটা বেলনের মতো চুপসিয়া যায়, জ্বালা অনুভব করেন তিনি।

সেই বিমল! খেলায় যার অদম্য উৎসাহ, স্বদেশীর টানে নাওয়া-খাওয়া ভুলিয়া যে সারাদিন বিলাতী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসবে মাতিয়াছে, ঘরের টানকে উপেক্ষা করিয়া পথের মায়াডোরে যে মনকে বাঁধিয়া রাখিত সর্ব্বক্ষণ! বুক ফাটিয়া নিশ্বাস বাহির হয়, একটা বড় রকমেরই নিশ্বাস। যোগমায়া আপনমনে বড়ি দিতে থাকেন।

বড়ি দেওয়া শেষ হইলে যোগমায়া বলিলেন, "কুলুইচণ্ডীর ব্রত কাল—মনে আছে তো বউমা?"

বধূ সলজ্জ কণ্ঠে উত্তর দিল, "এবার আপনি পালুন।"

"কেন, একটা দিন ফলার খেয়ে থাকতে পারো না?"

"থাকতে পারি। জানেন তো আপনার ছেলের কাণ্ড—কাল শনিবারে মাছ আনবেন এই এতগুলি।"

যোগমায়া কথা কহিলেন না। ধর্ম্মকর্ম্ম কিছু জোর করিয়া ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া চলে না।

আর অশান্তি বাড়িয়া উঠে কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন।

কার্ত্তিকী পূর্ণিমা প্রায়ই অগ্রহায়ণের প্রথম ঘেঁষিয়া পড়ে এবং ঐ একটি রাত্রির চাঁদের আলো সহস্র সূর্য্য-প্রভান্বিত হইয়া যোগমায়াকে দগ্ধ করিতে থাকে। ঐ দিন তিনি জলস্পর্শ করেন না—নিরম্বু উপবাসে কাটাইয়া দেন। বিমল বাড়ী আসিলে উনুন-পাড়ে তাঁহাকে বসিতে হয়, কিন্তু উনানের কাঠগুলিতে সেদিন ধোঁয়ার প্রাচুর্য্য দেখা যায় এবং যোগমায়ার দু-চোখ বাহিয়া জলধারা গড়ায়। ঐ দিন সকালে গঙ্গাস্নানে গিয়া গুপ্তিপাড়ার সুউচ্চ খেয়াঘাটের পানে তিনি বহুক্ষণ সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকেন। কত লোক খেয়াপারে চলিয়া যায়—খেয়াপার হইতে ফিরিয়া আসে; বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ, হিন্দু, মুসলমান, কৃশ, বলিষ্ঠ, রুগ্ন, সুস্থ, গৌর বা কালো—কত ধরণের লোকই যে পারাপার করে—সেই শ্যামবর্ণের রোগা ছেলেটি আর আসে না! খেয়ার উচ্চ পাড়ে—গরুর খুরের আঘাতে ধূলির কুয়াশা যেখানে রচিত হয়, তীরস্থ তরুরাজির মসীঘন সীমার পারে দৃষ্টি যেখানে পৌঁছায় না,—সেই অস্পষ্ট দিগন্তের কোল ঘেঁষিয়া ঈষৎ মলিন জামাটি গায়ে দিয়া—শুভ্র উত্তরীয় দু-পাশে উড়াইয়া, দীর্ঘ কোঁকড়া চুলে ভরা মাথাটি মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে হেলাইয়া রোগা পাতলা শ্যামবর্ণের ছেলেটি তো ফিরিয়া আসে না! জলে বুক ডুবাইয়া যোগমায়া ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করেন। দেবীর বীজমন্ত্রে শ্যাম-কিশোরের ছবিটি বার বার ফুটিয়া উঠে।

নিস্তারিণী বলেন, "দিদি, হ'ল?"

"এই যে প্রণামটা সেরে নিই।"

দীর্ঘ প্রণামের পরে আবার তিনি খেয়াপারে দৃষ্টি প্রেরণ করেন। ধূলিজালে ও বনে খায় সে দৃষ্টি আটকাইয়া যায়, শ্বেত উত্তরীয়ের আলো লাগিয়া অন্য পারের তমসা তরল হয় না একটুও।

আজ কতদিন পরে তেমন ঘন বন্দে মাতরমের ধ্বনিও শোনা যায় না। বিমলের মুখে তো নয়ই। সাহস করিয়া যোগমায়া সে কথা বিমলকে জিজ্ঞাসাও করিতে পারেন না। এই মায়ের পায়ে যাওয়া-আসার কালে যে প্রণাম বিমল রাখিয়া দেয়—সে হয়তো ভক্তিভারে নম্র, শ্রদ্ধায় পবিত্র। মাটিকে মা মানিয়া যে প্রণাম-মন্ত্র বিমল উদাত্তকণ্ঠে উচ্চারণ করিত—তাহাতে বজ্রের প্রতিধ্বনিই উঠিত। বজ্রের ডাকের আগে যেমন বিদ্যুতের আলো—তেমনই একটা চোখ-ধাঁধানো দীপ্তিও ছিল। কিন্তু ভক্তি লইয়াই যোগমায়াকে খুশী হইতে হয়। শরতের কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না। কি জানি, ভুলিয়া যাওয়া মন্ত্র আবার যদি বিমলের মনে পড়ে—ভক্তিকে ছাপাইয়া বজ্রের ডাক যদি আবার ধ্বনিয়া উঠে!

বিমল আসিয়া প্রণাম করিল। বলিব-না বলিয়া সারাদিন যে প্রশ্নকে বুকের মাঝে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, অসাবধান মুহূর্ত্তে সেই প্রশ্নই

প্রথমে তাঁহার কণ্ঠস্খলিত হইয়া পড়িল, "হ্যাঁরে খোকা, শরৎ এখন কোথায় জানিস্?"

বিমলের প্রফুল্ল মুখ সহসা চাবুক খাইলে যেমন বিবর্ণ হইয়া যায় তেমন ধারা দেখাইল। চোখের কোণে একটু আগুন জ্বলিয়া উঠিল—ঈষৎ দীপ্তি। সবেগে সে মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিল, "জানি।"

"কোথায় রে? একবার তাকে আনতে পারিস্ নে?"—যোগমায়া আকুল হইয়া উঠিলেন।

"তোমার ভয় করবে না?" মায়ের পানে চাহিয়া বিমল প্রশ্ন করিল। প্রশ্ন তো নহে—নির্ম্মম আঘাত।

অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া যোগমায়া কহিলেন, "ভয় করে, কিন্তু তাকে দেখতে ভারি ইচ্ছে হয়।"

দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া বিমল কহিল, "কিন্তু তাকে দেখবার উপায় নেই, সে এখন অনেক—অনেক দূরে।"

"কোথায়—কোথায় রে?"

"পোর্টব্লেয়ার—আন্দামান জানো! ফাঁসির বদলে লোককে যেখানে পাঠায়?"

আশ্চর্য্য—ওই একটি কথায় বিমলেরও কেমন যেন পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল সেই সন্ধ্যায়। জলখাবার নামমাত্র সে স্পর্শ করিল। বধূর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ জমাইল না। খালি পায়ে বাড়ীর বাহির হইবার সময় শুধু বলিল, "একটু বাইরে যাচ্ছি মা, ফিরতে দেরি হবে।"

অনেকখানি দেরি করিয়াই বিমল ফিরিল এবং ভালো করিয়া আহারও করিল না। যোগমায়া খুব বেশী অনুযোগ করিবার সাহস পাইলেন না। সমস্ত অপরাধের বোঝা নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া মৌন হইয়া রহিলেন।

রাত্রি প্রভাতে বিমলের পূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন। বধূর উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "আজ তুমিই রাঁধো মা, আমি গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসি।"

সংসারের আচার-বিচারে বধূ পটু না হইলেও গুছাইয়া রন্ধন করিতে জানে। যে যে জিনিস বিমল ভালোবাসে—সেগুলি তো রাঁধিয়াছেই, উপরন্তু এমন দু-একখানি তরকারি করিয়াছে যাহা যোগমায়া কখনও খান নাই। বেশ তৃপ্তি করিয়াই বিমল খাইল। যোগমায়া প্রসন্ন হইলেন।

পাখা হাতে পুত্রের সম্মুখে বসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁরে, তা হোটেলে খেতে তোদের খুব কষ্ট হয়?"

বিমল বলিল, "কষ্ট হলে আর উপায় কি, সবাই তো খায়।"

যোগমায়া একটু থামিয়া বলিলেন, "তা বাসা কর্ না কেন, বউমা তো দিব্যি রাঁধতে শিখেছেন।"

বিমল হাসিয়া বলিল, "তোমার বউমা রাঁধতে শিখলেই আমার বাসা করা চলে না, মা।"

"খুব চলে। চিরজীবনটা কষ্টই করবি বুঝি।"

বিমল বলিল, "কষ্ট মনে করলেই কষ্ট—না হ'লে কিছুই নয়। শ্বশুরমশায় কি বলেন জানো?"

"কি বলেন?"

"ওই তুমি যা বলছ।"

"তা ঠিকই বলেন তিনি। এ অঘ্রাণেই ভালো একটি দিন দেখে—"

কথাটা যোগমায়ার শেষ হইল না। কণ্ঠটা কেমন যেন শুকাইয়া উঠিল।

বিমল হাসিয়া বলিল, "তুমি একা থাকবে কি করে?"

যোগমায়া হাসিলেন, "চিরকালটা কাটলাম—আর দুটো দিন না হয়—"

"সে কি ভালো হয়?"

"খুব হয়, তুই বাসা দেখিস।"

"আচ্ছা, ভেবে দেখি।"—বলিয়া বিমল উঠিয়া পড়িল। যোগমায়ার বুক ঠেলিয়া আবার নিশ্বাস উঠিল। বিমলের আপত্তি তো প্রবল নহে! প্রবল হইলেই বুঝি যোগমায়া পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতেন।

খাইতে বসিয়া বধূকে বলিলেন, "বাসায় খুব সাবধানে থাকবে মা।" যেন বিমল বাসা করিয়া কালই বধূকে লইয়া যাইতেছে!

বধূ সলজ্জ কণ্ঠে বলিল, "আপনার ছেলে তো আগে বাসা করলেন!"

যোগমায়া বলিলেন, "বাসা করবে বৈকি।"

বধূ বলিল, "আপনিও যাবেন তো?"

"আমি!" যোগমায়া হাসির দ্বারা এই প্রশ্নের অসম্ভাব্যতা প্রকাশ করিলেন।

"তা হোক—চলুন না।"

"আমি গেলে সংসার-ধর্ম্ম কে দেখবে, মা? শিবের মাথায় অঘ্যি-জল দেওয়া, গরুর সেবা করা, ঘর-দুয়োর দেখা-শোনা করা—"

"কেন, কাউকে বলে যাবেন না হয়। পুরুতকে পয়সা দিলেই তিনি পূজো করে দেবেন।"

"পাগল! পর দিয়ে কখনও কাজ হয়, না

সে কাজের ছিরি থাকে! নিজের ঘর-দুয়োর নিজে না দেখলে নষ্ট হয়ে যায়।"

যোগমায়ার গম্ভীর থমথমে আওয়াজে বধূ কথা কহিবার সাহস পাইল না।

যোগমায়ার মেজাজটাও সেইদিন অপরাহ্নে রুক্ষ হইয়া উঠিল। নিস্তারিণী আসিলে কহিলেন, "এমনি করেই সংসার-ধর্ম্ম করবে এরা! সন্ধ্যে-বেলায় দুয়োরে গঙ্গাজল দিয়ে শাঁখটায় গোটা তিনেক ফুঁ দেবার সময় থাকে না এ-কালের মেয়েদের। এরা আবার সংসার করবে!"

নিস্তারিণী বলিলেন, "তা যা বলেছ, দিদি। গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ান সব হাওয়ার বিবি! দিন-রাত্তির ভাবন—সাজন-গোজন—এত ভালোও লাগে?"

যোগমায়া বলিলেন, "লাগবে না কেন, বোন? নিজে হাতে জমি কুপিয়ে তো শাকপাতা আজ্জায় না—কাজেই গরু-ছাগলে খেলে তো ওদের বয়েই গেল। এই যে বুড়ো মাগী ঠ্যাঙা হাতে করে বোশেখ-জষ্টির রোদে ওপর-নিচে করে আমগুলো আগলাই—ওদের সাধ্যি। তা আর পারতে হয় না!"

"তোমার দিদি অকণের গতর। একা হাতে সব করছ।"

"শ্বশুরের ভিটে—না করবার তো কথা নয়, বোন। ওরা বলে—এত খাটো কেন? খাটুনির মর্ম্ম ওরা কি বোঝে বলো? শুয়ে থাকলে গায়ে কে যেন কাঁটা ফুটিয়ে দেয়!"

"তাই বটে। সেদিন বাঁড়ুজ্জে-বাড়ী গিয়ে-ছিলাম। গিয়ে দেখি, ওঁ মা! নাক ডাকিয়ে বউ ঘুমুচ্ছে দালানে—আর একটা কালো গরু ঢুকে মস্‌মসিয়ে পালঙের ক্ষেত মুড়িয়ে খাচ্ছে। এমন ঘুমও বউ ছুঁড়ির!"

"আহা, খাসা তেজালো শাক বেরিয়েছিল গো।"

সন্ধ্যার মুখে নিস্তারিণী চলিয়া গেলেন। বধূ ততক্ষণে দুয়ারে গঙ্গাজল ছিটাইয়া শাঁক বাজাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। দুই গাল ফুলিয়া বধূর চোখে জল আসিবার উপক্রম হইয়াছে—তবু চাপা শব্দ ছাড়া শাঁখের ধ্বনি বাহির হইতেছে না। যোগমায়া উঠিয়া আসিয়া বধূর হাত হইতে শাঁখ লইয়া ফুঁ দিয়া তীব্র ধ্বনি বাহির করিয়া বলিলেন, "আস্তে আস্তে সবটা ফুঁ ঐ ফুটোর মধ্যে দিয়ে দিলে তবে শাঁখ বাজে, গায়ের জোরের কর্ম্ম নয়। ও কি, একটু গঙ্গাজল দিয়ে না ধুয়ে শাঁখ তাকের ওপর থুয়ো না। বাজালে এঁটো হয় যে।"

"একটু ধুনো দেব?"

"দাও, ধুপও একটা জেলে দাও।"

হরিনামের মালা হাতে যোগমায়া উপদেশ দিতে লাগিলেন। করাঙ্গুলি সমেত জপের অক্ষগুলি আবর্ত্তিত হইতে লাগিল, মনে মনে মন্ত্রোচ্চারণও হয়তো করিলেন, মুখে সংসার সম্বন্ধে বধূকে অনর্গল উপদেশ দিতে লাগিলেন।

রাত্রির আহারের সময় পুনরায় বিমলের কাছে বসিয়া কথাটা পাড়িলেন, "হ্যাঁরে, কবে নিয়ে যাচ্ছিস বউমাকে?"

"তুমি ক্ষেপেছ, মা!" ভাতের গ্রাস মুখে তুলিয়া বিমল সে কথার নিষ্পত্তি করিয়া দিল।

যোগমায়া মনে মনে পুলকিত হইলেন। বিমলকে আর অনুরোধ করিলেন না। কি জানি, মায়ের অনুরোধ আন্তরিক মনে করিয়া বিমল যদি সম্মতি দিয়া বসে!

২

হাতের চুড়ি ও কানের মাকড়ি পরিয়া লতা যোগমায়াকে প্রণাম করিল। যোগমায়া বধূর চিবুক ধরিয়া আদর করিলেন, "থাক্ মা, থাক্। কলকাতা থেকে বিমল গড়িয়ে আনলে বুঝি?"

লতা নীরবে ঘাড় নাড়িয়া মৃদুস্বরে বলিল, "বাবার জানা স্যাকরা।"

"তা অনেকগুলি টাকা খরচ হয়েছে দেখছি।"

বধূ অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "সোনার দামটা লাগল শুধু, বানি মাসে মাসে দিলেও চলবে।"

যোগমায়া অকস্মাৎ রোয়াক হইতে নামিয়া গরুকে শাসাইতে লাগিলেন, "ভাগাড়ে যাও, দিনরাত দড়া খুলে গাছপালা মুড়োচ্ছ—ভাগাড়ে যাও!"

বধূও যোগমায়ার সাহায্যে অগ্রসর হইতেছিল। তিনি নিষেধ করিলেন, "ওই দস্যি গরু সামলানো তোমার কর্ম্ম নয়, মা! সরো।"—বলিয়া একটা সজিনার শুষ্ক ডাল তুলিয়া লইয়া সজোরে গরুটার পিঠে আঘাত করিলেন।

আর একটু বেলা হইলে প্রকাণ্ড একটি শাল-

পাতার ঠোঙা যোগমায়ার হাতে দিয়া লতা বলিল, "ঠাকুরকে উচ্ছুগ্যু করে পাড়ার সকলকে দেবেন।"

যোগমায়া বলিলেন, "গহনা হ'লে আবার পাড়ার লোককে খাওয়ানো কেন? সবই আদিখ্যেতা!" বধূর পানে চাহিয়া দেখিলেন—তাহার মুখখানি ম্লান হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে যোগমায়ার মনে অনুশোচনা জাগিল। কথাটা বড় তীব্র হইয়া গিয়াছে। আজকাল তাঁহার কি হইয়াছে কে জানে, মনের মধ্যে একটা অকারণ উত্তাপ জমিয়া বাহির হইবার জন্য ঠেলাঠেলি করে। কথার সুরে তীব্রতা আসিয়াছে।

বধূর হাত হইতে শালপাতার ঠোঙাটি লইয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, "লোককে দেওয়া-থোওয়ার মতো আনন্দ আর কিছুতে নেই, মা। এই এত গুলো টাকা খরচ করে গহনা গড়ালে—আবার খাওয়ানো—"

বধূর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিল, "খরচের পালা যখন পড়ে—তখন খরচই হয় শুধু। ওই ছোট ঠোঙাটায় আপনার মিষ্টি আছে।"

"ঘরের লোকের জন্যে আবার আলাদা ব্যবস্থা কেন?" মুহূর্ত্তে যোগমায়ার অন্তরে সেই উত্তাপ তীব্র হইয়া উঠিল। ছেলেকে লইয়া বধূ পৃথক্ সংসার গড়িয়া তুলিতেছে!

ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া নিজের হাতে সেই মিষ্টান্ন যোগমায়া পাড়ায় বিলাইলেন। নিজে কিন্তু কিছু মুখে দিলেন না। বধূর বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও কিছু মুখে দিলেন না। শুধু বলিলেন, "শরীরটা খারাপ হয়েছে, ভাতও আজ খাব না।"

উদ্বিগ্ন মুখে বিমল ছুটিয়া আসিল, "কি হয়েছে মা!" কপালে হাত দিয়া বলিল, "কই, কিছুই না তো!"

"কপাল গরম নয়, বুকটা কেমন করছে।"

বিমল পুনরায় ব্যস্ত হইয়া উঠিল, "খুব ধড়ফড় করছে কি? ডাক্তার ডেকে আনি।" সে ছুটিয়া যায় আর কি!

যোগমায়াকে তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিতে হইল। কহিলেন, "ডাক্তার ডাকতে হবে না। ডাক্তার এসে করবে কি, একটু জিরোলেই সব সেরে যাবে'খন।"

"তুমি ভাত না খেলেই ডাক্তার ডাকব কিন্তু।"

যোগমায়া কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "তোদের জন্যে আমার অসুখ করবে না? খুব শাসন করছিস্ যাহোক্!"

"অসুখ করলে শুনব কেন! যেমন তেমন দিনে অসুখ করলেই হ'ল।"

অগত্যা যোগমায়া উঠিলেন।

কিন্তু এমন করিয়া আর কত দিন চলে? মনের উত্তাপ কখনও কথায়, কখনও কাজে ফুটিয়া উঠিতে চাহে। রুদ্ধ ঠাকুরঘরে বসিয়া যোগমায়া এই উত্তাপের হেতু নির্ণয় করিতে চাহেন। নিজের মনের সর্ব্বত্র তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলিয়া এই সামঞ্জস্যহীন আচরণের জঞ্জালগুলি কোথায় জড়ো হইয়াছে দেখিতে চেষ্টা করেন; পূজার মন্ত্র, সংসার ও স্নেহে সব একাকার হইয়া যায়। মনে হয় বধূই সর্ব্বাপেক্ষা দোষী। এই সংসারে উহার অবাঞ্ছিত আগমনই এই অনর্থের হেতু। তবু তাহাকে কথার আঘাত করিলে সে আঘাত তীক্ষ্ণ তীরের মতো তাঁহাকেই বিঁধিতে থাকে। তাঁহার বড় আদরের বিমলের বউ—কোথায় তাহাকে সর্ব্বদা স্নেহের অঞ্চলে ঘিরিয়া ঘিরিয়া রাখিবেন, না সেই আঁচলের তলাকার উত্তাপ আগুন হইয়া প্রতিনিয়ত বাহিরে আসিতে চাহিতেছে! এতদিনের হাতে-গড়া সংসার—এমনই করিয়া কি শুকাইয়া যাইবে?

যোগমায়া সঙ্কল্প দৃঢ় করিয়া বিমলের কাছে আসিয়া বলিলেন, "বোশেখ থেকে তোর মাইনে বেড়েছে—বাসাটাসা দেখ্।"

বিমলের সেই পুরাতন আপত্তি, "মা, তুমি পাগল!"

"হ্যাঁ, আমি পাগল। সারাজীবন যদি কষ্টই করবি তো কিসের জন্যে উপার্জ্জন শুনি?"

বিমল রহস্য করিয়া বলিল, "লোকে কি বলবে জানো? বলবে শাশুড়ী-বউয়ে বনিবনা হ'ল না, তাই বাসা করলে।"

যোগমায়া গম্ভীর মুখে বলিলেন, "লোকে বলবে, না তুই বলছিস? কি এমন দিনরাত বউকে নিয়ে কাক-চিল পড়াপড়ি করছি যে—লোকে বলবে? লোকের বলার কি ধার ধারি আমি!"

সেই উত্তাপ অগ্নিশিখাকে প্রকটিত করিতে চাহিতেছে!

বিমল সবিস্ময়ে মায়ের রক্তবর্ণ মুখের পানে চাহিয়া কহিল, "তুমি সুখী হবে ওকে নিয়ে গেলে?"

"কেন, বউ কি আমার দু-চক্ষের বিষ, তাই ও কথা বললি?"

"কি বিপদ! তুমি যেন আজকাল কি হয়েছ, মা। কথাগুলো এমন উল্টে ধরো।"

বধূ আসিয়া দুয়ারের পাশে দাঁড়াইয়াছে। যোগমায়ার উত্তাপ হু-হু করিয়া নামিয়া গেল। অপ্রতিভ হইয়া কণ্ঠস্বর নামাইয়া কহিলেন, "পোড়া মনের যেন কি হয়েছে। গৌরী আজ এক সপ্তাহ হ'ল চিঠি দেয়নি।"

"আমি কালই খবর আনাচ্ছি।"

রাত্রিতে বিমল বলিল, "দিনকতক তীর্থে ঘুরে এসো না, মা।"

"তীর্থে? কে নিয়ে যাবে?"

"বলো তো আমি নিয়ে যাই। তোমার তীর্থ হবে—আমারও দেশ দেখা হবে।"

"কিন্তু এবার অকাল, তীর্থ করতে নেই।"

'ঠাকুর দর্শনে আবার কালাকাল কি?

"আছে বৈকি। রোজ তো ঠাকুর দর্শন করছি নে। কিন্তু খোকা, হঠাৎ আমাকে তীর্থ করাবার সাধ হ'ল কেন রে তোর?"

"বাঃ রে, এতখানি বয়স হ'ল—কোথাও তো গেলে না। বারো মাস সংসার নিয়ে থাকলে—মানুষের মন তো!"

"মানুষের মনে কি হয় রে সংসার নিয়ে থাকলে?"

"একঘেয়ে ভালো লাগে না।"

"সংসার ভালো লাগে না! তা সংসার যাদের ভালো লাগে না তারা অরণ্যে গিয়ে থাকলেই পারে, সাধু-সন্নিসী হ'লেই পারে।" একটু থামিয়া বলিলেন, "তা দিনরাত সংসার ভালো লাগে না—এ বুদ্ধি তোর মাথায় কে ঢুকিয়ে দিলে রে? বউমা বুঝি?"

বিমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "যে-ই ঢুকিয়ে দিক, সত্যি কি না?"

"না, সত্যি নয়। যারা সংসার কি চেনে নি—তারাই বলে ও-কথা।" মায়ের কণ্ঠস্বর আবার গম্ভীর হইয়া আসিতেছে। বিমল রহস্য করিয়া বলিল, "তা যাই বলো, আমি কিন্তু এক মাসের ছুটি নিচ্ছি, বেড়াবার সখ হয়েছে বড্ড। আর তোমাকেও ছাড়ছি নে।"

যোগমায়া হাসিয়া বলিলেন, "উনিই বড় করালেন তীর্থ-ধর্ম্ম—তা তুই করাবি! ওসব বাজে কথা রেখে খাবি আয়।"

"আচ্ছা মা, তোমার কি তীর্থে যেতে ইচ্ছে করে না?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া যোগমায়া বলিলেন, সেই বরাত করেছি কি যে তীর্থ করব? যেতে ইচ্ছে হ'লেই বা যাওয়া হয় কৈ?!"

"না মা, তোমায় আমি নিয়ে যাব।"

"দূর পাগল! অকালে আমি গেলাম আর কি। আচ্ছা শোন্, এ বছর আর ছুটি নিস্ নে, আসছে বার বরঞ্চ—"

"আসছে বারও যদি অকাল থাকে?"

"পাঁজি দেখে বেরুলেই হবে।"

"মা, তুমিই তো বলো—ভালো কাজের ইচ্ছে মনে ওঠবামাত্র করা উচিত, নইলে রাবণ রাজার স্বর্গের সিঁড়ি তৈরির মতো হয়।"

"খুব পণ্ডিত হয়েছিস তো! এখন বাসা তো কর্।"

"না মা, তোমার রাবণ রাজাই বলে গেছেন, মন্দ কাজের ইচ্ছেয় দেরি হওয়াই ভালো।"

মা ও ছেলে দুইজনেই হাসিতে লাগিলেন।

পর দিন সকালে যোগমায়া পুনরায় গম্ভীর হইয়া গেলেন। বিমলকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুই একেবারে ছুটি নিয়েই এসেছিস বুঝি?"

"পাওনা ছুটি—বড়বাবু বললেন নিতে—"

"হুঁ, তা ছুটি নিয়ে পাহাড়ে চলেছিস বুঝি বেড়াতে?"

"যা গরম—দার্জ্জিলিঙে ঘুরে আসি একবার।"

"বউমাও শুনলাম যাবেন।" তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বিমলের মুখের পানে চাহিলেন যোগমায়া।

বিমল অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিল, "শ্বশুরমশায়রা মাসাবধি ওখানে রয়েছেন। বিশেষ করে ধরেছেন—"

"তা জানি। আমাকেও লিখেছেন—দু-দুবার।"

বিমল সাগ্রহে মায়ের পানে চাহিয়া বলিল, "তুমি উত্তর দাও নি?"

যোগমায়া সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, "যখনই যাও—ভালো দিন-টিন দেখিয়ো, আর সময় থাকতে আমায় ব'লো। হুট বলতে বাড়ী থেকে বেরুনো—একটা লক্ষণ আছে তো?"

বিমল আর মায়ের পানে চাহিল না, প্রফুল্ল মনে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

নিস্তারিণী বেড়াইতে আসিলে যোগমায়া কহিলেন, "সে দিন কথা শুনতে গিয়ে ভালো বুঝতে

পারলাম না, বোন। সেই যে ভরত রাজার উপাখ্যান।"

নিস্তারিণী বলিলেন, "আমার তো দিদি বসলেই ঢুল আসে। সারাদিন খেটে মরি সংসারে, দু-দণ্ড পা ছড়িয়ে যদি বসেছি কি—"

"পোড়া কপাল, কি করতে যাস্ কথা শুনতে? ভরত রাজার কথা জানিস নে? ওই তোরই মতো সংসারের মায়া রে? মরণ কালে হরিণছানাটার মায়া কাটাতে না পেরে আবার জন্মগ্রহণ করলেন।"

"আমরা নরুকি—পাপীষ্টি—আমরা যদি না জন্মাব—"

বাধা দিয়া যোগমায়া বলিলেন, "তাই বলছিলাম। হা সংসার যো সংসার করে মরি, ছেলে বউ কেউ কারও না।"

"কেউ কারও নয় দিদি! সেদিন বোসেদের—"

যোগমায়া কণ্ঠে উত্তাপ ঢালিয়া কহিলেন, "বিমল বউকে নিয়ে পাহাড়ে হাওয়া খেতে চলল যে!"

"বউমা যাবেন?"

"যাবার জন্যে তো গোছ—যাবে না আবার! আজকালকার ঢেউ।"

"তাই বটে।"

"আমাকেও বলে, চলো, সে কি টানাটানি! বলি, বুড়ো-মাগী কোথায় যাব!"

"তা গেলেই পারতে।"

"তোর কথা শুনে গা জ্বালা করে। ছেলে যাবে বউ নিয়ে বেড়াতে, আমি চোদ্দ শাকের মধ্যে ওল-পরামাণিক হয়ে যাব কোন্ মুখে শুনি?"

নিস্তারিণী সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "তা ঠাকুর-দেবতাও তো আছে।"

"ছাই আছে। ওরা যাক। আমাদের সংসারই ভালো, কি বলিস?"

"তা আর নয়—বলে শ্বশুরের ভিটে—"

এমনই করিয়া নিজের মনকে প্রবোধ দিলেন যোগমায়া।

বিদায়-দিনে প্রবোধ মানিল না মন। দু-চোখে জলধারা গড়াইয়া পড়িল। বধূর চিবুক ধরিয়া চুমা খাইয়া ধরা গলায় বলিলেন, "সু-ভালাভালি ফিরে এসো মা।"

ছেলেকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন, "বউমাকে যেন বাপের কাছে রেখে এসো না। নিয়ে যেতে হয় বেয়াই নিজে এসে নিয়ে যাবেন। বউ রেখে আসা আমাদের বাড়ীর নিয়ম নয়।"

সে রাত্রিটা মনে হইল—বড় অন্ধকার রাত্রি। বৈশাখের প্রথম রাত্রিতে যে বাতাস বয়—সে যেমন উদ্দাম—তেমনই এলো-মেলো। সে বাতাসে বিলাপ-ধ্বনির আভাস পাওয়া যায়। একলা ঘরে শুইয়া যোগমায়ার অনেকক্ষণ অবধি ঘুম আসিল না। কেবলই মনে হইতে লাগিল, এত যত্নে গড়া সংসার কি তাঁহারই সঙ্গে শেষ হইবে? এই বাড়ীর উপরে বউয়ের মমতা তো নাই-ই, ছেলেও যেন বউয়ের অতিরিক্ত অনুরাগী হইয়া উঠিতেছে। নিজের জীবনের বহু বর্ষ পূর্ব্বের ঘটনাগুলি মনশ্চক্ষে ফুটিয়া উঠিল। পুরুষরা চিরকাল ঘর ভাঙার মন্ত্রই দিয়া থাকে, ঘর গড়িবার দীক্ষা গ্রহণ না করিলে মেয়েরা পরম নিশ্চিন্তে কোন্ আশ্রয়ে থাকিয়া শান্তিসুখ ভোগ করিবে! বিমল আর কিছুই নহে, রামচন্দ্রের প্রতিবিম্ব মাত্র।

পরদিন কমলার চিঠি আসিল। কমলা লিখিয়াছে:

"ভাই বউ, অনেক দিন আমাদের এখানে আসিস নি, একবার আসবি? বউ নিয়ে সংসার আমিও করি, কিন্তু তোর মতো জড়িয়ে পড়ি নি। তা ছাড়া নাতি আছে। টাকার চেয়ে টাকার সুদের মায়া বড়। এতদিন তুই কেন এখানে আসিস নি, জানি। কিন্তু ভাই—দৈবের ওপর মানুষের হাত কি! জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে—তিন বিধাতা নিয়ে। ও সব হিন্দুই মানে! এঁরাও মানেন। যে মেয়েটিকে তুমি দেখে গিয়েছিলে—তার বিয়ে হয়ে গেছে। বেশ ভালো বিয়েই হয়েছে। আর তা ছাড়া জয়ন্তী-দিদি গঙ্গালাভ করেছেন। গঙ্গালাভ করেছেন বললে ভুল হয়, কেন না তীরস্থ হলেও গঙ্গার দিকে চেয়ে দেখেন নি তিনি। এমন মানুষও থাকে! সবাই বললে, 'তারকব্রহ্ম নাম করো দিদি।' দিদি বললেন, 'অত কথা বলতে পারব না।' হতাশ হয়ে সবাই বললে, "ওই ষ্টীমার আসছে—দেখ দিদি।' দিদি বললেন, তোরা দেখ্‌গে ষ্টীমার।' সবাই বললে, 'নাম না নাও, গঙ্গা দেখ একবার, নইলে গতি হবে না।' দিদি চোখ বুজে রইলেন। বললেন, 'না হোক্ গতি, সগ্‌গে যাবার রুচি নেই আমার।' এমন কোথাও শুনেছ? আর জয়ন্তী দিদির কথা বলে চিঠি বাড়াব না। তোমার ঠাকুর-জামাইয়ের শরীর গতিক মোটেই ভালো যাচ্ছে না আজকাল। কি জানি, ভগবান কি কপালে লিখেছেন। কেমন

ছস? মান্যে বড় হলেও কোন দিন প্রণাম দিতে পারি নি। ভালোবাসা নিস। যত শীঘ্র পারি মনীশের বিয়ে দেব। তৈরি হয়ে থাকিস।"

চিঠি পড়িয়া যোগমায়া বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। নিজের মন দিয়া যাহাকে পুত্রবধূ করিতে চাহিয়াছিলেন—সে আজ অপরের ঘরে। সুশীলা বধূ হইয়া সেই ঘর সে শ্রীমণ্ডিত করুক, বার বার এই প্রার্থনাই যোগমায়া করিলেন। প্রার্থনার সঙ্গে চোখের জল এমন হু-হু করিয়া গড়াইতে লাগিল যে, আঁচলের সবটাই ভিজিয়া সপ্ সপ্ করিতে লাগিল। হায়, আজ যদি হৃষীকেশ বাঁচিয়া থাকিত! হৃষীকেশের নাম ধরিয়া মৃদু গুঞ্জনে যোগমায়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিলেন।

নিস্তারিণী আসিলে বলিলেন, "প্রাণটা বড্ড হাঁপাই-হাঁপাই করছে ভাই, দিনকতক না হয় তীর্থেই ঘুরে আসি।"

"বেশ তো, আমাকে সঙ্গে নিযো। তা নিয়ে যাবে কে?"

"কে আবার? পা আছে, নিজেরাই যাব। এই তো কালীঘাট—আজ গিয়ে আজই ফিরে আসা যায়।"

"তবে যে বললে তীর্থ করবে?"

"তুই এমনও নেকী! কালীঘাট তীর্থ নয়, একান্ন পীঠের এক পীঠ নয়?"

"পশ্চিম যাবে না?"

"উনি আসুন। আসছে বার পেন্সন নেবেন, তখন ঘুরব।"

"কচি বউয়ের ঘাড়ে সংসার দিয়ে গেলে পারবে তো গুছিয়ে করতে?"

"না পারবার তো কথা নয়। কচি বউ কিসের? ওর আদ্ধেক বয়সে বিয়ে হয়ে আমরা সংসার-ধর্ম্ম করি নি?"

"সেকাল আর একালে অনেক তফাৎ, দিদি।"

"ঘাড়ে বোঝা পড়লে সব ঠিক হয়ে যায়।"

অন্ধকার রাত্রি আর তত অন্ধকার বোধ হয় না, বাতাসে দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দও কম শোনা যায়। তীর্থ-দর্শনের ধ্রুব তারাটি মনের দূর সীমানায় উঠিয়া নির্জ্জন একাকিত্বকে স্নিগ্ধ ও গুঞ্জনময় করিয়া তুলিতেছে।

পরম উৎসাহে যোগমায়া সংসারের কাজকর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

৩

বধূর ঘাড়ে বোঝা ফেলিতেই যোগমায়া সচেষ্ট হইলেন।

দার্জ্জিলিং স্বাস্থ্যকর স্থান। বধূর দেহবর্ণ উজ্জ্বল হইয়াছে, দেহও পুষ্ট হইয়াছে। এই বাড়ীর নিরালা কোণের কথা—নির্জ্জন পরিবেশের কথা যখন-তখন বধূর মুখে শুনা যায়।

সে প্রায়ই বলে, "মা, আপনাদের দেশের বাতাস ভারি ধূলো।"

"আজ একমাস জল নেই যে, মা। ধূলো আর কোন্ রাজত্বে নেই?"

"শহরে পাইপে করে জল ছিটোয় কিনা, ধূলো জমে না।"

"ওঃ!" তাচ্ছিল্যভরে যোগমায়া উত্তর দেন।

"যে কুড়ি-বাইশ হাত কুয়ো আপনাদের দেশে—জল টেনে তুলতে প্রাণান্ত!"

"হুঁ!" যোগমায়ার কণ্ঠস্বর গম্ভীর হইতে থাকে।

"আর একটা বাথরুম না হ'লে ভারি অসুবিধে।"

"সে আবার কি!" গাম্ভীর্য্যের মধ্যেও যোগমায়ার বিস্ময় ফুটিয়া উঠে।

"মানে নাইবার ঘর। দার্জিলিঙে সব বাড়ীতেই আছে।"

"বেশ, কালই মিস্ত্রি ডাকিয়ে ইঁদারা-তলায় একটা ছোট ঘর করে দিচ্ছি।" একটু থামিয়া বলেন, "ভালো করে ঘর-সংসার দেখে নাও, আমি শীগ্‌গিরই তীর্থে যাব।"

"আমাকেও সঙ্গে নেবেন, মা?"

"সাত সকালে তীর্থ কি? সে বয়েস হ'লে যাবে বৈকি।"

"এ বাড়ীতে আমি একলা থাকতে পারব না।"

"সে কি—আমি যদি আজ মরে যাই—তোমার ঘর-সংসার বুঝে নেবে না?"

"ও কথা বলবেন না, মা।" বধূ অনুনয় করে।

"মানুষ তো অমর নয়।" হাসিয়া উত্তর দেন যোগমায়া।

বধূ ঘাড় নাড়িয়া বলে, "না মা, ও কথা শুনলেও ভয় করে। আপনিও তীর্থে যাবেন—আমিও একদিকে চলে যাব।"

"ও কি কথা? ছিঃ!" ভর্ৎসনার সুরে যোগমায়া উত্তর দেন।

বধূ অপরাধিনীর মতো হাতের আঙুলে আঁচলের খুঁট জড়াইতে লাগিল।

"যা বললে-বললে—আমার সামনে আর কখনও ব'লো না ও-কথা। আমরা এগারো বছর বয়েস থেকে গুছিয়ে সংসার করতে শিখেছি। শাশুড়ী কত বকেছেন—কত শক্ত কথা বলেছেন। আবার আদরও করেছেন কত নিজের সংসার নিজে না বুঝে নিলে কখনও লক্ষ্মীশ্রী থাকে!"

বধূ আর কথা কহিল না, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। যোগমায়া তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "যাও, গা ধুয়ে কাপড় কেচে নাও গে। আমি মাত্তর কালীঘাটে যাব। যাব আর আসব, ভয় কি? বিমল বাড়ী থাকবে।"

বধূ চলিয়া গেল।

যোগমায়া হাসিলেন। বয়স হইলে কি হয়—একালের মেয়েরা মনে অত্যন্ত ছেলেমানুষই আছে। ন' বছরের মেয়ে এক দিন সভয়ে শাশুড়ীর আঁচল চাপিয়া ধরিতে পারে, এক ছেলে কোলে করিয়া ষোল বছরে যেদিন সমস্ত দেহে ও মনে পরিপূর্ণ হইয়া সেই বালিকা এই ভিটায় ফিরিয়া আসিল, সেদিন ভয়ের লেশমাত্রও তার মনে ছিল না। অথচ আঠারো বছরের মেয়ের ভয় দেখিলে হাসি পায়!

ভয় উহার ভাঙাইতেই হইবে,—এই রবিবারেই তিনি কালীঘাট যাইবেন।

গাঙ্গুলী-গিন্নি, নিস্তারিণী, বোসেদের হরিলক্ষ্মী প্রভৃতি জন-দশেক মিলিয়া ভাদ্র-কালী দেখিতে রওনা হইলেন।

বধূকে উপদেশ দিতে গিয়া যোগমায়ার তো ট্রেণ ফেল হইবার যো! অবশেষে বিমলই তাড়া দিয়া তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিল।

গাড়ী খানিকদূর আসিলে বলিলেন, "ওই যা:—নিস্তার,—হরিনামের ঝুলিটা ফেলে এলাম।"

"তা হোক, মনে মনে জপ ক'রো।" গাঙ্গুলী-গিন্নী উত্তর দিলেন।

"মানতের পয়সা ক'গণ্ডা যে আনা হ'ল না।"

"এখন আনতে গেলে ট্রেণ ধরা যাবে না ভাই, পরে কারও হাতে পাঠিয়ে দিও।"

"কপালে ছোঁয়ানো পয়সা।"—যোগমায়া খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে দেখা গেল—যে কয়টি প্রয়োজনীয় জিনিস—সব কটিই হয় ফেলিয়া অথবা ভুলিয়া আসিয়াছেন। ঘোড়ার গাড়ী বদল করিয়া ছোট ট্রেণে উঠিতে হইল; ছোট ট্রেণের পর চুর্ণীঘাটের নৌকা, তারপর রাণাঘাটে দুই দফা ট্রেণ বদল। কলিকাতায় পৌঁছিয়া বিরাট ষ্টেশন ও জনমণ্ডলী দেখিয়া বিস্মিত না-হওয়া পর্য্যন্ত একটি-না-একটি ফেলিয়া আসা জিনিসের জন্য যোগমায়ার মৃদু, সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ আক্ষেপে গাড়ীর কামরা মুখরিত হইয়া উঠিল। বোস-গিন্নি মুখ টিপিয়া হাসিলেন, গাঙ্গুলী-গিন্নি কয়েকবার প্রবোধ দিলেন, নিস্তারিণী সর্ব্বক্ষণই সমবেদনাতুর হইয়া রহিলেন।

কলিকাতায় পা দিতে-না-দিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। বলিলেন, "রাতকে দিন করে রেখেছে—এত আলো জ্বাললে কে!" বিস্ময় কাটিলে বলিলেন, "কি জানি বাড়ীতে কি কাণ্ড হচ্ছে! সন্ধ্যে উৎরে যাবার আগে পিদিমটা যদি জ্বেলে দেয়!"

"দেবে—ভাই দেবে। বউ তোমার সেয়ানা খুব।"

"কোথায় সেয়ানা! আমি তা হ'লে ভেবে মরি?"

"কেন, কথায় তো খুব ছব্বানব্বা দেখতে পাই।" বোস-গিন্নি বলিলেন।

"ওই কথাই। আমার আঁচল ধরেই ফেরে! যা বলি মুখটি বুজিয়ে শোনে।"

"তবে তো ভালো তোমার বউ।" বোস-গিন্নি বলিতে লাগিলেন, "আমার বউটি কেমন জানো? একেবারে যাকে বলে—বিষ নেই কুলোপনা চক্কোর। আবার বলে, বোয়ের হিংসে করি। শুনেছ কথা! আমি যেন ওর সতীন! পোড়া কপাল!"

নিস্তারিণীর বিস্ময় সব কথাতেই বর্দ্ধিত হয়। বলিলেন, "ছেলের বোয়ের হিংসে? ওমা—সে আবার কি কথা!"

"ওই যে কথায় কথায় টিকটিক্ করি কিনা। ক্ষেতি-অপচো দেখতে পারি নে। সাধে বলি—ডুম্বি বউ—একটা কাজের যদি ধরণ আছে!" নথ ঘুরাইয়া বোস-গিন্নি বাহির পানে চাহিলেন।

গাঙ্গুলী-গিন্নি বলিলেন, "এখন বউয়ের কথা রেখে—নিজের নিজের মোট গুণে নাও। কালী-ঘাটে এলাম বলে।"

বোস-গিন্নির কথাটা যোগমায়ার মনে ধরিয়া গেল—শাশুড়ী তবে সত্যই বধূর হিংসা করে! অন্ততঃ শাশুড়ী না মনে করুক—বধূরা হয়তো মনে করে। বধূর কথায় মনের মধ্যে ওই যে

অকারণ উত্তাপ জমিতে থাকে—সে কি হিংসা? হিংসা বলিয়াই বধূর অকর্ম্মণ্যতাকে তীব্র কণ্ঠে অনাবৃত করিতে ইচ্ছা করে! কলহ যোগমায়া কোন কালেই ভালোবাসেন না—অথচ ওই তীব্র উত্তাপ মন হইতে বাহির করিয়া দিতে গেলেই যে তীব্র বাক্য বাহির হয়, হয়তো তাহাই কলহের নামান্তর। জলস্রোতের মতো হু-হু করিয়া শহরের সাজানো বৈভব, জনস্রোত, আলো, প্রাসাদ, যানবাহন দ্রুত সরিয়া গেল। যোগমায়া বধূর কথা ভাবিতে লাগিলেন।

তা ঠেলাঠেলি করিয়া ঠাকুর দেখা এক রকম হইল। গঙ্গায় স্নান হইতে কালীমন্দিরে ঠাকুর দর্শন—সবই ঠেলাঠেলির ব্যাপার। কাপড় ছিঁড়িবার ভয় আছে, কোমরের গেঁজিয়া অপহৃত হইবার ভয় আছে, হাতের জবাফুল ও বিল্বপত্র শক্ত মুঠার চাপে নিষ্পেষিত হইবার ভয় আছে। পাণ্ডা হাত ধরিয়া হ্যাঁচকা টান দিয়া বলিল, "বলো নমো।" তারপর দ্রুত আবৃত্তির মধ্যেই যাত্রীর কণ্ঠ হইতে পূজা-মন্ত্র উচ্চারিত হইল কিনা সেটুকু না জানিয়াই, অথবা বুঝিয়াই পাণ্ডা-ঠাকুর ভক্তের হাতের মুঠা শিথিল করিয়া দিলেন। অঞ্জলি দেবী-পাদপদ্মে পড়িল কি কোথায় পড়িল দেখিবার সুযোগ হইল না। পুরোহিত অন্ধকার গর্ভগৃহে প্রদীপ উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিলেন, "আচ্ছা করে দর্শন করো মায়ি—পূজা দেও।" মা কালীর লাল টকটকে জিহ্বার খানিকটা দেখা গেল শুধু, কানে তাম্রপাত্রে অবিশ্রান্ত দর্শনী পড়িবার ঝন্‌ঝন্ আওয়াজ শ্রুত হইল, এবং যুক্তকর যাত্রীর প্রণাম শেষ হইতে-না-হইতে পাণ্ডা-ঠাকুর তাঁহাদের ঠেলিয়া বাহিরে লইয়া আসিলেন। বাহিরে আলোহাওয়ায় নিঃশ্বাস লইবার সুযোগে যাত্রীরা কথা কহিবার সুযোগ পাইলেন।

"আঃ—খাসা দর্শন হ'ল!" বোস-গিন্নি বলিলেন।

গাঙ্গুলী-গিন্নি বলিলেন, "বড্ড তাড়াতাড়ি করে।"

নিস্তারিণী বলিলেন, "আর পিদিমের তেমন জোরও নেই।"

চাটুয্যে-গিন্নি বলিলেন, "যে তাড়াতাড়ি মন্তর পড়ে!"

যোগমায়া কোন কথা না বলিয়া বস্ত্রাঞ্চলে কপালের ঘাম মুছিতে লাগিলেন।

বোস-গিন্নি রহস্য করিয়া কহিলেন, "কি দিদি, লাউ-মাচা—পুঁই-মাচা দেখলে নাকি?"

যোগমায়া বলিলেন, "সে তো তবু একটা ঠাহর করা যায়—এ সবই ধোঁয়া।"

সকলেই হাসিলেন। "ধোঁয়া? উনুনের, না মনের?"

যোগমায়া বলিলেন, "মনেরই ভাই।"

ঠাকুর দর্শন হইলে দুই ধারের দোকানে যে অজস্র রকমের জিনিসপত্র আছে—সেই দিকে ইঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। গাঙ্গুলী-গিন্নির কোন আত্মীয় কালীঘাটে বাসা করিয়া আছেন। তাঁহারই বাড়ীতে এই নাতিবৃহৎ দলটি আশ্রয় লইয়াছেন। সেই বাড়ীরই একটি তের-চোদ্দ বছরের ছেলে পথ-প্রদর্শকের কাজ করিতেছিল। ছেলেটি ছোট হইলেও—একেবারে স্ত্রী চরিত্রে অনভিজ্ঞ নহে। ইঁহাদের দোকানের দিকে ঝুঁকিতে দেখিয়া বলিল, "এ বেলা বাসায় চলুন, খাওয়া-দাওয়া করে ও-বেলা বরঞ্চ জিনিসপত্র কিনবেন।"

গাঙ্গুলী-গিন্নি বলিলেন, "এই পাঁচমিনিট, বাবা। তুমি একটু দরদস্তুর করে দাও, চেনা দোকান দেখিয়ে দাও।"

কিন্তু সে অবসরটুকুও ইঁহারা ছেলেটিকে দিলেন না। সামনের বড় দোকানটিতেই হুড়মুড় করিয়া ঢুকিয়া পড়িলেন এবং জিনিস হাতে করিয়া দরদস্তুর আরম্ভ করিলেন। ছেলেটি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল।

"ওমা, ওইটুকুন পুতুলের দাম ছ' পয়সা!"

"ও কালীঘাটের পুতুল মা, আর কোথাও এমন পুতুল পাবেন না।"

"নাঃ! আমাদের কেষ্টনগরের বার-দোলের মেলায় যা পুতুল আসে···ঘূর্ণির মতো কারিগর কোথাও আছে নাকি?"

নিস্তারিণী বলিলেন, "তবে বার-দোল থেকেই না হয় নেব। মিছিমিছি এতদূর থেকে মাটির ঢেলা বয়ে মরি কেন?"

যুক্তি ভালো। কিন্তু ঘূর্ণির কারিগর ভালো হইলেও—কালীঘাটের তীর্থমাহাত্ম্য তো সে পুতুল-গুলিতে নাই। দরদস্তুর চলিতে লাগিল এবং বোঝাই আঁচল ক্রমশঃ ভারি হইয়া উঠিতে লাগিল। এ দিকে ছেলেটি তাগাদা দিতে আরম্ভ করিয়াছে, "চলুন, দশটা বেজে গেল যে!"

"হেই বাবা, আর একটুখানি—দু'খানা পট ভালো দেখে কিনে নেই।"

"ও-বেলাই না-হয় কিনবেন—দোকান তো উঠে যাবে না।" ছেলেটি যেন বিরক্ত হইয়াছে।

কিন্তু ছেলেমানুষের কথা শুনিতে গেলে আর সংসার চলে না। দোকানী তো আগেই বলিয়াছে, "যা কেনবার পছন্দ করে নিন্ মা-ঠাকরুণরা, ওবেলা ফুরিয়ে যেতে পারে জিনিস।"

ধূর্ত্ত দোকানী জানে—ইঁহাদের প্রত্যেক জিনিসের প্রতি অপরিসীম লোভ আছে এবং পুরাতন দোকান খুঁজিয়া বাহির করিবার ধৈর্য্যেরও অভাব।

বলিল, "সবুর করুন না বাবু, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। খাওয়া-দাওয়ার কোন কষ্টই হবে না।"

গাঙ্গুলী-গিন্নি বলিলেন, "তুমিও যেমন বাবা, বিধবার আবার খাওয়া! একটা ভাতে-ভোতে—"

ছেলেটি মনে মনে বলিল, "সবাই তো আর বিধবা নয়।"

পট কেনা হইলে—কাঠের খেলনার দিকে দৃষ্টি পড়িল। সেগুলি কিনিয়া পিতলের বাসনের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

"এই পঞ্চ পিদিম কত, বাবা? পিলসুজ? তামার ফেরো?"

দোকানী ইঁহাদের চেনে—কাজেই চড়া দাম হাঁকিয়া বসিল। দরদস্তরে ইঁহারাও পটু। দেবস্থানের মাহাত্ম্য-বর্ণন ও ধর্ম্ম-শপথ করিয়া ন্যায্য দরটি বলিয়াও দোকানী শুধু ইঁহাদেরই খাতিরে দর কমাইতে থাকে—খুশী মনে ইঁহারাও জিনিস গ্রহণ করিতে থাকেন। পিতলের জিনিসের পর জপের মালা ইত্যাদির উপর দৃষ্টি পড়িল।

কিন্তু সঙ্গী ছেলেটি অসহিষ্ণু কণ্ঠে কহিল, "তাহ'লে আপনারা জিনিস কিনুন—আমি ঘুরে আসি।"

সত্যই সে দোকান ত্যাগ করিয়া যায় দেখিয়া—সে ঘটনাকে ছেলেমানুষি বলিয়া উড়াইয়া দিবার সাহস কাহারও হইল না। চেনা পথ হইলে অবশ্য অন্য কথা ছিল।

"হেই বাপ—একটু দাঁড়া। কার ঠেঁয়ে কি পয়সা ধার করলাম—একটু হিসেব করে নিই। যোগমায়া-দিদি—তুমি দিয়েছ আমায় পাঁচ পয়সা—কিন্তু তোমার ঠেঁয়ে এক গুটি (কাঁচি পোয়া) দুধের দাম দেড় পয়সা পাব। তাহ'লে বাদ দিলে—তোমার পাওনা হ'ল গিয়ে সাড়ে তিন পয়সা। কেমন, সাড়ে তিন পয়সা নয়?"

"তার জন্তে ব্যস্ত কি ভাই—বাড়ী গিয়েই দিও।"

"তা তো দেবই, কিন্তু তীর্থের পয়সা হিসেবে গোল হ'লে নরক ভোগ করতে হবে যে দিদি।...আ মরণ!—ভিক্ষে চাইতে এসে একেবারে ছুঁয়ে ফেললি! আস্পদ্দা তো কম নয় মাগীর!"

এইরূপে জিনিসপত্র আঁচলে বাঁধিয়া, পয়সার হিসাব ও লাভ-লোকসান খতাইয়া বেলা একটার সময়ে সকলে বাসায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

আহারাদি সারিতে অপরাহ্ণ হইল। গাঙ্গুলী-গিন্নি বলিলেন, "কাল সকালের ট্রেণেই তো বাড়ী যাব, এই বেলা রোদ্দুর থাকতে থাকতে মালা দু'গাছা কিনে আনি গে ভাই।"

নিস্তারিণী বলিলেন, "তাই চলো দিদি, সইয়ের জন্তে আমিও একখানা মা-কালীর পট নেব।

কিন্তু ও-বেলাকার সেই ছেলেটিকে পাওয়া গেল না। গাঙ্গুলী-গিন্নি বলিলেন, "ভারি তো রাস্তা—আর ও-বেলা দোকানও চিনে এসেছি, একলাই কত কেনা-কাটা করতে পারি।"

এ-বাড়ীর বধূরা ঝিকে সঙ্গে দিতে চাইলে ইঁহারা অস্বীকার করিলেন।

"কালীঘাট তো পাড়াগাঁর মতো! আর তোমাদের তালগাছওলা বাড়ী খুব চিনতে পারব।"

তবু যদি ভুলিয়া যান—এই জন্য বধূরা বলিল, "তিরিশ নম্বর মনে রাখবেন। হালদার পাড়া।"

চেনা দোকান খুঁজিয়া না পাইলেও দোকানীরা সবাই ভদ্র। সম্বর্দ্ধনা করিয়া বসাইল। নানা প্রকারের জিনিস দেখিয়া ইঁহাদেরও অঞ্চল-গ্রন্থি শিথিল হইতে লাগিল।

হাতের পয়সা ফুরাইয়া যাওয়াতে বড় কাচের পুতুলটা হাতে লইয়া যোগমায়া বলিলেন, "দু'আনা পয়সা হবে, নিস্তার?"

নিস্তারিণী বলিলেন, "আমিই বলে তোমার কাছে চাইব-চাইব মনে করছি। আহা, কালীঘাট এমন জানলে আর দু'এক টাকা সঙ্গে করে আনতাম!"

সে আক্ষেপ কম-বেশী সকলেই করিলেন এবং ক্রীত-দ্রব্যের দোষগুণ বিচার করিতে করিতে পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ভাদ্রের আকাশে তীব্র রৌদ্রের পিছনে একখানা বড় কালো মেঘ তাড়া করিয়া আসিতেছিল। সেইখানা কালীঘাটের এই রাস্তাটির উপর থমকিয়া দাঁড়াইল ও বিনা সতর্কতায় হঠাৎ বর্ষণ সুরু করিয়া দিল। যোগমায়াদের দল ছুটিতে ছুটিতে একটি গেট-ওয়ালা বাড়ীর গাড়ী-বারান্দার তলায় আসিয়া

আশ্রয় লইলেন। মাটির পুতুল না থাকিলে আশ্রয় লইতেন কি না সন্দেহ। এমন সময় সেই গাড়ী-বারান্দার সামনে একখানা মোটর আসিয়া থামিল। ছোট ঝকঝকে মোটর হইতে নামিল—দুইজন সুশ্রী ও সুবেশ তরুণ-তরুণী।

তরুণের পরণে মোটা কাপড়—গায়ে মোটা জামা ও চাদর, পায়ে চটি জুতা। উজ্জল রং, মার্জ্জিত ও চকচকে চওড়া কপাল, চক্ষু বুদ্ধির দীপ্তিতে শাণিত, দাঁতগুলি সাদা ঝক্ ঝকে। তরুণীর গাত্রবর্ণ অতটা উজ্জল নহে, খোঁপা দেখিয়া মনে হয় চুল আগুল্‌ফলম্বিত, কিন্তু চুল বাঁধিবার ধরণটি—ইঁহাদের সুষ্ঠু বলিয়া বোধ হইল না। কপালে সিঁদুর ও হাতে লোহা নাই, কাপড়ের পাড়ও তেমন চওড়া নহে! চোখ দুটি বড় হইলে কি হয়—দৃষ্টিটা কেমন যেন প্রখর। এই এতগুলি স্ত্রীলোকের সম্মুখে মাথার ঘোমটা তুলিয়া বাহিক লজ্জা-প্রকাশের নিয়মটুকুও রক্ষা করিতে তাহার যথেষ্ট আলস্য দেখা গেল।

কলিকাতার চলনই আলাদা!

যুবক অপাঙ্গে জড়সড় কৌতূহলাক্রান্ত জনতার পানে চাহিয়া মেয়েটিকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "রেবা, বাইরের ঘরটা খুলে ওঁদের বসাও। কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবেন।"

দুয়ার খুলিয়া রেবা অভ্যর্থনা করিল, "আসুন, বসবেন আসুন।"

উন্মুক্ত দ্বারপথে উঁকি মারিয়া সকলেই সে গৃহের সজ্জা-নৈপুণ্য কিছু কিছু দেখিলেন। চেয়ার-টেবিলে ঠাসাঠাসি ঘর—কয়েকটা বই-ঠাসা আলমারিও রহিয়াছে। দেওয়ালের গায়ে যে-সব ছবি ঝুলিতেছে—তাহার একখানিও পরিচিত দেবদেবীর নহে। অপরিচিত সায়েব, মেম, ঘোড়া, কামান, পাহাড়, ফুলগাছ, নদী, বাড়ী, শৃঙ্গ ও লাঙ্গুল সমন্বিত কালো দৈত্য—অদ্ভুত সব ছবি। পরস্পর গা টেপাটেপি করিয়া ইঁহারা নিঃসন্দেহ হইলেন যে—ইহা কোন হিন্দুর বাড়ী নহে।

রেবা ডাকিল, "আসুন!"

গাঙ্গুলী-গিন্নি বলিলেন, "আর যাব না মা, বেশ আছি। ভাদ্দর মাসের বিষ্টি—এখুনি ছেড়ে যাবে।"

রেবা বলিল, "বৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছে আধ ঘণ্টার আগে আর ছাড়ছে না, আপনারা যদি না বসেন তো ভারি দুঃখিত হব।"

গাঙ্গুলী-গিন্নি বলিলেন, "আধ ঘণ্টা লাগবে! বলো কি? অন্ধকার হ'লে আমরা পথ চিনতে পারব না যে।"

"অন্ধকার হবে কেন, পথে আলো জ্বলবে।"

"রাত হবে তো। আলো জ্বললেও পথ চিনতে পারব কেন, মা?"

রেবা হাসিয়া বলিল, "ঠিকানাটা দেবেন—আমি আপনাদের পৌঁছে দেব।"

"তুমি একলা যাবে আমাদের সঙ্গে? কেউ কিছু বলবেন না?"

"না।" রেবা হাসিয়া উত্তর দিল। "আমার শাশুড়ীর ঢালাও হুকুম আছে।"

"তোমার শাশুড়ী আছেন? তাঁকে দেখলাম না তো!"

"তিনি তো এখানে নেই। এলাহাবাদে থাকেন।"

অবশেষে ইঁহারা ঘরে আসিয়া সঙ্কুচিত ভাবে একপাশে দাঁড়াইলেন। রেবার অনুরোধে নহে, বৃষ্টির সঙ্গে এমন এলোমেলো হাওয়া বহিতে সুরু হইয়াছে যে—কোঁচড়ের পুতুলগুলি সেই ছাঁট হইতে রক্ষা করা দুষ্কর।

রেবা চেয়ার আগাইয়া দিয়া বলিল, "বসুন।"

"না মা, দাঁড়িয়েই বেশ আছি।"

নিস্তারিণী অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন, "যা তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল হ'লে—"

রেবা বলিল, "জল খাবেন? আচ্ছা, আমি এনে দিচ্ছি।"

রেবা চলিয়া গেলে যোগমায়া বলিলেন, "তোর যদি কোন কালে আক্কেল হ'ল নিস্তার। কি জাত ঠিক নেই—বললি জল তেষ্টা পেয়েছে।"

"জল তেষ্টা পেয়েছে তাই বললাম। তা আমি কি জানি মেয়েটা জল আনতে ছুটে যাবে?"

গাঙ্গুলী-গিন্নি বলিলেন, "যাবে না ছুটে! ওরা তো ওই চায়।"

শুষ্ক কণ্ঠে নিস্তারিণী বলিলেন, "কি চায় ওরা?"

"জানো না—ওরা যে খিরিষ্টান। ছোঁয়া খাইয়ে সবাইকে খিরিষ্টান করে দেয়।"

নিস্তারিণী শুষ্ক কণ্ঠে কহিলেন, "ওমা, তবে আমার কি হবে! কেন মরতে তেষ্টার কথা বললাম! দিদি, পালাই চলো।"

"বৃষ্টি ঝেঁপে এলো। এককাঁড়ি পয়সা দিয়ে পুতুল কিনলাম—সব নষ্ট করব নাকি!" ঝাঁজিয়া উঠিলেন বোস-গিন্নি।

নিস্তারিণী পরম বিপদে দিশা না পাইয়া কাঁদিয়া

ফেলিলেন। যোগমায়ার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "কি হবে, দিদি ?"

কি করিয়া নিস্তারিণীর জাতি রক্ষা হয়—সেই চিন্তায় সকলেরই মুখ কালো ও গম্ভীর হইয়া উঠিল।

অবশেষে বোস-গিন্নি বলিলেন, "পোড়া কপাল! ভর সন্ধ্যেবেলা ইষ্টদেবতার নাম না করে জল খাবি কি না!"

অকূলে কূল পাইয়া নিস্তারিণী হাসিমুখে বলিলেন, "তাই বটে, বাঁচালি দিদি।"

জলের গ্লাস হাতে রেবা আসিয়া বলিল, "শুধু জল দেওয়া যায় না। উনি বললেন—মিষ্টি আনিয়ে দিতে। একটু বসুন না দয়া করে।"

পরস্পরের গায়ে চিমটি কাটিয়া দলটি রেবার এই সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে বিশেষরূপে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

বোস-গিন্নি বলিলেন, "ভর সন্ধ্যেবেলা ইষ্টদেবতার নাম না নিয়ে কি জল খেতে পারি, মা ?"

"তবে কে যেন জল চাইলেন ?"

"ও ভুলে বলে ফেলেছে।—কিছু মনে ক'রো না, মা। একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?"

"বেশ তো, জিজ্ঞেস করুন না।"

"তোমরা কি খিরিষ্টান ?"

রেবা হাসিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল। চেয়ারের হাতলে দু'হাত চাপিয়া অদম্য হাসির বেগকে ঈষৎ সংবৃত করিয়া কহিল, "না।"

"তবে হাতে নোয়া নেই—মাথায় সিঁদুর নেই—"

রেবা হাসিতে হাসিতেই বলিল, "হাতের নোয়া আর সিঁথির সিঁদুর পুরুষের দাসবৃত্তির চিহ্ন বলে আমরা ত্যাগ করেছি।"

"ওমা, স্বামীর অকল্যাণ হয় না ?"

"হয় নি তো। ভালোই আছে।" হাসিতে হাসিতেই রেবা উত্তর দিল।

যোগমায়া শিহরিয়া মনে মনে বলিলেন, "ষাট—ষাট! কি বেহায়া মেয়ে গো!"

রেবা বলিল, "তবে আপনাদের অনুমান মিথ্যে নয়। আমরা হিন্দু হ'লেও—আচার-বিচারে আপনাদের চেয়ে পৃথক্। ব্রাহ্ম জানেন! আমরা তাই।"

"হুঁ—বেশ জানি। ঘর দেখেই আমরা বুঝেছি। তা কালীঘাটে বাসা করেছ কেন ?"

"শ্বশুরের ভিটে—কোথায় যাব বলুন ?"

"কালীঠাকুরকে দেখেছ কখনও ?"

"কত বার।"

"প্রণাম করেছ ?"

রেবা হাসিয়া বলিল, "প্রণাম করেছি শুনলে আপনারা খুশী হবেন ?"

"ঠাকুরকে প্রণাম করলে কে আর খুশী না হয়।"

এমন সময়ে উপর হইতে গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল, "রেবা, একবার ওপরে এসো, অতীন এসেছে।"

"আপনারা বসুন—আমি চট করে আসছি।"

রেবা চলিয়া গেলে নিস্তারিণী বলিলেন, "আর নয় দিদি, পালাই চলো। হয়তো খাবার নিয়ে আসবে।"

বোস-গিন্নি বলিলেন, "মিথ্যে নয়। জলও কমে এলো, আঁচলের তলায় ঢেকে-ঢুকে দুর্গা দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়ি চলো।"

যোগমায়া বলিলেন, "তোমাদের অত ভয়ই বা কিসের! না খেলে—কেউ জোর করে খাইয়ে দিতে পারবে!"

গাঙ্গুলী-গিন্নি বলিলেন, "কর্তা বলতেন—ওরা সব পারে। গিয়ে না নাইলে গা ঘিন্ ঘিন্ করতে থাকবে, ভাই।"

সকলের মতে সায় দিয়া অগত্যা যোগমায়াও অল্প বৃষ্টি মাথায় করিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু ম্লেচ্ছগৃহ ভাবিয়াও এইভাবে না বলিয়া গৃহত্যাগ করিতে তাঁহার কোথায় যেন বাধিতে ছিল। ব্রাহ্ম বলিয়া যা একটু ভয়, নতুবা মেয়েটির হাসি-খুশী মুখের কথাগুলি ভারি মিষ্ট। জল খাওয়াইবার অনুরোধটুকু আন্তরিক। অতিথিকে যত্ন-আপ্যায়ন করা পল্লীবাসীদের নূতন নহে। অতগুলি মিষ্ট আনাইতে দিয়া মেয়েটি বড় ভুল করিয়াছে। আহা—বেচারীর জিনিসগুলি নষ্ট হইবে। আর মনেও কষ্ট পাইবে বৈকি।

পথে নামিয়া গাঙ্গুলী-গিন্নি বলিলেন, "যাঃ—ভিজে গেল পুতুলগুলো!"

যোগমায়া ঈষৎ তিক্তস্বরে বলিলেন, "একটু থাকলেই হ'ত। ও তো আর এতগুলো লোককে ধরে খেয়ে ফেলত না!"

নিস্তারিণী চুপি চুপি বলিলেন, "দিদি তো বললেন—ওরা সব পারে ? নয় দিদি ?"

পুতুল ভিজিয়া যাওয়ায় গাঙ্গুলী-গিন্নির মনটা অপ্রসন্ন হইয়া উঠিতেছিল। চড়া গলায় বলিলেন, "সব পারে বলে মানুষ খায় নাকি ? ওরা কি রাক্ষস! মরণ আর কি!"

নিস্তারিণী এতটুকু হইয়া গিয়া চুপ করিলেন।

বোস-গিন্নি বলিলেন, "কি গো, তালগাছওলা বাড়ী দেখতে পাচ্ছ?"

"এর চেয়ে অন্ধকার ভালো। খানিকটা আলো—খানিকটা অন্ধকার। তালগাছ কি নারকোল গাছ কি আমগাছ ঠাহর করা যায় নাকি!"

"তবে কি হবে?"

"হ্যাগো বাছা—তিরিশ নম্বরের বাড়ী কোন্‌টা বলতে পারো?"

"ওই যে বাঁ হাতে গলিটার মুখে।"

"ওমা তাই তো! তালের বাগদো নড়ছে হাওয়ায়—দেখেছ দিদি!" নিস্তারিণী মৌন ভঙ্গ করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন।

৪

নূতন চেহারা লইয়া বাড়ীটা দেখা দিল, নূতন মূর্তি বধূরও। শাশুড়ীর পায়ের ধূলা লইতেই তিনি আন্তরিক স্নেহোচ্ছ্বসিত করে চিবুক ধরিয়া চুমা খাইলেন। রেবা মেয়েটিকে তাঁহার মনে পড়িল। সে যেন শহরের তীব্র আলোর মতোই চোখ ধাঁধানো, আর লতা, সেকালের স্নিগ্ধ মাটির প্রদীপ না হউক, তার চেয়ে উজ্জ্বল হ্যারিকেনের আলো। যোগমায়ার চোখে ঈষৎ তীব্র লাগে সে আলো—কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হইতেছে, কত সুস্নিগ্ধ এ আলো। খুঁটিয়া খুঁটিয়া বাড়ী দেখিতে লাগিলেন যোগমায়া। কার্নিশের চূর্ণবালি খসিয়াছে কি না, আলিসার ইঁট স্থানচ্যুত লইয়াছে কিনা, মেঝের কোথাও ফাটিয়াছে বা গর্ত হইয়াছে কি না, পৈঁঠা বা সিঁড়ির ধাপের কোণগুলি ভাঙিয়াছে কি না। কড়ি বরগায় মাকড়সারা কিছু ঘন ঝুল বুনিয়াছে—ঘরের কোণে সামান্য ধুলাও যেন জমিয়াছে। আর গাছগুলি বেশ সতেজই আছে। শসার মাচায় যে সাতটি শসা গুণিয়া রাখিয়াছিলেন—সেই সাতটিই আছে, আরও গুটি কয়েক জালি পড়িয়াছে। কুমড়া গাছটায় জালি সমেত আর একটি ফুল ধরিয়াছে। আর বাতাবিলেবু গাছটায় অনেকগুলি ফল ছিল—সেগুলি গুণিয়া উঠা দুষ্কর, তবু আন্দাজমত হিসাব করিতে লাগিলেন—ফলগুলি ঠিক আছে কিনা।

"হ্যাঁ মা, বিমলকে একটা বাতাবিলেবু পেড়ে দাও নি কেন, ও বড্ড লেবু ভালোবাসে। মুড়ি দিয়ে না হয় একটা শসাই খেতে!"

বধূ বলিল, "ছোট্ট জালি শসা বলে তুলি নি।"

"আঃ পোড়ার দশা, গাছের জিনিস নিজেরা আগলাবে—পেড়ে খাবে—তবে না আহ্লাদ। কলু তেল দিয়ে গেছে?"

ঘাড় নাড়িয়া লতা স্বীকার করিল।

পা ধুইয়া পুঁটুলি খুলিতে বসিলেন যোগমায়া।

"এই নাও, ওগুলো কাঠের আলমারিতে ভালো করে গুছিয়ে রাখো। এই পট দু'খানা টাঙিয়ে দেও ঘরে।"

লতা বলিল, "এই পুতুলটার হাত ভেঙে গেছে যে, মা।"

"অ্যাঁ—দেখি? ওমা তাইতো, সাত মুল্লুক বয়ে এনে—এই ঘোড়ার গাড়ীতে ওঠবার সময় ধাক্কা লেগে···হবে না? একখানা গাড়ীতে ছ'জন লোক—যেন গুড়ের নাগরি বোঝাই!" খানিকক্ষণ আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "তা হোক্, তুলে রাখো। তবু তীর্থের চিহ্ন।"

খাইতে বসিয়া তীর্থের গল্প আর ফুরায় না। রেলগাড়ী, রাজধানী, লোকজন, ঠাকুর, আদিগঙ্গা ইত্যাদি লইয়া এমন অনর্গল কাহিনী বলা চলে—যাহা এক মাসেও ফুরাইবার কথা নহে। আহারাদি শেষ হইলে বধূ একখানি খামে মোড়া চিঠি আনিয়া যোগমায়ার হাতে দিল।

বলিল, "আমি পান সেজে আনি, মা।"

ঢাকা হইতে রামচন্দ্র চিঠি দিয়াছেন। অন্যান্য কথার পর লিখিয়াছেন: "শরীর যেন এলাইয়া থাকে—বল পাই না। আর একটা বছর কেমন করিয়া যে কাটিবে জানি না! পেন্‌সনের শেষ বছরটা—যেন কাটে না। বধূমাতা ওখানে না থাকিলে তোমাকে আসিতে লিখিতাম"

পান লইয়া লতা ফিরিয়া আসিল। বলিল, "মা, কি ভাবছেন? খবর সব ভালো তো?"

"না মা, তোমার শ্বশুরের শরীর ভালো যাচ্ছে না।"

"তবে ছুটি নিন্ না কেন?"

"পেন্‌সনের আর এক বছর আছে মাত্র, এখন ছুটি নেয়া নাকি খারাপ।"

"তবে আপনি সেখানে যান।"

"আমি? তোমাকে একলা ফেলে আমি কোথায় যাব?" ম্লান হাসি হাসিলেন যোগমায়া।

লতা জিদ ধরিল, "না মা, তাঁকে দেখবার একজন লোকের দরকার। আপনার যাওয়া উচিত।"

"উচিত তো বুঝি—কিন্তু যাই কি করে মা?"

একটু ভাবিয়া লতা বলিল, "কাউকে রাত্তিরে শোবার ব্যবস্থা করে যান, আমি একলাই থাকব না-হয়।"

সে জানে—বাড়ী একেবারে বন্ধ করাটা যোগমায়া পছন্দ করেন না কোন দিন, নতুবা শাশুড়ীর সঙ্গিনী হইতে তাহার প্রবল ইচ্ছা হইতেছিল।

"পারবে থাকতে? শেয়াল ডাকলে ভয় করবে না?"

"ভয় করবে কেন—খুব থাকতে পারব।"

যোগমায়ার অন্তর অকস্মাৎ আনন্দের বন্যায় উদ্বেল হইয়া উঠিল। সংসার রাখিবার শক্তি এ মেয়ের আছে। কল্যাণী বধূ—লক্ষ্মী বধূ।

আবেগে তিনি তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া কপোল চুম্বন করিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মী মা আমার!"

লতা সেই আদরে বিহ্বল হইল না, মুখ তাহার ঈষৎ শুকাইয়া গেল।

সাত-সমুদ্র-তের-নদী না হউক, বার কয়েক ট্রেণ-বদল ও মাঝখানে কয়েক ঘণ্টাব্যাপী ষ্টীমারে চাপিয়া পদ্মার উপর পাড়ি দেওয়া—একা যোগমায়ার সাধ্য নহে। পাড়ারই একজন অল্প লেখাপড়া-জানা নিষ্কর্ম্মা যুবক সঙ্গী হইল। যাত্রা-পথের দূরত্বে ও বিঘ্নসংকুলত্বে ম্রিয়মাণ হইবারই কথা। তবু—পদ্মার বিস্তীর্ণ বুকে ষ্টীমারের দোলায় দুলিতে দুলিতে এই যাত্রার মধ্যেও ভয় দূর হইবার অবসর যথেষ্ট আছে। তীরে ভিড়িবার মুখে অবতরণোন্মুখ যাত্রীদলের উৎসাহে মন চঞ্চল হইয়া উঠে। এই ক্ষণকালব্যাপী যাত্রার মধ্যে যাহারা ষ্টীমারের পাটাতনের উপর আসিয়া সংসার পাতায়, কলরব করে ও সংসার ঘাড়ে করিয়া নামিয়া যায়—নাম-পরিচয়হীন তাহাদের বিচিত্র জীবন-তথ্য ও অন্তরালবর্ত্তী সম্পদ-সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ করিতে ভারি ভালো লাগে। কল্পনায় তাহাদের বাড়ীর অঙ্গনে কোঠাঘরের সংখ্যা গণনা, পরিজনদের মধ্যে সম্প্রীতি ও কলহের খণ্ড চিত্র, দৈনন্দিন আহার্য্য-তালিকা, পাল-পার্ব্বণ, বার-ব্রতের উপবাস ও উৎসব—মনের মাঝে রং ধরাইয়া দেয়। যে বধূ কলসী কাঁখে দীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া ঘাটে জল লইবার কালে বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ওই জলে-ভাসা শহরের সমৃদ্ধ রূপের পানে চাহিয়া বিহ্বল হইয়া যাইতেছে—তাহার কুটীরের পল্লবঘন ছায়ায় একটি জ্যোৎস্না-আবেশ-মাখা রাত্রির কল্পনা হয়তো অসাময়িক হইবে না, কিন্তু স্বামী-সোহাগিনীর মনের পাতায় যে লেখাগুলি ক্ষুদ্র কলহে ও খণ্ড প্রণয়ে সোনার অক্ষরে আবদ্ধ হইয়া আছে—সেগুলির পাঠোদ্ধারে নারীমাত্রেরই কৌতূহল স্বাভাবিক। তীরে কলসী নামাইয়া বধূ তো ষ্টীমারে উঠিয়া তাহার জীবন-রহস্যের কাহিনী উদ্ঘাটিত করিবে না—ষ্টীমারের যাত্রীদলের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের মুখে যোগমায়া এ দেশীয় আচার-নীতির অনেকখানিই জানিতে পারিলেন। পদ্মার তীর অলঙ্কৃত করিয়া তাল-সুপারি-নারিকেলশ্রেণী-চিহ্নিত গ্রামগুলির মতোই ইহাদের উদ্ভাসিত হইয়া উঠা ক্ষণিকের সে আলোকে যেটুকু পরিচয় মিলে—তীরের কোলে তরঙ্গের অস্ফুট ধ্বনির মতোই তাহা সঙ্কেতময় ও মনোরম। যোগমায়া ভাবেন, কথা কহিবার ধরণটি ইহাদের এমন কেন? চেনা জিনিসের নাম করিলেও ইহাদের চক্ষুতে না-জানার কৌতূহল কেন জাগিয়া থাকে? পদ্মার তরঙ্গ আলাপের মতোই এই নদীতীরবর্ত্তী গ্রাম ও বাসিন্দাদের অল্প জানিলেও—অনেকখানি না জানিয়া অতৃপ্ত থাকিতে হয়। ইহারা জমির কথা বলে, ফসলের গল্প শোনায়। জমি অনেক দেখিয়াছেন যোগমায়া, কিন্তু এমন করিয়া জমির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইবার সুযোগ তাঁহার হয় নাই। দীর্ঘপথ তাই কষ্টকর বোধ হইল না। অপরাহ্ণ সময়ে ঢাকার বাসায় ইঁহারা পৌঁছিয়া গেলেন।

ভাগ্যক্রমে রামচন্দ্র সেইমাত্র বাড়ী আসিয়া জামা ছাড়িতেছিলেন। মোট-সমেত যোগমায়া সেই ঘরের রোয়াকে আসিয়া দাঁড়াইলেন। জামাটা মাথায় গলাইতে গলাইতে রামচন্দ্র বাহিরে আসিলেন।

"খবর না দিয়ে হঠাৎ—ব্যাপার কি?"

"কালীকে নিয়ে এলাম চলে, আর খবর দেবার অবসর হ'ল না। কি অসুখ তোমার?"

কালীপদ আসিয়া রামচন্দ্রকে প্রণাম করিল।

"তারপর কালীপদ—কি করছ এখন? কিছুই না? ক'বছর হ'ল পাস করে বসে আছ? আচ্ছা, পরে শুনব। এখন হাতমুখ ধুয়ে সুস্থ হও—বামুনটা আবার চলে গেছে।"

যোগমায়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়াছিলেন। বলিলেন, "বামুনের কি দরকার? মাথায় দু'ঘড়া জল ঢেলে আমিই রেঁধে ফেলছি'খন। কুয়োতলাটা একবার দেখিয়ে দাও তো।"

ছোট্ট বাড়ী। পুরাতন। তবু ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশে তৈয়ারী হইয়াছে বলিয়া ঐটুকুর মধ্যে সব ব্যবস্থাই আছে। নূতন ভাড়াটে আসিলেই কলিচূণ ফিরাইয়া বাড়ীটার অঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া দিতে হয়। এলা মাটির গেরুয়া রং কোনকালে দেওয়া হইয়া ছিল—সাদা চুণের আস্তরণ ভেদ করিয়া সে রং এখনও উঁকি দেয়। পাতকুয়াতলা শান বাঁধানো—তার পাশে একটু মাটির উঠানও আছে। তবু ঘাসের জঙ্গলে সে উঠানটা ভরিয়া আছে। রান্নাঘরের টিনের চালে লাউ বা কুমড়ার লতাও নাই। অপরাহ্ণের রৌদ্রপাতে বিবর্ণ টিনও ঈষৎ চক্‌চক্‌ করিতেছে। খাড়া উঁচু পাঁচিল, গাছপালা কোথাও চোখে পড়ে না! চারি পাশেই বাড়ীর বেড়া। এই বাড়ীর বেড়ার উর্দ্ধে ঝুলিয়া আছে এক টুকরা আকাশ, অপরাহ্ণের বিবিধ বর্ণচ্ছটায় প্রতিফলিত আকাশ। বাড়ীটা দ্বিতল। দ্বিতলের খোলা জানালা দিয়া চাহিলে—ওই টুকরা আকাশের বিস্তৃতিই দেখা যায়। দূরে একটা বট বা অশ্বত্থ গাছের খানিকটা দেখা যায়—আর গলির মোড়টা পর্য্যন্ত। পুরাতন শহরের আভিজাত্য-গৌরব হয়তো কিছু আছে, চোখ ভুলাইবার মতো রূপ নাই।

সন্ধ্যা হইলেও বাসার একজন চাকরকে সঙ্গী করিয়া ঘণ্টাখানেকের জন্য কালীপদ শহর দেখিতে বাহির হইয়া গেল। যোগমায়া রামচন্দ্রের কাছে আসিয়া বসিলেন।

"কি বিশ্রী চেহারা হয়েছে তোমার? মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে।"

রামচন্দ্র হাসিলেন, "এতটুকু!"

সে হাসি করুণ হইয়া যোগমায়ার দৃষ্টিকে আঘাত করিল। রামচন্দ্রের মুখ যেন অপরাহ্ণের পদ্মফুল। মুদিত দলের মাঝে একটা দমকা হাওয়া ঢুকিয়া সেগুলি ঈষৎ উন্মীলিত করিয়া দিবার কালে প্রভাতকালের সেই পূর্ণ প্রস্ফুটিত সৌন্দর্য্যের রেখা-চিত্রের আভাস যেমন পাওয়া যায়—সেই রকম। পূর্ণ দৃষ্টিতে যোগমায়া রামচন্দ্রের পানে চাহিলেন। আশ্চর্য্য, সেই দৃষ্টিপাতে রামচন্দ্রের মাথাই যেন নুইয়া পড়িল, ঈষৎ শুষ্কস্বরে তিনি কহিলেন, "অমন করে চাইছ যে?"

ক্ষুদ্র নিশ্বাস বুকের মাঝে ঠেলিয়া দিয়া যোগমায়া বলিল, "দেখছি।"

"কি দেখছ?"

"বড্ড বুড়ো হয়ে গেছ—বড্ড রোগা হয়ে গেছ।"

"কোন্ কালেই বা মোটা ছিলাম?"

"মোটা না থাক্—রং তোমার এমন তামাটে ছিল না, মুখও এমন শুকনো শুকনো না। কি হয়েছে?"

"কি জানি। ডাক্তার দেখিয়েছিলাম। বলেন, অসুখ তো কিছুই দেখি না। মন-বোঝানো গোছ একটা ওষুধ দিয়েছেন। সব দিন খেতে ভালোও লাগে না।"

"তাই বলে! ওষুধ না খেলে কখনও রোগ সারে! বেঁধে একটি মাস ওষুধ খাও দেখি।"

"তুমি থাকবে—এক মাস?"

"কেন থাকব না? ভাবছ, সংসার দেখবে কে? ভেব না গো ভেব না, বউমা খুব শক্ত মেয়ে। উদ্যোগ করে নিজেই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।"

রামচন্দ্র পুলকিত হইয়া কহিলেন, "মেয়েটি সত্যিই লক্ষ্মী।"

যোগমায়া বলিলেন, "সে যাই বলুক, বেশী দিন তার ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে বসে থাকা ঠিক নয়। যদি এক মাসে বিশেষ উপকার না বুঝি—"

"বলেছি তো—আর কিছুদিন পরে একেবারে ছুটি নেব।"

"ও সব কথা শুনছি না, চাকরি আগে—না দেহ আগে?" একটু থামিয়া বলিলেন, "এ-বাসাটি বদলাও না কেন? বেশ নদীর ধারে একটু খোলা জায়গায়—"

"এখানে যে গঙ্গা আছেন—তিনি বুড়ো হয়েছেন খুব। তাঁর চেহারা এই আমারই চেহারার মতো—দেখলে খুশী হবে না।"

"নদী নাকি বুড়ো হয়! এই তো আসতে আসতে দেখলাম—কেমন চওড়া সুন্দর নদী।"

"আচ্ছা, কাল একবার নদীর ধারে যেয়ো, দেখবে মিথ্যে বলছি—কি সত্যি বলছি।" একটু থামিয়া বলিলেন "ওষুধ না খাইয়ে বরঞ্চ তোমার হাতের রান্না খাইয়ে দেখ, রোগ সারতেও পারে।"

রামচন্দ্র আর একটু সরিয়া আসিয়া যোগমায়ার একখানি হাত চাপিয়া ধরিলেন। স্পর্শের সঙ্গে কত কথা—কত ঘটনাই মনে পড়িয়া গেল। তরুণ মনের সে দিনগুলি একেবারে নিঃশেষিত হয় নাই। যোগমায়া ও রামচন্দ্র মৃদু হাসিয়া তাহা স্বীকার করিলেন।

"কালীপদ হয়তো এখনি আসবে।" কয়েক মিনিট পরে যোগমায়া বলিলেন।

রামচন্দ্র বলিলেন, "ও কি কিছুদিন থাকবে এখানে?"

"তা তো জানি না। কাজকর্ম্ম তো করে না কিছু, বললাম—চলে এলো। তোমার আপিসে একটা চাকরি হয়-না ওর ?"

রামচন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "যে রকম সুপারিশ নিয়ে এসেছে—হয়ে যেতেও পারে।"

"যাও !"—বলিয়া যোগমায়া জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "হ্যাগো, এখানে কেরোসিনের আলো জ্বেলে দেয় ? ভারি বিশ্রী দেখায়। একগাদা অন্ধকারের মাঝে টিমটিমে আলো !"

"ও আলো কি আর অন্ধকারকে দূর করে ?"

"তবে কি জন্যে জ্বালে ?"

"এই অন্ধকার রাত্রিতে লোকে দূর থেকে বুঝতে পারে একটা পথ আছে—এই আর কি ।"

"কলকাতায় কিন্তু দিন রাত্রির বোঝা যায় না।"

"সেখানে যে গ্যাস জ্বলে।"

কালীপদ হয়তো থাকিয়াই যাইত।

রামচন্দ্র বলিলেন, "চাকরি তোমায় করে দিতে পারি, কিন্তু শহরে তো হবে না। সাতঘাটের জল খেয়ে বেড়াতে হবে।"

কালীপদ বলিল, "তা'হ'লে বাড়ীতে একবার পরামর্শ করে আসি।"

"কেন, চিঠি লেখ না একখানা।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে কহিল, "না কাকাবাবু, একবার ঘুরেই আসি।"

রামচন্দ্র তাহার মনোভাব বুঝিয়া কহিলেন, "বেশ। আমার রিটায়ার করতে এখনও প্রায় এক বছর, কিছুদিন পরে এলেও ক্ষতি হবে না।"

৫

এক মাসেও রামচন্দ্রের চেহারার বিশেষ উন্নতি হইল না। যোগমায়া মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া প্রায়ই বলেন, "কই, তোমার চেহারা সারছে না তো ?"

রামচন্দ্র বলেন, "বলো কি ! বুড়ো বয়সের চেহারা যুবার মতো হবে ! আগে কত ক'টি ভাত খেতাম বলো দেখি ?"

"না গো, মুখ তোমার তেমনি শুকনো শুকনো।"

"আগেকার মতো আপিস থেকে এসে কি বিছানায় শুয়ে পড়ি ?"

"রংও তামাটে হয়ে রইল ! তুমি ভালো কবিরাজ দেখাও।"

"দেখাব—দেখাব। আর ন'টা মাস যেতে দাও, যত ইচ্ছে কবিরাজ এনে জড়ো ক'রো—কিছুটি বলব না।"

যোগমায়ার মন প্রবোধ মানে না। এই অগ্রসরোন্মুখ শীর্ণতার মধ্যে—ক্রমবর্দ্ধমান পাণ্ডুরতার মধ্যে বার্দ্ধক্য বুঝি আসিয়া গেল ! বার্দ্ধক্য আসুক—তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহার পিছনে কালদণ্ড হাতে মহাকালের ছায়াটিও যেন পরিস্ফুট-তর হইয়া উঠিতেছে। হাতের নোয়া মাথায় ঠেকাইয়া যোগমায়া কোন্ অলক্ষিত দেবতার উদ্দেশে এই সংসারের মঙ্গল কামনা করেন। চুলের শুভ্র বিন্দুর মাঝে সিন্দুর-রেখা এখনও জ্বল জ্বল করে। শেষ রাত্রির শুকতারাকে সূর্য্যের আলোকে ধরিয়া রাখা দায়, আকাশের পশ্চিম প্রান্তে হেলিয়া পড়িয়া নিত্য সে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় ! আকাশের তারা দেখিয়া তো মনকে বুঝানো যায় না।

একদিন মাত্র বুড়িগঙ্গায় স্নান করিতে গিয়াছিলেন যোগমায়া। স্নান করিয়া তৃপ্তি হয় নাই। এই চওড়া খালকে গঙ্গা নাম দিয়া তাঁহার মাহাত্ম্যকে যেন খর্ব্বই করা হইয়াছে। জলের সে রং নাই, জলে সে স্রোত নাই। দু'ধারে পলিমাটি-আস্তৃত তীরভূমির সেই মন-ভুলানো রূপই বা কোথায় ? ঐ সুসজ্জিত ভাউলিয়াগুলি নদীর শোভা বাড়াইয়াছে বটে, পাল তোলা নৌকার তরতরে গতির কাছে এগুলিকে নিষ্প্রাণ বলিয়াই বোধ হয়।

রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "কেমন সুন্দর নৌকো দেখেছ এখানে ? যেন ঘরবাড়ী।"

সুগঠিত নৌকাকে প্রশংসা করিয়াছেন যোগমায়া—মন ভরে নাই। এই গঙ্গাকে লইয়া খেলা করা চলে, পূজা করা চলে না।

নিত্য অনুযোগ করেন যোগমায়া, "চিরটা কাল বিদেশেই থাকবে ? দেশ কি তোমাদের জন্যে নয় ?"

"অন্নগত-প্রাণ কলির জীব আমরা—দেশ আমাদের চাকরিস্থল।"

এখানেও রাত্রি আসে। পূর্ণিমার চাঁদ বুকে করিয়া আকাশের সঙ্গে এই নবাবী আমলের শহরও মাঝে মাঝে স্বপ্নাতুর হয়। সেই জ্যোৎস্নালোকিত তিপিগুলিতে ক্ষুদ্র বাসাবাড়ীর দ্বিতলের জানালা খোলা থাকে। খণ্ড আকাশের গায়ে, সেই জানালা ভেদ করিয়া, দুইজোড়া স্বপ্নালস দৃষ্টিও মাঝে মাঝে

আসিয়া পড়ে। চিরনূতন চাঁদের সঙ্গে—চিরনূতন আকাশের খেলায় চিরনির্ম্মল নক্ষত্রগুলিও যেন মাতিয়া উঠে। মাতিয়া উঠে চিরনূতন আত্মা—পুরাতন দেহের মাঝে।

যোগমায়া জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়ান। শোভা দেখিতে নহে, জানালা বন্ধ করিতে।

রামচন্দ্র বলেন, "আর একটু খোলা থাক, মায়া, বেশ লাগছে।"

"না। শরৎ কালের ঠাণ্ডা লাগলে অসুখ করে। কাল থেকে তো খালি কাসছ।"

"বুড়ো বয়সের কাসি সঙ্গের সাথী।"

"হ্যাঁ—তা বৈকি, বদ্যি দেখালে আবার অসুখ সাবে না!"

"তা হ'লে ভালো ভালো ডাক্তার থাকতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছেলে মারা গেল কেন?"

"তোমার এই কথা! আয়ু যার নেই—"

"আয়ু!" হাসিয়া রামচন্দ্র তর্ক করিতে চান।

যোগমায়া ধমকের সুরে বলেন, "থামো, খুব বীর পুরুষ!"

রামচন্দ্র অন্য কথা পাড়েন, "গৌরীকে ঢাকায় আসতে লিখে দাও বরঞ্চ। এদিকের শহরটা দেখে যাক্।"

"ছাই শহর! সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে এখানে কেন আসবে? প্রথম বার এত দূরে আসে কখনও?"

"প্রথম বার তো বাপের বাড়ী আসা নিয়ম। তোমাদের মেয়েলি শাস্ত্রে বলে না?"

"বলেই তো। ঢাকা তো আর বাপের বাড়ী নয়।"

"আহা—যেখানে বাপ-মা থাকেন, সেই খানেই—"

"ব্যাখ্যানাতে কাজ নেই, ওষুধ খাবার সময় হয়েছে না?"

"দাও। মোগলের হাতে পড়েছি যখন—খানা খেতে হবে বৈকি।"

"আচ্ছা, ওষুধ খেতে অত ছেলেমানুষি করো কেন?"

"কেন করি জানো?" একটু থামিয়া বলিলেন, "না, বলব না, শুনলে তুমি দুঃখ পাবে।"

"হোক দুঃখ—বলো।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া রামচন্দ্র বলিলেন, "ওষুধ দেখলেই শেষ দিনের কথা মনে পড়ে।"

যোগমায়া তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া কক্ষত্যাগ করিতে গেলেন।

রামচন্দ্র বলিলেন, "চোখে জল এলো? আহা—শোনই না।"

অল্পক্ষণ পরে যোগমায়া ফিরিয়া আসিলে বলিলেন, মানুষের মজাই এই—কঠিন কথা সে শুনতে চায় না। শুনতে পারে না। যা একদিন ঘটবেই—তাকে ভয় করলেই কি ঠেকিয়ে রাখা যায়, মায়া?"

যোগমায়া উত্তর না দিয়া রামচন্দ্রের পানে চাহিলেন। সে চাহনিতে ভর্ৎসনা ছিল না, অনুযোগ বা আশঙ্কাও ছিল না—সে চোখের তারায় ও পাতার কোলে আশ্বাসহারা সুকোমল দিব্য-দৃষ্টির জ্যোতি ঝলমল করিতেছিল। যাহা ঘটিবে তাহা যেন যোগমায়ার অজানা নহে, যাহা আসিতেছে তাহার পদধ্বনি বহুদিন হইতেই শুনিতেছেন তিনি, এবং যাহা লইয়া এত আশঙ্কা অকল্যাণের বিভীষিকা, তাহাকে জয় করিবার মন্ত্রটিও যেন তাঁহার জানা। কয়টি নারী আর অবৈধব্যের শান্তিময় ক্রোড়ে বসিয়া অমৃতানন্দ পান করিতে পারেন!

পরদিন অবুঝ হইয়া উঠিলেন যোগমায়া। কহিলেন, "আমার আর একদণ্ডও ভালো লাগছে না এখানে, বাড়ী চলো।"

"চাকরি ছেড়ে দেব?"

"দাও।" প্রশান্ত স্বরে যোগমায়া উত্তর দিলেন।

"মায়া—"

"না না,—তুমি বাড়ী যাবে কি না? যদি বাড়ী না যাও—আমি না খেয়ে শুকিয়ে মরব এখানে।"

রামচন্দ্র তাঁহার কাছে আসিয়া মাথার উপর ডান হাতখানি ধীরে ধীরে বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "হঠাৎ এমন করছ কেন? কি হ'ল তোমার?"

"জানি না।" রামচন্দ্রের বুকের মাঝে মাথাটি গুঁজিয়া দিয়া প্রথম যৌবনের অভিমানিনী যোগমায়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিলেন যোগমায়া। দুই একবার বৃথা সান্ত্বনা দিতে গিয়া রামচন্দ্র আর সে চেষ্টা করিলেন না। যোগমায়ার এই উত্তাল কান্নার স্রোত তাঁহার রুদ্ধ বুকের দুয়ার খুলিয়া সেখানেও প্লাবন আনিয়া দিল। এ তো কান্না নহে, এ ঘরে ফিরিবার আকুল আহ্বান। দিন বুঝি শেষ হইয়া আসিল,

সূর্য্য পাটে বসিবেন। কিন্তু অস্তাচল-চূড়া রাঙাইয়া আকাশকে ভালোবাসিয়া সেখানেও একটি রূপলোক সৃষ্টি করিয়া তবে না তাঁর গৌরবময় অস্ত অভিযান। অকাল-বর্ষার মেঘে মধ্যাহ্ন-আকাশে যে-দিন দিনদেব অন্তর্হিত হন—সে-দিনের শোক রাত্রির অন্ধকারেও চাপা পড়ে না।

যোগমায়া কাঁদিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রের চোখের উপর শান্তিপুরের সেই দ্বিতল বাড়ীখানি ভাসিয়া উঠিল। বনের মধ্যে মহিমময়ী মায়ের রূপ-লাবণ্যভরা মূর্ত্তিখানি লইয়া সেই বাড়ীখানি ভাসিয়া উঠিল। সেই বাড়ী হইতে অতীতের অনেক ঘটনা—অনেক স্মৃতি পল্লববাহু-আন্দোলিত বনস্পতির মতোই নিকটে আসিবার আকুতিতে মুখর হইয়া উঠিল।

যোগমায়ার অশ্রুকলুষিত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া রামচন্দ্র বলিলেন, "কালই ছুটির দরখাস্ত করে দেব, মায়া।"

পদ্মার বুকে আবার ষ্টীমার ভাসিয়াছে। পদ্মার কূলে কূলে সুপারি-নারিকেল-শ্রেণী-চিহ্নিত গ্রামগুলি আবার দেখা দিয়াছে। যাত্রীদের কোলাহলে সেই ষ্টীমারে আবার নানা সংসারের বিচিত্র কলরব উঠিয়াছে। পদ্মার ঢেউয়ের মধ্যে সেই অস্ফুট কলরবের সম্পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া বিস্ময় বাড়িয়াই চলিয়াছে। যোগমায়ার মন আজ পদ্মার মতোই পরিপূর্ণ। দু'চোখ ভরিয়া দিগন্তলীন মাঠের শ্যামরূপ দেখিতে দেখিতে বলিতেছেন, "দেখ—দেখ, জলের কূলকিনারা নেই।—কি সুন্দর!"

"শরৎকালে পদ্মার ধার এমনই মনে হয়। এক বাড়ী থেকে আর এক বাড়ী যেতে নৌকো লাগে।" রামচন্দ্র উত্তর দিলেন।

"সাপের ভয় আছে তো?"

"আরও অনেক ভয় আছে। তবু ওরা সুখী।"

ভয়ের কথা যোগমায়ার ভাল লাগে না। বলিলেন, "বাড়ী গিয়ে রোজ ভোরবেলায় তোমায় গঙ্গাস্নান করতে হবে কিন্তু। শুনেছি প্রাতঃস্নানে অনেকের অনেক রকম রোগ সেরেছে।"

"আর সকাল সকাল খাওয়া?"

"ওখানে তো সকাল-সকাল বাজার বসে না, বারোটার কম খাওয়া হবে না।"

"আর?"

"আর কি" ভ্রূভঙ্গী করিয়া যোগমায়া বলিলেন, "আর গুচ্ছেক মাছ বা তরিতরকারি এ-ও চলবে না।"

"কি করব বল,—ঢাকায় তো হরেকরকম তরকারি মেলে না, যা করে মাছ আর দুধ।"

"দুধ খেলে বুঝি অসুখ করে?"

"তবে মাছ খাওয়াটাই বুঝি দোষের?"

"তোমায় নিয়ে আর পারি না, যা ইচ্ছে করো। ওদিকে জুল্ জুল্ করে তাকাচ্ছ যে?"

"খালাসীরা কেমন চাকা চাকা করে ইলিশ মাছ কুটছে—দেখে লোভ লাগছে।"

"এমনও পেটুক! ওদের রান্না তুমি খেতে পারো?"

"কেন পারব না। সেবার ষ্টীমারে আসবার সময়—"

"খুব হয়েছে। বেশী বয়স হ'লে—মন্তর না নিলে মানুষের এমন ধারাই হয়। বিমলের আর দোষ কি!"

"বিমল আবার করলে কি?"

"তোমারই ছেলে তো? ঘরের রাঁধা আলুর দম ছেলেবেলায় ওর ভালো লাগতো না। এখন কলকাতার কি মাংস-টাংশ খায়—কে জানে!"

"খাক না, তবু গায়ে একটু জোর হবে।"

"জোর কত, বাতাসে উড়ছেন ছেলে!" কথায় কথায় শরতের কথা আসিয়া পড়িল।

যোগমায়া বলিলেন, "গায়ে জোর নেই—ওরা স্বদেশী করে কি করে বলো তো?"

"গায়ের জোরটাই সব নয়, মায়া। মন ওদের তাজা।"

"তুমিও ওসব কাজ ভালোবাসো নাকি?"

রামচন্দ্র কথা কহিলেন না।

যোগমায়া ঈষৎ বেগের সহিত বলিলেন, "চুপ করে রইলে যে?"

"আমি ওসব বুঝতে পারিনে, মায়া। বুঝতেই যদি পারব তো সরকারি উকিলের মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে দিলাম কেন? আমি ছেলেবেলা থেকে গরীব হওয়ার দুঃখ জানি; অনেক কষ্ট ভোগ করেছি—তাই সেই দুঃখ দূর করতেই সারা জীবন চেষ্টা করলাম।'

যোগমায়া বলিলেন, "সংসারের দুঃখ দূর করতে সবাই করে চেষ্টা, তাইতেই তো মানুষের শান্তি।"

রামচন্দ্র সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, "বাড়ী থেকে ঢাকা যাওয়া-আসার কালে

দু'ধারের এই গাঁগুলো দেখে আমার খালি মনে হয়—এই দেশের দুঃখ দূর করতেই কি ওরা নতুন মন্ত্র উচ্চারণ করে—নতুন গান বেঁধে চীৎকার করে গলা ফাটায়! এমন সোনার দেশকে নিয়ে ওরা হৈ চৈ করে কেন বুঝি নে। আগেকার কালে ধন নিয়ে লোকের সুখ ছিল না, রূপসী বউ নিয়ে লোকের শান্তি ছিল না, দুভিক্ষে হাজার হাজার লোক গাছের পাতা খেয়ে থাকত—"

"আগেকার কথা বাদ দাও। এখন হাঁড়ির মিষ্টিগুলো হাঁড়িতেই পচবে—না মুখে উঠবে?"

"নিশ্চয় মুখে উঠবে—কৈ, দাও।"

জলযোগ হইলে যোগমায়া রহস্য করিলেন, "ভাজা ইলিশ মাছের জন্যে প্রাণ কাঁদছে না তো?"

কাঁদলেই বা উপায় কি! মিষ্টি খাইয়ে পেট ভরালে বটে—জাত রক্ষে করতে পারলে না।"

"কেন ওতেই তো জাত রক্ষে হ'ল।"

"কৈ আর হ'ল! ঘ্রাণে অর্দ্ধভোজনের কাজ হয়ে যাচ্ছে।"

যোগমায়া হাসিতে হাসিতে রামচন্দ্রের হাতে একটি পানের খিলি তুলিয়া দিলেন।

আমবাগানের মধ্যে ট্রেণ আসিয়া থামিল। শরতের খর রৌদ্রভরা দুপুর।

যোগমায়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আঃ—বাঁচলাম!"

৬

বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া যোগমায়ার মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। প্রকাণ্ড সদর দরজায় ক্ষুদ্রকায় একটি তালা ঝুলিতেছে।

ঘোড়ার গাড়ীর শব্দে পাড়ার কয়েকটি উলঙ্গ শিশু ছুটিয়া আসিয়াছে। খানিক পরে দুই একজন বর্ষীয়সীও দেখা দিলেন।

"ওমা, দিদি কখন এলে! এই আসছ? শোননি?"

শুষ্কস্বরে যোগমায়া প্রশ্ন করিলেন, "কি হয়েছে? এদের কি অসুক-বিসুক—"

"না না অসুখ হোক্ শত্রুর। একদিন সন্ধ্যে-বেলা বেয়াই এলেন। এসে দেখেন, এত বড় বাড়ীটায় বউমা ঘরে দুয়োর দিয়ে রয়েছেন—আর জনপ্রাণী নেই। অনেক ডাকাডাকিতে তবে বউমা দুয়োর খুললেন।"

'কেন, বাড়ী আগলাতে ভূষণের বউকে রেখে যাইনি? সে শুত না রোজ?"

"শোবে না কেন দিদি, রাত করে আসত। কোথায় রামায়ণ হচ্ছে—তার শোনা চাই, কোথায় কথকতা হচ্ছে—যাওয়া চাই। কে জানে রাত দশটা—কে জানে বারোটা। কচি বউ, একলা এই নিবন্দো পুরীতে থাকতে পারে কখনও?"

এমন সময় খবর পাইয়া চাবি হাতে লইয়া ছুটিতে ছুটিতে ভূষণের বউ আসিল।

"আজ এই মাত্তর তোমাদের পত্তর পেলাম, মা। পেয়েই ছুটতে ছুটতে আসছি।"

গম্ভীর মুখে যোগমায়া চাবি লইয়া দুয়ার খুলিলেন।

প্রতিবেশিনী কথা কহিতে কহিতে যোগমায়ার অনুসরণ করিলেন, "মেয়েকে একলা দেখে বেয়াইয়ের হ'ল রাগ। ভূষণের বউকে কি সব যাচ্ছেতাই করলেন। তার পরদিন সকালেই মেয়ে নিয়ে চলে গেলেন।"

যোগমায়ার কানে সে কথা প্রবেশ করিল কি না—কে জানে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তিনি বাড়ীর চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। উঠানে জঙ্গল ঘন হইবার উপক্রম হইয়াছে, শসার মাচাটা ভাঙিয়া প্রাচীরের পাশেই হেলিয়া পড়িয়াছে, গাছ মরে নাই—তবে একটিও ফল আর গাছে নাই। অপরিষ্কার বারান্দা—কড়ি বরগায় ঝুলের রাশি, কতকগুলি ইঁটে নোনা ধরিয়া এখানে ওখানে বালির চাপ খসিয়াছে।

"হ্যাঁরে—ভূষণের বউ, তুই তো বাড়ীতে ছিলি, না মরে গিয়েছিলি? একটু ঝাঁটপাট করতেও কি গতরে শুঁয়োপোকা লাগত!"

"ঝাঁট তো রোজ দিতাম, মা। যে তোমার উঠোনে ধুলো—আর যে ঝড়টা গেল—"

"থাম্—থাম্, ঠিক দুপুর বেলায় কতকগুলো মিথ্যে কথা বলিস নে। বাড়ী ঝাঁট দিতে তো তোকে রেখে যাইনি—রেখে গিয়েছিলাম রামায়ণ-মহাভারত শুনতে।"

"ওমা, কোন্ গতরখাগি বলেছে একথা!" হাউ হাউ করিয়া ভূষণের বউ কাঁদিয়া উঠিল।

তাহাকে ধমক দিয়া যোগমায়া নিজের হাতে ঝাঁটা তুলিয়া লইলেন। ভূষণের বউ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাত হইতে ঝাঁটা কাড়িবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "এই তেতে পুড়ে এলে—এখন কি—"

"যার কপালের লেখা জলে পুড়ে মরা তাকে ঠেকাবে কে? দে—ঝাঁটা দে। অমন আলগোছে আলগোছে ঝাঁট দিলে কখনও ধুলো যায়! সর্।"

সে বেচারি সরিয়া দাঁড়াইল।

রামচন্দ্র জিনিসগুলি গুছাইয়া কতক বারান্দায় তুলিলেন, কতক বা ঘরে পুরিলেন। এক সময়ে রহস্য করিয়া বলিলেন, "বলি ঝাঁট দিলেই কি আজ পেট ভরবে? তার চেয়ে বরঞ্চ—"

যোগমায়া মুখ তুলিয়া তাঁহার পানে চাহিয়া বলিলেন, "যা হোক্ জলটল তো খাওয়া হয়েছে—অবেলায় আর রাঁধব না। একেবারে রাত্তিরে ভাত খাওয়া যাবে।"

রামচন্দ্র বলিলেন, "প্রাণটা কিন্তু ভাত ভাত করছে।"

"ধন্যি বাপু, একটি বেলা ভাত না খেয়ে তোমার কাটে না। এমন পেটনাদ্‌রা মানুষ!" ঝাঁট ফেলিয়া যোগমায়া ইঁদারাতলায় চলিয়া গেলেন।

ভূষণের বউ বলিল, "সকালে ঘর নিকিয়ে রেখেছি, মা। বলো তো আকায় আগুন দিয়ে দেই।"

"তোমার নিকুনোয় হবে কিনা। ভালো করে গঙ্গাজল ছিটিয়ে—বলি গঙ্গাজলটল আছে তো ঘরে? না—"

"পরশু এক কলসী জল যে এনেলাম, মা। বলি হুট করে কবে যে আস্‌বে!"

অপরাহ্ণ বেলায় খাওয়া সারিয়া যোগমায়া আর শয়ন করিলেন না। উঠানের জঞ্জাল সাফ করিতে লাগিয়া গেলেন। আগাছা সাফ করিতে করিতে সূর্য্য অস্ত গেল। বাহিরের দুয়ারে দু'টি গরু আসিয়া হাম্বা রবে ডাকিতে লাগিল।

"ওমা, একি ভাগাড় মূর্ত্তি গো! ঘরে ডাঁই করা খোল রয়েছে—পালা ভর্ত্তি বিচিলি রয়েছে—একটা শানিও বুঝি বাছাদের মেখে দেয়নি গো! পরে আর কত করে বলো!" গজ গজ করিতে করিতে যোগমায়া গোয়ালে গরু বাঁধিলেন। সন্ধ্যা দেখাইয়া যখন উপরের ঘরে আসিলেন, তখন দালানের চেয়ারে হেলান দিয়া রামচন্দ্রের একটু তন্দ্রার মতো আসিয়াছে।

"ভরসন্ধ্যেবেলায় মানুষের ঘুম দেখছ! ওগো শুনছ?"

"অ্যাঁ! কেমন ঘুম ধরে গেল। বারান্দায় বসে বসে দেখেছিলাম ওই গাছপালাগুলো; ভারি মিষ্টি লাগছিল, মায়া।"

"তবু তো বাড়ী আসতে মন সরেনা।"

"সাধে কি আর···আরে ওকি! মাথায় তোমার একমাথা ঝুল যে!"

"কি করি বলো—এক মাসে বাড়ীর দশা হয়েছে যেন মা-মরা বাপে-খেদানো ছেলের মতো। পরের মার ভালোবাসা আর আলুনি তরকারি কথায় বলে না! আবাগীরা যেন বাড়ীটার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। পশ্চিম দিকের কার্ণিশটা ভেঙেছে—আর মাঝখানের থামের চূণ বালি খসিয়েছে।"

"এখন কি কি কাজ হ'ল?"

"যা গতরে বুলুল তাই হ'ল। বাড়ীর এমন অবস্থা দেখে আর আজ ঘুমুতে পারতাম!"

"একটু বসবে?"

একটা টুল টানিয়া যোগমায়া বসিলেন। পূবের দিক হইতে আধখানা চাঁদ উঁকি মারিতেছে। আলোটা তত প্রখর নহে—গাছের মাথায় পাতলা একখানি হিমের চাদর বিছানো; সেই চাদরে ছাঁকা বলিয়া চাঁদের আলো কেমন স্তিমিত দেখাইতেছে। যোগমায়ার মনে খুশীর সুরটুকু আমবাগানে ট্রেণ থামিবার সঙ্গে সঙ্গে রাগিণীময় হইয়া উঠিয়াছিল, বাড়ীতে পা দিবামাত্রই সেই সুরের অপমৃত্যু ঘটিয়াছে। বাড়ীর এই দুরবস্থা দেখিয়া মন তাঁহার খারাপ হইয়াছে, না বউয়ের অনুপস্থিতিতে তিনি বেদনা অনুভব করিতেছেন—সে কথা বলা শক্ত। ভূষণের বউকে অনেকগুলি কড়া কথা শুনাইয়াও তাঁহার ক্রোধবহ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই।

রাত্রিতে প্রদীপ নিবাইয়া শুইবার পূর্ব্বে রামচন্দ্র বলিলেন, "কালই বউমাকে আনবার জন্যে বেয়াইকে একখানা চিঠি লিখতে হবে।"

"না।" যোগমায়া সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করিলেন।

"সে কি—জানাব না তাঁকে?"

"না।" সেই সংক্ষিপ্ত উত্তর।

রামচন্দ্র বিস্মিতভাবে খানিক যোগমায়ার পানে চাহিয়া রহিলেন, পরে কি বলিবার উপক্রম করিতেই যোগমায়া বলিলেন, "মেয়ে নিয়ে যাবার সময় বেয়াই কি জানিয়েছিলেন আমাদের?"

"তাঁর জানাবার সুবিধে ছিল না।"

"ছিল। তবু তিনি খবর দেওয়া উচিত মনে করেন নি। যাক, তিনি বেশ করেছেন। আমরাও যা বুঝব—"

"কিন্তু কুটুমের সঙ্গে কি মনান্তর করা ভালো?"

যোগমায়া ভ্রূ কুঁচকাইয়া ক্ষণকাল কি ভাবিলেন, পরে ধীরস্বরে বলিলেন, "লোকেরও বিবেচনা থাকা দরকার। যাদের আক্কেল থাকে না—তাদের আক্কেল দিতে হয়।"

"বউমা ছেলেমানুষ, একলা এই বাড়ীতে—"

"আমি যখন এ বাড়ীতে আসি—তখন ক' বছর বয়স ছিল আমার? বরণের সময় ভয়ে শাশুড়ীর আঁচল চেপে ধরেছিলাম।"

"তবে?"

"তের বছর বয়সে—আমায় ফেলে শাশুড়ী ষাঁড়েশ্বরে গেছেন জল দিতে। তারকেশ্বরে গেছেন হত্যে দিতে। বুড়ো পিসিমাকে নিয়ে এই ভাঙা বাড়ীতে রাত কাটিয়েছি।"

"তবু তো পিসিমা ছিলেন?"

"ষোল বছরে বিমল কোলে যখন বাপের বাড়ী থেকে এলাম—তার সাত দিন পরে বাঘনাপাড়ার গোপেশ্বরের পূজো দিতে গিয়ে শাশুড়ী তিন দিন বাড়ী-ছাড়া হয়ে রইলেন। কাটাই নি কচি ছেলে নিয়ে একলা বাড়ীতে? বউমার বয়স এই আঠারো পেরিয়ে উনিশে পড়েছে।"

থমথমে আওয়াজ যোগমায়ার। মনের গভীর দুঃখ ও অভিমানে সে স্বর যেমন ভারি—তেমনি তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট। সে তো অভিযোগ নহে—স্পষ্ট নির্দ্দেশ। যে নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে রামচন্দ্রের যুক্তি-গুলিকে দাঁড় করানো শক্ত। প্রদীপ নিবাইয়া যোগমায়া মেঝের উপর মাদুরটা একটু টানিয়া লইলেন। খস্ খস্ করিয়া একটু শব্দ উঠিল মাত্র। শব্দটা মাদুরেরই—দীর্ঘশ্বাসের নহে।

খানিক পরে রামচন্দ্র ডাকিলেন, "মায়া!"

দেওয়ালে একটা টিক্ টিক্ ধ্বনি করিয়া উঠিল, যোগমায়ার দিক হইতে কোন সাড়া আসিল না। বোধ হয় তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

যোগমায়া সে-দিন প্রায় শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়াছিলেন। কাঠের আগুন বুকের মাঝে জ্বালাইয়া নিশ্চিন্তে সুখনিদ্রা দেওয়া অত্যন্ত সহজ ব্যাপার নহে। অপমানের উত্তাপে অশ্রু তখন উপাধান ভিজাইয়া দিতেছে। এই বাড়ীকে যে অবহেলা করিতে পারে—যোগমায়ার কাছে তাহার নিষ্ঠুরতার তুলনা নাই। বাড়ীর মর্য্যাদাকে নিজের মর্য্যাদা হইতে পৃথক্ করিয়া ভাবিবার অবসর যোগমায়া কোনদিন পান নাই। বাড়ীর অঙ্গে যতখানি ক্ষত—যোগমায়ার আঘাতপ্রাপ্ত মন সেই পরিমাণেই রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

কয়েক দিন পরে গৌরী আসিলে যোগমায়া খানিকটা সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

গৌরী একা আসে নাই—সঙ্গে জামাই আসিয়াছে। একা বলিয়া যোগমায়া কোন দিন ক্ষোভ করেন নাই, খাটুনি লইয়া অভিযোগ জানাইবার কথাও তাঁহার মনে হয় নাই কখনও। এমন অনেকে আছেন—অভিযোগ জানাইবার লোকাভাববশতঃ নিজের মনেই দিনরাত বকিয়া সে অভাব পূরণ করিয়া থাকেন, সে স্বভাব যোগমায়ার নাই।

রামচন্দ্রকে বলিলেন, "বাজারে ভালো মাছটাছ পাও তো এনো। আর ময়রার দোকান থেকে কিছু ভালো সন্দেশ ও সিঙাড়া-কচুরি ভাজিয়ে আনো। তোমার জামাইয়ের আবার চা খাওয়া অভ্যেস আছে।"

"চা খাওয়া অভ্যেস আমারও ছিল।"

"তুমিও চা খেতে! কৈ, এক মাস ঢাকায় রইলাম, একদিনও তো—"

"সে কি আর আত্মনেপদী! তোমার বেয়াইয়ের বাসায় বেড়াতে গিয়ে রোজই এক কাপ—"

"ওসব বদ্ অভ্যেস না থাকাই ভালো।"—বলিয়া সে কথার নিষ্পত্তি করিয়া যোগমায়া পিছন ফিরিলেন। পরে কি ভাবিয়া পুনরায় মুখ ফিরাইয়া হাসি টানিয়া বলিলেন, "দেখ, যদি মন খুঁৎখুঁৎ করে, বেশী করে জল গরম করতে বলি গৌরীকে। সব জিনিসের পার আছে, নেশাকে তো—"

"না না। ও নেশা অনেকদিন ত্যাগ করেছি!" রামচন্দ্র সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন।

"হঠাৎ ধরলেই বা কেন—আবার ছাড়লেই বা কেন শুনি?"

"ধরেছিলাম পাঁচ জনের অনুরোধে। সবাই খায়, খেতে খেতে গল্প করতাম। ওঁদের সামনে কাপ হাতে না নিয়ে কেমন লজ্জা লজ্জা করত। আর ছাড়লাম—ডিস্‌পেপসিয়ার তাগাদায়।"

'তাই বলো!" হাসিয়া যোগমায়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

"হ্যাঁরে গৌরী, তোদের খাওয়া-দাওয়া এখনও সেই রকম আছে? ওঁরা খুব মাংস খান তো?"

"খান বৈকি, মা। উনিও আজকাল মাংস না হ'লে ভাত শ্রীবিষ্ণু করেন না।"

"তোর শ্বশুররা বুঝি শাক্ত?"

"হবে। আমার তো এখনও মন্তর হয় নি।"

"বলি বাড়ীতে কালী পূজোটুজো হয় না ?"

"কোন পূজোই তো হতে দেখি নি। শাশুড়ী এখনও মন্তর নেন নি।"

"বলিস কি! চল্লিশ বছরের বুড়ো মাগী···"

সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "তাহ'লে ওঁকে কিছু মাংস আনতে বলি, তুই বরঞ্চ রাঁধিস।"

"কেন—তুমিই রেঁধো, মা। তোমার হাতের রান্না কতকাল খাই নি।"

"না বাপু, তোদের হালফ্যাসানের গুচ্ছেক পেঁয়াজ দিয়ে রান্না আমি পারি নে, গা বমি বমি করে।"

গৌরী একটু থামিয়া নত মুখে বলিল, "বাবাকে বলো না—ভালো ইলিশ মাছ যদি পাওয়া যায়।"

"কার্ত্তিক মাসে কি আর ইলিশ মাছ পাওয়া যাবে! দেখি ওঁকে বলে। হ্যাঁরে, সাধটাধ ওঁরা দিযে পাঠিয়েছেন বুঝি ?"

ঘাড় হেঁট করিয়া গৌরী সলজ্জ মৃদু স্বরে বলিল, "হ্যাঁ।"

"তা হোক্, পাঁচখানা ভাজাভুজি করে এখানেও একদিন সাধ দিতে হবে। তা সাধে ওঁরা কি কাপড় দিলেন ?"

"কি সিল্কের শাড়ী।"

"কালই ঘরামি ডাকিয়ে ওদিককার রোয়'কে একখানা চালা তোলাতে হবে। যাই, কত কাজ চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে—দাঁড়িয়ে গল্প করবার সময় আছে কি ?"

"মা ?"

গৌরীর ডাকে ফিরিয়া বলিলেন, "কি রে ?"

"আমার একটা কথা রাখবে ?"

যোগমায়া বিস্মিত হইয়া গৌরীর পানে চাহিয়া হাসিলেন, "যেন কত দোষঘাট করেছিস—এমনি তোর মুখের চেহারা।"

যেই করুক—দোষঘাটের কথাই তো। মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্তত: করিয়া টক করিয়া সে কহিল, "বউকে আনাও না। একা একা ভালো লাগছে না।"

যোগমায়ার মুখ তেমন গম্ভীর হইল না। লঘু স্বরে তিনি কহিলেন, "আমরা তো তাঁকে পাঠাই নি।"

"ছেলেমানুষ বউ—"

"তা জানি। তার ঘরদোর সে এসে বুঝে নেবে না তো আমি রেহাই পাব কি করে! ওদের নিরু এসেছে শ্বশুরবাড়ী থেকে, বলিস তো তাকে আসতে বলি দুপুরবেলায়।"

"সে তো আসবেই। আজই আমি বউকে চিঠি লিখব, মা।"

"বেশ তো, লেখ। কিন্তু আসবার কথা লিখো না।"

মায়ের মুখের হাসি অনেকক্ষণ নিবিয়া গিয়াছে, গলার স্বরটিও ঈষৎ গাম্ভীর্য্যে ভার ভার শোনাইতেছে।

বিস্মিত হইয়া গৌরী বলিল, "কেন ?"

"ধরে-বেঁধে কখনও টান আনা যায় না, মা। যায় না। যার হয়—আপনিই হয়।"

"না মা, আসতে লিখি।" গৌরী আব্দারের ভঙ্গিতে যোগমায়ার গাম্ভীর্য্য দূর করিবার চেষ্টা করিল।

"লেখ, কিন্তু ওই সঙ্গে জানিয়ো, বেয়াই যেন নিজে মেয়ে দিয়ে যান। এঁর শরীর খারাপ—যেতে পারবেন না। কোন লোক পাঠাবার সুবিধেও হবে না।"

মায়ের এ মূর্ত্তি গৌরীর কাছে নূতন। তথাপি সে বুঝিল, অনুনয় বা স্নেহ দিয়া সে মতের পরিবর্ত্তন অসম্ভব। চিঠি লিখিবার ইচ্ছা তাহার আর রহিল না।

শনিবারে বিমল বাড়ী আসিলে সে বলিল, "দাদা, তোমাদের কি আক্কেল বলো তো ? কত দিন পরে বাপের বাড়ী এলাম—তা তোমাদের সব এক জায়গায় পাওয়াই মুশকিল।"

বিমল বলিল "তাই তো বাড়ী এলাম রে।"

মুখভঙ্গি করিয়া গৌরী বলিল, "তাই তো বাড়ী এলাম রে! বউ না থাকলে বাড়ীর লক্ষ্মীশ্রী থাকে ? কবে আনছ বউকে ?"

বিমল হাসিবার ভঙ্গি করিয়া কহিল, "তোদের বউকে আনবার কর্ত্তা কি আমি ?"

"তুমি, নাহয় মা—যে হয় একজন তো ? না, সত্যি বলছি, এ তোমাদের ভারি অন্যায়। পূজোর সময় বউ বাপের বাড়ী থাকে— এ ভারি অন্যায়।"

বিমল কহিল, "কি জানিস, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়—উলুখড়ের প্রাণ যায়। মাকে বল্ না।"

"বলি নি বুঝি ? ওঁর ধনুকভাঙা পণ। বাবা তো সদাশিব—কোন বিষয়েই নেই। যত জ্বালা হয়েছে আমার!" গৌরী বর্ষীয়সী গৃহিনীর মতো মুখ ভার করিয়া স্খলিত আঁচলটা মাথায় টানিয়া গমনোন্মুখী হইল।

তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া বিমল হাসিয়া ফেলিল। কহিল, "বুড়ো শ্বশুরকে বুঝি এমনি করে শাসন করিস ?"

"হ্যাঁ, বুড়োরা শাসন মানে কি না ?" মুখ ফিরাইয়া ঝঙ্কার দিয়া গৌরী বলিল, "এই মা যেমন মানছেন! আর তালুই মশায়! দিয়ে যাবেন না তালুই মশায় মেয়েটিকে—দেবেন ?"

বিমলের হাসি বাড়িয়া চলিল দেখিয়া সত্য সত্যই রাগে গর গর করিতে করিতে গৌরী চলিয়া গেল।

সোমবারে বিমল যথারীতি মায়ের পায়ে প্রণাম করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল। বধ-প্রসঙ্গ কেহই উত্থাপন করিলেন না।

৬

কার্তিকের শেষের দিকে ঠাণ্ডা লাগিয়া রামচন্দ্রের সর্দ্দি-কাশি বাড়িয়া গেল। তিনি একরূপ শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। অত্যাচার যথেষ্টই হইয়াছিল।

এক দিন মাইলখানেক দূরে এক শিক্ষিতা ধাইয়ের সন্ধান লইলেন। আর এক দিন ক্রোশ-খানেক দূরে বুনোপাড়ায় গিয়া এক বর্ষীয়সী রমণীকে আঁতুড়ঘরে থাকিবার কথাবার্তা পাকা করিয়া আসিলেন। তা ছাড়া বাজার হাট নিজেই করিতেন, গঙ্গাস্নানের পাট তো ছিলই।

আঁতুড়ে থাকিবার লোক ঠিক করিয়া যেদিন ফিরিলেন—সেই দিন পরিশ্রমটা অতিরিক্তই হইয়াছিল। ফিরিবার পথে মাথার উপর দিয়া এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। বাড়ী আসিয়া ভিজা কাপড় ছাড়িতে গিয়া দেখিলেন, গায়ের উত্তাপে কাপড় প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে—মাথার চুলগুলিও বিশেষ ভিজা ভিজা বোধ হইতেছে না।

যোগমায়া বলিলেন, "একটু গরম চা খেয়ে ফেল।"

"না, ও বদনেশা আর নয়।"

"তবে এক বাটি গরম দুধ খাও।"

"তাহ'লে রাত্রির খাওয়া আজ ইতি।"

"তা হোক্।" জিদ করিয়া আদার রস দিয়া এক বাটি গরম দুধ যোগমায়া তাঁহাকে পান করাইলেন। পরে বলিলেন, "লোক ঠিক হ'ল ? সেঁক-তাপ ভালো রকম দিতে পারবে তো ?"

"হ্যাঁ। অনেক আঁতুড়ে কাজ করেছে—ওই গোবরার মা গো।"

"বটে, বুড়ী এখনও বেঁচে আছে ? তা কত করে নেবে ?"

"এক পালি (আড়াই পোয়া) চাল আর দু'আনা পয়সা রোজ। যেদিন কাজ শেষ হবে, একখানা কাপড়ও চাই।"

"মাগীর খাঁই বড্ড। ছেলে হ'লে আবার বায়নাক্কা কত! ঘড়া দাও রে, শীতবস্ত্র দাও রে।"

অক্ষুধার উপর রাত্রিতেও কিছু আহার করিলেন। আহার করিয়াই মনে হইল, মাথাটার বড় যন্ত্রণা হইতেছে। মাঝরাত্রিতে তাঁহার কাতর স্বর শুনিয়া যোগমায়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন।

বলিলেন, "অমন করছ কেন ?"

"বড মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে।"

"মাথার যন্ত্রণা ? টিপে দেব একটু ?" তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"না না, সারা দিন খেটেখুটে এলে—একটু ঘুমোও।"

যোগমায়া রামচন্দ্রের শিয়রে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার কপালে হাত দিয়াই চমকিত হইয়া উঠিলেন, "অ্যাঁ—গায়ে ধান দিলে খই হয়ে যায়! কি বলে খেলে রাত্তিরে ?"

"তখন তো তেমন কিছু বুঝলাম না।"

"না, বুঝলে না। চিরদিন তোমার ওই রোগ। নিজেও ভুগবে—পাঁচজনকেও ভুগুবে। কখন আমি মাথামুণ্ডু কি করি বলো তো!"

যোগমায়ার দু'চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

রামচন্দ্র যোগমায়ার হাতখানি বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া শুধু বলিলেন, "আঃ

খানিক চোখ বুজিয়া থাকিয়া চাহিলেন। ম্লান আলোকে দেখিলেন, যোগমায়ার দু'চোখের কোল তখনও চক্ চক্ করিতেছে। স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন, "কাঁদ কেন, মায়া ? জ্বর হয়েছে—ভাবনা কি ?"

"মেয়ের কখন কি হয়—ঠিক নেই, তোমার এই জ্বর! কি আতান্তরে পড়লাম বলো তো!"

"কিছু নয়, কাল ওষুধ খেলেই জ্বর আমার সেরে যাবে।"

"সত্যি বলছ তো ? যন্ত্রণাটা তোমার একটু কমেছে কি ?"

যন্ত্রণা-পাংশু মুখে হাসি টানিয়া রামচন্দ্র বলিলেন, "অনেক কমেছে।"

মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে যোগমায়া বলিলেন, "একটা কথা ভাবছিলাম। কাল বরঞ্চ একখানা চিঠি লিখে দিই বউমাকে আসতে।"

রামচন্দ্রের মুখ একবার উজ্জ্বল হইয়া পরক্ষণেই নিবিয়া গেল। ধীরস্বরে কহিলেন, "না, থাক্।"

"কেন, এ কথা বললে কেন?"

"বেয়াই নিজের ভুল বুঝে মেয়ে রেখে যাবেন এক দিন।"

"যদি রেখে না যান?"

"যদির কথা ধরলে সংসার চলে না। সংসারে পুরো অশান্তি ভোগ করতে হয়।" একটু থামিয়া বলিলেন, যদি তিনি মেয়ে নিয়ে আসেন—আমাদের তরফ থেকে সেদিন তাঁকে কোন রূঢ় কথা বলে যেন লজ্জা না দেওয়া হয়।"

"তুমি কি মনে করো—কুটুমের সাক্ষাতে সে কথা আমি বলতে পারি?"

"তুমি তা পারো না। পারো না বলেই তো আজ বউমাকে আনবার মত আমি দিতে পারলাম না। তোমাকে কষ্ট দিয়ে নিজে সুখী হবার চেষ্টা তো কোন দিন করি নি।"

দুটি কম্পিত হাত দিয়া তিনি যোগমায়াকে বুকের কাছে আকর্ষণ করিলেন। কি জানি কেন, হয়তো বা অসহ্য পুলকেই, যোগমায়া রুগ্ন রামচন্দ্রের বুকে মুখ গুঁজিয়া হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

দমকা বাতাসে আধ-ভেজানো জানালার খানিকটা খুলিয়া গেল। পশ্চিম-আকাশের অন্ধকার-সমুদ্রে ডুবুডুবু আধখানি চাঁদের ম্লান আলো জানালার প্রান্ত দিয়া বিছানার উপর যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। বিহ্বল রামচন্দ্র ও যোগমায়া সেদিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না।

ডাক্তার বলিলেন, "অসুখটা খুব সোজা নয়, বুকে যেন একটা প্যাঁচ বসেছে। নিউমোনিয়া বলে সন্দেহ হচ্ছে।"

রামচন্দ্র চুপি চুপি বলিলেন, "বাড়ীতে এ কথা জানিও না।"

"কিন্তু নার্সিং-এর দরকার। বিমলকে বরং আসতে লিখুন।"

"না না, তিনদিন পরে শনিবারে সে আসবেই তাকে মিছিমিছি ব্যস্ত করিয়ে কি লাভ?"

"যে কোন মুহূর্ত্তে সিরিয়াস হতে পারে। বয়স হচ্ছে তো।"

রামচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "আমি অনেক দিন থেকেই প্রস্তুত আছি, ডাক্তার।"

অবগুণ্ঠন টানিয়া যোগমায়া এমন সময়ে ঘরে ঢুকিলেন। মৃদুস্বরে বলিলেন, "কেমন দেখলে বাবা?"

"এখন তো বিশেষ ভয়ের কারণ কিছু দেখছি নে। তবে একটু সাবধান থাকবেন। ওষুধটা চার ঘণ্টা অন্তর খাওয়াবেন। আর বুকে মালিশের একটা ওষুধ রইল। আমি বরং পিসিমাকে পাঠিয়ে দিই গে।"

"না, বাবা। বুড়োমানুষকে রাত্তিরে আর কষ্ট দিয়ে কাজ নেই। দরকার হয় তো কাল বরং বলব।"

ডাক্তার চলিয়া গেলে রামচন্দ্রের শয্যা-শিয়রে বসিয়া যোগমায়া বলিলেন, "বিমলকে একখানা চিঠি লিখে দিই—শনিবার কলকাতা থেকে কিছু ফলটল নিয়ে আসবে। আর ঠাকুরঝিকে একটা খবর দিই।"

"দাও।"

"অমন হাঁপাচ্ছ কেন?" যোগমায়া উৎকণ্ঠা-ভরে প্রশ্ন করিলেন।

"না এমনি। তা তুমি এখন বসলে কেন, রান্নার উদ্যোগ করো গে।"

"গৌরী আমাকে হেঁসেলে ঢুকতে দিলে না।"

কার্ত্তিকের শেষে সেদিন আকাশের অবস্থা ভালো ছিল না। কয়দিন ধরিয়াই পুবে হাওয়া বহিতেছিল—বৃষ্টিও পড়িতেছিল অল্প অল্প। আজ রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে বৃষ্টি ও হাওয়ার বেগ বাড়িয়া উঠিল। এলোমেলো হাওয়া। পাংশুবর্ণের আকাশ ঝড়ের দীর্ঘস্থায়িত্বের আভাস দিতেছে। বৃষ্টি কখনও চাপিয়া আসে, কখনও গুঁড়ি গুঁড়ি পড়িতে থাকে। মঙ্গলবারে বৃষ্টি আরম্ভ হইলে তিন দিন স্থায়ী হয়—এই প্রবাদ-বাক্যের উপর আস্থা বুঝি আর থাকে না। আজ রাত্রির সঙ্গে বৃহস্পতিবার শেষ হইবে—আকাশে ধূসর মেঘের আনা-গোণার বিরাম নাই। জোর পুবে-হাওয়া যতক্ষণ না দক্ষিণমুখী হইতেছে—ততক্ষণ এ দুর্য্যোগ কাটিবার ভরসা নাই।

বাড়ীতে লোকজন আসিয়াছে। জামাই সর্ব্বক্ষণ রামচন্দ্রের শিয়রে বসিয়া ঔষধপথ্য নিয়ন্ত্রিত

করিতেছে, যোগমায়াও রোগীর শিয়র ছাড়িয়া বেশীক্ষণ এদিক ওদিক যাইতেছেন না। সংবাদ পাইয়া কমলা আসিয়া রন্ধনশালার ভার লইয়াছেন। পাড়ার দুই এক জন অনুগত লোক বাহিরের বারান্দায় অষ্টপ্রহর বসিয়া আছে—কখন কি দরকার হয়, সেই জন্য। তা ছাড়া ছাতা মাথায় দিয়া ও লণ্ঠন হাতে করিয়া কয়েকজন আনাগোনা করিতেছেন। সকলের মুখেই উদ্বেগ পরিস্ফুট। কথা কহিতে কষ্ট বোধ হইতেছে বলিয়া ডাক্তার রামচন্দ্রকে উত্যক্ত করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এবং রামচন্দ্রের নিষেধবাক্য অগ্রাহ্য করিয়া বিমলকে একখানি পত্রও কাল দেওয়া হইয়াছে। টেলিগ্রামে চিন্তার গুরুত্ব আরোপ করা হয় বলিয়া পত্র দেওয়া হইয়াছে।

অপরাহ্ণে গৌরীকে লইয়াও একটু ভাবনা দেখা দিয়াছে। পেটের বেদনাকে প্রসব-বেদনা বলিয়াই ধাত্রী ডাকা হইয়াছিল। সে আসিয়া জানাইয়াছে—রাত্রি দশটার সময় আর একবার যেন খবর দেওয়া হয়। একখানি ঘোড়ার গাড়ী ঠিক করা আছে। বুনোদের বুড়ীটাকে বৈকাল হইতেই আনানো হইয়াছে। এক কাঁসি পান্তাভাত খাইয়া সে আঁতুড়ের এক কোণে দিব্য নিশ্চিন্তে নিদ্রা দিতেছে।

রন্ধনগৃহ হইতে কমলা বাহির হইরা যোগমায়ার নিকটে আসিলেন। যন্ত্রণা-কাতর মেয়ের শিয়রে বসিয়া যোগমায়া তাহাকে প্রবোধবাক্য দিতেছিলেন।

কমলা বলিলেন, "দশটা পর্য্যন্ত দেখে কাজ নেই, গাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।"

ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন "তুই নাহয় দাদার কাছে গিয়ে বোস, বউ। রান্নাঘরে শেকল তুলে দিয়ে আমি এখানে বসছি।"

যোগমায়া বলিলেন, "আজ আমার মন খালি কু-গাইছে, ঠাকুরঝি। যেন কি একটা হবে।"

"দূর—তোর যত ভাবনা! ডাক্তার তো এ বেলা বলে গেলেন দাদা ভালো আছেন।"

"গৌরীর সুভালাভালি দু'টো দু'ঠাঁই হয়!"

কমলা বলিলেন, "হবে—হবে—। কাঙালী দাওয়ানকে ডাকছি, পাঁচুঠাকুরকে ডাকছি—ভালোই হবে। আমাদের কালে পাস-করা দাই ছিল না গাঁয়ে, এখন কত সুবিধে হয়েছে। ভাবনা কি?"

যোগমায়া ঈষৎ আশ্বস্তা হইয়া বলিলেন, "চ্যাচারি ঠিক করা আছে তো?"

"পাস-করা দাই তোমার চ্যাচারি দিয়ে নাড়ি কাটবে কিনা? গরম জল চাই, ওদের ভালো কাঁচি আছে, তাই দিয়ে—"

একটু থামিয়া যোগমায়া বলিলেন, "বিষ্যুদ্‌বার এলেই আমার ভয় করে।"

"কেন লক্ষ্মীবারে অত ভয়টা কিসের?"

"কেন, জানো না ভাই?—লক্ষ্মীবারেই তো এ বাড়ীর গিন্নিরা স্বর্গে গেছেন। মা, পিসিমা—সবাই।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কমলা বলিলেন, "তা বটে।"

রাত্রি আরও গভীর হইল। বাহিরে ঝড়ের মাতনে আর গাছের শাখায় জলের ঝাপটায় অবিরাম দীর্ঘনিশ্বাস বহিয়া চলিয়াছে। গৌরী যন্ত্রণায় জ্ঞান হারাইবার মতো হইয়াছে, অস্ফুট গোঙানি ছাড়া তার মুখের স্পষ্ট কথা কিছু বুঝা যায় না। মেয়েকে লইয়া যোগমায়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তবু, উপর-নীচে টানাপোড়েন তাঁর ঘুচে নাই। কমলা যোগমায়াকে খাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন কত বার।

তিনি বলিয়াছেন, "ক্ষিদে তেষ্টা আমার নেই, ঠাকুরঝি। গৌরীর সুভালাভালি কিছু না হ'লে কাল বিষ্যুদ্‌বারকে আমি বিশ্বাস করিনে, ভাই।"

এমন সময়ে ঝড় ঠেলিয়া বিমলের আর্ত্তকণ্ঠ বারান্দার অন্য প্রান্তে শোনা গেল, "মা!"

যোগমায়া আঁতুড় ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইলেন। ঘুটঘুটে অন্ধকারে হ্যারিকেনটা লইতে তাঁহার মনেই হইল না।

"বিমল এলি?"

"বাবা কেমন আছেন, মা?"

কমলা আলো লইয়া যখন বারান্দায় আসিলেন, ততক্ষণে বিমলের প্রণাম শেষ হইয়া গিয়াছে। আর এক দিন সে যেমন পরম নির্ভরতায় যোগমায়ার বক্ষোলগ্ন হইয়া সমস্ত ব্যথা ও অপমানকে নিঃশেষ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহিয়াছিল—আজও এই পরম উদ্বেগের মুখে সেই মাতৃবক্ষেই পরম নির্ভরতার সঙ্গে মুখখানি সে গুঁজিয়া দিয়াছে।

মেয়ের কাছে ফিরিয়া যোগমায়া বলিলেন, "ঠাকুরঝি, ওকে দেখে আমার খুব সাহস হ'ল, ভাই। শাঁখটা বার করে রেখেছ তো? দাও, আমার হাতেই দাও।"

নির্ব্বিঘ্নে গৌরী সন্তান প্রসব করিল।

কমলা ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ছেলে হ'ল গো, ধাইবউ? খোকা—না খুকী?"

উপর হইতে বিমল আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিল, "মা মা, শীগ্‌গির একবার ওপরে এসো!"

কমলা ও যোগমায়া শাঁখ ফেলিয়া উপর পানে ছুটিলেন।

পুত্রসন্তানই হইয়াছে। শুভ শঙ্খধ্বনিতে তাহার শুভ আগমনবার্ত্তা ঘোষিত হইল না। মৃত্যু-দেবতার মহান-ঐশ্বর্য্য জন্মদেবতার ক্ষুদ্র উৎসবটুকু গ্রাস করিয়া ফেলিল বুঝি!

তখনও ঝড়ের মাতনে ও জলের ঝাপটায় বৃক্ষশাখায় অবিরাম দীর্ঘনিশ্বাস বহিয়া চলিয়াছে।

সেই সুরে সুর মিলাইয়া সদ্যোজাত, অবহেলিত শিশু ট্যাঁ ট্যাঁ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

চতুর্থ অধ্যায়

তারপর দীর্ঘদিন এবং দীর্ঘরাত্রির সমষ্টিতে যে নিরবধি কাল বিপুলা পৃথ্বীর উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, সে প্রয়াগের এই বিস্তীর্ণ বালুচরের মতোই আশা-আনন্দহীন। সে কালকে পরিমাপ করিবার উৎসাহ কাহারও হয় নাই। মুর্চ্ছাতুর চৈত্র দ্বিপ্রহরের মতো অনুভূতি-আলস্যে সেই কালের চোখে নিদ্রার অঞ্জন মাখানো ছিল। ঠিক নিদ্রা নহে—চোখের গোলকে বিশ্বের ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছে, কোন পরিচয় বহন করে নাই সেই দৃশ্য-গুলি। না নিদ্রা—না জাগরণ সেই অবস্থায় বাড়ী হইতে ছুটিয়া বাহির হইবার একটি প্রবল ইচ্ছার দ্বারা যোগমায়া চালিত হইয়াছেন এবং ঘুমের ঘোর না কাটিতেই পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কয়টি মাস, না—বৎসর? কালাশৌচের বাধা কাটিয়া গিয়াছে কিনা হিসাব নাই। অন্তরের আগুন তাঁহাকে ঠেলিয়া ঘরের বাহির করিয়াছে।

প্রাতঃকালের চর-সর্ব্বস্ব প্রয়াগের সঙ্গমস্থানে বসিয়া নিদ্রাজাগরণের মাঝামাঝি অবস্থা কাটাইয়া—যোগমায়া সর্ব্বপ্রথম যেন পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। সর্ব্বপ্রথম কোমল প্রভাত সূর্য্য জবা-কুসুমসঙ্কাশ রূপে তাঁহার ধ্বান্ত মনের কলুষ হরণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গ আলোক-বন্যায় উজ্জ্বল করিয়া দিল। মুণ্ডিত মস্তক নত করিয়া বালুবেলায় বসিয়া মন্ত্রো-চ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রিয় পৃথিবীর করস্পর্শ তিনি অনুভব করিলেন। কল কল স্রোতধ্বনি, গঙ্গা-মায়িকী জয়—স্রোতের মুখে তীব্র গতিতে ভাসিয়া যাওয়া নৌকা—সাদা ও কালো জলের স্পষ্ট দু'টি ধারা—এক হইয়া আবার স্রোতের বেগে বিপরীত-মুখী হইয়া গিয়াছে; ওপারের ঈষৎ উচ্চ তীর-ভূমিতে বাজরি ক্ষেতের সুউচ্চ জঙ্গল-মধ্যে বাজরি-আহরণরত মজুরদের অস্পষ্ট কোলাহল—এ পারের যাত্রী সংগ্রহের উচ্চরবে ডুবিয়া গিয়াছে। খাতা খুলিয়া যাত্রী-স্বত্ব লইয়া পাণ্ডায় পাণ্ডায় বচসা বাধিয়াছে, ঘণ্টা বাজাইয়া গোদানের জন্য কয়েকটি লোক চীৎকার-রবে তীরভূমি প্রকম্পিত করিতেছে। নানা বর্ণের পতাকা-শোভিত চালাগুলির মধ্যে পুণ্য সঞ্চয়ের দরদস্তুর চলিতেছে। ক্ষুর ভাঁড় বাগাইয়া নাপিত ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ের মতো তীরস্থ যাত্রীদলের পানে চাহিয়া আছে ও তাহার জিম্মায় মাথাটি সমর্পণ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছে। নৌকায় বসিয়া কেহ পুরী ও গরম জিলাপীর সদ্ব্যবহার করিতেছে, কেহ তুলসী রামায়ণ বা গীতা পড়িতেছে, কেহ সরবে স্তোত্র আওড়াইতেছে, কেহ চক্ষু মুদিয়া নীরবে জপতপ করিতেছে। ফুল, মালা, চন্দন, চিরুণী, ছোট আর্শি প্রভৃতি একটি ডালার মধ্যে ভরিয়া হাঁটুজল ঠেলিয়া কত লোক অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে, এই হাঁটুভোর জলের উপর ছুটাছুটি করিয়া ভিক্ষাও করিতেছে অনেকে। তীর্থরাজ প্রয়াগের এইরূপ দৃশ্যে যোগমায়ার চেতনা অল্পে অল্পে ফিরিয়া আসিতেছে।

স্নান, তর্পণ, সবই সারা হইয়া গেল। পুণ্য সঞ্চয়ের কলরব বেলা বাড়িবার সঙ্গে কিছু কম বলিয়াই বোধ হইল। দলস্থ লোকগুলি গরম পুরী ও জিলাপী সংযোগে রসনা ও উদরের তৃপ্তি সাধনের উদ্যোগ করিতেছে। যোগমায়ারও ডাক পড়িল।

"ওগো বিমলের মা, কি আনতে দেবে দাও না। ফটিক যাচ্ছে দোকানে।"

যোগমায়া পিছনে চাহিয়া উত্তর দিলেন, "ক্ষিদে নেই দিদি।"

বর্ষীয়সী স্নেহের অনুযোগ করিলেন, "ক্ষিদে তোমার কোন্ দিনই বা থাকে! গরম জিলিপীই আসুক চার পয়সার?"

"না। বাসায় গিয়ে এক পাকে যা হয় করা যাবে। তোমরা খেয়ে নাও দিদি।"

"পৈরাগে গঙ্গাতীরে দোষ কি ছিল? বামুন

হালুইকর পুরী ভাজছে। সেবার শিরোমণি মশায়—ওঁর বিধবা বড় জা—সবাই এসে খেয়েছিলেন।"

"সত্যি ক্ষিদে নেই, দিদি। আর মনটাও ভালো নেই।"

বর্ষীয়সীর নাম প্রমদা। হরি ঠাকুরঝি গত হওয়ার পর ইনি সেই পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। এ পদে উন্নীত হওয়ার জন্য পার্থিব কোনরূপ উদ্যোগ-আয়োজন করিতে হয় না। কোন্দলে পারদর্শিতা, পরোপকারে পটুতা, এক বাড়ীর সংবাদ অন্য বাড়ীতে পৌছাইয়া দেওয়া, সকালে স্নানের ঘাটে, দুপুর হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত পাড়া-বেড়ানোর কালে এবং সন্ধ্যার পর হরিকথা বা রামায়ণ, ভাগবত শ্রবণকালে এই সব তুচ্ছ অথচ মূল্যবান সংবাদগুলির আদান-প্রদান চলিয়া থাকে। সংসারে প্রায়ই ইঁহাদের কেহ থাকে না। দু'টি আতপ চাল ফুটাইয়া আহারের আয়োজনে কতটুকুই বা সময় যায়? আর সংসারে কেহ থাকিলেও সেদিকে দৃষ্টি দিবার মতো সঙ্কীর্ণতা ইঁহাদের মধ্যে নাই; সারা গ্রামখানিই তো ইঁহাদের সংসার।

"মন ভাল নেই কেন গা? এমন পৈরাগ তীর্থ, কথায় বলে—'পৈরাগে মুড়ায়ে মাথা, যা'কৃগে পাপী যেথা সেথা।"

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রয়াগে মাথা মুড়োলে সত্যিই পাপ তাপ থাকে না, দিদি?"

"শাস্তর কখনও মিথ্যে হয়? শাস্তরেই তো বলেছে।"

"কিন্তু প্রয়াগে সাধু-সন্ন্যাসী কই, দিদি!"

"আসল সাধুরা কি দেখা দেন বোন, না কারো কাছে হাত পাতেন? ওই যে কাদামাটি মেখে একটা নেংটি পরে ভিক্ষে মাগছেন যিনি—উনি কি সাধু? পোড়া কপাল!"

"তবে আসল সাধু কি করে চেনা যায়, দিদি?"

"মনের টান থাকলে আপনিই সাধুসঙ্গ মেলে ভাই। কথায় বলে না: যে খায় চিনি—তার চিনি যোগান চিন্তামণি।"

"চিনি খেতে তো ইচ্ছে করে দিদি, কিন্তু চিন্তামণি কি চিনি যোগাবেন?

"কেন যোগাবেন না! দুর্য্যোধনের রাজভোগ ফেলে বিদুরের খুদকুড়ো খাননি তিনি? প্রহ্লাদের ডাকে বৈকুণ্ঠ ছেড়ে পৃথিবীতে আসেন নি?"

"সে সব এই কলিযুগে কি হয়? আচ্ছা দিদি, ওই যে গঙ্গার ওপারে উঁচু ঢিবির ওপর বাড়ী দেখা যাচ্ছে, ওটা কি?"

"ওটাকে ঝুঁসির মঠ বলে এখানে অনেক সাধুসন্ন্যাসী থাকেন শুনেছি।"

যোগমায়া সাগ্রহে কহিলেন, "একবার যাবে, দিদি?"

"ঠাকুরদেবতা কি ওখানে আছে? শুধু সাধু দেখতে কে যাবে বলো।"

"না দিদি, আমি যাব। তোমরা যাও, একলাই যাব আমি।"

"এই দেখ দেখি—এত বেলায় ওখানে কখন মানুষ যায়! কাল সকাল সকাল না হয়—"

যোগমায়া কাহারও কথা শুনিলেন না, জিদ ধরিয়া বসিলেন—সাধুদর্শন না করিয়া জল গ্রহণ করিবেন না। দলপতি বেণী ঘোষাল বিপদে পড়িলেন। অনেক বুঝাইয়াও তাঁহাকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া পাণ্ডার পানে চাহিয়া কহিলেন, 'তাই তো ঠাকুর, কি করা যায়?"

যোগমায়া বলিলেন, "তোমায় একটি টাকা বকশিস দেব ঠাকুর—আমায় ঝুঁসি দেখিয়ে আনো।"

পাণ্ডা বলিলেন, "আপনারা বাসায় গিয়ে আরাম করুন, আমি মাইজিকে ঝুঁসি দর্শন করিয়ে আনি।"

গঙ্গায় হাঁটুভোর জল, স্রোত কিন্তু প্রবল। সে স্রোতের মুখে নৌকা পড়িয়া থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। আর কি সে গর্জ্জন—কানে তালা লাগিয়া যায়। দুরন্ত স্রোতের বেগে কম্পিত নৌকায় বসিয়া যোগমায়ার মন প্রথম হর্ষ অনুভব করিল। জীবনের চলার আনন্দ না পর মুহূর্ত্তের মৃত্যুর আকস্মিক আলিঙ্গনের আনন্দ—কোন্‌টা প্রবল হইয়া উঠিল, কে জানে? আকাশ তীক্ষ্ণ ময়ূখ মালায় জর্জ্জরিত, চরের বালুকায় সেই রৌদ্র ধোঁয়ার সৃষ্টি করিতেছে। সুদীর্ঘ সাপের মতো বাঁকিয়া আইজাক সেতু গঙ্গার গলায় লৌহ হার পরাইয়া ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে। সেতুর পার্শ্বে এই দুপুর রৌদ্রেও চিতার ধূমকুণ্ডলী উঠিতেছে। বি-এন-ডাব্লিউয়ের একখানা গাড়ী ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে ঝুঁসি ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল। শ্মশানঘাটের কাছে একখানা টিনের ছোট চালা আছে; শববাহকেরা হয়তো ওইখানে বিশ্রাম করে। ধারে ধারে শকুনি ও কাকের মহোৎসব লাগিয়াছে। কুকুরের সঙ্গে তাহাদের দ্বন্দ্বটা খুব তীব্র বলিয়া বোধ হয় না। এখানে ওখানে পোড়া কাঠ ভাসিতেছে। নৌকা আসিয়া এপারে লাগিল।

পাহাড় নহে—মাটিরই সুউচ্চ ঢিবি। গঙ্গাবক্ষ হইতে এককালে সিঁড়ি ছিল উপরে উঠিবার; সে সিঁড়ি কোথাও বা হেলিয়া, কোথাও বা ফাটিয়া এখনও খাড়া আছে। তবে গঙ্গা-গর্ভ হইতে আধ পোয়াটাক পথ হাঁটিয়া গেলে তাহার পাদদেশে পৌছানো যায়। যেমন সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি—তেমনই খাড়াই, উঠিতে গেলে বুক ঠেলিয়া কে যেন নামাইয়া দিতে চায়। বর্ষায় গঙ্গার জল বাড়িলে ওই সিঁড়ির পাদদেশে গঙ্গা আসিয়া তরঙ্গ-প্রহার করেন। সেই তরঙ্গ-প্রহারের বেগে উপরের সৌধ কিছু কিছু তীরসাৎ হইয়াছে, তাহারই খোয়া ও ইঁট তীর-ভূমিতে বিছানো; চলিবার কালে অনাবৃত পা দু'খানি রক্তাক্ত করিয়া তুলে।

ঘরের মধ্যে মহাবীরজীর মূর্ত্তি। পূজার চিহ্ন দেখা যায় না, পয়সা আদায় করিবার জন্য পূজারীও ছুটিয়া আসিল না। সে ঘর হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণ দিকের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে আসিলেন যোগমায়া। অভগ্ন দেবদেউল, আতা, বাঁশ, আম, কদলী ও নানা জাতীয় গুল্ম ও লতার সমাবেশে জঙ্গলের সৃষ্টি হইয়াছে—অথচ প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে নাটমন্দির-সমন্বিত ধূপধুনা-সুরভিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন এক মন্দির। বেদীতে কোন দেবমূর্ত্তি নাই—মঠাধিপ সন্ন্যাসীর কাষ্ঠপাদুকা শোভা পাইতেছে। পুষ্প ও বিল্বপত্র দেখিয়া অনুমিত হয়, সে পাদুকার প্রত্যহ পূজা-অর্চ্চনা হয়। দুয়ার খোলা পড়িয়া আছে, পয়সা কুড়াইবার কেহ নাই—চুরির জন্য কাহার লালসাও বুঝি নাই।

পাণ্ডা জানাইল মোহান্তজী কিছুদিন হইল দেহরক্ষা করিয়াছেন। খুব ভালো সাধক ছিলেন বলিয়া শিষ্যেরা এইভাবে তাঁহার নিত্য পূজা করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় মঠের বাড়ীগুলি ভালো, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন উঠান। নিমগাছের সুশীতল ছায়া—ইঁদারার জলও শীতল। কয়েকজন সংসার-বিরাগী সেই ছায়ায় বসিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেছেন। দেবমূর্ত্তিও আছে—কিন্তু মুদ্রা সংগ্রহের রীতি নাই। শ্রান্ত যোগমায়া নিমগাছের ছায়ায় বসিলেন। এই নির্জ্জন মঠে সাধুসঙ্গে জীবন কাটাইয়া দেওয়া চলে না কি? এমনই শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আলোচনা, নির্ভাবনায় দেবতার পূজা-আরত্রিক দর্শন ও প্রসাদ গ্রহণ—মুক্তিস্বাদ-বিহ্বল আকাশ অনন্ত বিস্তারের দিকে বুঝি পক্ষ মেলিয়াছে। সে আকাশের অবাধ বায়ুপ্রবাহে ভাসিয়া চলা···যেমন ওই চিলটা ভাসিয়া যাইতেছে নির্ভাবনায়—যেমন রাত্রির অন্ধকারে তরতরে মেঘের মাথায় চাপিয়া ভাসিয়া যায় অযুত অযুত জল্‌জ্বলে নক্ষত্র—যেমন আলোর বন্যা বহাইয়া ভাসিয়া যায় কলাভিমুখী চাঁদ।

'মা কুরু ধন-জন-যৌবন-গর্ব্বং'—। কাল নিমেষে এসব হরণ করিতে পারে। সংসার মায়া ছাড়া আর কি? একবার সেই মায়াজাল কাটিয়া বাহির হইয়াছেন যোগমায়া—ভগবানকে পরম করুণাময় জানিয়া এই মুহূর্ত্তে মাথা তাঁহার বারংবার নত হইয়া আসিতেছে।

তৃতীয় মঠের সৌন্দর্য্য আরও মনোরম। এখানে অযত্নবর্দ্ধিত গাছ একটিও নাই—মন্দিরের স্বর্ণচূড়া রৌদ্রালোকে জ্বলিতেছে; দেবতার সংসারও যেন যত্নবতী কোন দেববালার সুচারু করস্পর্শে সুশৃঙ্খলিত ও সৌন্দর্য্যমণ্ডিত। লৌহবেদীর উপর বসিলে ফলভারে অবনত আতাগাছের স্নিগ্ধস্পর্শ কাঁধে আসিয়া কৌতুকে ঘন হইয়া উঠে। রসাল-বৃক্ষ বেড়িয়া ব্রততীর পারিপাট্য—টবের সতেজ গাছগুলিতে ফুলের সমারোহ—জলসিক্ত সতেজ পত্রগুলি পথিককে যত্ন ও মমতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। মঠের ও-পিঠে প্রকাণ্ড বটগাছতলায় ক্ষৌমবাস পরিহিত শ্বেতশ্মশ্রুসমন্বিত এক সাধু বসিয়া আছেন। সম্মুখে তাঁহার পঁচিশ-ত্রিশ জন লোক ভজন গান গাহিতেছে। পুরাকালের আশ্রম-চিত্র মহাভারতের পৃষ্ঠা হইতে বুঝি শত শিকড়সমৃদ্ধ বটবৃক্ষতলে নামিয়া আসিয়াছে।

সেই বৃক্ষতলে একপাশে গিয়া যোগমায়া বসিলেন। অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। গান থামিয়া গেল, গ্রন্থপাঠ আরম্ভ হইল। উপদেশ দিলেন সাধু। হিন্দী ভাষায় সে উপদেশ যোগমায়া বুঝিলেন না—তবু কান পাতিয়া শুনিলেন। অতঃপর আহারের আয়োজনে সন্ন্যাসীর অনুচরেরা এদিক ওদিক চলিয়া গেল। সন্ন্যাসীও উঠিয়া পাশের একটি ক্ষুদ্র ঘরে প্রবেশ করিলেন।

পাণ্ডা ডাকিলেন, "মায়ি, উঠিয়ে। আভি খানাপিনা হোগা।"

সুপ্তোত্থিতের মতো যোগমায়া উঠিলেন।

২

গঙ্গার তীরভূমি আজ শত বাহু মেলিয়া যোগমায়াকে আকর্ষণ করিতেছে। ধূ-ধূ-বালু

বিস্তার—আলিঙ্গনাবদ্ধ গঙ্গা-যমুনার প্রীতিপূর্ণ প্রবাহ, ও-পারের বাজরি ক্ষেতের ঘন বন—অদূরে কেল্লার সুউচ্চ প্রাচীর শহরকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সংসারকে দূরে ঠেলিয়া বৈরাগ্য-বাঞ্ছিত এই সুবিস্তীর্ণ চর—অনন্তকাল ধরিয়া শুধু পুণ্য সঞ্চয়ের শুভ্রতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। পুরাণের কাহিনী—মহাভারতের কাহিনী—যাহা যোগমায়া জানেন—হিন্দু যুগ, মোগল-যুগ—বৃটিশ-যুগের ইতিহাস—যাহা যোগমায়া জানেন না—সমস্তই বিস্তীর্ণ চরভূমিতে ও দুর্গের পাদদেশে স্তূপীভূত হইয়াছে, যমুনার বেগপ্রবাহে ভাসিয়া চিরন্তন কালের কুক্ষিগত হইয়াছে, গঙ্গার কুলুধ্বনির মধ্যে মিশিয়া গানে ও ফেনার ফুলে সেই অনন্ত কালের চরণেই নিত্য বন্দনার পূজা-উপচার পৌঁছাইয়া দিতেছে। দারাগঞ্জের সুউচ্চ পাড়—মাইলখানেক অসমতল চর ভাঙিয়া যেখানে আলো জ্বালিয়া দোকানী পণ্যসম্ভারে ক্রেতাকে আহ্বান করিতেছে, সংসারী সংসার সাজাইয়া সংসারীকে প্রলুব্ধ করিতে চাহিতেছে—সেই উচ্চ পথের আলোক-সমারোহ, কোলাহল ও হাসির জগতে ফিরিবার ইচ্ছা আজ যোগমায়ার নাই। মাঘ মাস নহে যে কল্পবাস করিবেন—তবু বৈশাখের তিনটি পুণ্যময় রাত্রি এই তীরভূমিতে যাপন করিবার ইচ্ছা তাঁহার হইল। ওপারে ঝুঁসির মঠগুলির গাছপালাঘেরা প্রাসাদগুলি (দূর হইতে সেগুলি প্রাসাদ বলিয়াই ভ্রম হয়) যোগমায়াকে আজ বড় শান্তি দিয়াছে।

অপরাহ্নে দলস্থ দুই একজনকে সঙ্গী করিয়া প্রমদা ঠাকুরাণী আসিলেন।

"হ্যাঁ গো বিমলের মা, একলাটি থাকবে এই চরায়? একটা কিছু হ'লে বিমলকে কি বলব ভাই।"

"একটা কিছু যদি হয়ই সে তো আমার ভাগ্যি, দিদি। এ দেব-স্থানে সে ভয় কিছু ক'রো না।"

"বোষ্টম-দাদা বলছে—তেরাত্তির এখানে কাটালে বড্ড দেরি হয়ে যাবে।"

"এখানে যে তিন রাত্রি বাস করতে হয়, দিদি।"

"তা আমরা কেউ নাহয় এসে থাকি?"

"না। মনটা বড্ড হু-হু করে, একলাই থাকব আমি।"

চরের মধ্যে রাত্রি নামিল। প্রশান্ত স্নিগ্ধ রাত্রি। এ রাত্রির বুক ভরিয়া আছে অগাধ আশ্বাস ও পরিপূর্ণ শান্তি। ঈষৎ উচ্চ পাড়ের নীচেয় নৌকার সারি পাতলা হইয়া গিয়াছে—সঙ্গমের মুখে বসিয়া একটিও পাণ্ডা বা যাত্রী পুণ্যের মাশুল লইয়া আর দর-দস্তুর করিতেছে না। ওপারের বাজরি ক্ষেতটা সপ্তমীর অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যে কয়খানি নৌকা আছে—তাহার অভ্যন্তরে মাঝিরা কেরোসিনের কুপি জ্বালাইয়া রুটি তৈয়ারি করিতেছে ও দুর্বোধ্য উচ্চ সুরে গান গাহিতেছে। দূরে দারাগঞ্জের বাজার তখন অজস্র দীপমালায় সাজিয়া দীপান্বিতার রাত্রিকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কেল্লার মধ্যে অন্ধকার গাঢ় হইয়াছে, আইজাক্ সেতুর দু-পারে লাল-সবুজ সিগনালের আলো মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। সেতুর এক পাশ তরল আলোয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, ধোঁয়াও উঠিতেছে প্রচুর। প্রয়াগের শ্মশানে অনির্বাণ চিতার ইতিহাস।

রাত্রি গভীর হইতেছে। আকাশে তারার অজস্র ফুল চরের বালুরাশির সঙ্গে প্রতিযোগিতা সুরু করিয়াছে। সপ্তমীর চাঁদ পশ্চিমে হেলিয়াছে; সেই অস্ত-নিকেতনের ওপার হইতে একটি ম্লান আলো—তরল অস্বচ্ছ-বেদনাময় আলো যমুনার পরপারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অতি দূরের শব্দপ্রবাহও স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে ক্রমশঃ। ঝুঁসির দিকে গঙ্গার তীর ভাঙিবার ঝপ্ ঝপ্ শব্দ প্রায়ই শুনা যায়। গঙ্গার গর্জ্জন একটানা প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। দারাগঞ্জের ঘাটের বাগ্‌বিতণ্ডার কোলাহল বাংলাভাষা হইলে যোগমায়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেন হয়তো। এসব ছাপাইয়া এই নিশীথ রাত্রির বুকে—যমুনার কূলে কূলে ও তরঙ্গে তরঙ্গে যে বাঁশীর সুর কখনও মৃদু, কখনও উচ্চ হইয়া প্রার্থনা বা স্তব-মন্ত্রের মতো ধ্বনিত হইতেছে—তাহা তৃষিত শ্রবণকে অমৃত রসে অভিষিক্ত করিয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট। দুপুর বেলায় সেই অর্দ্ধ উলঙ্গ সন্ন্যাসী—পাণ্ডা বলিয়াছেন বংশীবাবা—যমুনার মাটি লইয়া কখনও তীরভূমিতে মাটির ঘর গড়েন—ভাঙেন—আবার মাটি বহিয়া আনেন—এই নিশীথ রাত্রিতে তিনিই একটি উঁচু ঢিবির উপর বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছেন। দুপুরের রৌদ্র হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য কোন ভক্ত হয়তো একটি ছত্রের ব্যবস্থা করিয়াছেন সেইখানটায়—রাত্রিতেও সেটি খোলা আছে। সহাস্যবদন সন্ন্যাসী রৌদ্র-বৃষ্টির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না। পাগল বলিয়া কেহ তাঁহাকে উপেক্ষা করে—সাধু বলিয়া কেহ বা চানা, ছাতু বা পয়সা সেই ঢিবির গোড়ার

রাখিয়া যায়। ভিখারীরা আসিয়া সেই পয়সা ও প্রসাদ গ্রহণ করে। সন্ন্যাসী হাসিমুখেই বংশীতে ফুৎকারধ্বনি তোলেন।

কি তীব্র অথচ করুণ সুর! যোগমায়ার বুকের ভিতরটা বাঁশীর স্বরলহরীতে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বালুর উপর কম্বল বিছাইয়া শয়ন করিয়াছেন যোগমায়া; চোখে এখনও নিদ্রা আসে নাই। যে সংসার পিছনে পড়িয়া রহিল, তাহার স্মৃতি রোমন্থন বা যে জীবনের পটক্ষেপণ হইয়াছে তাহার দীপাবলীর শোভা নিরীক্ষণ দুইটাই চলিতেছে একসঙ্গে। বাঁশী সান্ত্বনা দিতেছে—হৃদয়ের উত্তাপ গলাইয়া ঐ ত্রিবেণীসঙ্গমেই মিশাইয়া দিতেছে তবু সেদিনের কথা—

উপুড় হইয়া পড়িয়া আছেন যোগমায়া পায়ের কাছে বসিয়াছে বধূ। বিয়োগের দুঃখে যোগমায়ার চোখের জল শুকাইয়া গিয়াছে, সংসারের সুখ-দুঃখ মান-অপমান লইয়া সমস্ত অভিযোগ তাঁহার শেষ হইয়াছে বুঝি।

বধূ পায়ে হাত দিয়া ডাকিতেছে, "মা, ওঠো মা। মাগো—"

কি করুণ আর্ত্ত কণ্ঠস্বর! নিজের দুঃখের অতল সমুদ্রে প্রকাণ্ড একটি ঢেউয়ের মতো সেই ধ্বনি। সে ধ্বনি সমুদ্রকে ফুলাইয়া বিক্ষোভিত করিতেছে। উঠিয়া বসিলেন যোগমায়া। নিজের বুকের মধ্যে বধূর মাথাটি একটু জোরেই চাপিয়া ধরিয়া অন্যায় বিচারের প্রতিবিধান করিলেন। কিন্তু সেও ঘটিল এক অবিচ্ছিন্ন ঝঞ্ঝা-প্রবাহের মধ্যে। চেতনার উর্দ্ধলোকে ক্ষণিকের তরে ভাসিয়া আবার অতলস্পর্শ অন্ধকারে তিনি ডুবিয়া গেলেন।

বেয়াই আসিয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেন। ঘোমটা টানিয়া মাথা নাড়িয়া কি যে বলিলেন ভালো মনে নাই। হয়তো ক্ষমার কথাই বলিয়াছেন। বৈবাহিকের মুখ প্রসন্ন হাস্যদীপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। অস্ফুট কণ্ঠের 'দেবী' এই ধ্বনিটুকু মাত্র শোনা গেল। তারপর আবার সেই অবিচ্ছিন্ন ঝঞ্ঝা-প্রবাহে চৈতন্যের জগৎ মগ্ন হইয়া গেল।

বিমল আসিয়া শুষ্কমুখে ডাকিল, "মা!"

অবিন্যস্ত রুক্ষ চুল, তৈলাভাবে গায়ে খড়ি উড়িতেছে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ, আধ-ময়লা উত্তরীয় ও সাদাপাড় ধুতি এবং খালি পায়ে সে যেন সর্ব্বহারা ছেলেটি। ঝড় থামিয়া গেল—বুকের মধ্যে প্রচণ্ড একটি আঘাত জাগাইয়া।

"বাবা?"

"একটা ফর্দ্দ তো করতে হয় মা। বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ না করলে—"

"তাই করো বাবা, যা তোমরা ভালো বোঝ। আমায় জিজ্ঞেস করো কেন?"

"তুমি না বললে—"

"একটা কাজ করিস, খোকা। গাঁয়ের যত কাঙালী আছে, তাদের পেট ভরে খাইয়ে দিস, বাবা। ওদের এক সরা চিঁড়ে মুড়কি আর দুটো চিনির ডেলা দিয়ে বিদেয় করিস নে।"

"বেশ, তাই হবে।"

অবিচ্ছিন্ন ঝঞ্ঝা—আবার বহিতে থাকে। আবার যোগমায়া ডুবিয়া যান সেই অন্ধকারে। নয় বৎসরের বধূ—ষোল বৎসরের বর। প্রায় চল্লিশটি বৎসরের দৃঢ় বন্ধন—কালের ভ্রূকুটিতে শিথিল হইয়া ছিঁড়িয়া গেল। ছিঁড়িয়া মিলাইয়া গেল কোথায়? এক এক দিনের স্মৃতি অক্ষয় হইয়া আছে। অনেকগুলি স্মৃতির ফুল কুড়াইলে সুদীর্ঘ একটি মালা তৈয়ারি হয়। কিন্তু এখানে-ওখানে সে ফুল ছড়াইয়া আছে। একটি সূতায় গুছাইয়া মালা গাঁথিবার মালাকর মন আজ শোকের বাতাসে মুহ্যমান।

"পাঁচশো কাঙালী হবে, মা।"

"টাকা চাই? আমার ক্যাশ বাক্সটা নিয়ে আয়, খোকা।"

হু-হু করিয়া বাতাস বহিতেছে।

"ওগো, কাপড়চোপড়গুলো ধুয়ে রেখেছ তো? কলসী সাজানোর ভার কে কে নিলেন? অগ্রদানীর বাসন, গাড়ু, ঘড়া, শয্যা, ছাতি, থালা, গেলাস সব ঠিক করে রাখো। ষড়ঙ্গের জিনিসগুলো। খাটখানায় মশারি টাঙিয়ে দাও, গদিটার ওপর ভালো করে চাদরখানা পাতো, বিরাট পাঠের ব্যবস্থা যেন ভালো হয়!"

ঝড় থামিয়া গিয়াছে। বহু—বহুক্ষণ ধরিয়া আকাশ আজ শান্ত—নির্ম্মেঘ।

"গুরুর দান আলাদা করে তুলে রাখো—ওটা যেন পুরুতমশাই না নেন।"

"আকাশস্থ নিরালম্ব—বায়ুভূত নিরাশ্রয়—"

আবার ঝড় বহিতে সুরু করে। প্রেত—প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয় মানুষ, আকাশে অবলম্বনহীন—নিরাশ্রয় মানুষ ঘুরিয়া বেড়ায়।

"অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবাঃ—"

তাঁড়ার ঘরের মেঝেয় লুটাইয়া যোগমায়া চোখের ধারা মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

প্রেতযোনি প্রাপ্ত রামচন্দ্র তাঁহার মাথার উপর ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এই অন্নপিণ্ডের জন্য লালায়িত শুধু রামচন্দ্র নহেন—তাঁহার দুই কুলের সাত পুরুষ পর্য্যন্ত—দগ্ধ কাঁচাকলা-তিল-মধুসিক্ত গলিত আতপ তণ্ডুলের পিণ্ডের জন্য প্রেতলোকের বুভুক্ষায় এই দণ্ডে জাগিয়া উঠিয়াছেন। মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে হাতের উল্টা পিঠের দ্বারা কুশের উপর সেই পিণ্ড দান করিয়া বিমল তাঁহাদের পরিতৃপ্ত করিতেছে। তারপর—

মধুবাতা ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ।
মধুনক্তম্ উতষসো
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।

আকাশ মধুময় হউক, বাতাস মধুময় হউক···আঃ, কি সান্ত্বনার সুর—কি শান্তির স্বস্তিবাচন!

উঠিয়া বসিয়া দু'কান ভরিয়া সেই মন্ত্র-ওষধি পান করিলেন যোগমায়া। প্রাণে নববল সঞ্চার হইল। কর্ত্তব্যে অটল হইয়া কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন।

শ্রান্তি এ দিনের অন্য নহে, ক্ষুধা কর্ম্মের সুধা পান করিয়া ঘুচিয়া গিয়াছে। অসংখ্য বার সিঁড়ি দিয়া উঠা-নামা করিতে করিতে সর্ব্বকার্য্যের নির্দ্দেশ দিয়া সুসম্পন্ন করিলেন তিনি। গভীর রাত্রিতে কোলাহল স্তিমিত হইয়া আসিল। জয় জয় রবে কাঙালীরা দু'কান ভরিয়া দিয়া গিয়াছে; নিমন্ত্রিতের শত মুখে আয়োজন-পারিপাট্যের সুখ্যাতিতে মন ভরিয়া দিয়াছে, রবাহুতরা পর্য্যন্ত বিমুখ হয় নাই।

খান নাই শুধু কমলা আর যোগমায়া। যোগমায়া একবার তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কমলা বলিয়াছেন, "এত খেলাম—আবারও আমায় খেতে বলছ বউ!"

বাঁধভাঙা বন্যায় কমলা ভাসিয়াছেন, যোগমায়াকে ভাসাইয়াছেন।

থমথমে রাত্রি। দ্বিতলের ছাদ হইতে নামিবার সময় সিঁড়ির মুখে যোগমায়া একবার থমকিয়া দাঁড়াইলেন। আকাশে চাঁদ নাই, অনেকগুলি নক্ষত্র জ্বলিতেছে। তার মধ্যে পূর্ব্ব আকাশের তারাটারই জ্যোতি প্রখর বলিয়া বোধ হয়। সেটি আসন্ন প্রভাতের সূচনা করিতেছে। পশ্চিমের অন্ধকারকে শাসন করিবার উদ্ধত ভঙ্গী তার মধ্যে নাই; সান্ত্বনা দিবার প্রয়াসে একটু যেন ছলছলে হইয়াছে। পশ্চিমের দুর্ভেদ্য অন্ধকার গাঢ়তর হইতেছে—সেই সান্ত্বনায়। একটা গ্যাস-বাতি দপ দপ করিয়া নিবিয়া গেল। ভাঙা খুরি মুচির উপর দিয়া শৃগাল কিংবা কুকুরের ছুটাছুটি চলিতে লাগিল। বুকের গাঢ়তর নিশ্বাস মুক্ত করিয়া যোগমায়া পশ্চিম আকাশের পানে চাহিয়াই অবতরণ করিতে লাগিলেন।

গঙ্গার স্রোত যেমন শব্দ করিয়া এক মুখেই ছুটিয়াছে—টুকরা টুকরা ঘটনাগুলিও তেমনই একমুখীন। তাহাদের অন্তর্নিহিত শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট। একটি বৎসর ধরিয়া সেই শব্দ সমষ্টির সুস্পষ্ট অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন যোগমায়া।

কালাশৌচে পা বাড়াইতে নাই, কিন্তু শৃঙ্খলের জ্বালা সেই বন্ধনের মধ্যে। হাজার দিনের হাজারটা স্মৃতি চিতার মতো দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়াছে বুকের মধ্যে। রাবণের অনির্ব্বাণ চুল্লী। কানে আঙুল দিলে রাবণের সেই অনির্ব্বাণ চুল্লী আজও শোঁ শোঁ ধ্বনিতে রামায়ণ কাহিনীতে শ্রদ্ধা আনিয়া দেয়। কিন্তু চিরসধবা মন্দোদরীর কি সান্ত্বনা ছিল সেই অনির্ব্বাণ চিতার আগুনে? কি সান্ত্বনা ছিল? যে যায়—সে তো চিতাই জ্বালিয়া দিয়া যায়—যে পড়িয়া থাকে, তার বুকে জ্বলে সেই কালজয়ী অনির্ব্বাণ চিতা।

"মা, আমায় ফেলে আপনি কোথায় যাবেন? সংসারের কিই-বা জানি আমি?"

"তুমি লক্ষ্মী—তুমিই চালিয়ে নিও।"

"না মা, আপনি না থাকলে—আমি এখানে এক দণ্ডও তিষ্ঠুতে পারব না।"

"স্বামীর ভিটেয় সন্ধ্যে দেখানো যে তোমার ধর্ম্ম, মা। দেবতারা তোমায় আশীর্ব্বাদ করবেন।"

"আপনি কবে ফিরবেন?"

"পাপ মুখে ও কথা আর বলব না, মা। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো যেন তীর্থে দেহ রাখতে পারি।"

"না মা, ও কথা বলবেন না।"

বধুকে সান্ত্বনা দেওয়া কঠিন কাজ। মায়ের বেদনা ছেলে বোঝে, তাই নীরবে তাঁহার পায়ে প্রণাম করিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া থাকে।

"খোকা, তুই তো আমায় আসতে বললি নে।"

"তোমায় যে আসতেই হবে, মা।"

"যদি না ফিরি?"

"না মা, ফিরতে তোমায় হবেই।"

"ঠিক বলেছে খোকা, যত তীর্থ ই করো দিদি—এর বাড়া তীর্থ তোমার নেই।"

সে কথা মনে মনে স্বীকার করেন যোগমায়া। তুলসীতলায় প্রণাম রাখিবার কালে, মহাদেবের মন্দিরে গঙ্গবন্দ্রে প্রার্থনা করিবার কালে—সহস্র বার সে কথা মনে মনে স্বীকার করেন তিনি। যাহাদের রাখিয়া গেলেন এই ভিটায়—তাহাদের দুঃখ-অশান্তি দূর করিবার জন্য—কল্যাণের কত অনুষ্ঠানই না অনুষ্ঠিত হইল; দেব-দেবীর উদ্দেশে মানত ও প্রার্থনার বাণী মন্দির ভরিয়া সাজাইয়া রাখিলেন নৈবেদ্যের মতো।···চিরজীবনের জন্য সংসার ছাড়িলেন যোগমায়া।

হু-হু করিয়া অবিশ্রান্ত ঝড় বহিতেছে। ঝড়ের বেগে তৃণের মতো তিনি উড়িয়া চলিয়াছেন—ভাসিয়া চলিয়াছেন—নিশ্চিহ্ন হইবার তীব্র কামনা পোষণ করিতেছেন মনে মনে।

আশ্চর্য্য বাঁশী! বিদায়দিনের সবটুকু ব্যথা উজাড় করিয়া গঙ্গা-যমুনার তরঙ্গে ঢালিয়া দিতেছে—ওপারের ম্লান তীরভূমিতে আলগা বালুর মধ্যে ঝড়ের সঙ্গে মিশাইয়া দিতেছে। বনশীবাবা কি সারারাত এমনি উদ্‌ভ্রান্তের মতো বাঁশী বাজাইয়া চলিবেন? একটি মাত্র সুরের ব্যাপক মূর্চ্ছনায় একটি মাত্র গীতই তাঁর বাঁশীতে বাজিবে?

একই ঠাঁই চলেছি ভাই—ভিন্ন পথে যদি।
জীবন জলবিম্ব সম মরণহ্রদ-হৃদি।

৩

প্রমদা ঠাকুরাণী যোগমায়াকে বলিলেন, "আজ বিকেলে আমরা যাত্রা করব, বিমলের মা। সেথো বলছেন—অনেক দেরি হয়ে গেল।"

যোগমায়া তাঁহার পানে চাহিতেই তিনি বলিলেন, "তুমি কি রাত্তিরে ঘুমোও না, বিমলের মা? চোখ মুখের এ কি ছিরি তোমার!"

"ঘুমুই তো।" মৃদু হাসিয়া যোগমায়া উত্তর দিলেন।

"তা নাও, তোমার পোঁটলা-পুঁটুলি বেঁধেছেঁদে নাও। চলো, সঙ্গমে একটা ডুব দিয়ে আসি।"

"আমি মনে করছি দিন কতক এখানেই থাকব।"

"সে কি—তীর্থ দর্শন করবে না? মথুরা—বৃন্দাবন—সাবিত্রী—"

"না দিদি, এইখানটায় বড় শান্তি পেয়েছি।"

প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া প্রমদা ঠাকুরাণী বলিলেন, "তা কি হয়! আমাদের হাতেই তো বিমল তোমাকে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্দি রয়েছে। তোমাকে একলা ফেলে···না না, পুঁটুলি বেঁধে নাও।"

"না দিদি, মনের শান্তি যেখানে পেলাম—সেই আমার সবার চেয়ে বড় তীর্থ। কপালে থাকে এর পর মথুরা বৃন্দাবন দেখব। তোমরা বরঞ্চ ফেরবার মুখে একবার—"

"আ আমার কপাল! সেথো বলছিলেন, আমরা হরিদ্বার অযুধ্যে হয়ে কাশী দিয়ে ফিরব। সে নাকি আলাদা রাস্তা।"

"তবে বিমলকে আমার ঠিকানা জানিয়ে একখানা পত্র দিও। দায়-অদায়ে তার ভরসাই তো করি।" একটু থামিয়া হাসিবার ভঙ্গী করিয়া কহিলেন, "ভরসা কারও রাখতে নেই, দিদি। ওতেই তো যত কষ্ট। ভগবান ভরসা করেই এখানে রইলাম।"

ঝড়ের মুখে ভাসিয়া চলিয়াছেন যোগমায়া; সেই বেগ মন্দীভূত হইয়া মাটিতে পা রাখিবার সঙ্গে সঙ্গে মাটির স্পর্শ প্রিয়তর হইতেছে। এই যমুনা, ঐ গঙ্গা, ওপারে সু-উচ্চ ঝুঁসির মঠ, ওধারের বিশাল দুর্গ, মাইলব্যাপী চর ঠেলিয়া দারাগঞ্জের চক—আর অজগর-বেষ্টনীর মতো বি-এন-ডব্লিউয়ের লৌহসেতু আইজাক। গঙ্গার দিকে মুখ করিলে ফাপামউয়ের বড় সেতু অস্পষ্টভাবে দেখা যায়, কেল্লার আড়াল-ঘুচিলে যমুনার বুকে গৌ-ঘাটের সুদৃশ্য সেতুও চোখে পড়ে। চারিদিকে বন্ধনের রজ্জু, তবু এই বিস্তীর্ণ চরে মুক্তির ক্ষেত্র প্রসারিত। বাহিরের সংসারকে আটকাইয়া রাখিবার জন্যই সেতুর শৃঙ্খলে গঙ্গা ও যমুনা বন্দিনী হইয়াছেন; কেল্লার প্রাচীর, ঝুঁসির মঠ, ওপারের বাজরি ক্ষেত···সমস্তই এই পুণ্যভূমির মাহাত্ম্যকে এই বিস্তীর্ণ চরের মধ্যে কত যুগযুগান্তরের সঞ্চিত পবিত্র হোমশিখার মতোই জ্বালাইয়া রক্ষা করিতেছে, কে জানে?

সঙ্গম হইতে ফিরিবার মুখে প্রত্যহ বনশীবাবার বেদী ঘুরিয়া তবে যোগমায়া কুটিরে গিয়া উঠেন। প্রত্যূষের স্বর্ণকিরণে বনশীবাবা যমুনার তীরভূমিতে কাদা ও বালি কুড়াইয়া ঘর বাঁধিতে থাকেন। সারি

সারি অনেকগুলি ঘর। ঘর বাঁধা শেষ হইলে—উচ্চ বেদীর উপর বসিয়া বাঁশী বাজান। কে আসিয়া প্রণাম করিল, কে বা ফলমূল ও আহার্য্য বেদীতলে ভক্তিভরে রাখিয়া দিল—ওসব দেখিবার অবসর তাঁর নাই। পায়ের উপর পা রাখিয়া পদ্মাসন করিয়া ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গীতে সামান্য মাথা দুলাইয়া তাঁর সেই একাগ্র ফুৎকারের মধ্যে বাঁশী যেন সান্ত্বনার প্রস্রবণ বহাইতে থাকে। সারা দুপুর এবং সারা রাত্রি বাঁশী বাজে।

স্নান সারিয়া তীরের উপর দাঁড়াইয়া যোগমায়া একাগ্র মনে বনুশীবাবার বালু সংগ্রহ ও ঘর গড়া দেখিতেছিলেন।

সন্ন্যাসীর সে গোবর্ণ দেহজ্যোতি কোথায়? কোথায় বা আজানুলম্বিত বাহু—দীর্ঘ জটাজাল—মাল্যভারগ্রস্ত গলদেশ ও বাহুমূল? কপালে ত্রিপুণ্ড্রক নাই—দেহে ভস্ম-প্রলেপ নাই। লোকে বলে সাধু নন ইনি। জপ, তপ, উর্দ্ধাসন, হোম, মন্ত্রপাঠ—এসব কিছুই নাই, শুধু দিনরাত আপন খেয়ালে বাঁশী বাজাইয়া যান। কাহাকেও ঔষধ বিতরণ করেন না, শাস্ত্রকথা লইয়া কাহারও সঙ্গে তর্ক করেন না বা উপদেশ দেন না। বলিতে গেলে কথাই তিনি বলেন না। কেবল সকলের পানে চাহিয়া শীর্ণকায় মলিনজ্যোতি অতি সাধারণ সন্ন্যাসী ফিক্ ফিক্ করিয় হাসিতে থাকেন। লোকের মন তাহাতে ভরে না, বলে—পাগল।

হয়তো পাগলই তিনি। পাগল না হইলে বাঁশী বাজাইয়া আর যমুনার তীরে কাদা-বালির ঢিবি রচনা করিয়া পরমানন্দে তিনি দিনযাপন করেন কি করিয়া? যোগমায়ার পানে চাহিয়া সন্ন্যাসী হাসিলেন। কুৎসিত দেহের মধ্যে যদি কোথাও সৌন্দর্য্য থাকে—সে ঐ হাসিটুকুতে। সমস্ত অন্তরের প্রসন্নতা ও নির্ম্মলতা সেই হাসিতে উচ্ছ্বলিত হইতেছে। পাগল এমন অর্থপূর্ণ হাসি হাসিতে পারে কখনও? পরম রত্ন পাওয়ার আনন্দে—এমন ঝলমলে হাসি—গঙ্গার ও-পিটে ফাপামউ-সেতুর উপর প্রথম প্রভাত-সূর্য্যের আরক্ত কিরণপাতের মতো সুস্নিগ্ধ হাসি কয়জন শোকদগ্ধ মানুষের মুখে ফুটিয়া থাকে। মুগ্ধ হইয়া গেলেন যোগমায়া।

মনোযোগী দর্শক পাইয়া সন্ন্যাসীর উৎসাহ বাড়িয়া গেল। ক্ষিপ্রকরে কাদার তাল সংগ্রহ করিয়া ঘর গাঁথিতে লাগিলেন—আর যোগমায়ার পানে চাহিয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

যোগমায়া ভূমিলগ্না হইয়া প্রণাম করিয়া ডাকিলেন, "বাবা।"

সন্ন্যাসী ফিক্ করিয়া হাসিয়া মাটির ডেলা চাপাইয়া বালু-বেলার ঘর উঁচু করিতে লাগিলেন। অনেকখানি উঁচু হইলে—সেটি ধ্বসিয়া পড়িয়া গেল। সন্ন্যাসী যোগমায়ার পানে চাহিয়া হাসিলেন। আবার কাদার তাল লইয়া সেই ভগ্ন গৃহ সংস্কার করিতে লাগিলেন। কত বার ঘর ভাঙ্গিল—কতবার তিনি গড়িলেন। ক্লান্তি নাই, —বিরক্তি নাই। যমুনার তীরে সারি সারি মাটির ঢিবি তৈয়ার করিয়া চলিয়াছেন। সে ইঙ্গিত কেহই বোঝেন না, যোগমায়াও বুঝিলেন না। কাল-সমুদ্রের তীরে মানব-গেহীর ঘর বাঁধার এই চিরন্তন লীলার আদি রহস্য কয়জনই বা বুঝিয়া থাকেন?

আর এক আকর্ষণ হইল ঝুঁসি। গঙ্গার তীরে সুউচ্চ নির্জ্জন মঠগুলি প্রায়ই তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে থাকে। ইচ্ছা হয়—সেই নির্জ্জনে বসিয়া খানিক জপ করেন, খানিক বা চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। গঙ্গার দিক হইতে যেমন হু-হু করিয়া বায়ু বহিতে থাকে—মনের মধ্যেও সেই বায়ুর বিরাম নাই। নির্জ্জন গৃহের চত্বরায় বসিয়া কলাগাছের পানে চাহিয়া এক দিন মনে হইল, কোন্ বাল্যকালের পৌষমাসের একটি দিনে যেমন সঙ্গিনীদের সঙ্গে খিচুড়ি রাঁধিয়া বন-ভোজন করিতেন—এই নির্জ্জনে ঐ কলার পাতা পাতিয়া তেমনই একবার আনন্দ-উৎসব জমাইলে মন্দ হয় না। মন্দিরের আশে-পাশে অনেক জঙ্গল। একখানা কাটারি পাইলে তিনি অনায়াসে সেগুলি কাটিয়া জঙ্গল সাফ করিতে পারিতেন। একগাছি সম্মার্জ্জনী থাকিলে ঘরগুলি ঝুল ঝাড়িয়া ও মেঝের ধূলি-জঞ্জাল সাফ করিয়া দেবস্থানটিকে পরিচ্ছন্ন রাখিতে পারিতেন। আঁচল দিয়া আর কতটুকু পরিষ্কৃত হয় ধুলার রাশি?

দ্বিতীয় মঠের নিম্ব বৃক্ষমূলে শাস্ত্রপাঠ ও আলোচনা বুঝিতে পারেন না যোগমায়া, তবু সুরটি তাঁর ভালো লাগে। পারমার্থিক তত্ত্বের সবটুকু স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রয়াস, এবং সেই তত্ত্বকথা অন্তরে ভরিয়া রাখিবার আনন্দপাত্র খুব কম সংসারীরই আছে। তত্ত্বকথা আসে পর্ব্বোপলক্ষে গঙ্গাস্নানের মতো—আকাশে শরৎ বা বসন্ত কালের পরিপূর্ণ চাঁদকে হঠাৎ দেখার মতো—কোন সম্মানীয় ব্যক্তির সহসা আতিথ্য গ্রহণের মতো। সাধারণ

লোকে সংসারের তৌলদণ্ডটির দিকে মাঝে মাঝে সতর্ক দৃষ্টিই নিক্ষেপ করেন। বৈষয়িক কর্ম্মের অবসর-মুহূর্ত্তে পুণ্য সঞ্চয়ের আকুল আগ্রহ—তৌলদণ্ড এক দিকে ঝুঁকিয়া না পড়ে, তাহারই প্রচেষ্টা তাই তাঁহাদের মধ্যে প্রবল। সংসারের পরিবেশ আর ত্রিবেণী তীরের এই পরিবেশে অনেক তফাৎ। সেখানে স্পষ্ট প্রত্যক্ষীভূত জিনিস ধোঁয়ার মতো নিত্যই গাঢ় হইয়া উঠে—এখানে অস্পষ্ট জিনিসও অনুভূতিতে প্রখর হইয়া উঠে। সেখানে কাহিনী করে মনকে আকর্ষণ, এখানে কাহিনীর অভ্যন্তরস্থিত শাশ্বত সত্যবস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। এই বিরাট্ শূন্যতার মাঝে বিশ্ব-সৃষ্টির পরিপূর্ণ আভাস বিদ্যমান। ঘটে, পটে, মূর্ত্তিতে প্রতিনিয়ত যে ঈশ্বরের কল্পনা করিয়া আনন্দে অভিভূত হইয়াছেন যোগমায়া—এই বিরাট্ শূন্য প্রান্তর ও আকাশের মধ্যে নিয়ত প্রবহমানা গঙ্গা যমুনার কুলুধ্বনিতে সর্ব্বব্যাপী মহিমার মূর্ত্তিতে সেই ঈশ্বরকে অনুভব করিয়া তেমনই প্রসন্ন হইয়া উঠিতেছে মন।

তুমি আছ অনল অনিলে চির নভোনীলে
ভূধর সলিলে গহনে—
আছ বিটপী লতায় জলদের গায়
শশী তারকায় তপনে।

তৃতীয় মঠের স্তোত্রগানও স্বস্তি বচনের মতো শান্তি দেয়। একটি প্রণাম সেই বটবৃক্ষমূলে রাখিয়া তিনি ফিরিয়া আসেন।

আইজাক সেতুর পাদদেশে প্রায় শ্মশানঘাটেই নৌকায় আসিয়া চাপেন। শ্মশান অতিক্রম করিবার কালে মনে কোন বিকার জন্মায় না। নিত্য জীবনের মতো নিত্য কালের মৃত্যু অত্যন্ত সহজ বলিয়াই বোধ হয়। কোনটিই কোনটিকে অতিক্রম করিবার প্রয়াস করে না। পরস্পরের সম্পূরক হইয়া সৃষ্টিলীলার শতদলটিকে চির বিকশিত রাখিয়াছে বুঝি।

ঘর-বাঁধা ও ঘর-ভাঙার কাজে বন্শীবাবার তাই ক্লান্তি নাই।

দিনের কোলাহলমুখর নিত্য মহোৎসব লাগিয়াই আছে। সংসার যেন ভীমরোলে আবর্ত্তিত হইতেছে। উপরের দারাগঞ্জের গৃহ-উদ্গীরিত জনরাশি—কেল্লার পাশ দিয়া শত শত নৌকা বোঝাই জনরাশিতে প্রয়াগঘাট আচ্ছন্ন করিয়া দেয় যেমন বাদবিতণ্ডা—তেমনই কোলাহল। ক্ষণিকের সংগ্রহের পথে রতি পরিমাণ পুণ্য হয়তো তাঁহারা লইয়া যান—তীরভূমিতে ফেলিয়া যান পর্ব্বত প্রমাণ কলুষ। এত অচিন্তিতপূর্ব্ব কলুষও আছে সংসারে? আবার এত মধুও সঞ্চিত হইতেছে সংসার-কুলায়চক্রে!

আশ্চর্য্য রাত্রি এবং বৈরাগ্য-মণ্ডিত অদ্ভুত নিস্তব্ধতা নামিয়া থাকে প্রয়াগের চরভূমিতে। যুগযুগান্তর হইতে এমনই রাত্রি ও এমনই প্রশান্তি বুঝি নামিতেছে এখানে। শোকতপ্ত মনের সঙ্গে কতকালের আত্মীয়তা যেন সেই রাত্রির—সেই নিস্তব্ধতার। বন্শীবাবার বংশীধ্বনিও কি অনাদিকাল হইতে লক্ষ সাধুপদধূলি-পূত এই বৈরাগীচরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মন্দ্রিত হইয়া উঠে? তীরের গৃহ রচনার অনলস উদ্যম?

বাঁশীর সুর উঠিলেই—যমুনার তীরে বালুগৃহ রচনার কথা মনে জাগে। তার পিছনে যে বৃহত্তর গৃহ ফেলিয়া আসিয়াছেন যোগমায়া—সেই গৃহের ছবিও স্পষ্টতর হয় প্রতি রাত্রিতে। শান্তি লাভের অক্ষয় তীর্থের ভাণ্ডারে সেই গৃহের দানও অমূল্য। প্রভাতের যাত্রীরা পুণ্যমণ্ডিত হইয়া সেই ঘরের বাতাসকেই তো নির্ম্মল করিয়া তুলিবেন প্রত্যহ। সেই ঘরের কল্যাণে দেবতা হন আমন্ত্রিত; দেবতার ষোড়শ উপচার, পূজার ঘটা—দেবতাকে বরদানের কাকুতি মিনতি।

অনেকগুলি বিনিদ্র রজনী যাপন করেন যোগমায়া। কঠোর আত্ম-নিগ্রহে যে আনন্দ—শোককে আচ্ছন্ন করিবার শক্তি তার যথেষ্ট। তবু অনন্তের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিবার কালে গৃহের খণ্ডিত শ্রীটুকুও এক একদিন যোগমায়ার নিদ্রাহরণ করিয়া লয়।

খুব ঘটা করিয়া একদিন বিস্তীর্ণ চরে একটা সভা আহূত হইল। চরের ওদিক হইতে প্রায় অপরাহ্ণ সময়ে যোগমায়া ফিরিতেছিলেন। প্রচুর জনসমাগম দেখিয়া ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য তাঁহার ঔৎসুক্য জন্মিল। সাধু-সন্ন্যাসীকে লইয়া এমন সভার কথাও তো জানা আছে। পায়ে পায়ে অগ্রসর হইয়া জনতার প্রান্তভাগ তিনি স্পর্শ করিয়াছেন—এমন সময়ে অপ্রত্যাশিত এক ঘটনা ঘটিয়া গেল। সঙ্ঘবদ্ধ জনতা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। কিসের আশঙ্কায় কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া মরি-বাঁচি করিয়া তাহারা পরস্পরকে দলিত মথিত করিয়া পলাইতে লাগিল—যোগমায়া বুঝিতে

পারিলেন না। জনতার চাপের মধ্যে পড়িয়া তিনি আপনার সঙ্কট বুঝিতে পারিলেন—কিন্তু সে কতটুকুর জন্য? বাহির হইবার পথ খুঁজিতে গিয়া দেখিলেন—চারিদিকের চাপ অসম্ভবরূপে বাড়িয়া উঠিতেছে। শ্বাসরোধকারী সেই চাপের মধ্যে—অদূরে দণ্ডায়মানা এক নির্ভীক নারীমূর্ত্তির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। শুভ্র কেশজাল বেড়িয়া গলদেশে তাঁর পুষ্পমাল্য বিলম্বিত। তাঁর দু'টি চক্ষুর দৃষ্টি বিশৃঙ্খল জনতার পানে নিবদ্ধ। হস্তেঙ্গিতে জনতাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়াসও তিনি কয়েক বার করিলেন। তাঁহার বামহস্তধৃত ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা পত্‌ পত্‌ শব্দে উড়িতে লাগিল। আর সেই আন্দোলনের মধ্যেই পায়ের তলার মাটি ক্রমশঃ সরিয়া যাইতেছে মনে হইল। দারাগঞ্জের ঢালু রাজপথ হইতে লাল পিপীলিকার সারি যেন নামিয়া আসিতেছে। কয়েক জনের ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি ক্ষীণতর হইয়া মিলাইয়া গেল, তীরভূমিতে সহসা সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হইল।

প্রভাতের আলো এমন মিষ্ট ইতিপূর্ব্বে অনুভূত হয় নাই। ঘুম ভাঙিবার পর কিছু অবসাদ দেহে লাগিয়া থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু মাথা তুলিতে না-পারার দুর্ব্বলতা প্রচণ্ড অসুখেই সম্ভব। পরিচিত চরভূমিই বা কোথায়? কুঁড়ে ঘরে কম্বলের উপর কাপড় বিছানো শয্যা নহে—তাহার চেয়েও সুকোমল। চারিদিকে প্রভাতের আলোকবন্যা। স্বপ্ন দেখিতেছেন কি না যোগমায়া সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন।

একজন প্রৌঢ়া প্রবেশ করিলেন। যোগমায়ার উন্মীলিত চক্ষু দেখিয়া তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। দ্রুতপদে নিকটে আসিয়া মৃদু নিষেধের স্বরে কহিলেন, "উঠবেন না, আপনি বড় দুর্ব্বল।"

যোগমায়ার ওষ্ঠ নড়িতে লাগিল। কথা কহিবার চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না; পরিশ্রান্ত হইয়া পুনরায় চক্ষু মুদিলেন।

যখন চক্ষু চাহিলেন—চারিদিকের দুয়ার জানালা বন্ধ। হয়তো প্রভাত কাল নহে, পশ্চিমের নিদাঘ-মধ্যাহ্নের খরতাপে দুয়ার জানালা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও গাত্রচর্ম্ম শুষ্ক করিয়া দিতেছে। দৃষ্টি ফিরাইতেই পাশের টুলে উপবিষ্টা সেই প্রৌঢ়া মহিলাটিকে তিনি দেখিলেন। একখানি ছোট টিপয়ের উপর রেকাবিতে কিছু ফলমূল কাটা—খরমুজার সুগন্ধে ঘর ভরিয়া গিয়াছে—আর কাচের গ্লাসে এক গ্লাস জল। তাহারই সামনে প্রৌঢ়া বসিয়া রহিয়াছেন। একটু যেন অন্যমনস্ক। কোন বিষয় লইয়া গভীর ভাবেই হয়তো বা চিন্তা করিতেছেন।

অস্ফুট শব্দ করিয়া যোগমায়া তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। শশব্যস্তে তিনি উঠিয়া আসিলেন।

"উঠবেন না—উঠবেন না। মুখ ধোবার জল আমি এনে দিচ্ছি—পিকদানিতে মুখ ধুয়ে নিন।"

"আমার কি হয়েছে?" ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন যোগমায়া।

"যমুনার চড়ায় হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন, কেউ নেই দেখে টাঙ্গা করে বাড়ী নিয়ে এলাম।"

"সঙ্গম এখান থেকে কতদূর?

"তা মাইল চারেক হবে। এটার নাম লুকার-গঞ্জ। আপনি ব্যস্ত হবেন না, ডাক্তার বলেছেন শীগ্‌গির সেরে উঠবেন।"

"আমায় কি ওষুধ খাইয়ে দিয়েছেন?" ব্যগ্র স্বরে যোগমায়া প্রশ্ন করিলেন।

"না। ওষুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয়েছিল—পারেন নি ডাক্তার। আর খানিকক্ষণ জ্ঞান না হ'লে হয়তো—"

মনে মনে ভগবানকে প্রণাম করিলেন যোগমায়া। প্রশ্ন করিলেন, "আমায় পৌঁছে দেবেন চরে?"

"এমন অবস্থায় কি একলা ছেড়ে দিতে পারি? দু'টি দিন আপনার পূর্ণ বিশ্রাম দরকার।"

"না না, আমি যেতে পারব।" শয্যা-ত্যাগের চেষ্টায় আকুল হইয়া উঠিলেন যোগমায়া।

প্রৌঢ়া নিকটে আসিয়া তাঁহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া সুস্নিগ্ধ স্বরে কহিলেন, "না ভাই, সম্পূর্ণ না সেরে যাওয়া পর্য্যন্ত তোমাকে আমরা ছাড়ব না। মনে করো না যে—আমি তোমার বোন!"

যোগমায়ার মন অপূর্ব্ব পুলকরসে ভরিয়া গেল। এমন স্নেহপূর্ণ কথা—এমন দরদমাখা ব্যবহার রামচন্দ্র চলিয়া যাওয়ার পর এই যেন প্রথম শুনিলেন। শুধু শুনিলেন না, সারা অন্তর দিয়া সেই স্নেহ ও ব্যাকুলতা গ্রহণ করিলেন। প্রৌঢ়ার হাত ঈষৎ চাপিয়া ধরিয়া কি যেন বলিতে চাহিলেন, কথা বাহির হইল না। দু'চোখ বাহিয়া দু'টি ধারা শুধু গণ্ড অতিক্রম করিয়া উপাধান সিক্ত করিয়া দিল।

অনেকক্ষণ পরে প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কেমন করে আমায় দেখতে পেলেন?"

"আমি যে সেই মিটিঙে বক্তৃতা দেবার জন্যে গিয়েছিলাম। পুলিশে মিটিঙ করতে দিলে না।"

জ্ঞানের প্রান্তসীমায় দেখা—সেই শুভ্র কেশদাম—গলায় মালা নাই। হাতেও ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা দুলিতেছে না। চোখের প্রসন্ন ায় পরিচয়ের গাঢ়তাকে তিনি বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছেন।

"হাত মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নাও।"

"এখন তো খেতে পারব না।"

"কেন? ওঃ, কাপড় ছাড়ার ব্যবস্থা করে দিই।"

"না না, শুধু কাপড় ছাড়লে হবে না, নাইতে হবে, আরও—" কি বলিতে গিয়া যোগমায়া থামিয়া গেলেন।

"বলুন আর কি চাই? জপ-আহ্নিক করবেন? গঙ্গাজল চাই?"

যোগমায়া মাথা নাড়িলেন।

"আচ্ছা, আমি সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

৪

মধ্যাহ্নের রৌদ্রও এই পরিবেশে কোমল হইয়া আসে। কত কাল পরে এই পরিচিত কলরব—এই পরিচিত প্রিয়স্পর্শ। যোগমায়ার সংসার হইতে এই সংসার সম্পূর্ণ পৃথক্‌; আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, আহার-শয়নের ব্যবস্থায় পর্য্যন্ত কোন মিল নাই, তবু বহু কণ্ঠের হাসি-কান্নায় ভরা—সকাল-দুপুর-সন্ধ্যার স্নেহ-প্রীতি-ভালোবাসার বিনিময়-মুহূর্ত্তে যে সুর কানে আসিয়া বাজিতেছে—সে মন-ভরানো সুর চিরকালের বস্তু। সেই সুরই কি বৈরাগী-চরকে ভুলাইয়া দিয়া খণ্ডিত গৃহ-সীমানায় যোগমায়াকে বন্দিনী করিয়া ফেলিল? বন্ধন মনে করিলে কি আর দিনের পর দিন যোগমায়া এখানে থাকিতে পারিতেন? চর মনের সাম্য আনিয়া দিয়াছে—ঘর তাই পরম কাম্য হইয়া উঠিতেছে।

অন্তরের পরিচয়টা শুধু গাঢ় হইয়াছে, বাহিরের পরিচয় তেমন স্পষ্ট হয় নাই।

প্রৌঢ়া একদিন সে কথা বলিলেন, "আমাদের আর নাম জানাজানিতে লাভ কি ভাই? তাই জিজ্ঞাসা করি নি। কিন্তু ঘরের ঠিকানাটা তো জানা উচিত?"

যোগমায়া বলিলেন, "না ভাই, আর দিনকতক যাক্‌।"

"বাঃ রে, বোন বলছ, অথচ আমাদের হাতের রান্না খাচ্ছ না। সেই স্বপাকে—হবিষ্যির মতো খাওয়া।"

"বিধবার তো ওই খাওয়া। তোমরা কি করো জানি না।"

"আমরা!" প্রৌঢ়া হাসিয়া বলিলেন, "আমরা স্বামী গত হ'লে বিয়েও করি।" একটু থামিয়া যোগমায়ার বিস্মিত ভাব দেখিয়া বলিলেন, "তবে বিয়ে করবার বয়স আর সাধ যদি থাকে।"

"তোমাদের পাপ হয় না?"

"কি জানি ভাই, এতটা বয়স হ'ল—কেমন যে পাপের চেহারা—পুণ্যের চেহারাই বা কেমন, তা তো ধরতে পারি নে। পাপ তো লোকের মনে।"

"মনে তো বটেই, আচার-ব্যবহারেও কম পাপ হয় না। শাস্ত্রে—"

"শাস্ত্র আমি বুঝিনে ভাই। মানুষ শাস্ত্র তৈরি করেছে তার অসুবিধের জন্যে নয় তো।"

"মানুষ নয়—মুনিঋষিরা বিধান দিয়েছেন।"

"তুমি হয়তো বলবে একজন মানুষের অসুবিধে হ'ল বলে তো আর সমাজ-বিধান উল্টে দেওয়া যায় না। সত্যি কথা। কিন্তু অনেকগুলি মানুষে যে বিধানটি অসুবিধে ব'লে মনে করেন—তা কি বদলানো দরকার নয়?"

এ সব লইয়া তর্ক করিবার পটুতা যোগমায়ার নাই। পাপ যাহা—তাহা চিরদিনের পাপ। তাহার মূর্ত্তি কেমন, সে দেখিবার চক্ষু ও সে বিশ্লেষণ করিবার মন তাঁহার নাই। প্রৌঢ়ার কথাগুলি তাঁহার ভালো লাগিল না। চুপ করিয়া রহিলেন।

প্রৌঢ়াও হয়তো সে কথা বুঝিলেন। অন্য প্রসঙ্গ পাড়িলেন, "আজ আমার ছেলে বউমাকে নিয়ে আসছেন—এখনই একবার ষ্টেশনে যাব।"

এই কয়দিন খুঁটিয়া খুঁটিয়া গৃহসজ্জা দেখিয়াছেন যোগমায়া। ঘরের আসবাব-পত্রের মধ্যে টেবিল-চেয়ারের বাড়াবাড়ি। বই-ভর্ত্তি আলমারি। টিপয়, শেলফ্‌ প্রভৃতির ঢাকনিতে লতাফুল-আঁকা কারু-কার্য্য। অনেকগুলি পূর্ণবক্ষ ছবি— সব কয়টিই মানুষের। কোনটা কেশবচন্দ্র সেনের—কোনটা বিবেকানন্দের—আরও নাম-না জানা অনেক মানুষের। রামকৃষ্ণের ছবিখানি ক্ষুদ্র—মাথার উপর হাত রাখিবার ভঙ্গিতে কালীমাতা দাঁড়াইয়া নাই। জপের সময় চক্ষু মুদিয়া ঠাকুর-দেবতাকে স্মরণ করিবার কোন আয়োজনই নাই। একখানি পূর্ণাঙ্গ তৈলচিত্রের সজ্জাপারিপাট্য কিছু বেশী। সাদা তোয়ালে দিয়া প্রত্যহ সেটি মোছা

হয়, প্রত্যহ সেটিতে পুষ্পমাল্য ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। গললগ্নীকৃতবাসে সেই প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে প্রত্যহ সুদীর্ঘ ও সভক্তি প্রণাম নিবেদন যোগমায়া দেখিয়াছেন। নিকটে আসিয়া ছবিটি দেখিবার সৌভাগ্য যোগমায়ার হয় নাই।

প্রৌঢ় চলিয়া গেলে তিনি ছবির নিকটে আসিয়া দেখিলেন—দু'লাইন কবিতা—দিব্য পরিষ্কার ঝরঝরে হাতের লেখা—ছবির মতোই ছোট্ট একটি ফ্রেমে বাঁধানো রহিয়াছে ওই তৈলচিত্রের তলদেশে। লেখা আছে।—

মরণ অমৃত-লোকে জীবনের নব অভ্যুত্থান।
বিচ্ছেদ-বিহীন সঙ্গ নিত্য তুমি করিতেছ দান॥
—সুচরিতা।

"এই দিকে একবার এসো, নন্তু তোমায় প্রণাম করবে।"

এত বয়স হয় নাই যোগমায়ার, দিনের আলোকও প্রখর—ভুল হইবার কথা নহে। নির্ব্বাক-বিস্ময়ে তিনি অপরিচিত যুবক-যুবতীর প্রণাম গ্রহণ করিলেন। সঙ্কুচিত হইয়া একপাশে দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিলেন!

প্রৌঢ়া বলিলেন, "ওটি আমার ছেলে, ওটি ছেলের বউ। ওকে নাম ধরেই ডাকি—রেবা।"

ঠিক কথা, রেবা। অনেক দিনের কথা। কালীঘাটে আঁচলভর্ত্তি পুতুল লইয়া আকাশ-বাদলের দিনে ইহাদেরই বৈঠকখানায় আশ্রয় লইয়াছিলেন যোগমায়া। নিস্তারিণীর জলতৃষ্ণা ও জাতিনাশের ভয়ে তাঁহাদের চুপিসাড়ে পলায়ন। সঙ্কুচিত হইবার কথা। রেবা নামটি ভুলিবার যো কি?

রেবা তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। না পারিবারই কথা। এমন কত লোক তাহাদের বাড়ীর পাশ দিয়া নিত্য আসা-যাওয়া করে, নিত্য তাহাদের বাড়ীতে আশ্রয় লয়। আশ্রিত যে সে-ই শুধু কৃতজ্ঞ মনে আশ্রয়দাতাকে চিনিয়া রাখে; বৃহৎ বটবৃক্ষের নিশানা রাত্রিযাপনকারী পাখীরা কোনদিন ভুলে না, বটবৃক্ষ প্রত্যেক পাখীকে না চিনিলেই বা ক্ষতি কিসের?

এই বাড়ীতে থাকিলেও স্বপাকে আহার তিনি ছাড়েন নাই। ত্রিবেণীতীরের হবিষ্যবিধিই ঠিক চলিতেছে না, দু' একখানা তরকারিও রাঁধিতে হয়। শেষ পাতে একটু দুধ। এসব ব্যবস্থা অবশ্য গৃহকর্ত্রীর পীড়াপীড়িতে যোগমায়াকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। পাছে তাঁহার ছুঁৎমার্গের কোন অনিয়ম হয়—স্বতন্ত্র একখানি ঘর ও বারান্দা গৃহকর্ত্রী তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। বারান্দার দুয়ারটি বন্ধ করিয়া দিলে—বড় বাড়ীর সঙ্গে কোন সংস্রবই থাকে না।

যে জীবনের সঙ্গে কোন পরিচয়ই নাই যোগমায়ার, সেই জীবন যাপন করেন ইঁহারা। দেশের গণ্ডীবদ্ধ আবহাওয়ায় ও সমাজবন্ধনের চাপে এই সর্ব্বত্রব্যাপী স্বাধীন জীবনের ফুল হয়তো এমন পরিপূর্ণ মহিমায় ফুটিবার সুযোগ পাইত না; পশ্চিমের এই বড় শহরে শিথিলীকৃত সমাজের আবহাওয়ায় এই জীবন নিতান্ত বেমানান দেখায় না। এখানকার এই যেন রীতি। লজ্জার অনুশাসনই যেন এই অ-বাঙ্গালী শহরে পীড়নের মতো। প্রয়াগ তীর্থের সুবিস্তীর্ণ চরের মতো—মুক্তির প্রসার এই শহরের অসংখ্য অট্টালিকার সম্পদই বুঝি।

কালীঘাটের সঙ্কীর্ণ পরিসরে যাহা দৃষ্টিকটু মনে হইয়াছিল—সেই তীব্র বিরাগের ভয় যোগমায়াকে এই মুহূর্ত্তে তেমন সঙ্কুচিত করিতে পারিল না। কিছু পরে সঙ্কোচ কাটাইয়া তিনি হাসিমুখে প্রণামের পরিবর্ত্তে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সুচরিতা ডাকিলেন, "রেবা, দোতালায় তোমাদের ঘর ঠিক করা আছে—একটু বিশ্রাম করো গে। নন্তু শোন।"

ছেলে আসিয়া কাছে দাঁড়াইল।

"ক'দিন থাকবি রে?"

"পরশুই ফিরব।"

"পরশু! তা কি করে হবে। পরশু যে আমরা পিকেটিঙে বেরুব।"

"কিন্তু চিঠিতে তুমি তো কিছু লেখ নি, মা।"

"লেখবার দরকার ছিল না বলেই লিখি নি।" একটু ভাবিয়া বলিলেন, "আর লেখবারই বা দরকার কি, কাজ যখন সামনে আসে—তখন তাতে যোগ দিতেই হয়। পাশে পেছনে তাকাবার নিয়ম তো আমাদের নেই।"

"রেবাও কি পিকেটিং করবে মা?"

"না, এখনও ওর ট্রেনিং পাওয়া দরকার।"

"ও কিন্তু জোর করে চলে এলো—কাজে নামবে বলে।"

"একদিন তো কাজে নামতেই হবে, কিন্তু আজ নয়।"

"কেন আজ নয়, মা? শুভকাজে দেরি করা উচিত নয়।"

"না নন্তু, আজ নয়। আজ আমরা সবাই যদি জেলে যাই—"

কথাটা আর সম্পূর্ণ করিলেন না সুচরিতা। দেওয়াল-বিলম্বিত সেই পূর্ণাঙ্গ তৈল-চিত্রটির পানে চাহিয়া রহিলেন।

ছেলে বলিল, "গেলামই বা জেলে। এই বাড়ী ঘর এ-ও কোনদিন থাকবে না। তুমি যা শিখিয়েছ ছেলেবেলা থেকে—"

"না না, আজ নয়। ঘর গড়ার কথা তোমাদের কোন দিন বলি নি বটে, ওঁর নিষেধ ছিল, কিন্তু—"

ছেলে মায়ের পানে চাহিয়া হাসিল, "মা, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মন তোমার নরম হয়ে পড়ছে।"

সুচরিতা ম্লান হাসিয়া বলিলেন, "তাতো হয়ই বে! দেহের শক্তি কমে—মনের শক্তিও কমে। যাঁরা বলেন দেহের শক্তি আর মনের শক্তি দু'টো আলাদা জিনিস—তাঁদের কথা আমি ভুল বলি নে, কিন্তু দেহের শক্তি কমলে মন খানিকটা দুর্ব্বল হয় বইকি। আজ বেশ বুঝছি।"

"মিশিরজীকে বাড়ী দেখা-শোনার ব্যবস্থা করে দাও।"

"তাই দেব। তোদের জন্যেই তো মাঝে মাঝে ভাবি। বেশ, রেবাকে আর একবার আমি জিজ্ঞাসা করি, সে যদি বলে—"

"আমি ডাকছি।"—বলিয়া ডাকিবার উপক্রম করিতেই সুচরিতা বাধা দিয়া বলিলেন, "এখন নয়, সবে এসেছে—বিশ্রাম করুক। পরামর্শ করবার জন্যে পুরো একটি দিন আছে।"

বিশ্রাম! হাসিয়া নন্তু আর কোন কথা বলিল না। তর্ তর্ করিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

যোগমায়া বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছেন। সুচরিতা তাঁহার কাছে আসিয়া কহিলেন, "ভাই, একটা অনুরোধ করব— রাখবে?"

"কি বলবে?"

"পরশু আমরা পিকেটিং করতে যাব, তাতে আমাদের জেল হতে পারে। ছ' মাসের কম তো নয়। সেই ছ' মাস তুমি এখানেই থাকোনা কেন?"

যোগমায়া ব্যাকুল কণ্ঠে কহিলেন, "কিন্তু সাধ করে জেলে যাবে কেন তোমরা? সেখানে শুনেছি চোর-ডাকাতরা থাকে।"

হাসিয়া সুচরিতা উত্তর দিলেন, "ঠিকই শুনেছ। কিন্তু আমরা তো চুরি-ডাকাতি করে জেল খাটব না, ভারতের মুক্তির জন্যে যুদ্ধ করব শুধু।"

"তা, তোমাদের অস্ত্র কই?"

"আছে। তবে তলোয়ার, কামান, বন্দুক আমরা ব্যবহার করি নে। আমাদের যুদ্ধ নিরস্ত্র। মানে কেউ যদি আমাদের মারে, আমরা মার খেয়ে যাব, তাদের গায়ে হাত তুলব না।"

"তাই কি হয়?"

"আগে হ'ত না—এখন হয়। অস্ত্রের বল হ'ল পশুবল—আর আত্মার বল হ'ল দেববল। কোন্‌টা বড় ভাই?"

"দেববল।"

"তবে? দেববলের জয় হবেই। তুমি ভেব না।" একটু থামিয়া বলিলেন, "তুমি মহাত্মা গান্ধীর নাম শুনেছ?"

যোগমায়া মাথা নাড়িলেন। বহু দিন পূর্ব্বের কার্ত্তিকীপূর্ণিমার একটি ছবি তাঁহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। সে ছবি মাঝে মাঝে ফুটিয়া উঠে। শীর্ণকায় কালো ছেলেটি—মুখে তার প্রশান্ত নির্ম্মল হাসি—মা বলিয়া যোগমায়ার হারানো ছেলেটির স্থান ধীরে ধীরে অধিকার করিতেছে—এমনই সময়ে গঙ্গার দক্ষিণ দিকের সীমাহীন পথের প্রান্তে সে অদৃশ্য হইয়া গেল। ইচ্ছা করিয়া নহে—অন্যের তাড়নায়। সুচরিতার ঘর-ভাঙার মন্ত্রণার মধ্যেও সেই বিগত দিনের বিভীষিকা। যে আগুনের আঁচ সেদিন গায়ে লাগিয়াছিল—সেই অগ্নিসৃষ্টির তথ্য আজও যোগমায়া বুঝিতে পারেন না।

"মহামানব গান্ধী—এই যুগের কানে 'অভী' এই মন্ত্র দিয়েছেন। অন্যায় না করে কেন আমরা মানুষকে ভয় করব ভাই? মানুষের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ তো ভালোবাসার।"

ওপারের গঙ্গাতীরের সুউচ্চ পারে তখন যোগমায়ার দৃষ্টি নিবদ্ধ। সেই ছেলেটি কি সাদা উত্তরীয় কাঁধে ফেলিয়া, বিশৃঙ্খল চুল উড়াইয়া, শীর্ণ হাত দু'খানি আন্দোলিত করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে? মাথার উপর কালো আকাশ আর নাই; পেঁজা তুলার মতো সাদা মেঘে হুড়াহুড়ি করিয়া ছেলেটির আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে।

শরতের বিস্মৃতপ্রায় চেহারার সঙ্গে নন্তুর আশ্চর্য্য মিল। প্রিয়দর্শন নন্তু ততটা রোগা নহে, কালো তো নহেই। চুলের পারিপাট্য আছে—বেশের পারিপাট্য আছে, চাল-চলনের মধ্যে সাচ্ছল্যের মসৃণতা চোখে পড়ে—তবু কথার সুরে শরতের কণ্ঠস্বরের খানিকটা যেন ধরা পড়ে; আর তেমনই বড় বড় চোখের স্বপ্ন-মোহভরা দৃষ্টি। এই

ছেলেরা যুগে যুগে এমন স্বপ্ন দেখিয়া থাকে হয়তো। বিবাহ এদের কাছে হয়তো বা পদ্মপাতার উপর জলের মতো। যতক্ষণ জলবিন্দু পাতার উপরে থাকে—ততক্ষণই শোভা; না থাকিলেও পাতার দাগ বা সিক্ততার চিহ্ন থাকে না।

কখন সুচরিতা চলিয়া গিয়াছেন—যোগমায়া জানেন না। চমক ভাঙিল ক্লক্ ঘড়িটার টং টং শব্দে। কাঁটাগুলা আস্তে আস্তে ঘুরিয়া কালের চক্রটিকে সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। টিক্ টিক্ করিয়া ঘড়ি অনবরত কি কথা বলিতেছে। ঘড়ির লেখা যোগমায়া আজও পড়িতে পারেন না।

রাত্রির অন্ধকারে নিজের ঘরে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন যোগমায়া। বৈরাগ্য-বাঞ্ছিত প্রয়াগের সুবিস্তীর্ণ তীরভূমি নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, ওপারে ঝুঁসির মঠাভ্যন্তরেও পুঁথি-পড়ার সুরটুকু আর প্রাণের পিপাসা পরিতৃপ্ত করে না। সেতু-বন্ধনে আবদ্ধ চরভূমি ক্রমশঃই সঙ্কীর্ণতর হইতেছে। মাথার উপরের আকাশ নামিতে ঘরের ছাদে আসিয়া ঠেকিয়াছে—চারি পাশের দেওয়ালে সঙ্কুচিত হইয়া চরভূমি যেন বাসগৃহে রূপান্তরিত হইয়াছে। নদীর ধারে বসিয়া নুড়ি সংগ্রহ করিয়াছেন এতকাল? প্রয়াগে বৎসরে কত পুণ্য-তিথিই আসে—কত মেলা বসে। কুটীরে বসিয়াও যোগমায়া সংগ্রহ করিয়াছেন—ছোট মাটির পুতুল, চুপড়ি, হাতপাখা, সিঁদুর-কৌটা, নামাবলী, পাথরের ছোটবড় বাটি অনেকগুলি, রুদ্রাক্ষ, পদ্মবীজ ও তুলসীর মালা, গোপী তিলকের মাটি, ছোট শ্বেত চামর···, ক্ষুদ্র ঘরখানি এই সব সংগ্রহে ভরিয়া উঠিয়াছে। বৈরাগ্য বৈশাখী বায়ুর মতো সহসা উঠিয়াছিল। দু-দণ্ডের ঝড়-তুফান দণ্ড কয়েকের মধ্যেই শেষ হইয়াছে—এখন সংগ্রহের পালা। ভিতরে গিরিমাটির রং কোনদিনই ধরিতে পারে নাই।

ওপাশের ঘরে আজ যাহারা পরিপূর্ণ সংসার ছাড়িয়া যাইবার আয়োজনে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে—তাহাদের জন্য এত ব্যথা মনের মাঝে জমা হয় কেন? এ ব্যথা তাহাদের জন্য, না নিজের অফুরন্ত সংগ্রহ-বৃত্তির অপূর্ণতার পানে চাহিয়া এই কাঙালপনা? সুচরিতা দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা নহেন—নগ্নিকা সংহারিণী মূর্ত্তি কালিকা। উঁর খড়্গের উদ্ধত ভঙ্গিমার অন্তরালে বরাভয়যুক্ত শ্রীকর অদৃশ্য। পায়ের তলায় মঙ্গলমূর্তি শিবকে দলন করিয়াই সর্ব্বনাশিনীর কত যে পরিতৃপ্তি।

"এ কি মাসীমা, আপনার চোখমুখ শুকনো কেন? অসুখ করেছে নাকি?"

"না মা, কাল রাতে ভালো ঘুমুতে পারি নি।"

রেবা হাসিয়া বলিল, "আমরাও ঘুমুতে পারি নি। মার কাছ থেকে অনুমতি আদায় করে যা আনন্দ হ'ল।"

যোগমায়া বলিলেন, "তোমার শাশুড়ী যাই করুন—এই কচি বয়সে ও রকম কাজে তোমার না নামাই উচিত।"

"কেন নামব না, মাসীমা? বুড়ো হ'লে তখন কি আর কাজ করতে পারব?"

"জেলে যাওয়ার চেয়ে নিজের ঘর-সংসার দেখাতেও পুণ্যি আছে।"

"ঘর কোথায়, মাসীমা? সে জায়গা ছোট—এ জায়গা খানিকটা বড়—এই তো? পুণ্যি কোথাও নেই মাসীমা—ওটা নেহাৎ মনভুলানো কথা।"

"কি বলছ?"

"যে কাজ করে মনে আনন্দ হয়—তাই তো পুণ্য।"

যোগমায়া তর্ক তুলিয়া মেয়েটিকে নিরস্ত করিবার প্রয়াস করিবেন, এমন সময়ে সুচরিতা আসিয়া কহিলেন, "রেবা আজ সকাল সকাল তৈরী হয়ে নিতে হবে। আনন্দভবনে মহিলা-কর্ম্মীরা সব আসবেন।"

যোগমায়ার পানে চাহিয়া কহিলেন, "কি ভাই, কিছু বলবে?"

মুখ নামাইয়া যোগমায়া বলিলেন, "আমি তো তোমার সম্পত্তি আগলে পড়ে থাকব না, ভাই। দু'চার দিনের মধ্যেই আমাকে দেশে ফিরতে হবে।"

সুচরিতা হাসিমুখে বলিলেন, "বেশ তো, ফিরে যাবে। তোমার যাতে অসুবিধে হয়, সে কাজ তুমি করতে যাবে কেন?"

"কিন্তু এই বাড়ী-ঘরের ভার কার ওপর দিয়ে যাব?"

"কেন মিশিরজী রইলেন। না-হয় একটা তালা ঝুলিয়ে দিও।"

"তাই কি হয়?"

"কেন হবে না, সমুদ্রে যাদের বাস, শিশিরে তাদের ভয় করলে চলবে কেন ভাই? আজ এই বাড়ী ঘর আমার আছে—কাল সরকারের হতেই বা কতক্ষণ?" সুচরিতা হাসিমুখে জবাব দিলেন।

যোগমায়া সমস্ত আবেগ একত্রিত করিয়া সুচরিতার দু'খানি হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন,

"না ভাই, এই সর্ব্বনাশের কথা আর ব'লো না। তোমার হাসি দেখে আমার মন কেমন করে।"

"কেন?"

"কেন? ঘর না থাকলে মেয়েমানুষ কি নিয়ে বাঁচবে!"

"বাঁচবে ভাই—বাঁচতে হবে তাদের অন্য রকমে।—

না জাগিলে সব ভারতললনা

এ ভারত কভু জাগে না জাগে না।"

প্রস্তরমূর্ত্তির মতো যোগমায়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। রেবা কখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছে—কখন চলিয়া গিয়াছে; মনে মনেও আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করিবার অবসর তিনি পান নাই।

৫

তবু যোগমায়া যাইতে পারেন নাই। পরের ঘরের কোথাকার সঞ্চিত মমতা তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। কত দিন পরে তাহারা আসিবে ঠিক নাই। সুদীর্ঘ চারি মাস—ছয় মাস—পূজা আসিয়া চলিয়া যাইবে—তখনও কি যোগমায়ার এই দায়িত্বের শেষ হইবে না? কারাবরণ উহারা করে নাই, যোগমায়াকেই বন্দিনী করিয়া গেল বুঝি! বিমলের চিঠি আজকাল ঘন ঘন আসে। তীর্থযাত্রীর দল দেশে ফিরিয়াছে—মায়ের জন্য তাহারও ভাবনা বাড়িয়াছে। সেই বাড়ীতে মা কত দিন পরে ফিরিবেন—কত দিনে তাহারা স্বস্তি লাভ করিবে।

লতার কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে তাঁহার দুর্জ্জয় অভিমান ও সে অভিমানের পরিসমাপ্তি। বধূকে লইয়া তুচ্ছ সাংসারিক খুটিনাটির সংঘর্ষে যে অশান্তি জমা হইতেছিল দিন দিন—আজ সংসার হইতে এত দূরে বসিয়া নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে যোগমায়া সেই তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাগুলির বিশ্লেষণ করিতে থাকেন। সুচরিতাও শাশুড়ী—কিন্তু রেবার তিনি শাশুড়ী নহেন—মা। শাশুড়ীর কাছে অসঙ্কোচেই রেবা আব্দার করে, জিদ করিয়া শাশুড়ীকে বশ্যতা মানায়, স্বামীর সম্মুখে মাথায় কাপড় তুলিয়া দিয়া লজ্জায় কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া আনে না। এইগুলি অমার্জ্জনীয় অপরাধ। কিন্তু ঠিক হিন্দু-সংসার বলিতে যে নিয়ম-শৃঙ্খলা-ঘেরা সংসারটিকে যোগমায়া আজীবন জানেন—ইহা তাহা হইতে বিভিন্ন! বিভিন্ন বলিয়াই যে সব দিক দিয়া অসুন্দর, তাহা নহে। এ সংসারেও শুচিতা আছে—আনন্দ আছে। পরিষ্কার দিনের আলোয় সব দিক হইতে জীবনীরস আহরণ করিবার শক্তি এই সংসারও রাখে। দূরে দাঁড়াইয়া এই সংসারকে না মানার চেষ্টা হয়তো সহজ, বর্ষার রাত্রিতে বাহিরের অন্ধকারকে যেমন ভয়-ভয় লাগে কিন্তু সত্যই তো মনের অলীক ভয় চিরকালের সত্যকে চাপিয়া রাখিতে পারে না।

আশ্চর্য্য, সময় কাটাইবার মন্ত্র চিরকালই যোগমায়া জানেন। বাঁধামাহিনার চাকর ঘরের যে ধূলা ঝাড়িয়া যায়, তাহা যোগমায়ার মনঃপূত হয় না। নূতন করিয়া তিনি গৃহ-সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। ছবির ফ্রেমগুলি ফরসা তোয়ালে দিয়া নিত্য মুছিয়া দেন, বড় অয়েল-পেন্টিংটায় ফুলের মালা টাঙাইবার অবসর না মিলিলেও, একগোছা ফুল ফ্রেমে আটকাইয়া দেওয়া নিত্য পদ্ধতির মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। অকারণে বইগুলি হয়তো মুছিয়া দেন। সেগুলি তাঁহার নিপুণ করের সোহাগ-স্পর্শ পাইয়া ঝক্ ঝক্ করিয়া হাসিতে থাকে। সকালে দুয়ারে গঙ্গাজল না ছিটাইলেও—সন্ধ্যায় ধুনা জ্বালার কাজটি করিতে ভুল হয় না। শাঁখ বাজাইবার জন্য মাঝে মাঝে প্রবল ইচ্ছা হয়, কিন্তু ও-জিনিসের অভাব শুধু তাঁহাকে পীড়া দেয়। প্রয়াগের এই পল্লীতে সন্ধ্যার আগমনী নিঃশব্দেই সুরু হয়। বোতাম টিপিলে আলো জ্বলে—উনুনের ধোঁয়া এত গাঢ় যে, শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম। তরল ধুনার ধোঁয়া শুধুই সুগন্ধ বিস্তার করে না—সহজে নিশ্বাস লইবার প্রশান্তিতে মনটি পর্য্যন্ত স্নিগ্ধ করিয়া তুলে। মিশিরজীকে বলিয়া একটি তুলসীর চারা তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। উদ্যানের এক পার্শ্বে সযত্ন-জল-সিঞ্চনে সেটি দিন দিন স্বাস্থ্যবান হইয়া উঠিতেছে।

দুপুরের অবসরে বিমল ও লতার চিঠিগুলি লইয়া তিনি পড়িতে বসেন।

চিঠি পড়িতে পড়িতে যোগমায়া কখনও হাসেন কখনও বা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। চিঠি তো নহে, ব্যাকুল বাহু বাড়াইয়া সেই চিরজীবনের কাম্য ভূমি কোলের পানে টানিতে থাকে। সেই স্বপ্নে দুপুর কাটিয়া যায়, রাত্রি কাটিয়া যায়। এ বাড়ীর সযত্ন সেবায় নিষ্ঠা তাঁহার প্রগাঢ় হইতে থাকে।

প্রয়াগে তিনি নিত্য স্নান করেন। নিত্য-স্নান কালে যাত্রীর ভিড়—পাণ্ডার কলহ—বন্শীবাবার বাঁশী ও বালু লইয়া ঢিবি তৈয়ারি করা—সবই তাঁহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। আইজাক

সেতু কাঁপাইয়া অজগরের মতো দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে সুদীর্ঘ মালগাড়ীর শ্রেণী গঙ্গা অতিক্রম করে—ঝুঁসির মঠের উচ্চতা দূর হইতে মনোরম তপোবনের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলে, কিন্তু এসবের অর্থ আজ ভিন্নতর। আজ জীবনের কলরব ছাপাইয়া ঝুঁসির অঙ্গুলি-সঙ্কেত, আকাশের নক্ষত্রের রহস্য বা বনশীবাবার বাঁশী, কোনটাই অনিত্য-জীবনের কথা বার বার স্মরণ করাইয়া দেয় না। চিতার ধূমে ও অগ্নিশিখায় মনের কামনাগুলি বৈরাগ্যের ধূসর আবরণে মিশিয়া যায় না। এই পুণ্য সঞ্চয়ের পিছনে সংসারের সুশীতল কোলে জুড়াইবার যে বিচিত্র ব্যবস্থা আছে—তাহারই মধ্যে হাসি-কান্নায় জড়াইয়া বাঁচিয়া থাকাটাই বুঝি জীবন। সেই জীবন-তরু শাখা-প্রশাখায় শত দুরন্ত বাহু মেলিয়া আর সব কামনাকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে দ্রুত।

"...মা, তুমি না ফিরে এলে বাড়ী আমাদের ভালো লাগছে না। কবে ফিরবে? আমাদের চেয়ে তীর্থই কি তোমার বড় হ'ল?..."

কঠিন অভিযোগের উত্তর দিবার সাধ্য যোগমায়ার নাই। তোমরাই যে আমা'র সবচেয়ে প্রিয়তম। তোমাদের শান্তির জন্যই তো তোমাদের ছাড়িয়া এত দূরে আমার আসা। আমার সংসারে তোমাদের প্রতিষ্ঠা—এর চেয়ে বড় সাধ আমার কোন্ দিনই বা ছিল?

"...মা, আপনি আমায় ক্ষমা করিয়া গিয়াছেন, এখন বুঝিতেছি—সে ক্ষমা আন্তরিক নয়। এই নির্জ্জন ভিটায় মাসের পর মাস একলা থাকিয়া আমার ভয় হয় না, কিন্তু মন কেমন করে। যে প্রণাম তুলসীতলায় আপনার রাখিবার কথা—যে প্রদীপ আপনার হাতে জ্বলিলে বেশী উজ্জ্বল দেখায় —কিন্তু আপনি কি আসিবেন না? না আসিলে আজীবন এই শাস্তি আমায় বহন করিতে হইবে।"

পাগলী মেয়ে! এ কি শাস্তি, না আশীর্ব্বাদ। প্রণামের মন্ত্র মেয়েছেলের ভুল হইবে কেন? সে মন্ত্রের সঙ্গে তাহাদের যে জন্মগত সংস্কারের মিল আছে, তাহাদের হাতের আলো জ্বলিবার কালে কখনও কি কম-জোরী হইয়াছে?

যোগমায়া হাসেন। মনে মনে সেই দণ্ডে সেই ভিটায় ফিরিয়া গিয়া বধূকে কোলের কাছে টানিয়া অশ্রুজলের অভিষেকে আনন্দ-আপ্লুত করিয়া তুলেন।

"তুমি যে আমার বড় আদরের বিমলের বউ, তোমায় শাস্তি দেওয়া মানে নিজেকেই দুঃখ দেওয়া।"

এক মাসে ক'টি দিন, ক্যালেণ্ডারের তারিখে যোগমায়া প্রত্যহ একটি করিয়া দাগ দেন। যে-দিন শেষ হইয়া গেল—তাহারই অভ্রান্ত হিসাব।

দু-খানি পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিবার পর এক দিন বিমলের আর একখানি পত্র আসিল শ্রাবণ মাসের শেষই হইবে তখন। পশ্চিমের শহরে বর্ষার উপদ্রব নাই। প্রখর রৌদ্রভরা আকাশ সারাদিন অগ্নি বর্ষণ করে, ভোর রাত্রিতে গায়ে কাপড় টানিয়া না দিলে শীত-শীত বোধ করে। রুক্ষ প্রকৃতি সর্ব্বদাই মানুষকে শাসন করিতেছে। বাংলায় তিনি স্নেহের আতিশয্যে কোমলা। নূতন মেঘে আকাশ কোমল, পায়ের পাতা ডুবাইয়া নরম সবুজ ঘাস জন্মিয়াছে—বৈশাখের চিকণ পাতাগুলি পুরাতন ও সতেজ হইয়া প্রত্যেক গাছকেই ঢাকিয়া দিয়াছে। ভিজা কাঠ ও ভিজা কাপড় শুকাইতে দিয়া মানুষের মন সর্ব্বদাই সশঙ্কিত হইয়া থাকে। ডোবায় জল জমিলে ব্যাঙেরা সারারাত্রি মহোৎসবে মাতিয়া চীৎকার করে। ঘটির চাল-কড়াই ভাজা ভালো করিয়া ঢাকা না দিলে মিয়াইয়া যায়। সঞ্চিত কলাই-মুগে পোকা ধরে, হাওয়া ভিজে স্যাঁতসেঁতে, সমস্ত প্রকৃতির মধ্যেই অদ্ভুত কোমলতা।

বাহিরের ঘরে মিশিরজী তুলসীদাসের রামায়ণ পড়িতেছে :—

শ্রীরামচন্দ্র কৃপাল, নব কঞ্জলোচন,
কঞ্জমুখকর, কঞ্জপদ কঞ্জারুণম্।

সুরটিই শুধু মিষ্ট—ভাষার মধ্য দিয়া ভাব সেখানে মিতালী পাতায় না। কাজেই কান ছাড়া মনের সংযোগ সেখানে নাই।

তাঁহার গ্রামের সন্ধ্যাবেলায় রামায়ণের আসর মনে পড়ে। বিস্তৃত উঠানের এক প্রান্তে চারিখানি বাঁশ বা নোনা আতার মোটা ডাল পুঁতিয়া তাহার মাথায় মোটা বিছানার চাদর বাঁধিয়া চন্দ্রাতপ তৈয়ারি হইয়াছে। তাহারই তলে পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়া চারি জন ধুয়াদারকে দু'পাশে লইয়া নধর-কান্তি গৌরবর্ণ ক্ষুদিরাম ভাট রামায়ণ-গান আরম্ভ করিয়াছেন। সন্ধ্যার শঙ্খ বাজিবার পালা শেষ হইলেই গানের আসর জমিবে। সাদা মল্লিকা বা টগর ফুলের মালা গলায়—হাতে শ্বেত চামর—পরণে কাষায় বস্ত্র ও গলদেশে কাষায় উত্তরীয়ের অন্তরালে শাদা ধবধবে পৈতাটি বাম স্কন্ধদেশের

উপর হইতে দক্ষিণ বাহুর নীচে পর্য্যন্ত বিলম্বিত। কপালে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা। ভাট মহাশয়ের বড় চুলে চূড়া বাঁধা। চূড়া বেড়িয়া ছোট একগাছি মালাও শোভা পাইতেছে। সম্মুখের জলচৌকিতে রক্ষিত বড় পিতলের থালে কাঠাখানেক (আড়াই সের) চাল—তদুপযুক্ত ডাল, মশলা, মিষ্ট, আনাজ-পাতি ও একখানি নববস্ত্র বা গামছা দিয়া গৃহস্থ সিধা সাজাইয়া দিয়াছেন। তা ছাড়া মূল গায়কের সম্মুখে আর একখানি থালা পড়িয়া আছে, তাহাতে প্রণামীর পয়সা জমিতেছে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা মায়েদের নিকট হইতে পয়সা লইয়া হাসি-মুখে গায়কের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। হাসি-মুখে তাহাদের হাত হইতে পয়সা লইয়া গায়ক ঠুন করিয়া থালায় ফেলিতেছেন এবং ছেলে বা মেয়েদের মাথায় চামর বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। গায়কের হাতে পয়সা তুলিয়া দিবার জন্য ছেলেদের কি হুড়'হুড়ি! কৃত্তিবাসের অমর পয়ার ছন্দে গায়ক রামায়ণ-কাহিনী আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছেন। দোয়াররা ধুয়া ধরিয়াছে :—

'রামপদপঙ্কজ ভজরে মন।'

যুক্তপ্রদেশের ভূমিতে বসিয়া এমনই করিয়া বাংলার স্বপ্ন দেখেন যোগমায়া।

ঠিকানা খুঁজিয়া বিমল এক দিন তাঁহার কাছে আসিল।

"কে রে—বিমল! কি করে এলি?"

প্রণাম করিয়া বিমল বলিল, "যে করেই আসি —তুমি তো গেলে না।"

"বউমা একলা রইলেন তো?

"তা কি করব—তোমার অনুমতি না পেলে সে ভিটে ত্যাগ করবে না।"

"পাগল!" বড় তৃপ্তির হাসি হাসিলেন যোগমায়া। একটু থামিয়া বলিলেন, "বড্ড রোগা হয়ে গিয়েছিস, রং যেন পুড়ে গেছে।"

"যাবে না কেন, আমাদের কথা আর কে ভাবে বলো?"

যোগমায়ার বুকে অকস্মাৎ সপ্তসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

"মা!"

"বালতিতে জল আছে—হাত-পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হ। আমি আসছি।"

যোগমায়া আর আপনাকে সংবরণ করিতে পারিতেছেন না। এত দীর্ঘ দিন পরে দেখা—ঝড় থামিয়া সমুদ্র শান্ত হইয়াছে। সে সমুদ্রে অকস্মাৎ পূর্ণিমার জোয়ার লাগিলে তরঙ্গ-বেগকে সংযত করা বুঝি এমনই কঠিন। বিমলের এই বিবর্ণ মুখ—অনুযোগভরা কথা—এ সহ্য করিবার মতো মনোবল যোগমায়ার নাই। না পলাইয়া উপায় কি?

রেকাবি ভরিয়া জলখাবার লইয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন।

বিমল বলিল, "আজই তোমায় যেতে হবে, মা।"

"আজ?" শুষ্ক কণ্ঠে প্রশ্ন করিয়া যোগমায়া বিমলের পানে চাহিলেন।

"হ্যা। মাত্র দু'টি দিন ছুটি আছে। কাল গেলেও চলবে। কিন্তু বিশ্রাম না নিলে ভারি কষ্ট হবে।"

"কিন্তু আজ কি করে যাই বল্? এই সব কার হাতে বুঝিয়ে দিয়ে যাব?"

"কেন, যাঁদের বাড়ী তাঁরা বুঝে নিন না।"

"তাঁরা? কপালখানা আমার! তাঁরা কি এখানে আছেন? স্বদেশী করতে গিয়ে জেল হয়েছে যে?"

জেল! এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া মায়ের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বিমল বলিল, "তোমার পরণে ওখানা কিসের কাপড়, মা?"

"খদ্দরের। গিন্নী যে দিন জেলে যান—আমায় এক জোড়া কাপড় দিয়ে বললেন, 'এইটি পরলেই আমাকে তোমার মনে পড়বে, ভাই!' তাই রোজ পরি। এমন দেবীর মতো মানুষ—তুই দেখতে পেলি নে তাঁকে।"

বিমল বলিল, "দেবী দেখবার সৌভাগ্য আমাদের মেলে না, মা।"

বিমলের শুষ্ক স্বরে যোগমায়া অবাক হইয়া ক্ষণকাল তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। পরে ঈষৎ অনুযোগভরা কণ্ঠে কহিলেন, "তুই জানিস নে বিমল, তাঁকে দেখবার ভাগ্য সকলের হয় না। বয়সে তিনি আমার চেয়ে হয়তো বড়ই হবেন, ও ভাবে কথা বললে আমার বড্ডই লাগে।"

বিমল হাসিয়া বলিল, "তুমি ভুল করছ কেন মা? ওঁদের সঙ্গে আমাদের যে সাপে-নেউলের সম্পর্ক। পুলিশে আমি চাকরি করি যে।"

"তাই বলে মাথা কিনেছিস আর কি!" ধমকের সুরে যোগমায়া বিমলকে নিরস্ত করিলেন।

"নে, জলখাবার খেয়ে নে।"

"নিচ্ছি। কিন্তু মা, এখানে আর একদণ্ডও থাকা তোমার চলবে না। হিউয়েট্ রোডে আমার বন্ধুর বাড়ী জিনিসপত্তর আছে, তোমাকে সেইখানে যেতে হবে।"

"আচ্ছা যাব'খন। তুই খেয়ে নে তো আগে।"

হাসিতে হাসিতে বিমল বলিল, "ছেলেবেলায় কাক দেখিয়ে যেমন দুধ খাওয়াতে—তেমনি ধারা করছ না তো?"

"কাকে-বকে ভোলবার ছেলেই বটে তুমি! যেটুকু দুধ কাক ডেকে ঝিনুকে করে তোমায় খাইয়েছি—বমি করে সবটুকু না তুলে ছাড়তে কিনা!"

"ছেলেবেলার অভ্যেস এখনও আমার আছে!"

"খুব বাহাদুর! মাকে জব্দ করবার ফন্দী তোমাদের বলে দিতে হয় না।"

"আর ছেলেদের জব্দ করতে মায়েরাও এমন তীর্থ খুঁজে নেন—"

হাসি-কৌতুকের মধ্য দিয়া জলযোগ শেষ হইল। বিমল বলিল, "এইবার গুছিয়ে নাও।"

"দাঁড়া, ভাত চাপিয়ে এলাম এই মাত্তর—ধরে পুড়ে না যায়।"

যোগমায়া ফিরিয়া আসিলে বিমল বলিল, "কিন্তু এখানে তো আমি খেতে পারব না, মা।"

"কেন?" একটু থামিয়া ম্লান হাসিয়া বলিলেন, "পুলিশে চাকরি করো বলে—"

"সেটাও কারণ, কিন্তু সবটুকু নয়। বন্ধু আমায় নেমন্তন্ন করেছেন।"

"বন্ধুর নেমন্তন্নটাই তোমার বড় হ'ল!" বিমলের নত মুখের পানে চাহিয়া যোগমায়া বলিলেন, "বেশ, তবে সেইখানেই খাও গে।"

"তুমি যাবে না?"

"না।"

"এই তো রাগ হ'ল! তোমায় নিতে এলাম সাত সমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে—আর তুমি—"

"আমি তোমায় আসতে লিখি নি।"

"মা!" সাদরে যোগমায়াকে জড়াইয়া ধরিয়া বিমল বলিল, "সত্যি বলো নি? সত্যি না?"

"ছাড়—ছাড়, পাগল দেখ!" হাসিয়া ফেলিলেন যোগমায়া।

আহার শেষে বিমল বিশ্রাম করিতে রাজি হইল না। "আজই যাব আমরা, গুছিয়ে নাও।"

যোগমায়া বলিলেন, "না রে, ওদের সংসার, ওদের হাতে না তুলে দিয়ে আমি যেতে পারব না।"

অভিমান-আহত কণ্ঠে বিমল বলিল, "আমি মিছেই এতদূর ছুটে এলাম!"

"কি করব বাবা? পরের সংসার বলে তো ভাসিয়ে দিতে পারি নে।"

"তুমি জানো মা, এদের সংসারে তুমি আছ জানলে আমার চাকরির ক্ষতি হতে পারে?"

শঙ্কিত কণ্ঠে যোগমায়া বলিলেন, "কেন রে?"

"খবর তো কিছু রাখো না।"

খানিকক্ষণ দুই জনেই চুপচাপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে ক্ষুদ্র একটি নিশ্বাস ফেলিয়া যোগমায়া বলিলেন, "খবর রাখি না বটে, তোর খবরটা তো রাখি। তোর শুধু চেহারাই বদলায় নি খোকা।"

বিমলের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ওষ্ঠের কম্পন-আবেগে বঙ্কিম রেখা ফুটিল, কিন্তু সে কোন কথা বলিল না।

যোগমায়া অতটা লক্ষ্য করিলেন না, বলিতে লাগিলেন, "তুই এক দিন আমার হাতে রাখী পরিয়ে দিয়ে কি বলেছিলি—মনে আছে?"

মাথা নাড়িয়া বিমল বলিল, "না। ছেলেবেলার খেয়ালে কবে কি করেছি—মনে নেই।"

"আমার মনে আছে। পাতলা বিলিতী কাপড় ছাড়িয়ে—মোটা গুণচটের মতো একখানা কাপড় দিয়েছিলি আমায় পরতে।"

অস্থির হইয়া বিমল উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "আজ তাহ'লে যাবে না?"

যোগমায়া হাসিয়া বলিলেন, "আজ থাক না। অন্ততঃ একটা খবর পাঠিয়ে দিই তাঁদের।"

"খবর পাঠাবে জেলে তো? নৈনী জেলে? না মা, তার চেয়ে তুমি থাকো। আমি বরঞ্চ অন্য ব্যবস্থা করব।"

"কিসের ব্যবস্থা রে?"

নত মুখেই বিমল বলিল, "আমাদের যখন তুমি ভালোবাসো না—তখন নাই-বা শুনলে সে কথা।"

তাহার কাঁধের উপর ডান হাতখানি রাখিয়া সস্নেহকণ্ঠে যোগমায়া বলিলেন, "তবু শুনিই না।"

"না, শুনে কাজ নেই।" মুখ ফিরাইয়া বিমল মনে মনে হাসিল। মায়ের এই দুর্ব্বলতাটুকু সে চিরকাল পরম আনন্দে উপভোগ করিয়াছে।

যোগমায়া ব্যাকুল কণ্ঠে কহিলেন, "আবার দুষ্টুমি আরম্ভ করলি খোকা? জানিস, এখনও তোর কান মলে দিতে পারি।"

"তাই দাও না, মা। তোমার ওপর জোর করব—সেটুকু দাবিও যে খুঁজে পাচ্ছি না আজ।"

যোগমায়া পুনরায় বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে বিমলের পানে চাহিয়া বলিলেন, "কি বলছিস ?"

"বলছিলাম"—একটু ইতস্ততঃ করিয়া মুখ নামাইয়া সে বলিল, "তোমার অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল—বাপপিতামহের ভিটেয় তাঁদের প্রথম বংশধর যেন ভূমিষ্ঠ হয়।"

"খোকা!" আনন্দে যোগমায়া প্রায় আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। চোখ দিয়া তাঁহার জল গড়াইয়া পড়িল।

"কাঁদছ কেন, মা ?"

"ওরে, অনেক কথা আজ আমার মনে পড়ছে।" টপ টপ করিয়া অবাধ্য অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

খানিকটা পরে শান্ত হইয়া চক্ষু মুছিয়া কহিলেন, "আজ রাত্তিরে গাড়ী তো ?"

"হ্যাঁ মা। কিন্তু এ সংসার ফেলে তুমি যাবে কি করে ?"

"যাব—ওরে যাব। আর থাকতে পারব না আমি।" শুষ্ক চোখের কোল পুনরায় চক্ চক্ করিয়া উঠিল।

বিমল হাসিয়া বলিল, "যাকে দেখ নি সেই হ'ল তোমার সব চেয়ে বড়। আর আমি···"

যোগমায়ার মুখ অশ্রু হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া অপরূপ দেখাইল। কোমল কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "টাকার চেয়ে সুদের মায়া ঢের বেশী!"

ভগবানকে একমনে ডাকার ফল কিনা বলা যায় না—অন্ততঃ যোগমায়ার সেই বিশ্বাস—সেই দিন অপরাহ্ণে রেবা ফিরিয়া আসিল।

"মাসীমা, আমায় ছেড়ে দিলে!"

প্রণামরত রেবার চিবুক ধরিয়া আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করিলেন যোগমায়া। কহিলেন, "আসতেই যে হবে মা। আমি কায়মনোবাক্যে মানত করছিলাম।"

"কেন মাসীমা ?"

"বিমল এসেছে ওবেলা, আমাকে নিয়ে যেতে চায়।"

রেবার মুখখানি এই কথায় শুকাইয়া গেল। দু'টি মাসে সে অনেকখানি কৃশও হইয়াছে। গলায় শোভমান পুষ্পমাল্য রৌদ্রোত্তাপে এলাইয়া পড়িয়াছে। তবু কৃশাঙ্গী রেবার সৌন্দর্য্য তাহাতে এতটুকু হ্রাস হয় নাই। গৌরবর্ণটি আরও উজ্জ্বল হইয়াছে; অপরিসর ললাট ও ভাসমান চক্ষু দু'টি লাবণ্যের পরিমণ্ডল রচনা করিয়াছে। তপোমগ্না গৌরীর জ্যোতির্বিকীর্ণ মুখমণ্ডলের মতোই তাহা প্রোজ্জ্বল।

"তুমি এলে, বাঁচলাম।"

"মাসীমা, আমাকে একলা ফেলে রেখে আপনি যাবেন ?"

যোগমায়া সস্নেহে কহিলেন, "একলা কেন মা, নন্তুকে একটা তার করে দাও না।"

"ইস্, তিনি এসে তো সব করবেন! সংসারের বুদ্ধি তাঁরও যেমন—আমারও তেমনি।"

"তোমরা হৈ চৈ করে বেড়িও না, মা। এইবার গুছিয়ে ঘর-সংসার করো।"

"এই তো ঘর-সংসার করে এলাম, মাসীমা।"

"না না, ওসব পাগলামি আর ক'রো না।"

উত্তর না দিয়া রেবা হাসিতে লাগিল।

"তাহ'লে আজ রাত্তিরের গাড়ীতেই আমি যাব, মা"

"আপনাকে ধরে রাখতে তো পারব না।—সে জোর আমার নেই।"

ছল ছল চোখে রেবার চিবুক স্পর্শ করিয়া যোগমায়া বলিলেন, "সে জোর তোমার আছে, কিন্তু বউমা আমার একলাটি ভিটে আগলে পড়ে আছেন! ছেলেমানুষ বউ!"

রেবা বলিল, "না মাসীমা, তাঁর খুবই কষ্ট হচ্ছে। আপনার যাওয়া উচিত।"

"পাপিষ্ঠী আমি—প্রয়াগে সারা জীবনটা কাটাতে এসেছিলাম—পারলাম না।" দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিলেন যোগমায়া।

রেবা বলিল, "না মাসীমা, ওই গঙ্গার চর আপনার জন্যে নয়। ওখানে হয়তো পুণ্য আছে—কিন্তু সে পুণ্য অর্জ্জনে সবাই তো তৃপ্তি পায় না।"

"পুণ্যি করে যাঁরা তৃপ্তি পান—তাঁরা সাধু-সন্নিসী লোক। তাঁরা দেবতা, আমরা সংসারের জীব।" তীর্থভূমি ছাড়িবার দুঃখে যোগমায়া সত্যই ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন।

"মাসীমা, আমার একটি সাধ আছে।"

'কি সাধ মা! বলো, লজ্জা কি ?"

"এ বেলায় আপনি খান না—কিছু জলখাবার যদি করে দিই—"

খুঁৎখুঁতানি যে মনের মধ্যে না জাগিল, তাহা নহে; কিন্তু স্নেহের উত্তাপে নিষ্ঠার কাঠিন্য তখন দ্রবীভূত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বিদায়বেলার তীব্র বেদনায় সব ভুলাইয়া-দেওয়া ঔদার্য্যের

আকাশটি যোগমায়ার সারা মনে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে ততক্ষণে।

হাসিমুখে বলিলেন, "দিও। মেয়ের হাতের খাবার খাব বইকি, মা। কিন্তু আচমনী তো রাত্তিরে খাই নে। একটু দুধ জ্বাল দিয়ে দিও—একটু যা হয় মিষ্টি—"

জলযোগ শেষ হইলে রেবা বলিল, "মাসীমা, আপনার কিন্তু হার হ'ল আজ।"

"কেন?"

"মনে করে দেখুন দেখি—সেই ভাদ্র মাসের কথা। মনে পড়ে না? কালীঘাটে—"

যোগমায়া হাসিমুখে বলিলেন, "তুমি আমায় চিনতে পেরেছিলে, মা?"

"কেন পারব না? সে-দিন দেবস্থানে আমার হাতের জল খান নি বলেই তো আজ খাবার খাইয়ে আপনার জাত মেরে দিলাম, মাসীমা!" খিল খিল করিয়া রেবা হাসিয়া উঠিল।

যোগমায়া এতটুকু লজ্জিত বা আতঙ্কগ্রস্ত হইলেন না। হাসিমুখেই বলিলেন, "তখন তো আর তুমি আমার মেয়ে ছিলে না, ছিলে পরের বউ। তখন তোমার হাতের জল খেয়ে কেন জাত যাবে?" একটু হাসিয়া বলিলেন, "তা প্রথম যে-দিন আমায় দেখলে—সে দিন আমায় জানালে না কেন?"

"জানাবার সময় পেলাম কৈ? এসেই তো কাজের মধ্যে পড়ে গেলাম। আর দেখা হবামাত্র বললে আপনার লজ্জা হ'ত না বুঝি?"

মেয়েটি বুদ্ধিমতী। এমন বউ লইয়া সংসারে মনোমালিন্য কোনদিন ঘটে না। তাই সুচরিতার মেয়ের আসনটি এমন অসঙ্কোচেই ও দখল করিতে পারিয়াছে।

সবটুকুই বিদায়-বেলার উদার বিস্তৃত আকাশের মহিমা নহে, প্রয়াগের চরভূমিও সেই আকাশের নীচেয় প্রশান্তভাবে আত্মমগ্নের মতো বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। মানুষকে ভাঙিয়া গড়িবার—বদ্ধমূল সংস্কার কাটাইয়া নূতন পথপ্রান্তের সন্ধান দেওয়ার কাজে চিরদিনই উহাদের সহযোগিতা গভীর।

"খোকা, একটা কথা সত্যি বলবি?"

"কি, মা?"

"তুই কি আমার ওপর রাগ করেছিস?"

হাসিতে হাসিতে বিমল বলিল, "রাগ কোথায় দেখলে মা?"

যোগমায়ার মুখের বিষাদ বিমলের হাসিতে কাটিল না। বিষণ্ণ স্বরেই তিনি বলিলেন, "আজকালের কথা বলছি না। যেন অনেক দিন থেকেই তুই বদলে গেছিস। তোর মনে কি কষ্ট—আমায় বলবি নে, বাবা?"

এই স্নেহ-সম্ভাষণে বিমলের চোখে জল আসিবার উপক্রম হইল। মায়ের স্নেহ-সতর্ক দৃষ্টি হইতে মর্ম্মব্যথার কালো দাগটুকু দীর্ঘকাল লুকাইয়া রাখা চলে না। কিন্তু প্রকাশ করিয়াও লাভ নাই। মুখ ফিরাইয়া উচ্চ হাসির শব্দ তুলিয়া সে বলিল, "তুমি পাগল!"

"মুখ ফেরালি কেন?—আমার পানে চা।"

বিমল চাহিল না। দ্রুতগামী গাড়ীর তালে তালে মায়ের কথা যেন সহস্র কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। পশ্চিমের রুক্ষ প্রান্তর, চক্ষুপীড়াদায়ক কুশ্রী কুটীরশ্রেণী, মাঠের বুকে গভীর ক্ষতের মতো ডোবার-সঞ্চিত সবুজ রঙের জল, শ্রেণীবদ্ধ আম ও পেয়ারা-বাগান দ্রুত বেগেই চক্ষুর সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে সে বলিল, "মা, আমরা কলকাতা হয়ে বাড়ী যাব।"

যোগমায়া মাথা নাড়িলেন।

ট্রেণের গবাক্ষপথে গাছপালা—নদী প্রান্তর—আকাশের টুকরা—সবই তীরবেগে ছুটিয়া পলাইতেছে। একদৃষ্টিতে যোগমায়া ইহাদের পলায়নের শোভাযাত্রা দেখিতে লাগিলেন। এই শোভাযাত্রার মধ্যে শৈশবকালের বিমলকে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাওয়ার নিষ্ফলতা অনুক্ষণই তাঁহাকে পীড়া দিতে লাগিল। যোগমায়ার চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল।

৬

সুদীর্ঘ অনুপস্থিতির পর বিদেশ হইতে যত বার যোগমায়া বাড়ী আসিয়াছেন—তত বারই এই বাড়ী অপরূপ শোভায় তাঁহার মন হরণ করিয়াছে। পূর্ণিমায় স্ফীত সমুদ্রের মতো সর্ব্ব ইন্দ্রিয় আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া অসীম আনন্দ ও তৃপ্তির তরঙ্গে তিনি দোলা খাইয়াছেন। বিদেশের কত প্রাসাদ, মর্ম্মর হর্ম্ম্য—প্রশস্ত লনের বুকে যমুনার তীরে ফুলবাগানের মধ্যে রাজা-মহারাজার প্রমোদভবন দেখিয়া চক্ষুর তৃপ্তি ও মনের বিস্ময় বাড়িয়াছে—তবু নিজের ঘরখানির মতো একান্ত মমতায় আপন বলিয়া মানিতে পারেন নাই। চক্ষুর বিস্ময়কে বৃদ্ধি করে যে বস্তু তাহা দেখিয়া

গৌরবে স্ফীত হওয়া চলে—তাহাকে ভালোবাসিয়া অসমতল মেঝের ধুলায় আঁচল বিছাইয়া শয়ন করা বুঝি চলে না। মর্ম্মর-হর্ম্মো ফুলের মালা দোলাইয়া পূজা দিয়া মন পরিতৃপ্ত হয়, সে পরিতৃপ্তি সম্মার্জ্জনী প্রহারে জঞ্জালস্তূপ হইতে গৃহকে মুক্তি দিবার কালে পরিতৃপ্তির মতো প্রগাঢ় নহে। পরের বলিয়া শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভারে যেখানে মাথা নামাইয়া কর্ত্তব্য শেষ করা চলে, নিজের বলিয়া সেইখানেই উৎফুল্ল পদতাড়নায় জিনিসপত্র ছড়াইয়া দিয়াও কোমল বৃত্তিগুলিকে শাসন করিবার কথা মনেই জাগে না। আমগাছ ও কাঁঠালগাছ মিলিয়া উপরের রৌদ্র ঠেকাইয়া ছায়া-সুশীতল চন্দ্রাতপ রচনা করিয়াছে। মাথার উপর আকাশ যেমন ঘন নীল, চারিপাশের লতাগুল্মের শ্রী তেমনই নিবিড় সবুজে শোভাময়। ভালোবাসার সাথী পাইলে প্রকৃতিও যে প্রাণের কপাট খুলিয়া সাদর অভ্যর্থনা জানায়—সে কথা প্রবাস হইতে ফিরিয়া প্রতিবারই যোগমায়া অনুভব করিয়া থাকেন।

এই পরিপূর্ণ শান্তির মাঝে সব জিনিসই ভালো লাগে, সকলের সঙ্গেই হাসিয়া কথা বলিতে সাধ যায়।

প্রতিবেশিনীরা একে একে দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে কুশল-প্রশ্নের আদান-প্রদানে বেলা প্রায় অপরাহ্ণ হইয়া উঠিল।

লতা আসিয়া বলিল, "মা, আপনি হাতমুখ ধুয়ে কাপড় কেচে নিন, আমি রান্নার উদ্যোগ করে রেখেছি।"

"এরই মধ্যে রান্নার উদ্যোগ করেছ? ভাবছিলাম এই অবেলায় আর কিছু খাব না।"

"তাই কি হয়! কত দূর থেকে না খেয়ে তেতেপুড়ে আসছেন।"

ভারি মিষ্ট শুনাইল লতার এই অনুযোগপূর্ণ কথা! সে কথা যেন লতা বলিতেছে না—রেবা বলিতেছে, "মাসীমা, কিছু জলখাবার যদি করে দিই—"

যোগমায়া হাসিয়া বলিলেন, "তা ছাড়বে না যখন, তুমিই না-হয় চড়িয়ে দাও। নেয়েধুয়ে উঠতে আমার দেরি হবে তো।"

লতার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, খুশীভরা কণ্ঠে সে কহিল, "তবে ডালটা আগে চাপিয়ে দিই গে—"

"না না, এই অবেলায় পঞ্চ ব্যাঞ্জনে আর কাজ নেই, শুধু ভাতে-ভাত···আর শোন বউমা, গঙ্গাজল আছে তো ঘরে?"

"হুঁ, আপনি আসবেন বলে কাল আমি দু'ঘড়া আনিয়ে রেখেছি।"

আহার শেষ হইলে লতা বলিল, "যা ভাবনায় আমার দিন কাটত! আপনি এলেন—আমি নিশ্চিন্ত।"

যোগমায়া বলিলেন, "তোমার খুবই কষ্ট গেছে, মা।"

"না, কষ্ট আর কি। তবে ভয় ভয় করত বড়। এই বার আপনার ঘর-সংসার বুঝেপড়ে নিয়ে আমায় ছুটি দিন।"

"ছুটি! সংসার থেকে ছুটি নিয়ে কোথায় যাবে? এ সংসার কি তোমার নয়?"

"রক্ষে করুন, এতবড় দায়িত্ব নিয়ে চলবার সাধ্যি আমার নেই!"

"কিন্তু এই দায়িত্ব তো একদিন তোমায় নিতেই হবে।"

"না মা, ও কথা বলবেন না।"

"পাগল মেয়ে, আমি না বললে শমন রাজা কি আমায় ছেড়ে দেবেন! চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে যাবেন না?"

"না মা, ও কথা বলবেন না।"

লতার পাংশু মুখের পানে চাহিয়া মমতায় যোগমায়া পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। সস্নেহে বধূকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিলেন, "এমনি মায়ার ডোরে বাঁধছ, মা! চিরদিনই কি বদ্ধজীব হ'য়ে থাকব?"

"থাকলেনই বা। আমাদের ছেড়ে মুক্তি নিয়ে আপনি কি করবেন, মা?"

"সে ভাগ্যি আমার হ'ল কই, বউমা! নইলে তাঁর শ্রীচরণ ছেড়ে সংসার-মায়ায় বদ্ধ হতে এলাম কেন?"—বলিয়া গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে লাগিলেন:

"মিছে মায়াবদ্ধ হয়ে সংসারেতে আইনু॥
ফলরূপে পুত্রকন্যা ডাল ভাঙ্গি পড়ে।
কালরূপে সংসারেতে পক্ষ বাসা করে।"

রাত্রিতে যোগমায়া অনেকক্ষণ ধরিয়া বিনিদ্র রহিলেন। এই বাড়ীর একটা ভাষা আছে। গভীর রাত্রিতে সকলে যখন ঘুমাইয়া পড়ে—সে-কালের সলজ্জ ভীরু বধূটির মতো মৃদু অস্ফুট কণ্ঠে বাড়ী তখন কথা কহিতে থাকে। যার শুনিবার কান আছে—সেই বুঝিতে পারে অস্ফুট কণ্ঠের সেই ভাষা। ধ্বনিতে সে ভাষা অর্থময় হইয়া উঠে না

অতীত ঘটনার স্মৃতির মধ্য দিয়া প্রথমে সে অস্ফুট-বাক্—পরে সঙ্কেতে ভবিতব্যকে যেন প্রকাশ করে। হয়তো টুপ্ করিয়া গাছের পাতা খসিয়া পড়ে, ঝপ্ করিয়া কোন রাত্রিচর পাখী গাছের ডালে আসিয়া বসে, সর্ সর্ করিয়া সরীসৃপেরা উঠানে চলাফেরা করে, শিবমন্দিরের চূড়ায় বসিয়া লক্ষ্মী-পেঁচা চ্যাঁ-চ্যাঁ করিয়া ডাকে, গ্রামের কোন দূর প্রান্তে কুকুর ভেউ-ভেউ করিয়া উঠে। নিত্যই এসব ঘটে, কিন্তু এ সবের অর্থ দৈবাৎ কোন বিনিদ্র রজনীতে চিন্তাভারগ্রস্ত মস্তিষ্কের আগল ঠেলিয়া জ্ঞানের রাজ্যে বড় গোলযোগ বাধায়। দিনের বহু কর্ম্ম-নিপীড়িত মস্তিষ্কে সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুকে ঠাঁই দেওয়া মুশকিল—রাত্রি পরম সখীর মতো আসিয়া এই সমস্ত শব্দ ও ইঙ্গিতকে পরিস্ফুট করিয়া সুপরামর্শ দিয়া থাকে।

সকালে উঠিয়া যোগমায়া বিমলকে ডাকিলেন, "খোকা, একবার পাঁজিখানা দেখ্‌তো—কবে যাত্রার শুভদিন আছে।"

"কেন মা, আবার কোথায় যাবে?"

"ভয় নেই, তুই আন্ না বাপু পাঁজিখানা।"

পাঁজির পাতা উল্টাইয়া বিমল বলিল, "কাল পরশু—দুটো দিনই ভালো। যাত্রা উত্তম—মহেন্দ্র যোগ।"

"তোর ছুটি আর ক'দিন আছে?"

"তা তিন চার দিন। কলকাতায় সেইজন্যেই তো নামলাম—আরও ক'দিন ছুটি বাড়িয়ে নিলাম কিনা।"

"বেশ, পরশু তাহ'লে বউমাকে নিয়ে যাত্রা করবে।"

বিস্মিত কণ্ঠে বিমল কহিল, "পরশু?"

"হ্যাঁ, ভেবে দেখলাম—এই ভিটেয় বিঘ্ন হয়েছে অনেক। গৌরীর বেলায় কি কাণ্ডটাই না হ'ল। শান্তি-স্বস্ত্যয়ন না করে এখানে সাহস করতে পারি না।"

"শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করতে আর ক'দিন লাগে?"

"যত দিনই লাগুক—প্রথম সন্তান বাপের বাড়ীতে হওয়াই নিয়ম। তাঁদেরও একটা সাধ-আহ্লাদ আছে তো?" একটু থামিয়া বলিলেন, "তা বেয়াইরা কলকাতায় আছেন তো?"

"হ্যাঁ, বালিগঞ্জে বাড়ী করেছেন যে।"

"ভালোই হয়েছে। জোড়া মাসে তো বউমাকে বাড়ী থেকে পাঠাব না—পরশুই তুমি ব্যবস্থা করো।"

এ বিষয়ে লতার আপত্তি বেশী হইবার কথা নহে, তবু সে বার কয়েক আপত্তি করিল। আপত্তি কানে না তুলিয়া যোগমায়া ইহাদের যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া তুলিলেন।

বিমল মনঃক্ষুণ্ণ হইল, কিন্তু অভিযোগ সে একবার মাত্রই যা উত্থাপন করিয়াছিল। যাত্রার আয়োজনে তাহার উৎসাহ বা অনিচ্ছা কোনটাই তেমন প্রকট হইয়া উঠিল না।

একবার শুধু বলিল, 'মা', একা থাকতে তোমার ভয় না করুক—আমাদের ভাবনা যথেষ্ট হবে।"

যোগমায়া শুধু হাসিলেন।

বিমল বলিল, "একটা কুকুর পুষে রেখো—তবু রাত্রিতে বাড়ী পাহারা দেবে। না—কুকুরে ঘেন্না করবে?"

যোগমায়া বলিলেন, "তোরা কেবল আমার ঘেন্নাটাই দেখলি, খোকা—নয়?"

বিমলকে মাথা নিচু করিতে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তা দিস একটা বিলিতি কুকুর পাঠিয়ে—বাড়ীও আগলাবে—তোর মাকেও দেখবে।"

যথাসময়ে চোখের জল ফেলিয়া পুত্রবধূ রওনা হইয়া গেল। যোগমায়া জোর করিয়া চোখের জল চাপিয়া হাসিবার মতো মুখভাব করিলেন—কিন্তু কান্নার চেয়ে করুণ সেই মুখভাবের প্রতি বিমল চাহিতে পারে নাই—নতমুখে পা ছুঁইয়া প্রণাম সারিয়া নতমুখেই নিঃশব্দে বাড়ীর বাহির হইল।

নিস্তারিণী বলিলেন, "আজ কি রান্না-বান্না কিছু হবে না, দিদি?"

ধরা গলায় যোগমায়া উত্তর দিলেন, "না।"

"ও কি, এখনই শুয়ে পড়লে যে?"

"কাল রাত্তিরে ঘুমই নি ভালো করে—দুয়োরটা ভেজিয়ে দিয়ে যা, নিস্তার।"

সন্তর্পণে দুয়ার ভেজাইয়া দিয়া নিস্তারিণী বাহির হইয়া গেল।

সেই রাত্রি ঘুমাইবার রাত্রি নহে, তবু শেষ রাত্রির দিকে যোগমায়া স্বপ্ন দেখিলেন। আশ্চর্য্য স্বপ্ন! যোগমায়ার জীবন হইতে বহু বৎসর যেন মুছিয়া গিয়াছে। পুরাতন—প্রায়-বিস্মৃত দিনগুলির মধ্যে আবার যেন তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই শহরতুল্য গ্রামের পথঘাট, বিপণি, বাজার, আচার-নিয়ম ইত্যাদিতে বালিকা কালের পরিবেশটি পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। ঘোড়ার গাড়ী পথে চলিতেছে না; ছইঘেরা গরুর গাড়ী বা পাল্কীতে করিয়া অন্তঃপুরিকারা দেশ-দেশান্তরে যাতায়াত

করিতেছেন। তক্তানামায় করিয়া রাজবেশ পরিয়া গ্যাসের বাতি জ্বালাইয়া ও ইংরেজি বাজনা বাজাইয়া বিবাহের শোভাযাত্রা আর গ্রাম কাঁপাইয়া ছেলে-বুড়া স্ত্রী পুরুষকে পথের ধারে টানিয়া আনিতেছে না। নিঃশব্দ পাল্কীর সঙ্গে দেশী রোশনচৌকির ধ্বনির সঙ্গে কেরোসিন-সিক্ত ঘুঁটের মশাল জ্বালিয়া কাগজের ফুলের ঝাড় ও আশাসোটা পুরোভাগে রাখিয়া কাঁচা রাস্তার উপর দিয়া এই কল্যাণ-অনুষ্ঠানটি প্রাণ লাভ করিতেছে। জাগিয়া উঠিতেছে—ঘন আস্শ্যাওড়া ঝোপ ঠেলিয়া ঊর্দ্ধমুখী কাঠচাঁপা গাছের ঈষৎ হলুদ ফুলের স্তবক, শুষ্ নি-কলমি ভরা ডোবার ধারে ধারে সেই বৈঁচিবন, বেল গাছে ঝাঁপাইয়া-পড়া মধুমালতীর লতায় সাদা ফুলের গুচ্ছ, শিথিলবৃন্ত কামিনী ফুলের পাপড়ী-আকীর্ণ অঙ্গন, ঝাঁকড়া কুলগাছের ডাল নাড়া দিয়া দিয়া টোপা কুল পাড়ার ধুম, নিস্তব্ধ চৈত্রদুপুরে ছায়াময় বটের ঝুরিতে দোল খাওয়া ও কাঁচা আম সংগ্রহের চেষ্টায় আম বাগানে আঁচলে নুন বাঁধিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো।

তারপর বিবাহ। অস্পষ্ট সে কাল, একালের পুতুলের বিবাহের মতোই কৌতুকপ্রদ। তবু সে কালের অনেক স্মৃতি—অনেক কাহিনী একেবারে অস্পষ্ট হইয়া যায় নাই। খুড়িমার প্রাঙ্গণে সেই ঝাঁকড়া লেবু গাছটাও যেন ফিরিয়া আসিল। যোগমায়ার বিবাহিত জীবনে অভিশাপের মতো সেই ঘটনাগুলি একদা ছায়া বিস্তার করিয়াছিল। অস্পষ্ট ছায়ার মতো সঙ্গিনীরা ফিরিয়া আসিতেছে—তবু তাহাদের ঠিকমত চেনা যায় না। আটচালাযুক্ত ঘরখানি উঁচু দাওয়াসমেত দেখা দিয়াছে। সেই তক্তাপোষ, জোড়া কুলুঙ্গির মাথায় দেবদেবীর পট, কড়ির ঝাঁপি, কড়ি-বাঁধানো আলনা, জলচৌকিতে ঝকঝকে বাসন, রেড়ির তেলের প্রদীপে নিবু-নিবু শিখা—শুধু লবঙ্গলতা কোথাও নাই—রামজীবনও নাই! এদিকে শ্বশুরবাড়ীর উঁচু প্রাচীর ওদিকের কায়েতদের পোড়ো ভিটার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, অধুনা সুসংস্কৃত সিংদরজার সেকালের পতনোন্মুখ চেহারাটাও আবার ভীতি উদ্রেক করিতেছে। উঠানে আম-কাঁঠালের ঝোপ, খোয়া-ওঠা সঙ্কীর্ণ রোয়াকে কম্বলের ফুটা আসনখানি পাতা; সেই আসনে বসিয়া শাশুড়ী মালা জপ করিতেছেন না। ও ঘরের চরকার ঘ্যানর-ঘ্যানর আওয়াজ উঠিতেছে, পিসিমা কোথাও নাই। ঘরের মধ্যেও কেহ নাই, অথচ পুষ্পসার সুরভিতে ঘর আমোদিত। রামচন্দ্র বুঝি নিকটে কোথাও দাঁড়াইয়া আছেন। কিন্তু কই? শ্রান্ত যোগমায়ার দেহে অসীম ক্লান্তি; চোখের তারায় সে শ্রান্তি পরিস্ফুট। একটু আশ্রয়—সামান্য ক্ষণের জন্য বিশ্রাম—অতীতের পক্ষপুটে ফিরিয়া গিয়া মা বা শাশুড়ী অথবা স্বামীর উপর সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ত্তব্যভার ছাড়িয়া দিয়া দুদণ্ডের জন্য নিঃশ্বাস ফেলিয়া তৃপ্তিলাভ করা—মনের এই ব্যাকুল বাসনা কে মিটাইবে? অতীত ক্রমশঃ সরিয়া আসিতেছে বর্ত্তমানের দিকে—আলো তীব্রতর হইতেছে! মাথার উপর দায়িত্বগুলি অহোরাত্রব্যাপী অবিচ্ছিন্ন বস্তুপুঞ্জে স্তূপীভূত হইয়া পীড়া দিতেছে। কাহার হাতে এ ভার সমর্পণ করিয়া যোগমায়া নিশ্চিন্ত হইবেন? এ গুরুভার —দম যে আটকাইয়া আসে। বুকখানি কি এই চাপে ফাটিয়া যাইবে? মাগো!

সুন্দর প্রভাত। প্রভাত সূর্য্যের স্নিগ্ধ কিরণ দ্বিতলের পূব দিকের জানালা দিয়া সবেমাত্র মেঝের উপর শায়িত যোগমায়ার শিথিল পা দু'খানি ছুঁইয়াছে। 'গোবিন্দ'—'গোবিন্দ' বলিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন। রাত্রির স্বপ্ন মনকে সামান্যক্ষণ মাত্র আলোড়িত করিল। প্রভাতের কোমল রৌদ্রস্পর্শে দেহে শক্তির জোয়ার নামিল। লঘু পক্ষ মেলিয়া নানাদিকের নানাচিন্তাবাহিত নিশ্চল কর্ত্তব্যগুলি প্রভাত-আকাশে সাঁতার দিয়া ফিরিতে লাগিল। কি সুন্দর প্রভাত। সেই নবরৌদ্রস্নাত হইয়া অপরূপ সৌন্দর্য্যে বাড়ীটাও ঝলমল করিতেছে। জীবন নূতন কর্ম্ম-রসায়নে আবার শক্তি সংগ্রহ করিয়া অর্থযুক্ত হইয়া উঠিল বুঝি!

পিতলের ঘড়া কাঁখে করিয়া নিস্তারিণী আসিয়া ডাকিলেন, "কইগো দিদি, কোথায়? আজ তো আর রান্নাবান্নার হাঙ্গামা বিশেষ নেই, চলো গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসি।"

একহাত কাদা মাখিয়া যোগমায়া রান্নাঘর হইতে হাসিমুখে বাহির হইয়া আসিলেন।

নিস্তারিণী তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন, "ওমা, সক্কাল বেলায় কালি-কাদা-ঝুল মেখে এ কি চেহারা করেছ! কালই না হয় হবে ওসব।"

"তা কি হয়? জিনিসপত্তর অগোছালো—

ঘরের অযত্ন আমি দেখতে পারি নে, ভাই গায়ে যেন কাঁটার ছড়ি মারতে থাকে।"

"তা শীগ্‌গির সেরে সুরে নাও—আমি না হয় একটু বসি।"

"না রে, সারতে আমার অনেক বেলা হবে। শুধু কি রান্নাঘর? গোয়াল আছে, শোবার ঘর আছে, কুয়োতলা আছে, উঠোন আছে, —সব পরিষ্কার আছে।—চারটি খাবার ফুরসৎ হ'লে হয়!"

"ওমা আমার কি হবে! সারাদিন ধরে এই দাসীবিত্তি করবে! নাহয় কালই হ'ত?"

যোগমায়া শুধু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন।

নিস্তারিণী বলিলেন, "আজ যে মস্ত বড় যোগ।"

"তবে একটু গঙ্গাজল আমার মাথায় দিয়ে যাস, ভাই। তুই যা ভাই, রোদ চড়লে কষ্ট হবে বড্ড।"—বলিয়া হাসি মুখখানি ফিরাইয়া যোগমায়া রান্নাঘরের মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন।

সমাপ্ত

সুনয়নীর মৃত্যু

১

কলতলায় বাসন মাজিবার কালে সুনয়নী চিঠিখানা পাইলেন।

সদর খুলিলেই ছোট উঠান ও কলতলা একসঙ্গে নজরে পড়ে। জানা-পিওন দুয়ার অল্প একটু ফাঁক করিয়া মাত্র চিঠিসমেত হাতখানি বাড়াইয়া মুখে অনুচ্চ সংক্ষিপ্ত 'চিঠি' শব্দ উচ্চারণ করিয়া দুটি আঙুলের চাপ শিথিল করিয়া দেয়। চিঠি কখনও দুয়ারের কোলেই টুপ করিয়া খসিয়া পড়ে, বায়ুর বেগে কখনও বা উঠানে আসিয়া পড়ে।

আজ অল্প বাতাস ছিল বলিয়া সুনয়নীর পায়ের তলায় আসিয়া চিঠিখানি যেন প্রণাম জানাইল।

বাসন মাজিতে মাজিতে সুনয়নী হাঁকিলেন, 'ওরে সুধা, সুধা চট ক'রে একবার এদিকে আয় দেখি মা, একখানা চিঠি এল। সকড়ি হাত, আয় না মা চট্ ক'রে।'

বাড়ীখানি দ্বিতল নহে যে, সুধার নামিয়া আসিতে দেরি হইবে। জীর্ণপ্রায় একতলা দুখানি ঘর, পাশের ছোট ফালি বারান্দা হইতে অল্প অল্প ধোঁয়া বাহির হইতেছিল। সুধা উনানে আঁচ উঠাইবার চেষ্টায় ভাঙা হাত-পাখাখানি প্রাণপণে নাড়িতেছিল; কিন্তু পাখায় বাতাসের চেয়ে শব্দ হইতেছিল বেশী ও ধোঁয়ার গাঢ়ত্বও তেমন আশাপ্রদ নহে। উনান শীঘ্র না ধরিলে বাবার আপিস 'লেট' হইতে পারে। সকাল হইতে বেলা নটা পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি মিনিটের মূল্য এ-বাড়ীতে বড়ই চড়া, নটার পর ঘণ্টার খবরদারি না করিলেও কিছু যায় আসে না। মায়ের প্রথম ডাক তাই কর্ম্মরতা সুধার কানে যায় নাই, দ্বিতীয় ডাকে সে পাখা ফেলিয়া ফালি বারান্দাটুকু এক সেকেণ্ডে পার হইয়া উঠানে নামিয়া আসিল ও মায়ের পায়ের তলা হইতে একখানা খামেভরা চিঠি তুলিয়া লইয়া তাহাতে মনোনিবেশ করিল।

মনোনিবেশই করিল, সমস্ত চিঠিখানা পড়া শেষ হইলেও মুখে তাহার একটি কথাও বাহির হইল না। অধৈর্য্য সুনয়নী বাসনে একরাশ ছাই ঘষিতে ঘষিতে দ্রুতকণ্ঠে কহিলেন, 'দেখ মেয়ের আক্কেল, বলি চিঠিখানা দিলে কে?'

মেয়ের কানে মায়ের প্রশ্ন প্রবেশ করিল না, সে ও পাল্টা প্রশ্ন করিল, 'রমলা দেবী কে মা?'

সুনয়নী ক্ষণেকের তরে বাসনমাজা থামাইয়া উজ্জ্বল মুখে বলিলেন, 'রমলা কে জানিস নে? আমাদের রমলা যে, তোর মাসী হয়। একটু থামিয়া বলিলেন, 'তা তোরই বা দোষ কি, জন্মে অবধি মাসীকে দেখিস নি ত কখনও। তুইত তুই, যে-ঘরে সে পড়েছে চন্দ্রসূর্য্যি তার মুখ দেখতে পায় বড়! কলকাতায় সাতখানা বাড়ী, ওরা থাকে শ্যামবাজারের বড় বাড়ীতে।'

তথাপি সুধার মুখে বিস্ময়ের রেখাগুলি মিলাইল না দেখিয়া সুনয়নী দেবী একগাল হাসিয়া বলিলেন, 'মাস মাস পাঁচটা ক'রে টাকা মনি-অর্ডার আসছে কার দৌলতে? ওই মাসীর। খুড়তুতো বোন হ'লে কি হয়—আপনার মেয়ের চেয়ে ভালবাসে তোকে। তাই, তোর পড়ার খরচ বলে' মাস মাস ঐ টাকা পাঠায়।'

এতক্ষণে সুধার মুখের বিস্ময় ভাব কাটিয়া গেল।

সুনয়নী সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, 'তা কি লিখেছে রমলা? ভাল আছে ত?'

সুধা মুখখানি নামাইয়া অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলিল, তিনি মারা গেছেন।'

সবিস্ময়ে চোখ কপালে তুলিয়া সুনয়নী কহিলেন, 'মারা গেছে? রমলা? তবে চিঠি লিখলে কে?

'তাঁর ছেলে। ছাপানো চিঠি দিয়েছেন—নেমতন্নের। ৫ই তাঁর শ্রাদ্ধের দিন।'

২

এই দুঃসংবাদে আর পাঁচজনে যেমন করিয়া থাকে, সুনয়নী কিন্তু তেমন করিলেন না। দূর-সম্পর্কের খুড়তুতো বোন; ছেলেবেলাকার স্মৃতির

সমুদ্র হাতড়াইলেও তেমন কিছু মণি বা শুক্তি হাতের মুঠায় উঠে না। রমলার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পিতা এ-জেলা ও-জেলা করিয়া ঘুরিতেন ও ছুটির অবসরে নষ্ট-শ্রী পল্লীগ্রামে আসার চেয়ে কোন সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্যভরা নগরীর অঙ্কে আশ্রয় লইতেই ভালবাসিতেন। আপন ভাইয়ের সঙ্গেই লোকে সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলিতে পারে না, এ ত দূর-সম্পর্কের খুড়তুতো ভাই! তথাপি গ্রামের পাঁচজনের কাছে সুনয়নীর পিতা ডেপুটি-ভাইয়ের গল্প করিতে ভালবাসিতেন এবং পিতৃসূত্রেপ্রাপ্ত ঐ গল্পের বর্ণসমাবেশে সুনয়নীরও দক্ষতা কিছু দেখা গিয়াছিল। একবার মাত্র রমলার বিবাহে কুটুম্বিতা-সূত্রে তাঁহারা এক হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং বুদ্ধিমতী সুনয়নী সেই সুযোগ ব্যর্থ হইতে দেন নাই। রমলার শ্যাম জারের ঠিকানাটা তিনি সযত্নে সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং পরে গোপনে আপন দুঃখময় জীবনের কাহিনী ব্যক্ত করিয়া রমলার কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনা করিতে পারিয়াছিলেন। মাস মাস মেয়ের শিক্ষাব্যয়নির্ব্বাহার্থ যে পাঁচটি টাকা আসিতেছে তাহা ক্ষীণপ্রায় সম্বন্ধসূত্রকে দৃঢ় করিয়াছিল, সুনয়নীও পাড়ার পাঁচজনের কাছে গল্প করিবার এত বড় একটা সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

অতর্কিত দুঃসংবাদে কাঁদিবেন কি কাঁদিবেন না, সুনয়নী প্রথমটা ঠিক করিতে পারিলেন না। রমলার বিয়োগে তিনি দুঃখের আঁচ যেটুকু পাইলেন, তাহা এই পাঁচটি টাকার মারফৎ বলিয়াই মনে হইল। প্রতিমাসে পাঁচটি মুদ্রাই আসিত, রমলা দেবী কখনও ভগিনীকে লিপি-মারফৎ প্রণাম পাঠান নাই বা কুশল জিজ্ঞাসা করেন নাই। ধাতুমূর্ত্তির মধ্যে যদি স্নেহ থাকা সম্ভব হয়, তবে রমলা দেবী নিশ্চয়ই স্নেহময়ী ছিলেন দয়ার প্রশ্ন উঠিলে তিনি দয়াবতী। তাঁর ধন-সমৃদ্ধির সঙ্গে স্নেহ-মমতার মশলা মিশাইয়া যে সকল গল্প সুনয়নী তাঁহার প্রতিবেশীদের এ-যাবৎ উপহার দিয়াছেন, তাহাতে এই দুঃসংবাদে না-কাঁদিলে সম্পর্কের অসার দিকটাই প্রকাশ হইয়া পড়ে। আবার সাংসারিক কাজ না সারিয়া কাঁদিবার সময়ই বা কোথায়? নিষ্ঠুর সময় রূঢ় মুহূর্ত্তের সঙ্কেতে আপিস-তাড়নারত মানুষগুলিকে স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া ঘড়ির মধ্যে টিক্ টিক্ শব্দ করিয়াই চলিয়াছে।

বাসনে দ্রুত হাত চালাইতে চালাইতে তিনি সুধাকে বলিলেন, 'চিঠিখানা তুলে রাখ, দেখ্ গে উনুনে আঁচ উঠলো কি না। আর দেখ্, এখুনি যেন ছাদে উঠে এ-কথা কাউকে জানাস নে, যা বলবার আমি বলব।' সুতরাং আপিস যাইবার পূর্ব্বে একমাত্র স্বামী ছাড়া এ-কথা আর কেহ জানিল না।

৩

সারা দুপুর ও বৈকাল ভগিনীর মৃত্যুসংবাদ প্রচার করিয়া সুনয়নী দেবী ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন।

কাপড়-কাচা ও গা-ধোওয়া শেষ করিয়া তিনি ঘরে আসিয়া শুইলেন। কিন্তু শুইবামাত্রই মনে হইল, চুপ করিয়া শুইবার অবসরই বা তাঁর কোথায়? ঐ শ্রাদ্ধের দিন, অন্তত দিন-দুই পূর্ব্বে সেখানে পৌঁছান দরকার। কাজের বাড়ীতে শুধু খাইতে যাওয়াটা বড়ই বিশ্রী দেখাইবে। পাঁচ জনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়, তাদের সুখ-দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ, কাজের বাড়ীতে দুই একখানা হাল্কা কাজে হাত দেওয়া ইত্যাদিতে কিছু সময়ও ত যাইবে। তারপর ভগিনীপতিকে বলিয়া সুধার বিবাহের সাহায্য কিছু সংগ্রহ করা—সেও মায়ের পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য।

শুইবামাত্রই তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং ডাকিলেন, 'সুধা, সুধা, একবার এ-ঘরে আয় ত, মা।'

সুধা আসিলে বলিলেন, 'পরশু ধোপাবাড়ী থেকে যে কাপড়গুলো এসেছিল, মিল ক'রে রেখেছিলি ত?'

সুধা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'সব মিলে গেছে, কেবল তোমার লালপাড় সিল্কের শাড়ীখানা দেয় নি।'

সুনয়নী দেবী প্রচণ্ড বিস্ময়ে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলেন এবং চোখে মুখে আতঙ্ক ফুটাইয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন, 'সেইখানাই দেয় নি? এখন উপায়?'

সুধা বলিল, 'দু চার দিনের মধ্যেই দিয়ে যাবে বলেছে। দরকারী আটপৌরে কাপড়গুলো ত দিয়েছে।'

সুনয়নী দেবী মুখ মচকাইয়া বলিলেন, 'কোনটা দরকারী, কোন্‌টা অদরকারী, তুই তার সব জানিস কি না! ধোবামাগীর বড় আস্কারা, মিনি-পয়সায় কাচেন কি না!'

সুধা প্রতিবাদ করিল, 'বাঃ রে, তার কি দোষ! তুমিই ত কাপড় দেবার সময় বলেছিলে—আগে

আটপৌরেগুলো দিও, ভাল কাপড় দু দিন দেরি হলেও চলবে।'

সুনয়নী দেবী হতাশামাখা ভঙ্গী করিয়া বলিলেন, 'তখন কি জানতাম—' হয়ত মেয়ের কাছে বলিলেও খানিকটা অশোভনতা প্রকাশ পাইতে পারে এই আশঙ্কায় কথাটা ভঙ্গীর মধ্য দিয়াই শেষ করিলেন।

সুধা বলিল, 'তুমি কি মাসীমার শ্রাদ্ধে যাবে না কি?'

সুনয়নী উৎসাহভরা কণ্ঠে কহিলেন, 'যাব না! এক মাব পেটের না হোক, বোন ত বটে। তা যাবার দফা তুমিই ত শেষ ক'রে রেখেছ বাছা!'

তাঁহার কণ্ঠস্বর ভাবী হইয়া অশ্রুপতনের আভাস দিল। সুধা প্রতিবাদ করিল না। দোষটা তাহার স্কন্ধে চাপাইয়া মা যদি শান্তি পান, ভাল কথা।

খানিক মৌন থাকিয়া সে অবশেষে বলিল, 'তাঁরা বড়লোক, আমরা গরীব। আমাদের সেখানে যাওয়াটা—'

সুনয়নী দেবী মেয়ের মূঢ় প্রশ্নে জ্বলিয়া উঠিলেন, 'গরীব বড়লোক ব'লে সম্বন্ধটা কি হাত দিয়ে কেউ মুছে ফেলতে পারে? গরীব ব'লে সে কি আমাদের এত দিন হেনস্থা করেছিল? মাস মাস টাকা পাঠায় নি তোর লেখাপড়ার জন্যে? জ্বালাস নে, বাপু। একে মরছি রমলার জন্যে, তায় তোরা পাঁচ জনে লেগেছিস আমার পেছনে।' শুইয়া পড়িয়া তিনি ফোঁস ফোঁস করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

মায়ের অবস্থা দেখিয়া সুধা বেচারী সকাল হইতেই কেমন বিস্ময় অনুভব করিতেছে। মায়ের গল্প বা কান্না'র মধ্যে তাই সে কোন অর্থই খুঁজিয়া পায় নাই। তার কেবলই মনে হইতেছে, এ-সমস্তের মধ্যে কোথায় মস্তবড় একটা অসঙ্গতি রহিয়াছে—যার কথা মা হয়ত নিজেই জানেন না।

যাহা হউক মাকে সান্ত্বনা দিবার ছলে সে বলিল, 'মাসীমার শ্রাদ্ধে যাবে—ভাল কাপড় পরে নাইবা গেলে, মা। এ ত আর বিয়ের নেমন্তন্নে যাওয়া নয়।'

সুনয়নী দেবীর মনে কথাটা লাগিল। মেয়ে বড় হইয়াছে, কিছু লেখাপড়াও শিখিয়াছে, কথাটা বলিয়াছে নেহাৎ বুদ্ধিহীনার মত নহে। সত্যই ত, তাঁহার আদরিণী ভগিনীর শ্রাদ্ধে—সেখানে স্নেহময়ী দিদির সাজসজ্জা করিয়া যাওয়াটা খুবই লজ্জার কথা। পাঁচ জনে কিছু না বলুক, নিজের একটা বিবেচনা আছে ত!

সোৎসাহে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া তিনি বলিলেন, 'কাপড়গুলো এ-ঘরে নিয়ে আয় ত, মা। দেখি ওর মধ্যে ছেঁড়াখোড়া না-হয়, ব্লাউজের মিল থাকে—'

৪

ছেঁড়াও নহে, ব্লাউজের মিলও আছে—এমন কাপড় খান-দুই মিলিল।

সুনয়নী স্বামীকে বলিলেন, 'একখানা গাড়ী ভাড়া ক'রে তুমিই না-হয় আমাকে রেখে এস সেখানে। সুধা রইল, এ-চারটে দিন সে চালিয়ে নেবে'খন।' একটু থামিয়া কণ্ঠস্বর নামাইয়া বলিলেন, 'সেখানকার ভাবগতিক দেখি, সুধার বিয়ে ব'লে অন্তত শ-খানেক টাকা যদি নিতে পারি।'

স্বামী বলিলেন, 'ট্যাক্সিই ডাকি তাহ'লে?'

সুনয়নী তাড়াতাড়ি কহিলেন, 'না, না, ঘোড়ার গাড়ীই ভাল। সে বড়লোকের কাণ্ডকারখানা, কোথায় কে তার ঠিক নেই; ভাড়া যদি তারা দিতে না আসে তখন সেটা পড়বে আমাদেরই কাঁধে।'

বুদ্ধিমতী সুনয়নীর কথাই ঠিক হইল।

প্রকাণ্ড বাড়ীর প্রকাণ্ড দেউড়িতে জনকয়েক দারোয়ান জটলা করিতেছিল, এ-বাড়ীর ছেলেদের কাহাকেও দেখা গেল না। অবশ্য, ছেলেদের কাহাকেও দেখিলেই তাহারা যে এই বাড়ীরই তাহা সুনয়নী বলিতে পারিতেন না, তবে পরিচয়ের খেই কতকটা হয়ত ধরিতে পারিতেন।

কেহ অভ্যর্থনা করিতে আসিল না দেখিয়া সুনয়নী গায়ের দশ বৎসরের পুরাতন সিল্কের চাদর-খানার একাংশ মাথায় তুলিয়া দিয়া স্বামীকে বলিলেন, 'তুমি যাও, আমি চিনে যেতে পারব'খন।'

গাড়ীভাড়া চুকাইয়া স্বামী ট্রাম ধরিলেন, সুনয়নী সন্তর্পণে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিলেন।

সে-কালের বনিয়াদী বড়লোকের বাড়ী। খানিকটা অন্ধকার-ভরা গলি পার হইতেই প্রকাণ্ড ঠাকুরদালানের উঠানে আসিয়া নামিলেন। দালানের বড় বড় ফোকরগুলি দরমার বেড়া দিয়া ঢাকা, পাছে চামচিকা বা পারাবতকুল উহার মধ্যে বাসা বাঁধিয়া পালকে ও পুরীষে দুর্গন্ধময় করিয়া তুলে তাহার জন্য এই সতর্কতা। পূজার দালানের চারি দিকে চকমিলানো বারান্দাসমেত ঘর। উঠানটিতে ছেলেরা অনায়াসে বল খেলিবার মাঠ তৈয়ারী করিতে

পারে। কিন্তু আশ্চর্য্য, না দালানে, না উঠানে, না বা চকমিলানো দ্বিতল বারান্দায় লোক দেখা যায়। শোকের ঝড় যে বাড়ীখানির উপর দিয়া ভাল ভাবেই বহিয়া গিয়াছে, সুনয়নী তাহা বুঝিলেন। রমলার অশরীরী আত্মা হয়ত বা এই জনহীন পুরীর গাম্ভীর্য্যে চলাফেরা করিতেছে। কথাটা মনে হইতেই তাঁহার গা ছম-ছম করিয়া উঠিল এবং চোখ-কান বুজিয়া ঠাকুরদালানের পাশ দিয়া যে-পথ অন্দরাভিমুখে গিয়াছে তাহার মধ্য-বর্ত্তিনী হইলেন। মাঝপথে আসিতেই ও-বাড়ীর কোলাহল কানে গেল। কোলাহলটা বেশী বলিয়াই মনে হইল। পূজার বাড়ীতে রমলার আত্মা নির্জ্জন গাম্ভীর্য্যে অমর দেহ লাভ করিতেছে, অন্দরে শরীরী রমলা হয়ত বা জাগিয়া বসিয়া আছে! এক পারে মরণ, আর এক পারে জীবন!

অন্দরে প্রবেশ করিবার মুখে সুনয়নী একবার থামিলেন, ভাবিলেন, ভগিনী-পুত্র বা পুত্রবধূ যাঁহারই সম্মুখে গিয়া পড়ুন না কেন—পরিচয় দিতে তাঁহার বাধিবে কি না? না, বাধিবে না, শোকের পরিচয়-পত্র ত তাঁহার সঙ্গেই রহিয়াছে। মাতৃ বা শ্বশ্রূহারাদের দেখিলেই চোখের জল দিয়া সেই পরিচয়-লিপি ভাল করিয়া লিখিবেন। ভগিনীর বিয়োগ-দুঃখে তিনি কাঁদিলেই তাহাদেরও চোখে জল ঝরিবে এবং পরস্পরকে সান্ত্বনা দিবার সুযোগে পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইবেন। বাজে দাসদাসীর সামনে কাঁদিলে কোন ফল হইবে না।

৫

অন্দরে ঢুকিতেই প্রথমে নজর পড়িল, একটি অল্পবয়সী বধূ কয়েকজনকে কি উপদেশ দিতেছেন। বধূর বর্ণ শ্যাম, বয়স, শাড়ী ও অলঙ্কার-প্রাচুর্য্যে অনুমান করা দুঃসাধ্য। তবে শ্রী আছে, কর্ত্তৃত্বের একটি মর্য্যাদা তাহার চালচলনে ফুটিয়া উঠিতেছে। যদি না দামী জর্জ্জেট শাড়ী ও অঙ্গ ভরিয়া অলঙ্কার পরিয়া সে থাকিত ত তাহাকেই রমলার পুত্রবধূ ভাবিয়া সুনয়নী কাঁদিয়া আছাড় খাইয়া না পড়ুন—অন্তত মাটিতে বসিতেন! কিন্তু ঐ বধূটি কিছুতেই রমলার পুত্রবধূ নহে। কারণ, এত বড়লোকের ঘরের বউ শ্যামবর্ণের হইতেই পারে না, এবং রমলার বড় আদরের আদরিণী বধূ কোন্ দুঃখে একতলার স্যাঁতস্যাঁতে বারান্দায় পা দিয়া দাসদাসীদের উপদেশ দিতে আসিবে! তা শ্বশ্রূবিয়োগে শোকাতুরা বধূর যে ছবিটি সুনয়নী দেবী মনের মধ্যে আঁকিয়াছেন, ইহার সৌভাগ্যগর্ব্বিত হাসিমাখা মুখখানিতে সেই পরমক্লেশের একটি মাত্রও ক্লান্ত রেখাই বা কোথায়?

সামনের সিঁড়ি দিয়া তিনি দ্বিতলে উঠিলেন। দ্বিতলে উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে সুনয়নীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতেও যেন মরিচা ধরিবার উপক্রম হইল। চওড়া বারান্দায় এত বিভিন্ন বয়সের মেয়ে দেখা গেল যে, কে বা এই বাড়ীর বধূ, কেবা আমন্ত্রিতা কুটুম্বিনী কিছুই বোঝা যায় না। বর্ণের মধ্যে শ্যাম আছে, গৌর আছে, দুধে-আল্‌তা আছে। শাড়ী ও বেশভূষায় কেহ রাজেন্দ্রাণীতুল্যা, কাহারও বা বনিয়াদী চাল, কেহ আধুনিকা, কেহ বা একাল-সেকালের মধ্যবর্ত্তিনী। কাহারও মুখে হাসি-কৌতুকের হাল্কা আলো, কেহ বা বর্ষাসন্ধ্যার মত ম্লান, কাহারও শ্রী গাম্ভীর্য্যে ফুটিয়াছে, কেহ বা কুয়াশাম্লান শীতের রাত্রির চাঁদ। মাথা ঘুরিবারই কথা; সহজ পরিচয়ের যোগসূত্রটি কোথায় ছিঁড়িয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সুনয়নী দেবী এক হাট অপরিচিতা রমণীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাই থামিয়া উঠিলেন। একটি মেয়ে তাহার পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, 'কে গা তুমি? কি চাও?'

মেয়েটির প্রশ্নে আর পাঁচ জনেও সুনয়নীর পানে চাহিল এবং একসঙ্গেই কৌতূহলভরা বিচিত্র কণ্ঠের কলরব তুলিল। সুনয়নী আর নিজেকে সামলাইতে পারিলেন না। সহজ উত্তরটা তাঁহার পক্ষে এমনই শক্ত হইয়া উঠিল যে, কোন কথা না বলিয়া তিনি সেই মেঝের উপরই বসিয়া পড়িলেন এবং ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিলেন।

৬

যখন চক্ষু চাহিলেন, তখন পরিচয়ের পরম লগ্ন বহিয়া গিয়াছে। সে-চক্ষুতে বিস্ময় ছিল প্রচুর, জল ছিল না এতটুকু, এবং শ্যামবর্ণের সেই বধূটি—যাহাকে একতলায় সর্ব্বপ্রথম দেখিয়াছিলেন—একখানা সোফার উপর বসিয়া তাঁহার দিকে চোখ রাখিয়া পার্শ্ববর্ত্তিনীদের পানে চাহিয়া হাসিয়া হাসিয়া কথা বলিতেছেন দেখিয়া সুনয়নীর বুঝিতে বাকী রহিল না, কি সাংঘাতিক ভুলই তিনি করিয়াছেন। গরীবের শোকপ্রকাশের ভঙ্গী আর বড়লোকের শোক প্রকাশের শোভা দুইয়ে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। গরীবের যেখানে দৈন্য, বড়লোকের সেইখানে মর্য্যাদা। গরীবের হাসির অশোভনতা আর বড়লোকের হাসির শালীনতা—প্রকাণ্ড হলে

যেমন মাটির প্রদীপ আর বিদ্যুৎ-বাতি! একই জিনিষ ক্ষেত্র-হিসাবে মানায় ভাল।

সুতরাং না কাঁদিয়াও ক্ষীণকণ্ঠে পরিচয় দিতে হইল, অবশ্য, যতটা পারিলেন করুণ রসের খাদটা মিশাইয়া দিলেন।

'আর মা, আমরা বুড়ো'-হাবড়া—আমরা রইলাম পড়ে, ভাগ্যিমানী এযোরাণী রমু আমার ড্যাংডেঙিয়ে চ'লে গেল! পোড়া যমের কি আক্কেলও নেই, মা। বড় বোন থাকতে ছোট বোনকে টেনে নেয়! আহা! রমু আমার দিদি বলতে অজ্ঞান—'

পাশের একটি সৌন্দর্য্যময়ী মেয়ে বলিল, 'আপনাকে ত আমরা দেখি নি কোন দিন—এ বাড়ীতে।'

সুনয়নী শুষ্ক চক্ষে অঞ্চলাগ্র ঘষিতে ঘষিতে উত্তর দিলেন, 'দেখবে কি, মা! এ-পোড়ামুখ দেখবার মত ত নয়, আমি অভাগী—'

কথাটা শেষ হইতে পাইল না। চারি দিকে চাপা ও সকৌতুক হাস্যধ্বনি উঠিল, থতমত খাইয়া সুনয়নী থামিলেন, এমন কি অসংলগ্ন কথা তিনি বলিয়াছেন যাহাতে কৌতুকের সৃষ্টি হইতে পারে!

সেই মেয়েটি পুনরায় প্রশ্ন করিল, 'আপনি তাঁর কে হন? বোন বলছেন, কিন্তু তাঁর কোন বোন ছিল ব'লে ত আমরা শুনি নি?'

সুনয়নী তাড়াতাড়ি বলিলেন, 'রমু আমার খুড়তত বোন। তা আপন বোনেও—'

বাধা দিয়া মেয়েটি বলিল, 'তাঁর খুড়ো কি জ্যেঠা ছিল ব'লে ত শুনিনি তাঁর মুখে!'

সুনয়নী একটু থামিয়া বলিলেন, 'আপন খুড়ো ত নয়, দূর-সম্পর্কের—'

'বুঝেছি।' বলিয়া মেয়েটি হাসিল।

সুনয়নী তাহার হাসি লক্ষ্য না করিয়াই বলিয়া চলিলেন, 'আমার দুঃখ রমু বুঝত, তাই মাসে মাসে তার বোনঝির পড়বার জন্য পাঁচটা ক'রে টাকা পাঠাত। এমন সতীলক্ষ্মী দয়াবতী বোন—তাকে কি যম'—

কিন্তু করুণ রস জমাইবার অবসর না দিয়া শ্যামবর্ণা বউটি মেয়েটির পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, 'ঠাকুরঝি আর জ্বালাস নে, খাতাখানা খোল দেখি। কি নাম আপনার?'

সুনয়নী ক্রমশঃই নিস্তেজ হইয়া আসিতেছিলেন। ইহারা ক্রন্দনের অর্থ বুঝিতে চাহে না, সম্পর্কের খুঁটিনাটি বিচার করে। প্রচণ্ড শোককে সম্মুখে লইয়া মানুষ এমন প্রাণখোলা হাসিই বা হাসে কি করিয়া? শাশুড়ী বউয়ের কাছে বালাই হইতে পারেন, মেয়ের মনে মমতার লেশ মাত্রও কি নাই!

মেয়েটি খাতার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি নাম আপনার বলুন না?'

সুনয়নীর চিন্তাসূত্র ছিঁড়িয়া গেল, ত্রস্তে বলিলেন, 'শ্রীমতী সুনয়নী দেবী।'

খস্ খস্ শব্দে তাহার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে মেয়েটি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, 'টাকা কি বরাবর আপনার নামেই যেত?'

'হাঁ, মা।'

'এই যে। ১০।১। বি···লেন, সুনয়নী দেবী।'

শ্যামবর্ণের বউটি জিজ্ঞাসা করিল, 'রিমার্কের ঘরে কিছু আছে?'

'এই যে—'বলিয়া মেয়েটি মৃদু হাসিয়া এক জায়গায় অঙ্গুল রাখিল।

'ও'—বলিয়া বউটিও হাসিল।

৭

বউ এবং মেয়ের নির্দ্দেশমত সুনয়নীর বাসা যেখানে নির্দ্দিষ্ট হইল, সেটা একেবারে অন্দরের শেষ। পুরানো দোতলা ঘর, দুয়ার কম, জানালা একটির বেশী ছুটি নাই। বৎসরে একবার করিয়া গোলা ফিরানো হইলেও অত্যন্ত পুরাতন বলিয়া নোনা ধরিয়া সেই চুণ-কামের শ্রী ভাল করিয়া ফুটিতে পায় না। শ্রী না ফুটিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই, কারণ এই মহলে যাহারা আশ্রয় লাভ করে, তাহাদের সঙ্গে বাসভবনের বিশেষ যোগসূত্র থাকা বাঞ্ছনীয় বলিয়াই হয়ত ইঁহারা মনে করেন না।

ঘরের সাজসজ্জা মন্দ নহে। ইচ্ছা করিলে ছোট খাট একখানা মিলিতে পারে, ইচ্ছা করিলে মেঝেয় শয়নের ব্যবস্থাও আছে। জাপানী চিত্র-বিচিত্রিত মাদুর, ধবধবে চাদর, বালিশ ও পাতলা তোষক একখানা করিয়া সকলেই পাইয়াছেন। আর পাইয়াছেন হাত-পা ধুইবার জন্য পিতলের ঘটি, মাঝারি বালতি জলপানের জন্য এলুমিনিয়মের গ্লাস। ঘরের কোণে জলভরা একটি কুঁজো আছে, বিদ্যুৎ-কল্যাণে দিয়াশলাই হাতড়াইতে হইবে না। বেশ ব্যবস্থা। অতিথি সৎকারের জন্য এই সার্ব্বজনীন ব্যবস্থাটা সুনয়নীর মনঃপূত হইল না।

একটি মেয়ে আর পাঁচ জনের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে বহুক্ষণ হইতে সুনয়নীকে লক্ষ্য করিতেছিল এবং ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতেছিল। মেয়েটির বয়স

পঁচিশ-ছাব্বিশ হইতে পারে, ত্রিশ-বত্রিশ হওয়াও আশ্চর্য্যের নহে। সজ্জার পারিপাট্যে যেমন বয়স অনুমান করা সময়ে সময়ে দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, শ্রীহীনার যৌবনের সৌষ্ঠব তেমনই সব সময়ে প্রকাশ গৌরব লাভ করে না। মেয়েটির হাসি শোকের বাড়ীতে দুঃস্বপ্নের মতই বোধ হয়।

সুনয়নী অপ্রসন্ন কটাক্ষে মেয়েটির পানে চাহিবামাত্র সে সশব্দে হাসিয়া উঠিল, এবং হাসিতে হাসিতেই তাহার কাছে আসিয়া বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, 'আজ এলেন বুঝি? তা আপনি রমলাদির কে হন?'

সুনয়নী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মনের অপ্রসন্নতাকে নীরবে প্রকাশ করিলেন, কথা কহিলেন না।

মেয়েট ভ্রূকুঞ্চনে হাসি থামাইল না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা মাত্রা বাড়াইয়া কহিল, 'যাঁর সঙ্গে গল্প করছিলুম উনি সম্পর্কে রমলাদির পিসি। কাল এলেন। আসবামাত্রই সে এক মহামারী ব্যাপার। পড়লেন আছাড় খেয়ে কলতলায়, সঙ্গে সঙ্গে সে কি মড়াকান্না! সবাই অবাক্। ধরাধরি ক'রে নিয়ে এল এই মহলে। বুড়ো মানুষ হয়ত হাত-পা ভেঙে গেছে ব'লে ডাক্তারকে দেওয়া হ'ল খবর। ডাক্তার এসে দেখলেন, হাত-পা ত ভাঙেই নি—কোথাও আঁচড়টি পর্য্যন্ত লাগে নি ওঁর।' বলিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

সুনয়নী কথা কহিলেন না।

হাসি থামিলে মেয়েটি পুনরায় আরম্ভ করিল, 'আর ওঁর পাশে ব'সে যিনি হাত নেড়ে কথা কইছেন, উনি মাসী। তিন টাকা মাসোহারা পেতেন, থাকতেন কাশীতে। তা বোনঝির শোক পেয়ে মাথা এমন খারাপ হয়ে গেছে যে রাতের খাবার লুচি থেকে কাল চারখানা সরিয়ে রেখেছিলেন, আজ সকালে জল খেলেন।'

আবার দমকা হাসি।

সুনয়নী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'আমার শরীর খারাপ, আপনি দয়া ক'রে ঘরে যান।'

মেয়েটি পা ছড়াইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিল ও পূর্ব্বের মতই হাসিতে হাসিতে বলিল, 'পিস্-শাশুড়ীর কথাটা শুনবেন না? আহা! খাতায় দু-টাকা মাসোহারা ছিল শুনে যা শাপমন্নিটা দিলেন আজ। বলেন, চিরটা কাল চার টাকা ক'রে পেয়েছি—এখন হ'ল দুই?'

সুনয়নীর মুখ হইতে হঠাৎ বাহির হইল, 'তার মানে?'

'মানে সোজা। এঁরা কুটুম্ব-বিদায় দেবেন একখানা কাপড়, এই বিছানাপত্র সব আর যে যত টাকা ক'রে মাসোহারা পেতেন—তাঁকে এককালীন টাকায় দশ টাকা ক'রে। বুঝে দেখুন পিস্শাশুড়ীর লোকসান কত!'

সুনয়নী শুইয়া পড়িবার উদ্যোগ করিলেন।

হাসি থামাইয়া মেয়েটি পুনরায় কহিল, 'আর মামীর কথাটা শুনুন। ওই যে খয়ের স্কার্ট শাড়ী প'রে ঘুরে বেড়াচ্ছেন 'দস্যি'র মত, উনি। ও-মহলে গিয়েছিলেন কাজ করতে। বলেন, 'কাজের বাড়ী, গতর কোলে ক'রে ব'সে থাকা কি ভাল!' বউরাণী কি বলেছেন জানেন? বলেছেন, আপনারা নিকট-আত্মীয়, আপনাদের কি খাটাতে পারি! ও-সব ঠাকুর-চাকরের কাজ ওরাই করবে।'

কথাটার মানে বুঝিতে না পারিয়া সুনয়নী অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

মেয়েটি হাসিতে ফাটিয়া পড়িয়া কহিল, 'আপনি ত ভারি বোকা! বুঝলেন না? পরকে কেউ কি বিশ্বাস ক'রে ভাঁড়ারে হাত দিতে দেয়! আমরা খুব নিকট-আত্মীয় কিনা!'

সুনয়নী শুইয়া পড়িয়া কহিলেন, 'আঃ, মাথাটা যা হয়েছে!' মেয়েটি হাসি থামাইয়া কহিল, 'টিপে দেব একটু? না, বেশ ত আপনি! ওঁরা বড়লোক, ওঁদের সঙ্গে সত্যিকারের সম্বন্ধ হয়ত গড়ে ওঠে না, কিন্তু আপনার আমার মধ্যে কেন ফাঁক থাকবে? দিই না টিপে?'

সুনয়নী বিরক্ত হইয়া ঝাঁঝিয়া উঠিলেন, 'না।'

অগত্যা মেয়েটি ক্ষুণ্ণমনে উঠিল এবং দুয়ারের বাহিরে পা দিয়াই হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'কিন্তু বললেন না ত—আপনি রমলাদির কে?'

ঝাঁঝের মুখেই সুনয়নী উত্তর দিলেন, 'কেউ নই।' মেয়েটি হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

৮

সুনয়নী ঝাঁঝের মুখে উত্তর দিলেন বটে 'কেউ নই', কিন্তু মন স্থির করিয়া আর একবার সম্বন্ধ-বন্ধনের কথাটা ভাবিতে বসিলেন।

কে বলিল, রমলার সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ওই পাতানো মাসী-পিসির মতই মৌখিক! রমলার মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তি মাত্র তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদেন নাই সত্য, ইচ্ছা করিলে সেই মুহূর্ত্তে চোখে নদী বহাইয়া কাঁদাটা কিছু বিচিত্র ছিল না। স্নেহ

না থাকিলে রমলা তাঁহাকে মাস-মাস টাকা পাঠাইত না। আর তিনিও কি ওই দুঃশীলা পিস্‌শাশুড়ীর মত কম প্রাপ্তির লোভে রমলার মেয়ে বউকে শাপান্ত করিতে পারিতেন? রমলার মেয়ে ও বউ যদিও ঐ সমস্ত মুখসর্ব্বস্ব আত্মীয়ের ব্যবহারে আসল-নকলের পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার বাসস্থানও এই অতিথিশালায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে, তবু, আজ হউক কাল হউক, সে ভুল তাহাদের ভাঙিবেই। বাল্যের সাহচর্য্যে মধু বা বিষ কোনটাই দুই বোনের অন্তরে জমা ছিল না, যৌবনের হৃদ্যতায় আন্তরিকতা খানিকটা ছিল বইকি। যে দূর-সম্পর্কের খুড়তুত বোনের ঐশ্বর্য্য লইয়া তিনি পাঁচ জনের কাছে নিজেকে বিস্ফারিত করিয়া অতুল আনন্দ ও গৌরব উপভোগ করিয়াছেন, হয়ত নিরালা মুহূর্ত্তে সেই ঐশ্বর্য্যের অগ্নিশিখা নীরবে তাঁহাকে দগ্ধ করিয়াছে। দগ্ধ করিলেও সেই ভস্মরাশি তিনি কোন দিনই মুখে মাখেন নাই।

বাড়ী ফিরিয়া তিনি প্রতিবেশিনীদের কাছে গল্প করিবার অনেক কিছু পাইবেন। চোখোচোখি এমন সমারোহময় প্রাসাদ ও রাণীতুল্যা বউঝির দেখা কম ভাগ্যের কথা নহে। তিনি ভাগ্যবতী বলিয়াই এমনধারা একটা রাজসিক ব্যাপারে নিমন্ত্রিতা হইয়াছেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি চক্ষু মুদিলেন ও কল্পনা করিলেন, এই প্রাসাদের চেয়ে সেই দুখানি স্যাঁতসেঁতে এক তলার চুণবালি-খসা অন্ধকারময় ঘরের মূল্য কতখানি। তুলনা করিলেন, এখানকার ফরসা চাদর, নূতন মাদুর ও বালিশ-তোষকের সঙ্গে সেই দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা ছেঁড়া কাঁথা, ফুটা বালিশ ও ছেঁড়া মাদুর। এখানে দিনে পাঁচ তরকারি ভাত, রাত্রিতে লুচি আর সেখানে মোটা চালের সঙ্গে একটিমাত্র তরকারি, এক বেলার আয়োজনে দুই বেলা চলিয়া যায়।

আর লাভের কথা? এই কয় দিন রাজভোগ ছাড়া বিদায়কালের মোটা লাভটা,—এই বিছানা, বালিশ, মাদুর, চাদর, ঐ বালতি, ঘটি, গ্লাস, গামছা। আর পাঁচ টাকা মাসোহারার এককালীন পঞ্চাশ টাকা প্রাপ্তি। কাজ করিতে হইবে না, কাঁদিতে হইবে না, চাই কি, ওই পিস্‌শাশুড়ীর মত শাপমন্যি দিলেও এককালীন টাকাটা কেহ বন্ধ রাখিতে পারিবে না। খাতায় রমলার নিজের হাতের লেখা যে।···

কক্ষান্তরে মেয়েটির খিল খিল হাস্যধ্বনি শোনা গেল এবং সুনয়নীর বুকে সেই হাসির শাণিত তীর সজোরে আসিয়া বিঁধিল। ছটফট করিতে করিতে তিনি উঠিয়া বসিলেন। ঐ হাসির বিষাক্ত তীর বাহির করিতে না পারিলে তাঁহার মৃত্যু বুঝি অনিবার্য্য! তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, প্রাসাদের সমস্ত প্রসাদ ভোগ করিবেন, অথচ পাঁচ জনের কাছে সে কাহিনী বর্ণনা করিয়া সেই তীব্র সুখকে হয়ত আর উপভোগ করিতে পারিবেন না! এই হাসি তাঁহার আজন্মপোষিত মনোবৃত্তিকে পলে পলে ধ্বংস করিয়া দিতেছে।···

পুনরায় তিনি শুইয়া পড়িয়া দুই হাতে কান ঢাকিয়া রমলার ভালবাসা, সম্পদের আড়ম্বর এবং আপনার লাভকে প্রাণপণে স্মরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য, এই পরম প্রাপ্তির উল্লাসকে মনের মধ্যে যতই নিবিড় করিয়া রচনা করিতে লাগিলেন, সুনয়নীর চোখের কোলের আর্দ্রতা ততই যেন বিন্দু রচনায় অদম্য হইয়া উঠিল।

সংশোধন

এ অঞ্চলে ধনঞ্জয়ের বিজ্ঞ-খ্যাতি ছিল। আপদে-বিপদে পরামর্শ লইবার জন্য লোকে দুবেলা তাঁহার চণ্ডী-মণ্ডপে ভিড় জমাইত। জলচৌকির উপর হইতে লাল খেরো বাঁধানো নাতিবৃহৎ খাতাখানি হাসিমুখে টানিয়া লইয়া ধনঞ্জয় তাহাদিগকে সুপরামর্শ দিতেন ও আপন দৈনিক অভিজ্ঞতার কথা তাহাতে লিপিবদ্ধ করিতেন। সংসার তাঁহার বড় ছিল না। কিঞ্চিৎ জমিজমার কল্যাণে ও স্কুলমাষ্টারী করিয়া তাহা ভাল ভাবেই চলিত।

.ইদানীং চাষবাসের অবস্থা মন্দ হওয়াতে চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। নতুবা এক সময়ে তাঁহার খাতার দুই নম্বর উপদেশমালায় লিখিত ছিল:

"পরের দাসত্বই যত অনর্থ বা অসুখের মূল।"

পরে অবশ্য আর্থিক অবস্থা মন্দ হওয়াতে বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে ঐ উপদেশমালার নিম্নরূপ সংশোধন হইয়াছিল:

"কিন্তু সংসারের সুখশান্তি রক্ষার্থে আর্থিক উন্নতির প্রয়োজন আছে। তবে এ চেষ্টা অপ্রবাসী থাকিয়া করাই বাঞ্ছনীয়।"

একমাত্র পুত্রকে বাল্যকাল হইতে কাছে বসাইয়া খাতা খুলিয়া প্রথম উপদেশমালার উপর আঙুল বুলাইয়া বার-বার আবৃত্তি করাইলেন:

"অঋণী ও অপ্রবাসী না হইলে মানুষের জীবন সুখকর হয় না।"

ধনঞ্জয় গত হইলে পুত্র জীবন দেখিল নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ছাড়া পিতা বিশেষ কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

প্রথম, বিঘা দশেক জমি। সুবৃষ্টি হইলে জোতদারের প্রাপ্য ও জমিদারের খাজনা দিয়া মাসছয়েকের অন্নসংস্থান কোন প্রকারে হইতে পারে। সারা বছর সুশৃঙ্খলে সংসার চালাইবার জন্য পিতা তাহার শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সংসারই চলিত, নগদ এক পয়সা জমিত না। জমিবে কি করিয়া? জীবনকে উচ্চশিক্ষা দিবার জন্য যথেষ্ট ব্যয় তিনি করিয়া গিয়াছেন।

দ্বিতীয়, বিধবা ভগ্নী ও জননী।

তৃতীয়, তরুণী পত্নী। ধনঞ্জয় গত হইবার বৎসর খানেক পূর্ব্বে এই শুভকার্য্যটি সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন।

শোকের বেগ কথঞ্চিত প্রশমিত হইলে জীবন পিতৃপদ-প্রাপ্তির জন্য স্কুল-কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হইল। কিন্তু এই সময়ে স্কুল-সেক্রেটারীর কোন দূরতম আত্মীয় বি, এ, পাস করিয়া বেকার হইয়া পড়ায় জীবনের এ দাবী টিঁকিল না।

রাত্রিতে রমার সহিত জীবন পরামর্শ করিতে বসিল।

—বুঝলে রমা, দেশ না ছাড়লে অন্ন মেলা কঠিন।

রমা আব্দারের ভঙ্গীতে বলিল—এই যে এত লোক দেশে রয়েছেন, তুমি কি বলতে চাও, এঁরা না খেয়ে শুকিয়ে মরছেন?

—তাঁরা একটা-না-একটা কাজ নিয়ে আছেন।

—তুমিও তাই নাও।

রমার যুক্তিকে কাটিবার জন্য জীবন বদ্ধপরিকর হইল। বলিল—কিন্তু সে-কাজ আমি পারব কিনা—তাও তো দেখতে হবে।

রমা ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল—ইস্, না পারলেই হ'ল আর কি! তবে বি, এ, পাস করেছ কি করতে?

জীবন মনে মনে অত্যন্ত খুশী হইল। রমার যুক্তিতে অসারবত্তা যতই থাকুক না কেন জীবনের অর্জ্জিত বিদ্যার প্রতি গৌরব বোধ ত যথেষ্টই ছিল। সামান্য মানুষ যদি দেশে বসিয়া কায়িক পরিশ্রমে স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ করিতে পারে, জীবন এ-হেন উচ্চশিক্ষা পাইয়াও কেন বিদেশে যাইবে? কিন্তু অন্যের উপজীব্য কর্ম্মগুলির বিশ্লেষণ করিতে গিয়া জীবনের মনের আনন্দ মিলাইয়া যাইতে লাগিল।

সে তর্ক তুলিল—ধর, চিনিবাসের মত গরুর গাড়ীর চাকা তো আমি তৈরী করতে পারব না।

স্বামীর পেশী-ক্ষীণ বাহুর পানে চাহিয়া রমা নীরবে শিরশ্চালনা করিল।

—ধর, কেষ্টর মত আগুনের হাপর জ্বেলে ঠনাঠন লোহা পিটতেও পারব না।

শিরশ্চালনে এবারও রমার নীরব সম্মতি পাওয়া গেল।

—কিংবা হরিময়রার মত তাড় নেড়ে সন্দেশ তৈরি করতে বা সিঙ্গাড়া-কচুরি ভাজতে পারব না।

রমা এবার ঘাড় নাড়িল না, চোখে ঈষৎ বিস্ময় লাগিয়া রহিল।

জীবন সে বিস্ময়ের মর্ম্মগ্রহণ করিয়া বলিল—কলেজের শিক্ষা বাইরের জগতের জ্ঞান বাড়ায়, সিঙ্গাড়া-কচুরি ভাজতে শেখায় না, ও শিক্ষা আলাদা।

রমা শুধু বলিল, "তারপর?" বোঝা গেল, ময়রার কার্য্য গ্রহণটিও ঐ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের দ্বারা সে বাতিল করিয়া দিল।

—পারব উড়েদের মত কাঠ চেলাতে, জল তুলতে? রাজমিস্ত্রিদের মত কর্ণিক হাতে করে ঠনাঠন শব্দে ঘর গাঁথতে? না, গোয়ালার মত বাঁক বইতে?

রমা প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, না, না।"

উৎসাহিত জীবন উৎফুল্ল কণ্ঠে বলিল—জেলেদের মত মাছ ধরাও আমার কর্ম্ম নয়। এক দিন জল ঘাঁটলে তার পর দিন ডবল নিউমোনিয়া।

রমার মুখে আতঙ্ক পরিস্ফুট হইল।

—কাদা মেখে কুমোরদের মত হাঁড়ি-সরা তৈরি করা—

রমার আতঙ্কগ্রস্ত মুখের রেখা ঘৃণায় রূপান্তর গ্রহণ করিল। অসমাপ্ত কথার মুখে, 'ম্যাগো' শব্দের দ্বারা এটিও সে বাতিল করিয়া দিল।

—বলতে পার সেকরার কাজ। পরিশ্রম নেই, দিব্যি বসে বসে ঠুকঠাক করা।

রমার মুখচোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ঘরের সেকরা হইলে গহনার নিত্যনূতন প্যাটার্নের জন্য বানি লাগিবে না, মন্দ কি!

জীবন বলিল—এতেও তো কিছু মূলধন চাই। শিক্ষার কথা বাদ দিলাম, না হয় দুমাস ছ-মাস কোথাও কাজ শিখে নিতে পারব, কিন্তু মূলধনের জন্য তোমার গা খালি করতে হবে হয়ত—

স্বামীর জন্য এ-ত্যাগ রমার খুব বড় বলিয়া বোধ হইল না। সে বলিল—তা হোক। পসার জমলে এর দুনো গয়না—

জীবন হাসিল—পসার যে জমবেই, এমন কি কথা! এই পাড়াগাঁয়েই তো চার জন ভাল সেকরা রয়েছেন, দোকান তাঁদের অনেক দিনের, তবে অনিশ্চিতের পিছনে—

রমা তাড়াতাড়ি বলিল—থাক বাবু সেকরার কাজ, বামুনের ছেলে হয়ে করবে ঠুকঠাক? ছি! একটু থামিয়া বলিল—তার চেয়ে—

—থামলে কেন, বল?

—হয় মাষ্টারী, নয় পুরুৎগিরি।

—এ-গাঁয়ে মাষ্টারী জুটবে না, আগেই বলেছি। আর পুরুতগিরি? জান তো বাবার আদেশ—কখনও শূদ্রের বাড়ী যজন-যাজন করবে না। লোকেরই যা অবস্থা, ধর্ম্মকে পয়সা খরচ করে কটা লোক জীইয়ে রেখেছে বল?

—তা হলে উপায়? রমার কণ্ঠে হতাশার সুর।

—উপায় বিদেশ গমন।

—কিন্তু বাবার নিষেধ যে। বলিতে বলিতে রমার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিল—এক কাজ কর, তাহলে আর তোমায় দেশ ছাড়তে হবে না।

"কি কাজ?" উৎসুক মুখে জীবন প্রশ্ন করিল।

—চাষবাস কর। ভাগে জমি দিলে কতটাই বা ধান ঘরে আসে! মা বলছিলেন কাল যে, তুমি যদি একটু চেষ্টা কর তো কিছু জমি বাড়িয়ে নিয়ে নিজে চাষ-আবাদ করলে—

জীবন ম্লান হাসিয়া বলিল—খুব ভাল কথা। যা বিদ্যে অর্জ্জন করেছি, চাষের কাজে না লাগলেও ও কাজ যে চালাতে পারব না, তা নয়। কিন্তু দেহ? এই পোষাকী দেহে চড়া রোদ আর অবিশ্রান্ত জল সইবে তো? সেবার গ্রীষ্মের বন্ধে মনে আছে? এক দিন জলে ভিজে—'

—না, গো না, তুমি ইস্কুলমাষ্টারীই দেখ।

—আহা! তুমি যদি কোন স্কুলের সেক্রেটারী হতে!

—যাও, খালি তোমার ঠাট্টা।

জীবন হাসিয়া বলিল—কিন্তু ঠাট্টাই করি আর যাই করি, এই কপালে কি লেখা আছে জান?

—কি?

—প্রবাস বাস।

গ্রীবা বাঁকাইয়া রমা বলিল—বেশ তো, যাও না

বিদেশে। কে যেন ওঁকে মাথার দিব্যি দিয়ে থাকতে বলেছে এখানে!

ঈষৎ হাসিয়া জীবন বলিল—যেই বলুক, সে যে তুমিও নও—আমিও নই, তা আমরা দু-জনে মনে মনে বেশ জানি।

ক্ষুব্ধস্বরে রমা বলিল—তবে কে?

—বল দেখি কে? মুখ টিপিয়া টিপিয়া জীবন হাসিতে লাগিল।

রমা সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল—আর কারও তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই, তাই—

ক্রুদ্ধ রমার দুটি হাত নিবিড় আনন্দে পেষণ করিতে করিতে জীবন বলিল—সত্যি রমা, সে মাথা-ব্যথা তোমারও নয়, আমারও নয়। সে মাথাব্যথা আমাদের বয়সের।

"যাও।" বলিয়া বিপরীত দিকে গ্রীবা হেলাইবার পরিবর্তে জীবনের বুকের মধ্যেই সে মাথাটি গুঁজিয়া দিল।

স্বপ্ন আর বাস্তব জগতে চিরকালের সঙ্ঘাত। একটি বৎসর এই সঙ্ঘাতের মধ্যে কাটিয়া গেল। জীবনদের অবস্থা ক্রমেই নিম্নমুখী হইতে লাগিল। গুটি দশেক ছেলেকে সে বাড়ীতে পড়াইত। আরও গুটি দশেক ছাত্র হইলে মন্দ হইত না, কিন্তু সময় কোথায়? পাঁড়াগাঁয়ে টিউশনিতে যে পাইকারী রীতি প্রচলিত আছে, প্রথমটা তাহা গ্রহণ করিতে তাহার কিছু দ্বিধা ছিল। কিন্তু বেতন তাহাকে পাইকারী রীতিতেই লইতে হইত। যে কোন ক্লাসের ছাত্রকে দৈনিক দুই বা তদূর্দ্ধ ঘণ্টা পড়াইবার জন্য দেড় হইতে দুই টাকা পারিশ্রমিক লইয়াই তাহাকে সন্তুষ্ট হইতে হইত। না হইলে, প্রতিযোগিতার বাজারে ছাত্র-দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য।

প্রথম যখন সে টিউশনি গ্রহণ করে, তখন জনৈক অভিভাবকের সহিত নিম্নলিখিত রূপ কথাবার্তা হইয়াছিল:

—দেখুন, আমি ভেড়ার গোয়াল বসাব না বাড়ীতে। পৃথক পৃথক ভাবে শিক্ষা দেব ছাত্রদের, যাতে তারা ভাল ভাবে পাস করতে পারে।

অভিভাবক বলিয়াছিলেন—তা শিক্ষে আপনি যাই দিন, পাস করতে পারলেই হ'ল। পাসের আবার ভাল মন্দ কি! একটা চাকরি পেলেই হ'ল। মাইনে? থার্ড কেলাসে যদু মাষ্টারকে দিতাম দেড়' টাকা। এবার এক কেলাস উঠল, না-হয় আর চার গণ্ডা পয়সা ধরে দেব।

—দেখুন বিদ্যাশিক্ষা শাক-বেগুনের দরের মত কচলাকচলি ক'রে হয় না।

অভিভাবক রাগ করিয়া উঠিয়া গিয়াছিলেন, আর আসেন নাই, অন্যত্র তিনি দেড় টাকাতেই মাষ্টার পাইয়াছিলেন। এক দিন জীবনকে পথে পাইয়া শুনাইয়া দিয়াছিলেনও—হঁা, কপালে যার লোকসান নেই, তার অন্ন মারে কে! মাসে চার গণ্ডা পয়সা—মন্দ কি!

ঠেকিয়া জীবনকেও শিখিতে হইয়াছিল। ফলে, বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে দশ-বারটি ছাত্র লইয়া সকাল বৈকাল তাহার পাঠশালা বসিত। বিভিন্ন কণ্ঠের কর্ণবিদারক ধ্বনিতে দেবী বীণাপাণির হয়ত প্রাত্যহিক কর্ম্মের কিছু ব্যাঘাত ঘটিত, কিন্তু ছাত্রের অভিভাবকবৃন্দ সেই ধ্বনি-মাধুর্য্যে পুলকিত হইয়া উঠিতেন। মাহিনার রেট ছিল কিন্তু পাইকারী।

বর্ষার প্রকোপ এবার বেশী, এবং সংস্কার অভাবে চালের ছিদ্রও বাড়িয়া গিয়াছে। বাড়ীর মধ্যের ঘর দুখানিতে খুঁটি দিয়া লইলেও চলে, কিন্তু চণ্ডীমণ্ডপের আমূল সংস্কার চাই। জলে ভিজিয়া তো ছাত্রেরা মাষ্টারের কাছে পাঠ লইতে আসিবে না, নিরুপায়ে রমা হাতের শেষ সম্বল রুলি দুগাছি খুলিয়া দিয়াছে। রুলি খুলিয়া দিয়া ত্যাগের মহিমায় তাহার কচি মুখখানির জ্যোতি যে বাড়িয়া গিয়াছে, এমন নহে। জীবন তো সেকরার দোকান খোলে নাই, ছাত্র পড়াইতে বসিয়াছে। বর্ষাও বর্ষশেষে আবার আসিবে; পুরাতন খড়ও রৌদ্রবৃষ্টির অত্যাচারে কালো ও ভঙ্গুর হইবে। হস্তান্তরিত রুলি যে আবার সুকোমল করের শোভাবর্দ্ধন করিবে, সে আশা কম।

কিন্তু রুলির দুঃখে নহে, ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই এক দিন রমা বলিল—হ্যাঁ গা, আসছে বার যদি চাল ছাওয়াতে হয়, তখন কি করবে? কোথায় পাবে টাকা?

পরম নিশ্চিন্ত মনে জীবন বলিল—এ বছর ছাওয়ালাম, বছর দুই আর ওতে খরচ করতে হবে না।

তথাপি কৌতূহলাক্রান্ত স্বরে রমা প্রশ্ন করিল, বছর দুই পরে টাকা কোথায় পাবে?

জীবন ম্লান হাসিয়া বলিল—বছর দুই পরের কথা আজ ভেবে কি লাভ বল? তখনও কি আমার অবস্থা এমন থাকবে?

"কে জানে!"—মুখ ঘুরাইয়া রমা বলিল, "আকাশ থেকে তো টাকার বৃষ্টি হবে না, পাতাল ফুঁড়েও উঠবে না। এই ত ছেলে পড়ানো পয়সা, তখনই বা পাবে কোথায় শুনি?"

—রমা, তুমি যে এই দেড়বছরে এতটা হিসেবী হয়ে উঠেছ, তা জানতাম না।

—বেশ, গো, বেশ। ভাল কথা বললাম, না হিসেব-নিকেশ আনলে! কোত্থেকে টাকা আসবে শুনি?

জীবন বলিল—দেশে না উপায় করতে পারি বিদেশে যাব।

—পারবে বিদেশে যেতে?

—কেন পারব না, তোমরা যদি হাসিমুখে যেতে বল—

—ইস, বাবুর—অভিমান দেখ। কেন, কলকাতা কি ন-মাস ছ-মাসের পথ যে হাসিমুখে 'যাও' বলতে পারি না। ভারি ত দূর, দিনে দুবার যাওয়া-আসা চলে!

—আপিস করলে তো যাওয়া-আসা চলবে না, সেখানে থাকতে হবে।

—থাকবে সেখানে। শনিবার শনিবার ও-বাড়ীর ঠাকুরপো যেমন বাড়ী আসেন, তেমনি আসবে।

জীবন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল না। দীর্ঘনিশ্বাসকে সংক্ষিপ্ত করিবার বয়স ও অভিজ্ঞতা দুই-ই তাহার জন্মিয়াছে। ঈষৎ হাসিয়া বলিল—কিন্তু বাবার আদেশ অমান্য করি কি করে।

রমা গ্রীবা হেলাইয়া বলিল—বাবার খাতা বুঝি আমি দেখি নি? তিনি প্রথমে কি লিখে রেখেছিলেন দু নম্বর উপদেশমালায়? 'পরের দাসত্বই যত অনর্থের যত অসুখের মূল।' তার পর লিখেছেন, 'কিন্তু সংসারের সুখশান্তি রক্ষার্থে আর্থিক উন্নতির প্রয়োজন আছে।'

জীবন বলিল—তার পর লেখা আছে,—'তবে ও চেষ্টা অপ্রবাসী থাকিয়া করাই বাঞ্ছনীয়।'

রমা বলিল—তাই তো তোমায় এত দিন বিদেশে যেতে দেই নি।

জীবন বলিল—না তা নয়। আমার বিদেশ না যাবার মূলে বাবার উপদেশ ছিল উপলক্ষ্য মাত্র, আসল হেতু বয়স।

লজ্জায় লাল হইয়া জীবনের বুকে মাথা গুঁজিবার পরিবর্তে রমা সশব্দে হাসিয়া উঠিল। মাথা দোলাইতে দোলাইতে বলিল—আজ তবে যেতে দিচ্ছ কেন?

—প্রথম অভাব আর্থিক, দ্বিতীয় অভাব—

—কি?

—ওই বয়স। সে তো আর কমছে না।

রমা লজ্জায় মুখ নামাইয়া বলিল, "যাও।"

জীবন তাহার একখানি হাত ধরিয়া অল্প দোলা দিতে দিতে বলিল—যাবই তো। তবে যাবার আগে বাবার উপদেশমালার আর একটু সংশোধন ক'রে দিতে চাই। আন তো দোয়াত-কলম।

রমা কৌতুকভরে দোয়াত-কলম আনিয়া দিয়া বলিল—কিন্তু বেশী সংশোধন করতে হবে না মশাইয়ের।

—না গো, না। আজকালকার দিন হচ্ছে কথা সংক্ষেপের দিন—অবশ্য লেখার, বলবার নয়। ছোট একটি আদি অক্ষর তুলে দেব ঐ উপদেশমালা থেকে।

বলিয়া লাল কালির টান দিয়া একটি অক্ষরে দাগ দিয়া জীবন হাসিল।

রমাও হাসিতে হাসিতে পড়িল "কিন্তু সংসারের সুখশান্তি রক্ষ র্থে আর্থিক উন্নতির প্রয়োজন আছে। তবে এ চেষ্টা প্রবাসী থাকিয়া করাই বাঞ্ছনীয়।"

স্বপ্নজগতের স্বরূপ—মা, বোন, রমা এবং জীবন বহুদিন হইতেই উপলব্ধি করিতেছে, সুতরাং বিদেশ গমনের দিন ভাবদুর্ব্বল মুহূর্ত্তগুলিতে তেমন প্রাণ-সঞ্চার হইল না। স্বপ্নজগতের ভগ্নাংশ প্রাণে একটি সূক্ষ্ম বেদনার রেশ ধ্বনিত করিয়া তুলিল, বাস্তব জগতের অনাগত আশা-উজ্জ্বল আলোকে বাহিরটা পরমুহূর্ত্তেই ঢাকিয়া দিল। জীবনের আস্বাদ—শুধু ঘরের স্মৃতি নহে, পথের মায়াও দিতে জানে।

তখন চাকুরির বাজারে নানারূপ সমস্যা দেখা দেয় নাই—পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেকার কথা। জীবন স্বক্ষেত্রে শিক্ষকতাই একটি জুটাইয়া লইল। মাসিক মাহিনা চল্লিশ টাকা, পরে উন্নতির আশা আছে। বাড়ীতে ঘটা করিয়া দেবদেবীর পূজা দেওয়া হইল। বর্ষার জল-ধারাকে ভয় করিবার অবস্থা জীবন কাটাইয়া উঠিল।

শনিবার রাত্রিতে হাসিমুখে রমা জিজ্ঞাসা করিল—কেমন আছ?

হাসিমুখে উত্তর দিল—ভাল।

—একটু রোগা হয়ে গেছ।

—আর?

—একটু ফরসাও হয়েছ।

—আর?

—যাও, আর জানি না। কিন্তু এই পুলকমিশ্রিত লজ্জা ক্ষণিকের। পরমুহূর্ত্তেই মুখ তুলিয়া রমা বলিল—আমায় কেমন দেখছ বল তো?

—একটু মোটা।

রমা একটু ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল—আর?

—আর একটু কালো।

রাগ করিয়া রমা তক্তাপোষ হইতে উঠিতে গেল, টপ করিয়া জীবন তাহার হাত ধরিয়া বলিল—কিন্তু ফরসা হবার ওষুধ আমার কাছে আছে, দেখবে?

—না, যাও, তোমার খালি ইয়ে—

—সত্যি ইয়ে নয়। এই দেখ। সাবানের বাক্সটা জীবন তুলিয়া দেখাইল।

বর্ষাকালের রৌদ্র-মেঘের মত রমার মুখে আলোছায়া ফুটিয়া উঠিল। কহিল—ছিঃ, সাবান মাখব কি করে! লজ্জা করবে না বুঝি?

—সবাই যা মাখে—তাতে তোমারই যত লজ্জা? আর কি এনেছি জান?

—আবার কি?

কাপড়ের বাণ্ডিল খুলিতে খুলিতে জীবন বলিল,—তোমার জন্য একজোড়া ফুলপাড় শাড়ী আনলাম।

উৎফুল্ল স্বরে রমা বলিল—বাঃ, চমৎকার পাড় তো! মা আর ঠাকুরঝির জন্যে না আনলে তো ও কাপড় আমার পরা হবে না।

—ভয় নেই, সে জ্ঞান আমার আছে। এই ওঁদের কাপড়—

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে রমা বলিল—সব ক'টি টাকাই বুঝি খরচ করে বসলে।

—করলামই বা। কিছু দিলাম দেবতাকে, কিছু বা মানুষকে। শ্রদ্ধা আর ভালবাসা কোনটাকেই তো খাটো করা যায় না।

রমা হাসিয়া বলিল—তোমার সঙ্গে কথায় কে পারবে বল? শহরে গিয়ে কথায় যেন আরও শান দিয়ে এনেছ।

মাস ছয়েক পরে আর একটি রাত্রিতে জীবন বলিল—একটু চা কর তো, রমা। বড় ম্যাজ-ম্যাজ করছে শরীরটা।

রমা সাতঙ্কে জীবনের কপালে হাত দিয়া বলিল—কপালটা যেন ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে।

—উঁহু, চায়ের নেশা, বুঝছ না।

—রোজই চা খাওয়া হয় বুঝি কলকাতায়। সকাল বিকেল দু-বেলাই? তাই ভাত খেতে পার না।

জীবন বলিল—তোমাকেও চা তৈরি করা আর চা খাওয়া শিখিয়ে দিয়েছি তো।

—আমার খাওয়া এই শনিবার আর রবিবার সন্ধ্যার যা।

—কেন, চা, চিনি, দুধ সবই তো মজুত ঘরে, কেন ক'রে খাও না? সময় নেই বুঝি? তবে? লজ্জা? তা বলছি মাকে—

—চুপ। যখন বাসায় নিয়ে যাবে, তখন দু-বেলা না হয় তোমার সঙ্গে চা খাওয়া যাবে।

—তোমার শহরে বাস করতে সাধ হয় তাহলে?

—কেন হবে না! তোমার মুখে গল্প শুনে শুনে শহরের পথ-ঘাট, থিয়েটার-বায়স্কোপ, দোকান-পসার সমস্ত আমার মুখস্থ গো।

—টে! আচ্ছা বল দেখি মনুমেণ্ট কোথায়?

—ইস, মাষ্টারী আরম্ভ হ'ল! দাঁড়াও আগে চা করে আনি, তার পর একজামিন ক'রো। পাস যদি না করতে পারি তখন—

জীবন বলিল—দাঁড়াও। একটা খুব ভাল প্রাইজ দেব তখন।

চা-পানের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নোত্তর চলিতে লাগিল দুই জনের। বাহিরে অন্ধকার রাত্রি। জানালার বাহিরে নক্ষত্রখচিত আকাশের পরিপূর্ণ রূপে সেই অন্ধকার ঘনীভূত। মনের মধ্যে পুণিমার অবারিত আলোই তো বাহিরের অন্ধকারকে ভালবাসিবার শক্তি দেয়।

চকচকে ভেলভেট-কেস হইতে এক জোড়া নূতন প্যাটার্নের সুদৃশ্য রুলি বাহির করিয়া জীবন বলিল—এই তোমার প্রাইজ। দেখি হাত।

অনুজ্জ্বল প্রদীপের আলোয় রমার মুখ ও রুলির পালিশ চক্‌চক্ করিয়া উঠিল।

আরও কিছুদিন পরে—জীবন এক দিন বলিল—বছর বছর ঘর মেরামতিতে অনেক টাকা খরচ হয়, মনে করছি, দুখানা কোঠা ঘর তুলব।

রমা বলিল, 'ঘর তুলতে অনেক খরচ যে।'

জীবন বলিল—খরচ এক বারই হবে, বার-বারের ভোগান্তি থেকে তো বেঁচে যাব। মা কি বললেন শুনে?

—তুমি দেবে টাকা, ওঁর আপত্তি হবে কেন। তবে বলছিলেন কি, ও তো চাকরি নিয়ে বিদেশে রইল, ভাগীদার ক'বছর থেকে ধানের ভাগ কমিয়ে দিয়েছে।

জীবন বলিল—বলেছিলাম মনিরুদ্দি‌ৎকে সে-কথা। বলে, দেখছেন তো বাবু, জমির তেজ কমে আসছে; আগে যেখানে বিঘে প্রতি দশ মণ ধান পেয়েছি, এখন সেখানে ভাল বৃষ্টি হ'লেও ছ-মণের বেশী হয় না।

—জমিতে কেন সার দিক না।

—তা না দিলে ঐ ছ মণ ধানও জন্মাত নাকি? কাগজেও সেদিন পড়ছিলাম—বাংলার জমি দিন দিন অনুর্ব্বর হয়ে পড়ছে। মনে করেছি বিক্রী করে দেব জমি। মিছিমিছি ঘর থেকে খাজনা টেনে মরি কেন! ঐ টাকাতে বরং ঘর দুখানা তুলে ফেলি।

—মা কিন্তু রাজী হবেন না।

—বোঝাতে হবে তাঁকে।

নূতন ঘর ও কোলে ফালি বারান্দায় বাড়ীখানির শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে। জমি-বিক্রয়ের টাকাতেই প্রায় সব কুলাইয়া গিয়াছে, ধার যৎসামান্য চুণের দোকানে ও ইটের জন্য আছে। জীবন হিসাব করিয়া দেখিয়াছে মাস-মাস কুড়ি টাকা কিস্তিবন্দী করিলে ছয়-সাত মাসে ও-টাকাটা শোধ হইয়া যাইবে।

রমাকে সে প্রফুল্ল কণ্ঠে বলিল—আর মেরে কেটে সাতটা মাস, তার পর—

রমা মাথা হেঁট করিয়া পুলকমিশ্রিত মৃদুকণ্ঠে বলিল—না গো মশাই, সাত মাস পরেও একটা মোটা রকমের খরচ আছে তোমার।

বিস্মিত কণ্ঠে জীবন বলিল, "কিসের খরচ?" পরক্ষণেই স্বাস্থ্যবতী রমার লজ্জারক্ত মুখের পানে চাহিয়া বলিল—সাবান মেখে মেখে দেহের রং তো তোমার দিব্যি ফুটফুটে হয়েছে, যেন গণেশ-জননী।

রমা বলিল—যদি মেয়ে হয়?

—উঁহু, কক্ষনো না। তাহলে রং তোমার এত ফরসা হ'ত না। মুখে চোখে এত শ্রী খুলত না।

—যাও, কি যে বক। প্রদীপের আলোয় সলজ্জা রমাকে দেবীপ্রতিমার মতই মনে হইতেছে।

মুগ্ধ চোখে খানিকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া জীবন বলিল—নতুন ঘর হ'ল, আসছে নতুন অতিথি, খরচ তো আমায় করতেই হবে, রমা।

—না, ধার তুমি করতে পারবে না। রমা মিনতিভরা অনুনয়ে জীবনের দুটি হাত চাপিয়া ধরিল।

জীবন হাসিয়া বলিল—যে-ধার শোধ হয় না, তাকেই বলতে পার ধার, যাতে কষ্ট, তাই মৃত্যু। এ নিয়ে এখন থেকে মন খারাপ ভাল নয়, রমা।

টাকা ধার করিয়া জীবন ঘটা করিয়াই ছেলের অন্নপ্রাশন দিল। চারিদিক জীবনের সুখ্যাতিতে ভরিয়া উঠিল। হঁা, কৃতী সন্তান বটে। সার্থক বিদ্যা-শিক্ষা জীবনের। রমার মনেও আকাশ-কুসুম ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। এক দিন সে জীবনকে বলিল—দেখ, তোমার ছেলেকে কিন্তু এই পাড়াগাঁয়ে ফেলে রাখতে পারব না। যত দূর পারা যায়, ওকে শহরে রেখে লেখাপড়া শেখাব আমি।

জীবন বলিল, "নিশ্চয়ই।"

রমা বলিল—তুমি কিন্তু এখনও কৃপণ রয়ে গেছ।

—কেন?

—শহরে বাসা করবার কথা হ'লেই চুপ ক'রে থাক। সবাই তো আজকাল বাসায় থাকেন। না হ'লে এই যে কত কষ্ট ক'রে বারো মাস খাটছ, এতে লাভ? শরীর তো তোমার আধখানা হয়ে গেছে।

একটু হাসিয়া বলিল—যা শুনি খাওয়ার কথা, মেস হোটেলে মানুষ কখনও ছাইভস্ম খেয়ে থাকতে পারে!

—থাকে তো হাজার হাজার মানুষ।

—যাঁদের উপায় নেই, তাঁরা থাকুন। তোমায় আমি থাকতে দেব না।

—আমি বাসা করলে মার মনে কষ্ট হবে না?

—বাঃ রে, মা-ই তো দুবেলা আমায় সে-কথা বলেন, আগে তোমার শরীর, না আগে টাকা?

—আচ্ছা, আর দুটো মাস যাক। দেনাটা শোধ হোক।

—দেনা-দেনা করেই গেলে। চাকরি যখন রয়েছে, তখন দেনা শোধ হবে হেসে খেলে।

দেনা শোধ হইবার অবকাশ মিলিল না। মা এক দিন অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং দিন সাতেক রোগ ভোগের পর দেহরক্ষা করিলেন। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড হইতে নূতন ঋণ লওয়া সম্ভব হইল না। বাড়ীর দলিলখানি বন্ধক দিয়া জীবন মাতৃদায় উদ্ধার হইল।

মা দেহরক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গে দেশে বাস করিবার সমস্যাটা জটিল হইয়া উঠিল। অল্পবয়সী বধূ ও বিধবা বোন ছোট্ট একটি খোকা লইয়া সপ্তাহের ছয়টি দিন কি করিয়া যে ভয়ে দুর্ভাবনায় কাটায়—জীবন বাড়ী আসিয়া এক দিনেই তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ ভয়াবহ খুঁটিনাটিগুলি স্তব্ধ হইয়া শোনে। শোনে আর রক্ষকবিহীনা ঐ দুটি নারীর অনাগত বিপদ আপদ লইয়া মাথা ঘামায়। সত্য বটে দেহধারণে মানুষ নীরোগ হইবার আশা পোষণ করে না, কিন্তু এক দিন অতর্কিতে খোকার বা রমার জীবনসঙ্কট পীড়ার বার্তা বহিয়া যদিই জরুরি তার আসে? যদি বিধবা বোনের কোনরূপ মর্য্যাদাহানিকর সংবাদই সে পায়? গ্রামে গ্রামে দুর্বৃত্তদের হাতে নারী-লাঞ্ছনার সংবাদ তো নিত্য সংবাদপত্রে বাহির হইতেছে। রমার সব আশঙ্কাগুলিই তো অমূলক বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। অন্ধকার রাত্রিতে ঘরের কানাচে শুষ্ক পাতার উপর ব্যাঙ লাফাইবার বা কুকুর শেয়াল চলিবার দরুন যে খড় খড় শব্দ হয়—তাহা না-হয় ভীরু মনের প্রতিধ্বনি; ঝাঁকড়া গাছে জ্যোৎস্নার টুকরাকে ঘুমন্ত চোখে সহসা দেখিলে প্রেতভ্রমে আঁতকাইয়া উঠাও বিচিত্র নহে; কিন্তু গ্রামে আজকাল যে চুরি-ডাকাতি হইতেছে বা সেদিন উত্তরপাড়ায় ঐ যে অষ্টাদশী মেয়েটি বীভৎস ভাবে খুন হইয়া গেল—তাহার ক্রমবর্দ্ধমান আতঙ্ককে ঠেকাইবার যে কোন উপায়ই নাই। মুখের সাহসে আর কতটুকু হয়। যে উড়ে চাকরটাকে দুটি টাকা দিয়া চণ্ডীমণ্ডপে রাত্রিতে শোয়ানো হইতেছে, লোভের মুখে সে-ই যদি কোন দিন বিশ্বাসঘাতকতা করে?

এমনই করিয়া এক একটি মাস যায় আর ভাবনায়, আতঙ্কে জীবন প্রবাসে থাকিয়াও শান্তি পায় না। বলিতে গেলে যে-দেনা সে করিয়াছে তাহা পরিশোধ হইতে কয়েকটি বৎসরই লাগিবে। আরও যে ভবিষ্যতে দেনার পরিমাণ বাড়িবে না—তাহাই বা কে বলিবে? বিদেশের বাসা, খাওয়া-পরা ছাড়া—ডাক্তার-বৈদ্যের খরচই যে কত হইবে। কে জানে, জীবন বাস্তুখানির উদ্ধার করিতে পারিবে কি না?

বাড়ীর পাশেই এক দিন ডোমেদের এক বিধবা মেয়েকে দুর্বৃত্তেরা কোথায় লইয়া গেল, দেশে অজন্মার সঙ্গে সঙ্গে চুরির সংখ্যাও বাড়িয়া চলিয়াছে। রমা ত্রস্তা হরিণীর মত জীবনের গা ঘেঁষিয়া গল্প করিতেছিল।

—ভগবান জানেন, আমাদের অদৃষ্টে বা কি আছে! হাঁক দিলে একটা লোকও তো এদিকে উঁকি দেয় না।

জীবন শুষ্ককণ্ঠে বলিল—বাসা আমি ঠিক ক'রেই এসেছি, রমা। দিন দুই ছুটিও নিয়েছি—সব গুছিয়ে নাও।

যে পরিমাণে রমার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—সেই পরিমাণেই জীবন ভিতরে ভিতরে শুকাইয়া উঠিল।

বহুদিনের সাধ আজ তাহার পূর্ণ হইতে চলিয়াছে, কিন্তু ঋণের ঝঞ্ঝা ও অন্ধকারে সেই নিবু-নিবু দীপশিখাটিকে বুঝি আর বাঁচাইয়া রাখা যায় না!

গভীর রাত্রিতে জীবনের ঘুম ভাঙিয়া গেল। জানালা দিয়া ঘরের মধ্যে চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে; আলো পড়িয়াছে রমার ঘুমন্ত মুখে ও তাহার বক্ষোলগ্ন শিশুটির সুঠাম গৌর অবয়বে। মায়ের বুক ঘেঁষিয়া গভীর শান্তিপূর্ণ ঘুমে দেবশিশু মগ্ন, রমার ঠোঁটে পরিতৃপ্তির পাতলা হাসিটুকু লাগিয়া আছে। ওরা কল্পনার শিশু, কল্পনার দোলায় দুলিতে দুলিতে মধুর সব স্বপ্ন দেখিতেছে। জ্যোৎস্নার অন্তরালে রূঢ় যে বাস্তব জগৎ তাহা বুঝি নিদ্রাহীন জীবনের চোখেই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে! অস্থিরভাবে সে উঠিয়া বসিল ও পিতার উপদেশমালার খাতাখানি টানিয়া লইয়া ম্লান প্রদীপটি উস্কাইয়া দিয়া পাতা খুলিতে লাগিল।

প্রথম উপদেশমালার লেখাগুলি তাহার মুখস্থ: 'অঋণী ও অপ্রবাসী না হইলে মানুষের জীবন সুখকর হয় না।' হাত বাড়াইয়া কলম লইতে গিয়া তক্তপোষের কোণে খোঁচা লাগিয়া হাত কাটিয়া গেল। হাতের যন্ত্রণা বিশেষ নাই, কিন্তু অল্প অল্প করিয়া রক্ত গড়াইতে লাগিল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া দোয়াতে সে কলম ডুবাইল। বহুদিনকার অব্যবহৃত দোয়াতে কালির লেশ মাত্র ছিল না। অধীর আগ্রহে জীবন চঞ্চল হইয়া উঠিল;—এই মুহূর্ত্তে লেখার পরিবর্ত্তন যে চাই। কোথায় কালি? প্রদীপের আলোয় হাতের রক্তরেখা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল, জীবনের সমস্যাও অমনি মিটিয়া গেল।

বহু যত্নে সে লিখিল:

'ঋণী ও প্রবাসী না হইলে মানুষের জীবনধারণ বর্ত্তমানে অসম্ভব।'

ক্ষত

১

ষ্টেশন হইতে বাড়ী পাকা তিন মাইল পথ। রাস্তা পাকা হইলেও—একযুগ অ-মেরামতিতে—চলিবার কালে মানুষকে পিছনেই ঠেলিতে থাকে; অন্ধকার রাত্রিতে হোঁচট খাওয়া তো অত্যন্ত সুলভ ব্যাপার। আগে আগে শনিবারের দিন কলিকাতা হইতে একখানি স্পেশ্যাল ট্রেণ ছাড়িত বেলা সাড়ে তিনটায়, যুদ্ধের তৃতীয় বার্ষিকে সেটা বন্ধ হইয়াছে। এখন সাড়ে পাঁচটায় ট্রেণ ছাড়া গত্যন্তর নাই। রাত আটটার কম সে ট্রেণ ষ্টেশনে আসে না। পথের দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া ঘোড়ার গাড়ীর শেয়ারের পয়সা দিতেই হয়। প্রত্যেক শনিবারে বিজয় শেয়ারের গাড়ীতে বাড়ী আসে—সেই জন্য গাড়োয়ানরা তাকে খাতির করে বেশী। যারা গাড়ী চড়ে না, অন্ধকারে ওই দুর্গম পথ হাঁটিয়াই পার হয়—তাদের পাশ দিয়া যাইবার সময় গাড়োয়ানরা নিজেদের গাড়ীগুলিকে বেশী জোরে হাঁকাইয়া প্রচুর ধূলা উড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠে। যারা আপিসে চাকরি করে অথচ গাড়ী ভাড়া দিবার প্রবৃত্তি নাই—তাদের উপেক্ষা বা জব্দ ঐ একটি মাত্র উপায়ই ওরা জানে। বিজয়কে ওরা খাতির করে। বাড়ীর দুয়ারে গাড়ী থামিলে মণিব্যাগ বাহির করিয়া ভাড়া মিটাইয়া দিলে বিজয়কে ওরা সেলাম ঠুকিয়া চলিয়া যায়। এই সম্মানটুকু পাইয়া বিজয় মনে মনে খুশী হয়।

এক শনিবার বিজয়ের খুশার পরিমাণ কূল ছাপাইয়া গেল। সেদিন শশী গাড়োয়ান ভাড়া তো লইলই না—উপরন্তু একখানা দশ টাকার নোট তাহার হাতে দিয়া বলিল—এটা রেখে দিন বাবু, কাল দুপুরে আসবো আপনার কাছে—পরামর্শ আছে।

বিজয়ের আনন্দ হইবারই কথা। শুধু বিশ্বাস নহে, পরামর্শ লইবে বলিয়াছে। যারা ঘোড়ার গাড়ী চালায় তাদের ভাল রকমেই জানে ও। পাঁচু শা'র তাড়িখানাটা টিকিয়া আছে ওই গাড়োয়ান কয়জনের দৌলতেই। সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে অবসর পাইলেই ওরা দোকানে গিয়া তাড়ি গিলিবেই। কাঁচা পয়সা রোজগার,—হিসাব নিকাশের বালাই নাই। গাড়ীর মালিক কিছু গাড়োয়ানের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে পারেন না সারাদিন। রোজ বরাদ্দ কোনদিন কোনদিন ওরা মালিকের হাতে কিছু দেয়, কোনদিন দেয় না, তাড়ির দোকানে ঢালে। মিথ্যা বলিতে ওদের একটুও বাধে না। নিজের সংসারে ওদের অভাব লাগিয়াই আছে। চাল জুটিল তো পরণের কাপড় জোটে না; বাড়ী ঘর-দুয়ার অধিকাংশেরই নাই। গাড়ী ঘোড়া বা খাটুনি কোনটাই নিজের সংস্থানকে বাড়ায় না, মালিককেও যে সমৃদ্ধ করে এমন নয়। সস্তা নেশায়—তাড়িতে গাঁজাতে আর জুয়াখেলায় সর্ব্বস্ব উড়াইয়া দিয়া ছন্নছাড়া জীবনযাপন করাতেই ওদের আনন্দ।

রাত্রিতে শুইয়া বিজয় ভাবিল, এমনই উন্মার্গগামী একটি জীবনকে যদি সৎ উপদেশ দিয়া ও সুপরিচালিত করিয়া ভদ্র গৃহস্থে পরিবর্ত্তিত করা যায়—তার চেয়ে বেশী আনন্দ আর কিসেই বা লাভ হইবে। সে প্রতিজ্ঞা করিল, শশীকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবে।

২

দুপুরবেলায় শশী আসিয়া তাহার পায়ের ধূলা লইয়া মেঝের উপর বসিল। অত্যন্ত বিনীতভাবে হাত জোড় করিয়া কহিল, বাবু আমার একটা গতি করে দিন, না হলে পরের গাড়ী ভাড়া নিয়ে কতকাল আর কাটাব। মেয়েটা বড় হয়ে উঠল—ওর বিয়ে দিতে হবে।

বিজয় বলিল, তোমরা তো উপায় মন্দ কর না শুনি—মালিকের পাওনা মিটিয়ে কিছু জমে না কেন?

শশী বলিল, কি করে জমবে হুজুর, ভাড়া আমার জুটুক না জুটুক মালিককে দৈনিক দিতে হয় দু'টাকা। একটা সহিস ঘোড়া ডলাই মলাই করে,

মাঠ থেকে ঘোড়ার ঘাস নিয়ে আসে, তাকে দিতে হয় দৈনিক দশ আনা খাওয়া-পরা ইস্তক। তার পর দুটো ঘোড়ার ছোলা লাগে আট দশ সের। ষোল টাকা ছোলার মণ। তার পর আজ টায়ার ছিঁড়ছে—কাল চাকা ভাঙ্গছে, এসব তো আছেই। আগে ভাল রবার পাওয়া যেত—এক পাট রবারে ছ'মাস চলতো। তা' ছাড়া রাস্তা ছিল ভাল। আজ কাল খোয়া ওঠা রাস্তায় বাজে টায়ার পনের দিন যেতে না যেতে—ব্যস। দাম আগেকার চার গুণ। তারপর মিনসিপালির আইনে ফাইন তো লেগেই আছে।

বিজয় বলিল, ফাইন দাও কেন—যা নিয়ম সেই রকম লোক নিলে ত হাঙ্গামা থাকে না।

শশী হাসিয়া বলিল, তা'হলে আমাদের পোষাবে কেন বাবু। এই বলে পুলিশের হাত তেলা করে ফাইন দিয়ে গাড়ী প্রতি তিন টাকা থাকে। দিনে চারটে ক্ষেপে—গড়পড়তা দশটা টাকা—

তবে তোমাদের টাকা জমে না কেন?

আজ্ঞে—খেতে যে পরিবার, ছেলেপিলে নিয়ে দশটি প্রাণী। ধরুন চালের দাম—কাপড়ের দাম···

বিজয় বাধা দিয়া বলিল, আর তাড়িও ত যথেষ্ট গেল।

শশী মাথা নামাইয়া সলজ্জ কণ্ঠে কহিল, আজ্ঞে যা মেহন্নত হয়—তাতে একটু-আধটু নেশা না করলে খাটতে পারব কেন বাবু।

একটু-আধটু? শুনেছি যতবার ষ্টেশন থেকে ক্ষেপ মার···

শশী নত মস্তকেই প্রতিবাদ করিল, না বাবু, এই উপার্জ্জন এর মধ্যে যত খুশী হেলেই হ'ল! তাড়ির দাম তাই বলে এক গেলাস···, এ প্রসঙ্গ অশোভন বলিয়াই সে সহসা চুপ করিল। খানিক মেঝেতে আঙুল দিয়া আঁক কাটিতে কাটিতে বলিল, নেশা খারাপ জিনিষ—খুবই খারাপ। তাই ত ভাবলাম—আপনাদের ছিচরণে উপার্জ্জনের টাকা ক'টা ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্তি হব। আমায় গোছগাছ করে দিন বাবু!

এই কথায় বিজয় বিগলিত হইল। নিজেকে একজন সংস্কারক মনে করিয়া কহিল, পারি তোমায় মানুষ করে দিতে—যদি আমার কথা শোন।

আলবৎ শুনব বাবু। না শুনি তো আপনি আমার কান ধরে ঠাস্ ঠাস্ করে চড় মারবেন গালে। আমার পাঁচজনের সামনে···

আচ্ছা। প্রত্যেক সপ্তাহে যখন বাড়ী আসব—আমাকে অন্তত দশটা করে টাকা দেবে—অবশ্য তোমার সংসার খরচ বাদে। ওই টাকা আমি পোষ্ট আপিসের সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা রাখব। যখন গাড়ী মেরামতির দরকার হবে নেবে তাই থেকে।

সে ত উত্তম কথা বাবু। কিন্তু নিজের গাড়ী না হলে কাজে ফুর্ত্তি হবে কেন বাবু। আপনি আমায় একখানা গাড়ী ক'রে দিন।

দেব। এই ভাবে টাকা জমলে তিন মাসে তোর গাড়ী-ঘোড়া সব হবে।

শশী মেঝেয় সটান শুইয়া পড়িয়া ভক্তি গদ্‌গদ্-চিত্তে বিজয়ের পা-ছুঁইয়া বলিল, গরীবের ওপর একটু নেকনজর রাখবেন বাবু।

শশী গমনোদ্যত হইতেই বিজয় বলিল, আর শোন—মদ খাওয়া তোমায় ছাড়তে হবে। না হ'লে তোমার টাকা ফেরত নিয়ে যাও।

শশী এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া কি ভাবিল। তার পর আবার সটান শুইয়া পড়িল মেঝেয়। বিজয়ের মানা সত্ত্বেও তাহার পা খাবলাইয়া বলিল, এই পিতিজ্ঞে করলাম, আজ থেকে নেশা আমার হারাম। বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া দু'টি কান মলিয়া গটুগটু করিয়া বাহির হইয়া গেল।

শশী চলিয়া গেলে বিজয়ের মা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, শশেটা আজও মাতাল হয়ে এসেছিল বুঝি?

না-মা—ওর মতি ফিরেছে। ও জীবনে আর মদ খাবে না প্রতিজ্ঞা করলে—আর দশটা টাকা আমার কাছে জমা রাখলে।

বিজয়ের মা বলিলেন, ওদের আবার প্রতিজ্ঞা—তুইও যেমন। আদ্দেক দিন বউটাকে খেতে দেয় না, মারে। কালও বউটা আমাদের বাড়ী থেকে ভাত নিয়ে গেল।

আচ্ছা দেখ মা—ওকে আমি শুধরে তুলবই।

মা হাসিয়া বলিলেন, তা বেশ, এখন খাবি আয়।

৩

পরের শনিবারে শশী বিজয়ের হাতে দশ টাকা দিল। তারপরের সপ্তাহে সাত টাকা।

বিজয় বলিল, এবার সাত টাকা যে?, আবার বুঝি···

কান মলিয়া শশী বলিল, আপনার পা ছুঁয়ে পিতিজ্ঞে করছি বাবু—মদ হারাম। এবার উপার্জ্জন

কম হয় নি, তবে হঠাৎ মফঃস্বলে বিয়ের বায়না নিয়ে —মেঠো পথে গাড়ীর ইস্‌পিরিং গেল ভেঙ্গে। আপনাকে শনিবার ছাড়া তো পাব না—তাই মেরামত করিয়ে নিয়েছি পরশু।

বিজয় খুশী হইয়া কহিল, বেশ।

শশী হাত জোড় করিয়া হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, আর বুঝি সর্ব্বস্ব যায় বাবু। বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে উপোস করে মরতে হয়।

কেন—কেন?

মহাজন কড়া তাগাদা দিয়াছে—পরশু থেকে গাড়ী কেড়ে নেবে।

কেন—রোজকের রোজ ভাড়া দিস না বুঝি?

দিচ্ছি তো বাবু। কিন্তু আগেকার পাওনা ওর পেরায় পঞ্চাশ টাকা—তারই জন্যে গাড়ী কেড়ে নেবার ভয় দেখায়।

তা আগের এত পাওনা হ'ল কি করে?

শশী মাথা নামাইয়া বলিল, আগে তো আমার চরিত্তির ভাল ছিল না—নেশাটা ভাঙ্‌টা অযচ্ছল করেছি—তারই দরুণ, বলিয়া সে বিজয়ের পায়ের উপর পড়িয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বিজয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া কহিল, আঃ—কাঁদিস কেন? কি করতে হবে—তাই বল।

শশী বলিল, আমায় একখানা গাড়ী কিনে দিয়ে বাঁচান।

বিজয় বলিল, তা গাড়ী কেনবার এত টাকা কোথায়? মোটে তো সাতাশটি টাকা—

আপনি কিছু দিন বাবু—না হ'লে আমার—

আমি! বিজয় চমকাইয়া উঠিল।

হাঁ বাবু। দু' মাসে আপনার দেনা যদি শোধ না করতে পারি তো—আমায় জুতোপেটা করবেন বাবু। আমার কান কেটে কুকুরের গলায় ঝুলিয়ে দেবেন বাবু।

অবশ্য এই কঠিন শপথে আশ্বস্ত হইয়া নহে—পরোপকারের প্রবৃত্তির প্রাবল্যে বিজয়ের মনও অল্পে অল্পে দ্রব হইতেছিল।

শশী আড়চোখে বিজয়ের অনুকূল মুখভাব পাঠ করিয়া কহিল, বিশ্বাস আমায় করবেন না বাবু। গাড়ী ঘোড়া সবই আপনার নামে রাখুন। যেমন হপ্তায় হপ্তায় আপনাকে টাকা দিচ্ছি—তেমনি দিয়ে যাব। আপনাদের দায়ে দরকারে গাড়ী ভাড়াটাও লাগবে না—আর আমার পরিবারও রক্ষে হবে।

তাহার অশ্রুজল, অনুনয় ও প্রতিশ্রুতি আরও কিছুক্ষণ চলার পর বিজয় বলিল, আচ্ছা—আসছে সপ্তাহে যা হয় বলব। শশী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

৪

তিন দফায় টাকা পাইয়া শশীর উপর বিজয়ের বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে। শশী এবার ঠেকিয়া শিখিয়াছে। যৌবনের উদ্দাম আনন্দে নেশা করিয়া পয়সা নষ্ট করা ওদের জন্মগত স্বভাব। দুর্ব্বলচিত্ত শশীও তার প্রভাব কাটাইতে পারে নাই। আজ সে উদ্দামতা ওর নাই। ক্রমবর্দ্ধমান সংসারের চাপে এবং রক্ত গাঢ় হইবার সঙ্গে সঙ্গে এমনটা না হওয়াই বরং আশ্চর্য্যের। শশীর মনে সংসারের অভিযোগ ও আঘাত লাগিয়া এই পরিবর্ত্তন হয়ত কিছুদিন হইতেই সুরু হইয়াছিল। তবু অভ্যাসবশতঃ নেশাটা সে ছাড়িতে পারে নাই। বিজয়ের সংস্পর্শে আসিয়া ওর চিত্ত দৃঢ় হইয়াছে এবং বিজয়ের পা ছুঁইয়া শপথ করার পর হইতেই ও সম্পূর্ণ নূতন মানুষ হইয়াছে। নেশার ঝোঁক থাকিলে তিন দফায় এই ক'টি টাকা কখনই শশী বিজয়ের কাছে গচ্ছিত রাখিতে পারিত না। বিজয় সঙ্কল্প করিল, শশীকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবে।

এই চিন্তার তলায় আর একটি সূক্ষ্ম চিন্তার প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছিল—সেটিও বিজয়কে খুশীর স্বর্গে তুলিয়া দিল। নিজের নামে গাড়ী থাকিবে, যখন ইচ্ছা নিজেদের প্রয়োজনে এখানে ওখানে যাওয়া চলিবে, আর প্রতি শনিবার ষ্টেশন হইতে বাড়ী আসার জন্য কাহারও খোসামোদ করিতে হইবে না, যত ইচ্ছা মাল লইতে পারিবে—যে ক'জন বন্ধুকে খুশী গাড়ীতে তুলিবে। নিজস্ব একখানি গাড়ী থাকা কম গৌরবের নহে।

সে স্থির করিল—গাড়ী কিনিবার জন্য বাকী টাকাটা শশীকে দিবে। দিতে যখন হইবেই তখন মিছামিছি বিলম্ব করিয়া লাভ কি?

দুই-একজন বন্ধুকে সঙ্কল্পের কথা জানাইতেই তাহারা আনন্দে পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, বেশ ত, আমাদেরও এক একদিন গাড়ী চড়া হবে। গাড়ীর লাইসেন্স তোর নামে থাকবে—আর ও যখন শুধরেছে তখন টাকাটাও চটপট শোধ হয়ে যাবে। খুব ভাল কাজ করলি বিজু, একটা পরিবারকে এভাবে বাঁচানো—সত্যি খুব ভাল কাজ।

বিজয়ের স্ত্রী বলিল, গাড়ীখানা কার নামে থাকবে?

মনে করছি তোমার নামেই রাখব।

স্ত্রী মনে মনে অত্যন্ত খুশী হইয়া কহিল, শশীকে বলে দিয়ো ফি হপ্তায় এই বুধ বিষ্যুদ বারে আমাদের যেন টকি দেখিয়ে আনে। আর মাঝে মাঝে গঙ্গাস্নান করব।

বেশ ত, গাড়ী হ'লে সবই হবে।

মা'ও আনন্দিত হইয়া বলিলেন, অনেকদিন বাবলার পাট দেখা হয়নি—আর একদিন বাগাঁচড়ায় মা বাক্‌দেবীর মানত শোধ করতে যাব।

বেশ ত।

হাঁরে—ফুলে নবলা অবধি গাড়ী যদি যায় ত এবার কৃত্তিবাসের মেলায় নিয়ে যা'স আমাদের।

সবই হবে—গাড়ী আমাদেরই থাকবে। যে ক'দিন দেনা শোধ না হয়—যেখানে ইচ্ছে যা'বে।

একা বিজয়ের নয়—সকলেরই কল্পনায় অল্প-বিস্তর রং ধরিল।

পরের শনিবার ষ্টেশনের পথের ধূলার উপর শশী বিজয়কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল—আরও কয়েকজন গাড়োয়ান আসিয়া বিজয়ের পায়ের ধূলা লইল।

কেহ বলিল, বড়বাবু আপনার নাম আমরা যত দিন বেঁচে থাকব করব। শশেটাকে আপনি ছেলের মত মানুষ করে দিলেন।

কেহ বলিল, আমাদেরও একটা গতি করে দিতে হবে আপনাকে। রোজ রোজ পুলিশের হাঙ্গামা, বড়লোকের জুলুম—কম ভাড়া দেওয়া, এ সবের ব্যবস্থা করতে হবে আপনাকে। আপনাকে পিসিডেন হতে হবে।

রহমৎ বলিয়া একজন গাড়োয়ান শশীর কাঁধে ধাক্কা দিয়া কহিল, সে শালা—ভাল করে বাবুর পায়ের ধূলা লে। তোর জন্যে বাবু যা করল।

আত্মপ্রসাদে স্ফীত হইয়া বিজয় বাড়ী পৌছিল।

পরদিন সকালে শশী আসিয়া বলিল, গাড়ী এনেছি বাবু—আপনাকে একটু কষ্ট করে গোপালপুর যেতে হবে—না হ'লে গাড়ীখানা বিক্রী হয়ে যাবে।

কত দর ঠিক করলি?

দেড় শ'র কমে ছাড়তে চায় না বাবু—আপনি যদি বলে কয়ে কিছু কমাতে পারেন।

মাস কাবারের পুরা মাহিনার টাকাটা হাতে লইয়া বিজয় গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

ঘণ্টা-দুই পরে সে ফিরিলে স্ত্রী বলিল, হাঁ গা—গাড়ী কেনা হ'ল?

বিজয় হাসিমুখে বলিল, হাঁ—দুর্গা বলে বেরিয়েছি যখন—না কিনে কি ফিরি!

বেশ হয়েছে—মা সিদ্ধেশ্বরীর পূজো পাঠিয়ে দিই গে।

বিজয় বলিল, শশী—বলছিল—আজ বিকেলে তোমাদের সিনেমা দেখিয়ে আনবে। যাবে?

যাব না আবার—কি যে বল। আনন্দে পাক খাইয়া বউ বাহির হইয়া গেল। পরমুহূর্ত্তে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, পাড়ার দু-এক জনকে নিয়ে যাব কিন্তু।

বন্ধু সনৎ বলিল, তুমি এখন একজন বিগম্যান বিজয়—খাইয়ে দাও আমাদের।

বিজয় হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল, যাঃ—কি যে বলিস!

পথ দিয়া চলিবার কালে দোকানী বলে, বাবু—এই বার মানিয়েছে আপনাকে। গাড়ী না হলে চাকরি করে লাভ কি!

অন্য গাড়োয়ানরা সেলাম করে—কেহ কেহ কোচবাক্স হইতে নামিয়া পায়ের ধূলাও লয়।

পাড়াতেও সকলে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে, তবে আনন্দের তলায় ঈর্ষার ভাবটা স্পষ্ট দেখা যায়।

তা হবে বৈকি গাড়ী—চাকরির পয়সা, উপরিও তা আছে।

যখন হয়, এমনিই হয়—গাড়ীটার একটা আয় দাঁড়াল।

দেখেছ—আজকাল বাজার করে আনে, তাও গাড়ী চড়ে; পয়সা ত লাগে না।

মেয়েরাও বলে, বউয়ের ত গরবে পা পড়ে না মাটিতে। গাড়ী মেরে গঙ্গাস্নান! কালে কালে কতই দেখব!

প্রকাশ্যে সকলেই বিজয়ের খাতির করিয়া চলে। সামান্য কাজের এই অসামান্য ফল লাভে বিজয়ও যথেষ্ট স্ফীত হইয়াছে। সেও বুঝিয়াছে—যার মহিমাই মানুষ মুখে প্রচার করুক, অন্তরে অন্তরে সে ঐশ্বর্য্যের ভক্ত। শ্রদ্ধা সম্মান ভালবাসা—এ সবেরই নিরিখ টাকা।

৬

এমনই স্ফীত জোয়ারের জলে পরিবারবর্গসহ বিজয় ভাসিতে লাগিল। ধনগর্ব্ব ঠিক নহে—অথচ

গাড়ীতে চাপিলেই মনে হয়—এ গাড়ীখানা আমার। এখানি যেখানে যতক্ষণ খুশী ব্যবহার করিতে পারি। ভাড়া লইয়া কেহ বচসা করিবে না—টাকার হিসাব কষিয়া মনও সঙ্কুচিত হইবে না। আর পথ দিয়া চলিবার কালে দু'পাশের লোকের বিস্ময় ভক্তি কুড়াইয়া পাওয়া, সে-ও কি কম ভাগ্যের কথা! কিন্তু বিজয় যে একজন ছন্নছাড়া হতভাগ্যকে পরিবারবর্গ-সহ সর্ব্বনাশের মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছে—এই সাধুবাদই কি ওই নীরব ভক্তি বিস্ময় মাখানো দৃষ্টির মধ্যে ফুটিয়া উঠে না সর্ব্বক্ষণ? এর চেয়ে বড় পুরস্কার মানুষের জীবনে কিই-বা আছে।

মাস দুই পরে একদিন সনৎ বলিল, ওহে খুব ত নাম বার করেছ চার দিকে—গাড়ীর হিসেব-পত্তর কিছু রাখছ?

বিজয় বিস্মিত কণ্ঠে বলিল, গাড়ীর আবার হিসেব-পত্তর কি?

সনৎ হাসিয়া বলিল, অবশ্য পরোপকার-প্রবৃত্তি ভাল, তবে আমার যেন মনে হচ্ছে মাস মাস টাকা দিয়ে শশী তোমার ধার শোধ করবে। ভুল শুনেছিলাম কি?

বিজয় অপ্রতিভ হইয়া বলিল, ঠিক বলেছ ভাই, গাড়ীখানা কিনে মেরামত করতেও কিছু খরচ হয়েছে ওর—তাই টাকা চাই নি।

সনৎ বলিল, ভাল কর নি।—রাশ আলগা দিলে দুষ্টু ঘোড়া ঠিক পথ চলে না—একটু লক্ষ্য রেখ।

সোমবারে কলিকাতা যাইবার মুখে বিজয় শশীকে বলিল, হাঁ রে, দু'মাস হ'ল আমায় ত কিছু দিলি নে। দেনা শোধ করবি কি করে?

শশী বলিল, ভাবছেন কেন বাবু—চোত মাসে ভাড়া মন্দা চলে, আসুক বোশেখ মাস—এক মাসেই ডবল টাকা তুলে দেব। উঠুন—ভাল হয়ে বসুন বাবু। সজোরে ঘোড়ার পিঠে চাবুক কশাইয়া সে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

বৈশাখের দু'সপ্তাহ পরে বিজয় একটু চড়া গলায় বলিল, এসব ত ভাল নয় শশী, টাকা উপায় কর অথচ ধারশোধের নাম নেই।

শশী কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, কোথায় উপায় বাবু, দিন দিন জিনিষের দর যা চড়ছে—

বিজয় বলিল, আজকাল মদও নাকি খাচ্ছ?

শশী তাহার পায়ের গোড়ায় সটান শুইয়া পড়িয়া কহিল, যে হারামজাদা আমার নামে লাগিয়েছে—

বিজয় তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, যে যাই বলুক—আসছে সপ্তাহে তোমার কাছ থেকে দশটি টাকা চাই, না হলে গাড়ী আটকে রাখব জানবে।

সে সপ্তাহে শশীর গাড়ী ষ্টেশনে পাওয়া গেল না।

মতি গাড়োয়ান বলিল, বাবু, আমার গাড়ীতে আসুন—শশী কেষ্টনগরে গেছে ভাড়া নিয়ে।

রবিবারেও শশী ফিরিল না। সোমবারে হাঁটিয়াই বিজয় ষ্টেশনে গেল।

পরের শনিবারেও শশীকে ষ্টেশনে পাওয়া গেল না। মতি গাড়োয়ান বলিল, আসুন বাবু।

শশীর কি হ'ল?

মতি মুচকি হাসিয়া বলিল, আর বাবু, বেটা তিন দিন থেকে নেশা করে পড়ে আছে—গাড়ীও বার করছে না—আর ঘোড়াকেও খেতে দিচ্ছে না।

বাড়ী পৌঁছিয়াই বিজয় শশীর খোঁজে আস্তাবলে গিয়া দেখিল তাহার বাহ্যজ্ঞান নাই—বউকে খিস্তি করিয়া গাল দিতেছে।

বিজয় কঠিন কণ্ঠে ডাকিল, শশী—

শশী টলিতে টলিতে তাহার পায়ের গোড়ায় আছাড় খাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কিছু বলা বৃথা বুঝিয়া বিজয় বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

পরের শনিবার শশীকে ষ্টেশনে পাওয়া গেল। বিজয়ের পা ছুঁইয়া প্রণাম করিয়া সে কহিল, বাবু মাপ করুন।

বিজয় মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেও মুখে কিছু বলিল না।

জলযোগের পর মা বলিলেন, হাঁরে বিজু, গাড়ীখানা তোর না শশীর?

কেন মা?

পরশু বলে পাঠালাম বাগাঁচড়ায় নিয়ে যেতে—তা বললে কিনা আজ হবে না। কাল গঙ্গাস্নানে নিয়ে যাবার কথায় বললে, ভাড়া আছে। নিজেদের দরকারে যদি নাই পাওয়া যায় গাড়ী—তো এক কাঁড়ি টাকা ঢাললি কি জন্যে শুনি? টাকা কি তোর বাক্সে ধরছিল না?

বিজয় বলিল, দাঁড়াও—কাল দেখাচ্ছি মজা।

সনৎকে ডাকিয়া সে বলিল, কি করা যায় বল দেখি ভাই? গাড়ীখানা আটক করব?

সনৎ বলিল, তোমার ত আস্তাবল নেই—গাড়ী রাখবে কোথায়? আর ঘোড়া দু'টোরই বা কি ব্যবস্থা হবে?

বিজয় বলিল, লাইসেন্স নেওয়া আছে বউয়ের নামে—তাতেও ত গোলমা'ল হতে পারে।

পারে বৈকি—ও বেটা শয়তান। শুনলাম বাইরে দু'তিন জায়গায় এই রকম করে তোর কাঁধে চেপেছে।

তা'হলে উপায় ?

মিষ্টি কথায় ওকে বশ করে টাকা আদায় করতে হবে।

শশীকে ডাকিয়া বিজয় যথাসম্ভব মিষ্ট কথা বলিল। যদিও ওর ইচ্ছা হইতেছিল শশীর ভক্তি-গদ্‌গদ্ শঠতা-মাখানো মুখে গায়ের ঝাল মিটাইয়া গোটাকতক চড় কসাইয়া দেয়। চড় মারিলে টাকা আদায় হইবে না সত্য, কিন্তু, টাকা ফিরিয়া পাওয়ার চেয়ে তাহাই বেশী তৃপ্তিকর মনে হইতেছে। শশী বিনয়ে বিজয়কে অভিভূত করিয়া দিল। যাইবার সময় সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া পায়ের ধূলা লইতেও ভুলিল না।

৭

মিষ্ট ব্যবহারের দেনা-পাওনায় আরও ক'টি মাস গেল। কোন বার শশী দু'টাকা জমা দেয়—কোন বার তার উপবাসী বউ কাঁদিয়া কাটিয়া চার টাকা ধার লইয়া যায়। বলে, আমরা তোমাদের আশ্রিত মা! ওটা কি মানুষ ?—তা'হলে তোমাদের টাকা খেয়ে এত দুঃখু দেয় আমাদের ? খালি নেশা মা—খালি নেশা। আমরা ম'লাম কি রইলাম চেয়েও দেখে না।

এ সব ঘটে সপ্তাহের মধ্যবর্ত্তী দিনে। শনিবারে বাড়ী আসিয়া সব শুনিয়া বিজয় বলে, কেন দিলে ওকে টাকা ?

মা বলেন, শশেটা হতভাগ—কিন্তু বউ-ছেলে-মেয়েগুলো কি দোষ করলে বাবা ? যা হোক—আমাদের গাড়ী নিয়েই ত চলছে ওদের সংসার।

হিসাবে পাওনাটা ভারি হইতে থাকে দিন দিন।...অবশেষে বিজয় সঙ্কল্প করিল, একটা হেস্তনেস্ত আজ করবেই।

সনৎ শুনিয়া বলিল, তাই কর—তোর নিন্দে আর শুনতে পারি নে।

নিন্দে ? বিজয় বিস্মিত কণ্ঠে বলে, নিন্দে করবার মত কি কাজ করলাম আমি !

সনৎ বলিল,—সেদিন বাজারে বসে মদ খেয়ে তোর নামে যাচ্ছেতাই বলছিল। তোর দেনা নাকি কোন্ কালে শোধ হয়ে গেছে। গাড়ী কিনে ইস্তক টকি দেখানো—গঙ্গাস্নান করা—এখানে ওখানে যাওয়া—তোকে ষ্টেশন থেকে ফি সপ্তাহে বাড়ী আনা—এসব হিসেব করলে ওরকম গাড়ী নাকি তিনখানা কেনা যায়।

বলিস কি ! শয়তান এই সব বলছে ?

হাঁ। আরও বলছে—বাবু এমন অর্থপিশাচ যে, শনিবারে এসে সব টাকা কেড়ে-কুড়ে নেয়, ওর বউ ছেলেরা খেতে পায় না। লোকেও বলছে—তা হবেই ত। বড়লোকেরা আর কোন্‌কালে চায় গরীবদের মুখের পানে।

বিজয় স্তম্ভিত হইয়া সব শুনিল। টাকার জন্য ওর দুঃখ হইল, কিন্তু সে দুঃখের চেয়ে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করিল।

আত্মসুখের স্ফীত বেলুন কুৎসার ছিদ্রপথে কখন চুপসাইয়া গেছে।

সোমবার বিজয় আপিস গেল না। নিজের বৈঠকখানায় শশীকে ডাকাইল—সনৎ ও আর এক জন বৃদ্ধ প্রতিবেশীকেও ডাকিল।

সকলের সামনে বিজয় বলিল, শশী, আমার কাছে কত তোমার পাওনা বল ? আজ কড়ায়-গণ্ডায় সব শোধ হয়ে যাক।

শশী যথারীতি কাঁদিয়া বিজয়ের পা জড়াইয়া বলিল, আপনি মালিক—

চুপ। বিজয় গর্জ্জন করিয়া উঠিল। কত হয়েছে আমার কাছে পাওনা বল ? বল ?

আশ্চর্য্য—এত নেশা করা সত্ত্বেও দীর্ঘ দশটি মাসের নির্ভুল হিসাব শশী আঙুল গণিয়া বলিয়া দিল।

সনৎ বলিল, যা দেখছি—তাতে দেনা-পাওনা সমান সমান দাঁড়ায় যে।

বিজয় বলিল, আন কাগজ-কলম—গাড়ী আমি ওর নামে লেখাপড়া করে দেব। ওর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখব না আর।

লেখাপড়া শেষ হইলে শশী গদ্‌গদ্ চিত্তে আর একবার বিজয়ের পায়ের ধূলা লইতে গেল। বিজয় পা সরাইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, গেট আউট—গেট আউট।

একমাস পরে এক শনিবারে মতি গাড়োয়ান বিজয়কে বাড়ীর দুয়ারে নামাইয়া দিয়া হাত জোড় করিয়া কহিল, বাবু একটা নিবেদন আছে।

তাহার হাতে গাড়ীভাড়া দিয়া বিজয় বলিল, কি ?

মতি বলিল, শশীর হিল্লে করে দিলেন—সে কথা সবাই বলাবলি করে। আপনি ওর বাপের কাজ করেছেন। আমিও দেখুন, পরের গাড়ী নিয়ে ব্যাগার খাটছি—

বিজয় কটমট চক্ষে মতির মুখের পানে কয়েক মিনিট তাকাইয়া রহিল। পরে শ্লেষ-মাখানো স্বরে বলিল, টাকা চাই, না ? আচ্ছা বলতে পার মতি, মানুষ ক'বার ঠকে ?

বলিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া সে হন্ হন্ করিয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়া ঢুকিল।

—

প্রতিবিম্ব

সুপ্রভা দেবীর বক্তৃতা শুনিয়া নারীজাগরণ আরম্ভ হইয়াছে বলিলে অতিশয়োক্তি করা হয়, তবে একথা সত্য—সুপ্রভা দেবী বক্তৃতা দিয়া লোক মাতাইতে পারেন। তাঁর মধুর কণ্ঠে একটি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সুর বাজিয়া উঠে; যে সুর ভ্রান্তযুক্তির মোড় ফিরাইয়া দেয় অনায়াসে, নিস্তেজ ছিলাম মনকে সহসা এই ধিক্কারে পরিপূর্ণ করিয়া গতিশীল করিয়া তুলে—জোয়ারের হাওয়ায় যেমন নৌকার পালখানি স্ফীত হইয়া উঠে। যখন তিনি বলেন, 'স্বার্থান্ধ জাতি—নিজেদের সুখ-সুবিধার জন্য আমাদের জীবনকে করে রেখেছে পঙ্গু।' তখন নারী মাত্রেরই শিরায় রক্তস্রোত দ্রুত বইতে থাকে। যখন বলেন, 'চিরকালই কি রইবো আমরা খেয়ালী পুরুষের খেলানা হ'য়ে?' তখন প্রত্যেক দৃঢ়সংবদ্ধ অধরোষ্ঠে 'না'র একটি ব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠে। এবং যখন কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তুলিয়া তর্জ্জনী সঞ্চালনে বলেন, 'কেন সইব যুগ যুগ ধরে এই অত্যাচার?' তখন সহস্র চক্ষের বিদ্যুদ্দীপ্তিতে প্রতিবাদের অগ্নিকণা জ্বলিয়া উঠে। পুরুষ জাতির বিরুদ্ধে তাঁর এই অত্যুগ্র অভিযানই মহিলাসঙ্ঘের সভানেত্রীর পদটি সৃষ্টি করিয়াছে বলিলে অবশ্য অতিশয়োক্তি দোষ ঘটিবে না।

সুপ্রভা দেবী বিবাহিতা। এইজন্য স্বতঃই মনে উঠা বিচিত্র নহে যে—স্বামীর অত্যাচারে পীড়িতা হইয়াই বুঝি বা তাঁর এই পুরুষ-বিদ্বেষী মনোভাবের উৎপত্তি। যাঁহারা সুপ্রভা দেবীকে জানেন না—তাঁহারা অনায়াসে ঐ ধারণা পোষণ করিতে পারেন। যাঁহারা জানেন—তাঁহারাও বলেন—অত্যধিক বিদ্যা ও ধনস্ফীতির বাহ্যিক প্রকাশটা এমন না হইয়া পারে না। সুপ্রভা দেবীর সম্বন্ধে ওই দুই রকমের মতবাদই যুক্তিসহ নহে। বিদ্যা ও ধন অপরিমিত থাকিলেও স্ফীতি তাঁহার ত্রিসীমানায় ঘেঁষিতে পারে না। তাঁহার চালচলনে কিছু উগ্রতা থাকিলেও বক্তৃতাকালে ভুলিয়াও তিনি ইংরেজি শব্দ উচ্চারণ করেন না, এবং স্বামী-সৌভাগ্যে তিনি সত্যই সৌভাগ্যবতী।

ভূপেশ—হাঁ, তাঁর এই বক্তৃতা দেওয়ার প্রেরণা যদি কেহ জোগাইয়া থাকেন তো তিনি ভূপেশ রায়—সুপ্রভা দেবীর স্বামী। তিনিই কাগজে কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া, স্বনামে এবং স্ত্রীর নামে, তাঁকে এতবড় সাফ্রাজিষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। ভূপেশ রায়ই তো অর্থ দিয়া, মোটর দিয়া, প্রেরণা দিয়া সুপ্রভা দেবীকে জননায়িকার মঞ্চে উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার কণ্ঠে ভাষাই বলুন আর ভাষাতে যুক্তিই বলুন—কিম্বা যুক্তিতে নির্ভীকতাই বলুন—সমস্তই ভূপেশ রায়ের দান। যদিও সুপ্রভা দেবী বক্তৃতাকালে স্বামীর প্রতি সকৃতজ্ঞ ও সশ্রদ্ধ হইয়া গদ্‌গদ্ কণ্ঠে গুণকীর্ত্তনের সুর ভাঁজিয়া প্রত্যেক নিয়মের ব্যতিক্রম আছে বলিয়া ঘোষণা করেন না—তথাপি বক্তৃতা শেষে মঞ্চাবতরণ করত দামী মিনার্ভায় আসিয়া যখন সুখাসনারূঢ়া হন—তখন মনে মনে একবার সেই—সুখৈশ্বর্য্যের মালিককে কি মুহূর্ত্তের তরেও স্মরণ করেন না? খদ্দরের শাড়ীর উপর কোলের কাছে শিথিল দু'খানি হাত রাখিয়া সুপ্রভা দেবী চক্ষু বুজিয়া হয় তো বা ক্লান্তি উপভোগ করেন। ক্লান্তি উপভোগের মুহূর্ত্তে যদি কৃতজ্ঞ হওয়া চলে—তবে কল্পনা করিতে পারা যায় তিনি কৃতজ্ঞ। কিন্তু কেন? ধন বৈষম্যের যুগে অধিকার-সাম্যের দাবী তিনি ভুলিবেন কোন্ মোহে? এই মোটরে তাঁহার এবং তাঁহার স্বামীর সমান অধিকার। হিন্দু-বিবাহে যদি স্বামী-স্ত্রীর আত্মা এক হইয়া মিশিতে পারে—অর্থাৎ পরস্পরের সুখ-দুঃখের সমান অংশ ভাগী হইতে পারে—তবে মোটর সম্বন্ধে সে অধিকার অস্বীকার করিবে কে? সুপ্রভা দেবীর মনে সে সন্দেহ জাগে বলিয়াই মোটরের সুখাসনে বসিলেই চোখের তন্দ্রালস ভাবটি তাঁর মধুর হইয়া উঠে।

কঠিন বাস্তব জগতে সঞ্চরণের পর তিনি যেন স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সমস্ত চিন্তার পরিসমাপ্তি ঘটে।

ভূপেশ একটু বেশী মাত্রায় স্বাধীনতাপ্রিয়। স্ত্রীকেও তিনি সেই ছাঁচে গড়িয়া তুলিয়াছেন।

স্ত্রীকে গড়িয়া তোলা, না প্রকাণ্ড আয়না সম্মুখে রাখিয়া নিজের চেহারা দেখিয়া আত্মস্ফীতি হওয়া কোন্‌টা ভূপেশের নেশা? আয়নায় মানুষের এত কি দেখিবার থাকে? নিজেকে বার বার দেখিয়াও তৃপ্তি হয় না? যাহাদের চেহারা ভাল—তাহাদের কথা আলাদা—কিন্তু যাহাদের চেহারায় খুঁত আছে, আয়না বুঝি তাহাদেরই বেশী প্রিয়? তা ছাড়া কথা বলিবার সময় গালের টোলে, না ভ্রূর কুঞ্চনে অথবা ঈষদ্ধাস্যে শুভ্র দন্তপংক্তির বিকাশে কোন্‌টিতে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয়—তাহা রীতিমত চর্চ্চার বিষয়। সুপ্রভা দেবীর বক্তৃতার রিপোর্ট ব্যানার লাইন দিয়া সংবাদপত্রে ছাপা হয়; দুই তিন কলমে দীর্ঘ অভিভাষণগুলি বাহির হয়। লোকে সে উৎসুক-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—কে সুপ্রভা দেবী? কি তাঁর পরিচয়? আয়নার সম্মুখে বসিয়া ভূপেশ রায় পরম তৃপ্তি ভরেই হাসেন। রাত্রির মধ্যযাম উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও—অনুপস্থিত স্ত্রীর বিষয় লইয়া তিনি মাথা ঘামান না। জনারণ্যে যশ সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছে যে তাহার বাহিরের সম্মানকে ঘরের সম্মানের সম-পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া রাখা চাই-ই। ক্ষণভঙ্গুর সম্মান—প্রতিটি মুহূর্ত্তে সমান সাবধানতায় আগলাইয়া রাখা দরকার। পুরুষের কাছে উৎসাহ পাইয়াও কেন সুপ্রভা দেবীর কথায় পুরুষ-বিদ্বেষী ভাব প্রকাশ পায়, সে তথ্য কয়েকটি দ্বিপ্রহর ও রাত্রির প্রথম যামের মধ্যেই হয় তো নিহিত আছে। দ্বিতলের সুসজ্জিত কক্ষে আলস্য-চর্চ্চার অবসরে সুপ্রভা দেবীর দৃষ্টি পাশের একতলের একটি বাড়ীতে গিয়া পড়ে। যখন সদ্য-প্রকাশিত মাসিক পত্রে নিজের অভিভাষণ কয়েকবার পড়া হইয়া প্রায় মুখস্থ হইয়া যায়, (নিজের লেখার বা বক্তৃতার মধ্যে যে মাধুর্য্য ও ওজশক্তি নিহিত আছে—তাহা বারংবার অধীত হইলেও পুরাতন হয় না; প্রত্যেক অক্ষরে বা ধ্বনিতে পাঠকালে নূতন স্পন্দন অনুভূত হয়।) যখন সভার সাফল্য ও জনসমাগমের চিত্রপট উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া মনের মধ্যে স্থায়ী আসন লাভ করে, নূতন বই পড়ায় ক্লান্তি আসে—তখনই সুপ্রভা দেবী সম্মুখস্থিত ঐ একতলা বাড়ীর পানে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও চাহিয়া দেখেন। চাহিয়া দেখেন—মলিন-বসনা এক তরুণী সারা দিনমান ও গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত পুরুষের দাস্যবৃত্তি করে। কি করিয়া এত দুঃখের মধ্যেও সে হাসে; কি করিয়া লঘু পরিহাসে ওখানকার পরিমণ্ডল দূষিত করিয়া নিজ জীবনের সঙ্গে সংসারকে পর্য্যন্ত কারাগার করিয়া তুলে। মঞ্চের বক্তৃতায় যে অকাট্য যুক্তি জাগরণ-উন্মুখ নারীচিত্তে স্বাধীন সত্তাময় জ্বলন্ত নক্ষত্র হইবার বাসনায় আকাশকে করে সুনীল ও সুদূর-বিস্তৃত—এখানে সেই অকাট্য যুক্তিই বালির গাদায় বোমা ফেলার মত নিরর্থক হইয়া যায়। বন্দিনী নারী সশঙ্ক ও সন্দেহাকুল চোখের দৃষ্টিতে উপর পানে চাহিয়া অবাক হইয়া যায়। কখনও হাসে, কখনও বা মাথা নীচু করে, কখনও বা অর্দ্ধস্ফুট মন্তব্য করে—ওসব সখ কি আমাদের সাজে? নবজীবনের উদ্বোধনকে বলে কিনা সখ? প্রচলিত কুবিধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার নাম কি সখ? ওই দিনানুদিন খাওয়া, শোওয়া, আদর, লাঞ্ছনা ও কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে সংস্কার জীবনগতি কোথায়? প্রাণদীপ্তিতে প্রদীপ্ত হইয়াও সুপ্রভা দেবী অবসর মুহূর্ত্তে অত্যন্ত অবহেলাভরে ওইদিকে চাহিয়া থাকেন। যে নারী মুক্তির মন্ত্র শুনিবে না—তার অবশ্যপ্রাপ্য লাঞ্ছনাকে হয় তো বা প্রসন্ন মনেই উপভোগ করেন। প্রার্থনা করেন—আঘাত আরও কঠিন হউক, সম্মান ধূলায় লুটাইয়া যাক—তবে যদি যুগযুগান্ত সঞ্চিত সংস্কার ও বন্ধনের মোহ বেদনা সে কাটাইয়া উঠিতে পারে।

বউটির স্বামীকে দেখিলে পশু ছাড়া আর কিছু কল্পনা করা যায় না। রোমশ পেশী-স্ফীত হাত পা—বলিষ্ঠ চওড়া বুক—প্রায় সাত ফুট লম্বা দানবাকৃতি পুরুষ। মাথার চুল ঝাঁকড়া—দেহের বর্ণ কালো, পুরু ঠোঁটে দর্পিত ভঙ্গী—কথার মধ্যে কর্কশধ্বনি কর্ণপীড়া উৎপাদন করে। দেখিলেই মনে হয়—সারাদেহের অপরিমিত শক্তিকেও যেন ভদ্রভাবে বহন করিতে পারিতেছে না। প্রতি পদক্ষেপে—বাক্যে—আচরণে সেই শক্তি উচ্ছ্রিত হইতেছে। মানব-সভ্যতার ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠা ওই দানবটার জানা নাই। ওর চোখে লোভের উগ্র প্রকাশ যখন তখন ফুটিয়া উঠে। খাদ্যের প্রতি, নারীর প্রতি, নিজের সর্ব্ববিধ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি কি অপরিসীম লোভ! বউটিকে সে প্রায়ই শাসন করে, সামান্য ত্রুটিতে এমন ধমকায়! লোভী ও স্বার্থপর পুরুষের উপর সুপ্রভা দেবীর চিত্ত বিষাইয়া উঠে। বক্তৃতামঞ্চে যে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুর ফুটিয়া উঠে, তাহার উৎস বোধ করি ওই একতলা ঘরের বন্দিনী নারীর মর্ম্মোত্থিত হাহাকার হইতেই উৎসারিত।

আর তাঁহার স্বামী? উদার—আত্মভোলা।

পুরুষ জাতির ব্যতিক্রম বুঝি! বেশী রাত করিয়া আসিলে সস্নেহে বলেন, একটু কিছু খেয়ে শুয়ে পড় সু, ভাল ঘুম না হ'লে অসুখ করবে। সুপ্রভার মাথা ধরিলে কলিকাতার অনেকগুলি বড় ডাক্তার ডাকিয়া জড়ো করেন, সাতটা দাস দাসী মোতায়েন করিয়া স্ত্রীর প্রতি স্নেহ প্রকাশের অজস্র সুযোগ দিয়া নিজের উদার মনটিকেই মেলিয়া ধরেন। কোন ইচ্ছার আভাষ সুপ্রভার মুখে ফুটিলেই—ভূপেশ তাহা পূরণ করিয়া দেন। লাঞ্ছনা তো দূরের কথা—স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় মার্জ্জিত একটি রুচির স্নিগ্ধপ্রকাশ সব সময়েই সুপ্রভা দেখিতে পান। কখনও ভাবোচ্ছ্বাসে মাতিয়া বন্য আদরে সুপ্রভাকে যে ভাসাইয়া দিয়াছেন—সেকথা তো সুপ্রভার মনে পড়ে না। অথচ একতলার ওই অন্ধকূপে রাত্রির প্রথম যাম হইতেই যে অভিনয় সুরু হয়—তাহাতে সুপ্রভাই বেশী করিয়া লজ্জিত হইয়া উঠেন। কখনও বা হাসিয়া ফেলেন। হাসি যে আসিবেই। কিনা—একখানি সামান্য আটপৌরে শাড়ী আনিয়া মহামূল্য আভরণ উপহার দিবার ভঙ্গীতে বন্যপুরুষ অত্যন্ত গর্ব্ব অনুভব করে। স্ত্রীর হাসিমুখের বিদ্যুতে উহার চোখে লোভের আগুন জ্বলিয়া উঠে—এবং কুৎসিত সোহাগের বর্ষণ চলিতে থাকে। সুপ্রভার চোখ জ্বালা করে। ঘরের আলো নিভাইয়া দেন; আকাশের কোমল নক্ষত্র-মালাভূষিত ছায়াপথের পানে চাহিয়া ক্ষণপূর্ব্বের বিষাক্ত আবহাওয়া ভুলিতে চেষ্টা করেন। আশ্চর্য্য মন—আর নির্লজ্জ চোখ! আকাশের সৌন্দর্য্য-সাগরে একবার ডুবিয়াই পুনরায় একতলের ওই দৃশ্যের মধ্যে গিয়া পড়ে। কৌতূহল তো বটেই। অজানাকে জানিবার কৌতূহল। সুপ্রভা দেবীর কাছে একতলার ওই জগৎ—ওই রহস্যময় জগৎ—কৌতুকের বস্তু তো বটেই। ওই নির্য্যাতন ও সোহাগের ধারাবাহিক ইতিহাসে নূতনত্ব কম থাকিলেও উত্তেজনা যথেষ্ট আছে। দেখিতে দেখিতে সুপ্রভা দেবীর চোখ জ্বালা করে, মনের অদম্য কৌতূহলে চোখ ফিরাইতে পারেন না—ওদিক হইতে। এই নির্য্যাতনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা যখন তিনি সভামঞ্চে সতেজ ভাষায় অনর্গল বলিয়া যান—তখন এমন নারী কেহই থাকেন না যাঁহার নয়নে স্ফুলিঙ্গ না জ্বলিয়া উঠে। বাস্তব বর্ণনার এমনই অমোঘ শক্তি। নারীকে আদর করার মধ্যে আছে পুরুষের লোভের প্রকাশ—রিপুর প্রকাশ।

ওই মেয়েটী জানালার ধারে বসে আমাদের এদিক পানে চেয়ে থাকে কেন বলতে পার অনু? পুরুষের কর্কশ কণ্ঠস্বর।

কে জানে! ওদের টাকা আছে, কিন্তু মেয়েটার স্বামী বোধ হয় ওকে ভালবাসে না। মেয়েটি বলে।

তুমি কি করে বুঝলে?

বাঃ রে, ভালবাসা বুঝি আবার কি করে বোঝা যায়!

ওঃ—তোমায় আমি যেমন মারি—বকি, তেমনি বুঝি—

দূর, তা কেন, ওর বর তো একদিনও—এই তুমি যেমন আমায় আদর কর—

কর্কশকণ্ঠে পুরুষ হাসিয়া উঠে। উপরের জানালাটা সশব্দে বন্ধ হইয়া যায়।

আদর—আদর! যার কাছে অপর্য্যাপ্ত সম্ভ্রম পাওয়া যায়, আদরের মূল্য কতটুকু? সুপ্রভা দেবী কি আদরের কাঙাল! ছিঃ! পুরুষ খেলানার মত করিয়া স্ত্রীকে আদর করিবে—এই কল্পনাই যে অসহ্য। এই দাসী-মনোবৃত্তি সুপ্রভা তো কোনকালেই পোষণ করেন নাই! গণ্ডীঘেরা ওই সঙ্কীর্ণ জীবন আর সুপ্রভার জীবন! এ জীবনের কল্পনাও কি উহাদের আছে?

তথাপি সুপ্রভার চোখ জ্বালা করে। ওপাশের ঘরে ভূপেশ থাকেন। সুপ্রভা উঠিয়া সেই ঘরের সম্মুখে যান। ঘরের সুদৃশ্য সুগন্ধী পরদাটার সামনে বার কয়েক লঘুপদে চলাফেরা করেন। নীল পরদা ভেদ করিয়া বৈদ্যুতিক আলোর রশ্মি দুয়ারের এপারে আসিয়াছে। ভূপেশ দামী টেবিলটার সামনে বসিয়া নিশ্চয় সুপ্রভার বৈকালিক মিটিংএর বক্তৃতার বিস্তৃত বিবরণকে সাহিত্য-পর্য্যায়ভুক্ত করিবার প্রয়াসে মন দিয়াছেন। বড় ক্লকটার টকাটক শব্দ আর মসৃণ কাগজের খস্ খস্ শব্দ শোনা যায়। মাঝে মাঝে কাশিয়া ভূপেশ রায় বোধ করি গভীর ভাবের সঙ্গে সাবলীল ভাষার সংযোগ সাধন করিতেছেন। পরদা ঠেলিয়া নিঃশব্দপদসঞ্চারে সুপ্রভা দেবী ঘরে প্রবেশ করিলেন। অথচ সেই নিঃশব্দপদসঞ্চারে—পিছন ফিরিয়া-বসা দারুণ মনোযোগী ভূপেশ রায়ের তন্ময়তা কাটিয়া গেল। সুপ্রভা দেবী মনে মনে আনন্দিত হইলেন। লেখার তন্ময়তা কাটাইয়া লেখক ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি মনোযোগ দিলে সেই মনোযোগের অন্তরালে আনুরক্তির—প্রগাঢ়

আনুরক্তির নিদর্শন আবিষ্কার করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

ভূপেশ রায় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, এখনও ঘুমোও নি?

প্রত্যুত্তরে সুপ্রভা দেবী হাসিলেন, না, ঘুম এলো না।

ভূপেশ রায়ের মুখে দুশ্চিন্তার গাঢ় ছায়া নামিল। উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলিলেন, ডক্টর রায়কে বলে একটা ভাল ওষুধ—

না, না, ওষুধ দরকার নেই। সুপ্রভা দেবী হাসিলেন।

ভূপেশ রায় বিস্মিতকণ্ঠে কহিলেন, মানে বুঝছো না। ব্রেণ এক্সারসাইজ—

সুপ্রভা দেবী সোফায় অলসভাবে দেহ ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, আমি মিটিঙে লেকচার দিই—তুমি সেগুলি গুছিয়ে রাত জেগে রিপোর্ট লেখ, ব্রেণ এক্সারসাইজ আমার চেয়ে তোমারই বেশী হয়। তুমিই বরঞ্চ ওষুধ খেয়ো।

ভূপেশ হাসিবার ভঙ্গী করিয়া কহিলেন, ঠাট্টা রাখ।

ঠাট্টা নয়—সত্যি।

কিন্তু আমার ঘুম তুমি জান না সু। পড়বামাত্রই as dead as log.

সুপ্রভা বলিলেন, তা হ'লে আমার ঘুমের জন্যও তুমি চিন্তিত হ'য়ো না। একটু থামিয়া বলিলেন, কিন্তু কেন এলুম এ ঘরে, একবার জিজ্ঞাসা করলে না তো?

ভূপেশ বলিলেন, বোধ হয় রিপোর্টটা কেমন—

অর্দ্ধপথে বাধা দিয়া সুপ্রভা দেবী বলিলেন, না, ওর জন্য মাথাব্যথা আমার নেই। ওকে গোছানো ও সাহিত্য-পদবাচ্য করে প্রকাশ করার ভঙ্গি তুমি ভালই জান।

তবে আমি ঘুমিয়েছি কিনা—

মাথা নাড়িয়া সুপ্রভা দেবী বলিলেন, উঁহু। তুমি জান তোমার ঘুমের জন্য—

তা হ'লে বোধ হয়—

সশব্দে সুপ্রভা দেবী হাসিয়া উঠিলেন, তোমার কোন অনুমানই ঠিক হবে না। হাসি থামিলে সোফায় সোজা হইয়া বসিয়া তিনি চক্ষুর দৃষ্টিতে কোমল এক জ্যোতি ফুটাইয়া কহিলেন, এক অদ্ভুত প্রশ্ন আমার মনে জেগেছে, শুনলে তুমি হয় তো হাসবে।

মন্দ কি। হাসি জিনিষটাকে তুমি খারাপ বলতে পার না সু।

সুপ্রভা একটু কাশিয়া বলিলেন, মিষ্টি জিনিষটা কি সব সময়েই মুখরোচক? শুধু মিষ্টি?

যার যেমন রুচি।

মাথা নাড়িয়া সুপ্রভা হাসিলেন, আমার উপমা প্রয়োগটা সুষ্ঠু হ'লো না। সাহিত্য আমার লাইন নয়। এই ধর না কেন অনেক জিনিষ আছে—বৈশিষ্ট্যময়।

যথা? ভূপেশ কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন।

প্রাণী-জগতেই দেখ না—মেয়ের চেয়ে পুরুষের শক্তি বেশী—শ্রী বেশী। তারা সর্ব্বদাই পীড়ন করে ওদের।

মানুষ যদি প্রাণী-জগতের অনুসরণ করে—তা হ'লে তার অমার্জ্জিত রুচিকেই করে প্রকাশ। মানুষ পশুর চেয়ে উঁচু শুধু—

জানি। বহুবার বক্তৃতায় একথা বলেছি। কিন্তু যে জিনিষের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য যাতে—তাকে বিনয় আর মিষ্ট ব্যবহার দিয়ে মুড়ে রাখলে প্রাণহানি হয় না কি?

বিস্মিত ভূপেশ রায় টেবিল ছাড়িয়া সুপ্রভার নিকটবর্ত্তী হইলেন। বলিলেন, তুমি কি বলছ সু! পীড়নের মধ্যে প্রাণের সন্ধান—

সুপ্রভা হাসিলেন, বলেছি তো—আমার অদ্ভুত প্রশ্ন এটা। পুরুষ সব বিষয়েই প্রবল। তা প্রকাশ করেই তার পৌরুষ বোধ।

ভুল বলছ। ভূপেশ রায় কণ্ঠে জোর দিলেন।

সোফায় মাথা এলাইয়া সুপ্রভা দেবী চোখ বুজিলেন। খানিক পরে নিমীলিতচক্ষেই বলিলেন, হতে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক বৃত্তি যা যার চরিত্রগত—তাকে অস্বীকার করে লাভ কি! বলবান মাত্রেই চায় শাসন করতে, শাসিত হ'তে কার সাধ বল?

ভূপেশ রায় বিব্রত হইয়া একটু অগ্রসর হইয়া সোফার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলেন ও সন্তর্পণে সুপ্রভার মাথায় একখানি হাত রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, তুমি কি খুব শ্রান্ত সু?

না। এক মিনিট চুপচাপ। ভূপেশ ইতিমধ্যে সুপ্রভার চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা সুরু করিয়া দিয়াছেন। সুপ্রভা চোখ বুজিয়া সেই আরাম স্পর্শ বুঝি উপভোগ করিতেছেন।

অকস্মাৎ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সুপ্রভা বলিলেন, তুমি আমার গায়ে হাত তুলতে পার? এমন আস্তে আস্তে হাত তোলা নয়—যাকে বলে চপেটাঘাত।

ভূপেশ ব্যথিতহাস্যে বলিলেন, এমন কথা তুমি ভাবতে পার সু?

পারি না বলেই তো মাঝে মাঝে আমার কেমন সব খাপছাড়া লাগে। বিড়াল যদি মাছ খাওয়া ছাড়ে, বাঘ যদি অহিংস হয়, মহাত্মা গান্ধী যদি এনার্কিষ্ট হন—তুমি সইতে পার সে ঘটনা?

অসম্ভব কল্পনা মাত্রেই পীড়াদায়ক।

সুপ্রভা দেবী সোজা হইয়া বসিয়া কণ্ঠে জোর দিয়া বলিলেন, ঠিক—ঠিক। অবাস্তব মাত্রেই পীড়া দেয় মনকে। মানুষ সম্বন্ধে কেন খাটে না ওই কথা।

ভুল করছ সু। পীড়নের মধ্যে বর্ব্বরতার প্রকাশ, মানুষ তা জানে। মানুষ, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, বিবেকী মানুষ কখনও সে বিষয়ে ভুল করে না বা ভুল বোঝে না। নিজের বিবেক দ্বারা অসংযত বৃত্তিগুলিকে সে বশে আনে।

এ তো হ'লো অভ্যাসের কথা। স্বাভাবিককে মোড় ঘুরিয়ে অন্য পথে নিয়ে যাওয়া। বিড়ালের মাছ ছাড়ার মত।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

মনে মনে দারুণ অস্বস্তি বোধ করিয়া ভূপেশ সুপ্রভার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার ললাটে একটি সস্নেহ চুম্বন দিয়া বলিলেন, চল, শোবে চল। রাত হ'য়েছে।

সুপ্রভা দেবী খোলা চোখেই সেই চুম্বন গ্রহণ করিলেন, একটুও রোমাঞ্চ জাগিল না, বা মনের কোথাও কৌতূহল বা উত্তেজনা দেখা দিল না।

ভূপেশ রায় সোফার হাতলের উপর বসিয়া কোমলস্বরে বলিলেন, পাখাটা আর একটু বাড়িয়ে দেব?

না। বলিয়া সুপ্রভা দেবী দুই হাত মাথার উপর আনিয়া আলস্য ভাঙ্গিবার ভঙ্গিতে সোজা হইয়া বসিলেন ও সহসা প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, নীচের ওই ভাড়াটেকে কি উঠিয়ে দেয়া যায় না?

ইচ্ছে করলে হয় তো দেওয়া যায়। ওদের অভদ্র আচরণে আমিও কতদিন অতিষ্ঠ হ'য়েছি, কিন্তু তুমিই তো বারণ করেছ আমায়। একটু থামিলেন, বলেছ—ওরা নাকি তোমার বক্তৃতার প্রেরণা যোগায়।

জোগাতো। সংশোধন করিয়া সুপ্রভা বলিলেন, কিন্তু ওদের অভদ্রতা দিন দিন সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। যদি ওদের ওঠাবার অসুবিধে হয়, ওদিকের ঘরটা আমিই না হয় ছেড়ে দেব।

অমন দক্ষিণ খোলা ঘর!

হোক অসুবিধা। ওদের আমি সইতে পারছি নে। তাড়াতাড়ি সোফা ছাড়িয়া সুপ্রভা দেবী উঠিলেন।

ভূপেশ বলিলেন, তোমার অসুবিধা হয় তো আমার ঘরটাও ছেড়ে দিতে পারি।

তোমার ঘর? তোমার অসুবিধা হবে না?

কিছুমাত্র না।

মিথ্যে বলছ। আমি জানি তোমার অসুবিধা হবে।

সুপ্রভার কণ্ঠস্বরে ভূপেশ রায় চমকিত হইলেন।

সুপ্রভা বলিতে লাগিলেন, তোমার অসুবিধার কথা তুমি বলতে চাও না, কারণ—সত্য বলার সাহস তোমার কম। পুরুষ চায় শাসন করতে, অথচ তুমি দেখাতে চাও তুমি তার ব্যতিক্রম। তোমার এই লোক-দেখানো ত্যাগের কোন মূল্য নেই।

উত্তেজিত সুপ্রভা কক্ষদ্বারে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, বক্তৃতার রিপোর্ট আর লিখো না, কাল থেকে আমি বক্তৃতা করা ছেড়ে দেব। দ্রুতপদে তিনি কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

ভূপেশ রায় স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। সুপ্রভা কি অসুস্থা? ডাক্তার রায়কে ফোন করিবেন কি? ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া তিনি টেবিলের সামনে গিয়া বসিলেন। একবার খাতার পানে চাহিলেন, খানিক কি ভাবিলেন, অতঃপর ফোনটা তুলিয়া লইলেন। ঝড়ের বেগে সুপ্রভা দেবী কক্ষে পুনঃ প্রবেশ করিলেন।

শোন।

বিস্মিত ভূপেশ রায় ফোন যথাস্থানে রাখিয়া সে দিকে চাহিলেন।

তুমি কি রাগ করেছ আমার কথায়?

সুপ্রভার মুখে চোখে বিষণ্ণ ছায়া। দাঁড়াইবার শিথিল ভঙ্গিতে আলস্যমাখা বেদনা পরিস্ফুট।

রাগ!

সত্যি তুমি রাগ করো না। ওদের পশুবৎ ব্যবহারে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি। আমি—আমি বড় অস্বস্তি বোধ করি।

ভূপেশ রায় উঠিয়া ধীরে ধীরে সুপ্রভার দিকে

অগ্রসর হইলেন ও বাহু বাড়াইয়া তাহাকে আপনার পানে আকর্ষণ করিয়া কোমলকণ্ঠে কহিলেন, আমি জানি, তুমি আজ অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছ। আর কোন কথা নয়—শোবে এস।

শ্রান্তিভরে সুপ্রভা ভূপেশেব স্কন্ধে মাথা রাখিয়া কোমলকণ্ঠে কহিলেন, কিন্তু তোমাব বিপোর্ট তো শেষ করলে না।

কাল হবে।

বাঃ রে, কাল আব নতুন বক্তৃতার রিপোর্ট তা হ'লে লিখবে কখন?

কাল রাত্রিতে। প্রত্যেক জিনিসের ব্যতিক্রম কি ভাল নয় সু?

সুপ্রভা ঘাড় নাড়িয়া উজ্জ্বলমুখে ভূপেশের কথার অনুমোদন করিলেন।

সম্মুখেব আরসীতে দুইজনের আশ্লেষ-আবিষ্ট প্রতিবিম্ব ফুটিয়া উঠিল।

দুইজনেই আবসীব পানে চাহিবা হাসিলেন।

জোয়ার-ভাটা

ট্রেণের কামরার আলাপকে বৃষ্টির জলে বুদ্‌বুদ্‌-সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করা চলে—আবার সাবানের ফেনার কথাও মনে জাগে, কিন্তু হরিসুন্দরী বলেন: ওসব কথার কথা। 'মানুষের কুটুম এলে গেলে—আর গরুর কুটুম চাটলে-চুটলে'—এই হ'লো গিয়ে সত্যি কথা। নইলে ওরাই বা কে—আর আমরাই বা কে! এক দেশে বাড়ী নয়—এক জাত নয়—কথা বলার ধিবি ছাঁদই কি এক রকম! ওরা বলে—'থোও', আমরা বলি—রাখ ওখানে। আমাদের 'শেল', 'দেল', 'গোল' ওদের কাছে—'শেয়াল'—'দেয়াল'—'গোয়াল'। যা নিয়ে দিন-রাত্তির মানুষ বেঁচে আছে—যার অভাবে সংসার অচল সেই—'ট্যাকাকে' ওরা বলে কিনা 'টাকা'! তবু ওদের সঙ্গে ভাব জমে গেল এমন—যা অতি বড় আপ্তজনের সঙ্গে জমে না। হাসচো তোমরা? শোন তবে।

ও-বাড়ীর পিসিমা বলেন, উনুনে ঝোল চাপিয়ে ছুটে এনু একটা কাঁচকলার জন্যে। হবির আবার আম্বলের ব্যারামে শরীর পাত হয়ে গেল ভাই। কাল খুঁটিয়ে বাজার করেছে—গাঁদাল পাতা পর্য্যন্ত—আনেনি শুধু কঁাচকলা। অথচ কোব্‌রেজের ওষুধে পথ্যির ব্যবস্থা—

হরিসুন্দরী বলেন, এ তো আপনা-আপনির মধ্যে, নেবে তাতে লজ্জা কি ভাই। পরশু ময়রা-বৌ এসেছিল তেল ধার করতে। দিনু ভাই ছাপাছাপি একবাটি। আজ এই মাত্তর শোধ দিয়ে গেলেন। সে বাটিও নয়—সে তেলও নয়। আচ্ছা ভাই—নাই বা দিতিস শোধ—ভারি তো একপো তেল!

পিসিমা বলিলেন, ওদের দশাই ওই। হদ্দি খেতে গদ্দি নেই তবু অংখারে মটমট করচেন। আচ্ছা ভাই ও বেলা শুনবো'খন তোমার গল্প—

একটি বউ গোটা দুই কঁাচকলা আনিয়া পিসিমার হাতে দিতেই তিনি বলিলেন, এরই কথা বলছিলে বুঝি ভাই। আহা—লক্ষ্মী বউ।

বউটি প্রণাম করিলে চিবুক ধরিয়া চুমা খাইয়া তিনি হাসিলেন।

পিসিমা চলিয়া গেলে হরিসুন্দরী বলিলেন, তোমাদের ঘরে কাঁচকলা ছিল বুঝি বউমা?

বউটি হাসিমুখে বলিল, আপনার ভারি ভুলো মন—পরশু দেশ থেকে নিয়ে এলো না!

ওম'—তাই বটে! তা পাড়ার সক্কলকে দিয়েছ তো কিছু কিছু?

বাঃ রে, আমি জানি নাকি কাউকে! যা দেবার-থোবার আপনার সে ভার।

আচ্ছা—আচ্ছা সে হবে'খন। ঘরের জিনিস বলে লুটিয়ে দিতে হবে এমন কি কথা! কে দেয় কত মুঠো মুঠো আমাদের! একটু থামিয়া বলিলেন, আচ্ছা বউমা—তোমাদের সঙ্গে আলাপ আমাদের কত দিনের গা?

কত দিন আর। সেবার কোলকাতায় বোমা পড়বে এই হিড়িকে—

ঠিক কথা মা—ঠিক কথা। আমরা পালাচ্ছিনু কোলকেতা ছেড়ে—তোমরা যাচ্ছিলে ন'দে না কোথায়। শেলদয় শিমভাতে হয়ে উঠনু গাড়ীতে—প্রাণ ত্রাহি মধুসূদন। কোথায় যাব—কি করব, কিছুই জানি নি—চারিদিকে অকূল পাথার। বুড়ো মানুষ দেখে বসতে দিলে পাশে—

বউটি মৃদু হাসিয়া বলিল, ওসব কথা আর বলবেন না—লজ্জা করে। সবাই যা করে আমরাও তাই করেছিলাম, সে আর বলার মত নয়—

বৈকালে বারান্দায় পা ছড়াইয়া বসিয়া হরিসুন্দরী পানে-দোক্তায় মজা একটা পিচ ফেলিয়া পিসিমাকে সেই কথাই বলিতেছিলেন: এমন ভদ্দর আর এমন সজ্জন—নে গে তুললে নিজেদের বাড়ীতে। তারপর ভাই সে কি সেবা—কি যত্ন! দুধ রে—মাছ রে—আনাজপাতি রে—এই এত এত। ওদের আবার দুটো বড় বড় আঁব বাগান ছেল। সে কত রকমের মিষ্টি আঁব—ক্যাঁটাল—

জাম—জামরুল—একেবারে মোচ্ছব বসিয়ে দিলে। বেশ জায়গা ভাই পাড়াগাঁ। আর গঙ্গাচ্চানের সুখ কি। কোলকেতার মত ঘোলা নয়, তক্ তক্ করছে ফটিক জল—গলা ডুবুলে পায়ের পাতা পর্য্যন্ত দেখা যায়। বেশ ছিনু ভাই !

পিসিমা বলিলেন, থাকতে হয় সেই দেশে দিব্যি একখানি ঘর ভাড়া নিয়ে—

না ভাই—বর্ষা নামলে আর রক্ষে নেই। যা খাও হজম হবে না—অম্বলে বুক জ্বালা করে। প্যাচ-পেচে কাদা পথে—কেন্নো-মাছি-মশা-শুঁয়োপোকা ! আর ব্যাঙের ডাকই বা কি ! গ্যাঙোর গ্যাঙোর ডাকছে সারারাত। আর ভাই মা মনসার দৌরাত্ম্যিও কম নয়—

বেশ করেছ চলে এসেছ দিদি—অমন জায়গায় মানুষ থাকে !

পান তখন গালে মজিয়াছে বেশ। হরিসুন্দরী হাসিয়া বলিলেন, গেছনু বটে দু'দিনের জন্যে—যত্ন আত্তি যা করেছে চিরদিন মনে থাকবে। তাই তো তুলনু নিজের বাড়ীতে। বলি তোমরা এত করলে আর আমাদের বাড়ী থাকতে ভাড়া দিয়ে থাকবে অন্যের বাড়ীতে। এসো।

ভাড়া নাও না বুঝি ?

ভাড়া না নিলে কি রক্ষে আছে ! ওরা জোর করে দেয়। আর ভাই বাড়ী তো আমার নামে নয়—ওনার নামেও ছেল না। সব দেবত্তর। বাণেশ্বর শিব রয়েচেন ঘরে—তাঁর নিত্যি সেবা পুজোর ব্যবস্থা এই বাড়ী-ভাড়া থেকেই তো। ঠাকুরের সম্পত্তি আমি না নেবার কে ভাই।

তা তো বটেই।

তবে ভাড়া বাড়াইনি এক পয়সা। যা দিত আগের ভাড়াটেরা ওরাও তাই দেয়।

পিসিমা বলিলেন, তোমার ভাগ্যি ভাল ভাই। বোমার হিড়িকে সেই যে লোক পালালে, ভাড়াও ক'মে হ'লো আধাআধি। আমার ভাড়াটেরা ভারি বজ্জাত ভাই। জিনিষ-পত্তরের দর একটু একটু করে চড়ছে তো—ভাড়া বাড়াবার কথা বললেই মুখ মচকে বলে—কোথায় পাব ! এই বাজারে ভাড়া দেব, না পেটে খাব ? আর আমাদের যেন পেট নেই, সংসার নেই ?

তুলে দ্যাও না খ্যাংরা মেরে—নতুন ভাড়াটে বসাও।

হরি বলে, সে ভারি ফ্যাসাদ পিসিমা। কি নাকি আপিস হয়েছে—আইন হয়েছে, তারা তুলতে দেবে না ভাড়াটেকে। পোড়া কপাল আপিসের।

হরিসুন্দরী ঝাঁকিয়া কহিলেন, ইস্—মগের মুলুক নাকি। আমার বাড়ী যাকে খুশী ভাড়া দেব—তুলবো—

না ভাই তা হবার জো নেই। কোর্ট ঘর করে পায়ের সুতো ছিঁড়বে—তবু সুরাহা কিছু হবে না।

আচ্ছা, জিগ্‌গেস করবো'খন মণিকে—ওরা তো মানুষ চরিয়ে খায়।

তাই শুদিয়ো দিদি। পিসিমা উঠিলেন।

আইনের মর্ম্মার্থ জানিয়া হরিসুন্দরী মনমরা হইয়া গেলেন। সন্ধ্যাবেলায় মালা হাতে ভাঁড়ার ঘরের দেয়াল ঠেস দিয়া বসিলেন বটে—মন পড়িয়া রহিল ওই প্রসঙ্গে। সত্যই তো জিনিসপত্রের দর দিন দিন চড়িতেছে। যুদ্ধ বাধিয়াছে চার বছর; চার বছরে মানুষের চারশো হাল করিয়া ছাড়িবে। দুর্লভ-দর্শন পয়সার কথা ছাড়িয়া দিলে রেজকিরও যেন পাখা গজাইয়াছে। ন'টে শাকের ভাগ আর এক পয়সায় পাওয়া যায় না। ছেলেরা ভাত কোলে করিয়া মহার্ঘ্য মাছের কথা তুলিয়া আধ-খাওয়া অবস্থায় উঠিয়া যায়। গোয়ালা দুধে জল ঢালে অসঙ্কোচে। অনুযোগ করিলে জবাব দেয়, দু'দিন পরে সাদা রং আর দেখতে পাবে না—মা-ঠাকরুণ; গরু কি আর ভারতে আছে ! খোকাটার জ্বর হইয়াছিল—সারা শহরে নাকি সাগু পাওয়া যায় নাই। পাওয়া কি আর যায় নাই ? আট টাকা সেরের সাগুদানা খাওয়াইয়া রোগীকে চাঙ্গা করিবার কল্পনা কে কবে করিয়াছে ! উদ্ভট কল্পনা ! তার চেয়ে সন্দেশ খাওয়া ভাল। কিন্তু তাহাতেও যে আগুন লাগিতেছে। এতটুকু মারবেলের গুলির মত সন্দেশ একবাটি জল না ঢালিলে গলা দিয়া নামানো দুষ্কর। সন্দেশ খাওয়া তো নয়—টাকার শ্রাদ্ধ। এই অবস্থায় বাড়ীওয়ালাকে বধ করিতে প্রহ্লাদরূপী ওই আইনের হাঙ্গামা কেন বাপু !

মালা দ্রুত চলিতে লাগিল।

কাকীমা—একবার উঠ্‌বেন?

কেন গা বউমা ?

দেশ থেকে আমার ভাসুরপো এসেছে। কিছু সন্দেশ খেতে দিয়ে গেল—তাই থেকে দুটি—

আহা—তা আবার আমাকে কেন বউমা। বেশ সন্দেশ তোমাদের দেশের—কাঁচাগোল্লা

না কি? আর উঠবো না মা, কাচা কাপড় তো? তাহলে উই তেকাটায় টাঙিয়ে রাখ মা। নিত্যি নিত্যি এসব কেন মা! গেল হপ্তায় দিলে পটোল—

এবারও পটোল আর কাঁঠালের বিচি কিছু আছে।

কাঁঠালের বিচি! আহা, মণেটা বড্ড ভালবাসে খেতে।

আর ওলা একটা।

ওমা—আমার কি হবে! এতও খাণী করে রাখচো মা।

ভারি তো জিনিস—

হরিসুন্দরী মালা জপ করিতে করিতে উঠিয়া আসিলেন।

ওমা—এ যে পেতে ভর্ত্তি জিনিস! আবার নেবুও আছে? তা ইদিকে এস ত বউমা—ওই হাঁড়িটিতে কুলের আচার আছে—একটু তুলে নাও। না, না, এখুনি নাও। বলে তোমার নাম করে তৈরি করনু—

বউটি কুলের আচার লইয়া কহিল, আজ কিন্তু আর একটি জিনিস দিতে হবে কাকীমা—নইলে ছাড়ান নেই।

কি মা? তোমাকে দিই নি—হেন বস্তু ভূভারতে কি আছে মা!

তেল—কেরোসিন—

কেরাচিন! তা নাও। চার বোতল মাত্তর আছে। পরশু গুরুলুতে আর জবাতে গিয়ে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে নিয়ে এল তিনটি ঘণ্টায়। রাতে পা কামড়ানির জ্বালায় এ-পাশ ও-পাশ। সেই রাত্তিরে উঠনু—উঠে সরষের তেল গরম করে মালিশ করে দিই—তবে দু'টোতে ঘুমিয়ে বাঁচে।

শুনচি নাকি তেলের কার্ড হবে?

কে জানে মা—কালে কালে কতই দেখব! চালের অবস্থা দেখচ ত। আজ কুড়ি টাকা—ক'ল তিরিশ—

চালের কার্ডও হবে।

হলেই বাঁচি। কাঁড়ি কাঁড়ি ভিখারী দুয়োরে এসে হাঁকচে—না রেতে ঘুম—না দিনে সোয়াস্তি। মরতে শহরেই বা আসে কেন ওরা। পাড়াগাঁয়ে ত গেছনু—কেমন সবুজ ধান মাঠ ভর্ত্তি—কত আনাজপাতি—কি খাঁটি মিষ্টি দুধ।

সে পাড়াগাঁ আর নেই কাকী মা। এখানে দাম দিলে তবু চাল মেলে—ওখানে তাও না। আর যাদের পয়সা নেই—তাদের শহরই বা কি—পাড়াগাঁই বা কি!

তা হোক মা—শহরের লোককে উস্তম-খুস্তম করে মারা কেন? কত রোগ ওরা সঙ্গে করে এনেছে জান? মণি বলছেল এবার ম্যালোয়ারি যা হবে—

বউটি বলিল, ওরা ভাবে শহরে অনেক টাকা—অনেক ধান, বড়লোকেরা সবাই দয়াবান। হাত পাতলেই পেট ভরবে এই আশাই ত করে কাকী মা।

অত আশা ভাল নয় মা। কথায় বলে:

আপ্ত রেখে ধম্ম
পিতৃলোকের কম্ম।

বউটি কুলের আচার জিভ দিয়া চাকিতে চাকিতে কহিল, চমৎকার হয়েছে কাকী মা। আর সুন্দর!

আ আবাগের বেটি—সব সকড়ি করে ফেললি, ছেলের জন্যে একটু রাখলি নি?

রাখবে! বলে—ওই যে কি ছড়া বললেন আপ্ত রেখে ধর্ম্ম—আমারও হয়েছে তাই। যে ভাল লাগছে আপনার হাঁড়িটা না শেষ করে ফেলি। জিহ্বার আঘাতে টাকরায় এক প্রকার শব্দ তুলিয়া সে হাসিল।

তা করবে না—তা হলে যে দু'টি মাস আর উঠতে হবে না বিছানা থেকে। তা হাতটা ধুয়ে আর খানিকটা বার করে নাওগে ছেলের জন্যে।

ছেলেদের মধ্যেও এই সব আলোচনার সঙ্গে যুদ্ধের ভবিষ্যৎ লইয়া কথা হয়। যুদ্ধের সঙ্গে পৃথিবীর এবং পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের এবং সব জড়াইয়া স্বর্ণপ্রসূ ভবিষ্যতের চিত্র আঁকা চলে। যুদ্ধের আনুষঙ্গিক যে দুর্ভাগ্যগুলি মানুষকে সব সময়ে চিন্তার মহলে বন্দী করিয়াছে—সেগুলিকে যুদ্ধোত্তর যুগ পর্য্যন্ত টানিয়া লইবার কল্পনা—যে আজ অন্নাভাবে রাজপথে ধুঁকিতে ধুঁকিতে চলিয়াছে এবং যে টাকার অঙ্কে ফাঁপিয়া মোটরের সুখাসনে অর্দ্ধনিমীলিত দৃষ্টিতে পথের দু'পাশের দৃশ্যকে রমণীয় দেখিতেছে—কাহারও নাই। সে সোনার ভবিষ্যৎ অন্নহীনকে জোগাইবে প্রচুর অন্ন এবং মোটরবিহারীকে জোগাইবে আরও দু'একখানি মোটর।

মণি সোৎসাহে বলে, ইনসিওরেন্সের বর্ত্তমান দেখে মনে হচ্ছে ভবিষ্যৎও উজ্জ্বল।

চিতেন বলে, আপিসেও মাইনে বাড়বে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্‌ লিভিং উঁচু হলেই সব কিছু বাড়তে বাধ্য। দেখ না—গেল যুদ্ধের আগেকার স্কেলে আর পরের স্কেলে—

প্রকাশ মাথা নাড়িয়া বলে, দেশের স্বাধীনতা লাভ হবে? হবে না।

হতে বাধ্য। মণি টেবিলে চাপড় মারিয়া কণ্ঠ তারাগ্রামে তোলে, এই যুদ্ধের আগে জগতের যে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ছিল—যুদ্ধের পর তার বিরাট্ চেঞ্জ হবেই।

আচ্ছ আগে জার্ম্মেনী হারুক ত—।

সঙ্গে সঙ্গে দুই পক্ষ অবলম্বন করিয়া তুমুল তর্ক বাধে। সে তর্কও স্থায়ী হয় না।

শুনেচ তো, বেশনিং চালু হবে? চালের, চিনির, আটার—

হোক, তবু লোকে দু-বেলা দু-মুঠো খেতে পাবে।

প্রকাশ সশব্দে হাসিয়া উঠে, দু-মুঠো। দু-মুঠো তো অমনি কেউ দেবে না ভাই, দাম চাই।

দাম না দিলে কে দেবে?

যারা পথে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে তাদের কি আছে শুনি? যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে তবে না এসেছে রাজধানীতে।

লঙ্গরখানা খুলেছেন কত দাতা, সে খেয়েও কত লোক বাঁচছে।

প্রকাশ চীৎকার করিয়া কহিল, দয়ার নমুনা দেখে আমরাও বর্ত্তে যাচ্ছি। ওই কঙ্কালের মিছিল দেখলে আমার কি মনে হয় জানিস? ভাবি কত সহজে ওদের কৃতজ্ঞ করা যায়! ডাষ্টবিনে ফেলা নোংরা ঘেঁটে পচা ভাত গলা তরকারি খাচ্ছে, ওরা লোকের বাড়ীর চাকর হবার জন্য মাথা কুটছে, একমুঠা খিচুড়ি একখান ছেঁড়া কাপড় পেয়ে ভাবছে রাজধানীর লোকগুলি কি সাধু—

থাম হে থাম, আমরা সাধারণেরা এর চেয়ে বেশী কি করতে পারি?

কাওয়ার্ড। প্রকাশ রাগ করিয়া উঠিয়া গেল। কেহ মুখ টিপিয়া হাসিল, কেহ থমথমে আবহাওয়ায় খানিকটা চুপ করিয়া গোপনে একটি নিঃশ্বাস বুকের মাঝে টানিয়া লইল।

মোট কথা, ভবিষ্যৎ পৃথিবীর দুঃখ ও সুখের পরিমাপ করিয়া প্রত্যেকেই প্রত্যেককে কিছু-না-কিছু বলে। না বলিলে নিস্তার নাই বলিয়াই বলে।

একদিন হরিসুন্দরী বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মণিকে ডাকিয়া বলিলেন, তুই একবার যা বাবা, বড্ড দেরি করচে দাই। পেরথম পোয়াতি কিনা ভয় হয়।

মণি ছুটিয়া চলিয়া গেল।

সুপ্রসবের মানত করিয়া হরিসুন্দরী কয়েকটি পয়সা বউটির কপালে ছোঁয়াইয়া বাক্সে আলাদা করিয়া রাখিলেন।

যন্ত্রণায় বউটি কাতরাইতেছে; কাকীমা গো, যদি না বাঁচি ওরা রইলো দেখবেন—

যত সব অলক্ষুণে কথা, ছেলে যেন কারো হয় না। যার জিনিস সে থাকতে আমি দেখতে গেলুম কেন লা? আ গেল!

দু-বাড়ীর খাওয়া চুকাইয়া হরিসুন্দরী বারান্দার মেঝেতে বসিয়া ঢুলিতেছেন। রাত ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে। শীতকালের রাত যেমন দীর্ঘ তেমনই গম্ভীর। হরিসুন্দরী বলেন, শীতকালের রাত হলেন বেতোরুগী—আমাবস্যে হলে তো কথাই নেই। অন্ধকারে কারা আসেন, কারা কথা বলেন —মানুষের সঙ্গ তাঁদের ভাল লাগে বলেই…। সারা গায়ে কাঁটা দেয়, রামনাম জপ করেন। দ্রুত হৃৎপিণ্ডের তালে রামনামের মালা নাগরদোলার মত ঘুরিতে থাকে। সর্ব্বদেহ কাঁপিতে থাকে।

আঃ, শাঁক হাতে ঢুলছেন কেন গিন্নীমা, ফুঁ দিন—জোরে ফুঁ দিন।

চটকা ভাঙিয়া হরিসুন্দরী বলেন, অ্যাঁ—কি বললে দাই—?

শাঁক বাজান।

সজোরে শাঁখে ফুঁ দেন হরিসুন্দরী। ঘন ঘন বারকয়েক বাজাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, খোকা তো?

হাঁ, ভাল শাড়ী চাই একখানা।

হরিসুন্দরী দ্রুত উঠিয়া ঘরের মধ্যে যান। ট্রাঙ্ক খুলিয়া বাহির করেন পুরাতন জরিপাড় শান্তিপুরী শাড়ীখানি। কতকাল কাটিয়া গেছে, আজও তার পাড়ে লণ্ঠনের আলো পড়িলে আগুনের আভা ঝলসিয়া উঠে। ওই শাড়ীর সঙ্গে বিগত বসন্তের টুকরা আনন্দস্মৃতির সৌরভে ভর করিয়া ভাসিয়া আসে। ভাসিয়া আসে নিমন্ত্রণ-বাড়ীর উল্লাস এবং আদর-অভিমান-প্রণয়ের ক্ষণবুদ্‌বুদ-আশ্রিত হারাইয়া যাওয়া কতকগুলি দুর্ল্লভ মুহূর্ত্ত।

এই নাও। আমার সবচেয়ে ভাল শাড়ীখানা তোমায় দিনু!

খোকাও হয়েছে চমৎকার। আপনাদের কালের রাজপুত্রের যে গল্প শুনেছি, তারই মতো।

তোমাদের কালে বুঝি রাজপুত্তুর নেই?

আছে, তবে তাদের কদর কমে গেছে। তারা হচ্ছে হাসির খোরাক।

তা হোক, কান্নার চেয়ে হাসিটাই আমার ভাল।

দেখুন তাহ'লে খোকাটা কেমন হাসছে। দু-হাতে নবজাতককে তুলিয়া দাই হ্যারিকেনের দমটা বাড়াইয়া দিল।

হরিসুন্দরী পিছন ফিরিয়া কহিলেন, গিনি দিয়ে ছেলের মুখ না দেখলে বউমার দুঃখু হবে। না বাছা, ছেলে নে যাও। ষষ্ঠীপুজো হয়ে গেলে আঁতুড় উঠলে তবে ছেলের মুখ দেখব।

আচ্ছন্ন-শক্তিহীন বউটির কানে কথার ভগ্নাংশ প্রবেশ করে। আনন্দ ঘুমের মত দুটি মুদ্রিত চোখের পাতায় সূক্ষ্মভাবে কাঁপিতে থাকে।

এমনই করিয়া দিন যায়। পাঁচটে, নত্তা প্রভৃতি সারা হইয়া ষষ্ঠীপূজার দিন আসে। হরিসুন্দরী আর একবার হাত-বাক্সের ডালা খুলিয়া টাকার ছোট গেঁজিয়াটি বাহির করেন। দুখানি পুরা ও একখানি অর্দ্ধগিনি এবং কয়েকটি পঞ্চম জর্জ্জ-মার্কা টাকায় সেটি পূর্ণগর্ভ। রাজা জর্জ্জের টাকাগুলি বাজারে চলিবে না—তবু এগুলির উপর হরিসুন্দরীর মমতা বেশী। পুরাতন সাল হইলেও হাতবদল না হওয়ার দরুণ সেগুলি সদ্যোজাত টাকার মতই ঝক্‌ঝকে। ঝক্‌ঝকে জিনিস মাত্রেই মন হরণ করে। মাঝে মাঝে সেগুলিকে মেঝের উপর ঢালিয়া গণিয়া সন্তুষ্ট মনে তিনি পুনরায় গেঁজিয়া-জাত করেন। খরচ করিবার জন্য টাকার সৃষ্টি একথা যাহারা বলে তাহাদের কথার উত্তরে অল্প হাসিয়া হরিসুন্দরী ক্ষুদ্র টিপ্পনী কাটেন, ডোক্‌লা।

আজও মেঝেয় ঢালিয়া সেগুলির শোভা দেখিতে দেখিতে তিনি খানিকটা তন্ময় হইয়াছেন এমন সময় ভেজানো দুয়ার ঠেলিয়া মণি ঘরে ঢুকিল।

মা।

অভ্যাসবশতঃ টাকার উপর গেঁজিয়াটা চাপা দিয়া হরিসুন্দরী সেদিকে ফিরিলেন, কি রে মণি?

মণি অল্প ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, গিনিগুলো ভাল করে রেখো—ওর দর যা উঠছে।

দর। কিনেছিনু তো পনেরো ট্যাকায়—

এখন পাঁচ পনেরং পঁচাত্তরের কম নয়। সোনার ভরি নব্বুই ছাড়িয়েছে—শ'য়ে পৌঁছবে।

আঁ্যা—বলিস কি! হতবিস্ময়ে হরিসুন্দরী তাহার পানে চাহিলেন।

আর তোমার ওই পুরণো টাকগুলোও বেচে দাও—এক একটিতে পাঁচ সিকে আসবে।

দূর তা কি হয়! সেগুলির উপর মমতাভরা দৃষ্টিতে চাহিলেন।

বেশ, যা খুশী কর। কিন্তু শুনলুম একটা কথা—সত্যি?

কি কথা?

ষষ্ঠীপুজোর দিন তুমি নাকি গিনি দিয়ে হিতেনের ছেলের মুখ দেখবে?

হরিসুন্দরী বলিলেন, ষষ্ঠীপুজোয় নয়, ভাবছি ভাতের সময়···তখন সোনা সস্তা হবে না?

কি করে বলবো। যদি না হয়?

না হয়, খানিক চিন্তিত মুখে চুপ করিয়া রহিলেন; না হয় ট্যাকাই দেব।

যাই হোক গিনি এখন ছেড়ো না—দুলিটার বিয়ে দিতে হবে। গহনা গড়াবার সোনা হয়তো—

সে আর তোমাকে শেখাতে হবে না। গেঁজিয়া ভর্ত্তি করিয়া বাক্স বন্ধ করিলেন। যেটুকু দ্বিধা ছিল মনে—সোনার দর চড়িতেছে শুনিয়া নিঃশেষে মুছিয়া গেল।

বাহির হইবার পথে হিতেনের সঙ্গে মণির দেখা। হিতেন বলিল, আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম মণি-দা। মানে আপনার রেশন-কার্ড দুখানা একবার দেবেন তো।

মণি হাসিয়া বলিল, কার্ড কি করবে হে?

ডাক্তার বলেন দুধের সঙ্গে মিছরি জ্বাল দিয়ে খোকাকে খাওয়াতে। তাই ভাবছি—

মিছরি তো বাজারে নেই।

চিনি থেকে মিছরি তৈরি করাবো। একজন ময়রার সঙ্গে কথা হয়েছে, এক সের চিনি দিলে তিন পোয়া মিছরি দেবে।

তাই ত এ সপ্তাহে চিনি তো ডিউ নেই।

আসচে সপ্তাহে নেব না হয়।

তাই ত হে, বাড়ীতে পেল্লায় চায়ের খরচ; সকাল-বিকেল-দুপুর-সন্ধ্যে। হয় ব্ল্যাক মার্কেটের আশ্রয় নিতে হবে নয় পেশা কমাতে হবে।

কুণ্ঠিত স্বরে হিতেন বলিল, একটা মাস কষ্ট করে চালান দাদা। আমরা তো চা খাই নে, চিনিরও দরকার নেই।

বাড়ীর মধ্যে আসিয়া মণি বলিল, মা, ওদের রেশন-কার্ড দুখানা বার করে দাও।

ওপর হইতে হরিসুন্দরী বলিলেন, কাল তো চাল চিনি আনলি আজ আবার—

মণি রুক্ষ কণ্ঠে কহিল, যাদের কার্ড তারা যদি চায়—রাখতে পার তুমি! কি জোর আছে তোমার—

চাইছে? আচ্ছা, আমি না হয়—

মণি রুখিয়া উঠিল, না, না, না। যে আপনার নয়, তার কাছে ভিক্ষে নেব?

বৈকালে পিসিমা আসিলে হরিসুন্দরী ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন, ভাড়াটের মত দেখি নি ভাই, নিজের বোয়ের চেয়ে আপন ভাবতুম। এক জায়গায় ছিল কার্ট। ওদের দরকার হলে ওরা নিত, আমাদের দরকারে আমরা নিতুম। ভারি তো জিনিস! চাল আ'টা আর চিনি। আমরাই আনছি নিচ্ছি। চালটা আটাটা ওরা নেয়, চিনিটুকু সবাই চার-পাঁচ বার চা খায় বলে—

পিসিমা বলিলেন, কথায় বলে না:

জন জামাই ভাগনা,
তিন নয় আপনা।

হরিসুন্দরী পেরেকে টাঙানো হরিনামের ঝুলি লইয়া বলিলেন, সে চোখে তো দেখিনি কাউকে, দেখতেও পারলুম না কখনো।

বেশ ত, কচি ছেলের জন্যে চিনি যদি তোর দরকার হয়ই, নে না চেয়ে আমার ঠেঁয়ে। কাটান-ছেঁড়া করার কি দরকার ছেল!

পিসিমা চোখ টিপিয়া মুখ বাঁকাইয়া হাসিলেন একটু।

সেদিন মণি জিদ ধরিল, টাকাগুলোর গতি কর মা, কোন্ দিন দর নেমে যাবে—

হরিসুন্দরী বলিলেন, বে'থার তত্ত্বে-তাবাসে দিতে ভাল দেখায় বলে রেখেছিলুম। তা তোরা যখন বলছিস—

মণি বলিল, গোটা চার পাঁচ রেখে দাও না হয়।

না, না, কিসের জন্যে রাখব।

হিতেনের ছেলের ভাতে—

পোড়া কপাল! কথায় বলে:

মা বিয়োলো না বিয়োলো মাসী—
ঝাল খেয়ে মরে পাড়াপড়শী।

সুবাদ ত ওই পর্য্যন্ত। এই যে 'কার্ট'গুলো দু'মাস হ'ল নিয়েছে, দিলে ফেরত? উদ্ভুটে ডাক্তারের উদ্ভুটে ব্যবস্থা! কচি ছেলেকে কে আবার বারো মাস দুধ-মিছরি খাওয়ায় শুনি?

ওদের কার্ড ওরা নিয়েছে—তাতে আমাদের কি মা। নিক গে।

গেঁজিয়া উপুড় করিয়া টাকাগুলি মেঝেয় ঢালিয়া দিলেন। পুরাণ টাকার আওয়াজ ভারি মিষ্ট। শব্দ হইলেই মনে হয় গানের সুর। কিন্তু গান মাত্রেই ত সুখের নহে এ কথা আর কে না জানে।

ক্রমে ক্রমে বস্ত্র-সমস্যা উঁকি মারিল। সে যে অন্ন-সমস্যার মতই সঙ্গীন হইবে, প্রথমটা কেহ বুঝিতে পারেন নাই।

মণিদের বৈঠকখানায় তর্ক চলে, দু'মাস পরে কাপড়ে ছেয়ে যাবে বাজার। আমেরিকার জাহাজ-ভর্তি মাল প্যাসেফিকে পা বাড়িয়েছে।

ম্যানচেষ্টারও কি ছেড়ে কথা কইবে?

তখন কে কত পরবে কাপড়—

প্রকাশ উষ্ণ কণ্ঠে বলে, তাই পরো। তোমাদের লজ্জা নিবারণ হবে—দুঃখু ঘুচবে। সভ্য থাকাটাই হ'ল গিয়ে আসল—স্বাধীনতা ত ফাউ।

বড্ড বাজে বকিস নেকা। চালের দুর্ভিক্ষ হ'ল, আমাদের হাত ছিল কিছু? কাপড়ের দুর্ভিক্ষ দেখছি, তাতেই বা হাত কোথায়? এত সভাসমিতি—প্রতিবাদ অনুনয় বিনয়, হচ্ছে কিছুতে কিছু?

প্রকাশ উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া উঠে, তরকারিতে মশলা দিয়েছ অনেক তেল-ঘি গরম মশলা,—নেই শুধু নুন। আমরা আবার বড়াই করি!

কোন্ তরকারি রে?

জানি না। যাদের মুখের নেই স্বাদ—মনেতে নেই তৃষ্ণা—তারা আবার মানুষ! অত্যধিক ক্রোধ হইলে প্রকাশ সেখানে থাকে না—উঠিয়া যায়।

বাড়ীর মধ্যেও সে ক্রোধের ধোঁয়াটা গাঢ় হইয়াছে। হরিসুন্দরী বকিতেছেন: একে কাপড়ের দুর্মূল্য তায় এত বড় ফালা দিলে মানুষ বাঁচে! এমন দস্যি ছেলেপুলে—

হিতেনের বউ দোরগোড়ায় আসিয়া কহিল, ছেলেমেয়েদের দোষ নেই কাকী মা, তাড়াতাড়িতে আসছিলাম বালতিটা নিয়ে—কানায় খোঁচ লেগে—

হরিসুন্দরী নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে তাহার পানে চাহিলেন। সেই বিস্মিত প্রখর দৃষ্টির তলে চোখ তুলিয়া দাঁড়ান কঠিন।

হিতেনের বউ মুখ নামাইয়া বলিল, আমায় দিন কাকী মা, দুপুর-বেলায় রিফু করে রাখব'খন।

হরিসুন্দরী দৃষ্টি-আগুনের উত্তাপ কণ্ঠে ঢালিয়া কহিলেন, রিপু করলেই ত নতুন করে দেয়া যায় না। দু'তিন ধোপের কাপড় একেবারে ফালানালা!

মণি বারান্দায় পা দিতেই বউটি চলিয়া গেল।

অবশেষে শোনা গেল—চাল, আটা, নুন, চিনির,

কাপড়েরও রেশন হইবে। তবে সে ব্যবস্থা করিতে মাস দুই চার হইতে পারে। ইতিমধ্যে পাড়ার ওয়ার্ড-কমিটির মারফত বাড়ী-পিছু একখানি করিয়া কাপড় দেওয়া হইবে—অবস্থা সচ্ছল হইলে মাথা পিছু পাওয়া যাইতে পারে।

সকলের দেখাদেখি হিতেনও ফর্ম্ম পূরণ করিয়া দিল।

বউটি বলিল, কাপড় যদি পাও—কাকীমাকে একখানা দিও।

হিতেন হাসিল, দেবে ত একখানা—তার আবার কাকীমাকে!

না গো, ওঁর কাপড় ছিঁড়ে দিয়ে যা লজ্জায় আছি।

বুঝলাম। কাপড় ওঁকে দিলেও তোমার লজ্জা ঘুচবে?

তবু—

তবুর কিছু নেই। তুমি না হয় বাড়ীতে আছ—ছেঁড়া-খোঁড়া পরে থাকবে; নিদেন পক্ষে লেপের ওয়াড়—গামছা কাগজ যা কিছু হোক। আমাদের আপিস করতে হয়—রাস্তার আইন বাঁচিয়ে চলতে হবে। দেখ সু, সচ্ছল অবস্থার দিনে যে ত্রুটি মানুষকে লজ্জা দেয়—আপৎকালে তাই তার ভূষণ। ওতে অপরাধ নেই।

বউটি অত বোঝে না, মনের দুঃখে চুপ করিয়া থাকে।

অনুসন্ধান কমিটি হইতে যথাসময়ে হিতনের নামে পারমিট আসিল। সে মণিকে সেটি দেখাইয়া বলিল, একখানা ধুতির পারমিট পেলাম দাদা।

মণি পারমিট দেখিয়া প্রসন্ন হইল না। কহিল, ভালই ত।

আপনি কি পেলেন? ধুতি না শাড়ি?

মণি অন্তরে জ্বলিতেছিল, মুখে শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল, এক বাড়ী থেকে ক'জনকে পারমিট দেবে? এখনও ত ঢালাও দেবার অর্ডার হয় নি?

তাহ'লে আপনি পাবেন না?

মণি নীরস স্বরে কহিল, আচ্ছা হিতেন, যারা আপিস করে—খবরের কাগজ পড়ে—পাঁচ দিকের খবর রাখে—তারা যদি ন্যাকা সাজে, তাহ'লে কি ইচ্ছে হয় জান?

হিতেন দারুণ অপ্রস্তুত হইয়া আমতা আমতা করিয়া কি বলিতে গিয়া দেখে—মণি সেখানে নাই। মণির আক্রোশের হেতু বুঝিয়া তাহার অপরাধের বোঝা যেন হাল্কা হইয়া আসে। সে ত কমিটীকে বলিয়া শুধু নিজের কাপড় লওয়ার ব্যবস্থা করে নাই। তাহাদের খেয়ালখুশী মত যাহার ভাগ্যে যেটুকু লাভ হইল, তাহাতে হিংসাই বা কেন—ক্রোধই বা কিসের?

ম্রিয়মাণ বউটির হাতে ধুতিখানি দিয়া বলিল, তুলে রাখ।

বাঃ—বেশ মিহি ধুতি ত। পাড়টিও খাসা।

হিতেন বলিল, কত লোক এই দেখে হিংসেয় ফেটে মরছে জান?

হিংসে?

হাঁগো—মণিদাকে দেখালাম, মুখ কাল করে চলে গেলেন।

ওঁরা পান নি?

না, তাই ত রাগ।

এমন সময়ে ঘড় ঘড় ঝন্ ঝন্ শব্দ হইতে লাগিল। দু'জনে ঘর হইতে বারান্দায় আসিয়া দেখে, দেয়াল ঠেসান যে করোগেট টিনখানা এতদিন অকেজো হইয়া পড়িয়াছিল—সেটিকে মণি, হরিসুন্দরী, তাহার পনর বছরের নাতনী দুলালী এবং সাত বছরের নাতি মণ্টু, টানিয়া বারান্দায় তুলিতেছে।

হিতেন ও তাহার বউ বারান্দা হইতে সরিয়া গেল।

পরের দিন বৈকালে নিত্য অভ্যাস মত হরিসুন্দরী বারান্দার ওধারে বসিয়াছেন। কণ্ঠস্বরে বোঝা গেল পিসিমা আছেন। আর কে আছেন না-আছেন—হিতেনের বউয়ের দেখার সুযোগ কম। কেন না, করোগেট টিনে বারান্দাটা দ্বিধা-বিভক্ত হইয়াছে।

হরিসুন্দরীর গলা পাওয়া গেল। কাহাকেও গোপন করিয়া নহে—যেন অপর পক্ষকে শোনাইবার জন্যই এই আলোচনা।

আর ভাই, আলাদা বাড়ী না দেখালে ফাঁকিতে পড়ে সর্ব্বস্বান্ত। মণি ত বোঝে না—ভাবলে পরগাছাকে আপন করে নেবে। তা এক মালিক দেখিয়ে সব 'কাট' আমার বাকসোয় রাখত। ছেলের মিছরির ছুতো করে সেই যে 'কাট' নিলেন—সে হ'ল গিয়ে ছ'মাসের কথা। আবার কাপড়ের বেলাতেও দেখালেন ভু। বাড়ী পিছু একখানা কাপড়—তা কম্মকত্তাদের সলিয়ে-কলিয়ে গব্বোজাত করলেন। অথচ আমি ভাই—

প্রথম পরিচয় হইতে আজ পর্য্যন্ত কত রকম

এবং কি পরিমাণ জিনিস দিয়াছেন, তাহার সুদীর্ঘ তালিকা নিখুঁত আবৃত্তি করিয়া হরিসুন্দরী প্যাচ, করিয়া পানের পিচ ফেলিলেন।

পিসিমা বলিলেন, তা ভাই বেশ করেছ— বারান্দাটা ঘিরে আলাদা করে নিয়েছ। এখন বাড়ী আলাদা দেখাতে পারলে কাপড়ও পাবে আলাদা।

হরিসুন্দরী বলিলেন, তাই বলছিনু—তোরাই বা কে, আমরাই বা কে। কোন্ অজ পাড়াগাঁয়ে বাড়ী, এক জাত নয়—কথা বলার ছিরি ছাঁদই কি এক রকম! যার অভাবে সংসারে অচল, সেই 'ট্যাকা'কে তোরা ব'লস টাকা! তোদের সঙ্গে ভাব জমবে কোন্ সুবাদে শুনি?

প্যাচ করিয়া আর একবার শব্দ হইল।

পিচ ফেলার শব্দে মনে হইল—অনেকখানি ক্রোধ ও ঘৃণা সেই সঙ্গে বাহির হইয়া গেল

নূতন জগতে

আকাশে মেঘ ছিল না, রাজধানীর এই দ্বিতল ঘরখানিতে আলো-হাওয়া প্রচুর। কেবিনের গায়ে-ঘেঁষা খানিকটা নিরালা সিটটির মধ্যে প্রসন্নতাও কিছু অনুভূত হইল। তথাপ পরিচিত জগৎ হইতে চলিয়া-আসার বেদনা মনকে পীড়া দিতে লাগিল। অপরিচিত পরিবেশপ্রসূত বিরাগ ঠিক নহে—রোগের অনিশ্চিত আরোগ্যলাভের আশঙ্কাতেই হয়তো এমনটি সম্ভবপর হইয়াছে।

বসুন—ওই আপনার সিট।

ঠিক পায়ের গোড়ায় নার্সের বসিবার জায়গা হইতে নির্দেশ আসিল।

বিছানায় বসিয়া চারিদিকে চাহিলাম। লম্বা চওড়ায় প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন ঘর, কেবিন লইয়া সর্ব্বসুদ্ধ উনিশটি সিট। ঘরের বাহিরে পুরাতন জগতের পরিচয় বস্ত্র ছাড়িয়া আসিয়াছি; মাথার ধারে কাগজে-আটকানো বোর্ডটায় তাহার সামান্যতম নিদর্শন আছে, কিন্তু দেওয়ালের গায়ে ক্ষোদিত নম্বরটাই পুরাতন পরিচয়কে গ্রাস করিয়াছে। নাম মুছিয়া গেল, নম্বরে অধিষ্ঠিত হইলাম।

চারিদিকে কৌতূহলী দৃষ্টি। পুরাতন জগতে নূতন কিছু ঘটিলে চাঞ্চল্য উঠে। অনেকটা অগভীর পুকুরের জলে ঢিল ফেলার মত।

পাশের বেড হইতে একটি কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলে উঠিয়া আসিয়া আমার পাশে দাঁড়াইল। ছেলেটির বাম চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা বলিয়া ডান চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক প্রখর। সেই প্রখর দৃষ্টি দ্বারা আমাকে বিদ্ধ করতঃ কহিল, আপনার কি হয়েছে?

রোগের নাম শুনিয়া কিছু বুঝিতে পারিল না, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, অপারেশন হবে? খুব শক্ত অপারেশন বুঝি?

সংশয়-কুণ্ঠিত স্বরে বলিলাম, বোধ হয়।

কত দিনের রোগ ও কিরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব দিতে-না-দিতে আর একটি ওই বয়সী কৌতূহলী ছেলে আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল। তাহারও ডান কানের পিঠ হইতে মাথার খানিকটা পর্য্যন্ত ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। বাঁধনে মুখের খানিকটা ঢাকিয়া গিয়াছে। চোখের দৃষ্টিও স্বাভাবিক নহে।

কি ভাই—তিন নম্বর, আজ তোমার ড্রেসিং হ'ল?

নবাগত ছেলেটি বলিল, কই আর হ'ল। ডাক্তার বলে গেলেন—সকাল বেলায়। আর, এম, ও,র তো সে ভাবনায় ঘুম নেই। তোমার?

বললে—সন্ধ্যাবেলায় হবে।

হাঁ—সন্ধ্যেবেলায় তো কত হয়। জানেন সার—এখানে ব্যবস্থা আছে সব, কিন্তু কে কার কড়ি ধারে গোছ!

সে কি—বড় হাসপাতাল—

হাঁ মশায়, নামেই তালপুকুর—ঘটি ডোবে না। দেখুন না নার্সের কাণ্ড। ওপর নীচের দুটি ওয়ার্ড; নীচেয় গেলে ওপর দেখে কে বলুন।

কেন, নীচেয় আলাদা ষ্টাফ নেই?

ষ্টাফ সর্ট। যুদ্ধের হাঙ্গামা। তা ছাড়া দেখছেন তো সব মেল নার্স। অধিকাংশেরই কাণ্ডজ্ঞানের অভাব।

খানিকটা আতঙ্কিত হইলাম। চিকিৎসকদের ঔদাসীন্য ও নার্সের অনভিজ্ঞতা—দুইটিই রোগীর পক্ষে মারাত্মক। তবে সকলের উপরে ভগবান আছেন। সে বিশ্বাসকেও আঁকড়াইয়া ধরা আসন্ন অপারেশনের মুখে কম কঠিন নহে।

তিন নম্বর বলিল, আপনাদের অপারেশন তত শক্ত নয়—আকছাড় হচ্ছে। আমার কেসটাই ছিল সাংঘাতিক। একটু থামিয়া বলিল, এই যে কানের পিঠে হাড় দেখছেন—ওর মধ্যে পুঁজ জমে ছিল। হাড় কেটেছে—প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে। মাসটার্ড য়্যাবসেস্—কিনা সবচেয়ে সাংঘাতিক রোগ।

দু-নম্বর বলিল, আমার কেসটাও খুব শক্ত। ছেলেবেলায় চোখের কোণে একটা ছোটো কালো তিল ছিল। বয়স যতই বাড়ে—তিলটি মুসুর ভোর হতে মটর ভোর—মটর থেকে খানিকটা মাংস

গড়িয়ে নাকের পাশ দিয়ে ঝুলে পড়ে। চোখ ঢেকে ফেলেছিল আর কি! জোরে চলতে গেলে সেটি দুলতে থাকত—ভারি অস্বস্তি।

—কি রোগ?

—অ্যানুজিয়মো।

তিন নম্বর বলিল, তবে অপারেশন ওর সোজা। ক্লোরোফরম দিতে হয় নি। গোটাকতক লোক্যাল ইন্‌জেকশান দিয়ে মাংসটা তুলে দিয়েছে। আমার সার—পুরো তিন ঘণ্টা লেগেছিল। হাতুড়ি আর ছেনি দিয়ে হাড় কাটা—একটু অসাবধান হলে ব্রেণ পর্য্যন্ত অ্যাফেক্ট করত।

দু-নম্বর বলিল, চোখের কাছটাও—

হাসিয়া দুইজনকে নিরস্ত করিয়া কহিলাম, ডাক্তার কখন আসবেন?

ছ'টার পর—ভিজিটাররা চলে গেলে।

নার্স কহিল, আপনারা সব বেডে গিয়ে বসুন—ডাক্তাররা হঠাৎ দেখলে বকাবকি করতে পারেন।

দুইজনে যথাস্থানে বসিলে নার্স আমায় আর এক দফা জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া অভয় দিল, ভয় কি, কত রুগী আসছে—যাচ্ছে, মনে করুন না—বাড়ীতেই আছেন।

বাড়ীর চেয়ে জায়গাটা তো মন্দ নয়। পূব, পশ্চিম ও উত্তরে ফাঁকা মাঠ। প্রাসাদোপম বাড়ীতে প্রচুর আলো এবং অবাধ হাওয়া। ঘরে বিজলী বাতি ও বিজলী পাখা। বেশ খানিকটা নীল আকাশ, সবুজ শষ্প-ভরা মাঠ ও দূরের বৃক্ষশ্রেণী চোখকে তৃপ্ত করিতেছে। মনের ভাবনাকে ঠাঁই না দিলে অনায়াসে কবিতা লিখিতে পারা যায়। কিন্তু এত আলো হাওয়া ও প্রসারের মধ্যে এক টুকরা সন্দেহ মনের অন্ধকার কোণে কি করিয়া যে আটকাইয়া রহিল—আশ্চর্য্য! মৃত্যুর ভয় মানুষকে রোগদুর্ব্বল মুহূর্ত্তে এমনই সংশয়ে ভয়ে মুহ্যমান করিয়া রাখে। যুদ্ধের প্রাক্কালে জয়ের সংশয় সর্ব্বক্ষেত্রেই সুনিশ্চিত। বিকল দেহযন্ত্রে আজ সংঘর্ষ বাধিয়াছে—কবিতা লিখিবার বাহ্যিক উপকরণগুলি তাই অকিঞ্চিৎকর হইয়া গেছে।

ওধার হইতে একটি রোগী কাতর কণ্ঠে ডাকিল, মেল-নার্স বাবু, একটু জল দিন।

নার্স বলিল, অপারেশন রুগী—বেশী জল খায় না।

তবে এক কুচি বরফ—

বরফ! এ ওয়ার্ডে বরফ নেই—।

তবে একটু ডাবের জল।

নার্স বিরক্তস্বরে বলিল, আঃ—জ্বালালে! অপারেশন হবার দিন নিজের লোক কাছে রাখবার ব্যবস্থা করতে হয়।

কেবিন হইতে ঘণ্টা বাজিবামাত্র নার্স সেই দিকে দৌড়াইল।

কেবিনে পদমর্য্যাদাযুক্ত লোকেরাই থাকেন। কর্ত্তব্য-অবহেলার শাস্তি দিবার ক্ষমতা তাঁহাদের কেহ কেহ রাখেন এবং অর্থব্যয়েও অকুণ্ঠিত। নদী পর্ব্বতগুহা হইতে এক বার বাহির হইলে আর স্বস্থানে ফিরিয়া যায় না, সেই তার পরম সম্মান। দান কিন্তু বহুক্ষেত্রে বহু অসম্মানের কলঙ্কে ম্লান হইয়া যায়। অবশ্য পাথরে ক্ষোদিত দাতার নাম ও সহৃদয়তার কাহিনী সাদা চোখে সাদাই থাকে! কেবিন হইতে নার্স বাহির হইল একটু ব্যস্ত ভাবেই—হাতে তার সস্‌প্যান। সস্‌প্যানে সামান্য জলের মধ্যে দুটি ছোট ডিম। ষ্টোর রুমে গ্যাস-ষ্টোভ জ্বলিতেছে; সকাল বিকাল দুটি করিয়া অর্দ্ধসিদ্ধ আণ্ডা না হইলে কেবিনের রোগীর চলে না। একটা চাকর উঁহারই ফরমাসে পান ও ডাব আনিতে বাহিরে গিয়াছে, আর একজন ডিউটি নাই বলিয়া বারান্দায় ঘুমাইতেছে। মেথরটা মেজে পরিষ্কার করিতেছে—কাজেই ডিম দুটি সিদ্ধের ভার নার্স লইয়াছে।

মেল-নার্স-বাবু, একটু জল। পাশে নির্লজ্জ লোকটার কাতর স্বর।

হচ্ছে—হচ্ছে। ষ্টোর-রুমের মধ্যে নার্স অদৃশ্য হইল।

দু'নম্বর উঠিয়া আট নম্বরের কাছে গেল এবং চাকু ছুরি দিয়া ডাব কাটিয়া খানিকটা জল তাহাকে পান করাইয়া বাকিটা ঢাকা দিয়া রাখিল।

ওই কেবিনটার জাঁক বেশী বলিয়া মনে হইল। জানালার সাদা-পরদা একপাশে গুটানো রহিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়া ভিতরের প্রায় সবটুকু দেখা যায়। একখানি প্রিংওয়ালা খাট—ছোট মত একটা ড্রেসিং টেবিল—একখানি চেয়ার—সুদৃশ্য একটি মশারি হুকে ঝুলিতেছে এবং মাথার উপর বিজলী পাখা অনবরত ঘুরিতেছে।

আপাদমস্তক বেশে সুসজ্জিত তিন-চারিটি যুবক—কাহারও হাতে সংবাদপত্র—কাহারও হাতে চায়ের পেয়ালা—কেহ বা সিগারেটে দিতেছেন আরামদায়ক টান—দিব্য আড্ডা জমাইয়াছেন ওই ঘরে। চাকরটা চরকিবাজীর মত বাবুদের চা, জল, বরফ, লেবু, ডাব ইত্যাদি আনিয়া দিতেছে, নার্স

রুটির টুকরায় মাখন মাখাইতেছে, মেথরটাও মাঝে মাঝে আসিয়া ষ্টোর-রুম হইতে হয়তো বা এক কেতলি গরম জল—হয়ত বা কাটারিখানা আগাইয়া দিতেছে। সর্ব্বসুদ্ধ বেশ জমজমাট ভাব।

দু'নম্বরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ওঁদের মধ্যে রুগী কোন্‌টি?

সে যাহাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইল, তাহাকেই দলের মধ্যে সুস্থতম বোধ হইল। সুপরিচ্ছন্ন বেশবাসে সুমার্জ্জিত ভাব—সদ্য-ক্ষৌরিত ক্রীমলেপিত সুকোমল মুখমণ্ডল—গৌর গণ্ডদেশে দাড়িম লাঞ্ছিত রক্তিম বর্ণ, সুগোল হাত এবং নিটোল দেহ, লাইমজুস গ্লিসারিন প্রসাধিত চকচকে কেশ—এ রকমের রোগী দর্শন কদাচিৎ ঘটে!

এ দিকে রোগী-দর্শনের ঘণ্টা বাজিলে দু-একটি করিয়া লোক আসিতে লাগিল—নেহাৎ খুচরা রেটে। কাহারও বিছানার সামান্য অংশ কেহ স্পর্শ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া দু-মিনিটে কাজ সারিয়া চলিয়া গেল, কেহ বা পাশের টুল টানিয়া শিয়রে বসিয়া গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। কোন বেড ঘিরিয়া বন্ধুবান্ধবদের দল একসঙ্গে নানা কথা কহিয়া কোলাহল সৃষ্টি করিতে লাগিল। কেহ স্নেহের টানে আসিয়াছে—কাহারও বা কর্ত্তব্যের দায়। কিন্তু পাশের কেবিনে পাইকারী রেটে তত্ত্বাবধায়কের দল আসা-যাওয়া করিতেছে। সিগারেটের ধোঁয়ায় কেবিনটা মিলের চিম্‌নির মত হইয়াছে। উচ্চহাস্যে ও গল্পে রোগকে যেন নিষ্ঠুরভাবে শিকার করা হইতেছে।

ঘণ্টা বাজিল, একে একে দর্শনার্থীর দল চলিয়া গেল। মেথর ঝাড়ু ও ন্যাতা লইয়া গৃহ-মার্জ্জনায় প্রবৃত্ত হইল, নার্স ঔষধ সেবনের ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করিল—রোগীরা অল্পক্ষণের স্বাধীনতা হারাইয়া শয্যা আশ্রয় করিল।

বৈচিত্র্যময় ওয়ার্ড। আই-ওয়ার্ডের খানিকটা পর্য্যন্ত এর মধ্যে আছে। কাজেই বিভিন্ন আর, এম, ও'রা হাউস সার্জ্জেনের সঙ্গে পরিদর্শন সারিয়া যাইতেছেন। কোন্ কেস রেডি করিতে হইবে তাহার নির্দ্দেশ—ডায়েট শীটে রোগীর পথ্যাপথ্য-নির্ব্বাচন-বিধান, যন্ত্রপাতি ও অ্যামপিউল লইয়া কাহারও দেহে ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া, কোন সদ্য-অস্ত্রোপচার-সমাপ্ত নিস্তেজ রোগীর দেহতাপ বৃদ্ধির জন্য হীট, ক্রেডেলের ব্যবস্থা—ইত্যাদি যান্ত্রিক নিয়মে সুসম্পন্ন হইতেছে। কোন রোগী যন্ত্রণার অভিযোগ করিলে—কোন ডাক্তার হাসিয়া ঘাড় নাড়িতেছেন—কেহ বা দু-একটি কথা বলিতেছেন। যেন যন্ত্রণাটা উপলক্ষ্য। তৃষ্ণার কথা, খাবারের কথা, নাসের অবহেলা—এসব তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামাইবার অবসর তাঁহাদের নাই। যুদ্ধের বাজারে এ সব অসুবিধা জানিয়াই তো এখানে আসা!

তার পর ঘটাং করিয়া একটা শব্দ হইল,—রোগীরা সচেতন হইয়া উঠিল। খাবার আসিয়াছে। বেশীর ভাগ দুধ-পাঁউরুটির ব্যবস্থা—দুই-একজনের ভাত। মাথার কাছে মীটসেফের মাথায় রাখা অ্যালুমিনিয়ামের মগটিতে দুধ ঢালিয়া এক টুকরা (আধ পাউণ্ড ওজন) পাঁউরুটি রাখিয়া দিল। পিতলের কানা উঁচু পরাতে মগ-মাপা ভাত দিয়া গেল। সে অন্নের মধ্যে অন্নপূর্ণার প্রসন্ন হাসি বা ভিক্ষুককে দানের মমতাটুকু নাই। মানুষের হাত দিয়া পরিবেশিত হইলেও যন্ত্রের রূঢ়তা উহার প্রত্যেকটি দানার মধ্যে নিহিত। তবু ক্ষুধার জ্বালা বড় জ্বালা সেই গলিত অন্নপিণ্ড—জলবৎ ডালের ধারায় নরম করিয়া—নাম-না-জানা একটা ঘ্যাঁট তরকারি ও একখানা ভাজা মাছের সাহায্যে কয়েক মিনিটের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ভাত খাওয়া হইলে দু'নম্বরকে বলিলাম, পেট ভরলো?

না কাকাবাবু। ওই মগে মেপে ভাত দেয়—ও আর কতটুকু! আরও এক মগ খেতে পারি।

চেয়ে নাও না?

মাপা জিনিস, দেবার জো নেই। সবই তো রেশনের ব্যাপার।

তা সত্য। শুধু দুর্দ্দিনে সারবস্তু কিছু পেটে না পড়াতে ক্ষুধার মাত্রাটা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

অন্ন লইয়া প্রকাশ্য অভিযোগ যে না উঠিল তাহা নহে। মগরাহাট না কোথায় বাড়ী একজন আধা-বয়সী চাষী লোক রীতিমত বকাবকি সুরু করিয়া দিল। পরিবেশনকারীও আইন দেখাইয়া তাহাকে ধমক দিতে লাগিল। বিভাগীয় আর, এম, ও, ছুটিয়া আসিলেন।

গোলমাল কেন?

মশয়—এই ক'টি ভাতে পেট ভরে?

ফুল ডায়েট না হাফ্? প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডায়েট শীটে চোখ বুলাইয়া কহিলেন, ওর বেশী দেওয়া নিয়ম নেই। রেশন হয়েছে কলকাতায় জান না?

তথাপি লোকটি গজ্ গজ্ করিতে লাগিল।

অতঃপর নার্স দর্শন দিলেন। বাম হাতে ঔষধের বোতল—ডান হাতে মেজার গ্লাস।

ওষুধটুকু খেয়ে নিন্ সার।

কি ওষুধ?

এই এ্যালকালিন মিকশ্চার। তেতো নয়—কষা নয়—

আমার অধরস্পৃষ্ট গ্লাসটি না ধুইয়া দ্বিতীয় রোগীকে ঔষধ সেবন করাইলেন। তার পর তৃতীয়কে। স্বাস্থ্যনিলয়ে বসিয়া এই পরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশনে মন তন্মুহূর্ত্তে বিমুখ হইয়া উঠিল। তার পর তাপমান যন্ত্রে জ্বর দেখার অভিনয়। অভিনয় ছাড়া আর কি বলিব! কাহারও হাত টিপিয়া, কাহারও বা কপালে হাত দিয়া মাত্র দুই-এক জনকে তাপমান যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করত নার্স সাহেব চার্টে অঙ্কপাত করিতে লাগিলেন।

সে পর্ব্ব মিটিলে নার্স-সাহেব আমার বেডের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ওখানা কি বই সার?

একখানা নভেল।

একটু পড়তে পারি? বলিয়া অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। তারপর সামনের চেয়ারখানা ডেস্কের নিকট টানিয়া আনিলেন এবং দু'টী পা ডেস্কের উপর তুলিয়া দিয়া বইয়ে মনোনিবেশ করিলেন। রোগীরা নিবিষ্টচিত্ত নার্সকে আর বিরক্ত করিল না—কেহ বা বিছানায় শুইয়া—কেহ বা বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া পরিচিত রোগীর সঙ্গে আলাপ জমাইতে লাগিল। বাহিরে ট্রাম-বাসের শব্দ কমিয়া আসিতেছে, শুধু ষ্টেশন ইয়ার্ডে অতিকায় এঞ্জিনগুলি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে এবং বিরাট অজগর দেহের মত ওয়াগন-গুলি গা নাড়া দিতেছে। ব্ল্যাকআউটের বাজার—স্তিমিত আলোয় শহর তন্দ্রাবিষ্ট অবস্থায় যেন দুঃস্বপ্ন দেখিতেছে।

নূতন পরিবেশে নিদ্রা আসিল বহু বিলম্বে। ভোরের হাওয়ায় চোখ বুজিতে-না বুজিতে একি উৎপাত! নার্স হৈচৈ করিয়া রোগীদের পরিপূর্ণ নিদ্রা সকালে ভাঙিয়া দিল। বাহিরের পথে তখনও লোক চলাচল আরম্ভ হয় নাই, ইয়ার্ডে শুধু এঞ্জিনগুলি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে—তাহাতে রাতের গাম্ভীর্য্য বেশ বুঝা যায়। আকাশে তারার মিছিল—পূর্ব্বদিকে প্রভাতের কোন ইঙ্গিতই নাই। ওয়ার্ডে ঘড়ি না থাকায় অকাল নিদ্রাভঙ্গের এই উৎসব! চাকর মগে গরম জল ভর্ত্তি করিয়া দিয়া গেল—নার্স ঔষধের শিশি বোতল ষ্টোর-রুম হইতে আনিয়া টেবিলের উপর গুছাইতে লাগিল। নিদ্রাভারগ্রস্ত রোগীকে মুখ ধুইবার নির্দ্দেশ ও ঔষধ খাওয়াইবার প্রচেষ্টায় অনুনয় ভর্ৎসনা ভয় প্রদর্শন ইত্যাদি চলিতে লাগিল। রোগীর ও নার্সের সত্যকার সম্বন্ধটি যেন এই রাত্রি শেষের মুহূর্ত্তে নিঃশেষে প্রকাশ করিয়া দিল।

দলাদলি যদি জগতের নিয়ম হয়—এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটিবে কেন? এখানে রোগীরাই রোগীদের বন্ধু। তাহাদেরই বিচিত্র আলাপে পৃথিবী মমতাময়ী মাতার মত শিয়রে আসিয়া বসেন। আশ্চর্য্য—যার যত অভাবই থাকুক—সেই পৃথিবীর দুঃখকষ্টের পাঁচালী সর্ব্বক্ষণ কেহ কীর্ত্তন করে না, এই পৃথিবীর প্রাসাদে বাস করিয়া যে অসুবিধাগুলি অহরহ মনকে তিক্ত করিয়া তুলিতেছে—তাহাই আলাপ-পরিচয়ে প্রতিদণ্ডে ফুটিতেছে। পৃথিবীর (হউক সে নূতন কিম্বা পুরাতন) হৃদয়হীনতার কি ইয়ত্তা আছে। এক ভাগ স্থলের মধ্যে পাহাড় ও মরুভূমির পরিমাণটাই বা কম কি! কৃপণ ভগবান তিন ভাগ জলের উপর ফাউ দিয়াছেন এইগুলি। যুদ্ধ বাধিবে না কি মানুষ হাত-পা গুটাইয়া আরাম করিবে নিশ্চিন্তে! সৃষ্টির খুঁতেই মানুষ হইয়াছে খুঁৎখুঁতে। ডাক্তারের সঙ্গে নার্সের—নার্সের সঙ্গে রোগীর—রোগীর সঙ্গে খাবার পরিবেশনকারীর—চাকরের মেথরের বাদ্‌বিতণ্ডা লাগিয়াই আছে। যুদ্ধের বিক্ষোভে পৃথিবী আজ বিক্ষুব্ধ।

তবু ফাল্গুনের শেষ দিনে আকাশের চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে। হাসপাতালের মাঠে দু'টি আমগাছ ও ওয়ার্ড ঘেঁষিয়া একটি মহুয়া গাছে ঋতু-উৎসবের প্রসাদ-চিহ্ন। মহুয়া গাছটারই শোভা বেশী। আমের মুকুল শেষ হইয়া কতক ঝরিয়াছে—কতক বা দানা বাঁধিয়াছে, মহুয়ার স্তবকবদ্ধ লাল পুষ্পকলিকা ফাল্গুনের কামনাকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিবার আয়োজনে ব্যস্ত। মাটির রসে, আকাশের আলোয়, ঋতুর দাক্ষিণ্যে ওরই প্রকাশটি হইতেছে সুসম্পূর্ণ।

মুখ ধোওয়া এবং ঔষধ খাওয়ানোর পালা শেষ হইলে, আসিল প্রাতরাশ। অর্থাৎ এক টুকরা পাউরুটি ও খানিকটা স্বাদহীন বর্ণহীন চা। অতঃপর সংবাদপত্রের হকার আসিয়া কাগজ চাই কিনা জিজ্ঞাসা করিল। পথ্য জোটে না—কাগজ আর কে কিনিবে!

কেবিনের ভদ্রলোক ততক্ষণে চা, ডিম, রুটি

ইত্যাদি শেষ করিয়া মুখে ক্রীম ইত্যাদি মাখিয়া নূতন একটি স্যুট পরিয়া হলের মধ্যে আসিয়া দর্শন দিলেন। নার্স সসম্ভ্রমে চেয়ার ছাড়িয়া দিল। তিনি চেয়ারে বসিয়া একটি সিগারেট ধরাইলেন এবং নার্সকে দুই একটি প্রশ্ন করিয়া আমার নিকটে আসিলেন।

আপনার কি অসুখ সার ?

বলিলাম। ভদ্রতার খাতিরে তাঁহার কথাও জিজ্ঞাসা করিলাম।

বলিলেন, আমার তো অপারেশন কেস নয়—আছি মেডিক্যালে।—ডাক্তারেরা অনেকে বন্ধু আছেন—এইখানে চিকিৎসার সুবিধা হবে বলেই থাকা।

কেমন বোধ করছেন ?

আর বলবেন না মশাই। হাসপাতাল আজ নামেই হাসপাতাল! না নার্সিং—না ওষুধ। কেন যে লোকে আসে এখানে! আছি মাস তিনেক—যা খরচ হচ্ছে তাতে বাইরে গিয়ে অনায়াসে ভাল ভাবে চিকিৎসা করাতে পারতাম।

তাই কেন যান না।

ডাক্তার বন্ধু—প্রায় সর্ব্বক্ষণই ওঁদের পাই। আমার ব্যাপার কি জানেন—খানিকটা নার্ভাসনেস আছে বৈকি। যদি এক ঘণ্টা কোন ডাক্তারকে না দেখি—

পয়সা আছে—খরচ করিয়া আনন্দ পান, সে কথা ভাল কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া এই যে কেবিন আটকাইয়া রাখা এবং অর্থের মহিমায় চাকর মেথরকে পর্য্যন্ত সাধারণ রোগীর পরিচর্য্যা হইতে বঞ্চিত করা—এই অন্যায়টুকু কেন যে বোঝেন না!

ভদ্রলোক কিন্তু সাধারণ রোগীর জন্য যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন।

এদের দেখলে দুঃখু হয় মশায়। পুওর ডায়েট—কেয়ারল্যাস এ্যাটেনডান্স। নেহাৎ ভগবানের দয়া তাই টেঁকে যায়।

সাড়ে-আটটা হইতে বারোটা পর্য্যন্ত বিচিত্র বেশধারী ছোট-বড়-মাঝারি ডাক্তারদের এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড়ে ওয়ার্ড সরগরম থাকে। তখন নার্সরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে—রোগীরাও কিছু কিছু অভিযোগ করে। সমস্তটাই যেখানে অভিযোগের বিষয়ীভূত—সামান্য বিষয়ে সেখানে মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়াও কষ্টসাধ্য। তবু মানবীয় দুর্ব্বলতাবশত রোগীরা জানায় অভাব, এবং মানবীয় ঔদার্য্যহেতু ডাক্তাররা শোনেন তার খানিকটা এবং মানবীয় ভ্রান্তি বশতই কিছুক্ষণ পরে দুই পক্ষই ভুলিয়া যায় সে সব তুচ্ছ কথা। উদাসীন হাসপাতালে ঘরে ঘরে নিয়মের অনুবর্ত্তন ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল রাখিয়া চলে।

আট নম্বরে যে নূতন রোগীটি আসিয়াছে, তার গল্প সন্ধ্যা বেলায় বেশ জমে। নাবিক-জীবনে তার সঞ্চয় খানিকটা আছে। দেশ-বিদেশের কথা—সমুদ্রের কথা—বন্দরের জাঁকজমক—বিভিন্ন জাতির সঙ্গে পরিচয় ও তাদের জীবন-রহস্য গল্পের মতই মিষ্ট লাগে। লোকটি বলে, এখানে ভাল লাগছে না। ডাক্তার বলেছে অপারেশনের পর নাকি জাহাজে কাজ করা চলবে না। আমি তো একদণ্ডও এখানে থাকতে পারব না। ভাল লাগে না।

সে কি—দেশ বলে টান নেই? বাড়ী-ঘরের মায়া নেই তোমার ?

লোকটি হাসিয়া মাথা নাড়ে।

সমুদ্রে যান নি কোন দিন—যদি যেতেন, জিজ্ঞাসা করতেন না একথা।

ও মুক্তির স্বাদ পাইয়াছে—না উচ্ছৃঙ্খলতার ?

সাত নম্বরও তাহার কথা কিছু শোনায়; দপ্তরীর কাজ করি—মাসে কামাই (উপার্জ্জন) হয় বেশ, ছেলে কটিও আল্লার দোয়ায় রোজগার করে; আরে মশাই, হাসপাতালে এসে চুপচাপ বসে থাকলে ঠকে যাবেন। জুলুম জবরদস্তি না করলে কি কাজ আদায় হয় ?

সে তো প্রত্যক্ষ করিতেছি। খাবার আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একখানি সসার লইয়া বারান্দায় যান এবং নিজের হাতে কয়েকখানি মাছ উঠাইয়া লন। বাড়ী হইতে খানা আসে—তাহাতে মাছের ভাগ জুৎসই থাকে না বলিয়াই এই ব্যবস্থা। ডাকিবামাত্র জমাদার বেডপ্যান লইয়া হাজির হয় এবং ডাক্তারও অযত্ন করেন না। জল গরম ও দুধ গরম করিবার জন্য ষ্টোররুমেও তাঁর অবাধ গতি।

এই সব সুনিয়মের মূলে যে তথ্যটি আছে—আমাকে চুপি চুপি শিখাইয়া দিলেন। দিন দু-আনা চার-আনা ছাড়বেন, তোফা আরামে থাকবেন। হাসপাতালের ব্যবস্থা ভাল—বাড়ীতে চার গুণ খরচ করলেও এমনটি হয় না।

ব্যবস্থা তো ভালই। বিনা পয়সায় রক্ত ও মূত্র পরীক্ষা—ঔষধের ব্যবস্থা—সর্ব্বক্ষণের জন্য ডাক্তারকে পাওয়া ভাগ্যের কথা বৈকি।

কথায় কথায় পরীক্ষা—কত রকমের পরীক্ষা। দেহ লইয়া লজ্জা প্রকাশের অবকাশ যেন বাহুল্য। একটা কাঠের টুকরা কিম্বা একটি মাংসময় যন্ত্র। কোথায় সামান্য একটি স্ক্রু ঢিলা হইল বা কোন্ ক্ষুদ্র একটি দাঁত ক্ষয় প্রাপ্ত হইল—তাহারই মেরামতের ব্যবস্থা। আত্মসমর্পণের এমন পরিপূর্ণ ভাবটি অন্য কোথাও দেখা যায় না।

পরদা ঘিরিয়া ড্রেসিং ইত্যাদি হয়। লজ্জা হইতে রোগীকে বাঁচাইবার জন্য নহে—বীভৎসতা যাহাতে চোখে না পড়ে। সুচারু দেহে সামান্য স্ফোটক দেখিলে মনে প্রতিক্রিয়া সুরু হয়। দেহগত আকর্ষণ সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হইয়া যায়।

সেদিন আট নম্বরের অপারেশন হইবে। সে পাঁচ নম্বরকে বলিল, ভাইসায়েব—আমায় একটু দেখো। একটি টাকা আমার আছে, তোমার কাছে রেখে দাও। জ্ঞান হলে কিছু ফলটল কিনে খাইয়ো।

সেদিন সে অপারেশন-টেবিল হইতে ফিরিয়া আসিল।

ডাক্তার সেইদিন বৈকালে পাঁচ নম্বরকে বলিলেন, আপনি সেরে গেছেন। পরশু নাগাদ আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। একটি সস্পেন্সারি ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার করবেন।

তার পরদিন খুব ভোরে লোকটি ব্যাণ্ডেজ কিনিতে গেল—আর ফিরিল না।

সেই দিনই আট নম্বরের অপারেশন হইল এবং বৈকালে জ্ঞান হইতেই সে কাঁদিতে লাগিল

দু' নম্বর আসিয়া বলিল, কাকাবাবু শুনেচেন?

শুনিলাম পাঁচ নম্বর না ফিরুক তাহাতে কাহারও কিছু ক্ষতি ছিল না—শুধু আট নম্বরকে সে কাঁদাইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ গচ্ছিত টাকাটি ফেরত দেয় নাই।

আমরাই ডাব ইত্যাদি দিয়া আট নম্বরের তত্ত্বাবধান করিলাম।

কয় দিন হইতে আকাশে মেঘের আনাগোনা চলিতেছে। চৈত্রের প্রথমে সূর্য্যের উত্তাপ বাড়িতেছে বলিয়া মেঘের কাছে আমরা বর্ষণ-প্রত্যাশী। অন্ততঃ খানিকটা ঝড় হইয়াও যায় যদি। সেইদিন সকালে ডাক্তার জানাইয়াছেন পরশু আমার অপারেশন হইবে। কথাটা শুনিয়া অবধি একটা অজানা আতঙ্কে মন মুহ্যমান হইয়া গিয়াছে। যে সব অপারেশন কয়দিন দেখিলাম—তাহার পর পর অবস্থাগুলি মনে গাঁথিয়া রাখিতেছি। যদিও এ ওয়ার্ডে কাহারও মৃত্যু ঘটে নাই তবু অদৃশ্য শত্রুকে তুচ্ছ করিতে পারিতেছি না। এই ওয়ার্ডে একটি দশ-বারো বছরের ছেলে ছিল। ছেলেটির সর্ব্বত্র অবাধ গতি। রাশভারী ডাক্তারকে সে ডরায় না—নার্সের শাসন তো কোনদিনই মানিতে দেখিলাম না।

প্রত্যেক রোগীর কাছে গিয়া শুধাইত, হ্যাঁগা তোমার কি অসুক? অপারেশন হবে? তা ভয় কি।

কেহ জল চাহিলে ছুটিয়া সে জল আনিয়া দিত, অন্য ওয়ার্ড হইতে বরফ চুরি করিয়া আনিত। দু-পাশের বারান্দায় ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করিত। পাতি লেবুর উপর ছিল তার অপরিসীম লোভ। খাবার সে কাহারও কাছে চাহিত না, কিন্তু লেবু চাহিয়া লইত বল খেলিবার জন্য। সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। চঞ্চল ছেলেটির মধ্যে সেবার ভাবটি পরিস্ফুট।

সন্ধ্যাবেলায় আমার শিয়রে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাল তোমার অপারেশন হবে? আঃ বেশ মজা।

মজা কিরে? ভয় হয় না তোর?

ভয়! খিল খিল করিয়া সে হাসিয়া উঠিল। ভয় কিসের গো? ডাক্তার ইন্জেকশন করে যায় সন্ধ্যাবেলা, সকালে কিছু খেতে দেয় না—মেথর এসে ডুস দেয়। তার পর নাপিত আসে কামাতে। কামানো হয়ে গেলে ফের ইন্জেকশন। তার পর টেচারে শুইয়ে—লাল কম্বল ঢাকা দিয়ে যাবে উই ঘরে। সাদা পাথরের টেবুল—মাথায় সূয্যির মত আলো—আর মুখোস-পরা সব ডাক্তার। তুলোর পাহাড় যেমন সাদা—তেমনি সাদা সব যন্তরপাতি। ওষুধ শুঁকিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলে কিছু জানতে পারবে না। তার পর তোমাকে নিয়ে আসবে এই ঘরে। বিছানায় শুইয়ে হাত-পা বেঁধে দেবে। মুখ দিয়ে গাঁজলা উঠবে—বমি হবে। তার পর জ্ঞ্যান হবে। খানিক পরে বরফ খেতে দেবে, ডাবের জলও দেবে। ব্যস্।

যদি মরে যাই?

ধুর—মরবো কেনে। কত লোক গেল বাড়ী।

তোর অপারেশন হয় নি?

না। দু-বার নে গেছলো ওই ঘরে, সব দেখেছি। ভারি মজা।

এমন সময় দমকা হাওয়া আসিল, ছেলেটিও ছুটিয়া পলাইল। নার্সেরা অভয় দিত, ভয় কি,

আমরা আপনাকে দেখাশোনা করব।

সেইদিন বিকাল হইতে ডিউটি বদল হইয়া জানা নার্সেরা অন্য ওয়ার্ডে চলিয়া গেল। রাত্রিতে যিনি আসিলেন—তাঁহার 'ডোণ্ট-কেয়ার' ভাবটা যেন বেশী। দৈহিক শক্তি ও সজ্জা সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বক্ষণ সজাগ। হাতে একখানা বই—রোগীর জগতে যেটুকু থাকেন—তাহাও সমনস্ক নহে। সেই দিনই রাত্রিতে কাহাকেও এ্যালকালিন মিক্‌শ্চারের বদলে ব্যালসিয়াম মিক্‌শ্চার খাওয়াইয়া দিলেন, কাহাকেও বা কোন ওষুধই দিলেন না। চার্টে আপনমনে কি সব অঙ্কপাত করিলেন—রোগীকে জিজ্ঞাসামাত্র করিলেন না। হাত ফস্কাইয়া থার্ম্মোমিটারটা পড়িয়া ভাঙিয়া গেল—খানিক পরে ভাঙিল কাচের গ্লাসটি। উভয় বিষয়ে পরম নিশ্চিন্ত হইয়া চেয়ারে বসিয়া বইয়ে মনোনিবেশ করিলেন। তার পর রাত্রি গভীর হইলে একখানি শূন্যশয্যায় দেহ প্রসারিত করিয়া দিলেন।

দুয়ারে খিল দেওয়া ছিল। বাহিরের ঠক্‌ঠক্‌ ধ্বনিতে নার্সের গভীর নিদ্রাভঙ্গ হইল না, আঠারো নম্বরের রোগী উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। নাইট-ইন-চার্জ্জ সিস্‌টার টর্চ্চ হাতে ঘরে ঢুকিলেন এবং মেল-নার্সকে ধাক্কা দিয়া জাগাইলেন। তার পর ভর্ৎসনা ও ভয় প্রদর্শনের নমুনা আর দিব না—শুধু এইটুকু বলিতে পারি, পরিদর্শিকা চলিয়া গেলে আমাদের মেল-নার্সবাবু একটি মধুর সম্বোধনে সেই অনুদ্দিষ্টাকে আপ্যায়িত করিয়া নিজেকে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অনুশোচনার বা ভয়ের বিন্দুমাত্র ছায়া সে মুখে দেখা গেল না।

পরের রাত্রিতে বৃষ্টি চাপিয়া আসিল। ঝড় ছিল বলিয়া দুয়ার বন্ধ করিতে হইল বৃষ্টি থামিলেও সে দুয়ার আর খোলা হইল না, মেল-নার্স শয়নের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। আজ কোন বেড খালি ছিল না, তিন জন নূতন রোগী ভর্ত্তি হইয়াছে। ভাবিলাম, আরাম করিয়া ঘুম দেওয়া ও-বেচারার ভাগ্যে আজ বিধাতা লেখেন নাই। জানিতাম না—কৃতী পুরুষরা সর্ব্বক্ষেত্রেই সুযোগ সৃষ্টি করিতে সুদক্ষ।

সেদিনও মাঝরাত্রিতে দুয়ারে ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ হইল, নিকটবর্ত্তী রোগী দুয়ার খুলিয়া দিল, কিন্তু কোথায় মেল-নার্স? সে কি হাওয়া হইয়া উড়িয়া গেল! কিন্তু পরিদর্শিকার অভিজ্ঞতা অদ্ভুত। টর্চ্চের আলো ফেলিয়া তিনি নবাগত এক বে বিছানা হইতে মেল-নার্সকে আবিষ্কার করিলেন। সে চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পরম নির্ব্বিকারচিত্তে ভৎসনা শুনিতে লাগিল। পরিদর্শিকা চলিয়া গেলে সেই প্রিয় সম্বোধনের সঙ্গে আরও গোটা-কতক গ্রাম্য শব্দ জুড়িয়া দিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিল। অস্ফুট স্বরে বলিল, কত কলেজ ঘুরে এলাম—কত নার্সকেই দেখলাম, চাকরি তো নিতে পারবে না।

আজ অপারেশনের দিন। প্রভাতের আলো স্তিমিত বোধ হইতেছে, প্রাত্যহিক ঘটনাগুলিতে দৃষ্টি বা মন নাই। কে আসিল—কে চলিয়া গেল—কোথায় কি কৌতূহলজনক ব্যাপার ঘটিল, ভ্রূক্ষেপ নাই। আমার সজ্জাতেই সকালটা সর্ব্বস্ব নিয়োগ করিয়াছে।

তার পর যাত্রা করিলাম।

ঘুম ভাঙিয়া গেল—বেলা তখন বারোটা। খাবার বাক্সটার শব্দ এবং আহার-পর্ব্বের অনুযোগে নিত্যকার কোলাহল জমিয়াছে। মহুয়া গাছ হইতে কাকের দল আহার-প্রত্যাশায় কা-কা শব্দ করিতেছে, এঞ্জিনের ফোঁসফোঁসানি, মালগাড়ীর শান্টিঙের শব্দ কানে আসিতেছে। প্রথম চৈতন্যের অস্ফুট ও মিশ্র কোলাহল ক্রমশঃ অর্থযুক্ত হইতেছে।

খাটের রেলিংটা পা দিয়া অনুভব করিলাম, বাঁচিয়া আছি।

আমাকে চোখ চাহিতে দেখিয়া কে হাত-পায়ের বাঁধন খুলিয়া দিল এবং মিষ্ট স্বরে বলিল, চুপ করে ঘুমুন, ভয় কি।

ভয় বা চিন্তা প্রথম চৈতন্যদ্বারে ভীরু করাঘাত করিতে পারে কি? ঘুমাইবার সুযোগ হয়তো বহুবার পাইব। যন্ত্রণা? সে অনুভূতিও তত প্রবল নহে। আকাশপ্লাবী আলোর বন্যায় ঘর ভাসিয়া যাইতেছে, স্তিমিত প্রভাত যৌবন-লাবণ্যে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে সহসা, নীল আকাশের টুকরা ইন্দ্রকান্ত মণির দ্যুতিতে ঝলমল করিতেছে—আর সেই ঝলমলে মণিদ্যুতির নীচের লাল ফুলের স্তবক-সজ্জিত কামনা-প্রদীপ্ত মহুয়া গাছটি নিঃশব্দে হাসিতেছে।

ওই অপরূপ গাছের তিনটি শাখার সংযোগস্থলে বায়স দম্পতি বাসা বাঁধিবার আয়োজনে ব্যস্ত। পুরাতন জগতের নূতন রূপ—নূতন অর্থ ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইতেছে।

ভয়

প্রথম যখন যুদ্ধ বাধে—অনাদির আনন্দের আর অবধি ছিল না। ঘাড় নাড়িয়া সহকর্ম্মীদের প্রায়ই বলিত, দেখিস—এবার যদি জার্ম্মেনী না জেতে তো কি বলেছি!

সে বিষয়ে সহকর্ম্মীদের অবশ্য মতদ্বৈধতা ছিল না। চাকরি একটা মাঝারি-গোছের সদাগরী আপিসে। আপিসটা ইংরেজের। পার্টনার—সিনিয়র জুনিয়র দুই দলই অত্যন্ত কড়া মেজাজের। নিয়ম-শৃঙ্খলার একটু এদিক-ওদিক হইলেই ওরা কর্ম্মচারীদের ধমক দেয়, মাহিনা কমায়। দশটা-পাঁচটার পরও দুই-এক ঘণ্টা খাটাইয়া সে অনিয়মের শোধ তোলে। আবার মাহিনা বৃদ্ধির বেলাতেও ওদের ঔদাসীন্য অপরিসীম। যুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গেই কিছু জিনিসপত্রের দাম বাড়ে নাই, তবু গত মহাযুদ্ধের সময় কোন্ আপিসে কত ওয়ার-অ্যালাউন্স বা গ্রেড বাড়িয়াছিল, তাহার হিসাব-নিকাশে বেশ খানিকটা তর্কবিতর্ক প্রত্যহই হয়। সকলেই আশা করে—যুদ্ধটা দীর্ঘস্থায়ী হইলে আয়ের অঙ্কটা বৃদ্ধি পাইবে। কাজেই যুদ্ধ সম্বন্ধে সকলেরই উৎসাহ দিন দিন বাড়িয়া উঠে।

অনাদির সংসার নেহাৎ ছোট নহে। বিধবা মা, অবিবাহিতা বোন, বউ এবং ছেলেমেয়ে লইয়া মোট আট জন। নব্বুইটি টাকা মাহিনাও পুরা হাতে আসে না। শহরতলীর পৈত্রিক ভিটা না থাকিলে সংসার চালান কঠিনই হইত। এখনও সংসার চলে কোন রকমে। মায়ের সুগৃহিণীত্বের গুণে ধারকর্জ্জ হয় না বটে, তবে আহারে-বসনে কৃচ্ছ্র-সাধন না করিয়া উপায় নাই। ইহার উপর যুদ্ধের উৎসাহে নগদ এক আনা খরচ করিয়া একখানা দৈনিক বাংলা কাগজ কিনিতে আরম্ভ করিল। পরের কাগজ চাহিয়া আনিয়াছে ভাবিয়া প্রথম দিন-দুই মা কিছু বলিলেন না। মাস-কাবারে সংসার-খরচের টাকা কম পাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁরে অনাদি, দুটো টাকা কম দিলি যে?

ঢোক গিলিয়া অনাদি বলিল,—মানে, একখানা কাগজ নিচ্ছি কিনা এ মাস থেকে।

মা বলিলেন, কাগজ নিয়ে কি হবে! ও দুটো টাকা থাকলে যে কোলের মেয়েটার দুধ কিছু বেশী করে নেয়া যেত।

সে কথার উত্তর না দিয়া অনাদি বলিল, ঠিক দু'টাকা তো নয়, পুরোনো কাগজ বেচলেও হেসে-খেলে একটা টাকা হবে। পাছে মা আরও কিছু বলেন—এই ভয়ে সে কাজের অছিলা করিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

দুটি টাকার অভাব ছিদ্রগ্রস্ত সংসারে খুব বেশী বলিয়া বোধ হয় না। এদিকে জার্ম্মেনী দেশের পর দেশ জয় করিয়া যুদ্ধের উত্তেজনা বাড়াইয়া দিল। সেই সঙ্গে জিনিষের দামও কিছু কিছু চড়িতে লাগিল।

অবনী জিজ্ঞাসা করে, চা'লের দর আজকাল কত ক'রে যাচ্ছে হে?

ভূষণ বলে, পাঁচ টাকা।

অনাদি কাগজ খুলিয়া হাসি মুখে বলে, হু—হুঁ বাবা—আর ক'টা দিন সবুর কর। পাঁচ ছাড়ালেই ওয়ার-অ্যালাউন্স দিতে পথ পাবেন না বাছাধনেরা। এই দেখ কি লিখেছে।

অনাদির কথাই সত্য হইল। কিছুদিন পর চা'লের দাম সাতে উঠিতেই ওয়ার-অ্যালাউন্স মঞ্জুর হইল।

তারপর আসিল পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ। ইতিমধ্যে যুদ্ধ-ভাতা কিছু বাড়িলেও—সে প্রাপ্তিতে আনন্দ বোধ সকলের কাটিয়াছে। আর যুদ্ধের উৎসাহ কাটাইয়া দিল পঞ্চাশের মন্বন্তর।

সেদিন অনাদি আপিসে আসিতেই সহকর্ম্মীরা বলিল, কই হে—কাগজ কই?

অনাদি বলিল, ছেড়ে দিলাম কাগজ নেওয়া। যুদ্ধের খবর কি দিচ্ছে ওরা, যে পড়ে সুখ পাব!

রতন বলিল, সে কি হে, জার্ম্মেনী তো একটু একটু করে হটছে।

ছাই—। সব চাপা খবর, বলিয়া অনাদি মুখ ফিরাইল।

তা জার্ম্মেনী জিতলেই বুঝি খবরটা সত্যি হ'তো?

এই শ্লেষে অনাদি জলিয়া উঠিয়া বলিল, বোঝ তো কচু! একদিনও কিনলে না একখানা কাগজ, মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ করো না বলছি!

সকলে চোখ টেপাটিপি করিয়া হাসিল, আর কিছু বলিল না।

দুর্ভিক্ষ কাটিয়া গেল—লোকের দুঃখভার লাঘব হইল না, বরং তা দিন দিন বাড়িয়াই চলিল।

আগে বড় বড় যুদ্ধজাহাজ ডুবিলেই কাগজ খুলিয়া অনাদি চীৎকার করিয়া উঠিত, ওহে—আজও দুখানা পটোল তুলেছে। এই নিয়ে মোট' হল—

তারপর টনের হিসাব চলিত।

আজকাল কেউ জাহাজডুবির খবর দিলে বলে, ভারি ত'—লাভ তো এই—ভেবুদটা আর মিলবে না। পাচ্ছ হরলিক্‌স্? কডলিভার?

২

এমনি টাল-বেটালের মধ্যে একদিন জার্ম্মেনী আত্মসমর্পণ করিল। তিন মাসের মধ্যে পরমাণবিক বোমার ঘায়ে জাপানও ধরাশায়ী হইল। আপিসে দুই দিন করিয়া ছুটিও হইল এই উপলক্ষ্যে।

অবনী বলিল, যাক্ বাঁচা গেল! এবার মানুষ খেয়ে-পরে বাঁচবে।

অনাদি বলিল, ওয়ার-অ্যালাউন্স এইবার তুলে দেবে। উল্টে মাইনে থেকে না কাটে।

ভূষণ বলিল, ইস্—কাটলেই হ'লো! এই মাগ্যির বাজারে কাটুক না দেখি মাইনে থেকে।

কিন্তু হেভি রিডাকশান হবে।

পোষ্টওয়ার প্লানেও বলেছিল—কারও চাকরি যাবে না শীগ গির।

আরে ওসব আমাদের জন্যে আর কি।

অনাদি বলিল, তা যাদের চাকরি এই যুদ্ধের সময় হয়েছে—তাদের যদি ছাড়িয়েই দেয় তো তোমার-আমার কি!

বাঃ রে—তোমার আমার বাড়ীর আয় কমে যাবে না—তা হ'লে? ছেলেরা কাজ করছে না?

তা আর কি হবে। তোমার বাড়ী-তৈরির জন্য যে রাজমিস্ত্রীকে মজুরি দিয়ে খাটাও—বাড়ী শেষ হ'লে তাকে মজুরি দিতে পার?

কিসে আর কিসে! হরিপদ রুখিয়া উঠিল। বাড়ী তৈরি আর যুদ্ধ বাধান এক? আমরা বাধিয়েছি যুদ্ধ?

এই কথায় সকলে খানিকক্ষণের জন্য চুপ করিল।

ভূষণ বলিল, শুনছি নাকি পঁচিশ বছরের ওপর যাদের চাকরি হয়েছে তাদের ছাঁটিয়ে দেবে।

তাই নাকি? কোথায় শুনলে?

সকলের আগ্রহকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া ভূষণ গম্ভীরভাবে বলিল, আমার দাদার বন্ধু কাজ করেন গবর্ণমেণ্ট আপিসে। তাঁর এক বন্ধু কাজ করেন দিল্লীর দপ্তরে। সেখানকার কন্‌ফিডেন্সিয়াল খবর—

সুতরাং গোপন কথাটি লইয়া সারা আপিসে আলোচনা সুরু হইল। নিজের বয়সও চাকরির বয়স হিসাব করিয়া কেহ বিমর্ষ, কেহ বা পুলকিত হইল।

অবনী বলিল, যাক্—আমার ভয় নেই। এই সতের চলছে।

ভূষণ দাঁত মুখ খিঁচাইয়া কহিল, তবে আর কি! তুমি বাঁচলেই আমরা চতুর্ভুজ হব!

৩

এই সব গুজবের ভেলায় ভাসিয়া উনিশ শ পঁয়তাল্লিশ কোন রকমে পার হইয়া গেল। কূল এখনও বহুদূরে। ইতিমধ্যে তুফান উঠিল। ওই লোক-ছাঁটাই লইয়া প্রথম সূত্রপাত; বেতন বৃদ্ধির দাবীও পরে সংযুক্ত হইল। এক ইউনিয়ন এই আপিসেও ছিল। কার্য্যকারী কতকগুলি প্রস্তাব কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া তাহার কর্ত্তব্য সে এ-যাবৎ যথানিয়মে সুসম্পন্ন করিয়াছে। যুদ্ধের সংঘাতে মাগ্‌গি ভাতা বৃদ্ধির আন্দোলনে প্রায় চার বছর আগে প্রথম সে গা ঝাড়া দিয়া উঠে। তার পর ঐ জাতীয় অনেকগুলি আপিস-ইউনিয়ন একতাসূত্রে বদ্ধ হয়। এখন সাধারণ ইউনিয়নের শক্তি বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

সমস্ত ইউনিয়ন সমস্বরে দাবী জানাইল যুদ্ধপূর্ব্ব পুরাতন গ্রেডের পরিবর্ত্তন চাই। জীবনধারণের মান বহুগুণ বাড়িয়াছে। পুরাতন বেতনে পোষ্য পরিবারবর্গ লইয়া মানুষ কোন প্রকারে বাঁচিতে পারে না। পৃথিবীর চারি দিকে বাঁচিয়া থাকার সমস্যাই প্রবল হইতেছে। অবশেষে ইউনিয়নের

ব্যবস্থায় প্রত্যেক আপিসেই মাহিনা বৃদ্ধির আবেদন উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীসকাশে প্রেরিত হইল।

ভূষণ বলিল, তুমিও যেমন! মাইনে বাড়াও বললেই বাড়াচ্ছে আর কি!

হরিপদ বলিল, আলবৎ বাড়াবে। যুদ্ধের বাজারে লাখ লাখ টাকা কামিয়েছে কোম্পানী।

অবনী বলিল, ধর যদি মাইনে না বাড়ায়?

হরিপদ টেবিল ঠুকিয়া কহিল, ষ্ট্রাইক করব।

অনাদি বলিল, কেরাণী ষ্ট্রাইক করে সাক্‌সেসফুল হয়েছে কোন দিন?

হরিপদ বলিল, হয়নি বলে কখনও হবে না? সবাই এক হলে ক'দিন লাগে এদের শায়েস্তা করতে!

অবনী বলিল, তা যদি হয় তো কার না ইচ্ছে ষ্ট্রাইক করতে।

অনাদি বলিল,ষ্ট্রাইক-পিরিয়ডে আমাদের সংসার চলবে কি করে?

হরিপদ বলিল, সে ব্যবস্থাও ইউনিয়ন করবে। মাসে মাসে চাঁদা দিচ্ছ কিসের জন্য?

অনাদি লাফাইয়া উঠিল, কুছ পরোয়া নেই, চালাও ষ্ট্রাইক। মাইনে বাড়াবে না—ইয়াকি আর কি!

হরিপদ বলিল, ষ্ট্রাইক বললেই ষ্ট্রাইক হয় না—বড় শক্ত জিনিষ। যত উপায় আছে—সব না দেখে ষ্ট্রাইক করা চলে না।

ভূষণ বলিল, তা কত দিন চলবে ষ্ট্রাইক?

সে কেউ বলতে পারে? কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। ওরা ইচ্ছা করলে কিছুই হবে না। কোটি কোটি টাকা যাদের রিজার্ভ ফাণ্ডে জমা—তারা আমাদের দুঃখ ঘোচাতে পারে না?

অনাদি উত্তেজিত হইয়া কহিল, ওদের সঙ্গে কোন রকম সন্ধি নয়—ষ্ট্রাইকই উপযুক্ত ঔষধ।

কিন্তু ষ্ট্রাইক-পিরিয়ডে সকলকেই ত্যাগ করতে হবে—কষ্ট স্বীকার করতে হবে—সেটা মনে রাখবে।

অনাদি বলিল, এমনই কি কষ্ট স্বীকার করছি না আমরা!

এর চেয়েও কষ্ট। ধর ইউনিয়ন থেকে পুরো মাইনে না-ও পেতে পার। আধা মাইনেয়—

অনাদি ও একসঙ্গে অনেকগুলি লোক আঁতকাইয়া উঠিল—তা কি করে হবে!

হরিপদ অল্প হাসিয়া বলিল, একটি কিম্বা দুটি মাস—এ কষ্ট স্বীকার করতেই হবে! বলিয়া গুন্‌গুন্ করিয়া সুর ধরিল।

"দুখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে!"

৪

আবেদন-নিবেদনে কোন ফল না হওয়ায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল—

কিন্তু স্থিরীকৃত হইলেই সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মঘট করার নিয়ম নাই। এক মাসের নোটিশ দিয়া তবে এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব। প্রধান ইউনিয়ন আপিস-ইউনিয়নগুলির মত চাহিল। আপিসের সঙ্ঘগুলি আবার প্রত্যেক কেরাণীর সম্মতির জন্য সার্কুলার জারি করিল।

তিন দিনের মধ্যে প্রত্যেকের মতামত জানাইতে হইবে।

হরিপদ একখানি ফরম লইয়া অনাদির কাছে আসিতেই সে জিজ্ঞাসা করিল, এটা কি?

হরিপদ বলিল, একটা সই করে দাও। আমরা ষ্ট্রাইক করব ঠিক করলাম।

হঠাৎ অনাদির বুকের ভিতরটা শুকাইয়া উঠিল। বলে কি হরিপদ? এত শীঘ্র?

বিস্ময় বাক্যে রূপান্তরিত হইতে-না-হইতে হরিপদ বলিল আরে ভাবছো কি—সবাই সই করে দিয়েছে। এই দেখ।

হরিপদর হাতে এক তাড়া কাগজ দেখিয়া অনাদি আশ্বস্ত হইল। শুষ্ক ভাবটা বুক হইতে গলায় উঠিয়া আসিল। কহিল বড়বাবু সই করেছেন?

দুর বোকা—ও সব ঘুঘু লোক কখনও সই করে!

তবে! শুষ্ক ভাবটা আবার বুকের দিকে নামিতেছে বোধ হইল।

হরিপদ বলিল, উনি বললেন—তোমরা সবাই সই করগে। জান তো, আমরা তোমাদের পেছনে আছি।

অনাদি বলিল, আজ থাক ভাই। কাল না হয়—

হরিপদ হাসিয়া উঠিল, বউয়ের পরামর্শ নেবে বুঝি! কিন্তু আর সময় নেই—আজ বিকেলে কাগজ দাখিল করবার শেষ দিন। তবু অনাদি হাত উঠায় না দেখিয়া সে একরূপ ধমক দিয়া কহিল, নাও—নাও ঢের হয়েছে। বলি তোমার মাইনে বাড়লে আমাদের তার ভাগ দেবে? ন্যাকা!

ভূষণ বলিল, সিন্নির বেলায় যে খুব এগিয়েছিলে হে—এখন কোঁৎকার ভয়ে পিছোও কেন?

বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণের মধ্যে অনাদি কখন সই করিয়াছে মনে নাই। কিন্তু সই করার সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল মাতা বসুমতী বাসুকীর ফণা হইতে নামিবার কৌশল আয়ত্ত করিতেছেন। মাথাটা

হঠাৎ ঘুরিয়া উঠায় টেবিলে মাথা রাখিয়া সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল! বহুক্ষণ পরে বড় গ্লাসের এক গ্লাস জল খাইয়া তবে তার গলার শুষ্কতা ঘুচিল।

দূর হইতে অবনী বলিল, দাদা ঢক্ ঢক্ করে অত জল খাচ্ছ কেন গো?

আর এক জনের কণ্ঠস্বর কানে আসিল, সই করার মেহন্নৎ তো কম নয়।

৫

আপিস হইতে শিয়ালদহ ষ্টেশন—প্রায় দুই মাইল। তার পর ট্রেণে এক ঘণ্টা। ওদিকে ষ্টেশন হইতেও বাড়ী এক মাইল হইবে। মাতা বসুমতী সেই যে দুলিতে আরম্ভ করিয়াছেন—তার আর নিবৃত্তি নাই। রাণাঘাটের যে দলটি ট্রেণে চাপিয়াই বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া হাঁটুতে ঝাড়ন বিছাইয়া তাস খেলিতে বসেন ও নানাবিধ মন্তব্য করেন—তাঁহারাও অনাদির দৃষ্টি ও শ্রুতিকে আজ আকর্ষণ করিতে পারিলেন না। বাম পাশের কোণে হেলান দিয়া যে আধবৃদ্ধ লোকটি সংবাদপত্র পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে পেন্সিল দিয়া বিশেষ তথ্য-গুলিতে দাগ দেন এবং কেহ জিজ্ঞাসা করিলে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা করিতে বসেন, তিনিও আজ অনাদির চোখে লুপ্ত। ভিখারীদের, চানাচুর-বিক্রেতাদের মর্ম্মভেদী চীৎকার অর্থশূন্য ভাবে কানে আঘাত করিতেছে। কেবলই মনে হইতেছে—সংসার সুনিয়মে মসৃণ গতিতে চলিতেছে। কাহারও সামনে কোন সমস্যা নাই—কোন চিন্তা নাই, সেই শুধু নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ যে কাজ এইমাত্র করিয়াছে তাহার স্খালন বুঝি কিছুতেই হইবে না। এ নির্ব্বুদ্ধিতার পরিণতি যতই ভাবিতেছে অনাদি, ততই বাসুকীর ফণা হইতে মাতা ধরিত্রী নামিয়া পড়িবার আয়োজন করিতেছেন।

মেজ ছেলে কেষ্ট ধুলা মাখিয়া পথে খেলা করিতেছিল। অনাদির ক্লান্ত মন্থর গতি চোখে পড়িতেই ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আদরের স্বরে বলিল, আমার রেল গাড়ী কই বাবা?

অনাদি সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া দেখিল—ছেলের আলিঙ্গনে—কাল সাবান দিয়া কাচা জামাটা পূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ওর ঘ্যানঘেনে আদরটাও মাথায় আগুন জ্বালিয়া দিল! সজোরে গোটা দুই চড় তার গালে বসাইয়া দিয়া খিঁচাইয়া উঠিল, রেলগাড়ী! ভারি বাপের জমিদারি তালুক দেখেছ—না? দু'মুঠো ভাতও যে জুটবে না!

কেষ্ট তারস্বরে চীৎকার করিতে করিতে অনাদির আগেই বাড়ী গিয়া ঢুকিল।

অনাদির স্ত্রী শোভার বয়স পঁচিশের মধ্যেই। কিন্তু চারিটি সন্তানের জননী হইয়া ইতিমধ্যে সে বয়স নির্ণয়ের গণ্ডী ছাড়াইয়া গিয়াছে। দেহে যেমন যৌবন নাই—মেজাজেও তেমনি স্নিগ্ধতা নাই। অভাবী সংসারে ছেলেমেয়েদের দিবারাত্রি দেহি দেহি রবে তিক্ত বিরক্ত হইয়া সে প্রতিদিন প্রকাশ্যে নিজের ও সন্তানদের মৃত্যু কামনা করে। এই লইয়া শাশুড়ী বউয়ে মনকষাকষি প্রতিদিনই হয়, অথচ প্রতিদিন এই 'হা অন্ন' রব ও কলহ তর্ক না জমিলে মনে হয়—সংসারের ছন্দ কোথায় ব্যাহত হইল

ছেলের কান্নার হেতু না বুঝিয়াই সে তাহার পিঠে আরও গোটা কয়েক চাপড় কষাইয়া দিয়া কহিল, মর মর তোরা, আমি হাত পা ছড়িয়ে নিশ্চিন্দি হই।

অনাদির মা বাড়ী ছিলেন না। কেষ্ট উঠানে গড়াগড়ি দিয়া বাড়ী ফাটাইতে লাগিল।

অনাদি কোন কথা না বলিয়া ছেলের পাশ কাটাইয়া রোয়াকে উঠিল। ছোট মেয়েটি হামা টানিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে আধ আধ স্বরে কহিল, বাব্বা—বাব্বা—

তার বড় মেয়েটির কয়দিন হইতে জ্বর। সাগু মিছরি আজকাল অমিল বলিয়া বার্লির সঙ্গে চিনি মিশাইয়া খাইতে দেওয়া হইতেছে। কিন্তু ছোট মেয়েদের রুচিবোধ যথেষ্ট। খাইবার সময় সে প্রত্যহই বায়না ধরে, এবং মায়ের চপেটাঘাত ছাড়া কিছুতেই ওই তরল পদার্থ গলাধঃকরণ করিতে চাহে না। আজ আপিস যাইবার সময় শোভা বলিয়াছিল—দু'খানা বিস্কুটও তো আনতে পার—কি একটা কমলালেবু।

অনাদি কথা দিয়াছিল আনিবে।

মেয়েটি কাছে আসিয়া বলিল, বাবা বিস্কুট দে।

অনাদি কথা না কহিয়া ঘরের মধ্যে গেল। মেয়েটি স্বর নাকে তুলিয়া কান্নার মহলা দিতে লাগিল, নেবু দে, বিস্কুট দে।

অনাদির সহ্য হইল না, তাহাকেও একটা চড় বসাইয়া দিল। ব্যস, তারপর পাঁচ দিনের

উপবাসী মেয়ের কণ্ঠ হইতে যে সুতীক্ষ্ণ চীৎকার-ধ্বনি বাহির হইল—তাহাতে ব্রহ্মরন্ধ্র না হউক, কর্ণরন্ধ্র ফাটিয়া যাওয়া আশ্চর্য্যের নহে।

শোভা ছুটিয়া আসিয়া কহিল, রোগা মেয়েটাকে মারলে তো?

হাঁ, মারলাম! ঘ্যান্-ঘ্যান্ খাই-খাই ভাল লাগে না।

ভাল লাগে না তো সংসার করতে গিয়েছিলে কেন? ঝাঁজালো কণ্ঠে শোভা জবাব দিল।

অনাদিও ঝাঁজালো কণ্ঠে কহিল, ঝকমারি। না হ'লে মানুষ জেনে শুনে এমন অধর্ম্ম করে।

অতঃপর শোভাও ছেলেদের সঙ্গে গলা মিশাইয়া বাড়ী ফাটাইতে লাগিল। পাড়া বেড়াইয়া আসিয়া মা-ও যোগ দিলেন এই গোলমালে। অনাদির মনের উষ্ণতা এই সম্মিলিত উষ্ণতার চাপে ক্রমশই নীচে নামিতে নামিতে সন্ধ্যার পর কোথায় মিলাইয়া গেল।

ভাল করিয়া ভাত না খাইয়া সে শুইয়া পড়িল।

খানিক পরে শোভা ঘরে আসিয়া এটাওটা নাড়াচাড়া করিতে করিতে আড়চোখে অনাদির ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করিয়া দেখিল, সে চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে। হঠাৎ তার মনে হইল, অসুখ নয় তো?

কাছে আসিয়া যথাসম্ভব মোলায়েম স্বরে কহিল, আজ ভাল করে খেলে না কেন? আমাদের ওপর রাগ হয়েছে বুঝি?

এই সন্ধি-মূলক স্বর অনাদির অপরিচিত নহে। তাহার মন মুহূর্ত্তে অত্যন্ত কোমল হইয়া উঠিল। হঠাৎ বিছানায় উঠিয়া বসিয়া সে খপ্ করিয়া শোভার একখানি হাত টানিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। চোখ দিয়া তার হু-হু করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

রাত্রি তখন ন'টা। মাত্র অনাদির আহার হইয়াছে—হেঁসেল-পাট সারিতে এখনও ঘণ্টা দুই লাগিবে। এ সময়ে বিছানায় বসিয়া বিক্ষুব্ধ মনের ইতিহাস সবটা খুঁটাইয়া শুনিবার অবসর নাই, অথচ অনাদির এই কান্না শোভাকে কম বিস্ময়ান্বিত করিল না। সে কহিল, কাঁদ কেন?

এই কথার জবাব না দিয়া অনাদি আরও খানিকক্ষণ ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া মনের ভার লাঘব করিল। শোভাও অধীর কণ্ঠে বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, আঃ কাঁদ কেন? কি হয়েছে বলই না ছাই।

ভিতরকার বাষ্প কিছু বাহির হইয়া গেলে অনাদি বলিল, আমি আজ সর্ব্বনাশ করেছি। তোমাদের পথে বসিয়েছি।

অ্যাঁ—বল কি! শোভা আঁতকাইয়া উঠিল। ইন্সিওরের টাকাটা এবার দাও নি বুঝি?

ওগো, সে সব কিছু নয়। আমি, বলিয়া সে পুনরায় ফোঁপাইতে লাগিল।

শোভা কৌতূহলের ভারে প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইয়াছে। আর কত সহ্য হয়। হ্যাঁচকা টানে হাত ছাড়াইয়া সে কহিল, আর আদিখ্যেতায় কাজ নেই, কি হয়েছে তাই বল।

শোভার হ্যাঁচ্কা টানে অনাদি হকচকাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু বুদ্ধি তাহার একেবারে লোপ পায় নাই। যে ঘটনাটি আজ আপিসে ঘটিয়াছে তাহার পরিণামফল ওর মানস চক্ষে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে।

অনাদি সাদা গলায় বলিল, আজ সই করে দিয়ে এলাম আপিসে—মাইনে বাড়াতে হয় বাড়াও, নইলে রইল তোমার চাকরি।

বল কি গো! চক্ষু কপালে তুলিয়া শোভা খানিকক্ষণ ধ্যানস্থের মত রহিল। তারপর সেই দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিয়া অনাদিকে বিদ্ধ করতঃ কহিল, সত্যি বলচ?

অনাদি সরিয়া আসিয়া শোভার গায়ে হাত দিয়া বলিল, সত্যি—সত্যি—সত্যি।

শোভা অকস্মাৎ কাঁদিয়া উঠিল, ওগো, এমন দুর্ম্মতি তোমার কেন হ'লো! আমাকে হাড়ে নাড়ে ভাজবার জন্যেই কি বিয়ে করেছিলে তুমি! আমি তোমার সঙ্গে কি এমন শত্রুতা করেছিলাম যে—

রান্নাঘর হইতে মা ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন, কি হ'লো বউমা, কাঁদচো কেন?

শাশুড়ীর সামনে মাথায় ঘোমটা দিবার কথা শোভার মনেই হইল না। কাঁদিতে কাঁদিতে সে বলিল, আপনার ছেলে চাকরিতে জবাব দিয়ে এসেছে মা। আমরা পথে বসলাম।

মা-ও এই সংবাদে স্তম্ভিত হইয়া শুষ্ক স্বরে বলিলেন, হাঁরে ও বুদ্ধি তোকে কোন্ শত্রু দিলে? চাকরি বিনে আমাদের গতি কি হবে বলতে পারিস?

অনাদি বলিল, ছাড়িনি এখনও—তবে সে ছাড়াই সামিল।

মা রোয়াকে বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, সব খুলে বল বাছা, আমার বুক ধড়ফড় করছে।

সমস্ত শুনিয়া তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া

বলিলেন, তোদের বড়বাবু— মালিপাড়ায় থাকে না? যা বাবা—এখনই তার কাছে একবার ছুটে যা—

অনাদি বলিল, এত রাত্তিরে এক মাইল পথ—

মা বলিলেন, চল বাবা, তোর সঙ্গে না হয় আমিও যাচ্ছি। এই কাচ্চাবাচ্চাগুলোর সর্ব্বনাশ করতে কিছুতেই দেব না আমি।

অনেক কষ্টে তাঁহাকে বুঝাইয়া অনাদি পথে বাহির হইয়া পড়িল।

৬

পথে পা দিয়াই মনে হইল—এতক্ষণ সে বুঝি দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিল। ধূলা-কোমল পথে পা ফেলিয়া এত তৃপ্তি সে বহু কাল পায় নাই। পথের দু'পাশে ঘন ঝোপ অন্ধকারে মাখামাখি হইয়া ওকে সান্ত্বনা দিতে দিতে আগাইয়া চলিয়াছে। আকাশের কোমল নীল আস্তরণে নক্ষত্রেরা আজ বেশী উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। শীতল বাতাসে ক্লান্ত মস্তিষ্ক বহুক্ষণ হইল জুড়াইয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্য পথ—আর আশ্চর্য্য আকাশ। ন'টায় গরম ভাত মুখে গুঁজিয়া ন'টা আঠারোর ট্রেন ধরিবার জন্য ছুটিবার কালে-এ পথ উদ্বেগে কোথায় আত্মগোপন করিয়া থাকে। ছ'টার সময় বাড়ী ফিরিবার কালে ক্লান্ত দেহে এত আলস্য জমা হয় যে, সন্ধ্যামুখী আকাশের বর্ণবিলাস ওর দৃষ্টিকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না। ক্লান্তির ভারে পথকে মনে হয় দীর্ঘ—আকাশকে মনে হয় অনন্ত। কিন্তু আজ এই মুহূর্ত্তে, মনে এত উদ্বেগ সত্ত্বেও, কোথায় পট পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে, কে বলিবে। যে চিন্তা এতক্ষণ মর্ম্মান্তিক ভাবে মর্ম্মকে চাপিয়া ধরিয়াছিল—সে শীতল বাতাসে ভর করিয়া কোন্ ঊর্দ্ধলোকে উধাও হইয়া গেল।

ওই না বড়বাবুর দ্বিতল প্রাসাদ দেখা যায়? ঘরের খোলা জানালা দিয়া আলোর রেখা পথের ধূলায় মূর্চ্ছিতের মত পড়িয়া আছে। কোলাহলহীন নিস্তব্ধ বাড়ী। শান্ত প্রকৃতির সঙ্গে অদ্ভুত সামঞ্জস্য বাড়ীটার। এই পরিবেশে নিজের দীনতা কি উন্মোচন করা চলে? আজ থাক্। কাল দিনের বেলায়—সকলের অগোচরে আপিসেই না হয়—

এই চিন্তাও অসহ্য বোধ হইতেছে। সত্যই ত তার চাকরি যায় নাই। কল্পনায় আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া সে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে কেন? সকলের যে দশা তাহারও না হয় সেই গতিই হইবে? সকলকে বাদ দিয়া কিছু আপিস চলে না, আপোষ-রফা একটা করিতেই হইবে।

বহুদিন পরে অনাদি গুন্ গুন্ করিয়া একটা গান ধরিল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁরে কি বললেন বড়বাবু?

অনাদি ইতস্তত না করিয়া বলিল, বললেন ভয় নেই—সব ঠিক হয়ে যাবে।

৭

আজ আপিস যাবে তো? শোভা গা ঠেলিয়া ডাকিতেছে।

অ্যাঁ—আপিস যাব না কেন।

না—তাই বলচি। আজ একটু বেলা হয়ে গেল—ডাল আর চড়াব না। বলিয়া শোভা বাহির হইয়া গেল।

জানালা খোলাই ছিল। শেষ রাত্রির জ্যোৎস্না প্রভাত স্পষ্টপ্রত্যক্ষ নয়—সৌন্দর্য্যহীন। এমনই সৌন্দর্য্যহীন প্রভাত প্রতিদিন তাহাকে কর্ত্তব্যের পথে আহ্বান জানায়। কি কর্কশ রূঢ় সে আহ্বান।

কোনমতে স্নানাহার সারিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে হয় ষ্টেশনে। গাড়ীতেই কি বিশ্রামের জো আছে। প্রায়ই গলদ্‌ঘর্ম্ম অবস্থায় দাঁড়াইয়া এর কনুয়ের গুঁতো ওর বিড়ির ধোঁয়া খাইয়া এবং গাড়ীর দোলাতে এধার-ওধার কাত হইয়া চাপাচাপিতে কোন রকমে কলিকাতায় পৌঁছিয়া যায়। তারপর অসংখ্য গাড়ী-ঘোড়ার পাশ কাটাইয়া ফুটপাথে মানুষের স্রোতে গা ঢালিয়া পায়ে পায়ে আগাইয়া যাওয়া। আপিসে প্রায়ই লেট হয় এবং বড়বাবুর গরম গরম বাক্যগুলি হজম করিয়া মোটা লেজারের অঙ্ক-সমুদ্রে 'জয়কালী' বলিয়া সে ডুব দেয়। সৌন্দর্য্যহীন প্রভাত এই ভাবে রসকষহীন দিনের মাঝে তাহাকে ঠেলিয়া দিবার ইঙ্গিত জানায়।

কাল রাত্রির পথ ও আকাশ রাত্রির সঙ্গেই নিঃশেষ হইয়াছে। মনে অল্পে অল্পে জাগিতেছে ভয়।

ট্রেণের কামরায় বড়বাবুর সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব নয়। কেননা উঁরা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী নন। ষ্টেশনের পথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু

প্রাত্যহিক কাজগুলি এমন ঠাসবুননে ভরা যে ন'টার আগে কোনমতেই বাড়ীর চৌকাঠ ছাড়ান যায় না। ডালটা না হইলেও চলে, কিন্তু অন্ন উদরে না গেলে—

ছুট্—ছুট্—ছুট্।

ট্রেণ আসিয়া গেল হুস্‌হুস্ শব্দে। যথানির্দ্দিষ্ট কামরায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে উঠিতেই কয়েকটি কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, এই যে ব্রাদার, পান খাওয়াও।

পান চিবাইতে চিবাইতে এক জন বলিল, কাল তো 'জয় কালী' বলে ঝুলে পড়লাম- দেখা যাক কি হয়।

তোমাদের আপিসেও বুঝি—

অনাদির কথায় বাধা দিয়া সে বলিল, সব আপিসেই হবে ব্রাদার। ষ্ট্রাইক কোথায় না হচ্ছে। অমন যে কোটিপতির দেশ আমেরিকা, সেখানেও—

এইসব আলোচনায় মনে সাহস সঞ্চার হয়—ভবিষ্যতের কালো মেঘের ফাঁকে রূপালী আভাস দেখা দেয়।

ওই প্রসঙ্গে গাড়ী সরগরম হইয়া উঠিল।

শহর কিন্তু ভ্রূক্ষেপহীন।

আপিস আরও নিস্তব্ধ। আসন্ন ঝড়ের আগে থমথমে প্রকৃতির মত। কাগজের উপর কলমের খস্‌খস্ শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়। দশটা বাজিয়া কয়েক মিনিট হইয়াছে।

বড়বাবু চশমার মধ্যে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি হানিয়া বলিলেন, এ মাসে ক'দিন লেট হ'ল?

ট্রেণের আলোচনার খানিকটা মরিয়া-ভাব অনাদির মনে তখনও অবশিষ্ট ছিল। সে সাদা গলায় বলিল, ট্রেণ দেরিতে এলে আমাদের কি দোষ বলুন।

আগের ট্রেণে এলেই পার। আমরা আসি না?

এমন সৎ দৃষ্টান্তের উল্লেখেও অনাদির মন গলিল না। মনে মনে বড়বাবুকে একটা অকথ্য সম্বোধনে সম্বোধিত করিয়া কহিল, আপনাদের কথা আলাদা স্যার।

বড়বাবু বলিলেন, বটে! আমরা মানুষ নই?

অনাদি মনে মনে বলিল, কোন কালেই নয়। প্রকাশ্যে কোন কিছু না বলিয়া নিজের জায়গায় গিয়া বসিল।

চেয়ারে বসিয়াই মনে হইল, ইস্—কি ভুলটাই না হইয়া গেল! ট্রেণের উষ্ণতা অতখানি পথ বহিয়া এই আপিসে আনিবার কি আবশ্যকতা ছিল? যে কথা বলা তার উচিত—সে কথা না বলিয়া—

অত্যন্ত চঞ্চল মনে বার-দুই সে লেজার খুলিল, বার-দুই বন্ধ করিল। দাঁতে কলম কামড়াইয়া বার-কতক মাথা নাড়িল।

সামনের সীটের রতন বলিল, কি দাদা, সক্কালে দুর্গা নাম না লিখে কলম কামড়ে ধরলেন যে?

অনাদি অপ্রস্তুত হইয়া লেজার খুলিয়া কাজে মনোনিবেশ করিল।

৮

মন অত্যন্ত বেয়াড়া। বড়বাবুর কাছে যতক্ষণ না নিজেকে উদ্ঘাটিত করিতে পারিতেছে—ততক্ষণ অনাদির শান্তি নাই। নানাভাবে আলোচিত হইতেছে আসন্ন ধর্ম্মঘটের কথা—অনাদি মন নিবিষ্ট করিতে পারিতেছে না।

এক সময়ে রতন বলিল, শুনেচেন দাদা—আপিস থেকেও ফর্ম্ম ছাপা হচ্ছে—কিনা বণ্ড গোছের।

কিসের বণ্ড?

রতন বলিল, প্রত্যেক কেরাণীকে ওরাও নাকি সই করিয়ে নেবে—কারা কাজ করবে—কারা কাজ করবে না। রেকর্ড রাখতে চায় ওরা।

তা হলেই তো—

অনাদির শুষ্ক স্বরে রতন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, রাখুক না রেকর্ড যত পারে। আমরা তো ডুবেছি না—ডুবতে আছি।

রতনের হাসিতে অনাদির বুক গুর গুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি লেজার বন্ধ করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বড়বাবুর ঘরে আজ বেশী ভিড়। এক জন লোক বাহিরে আসে তো এক জন ভিতরে যায়। ওরাও কি চাকুরি রক্ষার জন্য একান্তে অনুনয় করিতে আসিয়াছে? ষ্ট্রাইকটা সর্ব্বসম্মতি ক্রমে স্থিরীকৃত হইলেও সকলের মন মুখ এক আছে তো? না এ দলে সম্মতি দিয়া ও দলে ভিড়িয়া রহিয়াছে? সাপের ও ব্যাঙের গালে প্রকাশ্যে ও গোপনে চুমা দেওয়ার লোকের অভাব তো নাই আপিসে। দ্বৈত নীতি না থাকিলে কোন্ কালে তাহারা অভাব-অভিযোগের বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়া যাইত।

একটা ফাইল বগলে চাপিয়া অনাদি বড় বাবুর ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

চাপরাসি জানাইল—বড় বাবু সাহেবের খাসকামরায়। ফিরিতে ঘণ্টাখানেক দেরী হইবে।

অনাদির বুক আবার গুর গুর করিয়া উঠিল। সারিয়াছে! তাহাদের চাকরি লোপের ব্যবস্থা পাকা না করিয়া উনি কি নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিবেন।

৯

আজও অদ্ভুত রাত্রির সঙ্গে অদ্ভুত পথ মন জুড়িয়া বসিল। আহারের পর 'একটু বেড়িয়ে আসি' বলিয়া অনাদি বড়বাবুর বাড়ী অভিমুখে চলিয়াছে। সারাদিন চিন্তার পর সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে—একটা হেস্তনেস্ত এ বিষয়ে আজ করিতেই হইবে। তাহার চাকরির সুতায় ঝুলিয়া আছে এত বড় সংসার। কর্ত্তব্য বল—দায়িত্ব বল সবই একা অনাদির। এ কর্ত্তব্যে অবহেলা করিলে কি না ঘটিতে পারে। তেবশো পঞ্চাশের ভ্রূকুটি এত শীঘ্র সে ভোলে নাই। ভোলা যায় না।

তবু চিন্তার সঙ্গে পথ ও আকাশ অনুসরণ করিতেছে। বায়ু উত্তপ্ত মস্তিষ্কে স্নিগ্ধ স্পর্শ রাখিয়া অন্য এক জগতে টানিতেছে মনকে। বহুদিন আগেকার জগতে। সদাগরী আপিসের সঙ্কীর্ণ ঘরে সে জগৎ আবদ্ধ ছিল না; জীবনধারণের দুশ্চিন্তায় ছিল না ভারগ্রস্ত।

পুরাতন আকাশের ওরা অনাদি কালের নক্ষত্র। ওরা ত জানে মানুষ বহুবার বদল করে দেহ; মনে লাগে পরিবর্ত্তনের ছাপ। চিন্তায় আচ্ছন্ন হয় দূরের বস্তু—দূরের লক্ষ্য। ভীরু সংশয় আর [illegible] [illegible] বার্দ্ধ দেহ ঢাকিয়া [illegible]— [illegible] তনকে ভুলি[illegible] চেষ্টাই [illegible] অহরহ!

[illegible] খোলা জানালার আলোর [illegible] [illegible] হইয়া পথের [illegible] লুটাইতেছে! আজও বাড়ীতে অটল গাম্ভীর্য্য। ও গাম্ভীর্য্য ভেদ করিবার সাহস অনাদির নাই। দণ্ডখানেক নিঃশব্দে উন্মুক্ত বাতায়নের আলোক-রেখার পানে চাহিয়া সে ফিরিয়া চলিল।

১০

এইভাবে অনাদির রাত্রি আর দিন পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। যে আলোয় জগৎ জীবনলাভ করিয়া নবীন আনন্দে হাসিয়া উঠে—সেই আলোই অনাদিকে চিন্তার জগতে টানিয়া লইতেছে। আশঙ্কা—সন্দেহ—ভীরুতার জগতে। দিন যাপনের উৎকণ্ঠা—অন্ধ প্রত্যাশার এই দুর্ব্বিসহ বেদনা ও আর বহিতে পারিতেছে না।

হরিপদ বলিল, দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছ কেন হে—মনে বল আন।

অনাদি বলিল, ইউনিয়নে কি ষ্ট্রাইকের দিন ধার্য্য করেছে?

হাঁ—পরশু নোটিশ দেওয়া হবে। একমাস পরে ষ্ট্রাইক।

সাহেবরা কিছু বলছে না?

বলছে বইকি—আমাদের কাছে ভাঙছে না কিছু। জানো ত প্রেষ্টিজ বড় বালাই।

অন্য সব আপিস ঠিক আছে ত?

নিশ্চয়। পরশু শনিবার—ওই দিন নোটিশ দেওয়া হবে—আর সব আপিস মিলিয়ে একটা প্রসেশন বার করা হবে। থাকবে সবাই।

প্রসেশন বার করে কি হবে?

পাবলিক সিমপ্যাথি ড্র না করলে ষ্ট্রাইক কখনও সাকসেসফুল হয়!···সবাই থাকবে মনে থাকে যেন। বলিয়া হরিপদ মাথা নাড়িল।

সকলে চলিয়া গেলে অনাদি হরিপদর জামায় মৃদু টান দিয়া চাপা গলায় কহিল, শোন।

সে ফিরিলে বলিল, আচ্ছা—সেদিন যে সই করিয়ে নিলে—আমরা কাজ করবো কি করবো না—তার কিছু শুনলে?

হরিপদ হাসিয়া কহিল, বিলেতে রিপোর্ট গেছে ষ্টাফের নামে! আমাদের ফাঁসি হবে!

অনাদি শুষ্ক কণ্ঠে কহিল, এটা হাসির কথা [illegible]

হরিপদ [illegible], [illegible] সেই [illegible] তাতার পর [illegible] আছে ত? [illegible] [illegible] ওদের [illegible] কি—

অতঃপর হরিপদ বহু শপথ ও কড়া মন্তব্য করিল!···

অনাদির লুপ্ত সাহস কিন্তু ফিরিয়া আসিল না।

১১

সৌভাগ্যক্রমে আজ বড়বাবু বাহিরের বৈঠকখানায় ইজিচেয়ারে শুইয়া গড়গড়ায় মৃদুমন্দ টান দিতেছিলেন। শুক্লপক্ষ-ঘেঁষা কি একটা তিথি; মেটে জ্যোৎস্নায় পথ স্পষ্ট দেখা যায়। সেই পথে দণ্ডায়মান একটি লোককে বহুক্ষণ এই বাড়ীর দ্বিতলের পানে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি সন্দিগ্ধ স্বরে প্রশ্ন করিলেন, কে—কে ওখানে?

বৈঠকখানা-ঘরে আলো জ্বালা ছিল না; অনাদি এ দিকে লক্ষ্য করে নাই। বড়বাবুর কণ্ঠস্বরে ওর চমক ভাঙ্গিল। এ অবস্থায় বিনা বাক্যব্যয়ে আর ফেরা চলে না, পলায়নে সঙ্কট বৃদ্ধি।

গুটি গুটি রোয়াকের ধারে আগাইয়া আসিয়া অনাদি বলিল, আজ্ঞে—আমি।

বড়বাবু বলিলেন, আমি কে?

অনাদি।

ওঃ! আশ্বস্ত বড়বাবু দুয়ার খুলিয়া গড়গড়া হাতে রোয়াকে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তা তুমি এত রাত্তিরে আমার বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছিলে?

আজ্ঞে—আপনাকে ডাকব কিনা ভাবছিলাম।

কেন—কি দরকার?

মাথা চুলকাইয়া অনাদি বলিল, আজ্ঞে আপিসে কি হচ্ছে না হচ্ছে—

বড়বাবু বলিলেন, তোমরা ত যা লিখবার লিখে দিয়েছ।

আজ্ঞে তাই ত বলছি। সায়েবরা—

ওরা খুব চটে গেছে। আর চটবে না-ই বা কেন! তোমার বাড়ীর চাকরেরা যদি বলে, হুজুর মাইনে বাড়িয়ে দিন তো দিন, নইলে দেখাব মজা। তুমি তাদের সন্দেশ খেতে দেবে?

অনাদি করুণ কণ্ঠে বলিল, আপনিই বলুন না সার—এত কম মাইনেয় ছেলেপুলে নিয়ে সংসার চলে?

না চলে যদি ত চাকরি নিয়েছিলে কেন? চাকরিই যদি নিলে, ওদের চোখ রাঙাচ্ছ কোন্ সাহসে?

আপনারা তো—

যাও—যাও। বড়বাবু ধমক দিলেন। আমরা বলেছিলাম—বাইরের ইউনিয়নে যোগ দাও! একটু থামিয়া বলিলেন, প্রজার পাপে রাজ্য নষ্ট। আজ বিলেত থেকে কি খবর এসেছে জান? হয় ওরা দাবী প্রত্যাহার করুক—নয় আপিস তুলে দাও। আপিস উঠলে করো ধর্ম্মঘট! খেয়ো চারটে হাতে!

বড়বাবু ক্রোধের বশে কাঁপিতে কাঁপিতে গড়গড়ায় টান দিলেন। কলিকার আগুন বহুক্ষণ নিভিয়া গিয়াছিল। সে টানে কতকগুলি ছাই উড়িয়া পড়িল শুধু।

ওড়া-ছাইয়ের মত অত্যন্ত হালকা দেহে অনাদি বাড়ী ফিরিয়া আসিল। পৃথিবী পুনরায় প্রবল বেগে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে।

১২

শনিবার। আপিসে সাজ সাজ রব পড়িয়াছে। এই মাত্র ইউনিয়ন মারফৎ লিখিত ধর্ম্মঘট ঘোষণা করা হইয়াছে। আসল দাবীর এক চুলও এদিক-ওদিক হইলে কর্ম্মীরা কাজ করিবে না।

ইউনিয়নের নির্দ্দেশে আজ বেলা দুইটার পর সমস্ত আপিসের কর্ম্মীরা মিলিয়া বিরাট একটি মিছিল বাহির করিবে। একজন বিখ্যাত শ্রমিক-নেতা মিছিল পরিচালনা করিবেন।

আজ খাতায় দুর্গা বা কালী নাম লেখা হয় নাই, লেজারের পাতায় কেহ মনোনিবেশ করে নাই। ধর্ম্মঘট ঘোষণা করা হইয়াছে—কার্য্যকরী হইবে এক মাস পরে। কিন্তু ঘোষণার মুহূর্ত্ত হইতে কাজের সঙ্গে সকলেই বুঝি অসহযোগ করিয়া বসিল। অনাদির বুকটা বারকয়েক কাঁপিয়া উত্তেজনার প্রথম ধাপটা অতিক্রম করিয়াছে। এখন সে উত্তেজনা মাথায় উঠিয়া স্নায়ুতে—মজ্জাতে—রক্তে ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আনন্দ নয়—বেদনাও নয়—সন্দেহ বা ভবিষ্যৎ-চিন্তা কিছুই নয়—এ এক তুরীয় অবস্থা। ভাবিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া এখন ঢেউয়ের টানে ভাসিয়া চলার আবেগ সঞ্চারিত হইতেছে। সে তো আর একা নয়, আর একটিমাত্র আপিসেই এই ব্যাপার ঘটে নাই।

বেলা বারটায় বড়বাবুর মারফত সার্কুলার জারি হইল—সমস্ত কর্ম্মচারীকে অনুরোধ করা যাইতেছে, তাঁহারা যেন আজ বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত আপিসে হাজির থাকেন। বিলাত হইতে জরুরি কাজ আসিয়াছে—আজই সেটি শেষ করা চাই। অবশ্য এই উপরি থাকার জন্য উপরি মাহিনার ব্যবস্থাও হইবে।

হরিপদ এবং আরও অনেকে সার্কুলার সহি করিল না।

হরিপদ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, এ শুধু ভাঁওতা। আমরা যাতে মিছিলে যোগ দিতে না পারি, তার জন্য এই কৌশল!

ছুটির কয়েকখানা দরখাস্ত পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে নামঞ্জুর হইয়া ফেরত আসিল।

ভূষণ বলিল, কি করা যাবে হরিপদ?

কি আবার করব—দুটো বাজলেই খাতাপত্তর

গুটিয়ে লম্বা। খবরদার কেউ আপিসে থাকবে না।

রাজপথে বিরাট্ মিছিল চলিয়াছে। ভূখা মিছিল। নানা জাতির নানা বয়সের লোক। নানা বর্ণের পতাকা ও শ্লোগানে ভরা পোষ্টার আন্দোলন করিয়া চীৎকার করিতেছে অপরিমিত। যত অভাব যত দুশ্চিন্তা অন্যায়ের প্রতিকার প্রার্থনা—সঞ্চিত ক্রোধ ও বিদ্বেষের জ্বালা সমস্তই চীৎকারে ভরিয়া দিক্-বিদিকে ছড়াইয়া দিতেছে—এই ভূখা মিছিল।

আপিসের দুয়ারে মিছিল আসিতেই কেহ আর বাধা মানিল না—পথে বাহির হইয়া পড়িল।

অনাদি দুয়ারে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে কি করিবে। পিছন হইতে বড়বাবু ডাকিলেন, অনাদি।

অনাদি পিছনে চাহিল।

ফিরে এস। মিছিলে যোগ দিলে চাকরি থাকবে না।

অনাদি দাঁড়াইল।

হরিপদ পিছন হইতে তাহাকে ধাক্কা দিয়া কহিল, দাঁড়ালে যে?

বড়বাবু বলিলেন, পাগলামি কর না তোমরা, চাকরি বজায় রাখতে চাও ত পথে পা দিও না।

হরিপদ কোন কথা না বলিয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া অনাদিকে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল।

তথাপি পথে পা দিতে অনাদির সাহস হইল না। ওদের পায়ের শব্দে ও চীৎকারে রৌদ্র-প্রখর মধ্যাহ্ন কাঁপিয়া উঠিতেছে। সেই সঙ্গে কাঁপিতেছে অনাদির বাস্তব-ভীরু মন।

দুয়ার হইতে সরিয়া সে ঘরের মধ্যে আসিল। প্রকাণ্ড ঘর শূন্যতায় খাঁ খাঁ করিতেছে—জনপ্রাণী কেহ নাই। বুকের মধ্যে দুরুদুরু কম্পন বাড়িয়া উঠিল। এই বিরাট্ শূন্যতার মুখোমুখি দাঁড়াইয়া নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হইল তার। যে ভয় তাহাকে আপিসের ঘরে এতক্ষণ আটকাইয়া রাখিয়াছিল, সেই ভয়ই তাহাকে মিছিলের দিকে টানিতে লাগিল।

ছুটিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সমাপ্ত